মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পঞ্চম খণ্ড—১২৯৪।

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬৯ নং মস্‌জিদ্‌ বাড়ী ষ্ট্রীট, সমর্থকোষ প্রেসে,

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

পঞ্চম খণ্ড নব্যভারতের সূচিপত্র।

(১২৯৪)

ছবি আমরা দেখিয়াছি। ভারতের জাতীয় মহাসমিতির [illegible] অধিবেশনের পর কে আর সন্দেহ করিবেন যে, এই ভারতে জাতীয় মিলন অসম্ভব? এক লক্ষ্যে, এক পথে, এক প্রাণে, এক মনে আজ ভারত মাতোয়ারা। এখনও অসম্পূর্ণ আছে, তা জানি। এখনও নিম্নশ্রেণীর উত্থান হয় নাই, এখনও দরিদ্রের চক্ষের জল মুছে নাই, সে সব জানি। কিন্তু সকলই সময়-সাপেক্ষ। জাতীয় অভ্যুত্থানের এক বিজয় ভেরী ভারতে বাজিয়া উঠিয়াছে। যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মানী—আজ এক প্রাণ, এক মন! এই একপ্রাণতার সঙ্গ [illegible]তা, চরিত্রবল ও ধর্ম্মবল যখন সংযোজিত হইবে, তখন না জানি কি অপূর্ব্ব শ্রী হইবে,—না জানি কি এক অপূর্ব্ব শ্রীতে আবার ভারত সজ্জিত হইবে! নব্যভারতের আশার কথা কেবল কুহেলিকা নয়, ইহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

তারপর জাতীয় ভাষা। ভাষার একতা যে জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথায় কাহারও আর সন্দেহ নাই। কিন্তু হইতেছে, কারণ এই [illegible]তে মিলনের মধ্যবিন্দু হইতেছে [illegible] ভাষা। বিদেশী [illegible] [illegible] আর উচিত নয়; [illegible] চর্চা অনেক কমিয়া গিয়াছিল, এই চারি বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে, জাতীয় ভাবে শিক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখিয়া এখন গবর্ণমেণ্ট টোলের সাহায্য করিতে অগ্রসর! সংস্কৃত ভাষার অমৃতময় অনন্ত প্রস্রবণ যে ভাষার প্রাণ, সেই মধুর হইতেও মধুর বাঙ্গালা ভাষা কালে যে ভারতের আর সকল গ্রাস করিবে, আমাদের এখনও আশা আছে। তাই এই ভাষার উন্নতির জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি। নিন্দা, তিরস্কার মুষলধারার ন্যায় বর্ষিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তবুও এই ভাষার উন্নতি-চিন্তার বিরাম নাই। লক্, লক্, লক্ করিয়া—সর্ব্বগ্রাসিনী হুতাশনের ন্যায়, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিবে যে বাঙ্গালা ভাষা, তাহার প্রতি আজও যিনি বীতস্পৃহ, তিনি হিতৈষী হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তিনি

কখনও সহৃদয় প্রেমিক নহেন। নব্যভারত বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে আজও আশায় প্রদীপ্ত। কিন্তু সমগ্র দেশ একথায় আজও সায় দেয় নাই। তাই দুঃখ।

কিন্তু এ সকলও আশার অবান্তরিক আয়োজন মাত্র। নব্যভারতের লক্ষ্য যাহা, তাহা এখনও বহু দূরে!—শতাব্দীর পর শতাব্দী, তারও পরে। এখন আয়োজনের প্রয়োজন, তাই এখন আয়োজনের কথা লইয়াই আলোচনা করিয়া থাকি। লক্ষ্য-সিদ্ধি এখনও বহু দূরে।

লক্ষ্য এখনও ঘোরতরা গভীরা মহা আঁধারে সুষুপ্ত। এখন কেবল পূর্ব্বাভাস মাত্র। পূর্ব্বাভাসে যে প্রকার আয়োজন হইতেছে, ইহা কিছুই নয়। ইহাও বালকের ক্রীড়া মাত্র। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা নাই, অথচ তাদের উত্থানের কথা,—প্রেম নাই মিলনের কথা,—প্রকৃত জ্ঞান চর্চ্চা নাই জাতিত্বের কথা,—চরিত্র বল ও নীতি বল নাই, স্বাধীনতার কথা,—এ সকলও বালকের ক্রীড়া। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই কামনা ফুরাইতেছে। কত দুঃখে দিন কাটাইতেছি! এখনও যে লোক পাশব বলের প্রতীক্ষা করিতেছে, চারিত্র্য শাসনের পরিবর্ত্তে পাশব শাসনের আয়োজন করিতে চাহিতেছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, প্রেম এখনও অনেক দূরে। সংসারের কঠোর যুদ্ধে মানুষকে বিজয়ী করিতে পারে—একমাত্র প্রেম। প্রেম আত্ম-সংযমের মূল মন্ত্র, প্রেম শত্রু পরাজয়ের মহা অস্ত্র। কে পর, কে মিত্র, কে আপন, কে পর?—প্রেমের নিকট সব একাকার। প্রেমের অভ্যুদয় ভিন্ন আমিত্ব ঘুচে না, স্বার্থ নিবে না, মহাজ্ঞান জন্মে না। প্রেমের অভ্যুদয় না হইলে জীবনাহুতি দিতে কেহই পারে না। তাই ত কেহই গা ঢালে না। তাই ত সকলেই হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, কিন্তু কিছুতেই মজে না। সভায় অসার বক্তৃতা—এখন দেশোদ্ধারের মূল অস্ত্র, সংবাদ পত্রে হৃদয়-শূন্য অত্যাচার-কাহিনী লেখা এখন জাতিত্ব-গঠনের অমোঘ ঔষধ। সকলেই প্রাণ দানের কথা বলে এবং লিখে, কিন্তু কেহই প্রাণ দান করে না। সকলেই বলে প্রেম নাই,— কিন্তু নিজে কেহই প্রেমিক হইতে চায় না। সুখ বিসর্জ্জন, আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ—এসকল যেন নিজের জন্য নয়, কেবল অন্যকে বুঝাইবার জন্য,—কেবল সভায় বক্তৃতার জন্য! বিসর্জ্জন—আত্মত্যাগ—স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কি কখনও কোন দেশ জাগিয়াছে? কিন্তু সে সকল এখনও সুদূর-পরাহত। ডিনার-ক্লবের নৃত্য গীতে, বক্তৃতা সভার বৃথা করতালিতে, উচ্চ প্রশংসার কুহক-মন্ত্রে এখনও হিতৈষী দলের মন প্রাণ মন্ত্রমুগ্ধ। এখনও আত্মত্যাগের কথা—বাতুলের ক্রীড়া। তাই বলিতেছিলাম,—লক্ষ্য-সিদ্ধি এখনও অনেক দূরে। আত্মত্যাগ শিখাইতে নব্যভারতের জন্ম, তাহা এখনও শত শত বৎসরের পশ্চাতে লুক্কায়িত। আশায় নিরাশা,—সুখে দুঃখ জাগিবে না তবে কেন, বলত?

আমাদের এক একবার ইচ্ছা হয়, এ স্বার্থ-কলঙ্কিত মুখ অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলি। মরণকে কতবার তাই উল্লাসে আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু মরণ কিছুতেই আমাদের আব্দার শুনে না। এত নিরাশা, এত ক্রন্দন, এত বুক-পোরা হাহাকার—তবুও পোড়া প্রাণ দেহ-মমতা, সংসার-মমতা ছিঁড়িতে পারে না। বিধাতার লীলা কে খণ্ডন করিবে!

মরিতে যাইয়াও মরা হয় না। এতই সংসার বিলাস-মমতা? কত মরণ আসে,আবার কত মরণ নিবিয়া যায়। তোমরা যে আমাদের মরণের জন্য চেষ্টা করিতেছ, সে ত মঙ্গলের জন্যই! তাহা বুঝিয়াছি। থাকিয়া ফল কি,বাঁচিয়া লাভ কি! যদি অহেতুকী প্রেমই না পাইলাম,—স্বার্থ ভুলিয়া যদি জগতের হইয়া যাইতে না পারিলাম—তবে জীবন ধারণ ত বৃথাই! তাই আমরা আরো মরণ, আরো অন্ধকার চাই। কিন্তু পাই কই? যে আসক্তি! এই দারুণ আসক্তির সেবা করিতে, এ শুষ্ক জীবন ধারণ করিয়া কি হইবে? তাই বন্ধু,—পায়ে ধরি, শত মরণের শত বজ্র সঘন নিক্ষেপ কর।—আমাদের কাছে তোমার ঐ হিংসার-বান নিক্ষেপ পুষ্প বর্ষণ! আমরা মরিতেই চাই। আমরা অন্ধকার হইতে আরো অন্ধকারেই যাইতে চাই। হিংসার আলোকে আর কাজ নাই! আমরা সব মায়া ভুলিতে চাই। ভালবাসা, মায়া, মোহ—সব অন্ধকার হউক। আত্মীয় বন্ধু সব পর,আরো পর,আরো পর,আরো পর হউক। যে কাছে ছিল, সে ঐ হিংসার কূটচাহনি লইয়া আরো দূরে, আরো দূরে চলিয়া যাউক। আমরা আসক্তিহীন মহা বৈরাগ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আত্মত্যাগের মোহিনী মন্ত্রে দীক্ষিত হই! আমাদের ধারে নাই বা বসিলে, আমাদের কথা নাইবা শুনিলে! চাই না—তোমাদের পবিত্র দেহ মনে আমাদের কলঙ্ক ঢালিতে চাই না! মরণ, মরণ, কেবল মরণ! দুঃখ, দুঃখ, কেবল দুঃখ! অশ্রু, অশ্রু, কেবল অশ্রুপাত! আঁধার, আঁধার,কেবল আঁধার! দুঃখে থাকিয়া, অশ্রুতে ভাসিয়া, আঁধারে আমিত্ব ডুবাইয়া—স্বার্থ নিবাইয়া জগতের হইতে না পারিলে কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

নব্যভারত আজও যে আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই, একথা কি আবার লিখিয়া বুঝাইতে হইবে? এখনও আপনার উজ্জ্বল কলেবরের প্রতি দৃষ্টি, এখনও প্রশংসার দিকে কর্ণ, এখনও অবস্থার প্রতি মনোযোগ! এখনও হিংসার প্রবল পরাক্রম! কি ভণ্ডামী!! আমরা এই চাই,—কেহ আমাদের কথা শুনিতে চাহিবে না; কেহ এ দিকে করুণার কটাক্ষপাত করিবে না, কেহ প্রশংসার স্তুতি ধরিবে না, কেহ ভালবাসার আদর করিবে না;—সকলের ঘৃণা, সকলের অনাদর স্বত্তেও, ঐ মরণের কোলে বসিয়া দিবানিশি দেশের মঙ্গল চিন্তা করিব;—প্রাণের কথা গাইব! না থাকিয়া, থাকিব! মরিয়া বাঁচিব! রূপ না দেখিয়া মজা, ভালবাসা না পাইয়া ভালবাসা,—স্বার্থহীন হইয়া জীবন ভাসান—নব্যভারতের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য-সিদ্ধি এখনও বহুদূরে। অহেতুকী প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি লাভ এখনও বহু শতাব্দীর পশ্চাতে! তাই নব্যভারতের হাহাকার এবং বিষাদ-সঙ্গীত। তাই এখনও পরাধীনতার তীব্র কষাঘাত নব্যভারতের অস্থি মজ্জাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে! নব্যভারত যদি বৈকুণ্ঠবাসী হইত তবে এ হাহাকার থাকিত না। শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান! আগুন, আগুন, আগুন আঁধার, আঁধার,আঁধার!—মহাবৈরাগ্যে আগ্নেয়মন্ত্রে মাতোয়ারা না হইলে নব্যভারতের কিছুতেই মঙ্গল নাই। স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের মহাব্রত এখনও অন-উদ্যাপিত রহিয়াছে। অমুন্নত নব্যভারতের তাই আজও পৃথিবীতে অবস্থিতি। বিধাতার লীলা কে

বুঝিবে? কিছুতেই মায়াজাল ছিন্ন হয় না!! কিছুতেই দেহ-মমতা, জীবন-মমতা,—আপন মমতা ছিঁড়িয়া নব্যভারত জগতের হইতে পারিল না। এ দুঃখ কে বুঝিবে?

বেদান্তসার।

চিত্তবৃত্তি বিন্যাসের নাম উপাসনা। উপাসনা আত্মজ্ঞান সাধনের সোপান। কোন প্রকার সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মে মোক্ষ নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম অন্যতর সোপান। মোক্ষ কেবল জ্ঞানে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-অদ্বৈত জ্ঞানে। প্রার্থনা, উপাসনা নহে। প্রার্থনা, দ্বৈতজ্ঞান পরিচায়ক। প্রকৃতি, আত্মা ও পরমাত্মা সকলই ব্রহ্ম—"ত্রয়ং সদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ"। প্রথমে সকাম কর্ম্ম করিবে, তাহার পর নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে, তাহার পর সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইবে।

অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তা।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়, আর জন্ম হয় না। দেবতাদেরও পুনর্জ্জন্ম আছে, কর্ম্মফল কাটে নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীর পুনর্জ্জন্ম নাই।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।

যদাপশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিং তদাবিদ্বান পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।

মন অবলম্বন শূন্য থাকে না। শুভালম্বন না পাইলে অসৎ কর্ম্মে ধাবমান হইবে, এজন্য অনুক্ষণ উপাসনা কর্ত্তব্য। মন ব্রহ্মপরায়ণ হইলে চক্ষু মন্দ দেখিবে না, কর্ণ মন্দ শুনিবে না। পদার্থ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন হইলেও মনের অভাবে প্রত্যক্ষ হইবে না।

উপাসনা দ্বিবিধ, যজ্ঞ ও ধ্যান। কোন পদার্থকে দান করার নাম যজ্ঞ। যে যত উৎকৃষ্ট পদার্থ দান করিতে পারে, তাহার যজ্ঞ তত ভাল। কামনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংসারে মানুষের কিছু নাই। সর্ব্ব কামনা ব্রহ্মকে উৎসর্গ করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। যে করে, সেই সন্যাসী। যজ্ঞ সাধন করিতে হইলে, বাক্য ও মন, এ উভয়ের সংস্কার আবশ্যক। একচক্র-রথের ন্যায় ইহাদের অন্যতর যজ্ঞ সাধনে সমর্থ নহে। পরন্তু চেষ্টা করিলে আপনিও বিনষ্ট হয়।

প্রবৃত্তি না হইলে কর্ম্ম হয় না। কামনা-ত্যাগ নিবৃত্তি মাত্র, সুতরাং উহা কর্ম্ম নহে। সকল প্রবৃত্তির সম্যক পরিচালনা করিতে হইবে; এ উপদেশ ভাল নহে। প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ পাশ্চাত্য উপদেশ। প্রবৃত্তি মার্গে-স্বর্গ আছে, মোক্ষ নাই। জ্ঞানী লোক স্বর্গের আকাঙ্খা করে না। মূর্খের প্রার্থনা স্বর্গলাভ। মোক্ষলাভ নিবৃত্তি মার্গে। প্রবৃত্তি যত চালিত হইবে, বাসনা তত বাড়িবে, বাসনা হইতেই পুনর্জ্জন্ম। প্রবৃত্তি যত নিরাশ হইবে, মোক্ষ তত নিকট হইবে। প্রবৃত্তির নিরাশ ইহাই উপনিষৎসিদ্ধ। ইহাও বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ।

যে যেমন সাধনা করে, তাহার তেমনি গতি হয়। যে ব্রহ্ম সাধনা করে, সে ব্রহ্মত্ব

লাভ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে দেবত্ব সাধন করে, তাহার দেবযান হয়, যে বাসনার সাধন করে, যে পিতৃযান লাভ করে। কর্ম্মমার্গে স্বর্গ, জ্ঞান মার্গে দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব। পূর্ণজ্ঞানে ব্রহ্মত্ব, অপূর্ণ জ্ঞানে দেবত্ব। একবার দেবত্ব লাভ করিলে আর নীচ জন্ম হয় না। উত্তরোত্তর পূর্ণজ্ঞান লাভ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। স্বর্গ ক্ষয়ে কর্ম্মী পুরুষ পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে।

মৃত্যুর পরে কি, সবাই জিজ্ঞাসা করে; জন্মের পূর্ব্বে কি, কেহ জিজ্ঞাসা করে না। অথচ উভয়ই কুটিল রহস্য। আত্মার অমরত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন, অনন্তত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা আত্মাকে সৃষ্ট বলেন বা দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন। তাঁহাদের জন্ম পূর্ব্ব-ঘটনা অনুসন্ধান করিতে হয় না। মানুষের জনন প্রবৃত্তির অপেক্ষায় ঈশ্বর এক একটী আত্মা হাতে করিয়া বসিয়া থাকেন। বস্তুত অনন্তত্ব-বিহীন অমরত্ব অতি অকিঞ্চিৎকর। যাহা অনন্ত, তাহা আদিতেও অনন্ত, অন্তেও অনন্ত, একথা বলিবার আবশ্যক নাই। অমরত্বের এক দিকে শূন্য।

যাঁহারা আত্মার অনন্তত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা স্ফটিকে ফুলের রঙের মত, বুদ্‌বুদে আদিত্য জ্যোতির ন্যায়, আত্মাকে পরমাত্মার জ্যোতি ভিন্ন, অদ্বৈত ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করিতে পারেন না। হয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে আত্মাকে দেহের জ্যোতি বলিতে হইবে, না হয়, আত্মাকে অনন্ত ব্রহ্ম বলিতে হইবে। তৃতীয় পন্থা নাই। আত্মাকে অমর বলিয়া পরকালের ন্যায় পূর্ব্ব কালের ব্যবস্থা না করিলে শশকের পত্রাচ্ছাদনে শিরোরক্ষা ঘটে। দুজ্ঞের্য় সুতরাং অচিন্তা-কর্ত্তব্য, ইহা না ভক্তির না জ্ঞানের কথা।

বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক উভয়েই কর্ম্ম ফল স্বীকার করেন, কর্ম্ম ও বাসনা পুনর্জন্মের কারণ। বাসনার নিরাশ হইলে জন্ম হয় না, বাসনা থাকিলেই জন্ম হইবে। সে বাসনা যে কোন প্রকার। ধার্ম্মিক হইবার বাসনা কর, পুনর্জ্জন্ম হইবে; মোক্ষ পাইবার বাসনা কর, পুনর্জ্জন্ম হইবে। বাসনা জন্ম-প্রসূতি। কি রকমের জন্ম হইবে, মনুষ্যরূপে, পশুরূপে, কীট কি পতঙ্গরূপে, তাহা কর্ম্মফলে নিশ্চিত হয়। সাংখ্যকার বলেন, কর্ম্মফল অকাট্য,-"অবশ্যমেব-ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং"। বৈদান্তিকেরা তিন প্রকার কর্ম্ম স্বীকার করেন—প্রালব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী। যাহা করিতেছ ও যাহা করিবে, জ্ঞানযোগে ইহাদের ব্যত্যয় হইতে পারে। কিন্তু প্রালব্ধ কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল ভোগে কাটে। প্রালব্ধ কর্ম্মফল-ভোগ শেষ হইলে জ্ঞানজনিত মোক্ষ লাভ হয়। যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে অথচ কর্ম্মফলভোগ কাটে নাই, তাহাকে মোক্ষের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এজন্য জীবন্মুক্তি—জীবিতাবস্থায় মোক্ষ ঘটে না। কর্ম্মফল-ভোগী জ্ঞানবান কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন বলিয়া কাতর নহেন। স্বাস্থ্যের সোপান জানিয়া তিনি রোগকে বিড়ম্বনা মনে করেন না।

জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, ঈশ্বর আছেন কিনা, আত্মা আছে কিনা, বৌদ্ধেরা এ সকল গূঢ় রহস্যের আলোচনা করেন না। যাহা আছে, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই স্বীকার করিয়া নামরূপের আলোচনাতেই বৌদ্ধ দর্শন সমাপ্ত। জগৎ দুঃখময়, দুঃখের কারণ

কি, কিরূপে দুঃখের বিনাশ হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই বৌদ্ধদর্শন পরিপূর্ণ। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মোক্ষ—"ত্রিবিধ দুঃখস্যাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ"—এই খানে বৌদ্ধ ও সাংখ্যদর্শনের একতা, বেদান্তদর্শনে পরব্রহ্মে আত্মার বিলয়ের নাম মোক্ষ।

তথাপি বৌদ্ধদর্শনের মর্ম্মে আত্মার অস্বীকার। বৌদ্ধেরা আত্মা স্বীকার করে না, অথচ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে। ইহা আপাতত বিসম্বাদী বলিয়া বোধ হইতে পারে। মৃত্যু হইলে দগ্ধ করিয়া শরীরের বিনাশ করা হয়, আত্মা স্বীকার না করিলে পুনর্জ্জন্ম কাহার হয়, একথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। বৌদ্ধদর্শনে স্পষ্টত আত্মা স্বীকার করাও হয় নাই, অস্বীকার করাও হয় নাই। সুতরাং এ প্রশ্নেরও স্পষ্ট কোন মীমাংসা করা হয় নাই। তথাপি আত্মা অস্বীকারের মত, অস্পষ্টভাবে, এ প্রশ্নেরও উত্তর বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়। বৈদান্তিকেরা দুই প্রকার রূপ স্বীকার করেন—স্বরূপ রূপ ও প্রবাহ রূপ। আমি যখন বলি যে "কাল গঙ্গার এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলাম" তখন সত্য কথা কহি কিনা? কালিকার আমি আজিকার আমি নহি, কালিকার ঘাট আজিকার ঘাট নহে, কালিকার সে গঙ্গা আজি নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অথচ কালি এই ঘাটে আমি স্নান করিয়াছিলাম, একথাও সত্য। কালিকার কিছুই স্বরূপ রূপে আজি নাই, কিন্তু প্রবাহরূপে সকলেই আছে। কালিকার আমি স্বরূপত আজি নাই, কিন্তু প্রবাহরূপে আজ আছি, কাল থাকিব, দশদিন পরেও থাকিব, জন্মে জন্মে থাকিব। বৃক্ষাদির আত্মা নাই, সকল দার্শনিকেই বলে, সে বৃক্ষাদি প্রবাহরূপে বহুদিন থাকে। আত্মা আছে বলিয়া কালিকার আমি আজি আছি, একথা সত্য নহে। আত্মা না থাকিলেও, প্রবাহরূপে জীব জন্ম জন্ম থাকিতে পারে। এই জন্য আত্মা স্বীকার না করিলেও, বৌদ্ধগণের জন্মান্তর স্বীকারে বাধা ঘটে না। এখানে বৌদ্ধমত বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধমত।

অনেকে আত্মা ও পরমাত্মার একতা স্বীকার করিলেও, প্রকৃতির সহিত আত্মার একতা, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" স্বীকার করিতে চাহেন না। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন। ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, উপাদান কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বুঝাইবার জন্য বেদান্ত "ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন" এরূপ কথা না বলিয়া "ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে" এইরূপ বলেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" কর্ত্তৃকারকের পরিবর্ত্তে অপাদান কারক ব্যবহার হয়। জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম বলিয়া জগৎকে ব্রহ্মময়—জগতই ব্রহ্ম—এরূপ বুঝিতে বৈদান্তিকের কোন আপত্তি হয় না। জগত মিথ্যা বলিয়াও বেদান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম, তাহা মিথ্যা কিরূপে হইবে, বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইতে পারে। বস্তুত, ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছু নাই, সকলই যখন ব্রহ্ম, তখন জগত আর কোথায় রহিল? রজ্জুকে যদি রজ্জু বলা যায়, তাহা হইলে ভ্রম হয় না। কিন্তু

রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম মিথ্যা। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানী লোকে ব্রহ্মকে জগত বলিয়া ভ্রম করে। সকলই ব্রহ্ম, জগত বলিয়া কিছু নাই।

ইতি পূর্ব্বে যজ্ঞ ও ধ্যানের কথা বলিতেছিলাম। অনেকের সেই কথাই ভাল লাগিবে, তুমি আমি নাই, ভেদাভেদ নাই, সকলই ব্রহ্ম, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইতে পারে। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকারী ভেদ না করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মত, সকলকে এক প্রকার উপদেশ দিলে কাহারও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। আবার আচার্য্যকে কাহারও নিকট প্রতিমার আবশ্যকতা, কাহারও নিকট অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে দেখিয়াছি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন সূত্রে লিখিত হইয়াছে যে, দুঃখ দুঃখের কারণ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় সংসারাসক্ত অসংস্কৃত লোকে বুঝিবে না বলিয়া বুদ্ধদেব বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। বৈদান্তিকেরা বলেন, যাহারা রাগ দ্বেষ, আসক্তি ও ঘৃণা হইতে মুক্ত হয় নাই, তাহারা ব্রহ্ম নিরূপণে অসমর্থ। যোগবাশিষ্টে একটী আখ্যায়িকা আছে। এক ব্যক্তি পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। বহুশত বৎসর ভ্রমণ করিয়াও পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে অসমর্থ হইলে, সে দ্রুততর গতি লাভের জন্য হরিণ রূপ ধারণ করিয়াছিল। সেইরূপে সে একদা শীকারীর বাগুরাবদ্ধ হইয়া রাজার গৃহে বন্দী হয়। যে পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে সমর্থ নহে, সে মায়ার অন্ত নিরূপণে কিরূপে সমর্থ হইবে? তাহার পর মায়ার অতীত ব্রহ্ম কত দূরে!

যজ্ঞ ও ধ্যান দ্বিবিধ হইলেও, কোন্ স্পষ্ট রেখায় দুইটী বিচ্ছিন্ন নহে। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ। যজ্ঞ সমাধিকে সাহায্য করে, আবার সমাধি যত উন্নত হইবে, যজ্ঞ তত মহত্তর হইবে। যতই উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতে পারিবে, সমাধি তত একাগ্র হইবে। মানুষের দুটী পা, ভিন্ন হইলেও, দক্ষিণে ও বামে বিভক্ত হইলেও, একটীকে ছাড়িয়া একটীতে চলে না। একের পতনে দুয়েরই পতন হয়। মনের মধ্যে আসিয়া দুই জনে যুক্ত হইয়াছে, তাহার পর একটী বাক পথে, অন্যটী অবাক্ পথে নামিয়া গিয়াছে। মৌনাচরণ ও মনন করিব বলিয়াই আমাদের নাম মানব হইয়াছে।

যাগ যজ্ঞে জীব পিতৃলোক লাভ করে, জ্ঞানে দেবলোক লাভ করে। যজ্ঞে চন্দ্র মণ্ডলে বাস হয়, জ্ঞানীর পরিণাম সূর্য্য মণ্ডলে। যজ্ঞের ফল ভোগ হইলে, পাপের ফল ভোগ আরম্ভ হয়। চন্দ্র মণ্ডল হইতে বৃষ্টিরূপে জীব ভূতলে পতিত হয়। কর্ম্ম ফলানুসারে যে জন্ম লাভ করিতে হইবে, সেই জাতীয় কোন জীব সেই বৃষ্টি জল গ্রহণ করে। সেই জীবের ঔরসে ফলভোগীর জন্ম হয়। জ্ঞানমার্গে যাহারা দেবলোক লাভ করে, তাহাদের আর পতন হয় না।

কর্ম্মে অবিদ্যার বিনাশ হয় না, পুনশ্চ উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি হয়। পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভের কারণ ঘটে। জ্ঞানেই কেবল অবিদ্যার বিনাশ হয়, বাসনা নাশ হইলে পুনর্জ্জন্মের কারণ ঘটে না। এই জন্য জ্ঞান মার্গ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মমার্গের শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের সোপান, জ্ঞান অবিদ্যা-বিনাস হেতু। এই খানে উত্তর ও পূর্ব্ব মীমাংসার মিলন।

আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে না। আত্মা নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নির্লিপ্ত। আত্মা সুখেরও ভাগী নহে, দুঃখেরও ভাগী নহে। কর্ম্ম-ফল-ভাগী জীবের সূক্ষ্মদেহ। সূক্ষ্মদেহ পঞ্চ-প্রাণ মনোবুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয় সমন্বিত। আত্মা নিরুপাধি। নীলকুসুম সন্নিধানে স্ফটিককে যেমন নীলবর্ণ বোধ হয়, অবিদ্যা বশত আত্মাকেও উপাধি বিশিষ্ট বোধ হয়। তাই অজ্ঞান লোক আত্মাকে পঞ্চ কোষময় বা ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপারী বলিয়া মনে করে। আত্মার অবস্থিতি হেতু ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে বটে, কিন্তু সে কর্ম্ম আত্মার নহে। আত্মা নিষ্কর্ম্মা, সূর্য্যোদয়ে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাই বলিয়া সূর্য্য সে সকল কর্ম্মের কারণ নহে। আত্মা কূটস্থ শুদ্ধ চৈতন্য।

আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, মন নহে, বুদ্ধি নহে, প্রকৃতি নহে, তাহাদের সকলের সমষ্টিও নহে। ইহাদের সকলে লয় পাই-লেও আত্মার কোন ক্ষতি হয় না। আত্মার মৃত্যু নাই। অবিদ্যাজনিত দেহাদি মরণ-শীল, আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই। আত্মা কাহারও সৃষ্ট নহে, আত্মা পরমাত্মার অংশ নহে। সূর্য্যকিরণে স্ফটিক যেমন জ্যোতির্ম্ময় হয়, জীবদেহে আত্মা তেমনি পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। আত্মা স্বপ্র-কাশ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তবে অস্বচ্ছ পদার্থে যেমন জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয় না, তেমনি অবিদ্যা কলুষিত ক্ষেত্রে আত্মা প্রকাশিত হয় না। যেমন নিষ্কলঙ্ক দর্পণে সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হয়, তেমনি কেবল মাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মা ভিন্ন আর কাহারও চৈতন্য নাই। আত্মার চৈতন্য হেতু দেহাদি সচেতন বলিয়া প্রতীত হয়। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থ। ইহারা কেহ আপনাকে প্রকা-শিত করিতে পারে না। প্রদীপ যেমন ঘটাদি প্রকাশিত করে, তেমনি আত্মা তাহা-দিগকে প্রকাশিত করে। প্রদীপ যেমন আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিতে পারে, প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য প্রদীপের আবশ্যকতা রাখে না, আত্মা তেমনি স্বপ্রকাশ, আপনাকে আপনি জানিতে পারে।

কর্তৃত্বাদি মনের ধর্ম্ম, রাগ দ্বেষাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম, আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই, কোন গুণ নাই, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য নির্ম্মল চিৎ-স্বরূপ। আকাশের নীলিমার ন্যায় আত্মার গুণ, কল্পনা মাত্র। আত্মার আকার নাই, বিকার নাই, ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, গুণ নাই, অভিমান নাই। আত্মা নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য ও অদ্বিতীয়। আত্মা আছে তাই সত্য, স্বপ্রকাশ তাই জ্ঞান-ময়, জন্ম মৃত্যু নাই তাই অনন্ত। পরমা-নন্দ পরমাত্মার বিদ্যমানতাই আনন্দস্বরূপ। আত্মাই ব্রহ্ম। আনন্দ আত্মার গুণ নহে, জ্যোতি যেমন সূর্য্যের গুণ নহে, সূর্য্য যেমন জ্যোতির্ম্ময়, আত্মা তেমনি আনন্দ-ময়।

যাঁহারা অনুশীলন ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারা বেদান্ত-বিরোধী। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধি বা তাহাদের সমষ্টি আত্মা হইলে, তাহাদের উৎকর্ষণে আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইত। বস্তুত আত্মার উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা নাই। বেদান্ত মতে ঐ সক-লের নিবৃত্তিতেই জীবের মঙ্গল। ইহারাই দুঃখ সহিবার ক্ষমতাকে মোক্ষ পাইবার উপায় বলিয়া, অশ্ব গর্দ্দভাদি ভারবাহিকে

মোক্ষ লাভের অধিকার দিয়াছেন। (প্রচার—পৌষ)।

আত্মস্বরূপ অনুভব হইলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই যোগী আত্মাকে সর্ব্বময় জ্ঞান করেন। যোগীর সাংসারিক সুখে অনুরাগ থাকে না। যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য লাভকে লাভ বলিয়া বোধ হয় না, যাহাকে পাইবার সুখ হইতে অন্য সুখ অধিক নয়, যাঁহার জ্ঞান হইলে অন্য জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয় না, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যাহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া জ্যোতিষ্কগণ প্রকাশ পাইতেছে, বাহ্য ও অভ্যন্তর সমস্ত জগতকে যিনি প্রকাশ করেন এবং স্বয়ং প্রকাশিত হন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ব্রহ্ম জগতের অতিরিক্ত, কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমরা যাহা কিছু দেখি ও শুনি, সে সমুদয়ই ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হইলে আর উপাসনার আবশ্যকতা থাকে না।

উপাসনার প্রধান সহায়, বিবেক অথবা আত্মানাত্ম জ্ঞান। বিবেক হইতে বৈরাগ্য জন্মে। স্থাবর বিষয়ে ইচ্ছাভাবের নাম বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ছয় প্রকার, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। দর্শন শ্রবণাদি প্রবৃত্তি নিরোধের নাম দম। শব্দাদি বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্তির নাম উপরতি। শীত গ্রীষ্ম রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের সহনকে তিতিক্ষা বলে। উপদেশে অচল বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা এবং পরব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান বলে। এইরূপ বৈরাগ্য যিনি সাধন না করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা হয় না। উপাসনা না করিলে জ্ঞান জন্মে না। জ্ঞান পূর্ণ না হইলে মুক্তি হয় না। কর্ম্মফল-ভোগী লিঙ্গ-দেহের কারণ অজ্ঞানতা। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতার বিনাশ হইলে, লিঙ্গ-দেহের লয় হয়। সর্ব্বাবশিষ্ট আত্মা তখন পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্মই জগতের কর্ত্তা, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। যাহারা উপাস্য ও উপাসকরূপে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ কল্পনা করে, তাহাদের মোক্ষ হয় না। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান হইলে জীবজ্ঞানের ভ্রম দূরীভূত হয়। এই জন্যই অজ্ঞানতার বিনাশ হইলে, জীবন্মুক্তি হয়, বলা যায়। বৌদ্ধ ও বেদান্ত ধর্ম্ম, গৃহীর নহে। রাগ দ্বেষ সমাজ বন্ধনের কারণ ও স্থিতি হেতু। নিস্পৃহ লোক, অসামাজিক। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও বেদান্ত ধর্ম্ম তাহাদের অবস্থান, নিয়মবদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত করে। সংসারের সুখ, প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ যাহাদিগের অভিলষণীয়, এই দুই ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে নাই। এইজন্য পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অদ্বৈতমতাবলম্বী চৈতন্যদেব কি জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, বেদান্ত ধর্ম্মে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই কেন, চৈতন্য ও সার্ব্বভৌম সম্বাদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারে যাহাদের কার্য্য ফুরাইয়াছে বা যাহাদের কার্য্য নাই, চিন্তাশীল সেই মহানুভবগণের পরিতৃপ্তি এতদ্ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। প্রেমপরায়ণ পৌরাণিক ধর্ম্ম যুবকের, জ্ঞানপরায়ণ বৃদ্ধের জন্য বেদান্ত বা বৌদ্ধধর্ম্ম। শঙ্কর বা সুপনার ভিন্ন ইহাদের মধুরতা আর কে বুঝিবে?

বেদান্ত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীন-

তর কে? জিজ্ঞাসা করিলে, বেদান্তকেই প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ধর্মই বেদান্ত, ব্রহ্ম মীমাংসা বা পূর্ণ প্রজ্ঞ দর্শন উপনিষৎ সূত্র সকলকে বিস্তৃত বা ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র। উপনিষৎ হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্মফল, জন্মান্তর বাদ, দুঃখ বিনাশে জীবমুক্তি, এসকল মত বেদান্ত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে একই ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে ভিন্ন নহে। আচার ব্যবহার ও সাধারণ গ্রাহ্য মতামতে ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীর বিভিন্নতা অতি অল্প। এই জন্য হিন্দু-আচার্য্য বুদ্ধদেবকে হিন্দু-অবতারের শ্রেণী মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দার্শনিক গূঢ় রহস্যে শঙ্কর ও শাক্যের যুগান্তর প্রভেদ। সাধারণ লোকের সে রহস্যের মর্ম্ম অবধারণ করিবার সাধ্য ছিলনা। তাহারা ভক্তিভাবে উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া এক জনকে বিষ্ণুত্ব অন্যকে শিবত্ব প্রদান করিয়াছে। শঙ্কর ও শাক্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, বিচার করিবার সাধ্য আমাদের নাই। ইহাঁদের অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। উভয়েই অতীন্দ্রিয় অমানুষী অপ্রামাণসিদ্ধ মতের অবতারণা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান কষ্টি প্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যায় না। কোনও দিন এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে কিনা, কে বলিতে পারে?

প্রেমিক ঈশ্বরকে, ভাবুক, ভাবগ্রাহী, দয়াময়, বাঞ্ছাপূর্ণকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেন। রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত জ্ঞানী তাঁহাকে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন বলিয়া অভিহিত করে। "সৎ" এই ক্লিবলিঙ্গ ভিন্ন তাহার অভিধানে আর কোন শব্দ নাই। যে যেমন, সে আপন ঈশ্বরকে তেমনি করিয়া লয়। কে আগে মুক্তি পাইবে, সে প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? সংসার বিসর্জ্জন করিয়া, প্রবৃত্তির শ্বাস রুদ্ধ করিয়া, স্নেহ, মায়া, মমতা যাহা কিছু কমনীয়, সকলি পরাস্ত করিয়া, যিনি পরকালের সুখের মুখাপেক্ষা করেন, তিনি বীর পুরুষ, তাহার সন্দেহ নাই। নিশ্চিত অপেক্ষা অনিশ্চিতে যিনি অধিক নির্ভর করেন, তিনি বিশ্বাসী, সন্দেহ নাই। যিনি প্রতিমূর্ত্তিকে জীবিতের ন্যায় পূজা করিতে পারেন, তিনি সাধক সন্দেহ নাই। পরকালের আশায় ইহকাল ঘুচাইব, প্রাণের প্রতিমা অতল জলে ডুবাইব, আমার যে সাধ্য নাই। বাসনার তৃপ্তি হয়না বুঝি, সুখের মরিচীকার অন্বেষণে দুঃখের কণ্টকে বিদ্ধ হই বুঝি, বাসনা সংযত করিতে পারিলে যে সুখের অন্বেষণ করিতেছিলাম সেই সুখই পাই বুঝি, তবু বাসনা সংযত করিতে চাহি না। চাহিলে পারি কিনা, সেটা এখন দেখা হয় নাই। এক সুখ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি উদ্দেশ্য উভয়েরই। উপস্থিত প্রেমিকের, অনুপস্থিত জ্ঞানীর। পরিণামে কে পাইবে, জানি না। যখন দুঃখের জগদ্দল পাষাণে হৃদয় নিষ্পেষিত করে, তখন আমি জ্ঞানী হই, বাসনাকে উপেক্ষা করি, ঠেকিয়া শিখি। যখন সুখের কুসুম-কাননে সুরভি শ্বাসে প্রাণ মন পুলকিত করে, তখন ইহকাল ছাড়িয়া পরকাল চাহি না। সেই প্রেমময়ীর চরণ তলে অনন্ত বিসর্জ্জন দেই। ইহা দুর্ব্বলতা। কিন্তু এই দুর্ব্বলতার উপর সমাজ গঠিত। মহাবল দেবতার জন্য সমাজ নহে, অল্পবল মধ্যবিত্ত লইয়াই সমাজ।

সমাজ ভাবুকের, সন্ন্যাস জ্ঞানীর। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, বৌদ্ধ ও বেদান্ত ধর্ম্ম যুগপৎ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য ভগবৎগীতার নিষ্কাম কর্ম্মকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া—সোপানকে চূড়ামণি বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে। যিনি প্রেমের উপাসনা করিয়া সমাজ রক্ষা করেন, তিনি গুণবান, যিনি জ্ঞানী হইয়া পরকাল বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাস উপেক্ষা করিয়া প্রেমিক হন, তিনি মহাবীর, তিনি জগতের বন্দনীয়। কেহ কি তাহা হইয়াছে বা হইতে পারে?—পাঠক জানেন।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম (১২শ)

বঙ্গদেশ গমন।

দিগ্বিজয়ী জয়ের পর নিমাই পণ্ডিতের যশে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, বড় বড় বিষয়ী লোক সকল তাঁহাকে দেখিয়া দোলা হইতে নামিয়া অশেষ প্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন; সর্ব্বত্রে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল; এবং ধনাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এখন হইতে যাহার বাটীতে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, তাহার ভোজ্যবস্ত্র দ্রব্যাদির এক এক অংশ তাঁহার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিত।

"সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হৈল ধ্বনি;
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে;
নামিয়া করেন নমস্কার ভালমতে।
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস;
নবদ্বীপে হেন নাহি যে না হয় বশ।
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে;
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু ঘরে।'

চৈঃ ভাঃ ১২ অ।

শিশুকাল হইতেই গৌরের হৃদয় মহা উদার; দুঃখীকে প্রেম করিতে তাঁহার মত কেহ জানিত না। যেমন এক দিক্ দিয়া তাঁহার ধনাগম হইতে লাগিল, তেমনি অন্য দিকে অজস্র ব্যয় হইতে লাগিল। সঞ্চয় কাহাকে বলে তাহা তিনি তখন জানিতেন না; এবং অর্থ লইয়া যে সাংসারিক সুখভোগ করিতে হয়, তাহা তাঁহার শাস্ত্রে লেখে নাই। এখন হইতে তিনি দুঃখী দরিদ্র দেখিলেই অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতে লাগিলেন; এবং সন্ন্যাসী উদাসীন অতিথিদিগের জন্য বাটীতে এক সদাব্রত খুলিয়া দিলেন। সংসারাসক্তি প্রথম জীবনেও তাঁহার জীবনকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। পর জীবনে যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখনকার ত কথাই নাই। এখন যে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রম করিতেছিলেন, এখনও এক দিনের জন্য সংসার চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিতে পারে নাই। প্রেমই তদীয় জীবনের মহামন্ত্র। প্রেমে আরম্ভ এবং প্রেমেই শেষ।

তখন নবদ্বীপে উদাসীন সন্ন্যাসী পরমহংস সর্ব্বদাই আগমন করিত এবং দুঃখী দরিদ্রেরও অপ্রতুল ছিল না। টোলে অধ্যাপনা করিতে করিতে এই সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি মহা সমাদরে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিষ্য দ্বারা জননীকে আহার সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য বলিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন ২০।২৫ জন নিরাশ্রয় ও সাধুভক্ত লোক তাঁহার বাটীতে আহার পাইতেন। দ্রব্যাদি আয়োজনের ভার জননীর উপর ছিল। তিনি সে সমস্ত আহরণ করিয়া নব বধূকে রন্ধন করিতে দিতেন। লক্ষ্মীদেবী অল্পবয়সেই অতি সুন্দর পাক করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সে সমস্ত রন্ধন করিলে নিমাই পণ্ডিত অভ্যাগতদিগকে লইয়া জাহ্নবীজলে মধ্যাহ্নাদি সনাপন করত পরম সুখে ভোজন করিতে আসিতেন। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গৌরাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্তাদির দ্বারা গৃহস্থদিগকে গৃহীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য এই সকল অনুষ্ঠান করিতেন।

লক্ষ্মীদেবীও তখনকার বঙ্গীয় বধূকুলের আদর্শ ছিলেন। তখন তাঁহার নবীন যৌবন, সে সময়ে সামান্য স্ত্রীদিগের কত আমোদ ও বিলাসের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর তাহা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি কায়মনোবাক্যে শ্বশ্রূ ও স্বামীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ও আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা ভুলিয়া গিয়া, শশ্রূর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইতেন। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহসংস্কারাদি করিতেন; তৎপরে স্নানান্তে বাটীর বিগ্রহ সেবারও স্বামী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পূজার আয়োজনাদি করিয়া, রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; এবং সকলকে আহারাদি করাইয়া ও আপনি ভোজন করিয়া গৃহকার্য্য সমাপনান্তে, স্বামীর পাদ সম্বাহন ও ক্ষণকাল স্বামী সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। নিমাই পণ্ডিতের নিয়ম ছিল যে, আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় টোলে অধ্যাপনা করিতে যাইতেন। এই অবসর সময়ে তিনি ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর মধুরালাপ করিতেন। তখনকার দেশের প্রথানুসারে দিবাভাগে স্বামী স্ত্রীতে একত্র থাকা দূষনীয় হইলেও, উদার-মতি শচীর গৃহে সেরূপ কঠোর শাসন ছিল না। বরং পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্রিত দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

"কোন দিন সেই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ;
বসিয়া থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ।
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র পদতলে;
মহাজ্যোতির্ম্ময় অগ্নি পঞ্চ শিখা জ্বলে।"

এই সময়ে গৌরচন্দ্রের পূর্ব্বদেশ গমনের ইচ্ছা হইল। তাহার সম্বন্ধে যে ইচ্ছা, সেই কাজ। তাঁহার জীবনে এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া একবার বুঝিতেন, তাহা হইতে কিছুতেই তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। পূর্ব্বাঞ্চল গমনে তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ভাল করিয়া জানা যায় না, তবে পরবর্ত্তী কার্য্য দৃষ্টে বোধ হয় যে, শিক্ষা বিস্তার করাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। জননীর আজ্ঞা লইয়া ও ভার্য্যাকে মাতৃ সেবার জন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া, কতকগুলি প্রিয় শিষ্য সমভিব্যাহারে বাটী হইতে বাহির হইলেন; এবং কিয়দ্দিনান্তর পদ্মানদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। পদ্মানদীর কোন্

ভাগে গমন করিয়া ছিলেন ও কোন্ কোন্ দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহা জানা যায় যে, কয়েক মাস ধরিয়া ঐ দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার যশসৌরভ সমস্ত বাঙ্গলা দেশে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল; তাই তাঁহার আগমন বার্ত্তা রাষ্ট্র হইবা মাত্র বহুসংখক পাঠার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে লাগিল। কথিত আছে যে, এই সকল লোক তাঁহার কৃত টীপ্পনির সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেছিল, ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এক্ষণে তাঁহাকে স্বদেশে পাইয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনিও টোল করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

'সবে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার ;
বলিতে লাগিলা করি অতি পরিহার।
আমরা সভার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার উদয় আসি হৈল এ দেশেতে।
অর্থ বৃত্তি লই সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে,
যাঁর ঠাঁই নবদ্বীপে যাইব পড়িতে ;
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে
আনিয়া দিলেন আমা সভার গোচরে।
সবে এক নিবেদন করি যে তোমারে ;
বিদ্যাদান কর কিছু আমা সবা কারে।
উদ্দেশে আমরা সব তোমারি টীপ্পনি ;
সেই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি।"

নিমাই পণ্ডিতের প্রণীত কোন টীপ্পনি এক্ষণে দেখা যায় না ; কিন্তু এত দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তিনি অনেক শাস্ত্রের ব্যাখা লিখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে অবস্থিতি কালে তপন মিশ্র নামে এক নিরীহ সারগ্রাহী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তপনমিশ্র অনেক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম জীবন লাভের প্রকৃত পথ কি ও ঈশ্বর তত্ত্বই বা কাহাকে বলে, তৎ সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার প্রকৃত উপায় জানিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে এক দিন রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের নিকট যাইলে তাঁহার সকল সংশয় অপনোদন হইবে। স্বপ্নের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের নিকট আগমন করিয়া, আত্ম বিবরণ নিবেদন করিলে, গৌরচন্দ্র বলিলেন যে, "প্রতিযুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে ভগবান যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন; সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর সেবা ও কলিতে নাম সংকীর্ত্তন এইরূপে যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। আমার বিবেচনায় আর সমস্ত কুটিনাটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম হইবে, তখন আপনি অনায়াসে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বর তত্ত্ব কি, তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না ; আপনা আপনি অনুভব করিতে হয়।" কথিত আছে যে, গৌরের এই উপদেশ বাক্যে ব্রাহ্মণের চক্ষুরুন্মিলিত হইল। তখন সে তাঁহার সহিত থাকিবার জন্য ইচ্ছা জানাইলে গৌরাঙ্গ দেব তাঁহাকে বারাণসী গমন করিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন যে, ভবিষ্যতে ঐ নগরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। তপনমিশ্র তদনুসারে বারাণসী নগরীতে চলিয়া

গেলেন। চৈতন্য-জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনায় জানা যাইবে যে, সন্ন্যাসের পর যখন তিনি কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন দুই মাস কাল এই তপনের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং এব্যক্তি তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত আখ্যায়িকা পাঠে স্বভাবতই মনোমধ্যে কয়েকটী কথা উপস্থিত হয়। প্রথমত, তখন পর্য্যন্ত ত গৌরচন্দ্র ধর্ম্মোপদেষ্টার ভার গ্রহণ করেন নাই। তবে কিরূপে তপনমিশ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়? দ্বিতীয়ত, তিনি কি তখন জানিতেন যে, পর জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে তপনের গৃহে অবস্থিতি করিবেন? যদি তাহা জানিতেন, তবে ইহার পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করা সম্ভব হয় কি না? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করত তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার ইচ্ছাই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সে সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারি না; তবে আমরা এসম্বন্ধে কি বলিব? আমরা কি বলিব যে, তিনি পূর্ব্বে হইতেই সমস্ত জানিয়া তপনমিশ্রকে কাশী যাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন? বড় কঠিন সমস্যা। তবে যদি উপাখ্যানটীকে অত্যুক্তিতে অনুরঞ্জিত বলা যায়, তাহা হইলে মীমাংসার বিষয় অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। তপনমিশ্রের সহিত পরিচয় ও তাঁহার উপদেশে তপনের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়া ও বৈরাগ্যের উত্তেজনায় কাশী গমন করা, ইহার কিছুই অসম্ভব নহে। তবে গৌরাঙ্গ যে স্বীয় ভবিষ্যৎ সন্ন্যাস জানিয়া তাঁহাকে কাশী যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন;—

"প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি;
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী।"

গৌরচন্দ্র পরম সুখে পূর্ব্বাঞ্চলে বসতি করিতেছেন, এদিকে নবদ্বীপে তাঁহার গৃহে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহার বাটী ত্যাগের কিছুদিন পরে দৈবাৎ রজনীযোগে সর্পাঘাতে তাঁহার পত্নীর প্রাণ বিয়োগ হইল। বিকাশোন্মুখ কুসুম কলিকাতেই শুকাইয়া গেল। শচীর গৃহ বিষাদের অন্ধকারে আবৃত হইল। প্রাণের সদৃশ প্রিয়তমা বধূর বিয়োগে শচীমাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং তাঁহার কাতর ক্রন্দনে কঠিন পাষাণও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? বোধ হয়, সন্ন্যাসে গেলে পতির বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিশ্বজননী আপনার প্রিয়কন্যাকে অমৃতময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক জাহ্নবী তীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং অপ্রিয় সংবাদ দিয়া গৌরচন্দ্রকে ব্যথিত করা অবৈধ বোধে কোন সমাচার পাঠাইলেন না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্পদংশনে লক্ষ্মীর পরলোক যাত্রা স্পষ্টত স্বীকার না করিয়া বলেন যে, স্বামী বিরহই ভুজঙ্গ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল।

'প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল;
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল।'

চৈঃ চঃ ১৬ পঃ

কিয়ৎ দিন পরে গৌরচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বঙ্গদেশীয়

ছাত্রগণ তাঁহাকে নানা প্রকার ধন সামগ্রী উপঢৌকন দিতে লাগিলেন। তিনি সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বোধ হয়, এই তাঁহার জীবনের প্রথম ও শেষ উপার্জ্জন।

'তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি ;
যার যেন শক্তি তেঁই ধন দিলা আনি।
সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র দিব্যাসন ;
সুরং কম্বল ভোট, উত্তম বসন।
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে ;
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে।'

চৈঃ ভাঃ

বহু শিষ্য ও ধন সম্পত্তিতে পরিবৃত হইয়া নিমাই পণ্ডিত স্বভবনে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ এবং অনেক দিনের পর জননী ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় প্রাণ আশান্বিত। কিন্তু হায়! তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার আশা ভীষণ নিরাশায় পরিণত হইবে। বাটী আসিয়া জননীকে প্রণাম করত তাঁহার হস্তে অর্থ সামগ্রী প্রদান করিলেন। বুদ্ধিমতী শচী ঠাকুরাণী হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং তিনি যাহাতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য পত্নীবিয়োগ সংবাদ জানিতে না পারেন, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। গৌরচন্দ্র আহারান্তে বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া আত্মীয়দিগের নিকট বঙ্গদেশের কথা বলিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গালের কথা অনুকরণ করিয়া কতরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। আত্মীয়গণ কেহই অপ্রিয় সংবাদ বলিতে সাহসী হইলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তাঁহার জননী অতি বিষণ্ণ চিত্তে বসিয়া আছেন। বহু দিনের পর বাটী আসিয়াছেন, ইহাতে জননীর মনে কত আনন্দ হইবে ; তাহার পরিবর্ত্তে তিনি বিমর্ষ চিত্তে রহিয়াছেন দেখিয়া,তাঁহার মনে কতকটা সন্দেহ হইয়াছিল। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক প্রতিবেশী তাঁহাকে পত্নীর বিয়োগ সংবাদ বলিয়া ফেলিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীরবে অবিরল অশ্রুধারা গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কিছু অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; পরক্ষণেই জননীর কাতর ক্রন্দন শ্রবণ ও নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া মাতাকে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

'প্রভু বলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমন।
এই মত কাল গত কেহ কারও নয় ;
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়।
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার ;
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর।
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায় ;
সেই সে হইল, কি কার্য্য দুঃখ তায়।
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি ;
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী।"

চৈঃ ভাঃ।

পুত্রের মধুর শান্ত্বনায় শচীদেবী ক্রমে ক্রমে শোক সংবরণ করিতে পারিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

শ্মশান-সঙ্গীত।

কে বলে ভয়ের বাস ভীষণ শ্মশান ভূমি,
যেখানে মিশিয়া আছ প্রাণের প্রেয়সি তুমি!
যেখানে তোমারে গিয়ে
হৃদয়ে পাইব প্রিয়ে,
কে জানে তাহারে আহা কত ভালবাসি আমি!
যেখানে তোমার কাছে
প্রাণের প্রমদা আছে
মেয়ে নিয়ে খেল প্রিয়ে আদরে বদন চুমি!
জনক জননী যথা
ভগিনী মমতা লতা
ডাকিছে লইতে কোলে "এস বৎস! এস তুমি!"
ডাকিছে প্রাণের ভাই
"এস দাদা! ভয় নাই,
আমরা সকলে আছি—কেনগো একাকী তুমি?"
সুখ শান্তি যদি থাকে,
যদি কোথা স্বর্গ থাকে,
তবে সে শ্মশান ভূমি! তবে সে শ্মশান ভূমি!
প্রজ্জলিত সে অনলে
শোক তাপ যাবে জ্বলে।
আনন্দ—অমৃত—প্রেম দিবে সে
শ্মশান ভূমি!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

মিছা কথা।

নিষ্ঠুর সংসারে আহা কেহ কারো নয়,
"তুমি আমার আমি তোমার" মুখে শুধু কয়!
কতদিন বলিয়াছি,
তুমি আছ ব'লে আছি,
প্রাণ গেলে ভুলিবনা—অভিন্ন-হৃদয়!
কত দিন বলিয়াছি
তুমি আছ ব'লে আছি,
জীবনে মরণে মাথা উভয়ে উভয়!
কিন্তু আজি হায় হায়
ভুলেছি সে সমুদায়,
ভুলিয়াছি সরলার সরল প্রণয়!
দিনান্তে একটী বার
এক বিন্দু অশ্রুধার
দেই কি না দেই তারে যদি মনে হয়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

শেষ বিদায়।

আমি—যাই যাই যাই নাথ, অনন্তে মিশাই,
কে জানে আর তোমার দেখা পাই কি না পাই!
যত ছিল মনে আশা
যত ছিল ভালবাসা
সকলি শ্মশানে আজি পু'ড়ে হলো ছাই!
রহিল প্রাণের "মণি"
রাখিও স্নেহ তেমনি,
তুমি বিনে অভাগিনীর আর কেহ নাই!
করেছি যে অপরাধ
ক্ষমা কর প্রাণনাথ!
আজিই বিদায় শেষ—এই ভিক্ষা চাই!
জানি না যেতেছি কই,
জানি না যেতেছি বই,
জানিনা অজ্ঞাত রাজ্য, তবু তথা যাই!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সংসার।

আজিও নারিনু তোমা চিনিতে সংসার!
কত ভাবে, কত বেশে দেও দরশন
মুগ্ধ মানবের কাছে,—কিসাধ্য আমার
বুঝিব স্বরূপ তব? বুঝে কি কখন,
সিন্ধুর স্বরূপ তৃণ, যবে ভাসমান
আকুল তরঙ্গ-বক্ষে,—আপনা-বিহীন?
জীবনের দিবা ওই ক্রমে অবসান;
ঘুরিব আবর্ত্ত-চক্রে আর কত দিন?
এই নিদাঘের রৌদ্র --প্রচণ্ড-দাহন,
এই শরতের জ্যোৎস্না—মধুর-উজ্জ্বল,
কভু শ্রাবণের ধারা—অশ্রান্ত প্লাবন,
কভু মলয়ের শ্বাস, পিকের সুকল;
আমি হে সংসার! তব ভক্ত উপাসক,
কিন্তু বল সত্য, তুমি স্বর্গ কি নরক?

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

শাক্যসিংহের পুরনিক্রম।

অর্দ্ধরাত্র অতীত, পুরবাসীগণ মায়া-নিদ্রায় অভিভূত, শাক্যসিংহ ভাবিলেন, অয়মেব সময়ঃ—এই আমার উত্তম সময়, উত্তম অবসর। অনন্তর তিনি মনে মনে সংকল্প ধারণ করিয়া শয্যাস্তৃত পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা রত্নজালিকা অবনামিত করিলেন। অর্থাৎ শরীরস্থ রত্নাভরণ সকল উন্মুক্ত করিলেন। অনন্তর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, হস্তদ্বয় পুটবদ্ধকরত পূর্ব্ব বুদ্ধদিগকে স্মরণ করতঃ "নমঃ সর্ব্ববুদ্ধেভ্যঃ" আমি সমুদায় বুদ্ধদিগকে নমস্কার করি; এই বলিয়া পূর্ব্ব বুদ্ধদিগকে নমস্কার করিলেন। ঐ সময়ে গগণতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখেন, আকাশে দেবগণ তাঁহার পূজার্থ আগমন করিয়া নতকায়ে অবস্থান করিতেছেন এবং নক্ষত্ররাজ চন্দ্র পুষ্যনক্ষত্রের সহিত সহাবস্থান করিতেছে। কার্য্যসাধক সুসময় সমাগত দেখিয়া, তিনি ছন্দক নামক স্বানুচরকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—

"ছন্দকা চ খলুমা বিলম্বহে অশ্বরাজ দদমে অলঙ্কৃতং,
সর্ব্বসিদ্ধি মমএতি মঙ্গলা অর্থসিদ্ধি ধ্রুব মদ্য-ভেব্যতে॥"

ছন্দক! বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র আমায় একটী সজ্জীকৃত অশ্ব দাও। আমার সমুদয় সিদ্ধি আগত বা নিকট হইয়াছে। নিশ্চিত অদ্য আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

শুনিয়া ছন্দক উদ্বিগ্নমনে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, অনন্তর বলিলেন,নৃপসিংহ! রাজন! কোথায় জাইবেন?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—ছন্দক! যাহার জন্য আমি পূর্ব্বে বারবার শরীর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজ্যধন ও উত্তমাভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং শীল, ক্ষমা, দয়া ও প্রভা প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যান-রত থাকিয়া কালকর্ত্তন করিয়াছি, অদ্য আমার সেই সময় বা সেই উদ্দেশ্য উপস্থিত।

আমি পিঞ্জরাবস্থিত জীবনিবহের জরা মরণ রূপ পাপ মোচনার্থ বহুকল্প কোটী

ব্যাপিয়া যে শিবশান্তি বোধ লাভের স্পৃহা করিয়া আসিতেছি, সেই শিবশান্তি বোধ লাভের সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে।

ছন্দক বলিলেন,—আমি শুনিয়াছি, আপনি প্রসূত হইবা মাত্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও আপনার ভবিষ্য বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপনি দৈবজ্ঞগণের সম্মুখে নীত হইলে, দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন, মহারাজ! আপনার এই রাজকুলের উন্নতি উপস্থিত। আপনার এই পুত্র শত পুণ্য লক্ষণে লক্ষিত হইতেছেন, সুতরাং ইনি চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্দীপেশ্বর ও সপ্তধনে অন্বিত হইবেন। যদি ইনি জীবজগতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ইনি বুদ্ধ হইয়া, এই পাপদগ্ধ প্রজাসমূহকে ধর্ম্মসলিলে অভিষিক্ত ও তৃপ্ত করিবেন। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার একটী কথা শুনিলে আমি সুখী হইব, কৃতার্থ হইব।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, বল।

ছন্দক বলিতে লাগিলেন,—দেব! ইহসংসারে লোক সকল যে উদ্দেশে অনেক প্রকার ব্রত তপস্যাদি করিয়া থাকে, জটাবল্কলধারী ও বায়ুভক্ষ হইয়া উৎকটতর তপস্যা করিয়া থাকে, আপনি সেই দেবমনুষ্য-সম্পত্তি বিনা তপস্যায় লাভ করিয়াছেন। আপনি রাজা ও রাজপুত্র, যুবা ও দর্শনীয়, তরুণ ও কোমল শরীর, আজও আপনার কেশপাশ ভ্রমরকৃষ্ণ রহিয়াছে, ক্রীড়া কৌতুক ও কাম ভোগ অদ্যাপি অসমাপ্ত আছে। এই জন্যই বলিতেছি, এখন আপনি অমরাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় রমমান থাকুন, সুখ বিশেষ ভোগ করুন, পশ্চাৎ যখন বৃদ্ধ হইবেন, তখন আপনি নিষ্কণ্টকে নিষ্ক্রম অর্থাৎ সন্যাসার্থ পুর পরিত্যাগ করিবেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—"ছন্দক! কাম্য ও কাম সমস্তই অনিত্য, অস্থির ও অশাস্বত। সমস্তই অপরিণামধর্ম্মী; নীহারের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, রিক্তমুষ্টির ন্যায় অসার, কদলীকাণ্ডের ন্যায় ভঙ্গুর ও দুর্ব্বল, অপক্ক ভোজনের ন্যায় বেদনাপ্রদ, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, বিষভোজনের ন্যায় পরিণাম দুঃখদ, মারুত লতার ন্যায় অসুখপ্রদ, ফেনবুদ্বুদের ন্যায় বিপরিণামধর্ম্মী, মায়া মারীচি সদৃশ, জ্ঞান বিপর্য্যায় হইতে উদ্ভূত, স্বপ্নের ন্যায় দুর্ভোগ, দুঃখপূরিত সাগরের ন্যায় দুরবগাহ এবং সর্পমস্তকের ন্যায় দুস্পৃশ্য। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে সভয়, সদোষ ও বিবর্জ্জনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞগণ ইহার নিন্দা করেন, শ্রেষ্ঠজন ইহাকে পরিহার করেন। অজ্ঞান ও মূর্খ লোকেরাই ইহার পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

ছন্দক দণ্ডাহতের ন্যায় ও শল্যবিদ্ধের ন্যায় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার বলিলেন;—দেব! সংসারের শত শত লোক তীব্রতর ব্রত নিয়ম ধারণ করিতেছে, অজিন-পরিধায়ী, জটাধর, কেশশ্মশ্রুধর ও পিণ্যাক-ভক্ষ হইয়া গোব্রত প্রভৃতি বহন করিতেছে। তাহাদের কামনা, আমরা শ্রেষ্ট হইব, বিশিষ্ট হইব, চক্রবর্ত্তী রাজা হইব, লোকপালক হইব, অথবা দেবত্ব লাভ করিব। দেবগণের সহচর হইব। হে নরবর্য্য! আপনি সে সমস্তই লাভ করিয়াছেন, আপনার রাজ্য স্ফীত, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব।

আপনার উদ্যান মনোহর, প্রাসাদ সুরম্য, স্ত্রী সুন্দরী, অনুরোধ করি, আপনি এসকল ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, যথা সুখে ও স্বচ্ছন্দে ঐ সকল ভোগ করুন, দেবরাজের ন্যায় বিহার করুন।

বোধিসত্ব বলিলেন, ছন্দক! শুন, পূর্ব্ব জন্মান্তরে আমি অসংখ্য দুঃখ ভোগ করিয়াছি; পূর্ব্বে ঐ সকল কাম্য কামনা দোষে বন্ধন, অবরোধ, তাড়ণ, তর্জ্জন ও জরা ব্যাধি প্রভৃতি জনিত দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ছন্দক! এ সমস্তই মিথ্যা, মিথ্যা প্রত্যয়-সমুৎপাদিত, অজ্ঞান-মূলক, অভ্রের ন্যায় অনিত্য, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণবিনাশী, নীহারের ন্যায় লয়শীল এবং রিক্ত, তুচ্ছ ও অসার। ইহা আত্মা নহে, আত্মাতে নাই, আত্মার সহিত ইহাদের সম্পর্কও নাই। এসমস্তই অনাত্মা ও অধ্রুব। এই নিমিত্তই আমার মন বিষয়ে সংরক্ত হয় না, সংসক্ত হয় না। অতএব হে ছন্দক, তুমি আমায় শীঘ্র একটী সজ্জিত অশ্ব দাও।

ছন্দক পুনরপি বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল,—শাক্যরাজ, কিছুকাল এ-সকল ভোগ করুন, সুখ অনুভব করুন, পরে আপনি বনে যাইবেন।

বোধিসত্ব বলিলেন,—ছন্দক! এসকল কাম্য কাম আমি অপরিমিত ও অনন্ত কল্প অনেক উপভোগ করিয়াছি, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—সমস্তই অনুভব গোচর করিয়াছি। দিব্য-ভোগ ও মানুষ-ভোগ উপভোগ করিয়াছি। তথাপি আমার তৃপ্তি হয় নাই, তৃষ্ণার অন্ত হয় নাই। পূর্ব্বে আমি চতুর্দ্বীপের রাজা হইয়া স্ত্রী-গৃহ মধ্যে বসতি করিয়াছি। ইন্দ্রত্ব করিয়াছি, যমত্বও করিয়াছি। আমি অনন্ত কাম উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় নাই। ছন্দক! পূর্ব্বে অততেও তৃপ্তি হয় নাই, আজ কেন এই অল্পতর কামে তৃপ্তি হইবে? ছন্দক! আমি যাইব, নিশ্চিত যাইব, সংবিৎ পদে গমন করিব। ছন্দক, আমি দৃঢ়তর ধর্ম্মরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া এই ভয়ানক ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইব। জগৎকাণ্ড উত্তীর্ণ করিব, তুমি বাধা দিও না।

ছন্দক এবার অনেকক্ষণ রোদন করিলেন, অনন্তর বলিলেন, "তবে কি উহাই নিশ্চয়?

বোধিসত্ব বলিলেন, নিশ্চয়। শুন, ছন্দক! জীবের মোক্ষার্থ ও হিতার্থ আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা দৃঢ়, অচল, সুমেরুর ন্যায় অটল। কিছুতেই তাহা বিচলিত হইবে না।

ছন্দক পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যপুত্রের নিশ্চয় কিরূপ দৃঢ়?

বোধিসত্ব বলিলেন, বজ্রের ন্যায়, অশনির ন্যায়, শক্তির ন্যায়, কুঠারের ন্যায় ও প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়।

"বজ্রাশনি পরশু শক্তি শরাশ্চ বর্ষে
বিদ্যুৎপ্রধ্মান জ্বলিতং ক্বথিতঞ্চ লৌহং
আদীপ্তশৈল শিখরাঃ প্রপতেয়ুর্মূর্দ্ধি
নোবা অহং পুনর্জনেয় গৃহাভিলাষম্।

বজ্রপাত, অশনিবৃষ্টি, কুঠার শক্তি, শর ও শীলাবর্ষণ হইলেও আমি স্বাভিলাষ প্রচ্যুত হইব না। মস্তকে বিদ্যুৎ বজ্র, তপ্ত লৌহ ও প্রজ্বলিত শৈলশিখর নিপতিত হইলেও পুনর্ব্বার গৃহাভিলাষ উৎপাদন করিব না।

শুনিয়া ছন্দক অবাক্, নিষ্পন্দ ও সংজ্ঞাহীন।

শ্রীরামদাস সেন

বোম্বে ও পুনা ভ্রমণ। (১)

নাগপুর হইতে অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম। পথে অনেক দৃশ্য দেখা গেল কিন্তু বিশেষ বিস্ময়কর ও লোচনাভিরাম কিছু দেখা গেলনা। বিরার রাজ্যের গ্রামস্থ কুটীর নিচয় কৃষকদিগের দারিদ্র্যের পরিচয় দিতে লাগিল। এ রাজ্যের গ্রামগুলি বঙ্গদেশের পল্লীর ন্যায় বহুবিস্তৃত নয়। বঙ্গদেশের এক খানা বাড়ীতে যতটুকু স্থান অধিকার করে, তাহাতেই প্রায় এক খানা গ্রাম বসিয়াছে। এই গ্রামগুলির একটী বিশেষ লক্ষণ আছে; প্রায় প্রত্যেক গ্রামের মধ্যস্থলেই এক একটী অনতিবৃহৎ মৃণ্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক গ্রামেই দুর্গ কেন? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। যখন পিণ্ডারী দস্যুরা তাহাদের অমানুষিক ক্রিয়াকলাপে মধ্যভারতকে বিজন অরণ্যে পরিণত করে, তখনই এই সমস্ত দুর্গ নির্ম্মিত হয়। তাহাদের ভগ্নাবশেষ আজও পিণ্ডারীদিগের দস্যুবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রামবাসীরা ইহাদের উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, গ্রাম্য পাটেলকে এক প্রকার সৈন্যাধ্যক্ষে নিযুক্ত করিয়া, এক এক দল ক্ষুদ্র সৈন্যসহ ঐ সমস্ত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। মধ্যভারত চিরকালই দস্যুদিগের নিবাসভূমি। আজ কালও তাঁতিয়া, ভীল ইংরেজ-শান্তিরক্ষকদিগের ভ্রূকুটীতে ভীত না হইয়া, স্বীয় বৃত্তির পরিচালনা করিতেছে। সংবাদপত্রে তাহার বহুল বিবরণ প্রচারিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য। ঐ দুর্গগুলি সমস্তই মৃত্তিকা নির্ম্মিত, কিন্তু শুনিলাম, দৃঢ়তায় প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গকে পরাস্ত করে। এই সমস্ত বিবরণ ঐ প্রদেশীয় সহযাত্রী কোন মহারাষ্ট্রীয় যুবকের নিকট শ্রুত হই। সেই সময়ে, ব্রিটিসরাজ কি কূটনীতি অবলম্বন করিয়া এই রাজ্যটী নিজামের হস্ত হইতে গ্রহণ করেন, তাহার কালিমাময় ইতিহাস মনে হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও শস্যক্ষেত্রের শস্যসমৃদ্ধি দেখিতে দেখিতে দিনমনি অস্তাচলাবলম্বী হইলেন।

রজনী-মুখে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীস্থ ভোসোয়াল ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। তথায় গাড়ী হইতে নামিয়া বিশ্রাম গৃহে (Waiting room) কিছু কাল বিশ্রাম করিলাম, সেখানে কথঞ্চিৎ জলযোগও হইল। শেষে রাত্র নয়টার সময় মেলট্রেনের এক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। স্থানাভাবে শয়ন দূরে থাকুক, বসিতেও যথেষ্ট কষ্ট হইতে লাগিল, সমস্ত রাত্রে একটু ঘুম হইল না। নিম্ন শ্রেণীর লোকের রসিকতায় মন প্রাণ ভাসাইয়া, রজনী অতিবাহিত করিলাম। রেলওয়ে কর্ম্মচারী ধবলকায় পশুদিগের দুর্ব্বল গরিব দুঃখীর প্রতি ২।১টী চিরপ্রসিদ্ধ অত্যাচারের উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিলাম। ঊষাকালে ঐ গাড়ীস্থিত একটী মহারাষ্ট্রী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি ও বোম্বে যাত্রী। প্রাতঃকালে জানিতে পারিলাম, বহু পর্ব্বত শ্রেণী ভেদ করিয়া আসিয়াছি। তখন ভয়া-

নক শীত বোধ হইতে লাগিল। বস্ত্রাদিতে সে শীত নিবারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। রজনীর অন্ধকার বিদূরিত হইলে, কল্যাণ ষ্টেশনে আসিলাম। ইহার পরেই মহাদেশ ছাড়িয়া সালসিটি (Salsete) দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। টানা প্রণালী এই দ্বীপটীকে মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। মহাদেশের সহিত একটী প্রকাণ্ড বাঁধ দ্বারা সংযোজিত।

এখান হইতেই বোম্বাইর শোভা সমৃদ্ধি দেখিতে আরম্ভ করিলাম, বোম্বাই, সালসিটী, এলিফাণ্টা ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ পাহাড় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, এখান হইতে সমুদ্রের শোভা কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে ক্রমে নগরে কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল, কারখানা নিচয়ের ধুমোদ্গমনকারী চিমনি-শ্রেণী দেখা দিল। সহজেই বোম্বাই ভারতের সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য-স্থান বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। লোকের ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় অল্পেতেই পাইতে লাগিলাম। ২।১টী ষ্টেশন বাকী থাকিতে, একটী পারসী ভদ্রলোক ২।১খানা পুস্তক, কতকগুলি কার্ড হস্তে, আমরা যে গাড়ীতে ছিলাম, সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। নানাবিধ আলাপ করিয়া শেষে বলিলেন, আমার একটী হোটেল আছে, সেখানে আপনারা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন। হোলেটের প্রশংসা পত্রগুলি দেখিলাম। তন্মধ্যে হিন্দুপেট্রিয়টের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর একখানি প্রশংসাপত্র দেখিতে পাইলাম। আমরা হোটেলরক্ষককে বলিলাম যে,তাহার অভ্যর্থনায় যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি, কিন্তু একটী মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক তাহাদের বাড়ীতে আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন, তাই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। ঐ উদ্দেশ্যে আর ও ২।১ টী লোক উপস্থিত ছিলেন।

ষ্টেসনে অবতরণ করিয়াই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। ষ্টেসনটীর বর্ণনা স্থানান্তরে করা যাইবে। অনেক দিন হইল কলিকাতা ছাড়িয়াছি, লোকের ভীষণ কোলাহল, গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ অনেক দিন শুনিতে পাই নাই, এখানে আসিয়াই মনে হইল যেন আবার কলিকাতায় আসিয়াছি। ষ্টেসনের বাহির হইলে সে ভ্রম সহজেই অপনোদিত হইল। প্রথমে মনে করিলাম, ট্রামকারে গন্তব্যস্থানে যাইব তাই রাস্তার পার্শ্বে আসিলাম। ট্রামকারগুলি অতি সুন্দর, তবে কলিকাতার গাড়ী অপেক্ষা অনেক ছোট। ট্রামের গাড়ীতে এই কয়েক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইলাম,—ঈষৎ বঙ্কিম টুপিযুক্ত পারসী, নানা রঙ্গে রঞ্জিত রেশমী সাঁড়ি-পরিহিতা পারসী রমণী, প্রকাণ্ড পাগড়ীযুক্ত মহারাট্টা; মাঝে মাঝে ২১ জন অঙ্গরঙ্গা-বিশিষ্ট ভাটিয়া, আর পূর্ব্ব পরিচিত গৌরাঙ্গেরা। শেষে ট্রাম গাড়ীতে যাওয়া হইল না, ভিক্টোরিয়া নামক ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ভিক্টোরিয়া এক চমৎকার গাড়ী। কলিকাতার বড় বড় লোকেরাও এ রকম গাড়ীতে সান্ধ্যসমীরণ সেবনে যাইতে পারেন কিনা, সন্দেহ। ভাড়াও কলিকাতার ছেক্‌ড়া গাড়ীর ভাড়া অপেক্ষা নিতান্ত অধিক নয়। দেখিতে কতকটা বগী গাড়ীর মত, অতি সুন্দর ও পরিষ্কার; তিন জন বসিতে পারে। এখানে আর এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া গাড়ী পাওয়া যায়,তাহাকে রেক্‌লা বলে। তাহাতে

নিতান্ত দরিদ্র লোকেরাই চলিয়া থাকে। এলাহাবাদের একা গাড়ীর সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। যে বাড়ীতে গেলাম, সে একটী প্রকাণ্ড চৌতল বাড়ী। সেখানে অনেক গুলি ছাত্র নিবাস আছে। বলিতে হইবে না যে, আমরা একটী ছাত্র নিবাসেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ছাত্রদিগের সৌজন্য ও আতিথ্যে নিতান্ত আপ্যায়িত হইলাম। ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী জানে, তাহাদের সহিত ইংরেজীতেই আলাপ চলিতে লাগিল; আর তাহা যাহারা না জানে, তাহাদের সহিত, আমাদের ভাঙ্গা হিন্দীতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এত দিন মহারাষ্ট্রীয় দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু লজ্জার বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত কথা বলা দূরে থাকুক, দুটী কথা বুঝিতে পারি না। যে দেশে ভ্রমণ করিতে যাওয়া হয়, সে দেশের ভাষা না জানা অতি দুর্ভাগ্যের বিষয়। দেশ ভ্রমণ শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। তদ্দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতা ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য-সংসাধন পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায়। এসম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক লর্ড বেকন যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, ইহার প্রত্যেক বাক্যই সত্য।

"He that travelleth into a country before he hath some entrance into the language, goeth to school and not to travel."

যিনি দেশীয় ভাষায় কিঞ্চিত অধিকার লাভ না করিয়াই, কোন দেশে ভ্রমণ করিতে যান, তাঁহার পক্ষে ও ভ্রমণ ভ্রমণ নয়, বিদ্যালয়ে (ভাষা শিক্ষার জন্য) শিক্ষার্থ গমন করার ন্যায়। ভাষা সম্বন্ধে এই সঙ্গে ২।১টী কথা মনে হইতেছে। ভারতীয় জাতিসমূহ কালের গতিতে এক প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিতে পরিণত হইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস, ইহাই আমাদের আশা। ভারতের সভ্যতা সময়ে জগতের সমস্ত সভ্যতাকে পরাভূত করিবে, ইহাও আমরা আশা করি। সেই শুভ দিনের চিহ্ন একটু একটু ভারতে প্রকটিত হইতেছে। তবে আশায় উদ্দীপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, কতকগুলি বিষয় অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মগত বিভিন্নতা জাতীয় একতার একটী প্রধান অন্তরায়, সে অন্তরায় কোন দিন দূর হইবে কি না, কে বলিতে পারে? তবে আশা করি, রাজনীতিকে ধর্ম্মে পরিণত করিতে পারিলে এক প্রকার ধর্ম্মগত একপ্রাণতা জন্মিবে। তারপরে ভাষা;—যাহারা আমাদিগের কথা বুঝিতে পারে না এবং যাহাদের কথা আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাদিগকে ভাই ভাই বলিয়া কি প্রকারে আলিঙ্গন করিব? যাঁহারা বঙ্গদেশের চতুঃসীমার বাহিরে যান নাই, তাহারা এই প্রশ্নের গাম্ভীর্য্য ও কাঠিন্য কখনও অনুভব করিতে পারিবেন না। মধ্যভারতের যে কোন স্থানে আসিবেন, সেখানেই ভারতের বিভিন্নভাষী লোক দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন। ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত বেবিলনের টাওয়ার ধ্বংশের পর, লোক সমূহের যে দশা হইয়াছিল, ভারতীয় জাতি সমূহেরও কতক পরিমাণে সেই দশা। শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইংরেজীর সাহায্যে তাহাদের মনোভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করেন; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার যতই বহুল প্রচার হউক

না কেন, ইহা কখনও কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী লোক পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না। যদি কোন ভাষা এই দেশের জাতি সমূহের পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের অধিকতর উপযোগী হয়, তাহা হিন্দিভাষা। তাই ভারতবাসী মাত্রেরই হিন্দিভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বোম্বাই অবস্থান কালে, কোন বন্ধু আমাদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, বাঙ্গলা অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা পুস্তকাদি প্রচার করা কর্ত্তব্য, তাহাতে কিছুই অনিষ্ট হইবে না, বরং লাভ যথেষ্ট আছে। উদাহরণ স্থলে তিনি বলিলেন যে, এই বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সমস্ত ভাষাগুলি সম্বন্ধে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে। কানাড়ী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী ইত্যাদি ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থাদি প্রচারিত হয়, তাহাতে ঐ পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে। অবশ্য চিঠি পত্র লেখালেখি পূর্ব্বেও যে ভাবে হইত, এখনও সেই ভাবে হইতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, পরস্পরের ভাষা বুঝিবার পথ অনেক সুগম হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার ধুরন্ধরেরা এই বিষয়টী একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? নুতন বলিয়া প্রস্তাবটী অবহেলা করিলে চলিবে না, নূতন পথে নূতন ভাবে না চলিলে আমাদের গতি কি হইবে? এটী যে নিতান্ত দুষ্কর ব্যাপার তাহা নয়, বাঙ্গলা অক্ষর ও দেবনাগর অক্ষর প্রায় এক রকমই, বাঙ্গলা অক্ষর দেবনাগর অক্ষর হইতেই সমুদ্ভূত। পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিবেন, ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া এসব কেন? কেবল কি দেখিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ না করিয়া, ভ্রমণ কালে যে সমস্ত ভাব ও চিন্তার স্রোত মনোমধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাও কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

তারপরে স্নান করিলাম, যদিও শীতের দিন, তবুও অনেক জলরাশি গাত্রে সিঞ্চন করিয়া সুস্থ হইলাম। এই স্থলে বোম্বের জল বায়ু সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব। পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া আসিতে পূর্ব্ব রাত্রে ভয়ানক শীত অনুভব করিয়াছি, কিন্তু প্রাতঃকালে বোম্বে আসিয়া দেখি, শীত একেবারে নাই। বোম্বের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। প্রায় সমস্ত বৎসর এক ভাবেই থাকে, কেবল মন্‌সুন বায়ু প্রবাহিত হইলে একটু পরিবর্ত্তন হয়। জলবায়ু অতি মনোরম, শীত গ্রীষ্মের প্রখরতা একবারেই নাই। অতি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে কলিকাতার বাবুরা যেমন গড়ের মাঠে, কি ইডেন উদ্যানে শরীর স্নিগ্ধ করিতে ভ্রমণ করেন, সন্ধ্যাকালে বোম্বের অনেকে সেইরূপ এই শীত কালে সমীরণ সেবনের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করেন। রাত্রিকালেও লেপের প্রয়োজন হইত না।

তারপরে আহার্য্য উপস্থিত। যদিও ৩।৪মাস মহারাষ্ট্র দেশে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণদিগের খাদ্য এই বার প্রথমে খাই। দস্তার একখানি থালায় কিছু আতব চালের ভাত, কয়েকখানা রুটী, পার্শ্বে একটু তুপ (ঘি) চিলি (লঙ্কা) ও সৈন্ধব লবণ, তরকারীর মধ্যে বেগুন, আলু ও পেয়াজ পূর্ব্ব পরিচিত, আর সমস্তই নূতন। বলিতে হইবে না যে, এখানকার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় পেয়াজ খাইতে কিছু আপত্তি করেন না। বরং ইহারা প্রচুরপরিমাণে পিয়াজ খাইয়া থাকেন। মৎস্য

মাংসাহারকে ইহারা প্রাণের সহিত ঘৃণা করেন। একটী বাটীতে কড়ি (দধি ও অন্যান্য জিনিষ মিশ্রিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের একটী উপাদেয় খাদ্য), আর একটী বাটীতে দুধ্। মৎস্যাভাবে কিছুই অসুবিধা হইল না। নাগপুরে থাকিতে২ প্রায় নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছি। আহারের সমস্ত সময় কয়েকটী মহারাষ্ট্রীয় বালক পার্শ্বে বসিয়া থাকিল। ইহাও তাহাদিগের আতিথেয়তার একটী নিদর্শন। আহারান্তে তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলাম। তার পরেই নগর দর্শনে বাহির হইব। ভিক্টোরিয়ার জন্য অর্ডার হইল। নগরটী দেখিলেই কলিকাতা হইতে অনেক সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে হয়। বাড়ীগুলি দেখিতে একেবারে ছবির ন্যায়, অত্যন্ত পরিষ্কার, কলিকাতার নেটিভ্ কোয়ার্টর অপেক্ষা ইহার সমস্ত অংশই সুন্দর। এখানে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নেটিভ কোয়ার্টর নাই। বাড়ীগুলি প্রায় ৬।৭ তল। যথা সময়ে ভিক্টোরিয়া উদ্যানে উপস্থিত হইলাম। এটী ইডেন উদ্যান অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এখানে একটী পশুশালা আছে। কলিকাতার পশুশালার পশু সংখ্যা অপেক্ষা এখানকার পশুর সংখ্যা অনেক কম, তবে এখানে কয়েকটী অতি বৃহৎ ব্যাঘ্র দেখা গেল। এখানকার সিংহটী খুব বড় ও অত্যন্ত বলশালী। আমরা যখন গেলাম, তখন পশুরাজ লোক-কোলাহল অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভিক্টোরিয়া উদ্যান দেখিয়া বোম্বের এলফিন্ষ্টোন কলেজ (বোম্বের প্রেসিডেন্সি কলেজ) দেখিতে গেলাম। কলেজ তখন বন্ধ, একটী ভৃত্য আমাদিগকে সকল দেখাইতে লাগিল। কলেজের ঘরটী প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘর অপেক্ষা আয়তনে ছোট হইলেও, শোভা ও সৌন্দর্য্যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রথমে ছাত্রদিগের বসিবার স্থান দেখিলাম। সমস্ত গুলিই ক্রমোচ্চ (Gallery); কেবল বিজ্ঞান শ্রেণীর স্থান নয়। অধ্যাপকের দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিবার স্থান গুলিও বেশ পরিপাটী। গৃহটী চৌতল, উহার মধ্যে কলেজের ব্যয়ে প্রতিপালিত ছাত্রদিগের (Fellows) থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। তখন কয়েকটী ছাত্র সেখানে ছিল, তাহারা মৌমাছির ন্যায় ভন্ ভন্ শব্দ করিতেছিল; অর্থাৎ পরীক্ষার জন্য ইংরেজী গলাধঃকরণ করিতেছিল। পুস্তকাগার (Library) দেখিলাম, বেশ্ জাঁকালো রকমের। প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরী অপেক্ষা ছোট বোধ হইল। একখানি টেবিলে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র গুলি দেখিতে পাইলাম। এ বন্দোবস্তটী বেশ। বিজ্ঞাপন বোর্ডে অনেক বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলাম, সমস্তই অধ্যাপক ওয়ার্ডসোয়ার্থের নামাঙ্কিত, তিনিই কলেজের অধ্যক্ষ। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাকে মনে মনে নমস্কার করিলাম, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে হইয়া উঠিল না। কলেজ গৃহের উচ্চতম স্থানে যাইয়া নগরের শোভা ও আরব সাগরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম।

সেখান হইতে ট্রাম গাড়ীতে ক্রফোর্ড মারকেট (Crawford market) বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইটী বোম্বের মিউনিসিপ্যাল মারকেট; দেখিতে অতি সুন্দর, আর সেদিনকার সাজ সজ্জার কথা কি বলিব? সমস্ত বাজারটী ফুলমালায় সুশোভিত,

কেননা সেই দিন বড় দিন। কলিকাতার মিউনিসিপাল মারকেট অপেক্ষা এটী অনেক বড়। ইহা নির্ম্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। মিঃ ক্রফোর্ড অর্থাৎ যাহার নামে এই বাজারটী পরিচিত, তিনি নাকি আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইহা নির্ম্মাণে যথেচ্ছ ভাবে সাধারণের বহুল অর্থ অপব্যয় করিয়াছিলেন। নিরো, সিরাজদৌল্লা প্রভৃতি অনেক ভূপতি আপনাদের নারকীয় ক্রিয়া কলাপ দ্বারা আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন! ধন্য যথেচ্ছাচার! সেখানে যৎকিঞ্চিৎ ফল ক্রয় করিয়া, প্রিন্সেস্ ডক দেখিতে চলিলাম। সেটী একটী বিস্ময়কর দৃশ্য বটে। এখানে আসিয়া বুঝিলাম, ইংরেজ জাতি কেন সমুদ্রের অধীশ্বর। অপার জলনিধি প্রিয় সন্তানের ন্যায় কেন ইহাদিগকে ক্রোড়ে রক্ষা করে, কেন তাহারা এত ধনী, আর কোন্ শক্তি প্রভাবে ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী মুষ্টিমেয় লোক এই সুজলা সুফলা কোটী কোটী নর নারীর নিবাস ভূমি ভারতরাজ্যকে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করিতেছে। ডকটী বাহু প্রসারণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ তরী সমূহকে ক্রোড়ে গ্রহণ করে। এখানে বাণিজ্য দ্রব্য গুলি অবতারিত হয়। অনেকগুলি জাহাজ ডকে ছিল, একখানি জাহাজে উঠিয়া কতকক্ষণ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। এ স্থানের বর্ণনা করা আমার অসাধ্য, কারণ ইহার সহিত উপমা দিবার কোন বস্তু কলিকাতায় নাই। এটী যথেচ্ছ ভাবে সঞ্চালিত করা যায়। খিদিরপুরের ডক্ নির্ম্মিত হইলে ইহার তুলনার যোগ্য কিছু হইলেও হইতে পারে। তার পরে কোলা বা লাইট হাউস (Light house) অর্থাৎ আলোক মঞ্চ দেখিতে গেলাম। রজনীতে এখানে একটী প্রকাণ্ড আলোক বর্ত্তিকা, সমুদ্রস্থিত তরী সমূহের দিক্‌নির্ণয়ের ও বন্দরে প্রবেশের সহায়তা করে। সে অনেক দূর, সেখানে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না পাইয়া উপরে উঠিতে পারিলাম না। সেখানে একটী লোক দূরবীক্ষণ যন্ত্র হস্তে, সমস্ত দিন, জাহাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে এবং নানাবিধ সংকেতাদি করে। সেখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। এ সহরে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্র তীর দিয়া রেল গিয়াছে। শুনিয়াছি, লণ্ডন নিউইয়র্ক প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় ও আমেরিক প্রধান প্রধান নগরে এ প্রকার বন্দোবস্ত আছে। ১৫ মিনিট অন্তরই এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে গাড়ী যায়। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে কখনও উঠি নাই; তাই বড় সাধ করিয়া প্রথম শ্রেণীর টিকিট্ কিনিলাম, ব্যয় তিন আনা। পাঁচ মিনিট গাড়ীতে ছিলাম। তারপরে কিছু কাল পদব্রজে চলিতে হইল। পথ পার্শ্বে একটী পারসী ধর্ম্মমন্দির, আলোক মালায় সুশোভিত দেখিলাম। এই মন্দির গুলিকে আগাড়ি বলে। এখানে একটী বিবাহ হইতেছিল, তাই এত ঘটা। পারসীদের আচার ব্যবহার যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই বোধ হইতে লাগিল, ইহাদের রুচি অনেক পরিমার্জ্জিত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস।

কেন এ জীবন?

(১)

প্রকৃতির বিক্ষুব্ধ বিজ্ঞানের মুখে
জীবন রহস্য কথা চাহিনা শুনিতে।
লোকস্থিতি, আত্মস্থিতি,
শান্তি, সুখ, বিশ্বপ্রীতি,—
তাহাই সাধিতে প্রাণ আছে সদা ঝুঁকে?
বুঝিয়াও সেই ভাষা পারিনা বুঝিতে।

(২)

কারে বা অরণ্য বল, কারে বল গেহ?
কারে বা জীবন বল, কারে বা মরণ?
কারে বল ভালবাসা, কারে বল স্নেহ?
কারে বল মুক্তি, তুমি, কারে বা বন্ধন?

(৩)

শুধুই এ বিশ্ব কি গো মানব ভবন?
অদৃশ্য কীটাণু যারা,
পায়নি জীবন তারা?
বৃথা কি স্থিতির মন্ত্র পড় অনুক্ষণ?

(৪)

গড়িতে প্রাসাদ তুমি
বিনাশিছ বন ভূমি;
কাঁদে কুকী, কাঁদে ভীল, কাঁদে জুলু, সেহ (১)
কারেবা অরণ্য বল, কারে বল গেহ?

(৫)

তোমার কামনা সিদ্ধি,
ক্ষুধাশান্তি, আয়ু বৃদ্ধি,
যন্ত্রণায় কিন্তু হোথা কাঁদে জীবগণ;
কারে বা জীবন বল, কারে বা মরণ?

(৬)

লভিবারে ধন ধান্য,
মুষিকে আবাস শূন্য
করি আজি হল-মুখে, কাঁদে কবি কেহ (২)
মানবের অধিকার,
ধিক্ তাহে শতবার!
কারে বল ভালবাসা, কারে বল স্নেহ?

(৭)

আছ সবে হৃষ্ট মনে,
উন্নতির সিংহাসনে;
তবু কেন কাঁদে আজি যোগী সৌদ্ধোদন?
কারে বল মুক্তি তুমি, কারে বা বন্ধন!

(৮)

হের হোথা কুরুক্ষেত্রে,
যুধিষ্ঠির সাশ্রুনেত্রে
কহিছে, সাম্রাজ্যে তার নাহি প্রয়োজন!
এই কি বিশ্বের শান্তি, দুষ্টের দমন?

(৯)

কে বুঝাবে, কে বলিবে, কেন এ জীবন?
কেন এসংসারে আসা,
কেন প্রীতি, ভালবাসা?
কেন গো মুক্তির নামে দারুণ বন্ধন?
শোধিতে কাহার ঋণ,
বৃথায় কাটিছে দিন?
আত্মোন্নতি? পরসেবা? পারিনা বুঝিতে।
সাধিতে একের হিত,
আঘাতি অন্যের চিত;
উন্নতির নামে, সদা হতেছে যুঝিতে;
সে যুদ্ধের অবসান,
না হোতে; না পেতে প্রাণ
কল্যাণ,—চরম লক্ষ্য; আসেরে মরণ।
কে বুঝাবে, কে বলিবে, কেন এজীবন?

(১০)

এই যে মস্তিষ্ক মম,
স্নায়ুচক্র, রক্ত ক্রম,—

(১) Saho জাতি। (২) Burns.

আশাময় জীবনের এই কি পরিধি ?
কর্ত্তব্যের উপাসনা,—
সেকি শুধু বিড়ম্বনা ?
শেষ মাত্র স্মৃতিশূন্য মৃত্যুর বারিধি ?
কেন তবে এ সংসার ?
যদি শুধু অন্ধকার—
যদি শুধু সজ্ঞাহীন মৃত্যু পরিণাম— ?
হে প্রকৃতি, হে ঈশ্বর,
ভাঙিলে মাটীর ঘর,
জীবন লীলার হায় হবে কি বিরাম ?

(১১)

হায়রে কেন বা তবে
জীবন, বিকাশে ভবে ?
কেন এ চৈতন্যময় প্রেমের সর্জ্জন ?
সকলি কি মোহ মায়া ?
—বৃথা কল্পনার ছায়া ?
কে বলিবে, কেন গো এ সোণার জীবন ?

(১২)

দাম্ভিক বিজ্ঞান বলে,—
এই শেষ মহীতলে ;
জীবন ফুরালে রহে কেবল মরণ।
আকাঙ্ক্ষার, কামনার,
সেই শেষ দুর্নিবার,
জগতের পরিণাম এমনি ভীষণ ! !
সুগন্ধ বিস্তার করি,
কুসুম, পড়িলে ঝরি,
রহিবে যে ফল তার, সেই পরকাল ;
এ দেহের শেষ হোলে,
রবে স্মৃতি ধরাতলে ;
গতিরূপে,—দোষে, গুণে,—বংশে চিরকাল !
জীবাত্মর বংশধর,
বিকশিত যত নর,
যত রূপে, যত গুণে, দেখিছ ভূষিত,
তিল তিল পরিমাণে,
হোয়েছে তাহার প্রাণে
সে উন্নতি, বিশ্বগতি হোতে সংক্রামিত।
অক্ষয় সমাজস্তরে,
লেখা থাকে স্বর্ণাক্ষরে
পূর্ব্ব পুরুষের গুণ, মহিমা—উজ্জ্বল ;
উন্নতি সঞ্চারি ভবে,
অস্থি মজ্জা ভস্ম হবে ;
জীব বংশে জীব রবে, এই শেষ ফল।

(১৩)

শুনেছি অনেক বার,
শুনিতে না চাহি আর,
প্রত্যক্ষ-বিনাশী এই প্রত্যক্ষ পুরাণ
উন্নতির বাড়ে বুক,
সমাজের হয় সুখ ;
কিন্তু কোথা ডুবে যায় প্রত্যক্ষ পরাণ ?

(১৪)

অর্দ্ধ প্রাণ আত্মগত ;
অর্দ্ধ, পর সেবা রত ;
আত্ম ছাড়া নাহি পর, নিশ্চয় সন্ধান।
জীবন ফুরালে, ভবে
পর-সেবা একা রবে ?
আত্ম আকাঙ্ক্ষার তবে কোথায় প্রয়াণ ?
সকলেরি পরিণতি,
অক্ষয় অমর গতি;
আত্ম আকাঙ্ক্ষার একা নিষ্ফল ক্রন্দন ?
শ্রীকৃষ্ণ, জৈমিনি, প্লেটো,
বুদ্ধ, খৃষ্ট, দুঃখী কেটো,
তোমরা বল গো শুনি কেন এ জীবন।
কেন এ সংসারে আসা,
কেন প্রীতি ভালবাসা,
কেন এ চৈতন্যময় আকাঙ্ক্ষা আত্মার ?
বিজ্ঞানের জড়বাদ,
শুনিলে পোরেনা সাধ,

তোমরা বলগো মোরে কি হবে আমার।
এ দেহের হলে শেষ,
ধরিয়া কি নব বেশ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পথে ছুটিব তখন?
তোমরা বল গো মোরে কেন এ জীবন!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা। (৩য়)

(ধর্ম্ম)

উপনিষৎ বা আরণ্যক সকল বেদের অন্তিমভাগে নিবিষ্ট, সেই নিমিত্ত ইহারা বেদান্ত নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে উপনিষতের সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু প্রধান উপনিষৎ দশ খানি, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়,ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এবং ছান্দোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে আকারে বৃহদারণ্যকই বৃহৎ। একজন সুবিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদ্যপি হিন্দুধর্ম্মরূপ সুশোভন উদ্যানের আদ্যন্ত সকল স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ইহার তত্ত্বকুসুম সকল আহরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি প্রথমেই ছন্দোবিভাগে ইন্দ্র, বরুণ, দ্যৌ, উষা, মাতরিশ্বা প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থপুঞ্জের স্তুতিবন্দনার মধ্যে আর্য্যঋষিগণের অবিমিশ্র আর্জ্জব ভাব, অজ্ঞানতা এবং মনোবৃত্তির অপরিপক্কতা দর্শন পূর্ব্বক দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ করিবেন। এবং তথা হইতে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকময় এই উপনিষৎ ক্ষেত্রের উপরে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবে। তিনি এক দিকে ইহার শোভা এবং সৌন্দর্য্য এবং অপর দিকে-গাম্ভীর্য্য এবং সারবত্তা-দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। ইহার প্রতি পরিচ্ছেদে আর্য্যঋষিদিগের সুমার্জ্জিত চিন্তা শক্তির বিকাশ এবং সমুজ্জ্বল জ্ঞানচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উপনিষৎ সকল পাঠ করিতে করিতে পূজ্যপাদ ঋষিগণের গভীর ব্রহ্মানুরাগ, চিত্তের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং পরমার্থ-তত্ত্বে গাঢ়াভিনিবেশ দর্শনে বিস্ময়ে মোহিত হইতে হয়। অধিক কি, আজ পর্য্যন্ত জগতের বিভিন্ন ভাষা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, উপনিষৎ সারবত্তায় সে সকলের শীর্ষস্থানীয়। উপনিষদের ন্যায় এমন সারবান মহামূল্য ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র অদ্যাপি মানবজাতির মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। বালক-স্বভাব অজ্ঞান ব্যক্তি সাগরতটের বেলা-ভুমি-মধ্যে বালুকারাশি অন্বেষণ করিতে করিতে,অকস্মাৎ রত্ন-খণ্ড দর্শন করিয়া যেমন তাহা বিশেষ যত্নে লইয়া গিয়া রক্ষা করে, ভারতের সরল-স্বভাব বৈদিক মুনিগণ সেইরূপ অগ্নি, বায়ু, মেঘ, সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ-পুঞ্জের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সেই সকল পদার্থের রচয়িতা এবং নিয়ন্তা সত্যপুরুষকে দর্শন করিয়া পরম যত্নে এই উপনিষৎ রূপ সুরম্য গৃহে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান এই গৃহে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপনিষৎ সকল অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মমীমাংসায় পরিপূর্ণ। বিশ্বের রচয়িতা

পরমেশ্বর যে অরূপী অতীন্দ্রিয় চৈতন্য-স্বরূপ এবং অজ ও অমর, তাহা উপনিষৎকার ঋষিরা অতি বিষদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; এবং সেই জন্মবিহীন ভূমা পুরুষই যে মানবাত্মার মুক্তি ও ইহপারলৌকিক সংগতির একমাত্র কারণ,তাহাও উপনিষৎ মধ্যে সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপনিষৎ মধ্যে আরও একটী অতি মহৎ সত্য প্রচারিত হইয়াছে। সেটী এই যে, পরমত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ অব্যবহিত সম্বন্ধ ; এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, কোন গুরু নাই, কোন গ্রন্থ নাই। পুত্র যেমন অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সাক্ষাৎভাবে পিতার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে, মানবাত্মাও সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। উপনিষৎ ভিন্ন এমন মহামূল্য সত্য আজ পর্য্যন্ত কি কোরাণ, কি বাইবেল, জগতের কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই। উপনিষদ্রচয়িতা ঋষিগণের ব্রহ্মজ্ঞান এতদূর উজ্জ্বল হইয়াছিল যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, পরমেশ্বরকে যে কেবল জীবাত্মা জানিতে পারে তা নয়, কিন্তু জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পারে, স্পর্শ করিতে পারে, উপভোগ করিতে পারে, তাহাতে সঞ্চরণ এবং রমণ করিতে পারে। সেই অনন্ত ভূমামহান্ পুরুষের সহিত মর্ত্যবাসী ক্ষুদ্র মনুষ্যের যে এমন নিকটতর, ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ,তাহা উপনিষৎ মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। মানবাত্মা যে অক্ষয়, অবিনাশী, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, এ সত্যও উপনিষদের ঋষিরাই উজ্জ্বলরূপে ধারণা করিয়াছিলেম। এতদ্ভিন্ন উপনিষৎ মধ্যে ঋষিদিগকে আর একটী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়,সেটী সৃষ্টি তত্ব। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মৌলিক অবস্থা কি, এবং সেই অবস্থা হইতে একেবারে না পারম্পর্য্যভাবে এই বিশ্বচরাচর রচিত হইয়াছে, এ বিষয়ে ঋষিগণ ইহার মধ্যে সুযুক্তিযুক্ত চিন্তা ও গবেষণার অবতারণা করিয়াছেন। অনেকের ধারণা যে, উপনিষৎপ্রণেতা ঋষিগণ জীবব্রহ্মে অভেদত্ব— জীবাত্মা পরমাত্মার একত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উপনিষদে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, এরূপ ধারণা অমূলক। মহর্ষি তলবকার বিদিত এবং অবিদিত সকল প্রকার পদার্থ হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন ; যথা "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদপি" অর্থাৎ তিনি বিদিত অবিদিত সকল প্রকার বস্তু হইতে ভিন্ন।

উপনিষৎ মধ্যে যদিও পরব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে অরূপী চিৎস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায়,স্থানে স্থানে রূপকচ্ছলে সেই নিরাকার পুরুষের রূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এ সকল হৃদয়গত কবিত্বভাবের আবেশ বই আর কিছুই নহে। মুণ্ডকঋষি একস্থানে সেই নিরাকার সত্য পুরুষের এইরূপ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন ; যথা—

অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুসী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ
শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

অর্থাৎ অগ্নি (স্বর্গ) তাঁহার মস্তক ; চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষুদ্বয় ; দিক সকল তাঁহার শ্রোত্র, বেদ সকল তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার

প্রাণ, সমস্ত জগৎ তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার চরণ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। এরূপ বর্ণনায় কোন অনর্থের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত এতৎদ্বারা ঈশ্বর-স্বরূপ মানব-অন্তরে উজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। উপনিষৎ সকল যখন ভিন্ন ভিন্ন ঋষির দ্বারা রচিত, তখন সকল উপনিষদের যে সকল বিষয়ে এক মত হইবে, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে এমন মহামূল্য তত্ত্ব সকল যাঁহাদিগের চিন্তা হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাঁহারা যে অসাধারণ প্রতিভাশালী,—অধিক কি, মানব জাতির ধর্ম্ম পথের পথপ্রদর্শক স্বরূপ তাহাতে আর সংশয় কি? এই স্থানে বেদোক্ত ধর্ম্মের বিষয় সমাপ্ত হইল। সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৈদিক ধর্ম্মের তিনরূপ অবস্থা। প্রথম অবস্থা, ছন্দোবিভাগে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থের উপাসনা; দ্বিতীয় অবস্থা, ব্রাহ্মণ বিভাগে দর্শ পৌর্ণমাস; অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি বহুবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। তৃতীয় অবস্থা, উপনিষদে উজ্জ্বল বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞান।

বেদের পর স্মৃতি; বেদার্থের স্মরণ করিয়া এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেই জন্য ইহাদিগের নাম স্মৃতি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি কুড়িজন ঋষির প্রণীত স্মৃতিই প্রধান এবং প্রামাণ্য। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে স্মৃতির প্রভুত্বে ক্রিয়া কাণ্ড সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা এই বিংশতিজন পণ্ডিতের মধ্যে এক জনেরও প্রণীত নয়, তাহা নবদ্বীপের রঘুনন্দন নামক জনৈক স্মার্ত্ত পণ্ডিতের রচিত। স্মৃতি শাস্ত্র সকল বর্ণ বিচার, আশ্রম ধর্ম্ম, গার্হস্থনীতি, উপনয়ন, উদ্বাহ প্রভৃতি বিষয় সকলের বিচার ও ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। এ সকল গ্রন্থে যখন নিরপেক্ষ ভাবে ধর্ম্মমত বর্ণিত হয় নাই, তখন ইহাদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ের আশা করা যাইতে পারে না। তথাপি এই সকল গ্রন্থ সর্ব্ব-সম্মতরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকেই বিশ্বের রচয়িতা এবং পরিত্রাণের একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এই বিংশতি স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং প্রামাণিক। এমন কি, মনুর বিপরীত যে মত, তাহা হিন্দুর নিকট অশ্রাব্য এবং অগ্রাহ্য। মনুসংহিতার প্রভুত্ব সর্ব্বোপরি। এই মনুসংহিতায় পরব্রহ্মকেই মানবের উপাস্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

অর্থাৎ আত্মা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই পরব্রহ্মই উপাস্য। মহর্ষি মনু পরমেশ্বরকে আত্মার মূল স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনু ব্রহ্মোপাসনার এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, একস্থলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।"

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণিদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবী জীব-সকল শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে

বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ট, বিদ্বানদিগের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ঐ কর্ত্তব্যের জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ট; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। মনুস্মৃতিতে এইরূপে ব্রহ্মবাদী ব্যক্তির সর্ব্বোপরি প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনু নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

নিস্তারায় তু লোকানাং স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ
ব্যাস রূপেণ কৃতবান পুরাণানি মহীতলে ॥

অর্থাৎ নারায়ণ লোকদিগের নিস্তারের নিমিত্ত স্বয়ং ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে পুরাণ শাস্ত্র সকল প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ সকলের মধ্যে যেরূপ মত-বৈসদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহাতে কথনই ঐ সকলকে এক ব্যক্তির রচিত বলা যাইতে পারে না। অধিক কি, পুরাণ সকলের মধ্যে এরূপ প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের ছবি অঙ্কিত আছে, যাহা পাঠ করিলে কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তিই ইহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-রচয়িতা বলিয়াছেন—"তথা সর্ব্ব-পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমে বচ" অর্থাৎ সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ প্রতিপুরাণকার অন্যান্য অপেক্ষা আপন আপন পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সকল পুরাণ কখনই এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত নয়। অমরকোষ অভিধানে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সে পঞ্চ লক্ষণ এই—সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তরঃ এবং বংশানুচরিত। প্রচলিত পুরাণ সকল অমরকোষের বর্ণিত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত নয়, সেজন্য অনেক সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিবিধ প্রমাণের দ্বারা প্রচলিত পুরাণ সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী একরূপ পুরাণের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান পুরাণ সকল যখন আমাদিগের আলোচ্য, তখন তাহারই অনুসরণ করা যাউক। পদ্মপুরাণ-কর্ত্তা সমুদায় পুরাণকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন; সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। যে সকল পুরাণ বিষ্ণুপ্রধান অর্থাৎ যাহাতে বিষ্ণুমাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল পুরাণ সাত্ত্বিক; এবং শিবপ্রধান পুরাণসকলকে তামসিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল যে এই কথা বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, তা নয়। বিশেষ নিন্দাবাদ এবং ঘৃণার সহিত শিবপ্রধান পুরাণগুলিকে নিরয় সাধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণ সকল পাঠ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, পুরাণকর্ত্তা ঋষিগণ আখ্যায়িকাস্থলে অনেক ধর্ম্ম প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেকেই আপন আপন আরাধ্য দেব দেবীর বা মনুষ্য বিশেষের শ্রেষ্টত্ব (অবতারত্ব) প্রতিপাদন বা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এক এক খানি পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই যে পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে,তাহা তাহাদের নামেই বুঝা যাইতেছে; যথা শিব পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, কালিকা পুরাণ ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ পুরাণে বিশেষ বিশেষ দেবতার মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে বিষ্ণু মাহাত্ম্য,

মৎস্য কূর্ম্মাদিতে শিবমাহাত্ম্য, মার্কণ্ডেয় কালিকাদিতে শক্তি মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ সকলের কোন কোন স্থল এরূপ অসংলগ্ন অযৌক্তিক বর্ণনা এবং কাল্পনিকতার আবেগে পরিপূর্ণ যে, ইহা হইতে কোন বিষয় নিরূপণ করা দুর্ঘট। কিন্তু তথাচ পুরাণ-রচয়িতা ঋষিগণ নিজ নিজ আরাধ্য দেব দেবীর বা মনুষ্য বিশেষের অযথা স্তুতিবাদ, বা সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে তাহাতে অমানুষিক গুণাবলী আরোপণ করিতে গিয়া অমূলক কল্পনা-সহচর সঙ্গে ভ্রান্তি-সলিলে নিমজ্জিত হইয়াও,সেই পরাৎপর উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তনে বিস্মৃত হয়েন নাই। পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাই সার-ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও তাহাদিগের মধ্যে বহুদেবপূজা এবং বহুদেবতার মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত আছে; তথাপি পুরাণ-প্রবর্ত্তক ঋষিগণ নিরাকার চিৎ-স্বরূপ পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

তত্ত্বকৌমুদীর উত্তর।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হওয়ার পরই ব্রাহ্মসমাজের শাখা বিশেষের কতকগুলি সভ্যের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই প্রকার আন্দোলনে বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া,আমরা প্রথমে বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই বুঝিলাম, এ আন্দোলন নব্যভারতের সম্পাদককে অপদস্থ করিবার জন্য উঠিয়াছে। গালাগালি, তিরস্কার, শ্লেষোক্তি—ঘাটে, পথে, সভায়, অসভায়, নব্যভারতের সম্পাদকের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহাতেও শেষ নাই। নব্যভারতের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে অনুরোধ এবং শ্লেষোক্তি ও বিদ্বেষ ভাব পূর্ণ পত্র মফঃস্বলের বন্ধুগণের নিকট প্রেরিত হইল—কোন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল! তারপর কমিটীর দ্বারে অভিযোগ চলিল। এ সকলের কারণ এই, নব্যভারতের সম্পাদক একজন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোক হইয়াও কেন ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিলেন! একটা অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ লইয়া যখন বন্ধুদিগের মধ্যে এইরূপ বিদ্বেষভাব পূর্ণ আন্দোলন চলিল, তখন আমরা সংস্কার সম্বন্ধে কিছু নিরাশ হইলাম। দোষ-সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া, দোষ-উল্লেখকারীর প্রতি অত্যাচার বর্ষণ করা, কিরূপ লোকের কার্য্য, পাঠকগণ বিচার করুন। দুই দশ জন ব্রাহ্মনামধারী নব্য লোকের মধ্যেই যদি এই আন্দোলন নিবদ্ধ থাকিত, আমরা কোন কথাই বলিতাম না। যখন দেখিতেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র, তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক, সম্পাদকীয় স্তম্ভে, এ সম্বন্ধে প্রকৃত সমালোচনার পরিবর্ত্তে, শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিতেছেন, তখন আর আমাদিগের নীরবে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে

হইতেছে না। পাঠকগণ আমাদিগের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। তত্ত্বকৌমুদী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র, কি লিখিতেছেন, শুনুন,—

"বিগত ফাল্গুণ মাসের "নব্যভারত" পত্রে "যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। কেবল আমরা নহি, ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই ইহা পাঠ করিয়া একান্ত বিস্মিত হইয়াছেন। কোন ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী শিথিল-বিবেক ব্যবসায়ী সংবাদ পত্রে এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে কেহই বিস্মিত হইত না, কিন্তু একজন অপেক্ষাকৃত পুরাতন ব্রাহ্মের সম্পাদিত পত্রে কিরূপে এরূপ অত্যুক্তি ও অসার কল্পনা-দূষিত প্রস্তাবের স্থান হইল, ইহা নিতান্তই বিস্ময়ের কথা। "নব্যভারত" সম্পাদকের অপেক্ষা "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক ও লেখকদিগের ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অধিক বই অল্প নহে, সুতরাং উক্ত প্রস্তাবকে "অত্যুক্তি ও কল্পনা-দূষিত" বলিতে আমরা কিছুই সঙ্কুচিত হইতেছি না। আমরা জানি ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গ নহে, অথবা স্বর্গ হইলেও, স্বর্গেও কদাচিৎ অসুর প্রবেশ করে। কিন্তু ইহা বলা এক কথা, আর উক্ত প্রস্তাব লেখক অসংযত ও কবিত্বপ্রবণ লেখনীর সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজকে যেরূপ কদর্য্য বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, তাহা আর এক কথা। এরূপ লেখাতে আর কিছু হউক না হউক, ইহাতে লেখক এবং কাগজের প্রতি চিন্তাশীল বুদ্ধিমান পাঠকদিগের অশ্রদ্ধা অম্লান অনিবার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের উপকার করাই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয়, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন সামাজিক সভায় এই বিষয় আলোনার জন্য উপস্থিত করিলেই পারিতেন। সাধারণ পাঠকের সহিত এই বিষয়ের কি সম্পর্ক? আর, যিনি অত্যুক্তি ও কল্পনা-দূষিত ভাষায় ঘরের নিন্দা বাহিরে কীর্ত্তন করেন, তিনি শত্রু মিত্র উভয়েরই অবিশ্বাস ভাজন হন। ঘরের লোক স্বভাবতঃই তাঁহাকে অবিশ্বাস করে, বাহিরের লোক তাঁহার অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতা দেখিয়া হাস্য করে।" তঃ কৌ, ১৬ই চৈত্র, ১৮০৮ শক।

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক নিজে কেবল বিস্মিত হন নাই, তিনি জানেন, ব্রাহ্মসমাজের বিশেষজ্ঞ অনেক ব্যক্তিই উহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। ব্রাহ্ম সাধারণের মত সংগ্রহের জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই বাধিত হইলাম। কিন্তু এত বিস্ময়ের কারণটা কি? আমরা যে সকল কথা লিখিয়াছিলাম, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক তাহা কি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন? না—তাহা নয়। তিনি যদি আমাদের প্রবন্ধটার আমূল সমালোচনা করিয়া আমাদিগের ভুল দেখাইতেন, আমরা যারপর নাই কৃতজ্ঞ হইতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া, তিনি নিজের ভাষায়, নিজের কথায়, নিজের অধিক অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া আমাদের প্রবন্ধটাকে "অত্যুক্তি ও অসার কল্পনা-দূষিত" বলিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম সাধারণকে আমাদের প্রতি বিরক্ত হইতে, প্রকারান্তরে, পরামর্শ দিয়াছেন। "অত্যুক্তি ও অসার কল্পনা-দূষিত" কেন? সে বিষয়ে দুই চারিটী দৃষ্টান্ত দিলে কি ভাল হইত না? কিন্তু এটাও বিস্ময়ের প্রকৃত কারণ নয়। বিস্ময়ের প্রকৃত কারণ—এটা "কোন ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী শিথিল-বিবেক ব্যবসায়ী সংবাদপত্রে" প্রকাশিত না হইয়া

"একজন অপেক্ষাকৃত পুরাতন ব্রাহ্মের সম্পাদিত পত্রে" প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত পুরাতন ব্রাহ্ম বলিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু কার অপেক্ষা পুরাতন? উপরোক্ত পদের মধ্যে খুঁজিয়া লেখকের অভিপ্রায় কি, পাইলাম না। একটা শব্দ যেখানে সেখানে বসাইলেই হয় না, তার একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বসান উচিত। ব্যবসায়ী সংবাদ পত্র অপেক্ষা পুরাতন ব্রাহ্ম? ব্যবসায়ী সংবাদ পত্র ত আর ব্রাহ্ম নন। তবে এ তুলনা কাহার সহিত? যাক্, ইহাপেক্ষা আরো মারাত্মক ভাষাগত দোষ তাঁহার ষষ্টিছত্র-ব্যাপী প্রবন্ধে অনেক থাকিলেও, সে সকলের আলোচনা এখন করিতে চাহি না। "কোন ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী শিথিলবিবেক ব্যবসায়ী সংবাদ পত্রে"—একথাটা একখানি তত্ত্ব-প্রকাশক পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় বড়ই দুঃখের কারণ হইয়াছে। কোন শব্দটা দেওয়ায় ব্যক্ত হইতেছে যে, এরূপ পত্রিকা এদেশে অনেক আছে। নব্যভারতের সম্পাদক তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকের নিকট অপরাধী হইতে পারেন, তাহার কল্পনা "অসার" হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সংবাদ পত্রকে বিনা কারণে এই শ্লেষপূর্ণ ভাষায় কেন গালিগালাজ দেওয়া হইল, আমরা বুঝিলাম না। ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী পত্র মাত্রই কি শিথিল-বিবেক ব্যবসায়ী? অন্য সম্পাদকদিগকে এই আখ্যায় অভিহিত করিয়া তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক প্রকারান্তরে আপনার ধার্ম্মিকতা এবং বিবেক-প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন! কি অহঙ্কারের কথা! ছি, ধার্ম্মিকের পক্ষে কি ইহা শোভা পায়!!

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের অহঙ্কারের পরিচয়, তাঁহার নিজের ভাষাতেই আরো স্পষ্ট পাওয়া যায়। তিনি অহঙ্কার করিয়া বলিতেছেন,—"নব্যভারত সম্পাদকের অপেক্ষা তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক ও লেখকদিগের ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অধিক বই অল্প নহে।" সম্পাদক মহাশয় নিজেই যখন অভিজ্ঞতা দাওয়া করিতেছেন, তখন কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহার আবদার রাখিতে হয়। কথাটাও কিন্তু ঠিক। তত্ত্বকৌমুদী নব্যভারত অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের অনেক বিষয় অধিক জানাই সম্ভব! নব্যভারত প্রকাশের পূর্ব্বে, আমরা এ পৃথিবীতে ছিলাম কি না, বড়ই সন্দেহ! আর থাকিলেও, সে কথাটা আইনানুসারে ধর্ত্তব্য নয়। কারণ, সম্পাদকের পদ পত্র হইতেই—সুতরাং আইনানুসারে বলিতে গেলে, তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদককে জ্যেষ্ঠ বলিতেই হইবে। তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ বলিতে আমাদের কোন আপত্তিও নাই। পাঠকগণ বিচার করুন যে, যিনি নিজে অধিক অভিজ্ঞতার দোহাই দেন, তিনি জ্যেষ্ঠ না জ্যেষ্ঠতাত?

ইহার একটু পরেই বিজ্ঞ সম্পাদক উপদেশের ভাষায় বলিতেছেন, "যিনি অত্যুক্তি ও কল্পনা দূষিত ভাষায় ঘরের নিন্দা বাহিরে কীর্ত্তন করেন ইত্যাদি।" এখানে সম্পাদক মহাশয় বাহির ও ঘর, শত্রু ও মিত্র, কাহাকে বলিতেছেন, পাঠক বিচার করুন। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যে আইনানুসারে বিজ্ঞত্ব পাইয়াছেন, সেই আইনের চক্ষে বিচার করুন। সম্পাদকের পক্ষে "ঘর এবং বাহির" "শত্রু এবং মিত্র" জিনিষটা কি?—নব্যভারত কোন সম্প্রদায় বিশেষের কাগজ

নয় ;—আমরা কোন দিন কোন সমাজকে 'ঘর', বা "মিত্র" এবং কোন সমাজকে "বাহির" বা "শত্রু" বলিয়া ব্যক্ত করি নাই। ব্যক্তিগত দায়িত্ব হইতে সম্পাদকীয় দায়িত্ব যে সম্পূর্ণ পৃথক, একথাটী অনেকেই বুঝেন না। নব্যভারতের সম্পাদক ব্রাহ্ম হউন, খ্রীষ্টান হউন, যাহা হউন, তাহা হউন, নব্যভারত কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাগজ নয়। এই বিস্তৃত ভারতভূমির প্রতি পরিবার, প্রতি সমাজ, প্রতি দেশ—আমাদের ঘর ;—আমাদের মিত্র। তত্ত্বকৌমুদী সম্প্রদায় বিশেষের কাগজ, তিনি "ঘর বাহির, শত্রুমিত্র" গণনা করিতে পারেন, করুন ; আমাদের পক্ষে "বাহির" কিছুই নয়, "শত্রু" কেহই নন। কেহ যদি আমাদিগেকে শত্রু মনে করে, তবুও আমরা তাহাকে এই পাপ মুখে শত্রু-আখ্যা প্রদান করিতে পারি না। সম্পাদক মহাশয় যে আইনানুসারে বিজ্ঞত্বের বড়াই করিয়াছেন, সেই আইন এস্থলে যে কেন ভুলিলেন, আমরা বুঝিনা।

এখন আমরা দেখিব, সম্পাদকের অভিজ্ঞতা কি বলিতেছে ;—"ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গ নহে, অথবা স্বর্গ হইলেও, স্বর্গেও কদাচিৎ অসুর প্রবেশ করে।" অনেক আড়ম্বরের পর সম্পাদক মহাশয় গলদ ধর্ম্ম ফেলিয়া স্বীকার করিলেন যে, "ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গ নহে।" বেশ কথা! তবে আর এত দেশ-ছাওয়া বিস্ময় কেন? ব্রাহ্মসমাজের "অসুরদের" কথাই ত আমরা বলিয়াছি, দেবতাদের কথা ত বলি নাই। অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের একাংশ পড়িয়াই সম্পাদক মহাশয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন। আমরা অন্য স্থানে দেখাইব যে, "যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" প্রবন্ধ যে স্বামী ও স্ত্রী নামক প্রবন্ধের উপসংহার, অভিজ্ঞ সম্পাদক সেই প্রবন্ধটীও পড়েন নাই। "কোন কোন স্থলে ইহাও দেখিয়াছি"—ইত্যাদি কথায় কিছু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে বলা হয় না। আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধের দুটী শব্দে যে একটু দোষ ঘটিয়াছিল, আমরা গতবারে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়াছি। অভিজ্ঞ সম্পাদক আমাদিগের লেখনীকে অসংযত ও কবিত্ব-প্রবণ বলিয়াছেন। ভাল, ইহারও দুটী চারিটী দৃষ্টান্ত দিলে দোষ কি ছিল? তাহা হইলে, আমাদের ভুল সংশোধিত হইত। ভাবের কথায় জগৎকে ভুলাইতে যাওয়া কিরূপ অভিজ্ঞতা, আমরা বুঝি না। শক্তি থাকে, অসংযত ও কবিত্বপ্রবণ লেখনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একে একে দোষ বলিয়া যাও, এবং তাহার প্রত্যুত্তর শুন। অন্ধকারে এ প্রকারে ঢিল মারা কেন?

তারপর সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"ইহাতে লেখক এবং কাগজের প্রতি চিন্তাশীল বুদ্ধিমান পাঠকদিগের অশ্রদ্ধা জন্মান অনিবার্য্য।" সে জন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। কর্ত্তব্য যাহা, তাহা অবশ্য পালন করিব, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা জানি না। কিন্তু অভিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, চিন্তাশীল বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই তাঁহার দৃষ্টান্ত-হীন মন-গড়া কথা শুনিয়া আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন না, কারণ সত্য ও ন্যায়ের প্রতি এখনও তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে।

তারপরের কথাটী আরো মারাত্মক। সে যুক্তিটী ইতিপূর্ব্বে অনেক বিজ্ঞ ব্রাহ্মের নিকট শুনিয়াছি এবং উত্তর দিয়াছি। এখন আবার তত্ত্বকৌমুদীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কথাটী এই—"ব্রাহ্মসমাজের কোন সামাজিক সভায় এই বিষয় আলো-

চনার জন্য উপস্থিত করিলেই পারিতেন।”— প্রথমত, ব্রাহ্মসামাজিক সভার সহিত নব্যভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়ত,ব্রাহ্মসমাজ এখন সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে— নানা শাখা,নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত। সুতরাং কোন সামাজিক সভায় আলোচনা করিলেই, সকল ব্রাহ্মের কাণে তাহা যাইবার সম্ভাবনা নাই। আর যদি বল, বন্ধুবান্ধবের নিকট ব্যক্ত করিলেই ক্রমে তাহা দেশ-ব্যাপ্ত হইত। তাহাও করিয়াছি; কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও তাহা দেশব্যাপ্ত হয় নাই এবং দোষ প্রতিকারের চেষ্টা হয় নাই। চেষ্টা করিবেই বা কে? যিনি দশ পনর বৎসর ব্রাহ্ম হইয়াছেন তিনিও, ব্রাহ্ম;·আর যিনি কাল মদ্য মাংস ছাড়িয়া ভণ্ডতপস্বী সাজিয়াছেন তিনিও, ব্রাহ্ম। প্রবীণের মত অপ্রবীণের অসার মতের দ্বারা সংঘর্ষিত হইতেছে;—ধার্ম্মিকের মত অধার্ম্মিকের স্বেচ্ছাচারের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। ‘কোন সামাজিক সভা’—সে ত অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ। সেই সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও কি এপর্য্যন্ত কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়াছে?—মীমাংসিত হইয়া তাহা কি ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যকরী হইয়াছে?— কে বল কার কথা শুনে?—নানা মুনির নানা মত। আপন আপন মত লইয়াই সকলে স্ফীত ও গৌরবান্বিত। যে, যে কার্য্য করে, সে তাহারই পোষকতা করে। এই বিস্তৃত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের দ্বারা, স্থিরবুদ্ধি চটুল ব্যক্তির দ্বারা, বৃদ্ধ যুবকের দ্বারা, নানা স্থানে, নানা ঘটনায় অপদস্থ হইতেছেন। পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বিক্রীত হইতেছে। এমন কোন কথাই নাই, এই স্বেচ্ছাচারিতার সম্মুখে যাহা উপহাস্য নয়। দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইবে কি? না—তা নয়। আমরা যৌবনবিবাহ নামক প্রবন্ধে প্রধানত বলিয়াছি যে, বিবাহ সুনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে অপকার হয়। এ কথাটীতে কি আপত্তি আছে? তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের আপত্তি থাকা উচিত নয়, এবং সুখের বিষয়, তাহা নাইও। আপত্তি ত নাই, কিন্তু কই, সুনীতির ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হন কই? কই,এই ভাল কথাটীর প্রতিও উপহাস করিতে ছাড়েন কই? আমাদিগকে অপদস্থ করিতে যে সকল বাক্‌পটু, ধর্ম্মব্যবসায়ী নব্যব্রাহ্ম, প্রবীণের সাজ ধরিয়া,আজ আসরে নামিয়াছেন, এবং নানা প্রকার কটূক্তি এবং ঈর্ষার ঢিল নিক্ষেপ করিয়া হিংসা বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা যদি এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, একটু ধর্ম্ম, একটু চরিত্র, একটু নীতির সেবা করিতেন, তবে এতদিন ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইত। আমরা মরিয়া যাইতে বসিয়াছি, নয় মরিয়াই যাইলাম। আমরা অবিশ্বাসভাজন হইয়া থাকি,নয়,এ পত্রিকা উঠিয়াই যাইল। কিন্তু তাতেই কি ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবে? হাজার কুটিল নীতি (Policy) অবলম্বন কর, সত্য ঢাকিতে হাজার চেষ্টা কর— যদি ব্রাহ্মসমাজের বায়ু আমূল সংশোধিত না হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, এই সমাজের দ্বারা কখনই এ দেশে স্বর্গের পবিত্র একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না?

শান্তি নাই, শান্তির কথা জগতে বলা; মিল নাই মিলনের কথা প্রচার করা; প্রকৃত

ভালবাসা নাই, ভালবাসার কথা প্রকাশ করা, ভণ্ডামী বই আর কিছুই নয়। সত্য যাহা, তাহা চিরকাল সত্য। ঢাকাঢাকি, চাঁপাচাঁপি কেন? ঢাকাঢাকি, চাঁপাচাঁপি করিয়া দুই দশদিন লোকের শ্রদ্ধা পাইলে পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভণ্ডামী অনেক দিন চলে না। মেকি টাকা অনেক দিন চলে না। এ কথাটা ভুলিয়া যাওয়া ভাল নয়।

আবার বলি, বাহিরের লোক ও ভিতরের লোকে প্রভেদ কি?—প্রথমত, সম্পাদকের নিকট সকলেই বন্ধু, সকলেই প্রাণের ভাই, কেহ পর নয়। আর ধর্ম্মের চক্ষে দেখিতে গেলে, আপন পর জ্ঞান বড় সর্ব্বনাশের মূল। তুমি যদি আমাদের গলদ জানিতে পারিলে, তবে ভগবানের রাজ্যের আর শত জন ভাই কেন যে পারিবে না, ধর্ম্মবুদ্ধিতে আমরা একথা বুঝি না। ভেদাভেদ কোথায়?—সকলই ত ঈশ্বরের সন্তান। যে দূরে সেও ঈশ্বরের; যে কাছে, সেও ঈশ্বরের। তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার প্রার্থনায় যদি আমার উপকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ শত সহস্র জনের আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনায় কেন যে আমাদের উপকার হইবে না, তাহা আমরা বুঝি না। তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক "ঘর ও বাহিরের" প্রভেদ করিতে যাইয়া, ব্রাহ্মসমাজের নামে দুর্গন্ধময় সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিয়া, সমাজের যে অনিষ্ট করিয়াছেন, ভগবানের নিকট তাহার ক্ষমা নাই। আমরা এরূপ গণ্ডীর মাহাত্ম্য আদবেই বুঝি না।

ভয় দেখাও কেন? 'ঘরের লোক' অবিশ্বাস করে—এ ভয় দেখাও কেন? যাহা মানি না, তাহা কখনও মানিব না। ভিতর ও বাহিরের ভেদাভেদ গণনা করিতে আমরা পারিব না। ব্যক্তিত্ব লইয়া ঝগড়া করিতে চাও, নব্যভারতের সম্পাদককে দল হইতে বাহির করিতে চাও, কর। সমাজ হইতে নাম কাটিয়া দিতে চাও, দেও। আমরা এরূপ গণ্ডীর মধ্যে, এরূপ চাঁপাচাঁপির মধ্যে থাকিতে চাই না। ভয়ে ভয়ে ঢিল মারিতেছ কেন?—এত কষ্টই বা কেন?—ভগবানের জন্য এবং পবিত্র কর্ত্তব্যের জন্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি, আর তোমাদের ভালবাসা (?) হায়, তোমাদের প্রেম (?), হায় তোমাদের ঘৃণা বা Moral indignation (?) উপেক্ষা করিতে পারিব না? আমরা কি এতই অপদার্থ যে, ঘরের লোকের 'অবিশ্বাস' এবং বাহিরের লোকের 'হাস্য' স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে স্খলিত হইব? একা আসিয়াছি, একা যাইব,—ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া মরণকেও আলিঙ্গন করিতে পারি, কিন্তু তোমার কিম্বা তাহার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস স্মরণ করিয়া, কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর বা অনগ্রসর হইতে চাই না। ছি, এমন কথাও লিখিতে হয়!!

আমরা যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে, বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিবার জন্য মালাবারি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিলে যৌবন বিবাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই যৌবন বিবাহে অনেক অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। সেই গুলির আলোচনা করা সকলের পক্ষেই উচিত। ব্রাহ্মসমাজের কথা এই জন্য উঠিয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজ এই ব্রতে ব্রতী। ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিবার অধিকার দেশের সাধারণের থাকিবে না কেন?—আমরা বুঝি না।

আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের ত্রিসীমার বাহিরে, এবং হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজের ত্রিসীমার বাহিরে মনে করিতে আজও শিখি নাই। হিন্দুর রক্ত এখনও আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান,—হিন্দুর হিন্দুত্ব এখনও আমাদের হৃদয়ের ভূষণ;—আমরা হিন্দু সমাজকে পর মনে করিব? শরীরের এক অঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে বল, প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ কাজটী আমাদের দ্বারা হইবে না। আমরা প্রবীণ নাই বা হইলাম, তোমাদের বিশ্বাসভাজন নাই বা হইলাম, ক্ষতি কি, দুঃখ কি? আপনকে পর ভাবিব, তোমাদের মায়ায়? এমন অনুরোধ, এমন কথা ঐ কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও। সাম্প্রদায়িকতার ভাণ করিয়া আর হিংসা বিদ্বেষের আগুন দেশে ছড়াইও না।

অভিজ্ঞতায় প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় স্তবকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি আমাদের "স্বামী ও স্ত্রী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন নাই। সেই প্রবন্ধে আমরা স্পষ্ট বলিয়াছি, আশু পাপ দমনের জন্য ও ব্যভিচারের স্রোত প্রতিহত করিবার জন্য অনাধ্যাত্মিক বিবাহ যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, কর, কিন্তু তাহাকে কখনই আদর্শ বলিয়া ভুল করিও না। পরিবারসাধনই যে মুক্তিসাধনের সোপান গত বারে আমরা তাহাও বলিয়াছি। সামাজিকতা যে আধ্যাত্মিকতার সোপান নয়, ইহা আমরা কোথাও বলি নাই না পড়িয়া, না বুঝিয়া এ সকল অবান্তরিক কথার আলোচনা যে তিনি কেন করিলেন, বুঝি না। তারপর তিনি বলিতেছেন—"তবে বিবাহ মাত্রই সুনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সহজ কথা কে না বুঝে? মানুষকে ইহা সবিস্তার বুঝাইতে যাওয়া সময় নষ্ট মাত্র।" তিনিই ইহার একটু পূর্ব্বে বলিতেছেন যে "আধ্যাত্মিকতা মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু উচ্চতম লক্ষ্য আয়ত্ত করা জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই বহু সময় ও সাধন সাপেক্ষ। * * * কেবল জাতি নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিকেও বিধাতা আধ্যাত্মিকতার আস্বাদন না দিয়াই বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন।" * * ইত্যাদি। এই দুটী পদ কিরূপ পরস্পর-বিরোধী, পাঠক বিচার করুন। নীতি নাই আধ্যাত্মিকতা আছে, কিম্বা আধ্যাত্মিকতা আছে নীতি নাই, এ কথা আদবেই সত্য নয়। এ দুটী পরস্পর এত কাছের জিনিস যে, একটীর অভাবে অন্যটীর থাকা অসম্ভব। নীতি বিবাহের ভিত্তি, ইহা সকলেই বুঝে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বুঝে না। কি যুক্তিপূর্ণ কথা? নীতিটা যদি সকলেই বুঝিত, তবে পৃথিবীতে নীতি কখনও এত হতশ্রদ্ধ হইত না।

তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় উচ্চ ধার্ম্মিকতায় উজ্জ্বল হইয়াছেন, সুতরাং সুনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁহার মতে বৃথা সময় নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মতে তাহা নয়। নীতি-শিথিলতাই যে ভারতের সর্ব্ব প্রকার অধোগতির মূল, ইহাতে আমাদের একটুও ভ্রান্তি নাই। সেই জন্যই সর্ব্ব প্রকার সংস্কারের মধ্যে সুনীতিকে বদ্ধমূল করিতে আমরা প্রয়াসী। এই সহজ কথাটা সকলেই যদি বুঝিত, তবে এদেশের এত দুরবস্থা ঘটিত না। তত্ত্বকৌমুদীর ন্যায় কোন ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারক পত্রিকারও প্রয়োজন থাকিত না। 'এই সহজ

কথাটা লইয়া আমরা আলোচনা করিতেছি বলিয়া সম্পাদক মহাশয়ের এত ব্যাকুল হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাপেক্ষা আমরা অধিক বুঝি। তাঁহাকে ত আর আমরা এই বিষয়টা লইয়া আন্দোলন করিতে বলিতেছি না? তবে আর একথা কেন?

আমরা যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধে বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ চিত্র করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কোন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি যে কেন আপত্তি করিবেন, বুঝিতেছি না। তারপর ব্রাহ্মসমাজের যে সকল কালিমার কথা লিখিয়াছি, সে গুলিকে সংশোধন করিতে প্রয়াসী না হইয়া যে ভাবে আমাদিগকে অনেকে আক্রমণ করিতেছেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মসমাজ কিছু সংস্কার-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এখানে আর সে সকল কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (৩য়)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে সংস্কৃতের অনুশীলন আরব্ধ হয়। পালবংশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অদীনপরাক্রম ক্ষত্রিয় নরপতিগণ সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন না। সংস্কৃতে লিখিত তাম্রশাসন ও প্রস্তরাদি পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের অমাত্যবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কেহ কেহ সংস্কৃতের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তাঁহাদের সভামণ্ডপ সর্ব্বদা সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ সমলঙ্কৃত করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়। পালবংশীয় নরপতিগণের পূর্ব্বতন বাঙ্গলাদেশের অবস্থা পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু আয়াসেও বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই। পালনৃপতিবর্গই বাঙ্গলাদেশের প্রথম প্রামাণিক রাজা। তাঁহাদের সমসাময়িক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি বিষয়ে অবিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

পালবংশের পর সেনবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ বঙ্গদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর হন। বিজয়সেনই গৌড়নগরীতে সেন রাজবংশের রাজপাট সংস্থাপন করেন। বঙ্গেশ্বর মহারাজ আদিশূরের † সময়ে (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) যে পাঁচ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনীত হইয়া বাঙ্গলায় উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ তাঁহাদের অন্যতম। এই ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নামক সুপ্রসিদ্ধ বীররসাশ্রিত নাটক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচনা করেন। আমরা অন্যত্র বেণীসংহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভরদ্বাজগোত্রজ তিথিমেধাকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বলিয়া কৌলীন্য-মেল সংস্থাপক সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই তিথিমেধার

† বান্ধব, অষ্টম খণ্ড, ৩১০-৩১৭ পৃঃ।

বংশধর শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি নৈষধচরিত নামক সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক ষড়দর্শনের সমালোচনাপূর্ণ দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে কবিত্ব ও দার্শনিকতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেনের পুত্র মহারাজ বল্লাল সেন গৌড়ের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়েই বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী সমতট বিক্রমপুর (রামপাল) নামে পরিচিত হয়। তিনি বর্ত্তমান নবদ্বীপের দেড়ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে এক বাটী নির্ম্মাণ ও একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। উক্ত দীর্ঘিকা এক্ষণে বল্লাল-দীঘী নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে অনুমান করেন যে, বল্লাল দীঘীর উত্তরদিকে বল্লাল সেনের টিবী নামে যে উচ্চ স্থান আছে, তথায়ই বল্লালের বাটী ছিল। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বল্লাল-সেন 'দানসাগর' নামে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।*

১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে(১০২৮ শকাব্দে) বল্লালের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্যপুত্র লক্ষণ সেন দেব বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহা অধুনাও মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত আছে। উমাপতি, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব ও ধোয়ী কবিরাজ নামক পঞ্চ পণ্ডিতরত্ন-দ্বারা তাঁহার সভামণ্ডপ সমলঙ্কৃত ছিল। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন —

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ, সন্দর্ভশুদ্ধিংগিরাং
জানীতে জয়দেব এব,শরণঃশ্লাঘ্যো দুরূহ-দ্রুতে
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈঃ আচার্য্যগোবর্দ্ধন,
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো
ধোয়ী কবি-ক্ষ্মাপতিঃ॥

গীতগোবিন্দ, ১ম সর্গ, ৪র্থ শ্লোক

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা হইতে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম কবি জয়দেব স্বকৃত পুরুষ-পরীক্ষায় লিখিয়াছেন যে, উমাপতিধর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কুসুমাঞ্জলি নামক সুপ্রসিদ্ধ দর্শন গ্রন্থ প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের পুত্র উমাপতি সচিবপ্রবর উমাপতি কি না, বলা যায় না। *

---

* শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় তদীয় সেনরাজগণ নামক উৎকৃষ্ট পুস্তিকায় আদিশূরকে মহারাজ বল্লাল সেনের মাতুল বংশীয় সমতটের (পূর্ব্ববঙ্গ বা বিক্রমপুরের) রাজা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "যৎকালে শিবভক্ত মহারাজ বিজয় সেন পালবংশীয় শেষ বৌদ্ধরাজাকে দূরীভূত করিয়া গৌড়ের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয় আদিশূরবংশীয় কোন নরপতি বঙ্গ (সমতট) প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বিজয়সেন সমতটের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয়, এই কন্যার গর্ভেই বল্লাল জন্ম গ্রহণ করেন।" কৈলাস বাবুর অনুমান কতদূর যুক্তি-সঙ্গত,তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

* কুসুমাঞ্জলির অনুবাদক কাউয়েল সাহেবের মতে উদয়নাচার্য্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ও মনুসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূক ভট্ট রাজসাহীর অন্তঃপাতী তাহেরপুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাদুড়ী কুলকে পবিত্র করিয়াছেন। (বান্ধব, ৭ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)। উদয়নাচার্য্য

জয়দেব বীরভূমের প্রায় দশক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগবত পুরাণের অমৃতময় রস আস্বাদনে বিমোহিত হইয়া ভাবসিন্ধু মন্থন পুরঃসর তিনি গীতগোবিন্দ নামক দ্বাদশ সর্গাত্মক অপূর্ব্ব গীতিকাব্য রচনা করেন। গীতগোবিন্দ আজিও শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের সম্মুখে প্রত্যহ পঠিত হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি পূজনীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় কীদৃশী মনোহারিণী কবিতা বিরচিত হইতে পারে, গীতগোবিন্দকে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। †

গোবর্দ্ধন মহারাজ বল্লালসেনের মন্ত্রী আদিদেবের পুত্র। ইনি আর্য্যা-সপ্তশতী নামক সুপ্রসিদ্ধ ছন্দোবন্ধময় কাব্য প্রণয়ন করেন। আর্য্যা-সপ্তশতী হাল নামক কবির সপ্তশতকের অনুকরণে লিখিত। ইহাকেই আদর্শ স্বরূপ লইয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল ও তুলসীদাস "সত্তসই' গ্রন্থ হিন্দিভাষায় রচনা করেন ‡।

কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা গ্রন্থ ধোয়ী কবিরাজ রচনা করিয়াছেন কিনা, অনুসন্ধান করা উচিত।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেব সেনবংশের শেষ রাজা। তিনি ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপে রাজপাট সংস্থাপন করেন। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থ প্রণেতা হলায়ুধ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাল্যেখ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃশ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তনুপদংদত্বা নবে যৌবনে
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যং অখিল-ক্ষ্মাপাল-
নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥
(ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব)

হলায়ুধ আদিশূরানীত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বাৎস-গোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত। তাঁহার ভ্রাতা ঈশান ও পশুপতি যথাক্রমে আহ্নিক ও পশুপতি-পদ্ধতি নামক ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। সচিবশ্রেষ্ঠ হলায়ুধ অভিধান রত্নমালা নামক অভিধান এবং আচার্য্য পিঙ্গল প্রণীত বৈদিক ছন্দসূত্রের মৃত সঞ্জীবনী নামক টীকা * রচনা করেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের শ্রীধরদাস নামা জনৈক সভাসদ ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে) সদুক্তিকর্ণামৃত নামক গ্রন্থ ৪৪৬ জন কবির রচিত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শাকে সপ্তবিংশত্যধিক-শতোপেত দশশতে
শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য হি রসরসৈক অব্দে ॥

তাহেরপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি নিসিন্দা গ্রামবাসী ছিলেন।

† প্রসন্ন-রাঘব নামক রাম বিষয়ক নাটক প্রণেতা জয়দেব বিদর্ভবাসী ছিলেন। (ভারতকোষ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

‡ Weber's History of Indian Literature, P. 211, Foot notes.

* সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বেবার (ওয়েবার) সাহেব হলায়ুধকে এক স্থানে দশম অপর স্থলে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Weber's History of Indian literature. P. 196 and 230.

Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. I. p. 1.

এই ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগেই মহম্মদ বখ্‌তীয়ার খিলজী নবদ্বীপ অধিকার করেন। রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ক্রমশঃ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৩)

আমরা গতবারে প্রবন্ধশেষে বলিয়াছি যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, প্রেম সাধনের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। নানা কারণে এই প্রথার প্রতি লোক কিছু বিরক্ত। সুতরাং প্রেম-সাধনায় কিছু ব্যাঘাত ঘটিতেছে। প্রেম-সাধনা ভিন্ন ধর্ম্মলাভ অসম্ভব। প্রেমের পথে নানা কারণে কণ্টক পড়াতে ব্রাহ্ম পতি পত্নী কিছু ধর্ম্ম-লক্ষ্যভ্রষ্ট, সুতরাং সংসারাসক্ত হইয়া পড়িতেছেন। এই ধর্ম্মহীনতার আরো যে সকল কারণ আছে, সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। বিধাতা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মহীনতার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্বাধীনতার নামে অল্পে অল্পে কিছু স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই স্বস্ব প্রধান, পরস্পরের প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নাই। স্বাধীনতার পক্ষপাতী ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারিতেছেন না। মতে মত না মিলিলে, পরস্পরকে অপদস্থ করিতে ব্রাহ্মেরা বড়ই মজবুত। প্রথম হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিবাদ করার শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে। বয়সের প্রতি, অভিজ্ঞতার প্রতি সম্মান রাখিতে হইবে,—এ শিক্ষাটী বড়ই কম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে ভক্ত কেশবচন্দ্র, এবং কেশবচন্দ্র হইতে নব্য ব্রাহ্মদল—সকলেই স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার ধুঁয়া ধরিয়া পরস্পরের মতকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। মতের প্রতিবাদের শিক্ষাটা বড়ই প্রবল। কিন্তু মত পালনে দৃষ্টি বড় কম। সেই শিক্ষার কুফলে আজ ব্রাহ্মসমাজ দারুণ অপ্রেমের লীলাস্থল হইয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের মতের প্রতি উপেক্ষা করা, ঘৃণা প্রদর্শন করা বা পরস্পরকে নিন্দা করা অধিকাংশ ব্রাহ্মের দৈনিক কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কি উপাসনা-মন্দির, কি প্রচারক্ষেত্র, কি সভাগৃহ, কি পরিবারের কেন্দ্র, সর্ব্বত্রই অবাধে সকলে পরস্পরের নিন্দা করিতেছেন। এই কদর্য্য শিক্ষায় দীক্ষিত—বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ, অনেকেই। আজ যে ভেক লইয়া সংসার ছাড়িয়া বৈরাগী সাজিয়াছে, সেও বক্রমুখে প্রবীণের নিন্দা করে; কাল যে ব্যভিচার ও মদ্যপান পরিহার করিয়া ভক্তবেশ ধরিয়াছে, সেও অবাধে নানা মতের প্রতি উপেক্ষা করিতেছে। কেশবচন্দ্র সেনকে একদলের অধিকাংশ লোক ঘৃণার চক্ষে দেখেন, অন্যদল সাধারণ তন্ত্র-ভুক্ত ব্রাহ্ম-অধিনায়কগণের প্রতি কৃপার কটাক্ষপাত করেন। এই ঘৃণা, এই নিন্দার স্রোত—উপর হইতে আরম্ভ করিয়া এখন

নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকা, অপেক্ষাকৃত বড় বড় যুবক যুবতী, ধর্ম্মতত্ব, সমাজতত্ব যাহারা মোটেই বুঝে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহারাও আজ সমালোচকাগ্রগণ্য। তাঁহারাও আজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বক্র মুখে কত নিন্দা প্রচার করিতেছে। আজ কালকার দিনে, প্রেম-শিক্ষার পরিবর্ত্তে ঘৃণা বিদ্বেষ বা স্বাতন্ত্র্য শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। "যত ছিল নাড়াবুনে সব হলো কীর্ত্তুনে"—আমাদের দেশের একটী প্রাচীন কথা। ব্রাহ্মসমাজের নব্য দল সম্বন্ধেও সেই কথা খুব খাটে। ব্রাহ্মসমাজের কে বড় কে ছোট, কার মত প্রবল, কার মত অপ্রবল, ইহা নির্ণয় করা আজ কাল বড়ই কঠিন। কার কথা কে শুনিবে, কার কথা কে মানিবে? সকলেই স্ব স্ব প্রধান। হাজার লোকের হাজার মত। কাহারও মতে কেহ চলিবে না। কারণ, এ যে স্বাধীনতার যুগ। বিবাহের আদর্শ তোমার একরূপ,আমার অন্যরূপ; উপাসনা প্রণালী তোমার একরূপ,আমার অন্যরূপ; তোমার কথা আমি মানিব কেন? তুমি বিবাহের পূর্ব্বে যে সকল আচার ব্যবহার নিষেধ কর, আমি তাহাকেই উচিত মনে করি। একটী বালিকা একটী যুবককে দাদা বা কাকা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তারপর বিবাহ করিয়াছে, তাতে দোষ কি? তোমার মতে দোষ, আমার মতে দোষ নয়। বিবাহের পূর্ব্বে স্বেচ্ছ-বিবার তোমার মতে অবৈধ হইতে পারে, আমি ইহাকেই প্রণয়-প্রস্ফুটনের পক্ষে পরম সহায় বলিয়া মনে করি। সুতরাং তোমার সঙ্কীর্ণ মতামতে আমি চলিব কেন?—আজকালকার অনেক নব্য-ব্রাহ্মের মুখে মুখে এই কথা। প্রবীণ লোকের মুখের উপর ধা করিয়া কত যুবক আজ কাল কত অসম্মান-সূচক কথা বলে। স্বাধীন যুগের স্বাধীনতার স্রোত এমনই প্রবল বেগে চলিয়াছে যে,—কোন কথা বলিতে বা লিখিতে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতে হয়! কথা যে কেহ মানিবে, সে আশা অতি কম। এইরূপে প্রবীণ লোকদের আদর্শ চিত্র উপেক্ষিত হইতেছে,ও আদর্শ মত ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইতেছে। এই যে স্রোত, এই স্রোতের গতি যে কোথায় যাইয়া থামিবে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিবাহের পূর্ব্বে কোন অবৈধ ঘটনার প্রতিবাদ করিয়া নিস্তার পাওয়া এখন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রবীণ ব্রাহ্মগণ যে এবিষয় বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহা আমরা মনে করি না। কিন্তু তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়া এই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছেন। শোচনীয় অবস্থার কথা কে ভাবিবে? তুমি বলিতে যাও, তোমার দুর্দ্দশার এক শেষ হইবে। বাদ প্রতিবাদ, মত লইয়া মারামারী, কাটাকাটী করিতেই অধিক সময় চলিয়া যাইতেছে, কে বল আর সাধন ভজনে মন দেয়। প্রতিবাদ-স্রোতের প্রাবল্যে, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে দিন দিন ধর্ম্মহীন হইবেন, কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। তার উপর আবার বিলাসিতা ও সংসারাসক্তির দারুণ পরাক্রম। মতসর্ব্বস্ব সাধনায় ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন যে কি শোচনীয় অবস্থায় যাইয়া উপস্থিত হইতেছে, কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। বিধাতা এই সমাজকে রক্ষা করুন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্ম কোন শাস্ত্র মানেন না,

সমাজ সম্বন্ধেও কোন শাস্ত্র বা নিয়ম মানেন না। সমাজ চিরকাল পরিবর্ত্তনশীল। এক নিয়ম, সুতরাং খাটে না। নিয়মহীন সমাজ, একবার জাগে, আবার ডুবে। উন্নতির পরিবর্ত্তে তাই অবনতি, নিয়মহীন সমাজের ভাগ্যে ঘটিতেছে। আবার উন্নতি হইবে না, তা বলি না। কিন্তু সে বড় দূরের কথা। সকল শাস্ত্র, সকল নিয়ম উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়া নবীন ব্রাহ্মদিগকে স্বেচ্ছাচারের পথে যাইতে আদেশ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কঠিন সঙ্কটাপন্ন সমস্যার দিনে কি ভাবিতেছেন, আমরা জানি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, এযুগের সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রণালী যদি স্থিরীকৃত করিতে এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহা চালাইতে ব্রাহ্মগণ না পারেন,তবে এই উশৃঙ্খল সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। আগুন লইয়া খেলা, সামান্য ব্যাপার নয়। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজ একটী সমাজের আকার ধারণ করিতেছে। এখন নিয়মাদি ভিন্ন, সতর্কতা ভিন্ন চলা দুষ্কর। সমাজের আবশ্যকতা থাকিলে নিয়মের আবশ্যকতা অবশ্যই মানিতে হইবে। কিন্তু সেই নিয়মের মূলে প্রেম,ভগবদ্ভক্তি ও গভীর সাধন ভজনের অঙ্কুর থাকা চাই। লোকশাসনের জন্য যে নিয়ম, তাহাতে মঙ্গলের আশা বড়ই অল্প।

ব্রাহ্মসমাজ এপর্য্যন্ত বিবেকের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। বিবেক না মানিলে, ধর্ম্মকে দাঁড় করান কিছু কঠিন। ভগবান মানুষের নিকট স্পষ্ট কথা বলেন, একথা না মানিলে ধর্ম্মকে দাঁড় করান যায় না। কাজেই কতকটা অভ্রান্তবাদ মানিতেই হয়। মানুষের নিকট ভগবান যে কথা বলেন, তাহা অভ্রান্ত। কিন্তু গভীর সাধন ভজন ভিন্ন, বিবেকের কথা বা আদেশ বুঝিতে পারা বড়ই [illegible] কঠিন বলিয়াই, হিন্দুশাস্ত্রকারেরা [illegible] উপদেশ মানা [illegible] [illegible] সেই উপদেশ আবার অ[illegible] [illegible] নানা সময়ে, নানারূপ [illegible] [illegible]য়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে [illegible] প্রতি আস্থা নাই, কারণ এসমাজের [illegible] সেরূপ নয়। এখানে বাধ্য হইয়া বৃদ্ধকে এবং বালককে, জ্ঞানী এবং মূর্খকে ঐ বিবেকের কথার দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু এদিকে সাধন ভজন বড় কম। তাই ভুল ভ্রান্তি যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আজ যে পথে, কাল তার ঠিক বিপরীত পথে, কাল যে পথে যাইবে আজ তার ঠিক ভিন্ন পথে চলিতে হয়। ধর্ম্মে দৃঢ়তা, অটল বিশ্বাস সধারণত মানুষের বড়ই কম। আজ এটা, কাল সেটা, কাজেই মানুষকে ভুলাইতে থাকে। গভীর ধর্ম্মসাধনার অভাবে, বুদ্ধি ও ধারণা শক্তির তারতম্যানুসারে মানুষের বিবেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথা বলে। আজ যেমন, কাল তেমন নয়,রামের যেমন শ্যামের তেমন নয়। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছা বা খেয়াল,আসক্তি বা সুখেচ্ছা অনেক সময়ে বিবেকের স্থানীয় হইয়া মানুষকে নানা বিপথে লইয়া যাইতেছে। স্থিরতা কিছুতেই জন্মিতেছে না। আজ এটা, কাল সেটা। বিবেক কি মানুষকে কখনও এইরূপ চঞ্চল করে? না, তা নয়। বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি চিরকাল মানুষকে একই পথে লইয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধির স্থানীয় হইয়া অনেক সময় সংসারবুদ্ধি মানুষকে পথ ভুলাইয়া ফেলে। তাই মানুষের এত চঞ্চলতা দেখিতে

পাওয়া যায়। ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্ম, স্বর্গের স্থানে সংসার, বৈরাগ্যের স্থানে আসক্তি, প্রেমের স্থানে ঘৃণা বিদ্বেষ,—তাই মানুষের হৃদয়কে মলিন করে। সংসারাসক্তি বা স্বেচ্ছার কথা ও বিবেকের কথায় তারতম্য করা বড়ই কঠিন। তাই ব্রাহ্মসমাজের মলিনতার অবস্থা উপস্থিত। আদর্শ না পাইয়া সকলেই হতবুদ্ধি। সকলেই স্বস্ব প্রধান। এই অবস্থায় ধর্ম্ম এবং নীতি অনাদৃত হইবে না, কিরূপে? কিন্তু ইহার কি কোন ঔষধ নাই? এই ভয়ানক দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার কি আর উপায় নাই? আছে বই কি। উপায়, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা, কঠোর তপস্যা। কিন্তু কে বল, সংসার-খেলা ছাড়িয়া দিবারাত্রি তোমার প্রার্থনা বা তপস্যা লইয়া এই জড়বাদের দিনে বসিয়া থাকিবে? দুর্দ্দশা বা দুর্দ্দিন কেমনে ঘুচিবে, তা বল?

এসকল কথা আমরা লিখিতেছি কেন? আমরা পূর্ব্ববারে বলিয়াছি, ভগবানের বিধান না বুঝিয়া যাঁহারা বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গীয় পবিত্র কুসুম তাহাদের হৃদয়ে ফুটে না। এই বিধান বুঝিবার সময় যে ভুল হইতে পারে, এস্থলে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াও একান্ত উচিত বলিয়া তাহা করিলাম। বিধান বুঝা বড়ই কঠিন। বিধানের স্রোতে না পড়ার দরুন হিন্দু পতি পত্নীর অনেক স্থলে যে দুর্দ্দশা, ভুল-বিধান বুঝাতে ব্রাহ্মপতি-পত্নীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা। না বুঝিয়া বা বুঝিতে ভুল করিয়া অনেক সময় অযথা-স্থানে অনেকে পরিণীত হইতেছেন। রূপজ-মোহ বা যৌবন-চাঞ্চল্য এবং সংসারাসক্তি বিবেকের স্থানীয় হইয়া মানুষকে ঘোরতর অন্ধকার, দুর্নীতি ও দুর্গতির পথে লইয়া যাইতেছে। সে ভীষণ পথ নরক অপেক্ষাও দুর্গতিময়। সেখানে যাইয়া মানুষ হাহাকার করিয়া চীৎকার করিয়া মরিতেছে। কিন্তু সে দুর্গতিময় পথের কথা মানুষ প্রথমে কিছুতেই বুঝিতে পারেনা, বুঝিতে চায় না। নিজেও বুঝিবেনা,অন্যের কথাও শুনিবে না। শাস্ত্রের কথাও মানিবে না, প্রাচীন অভি-ভাবকের পরামর্শেও কর্ণপাত করিবে না। আলোক দেখিয়া পতঙ্গ যেমন পুড়িয়া মরে, অনেকে সেইরূপ সংসারের দারুণ যৌবনাগুনে জীবনাহুতি দিতেছেন। এই জন্যই আমরা বর কন্যার মনো-নয়নের ভার, কেবল বর কন্যার উপর না রাখিয়া, বিজ্ঞ এবং নিঃস্বার্থ অভিভাবক-দিগের উপরও কতক রাখিতে চাই। কিন্তু সে সকল কথা এ স্বাধীনতার দিনে লোকে শুনিবে কেন?

আমরা দেখিতেছি, ধর্ম্মপথের যে দুটী পরিষ্কার পথ স্বাধীনতা ও বিবেক-প্রাধান্য, সেই প্রধান দুটী অবলম্বনই বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছে। স্বাধীনতা এবং বিবে-কের ধূঁয়া ধরিয়া লোক দিন দিন দুর্গতির পথে যাইতেছে। যে রক্ষক, সে ভক্ষক হইলে, আর কে রাখিবে? ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক আজকাল ভক্ষক বেশ ধারণ করি-য়াছে। এ দুর্দ্দিনের উপায় কি?—তা বিধাতাই জানেন।

আর স্থানে কুলাইল না সুতরাং অন্যান্য কথা আজ রহিল।

পালরাজগণ।
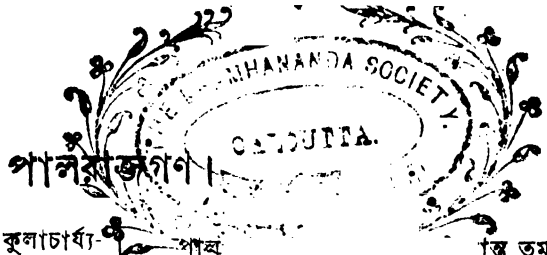
সত্যের শীর্ষে পদাঘাতকারী কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগের মনে পালরাজন্যবর্গের সম্বন্ধে যে বিকৃত ভাব বদ্ধমূলক হইয়াছে, অদ্য আমরা তাহার মূলদেশে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি। সাধারণের অন্তঃকরণে এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, পাল নরপতিগণ গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের দারুণ শত্রু ছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে বাঙ্গালার বেদবিৎ ব্রাহ্মণ লোপ পাইয়াছিল। এই সকল সংস্কারের সৃষ্টিকর্ত্তা কেবল সেই মিথ্যাবাদী ঘটকচূড়ামণিগণই বটেন। প্রকৃত পক্ষে এই সকল কথার কোন মূল্য নাই। পাল রাজন্যবর্গের ইতিহাস আমাদের অতি আদরের ধন। আমরা যদি কখনও বীরবংশধর বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারি—আমরা যদি কখনও জগতে মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারি, তবে সে কেবল পাল রাজন্যবর্গের কৃপায়।—কোন্ বাঙ্গালীর বিজয়ী পতাকা পশ্চিম সাগরের তীরে উড্ডিন হইয়াছিল? কোন্ বাঙ্গালীর বিজয়ী ডঙ্কা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিনাদিত হইয়াছিল? কেবল এক পাল রাজন্যবর্গের। পালরাজন্যবর্গের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী উজ্জ্বল অধ্যায়। এ হেন পাল নরপতিদিগের প্রকৃত ছবিকে যাঁহারা বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট বিকৃত করিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভয়ানক পাপীষ্ঠ। ইহারা স্বজাতির শত্রু ও দেশের শত্রু।

পাল্র [illegible] ান্ত তমসাচ্ছন্ন গুহায় নিপাতিত। তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি সমূহের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই বংশের প্রথম রাজা গোপাল দেব। ইনি বল্লভীর রাজকন্যা বাগীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আধুনিক পাটনাজেলার অন্তর্গত বিহার উপবিভাগের অধীন বর্ত্তমান বোড়গাও প্রাচীন কালে নালন্দা নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধদিগের উন্নতি সময়ে নালান্দারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এস্থলে বৌদ্ধদিগের অনেক গুলি মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করিতেন। বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিমল জ্যোতি প্রচার করাই ইঁহাদিগের জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল। পূর্ব্ব ভারতের জ্ঞান-নিকেতন সেই নালন্দানগরে বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত মহাত্মাগণ ধর্ম্মোদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। এই সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মহারাজ গোপালদেব কিম্বা তাঁহার রাজ্ঞী নালন্দা নগরে যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারদেশে যে খোদিত প্রস্তর-লিপি সংযোজিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছেঃ—

"সম্বত ৭ আশ্বিন সুদি ৮ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রী গোপাল রাজ নিমা (র্ম্মা) নতত্তয়া (র্য্যাং) শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টারিকা সুবল্লভী দেশস্থাঃ।"

প্রায় এক শতাব্দী গত হইল, মুঙ্গের নগরে পাল বংশের একখানি তাম্রশাসন

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস উইলকিন্স সাহেব তাহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের প্রতিলিপি সহ সেই অনুবাদ "এসিয়াটিক্ রিসার্চের" প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, অদ্বিতীয় ভাগ্যবান ও দিগ্বিজয়ী মহারাজ গোপালের ধর্ম্মপাল নামে এক পুত্র ছিল। তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেনন। বিজয়ী ধর্ম্মপাল দেব রাষ্ট্রকুটাপতি প্রবল নরপতির দুহিতা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন *। এই রণ্ণা দেবী এরূপ সুন্দরী ছিলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

এই রণ্ণাদেবীর গর্ভে মহারাজ ধর্ম্ম পালের এক পুত্র জন্মে। এই কুমার দেবপাল আখ্যা প্রাপ্ত হন। মহারাজাধিরাজ দেবপালদেব গঙ্গার উৎপত্তি স্থান অর্থাৎ হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ, লক্ষীকূল হইতে পশ্চিম সাগরের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন। বিজয় কালে তাঁহার অশ্ব সকল কাম্বোজে ও হস্তী সকল বিন্ধ্যপর্ব্বতে যাইয়া আপনাদের প্রাচীন পরিবারবর্গকে দর্শন করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। সেই ভারতবিজয়ী দেবপালদেব বিজয়-কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক মুদ্গগিরিতে স্কন্ধাভার সংস্থাপন করিয়া ভট্ট বিশ্বরথের পৌত্র, ভট্ট বৃহর্ইস্বের পুত্র ভট্টবৃক্ষ রথমিশ্রকে শ্রীনগর * প্রদেশস্থিত কৃমিলার অন্তঃপাতী মিসিক গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকুটাপতির প্রদত্ত ৭৪৪ শকাব্দের ১২ই বৈশাখের যে একখানি তাম্রশাসন বরদা নগরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার ষড়্‌বিংশতি শ্লোকে লিখিত আছে, "গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য মালবাধিপতি, কর্কারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেলেন।" †

বিজ্ঞবর লাসেন সাহেব রাষ্ট্র কুটারাজবংশের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন, গৌড়েশ্বর গোপালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মালবরাজ রাষ্ট্রকুটাপতি দ্বিতীয় কর্কারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কর্কারাজ ৭৩৭ শকাব্দে জীবনলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাল বংশের স্থাপয়িতা গোপাল দেব ৭৩৭ শকাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

বিহার প্রদেশস্থ ঘোসরাঁত্তা (প্রকাশ্য গুসরা) র একটী প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির

* দক্ষিণ মহারাষ্ট প্রদেশকে প্রাচীনকালে রাষ্ট্রকুটা বলিত। রাষ্ট্রকুটাপতিগণের অনেক গুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারাও অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। রাষ্টকুটাপতি প্রবলের দুহিতা রণ্ণাদেবাকে মহারাজ প্রবল বিবাহ করেন। উইলকিন্স সাহেব শাসন পত্রের শ্লোকটী ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া তাহারা এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,–
"This prince took the hand of the daughter of Probal Raja of many countries, whose name was Rana Debee.

কিন্তু আমরা শাসনপত্রের প্রতিলিপি পাঠ করিয়া নবম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। "শ্রীপ্রবলস্য দুহিতুঃ ক্ষৌনিপতিজ্জা রাষ্ট্রকুটা তিলকস্য রণ্ণা দেব্যাঃ।

Asiatic Researches, vol. I. p. 110. (2d. ed.)

* শ্রীনগর আধুনিক পাটনা।

† Journal. As. So. Bengal Vol. VIII, p. 303.

গাত্রে খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেবের শাসন কালে যশোবর্ম্মা নামক একব্যক্তি বিহারের শাসন কর্ত্তা কিম্বা সামন্ত রাজা ছিলেন। *

কিছু দিন হইল ভাগলপুরে মহারাজ নারায়ণপাল দেবের একখণ্ড তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ডাক্তর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় এই শাসন পত্রের প্রতিলিপি ও অনুবাদ স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। মুঙ্গের ও ভাগলপুরের শাসন পত্র পরস্পর তুলনা করিলে একটী গণ্ডগোল দৃষ্ট হয়। মুঙ্গেরের শাসন পত্রে দেবপাল দেব আপনাকে ধর্ম্ম পালের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভাগলপুরের শাসন পত্রে দেবপাল দেবকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বাক্ পালের পুত্র বলা হইয়াছে। ভাগলপুরের তাম্রশাসন দেবপাল দেবের পিতৃব্য পুত্র জয়পালের পৌত্র নারায়ণপাল দেব প্রদত্ত। সুতরাং এস্থলে দেবপাল দেবের নিজের বাক্যই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ভাগলপুরের তাম্রশাসন হইতে পাল বংশের নিম্নলিখিত রূপ বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা—

১। গোপাল।

২। ধর্ম্মপাল   বাকপাল।

৩। দেবপাল।   জয়পাল।

৪। বিগ্রহপাল।

৫। নারায়ণপাল।

ভাগলপুরের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, জয়পাল তাঁহার অগ্রজ দেবপালের আদেশ অনুসারে উড়িষ্যা ও কামরূপ প্রভৃতি দেশাধিপতিকে জয় করিয়াছিলেন।

মুঙ্গেরের শাসন পত্রের অন্তভাগে লিখিত আছে যে, প্রকৃতি বর্গের মনোরঞ্জনার্থ মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেব তাহার পুত্র রাজ্যপালকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগলপুরের ও অন্যান্য শাসন পত্রের মর্ম্মালোচনা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, দেবপালের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতষ্পুত্র বিগ্রহপাল রাজদণ্ড ধারণ করেন। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, যুবরাজ রাজ্যপাল তাঁহার পিতার বর্ত্তমানেই কালকবলিত হন। মহারাজ বিগ্রহপাল হৈহয় বংশজাত লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ কারন। এই লজ্জা দেবীর গর্ভে বীর চূড়ামণি নারায়ণপাল দেব জন্মগ্রহণ কারন।

অনল সদৃশ জ্যোতিষ্মান ও নলের ন্যায় পুণ্যশ্লোক পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্নারায়ণপাল দেব কলশ, পোত গ্রামে সহস্র দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া "ভাগবতঃ শিবভট্টারক" ও "পাশুপত আচার্য্য" কে স্থাপন করিয়াছিলেন।

* Journal As. So. Bengal Vol. XVII. Part I. Page 493. এই প্রস্তর লিপির মূল ও অনুবাদ পুনর্ব্বার ব্রডলি সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। J. A. S. Bengal Vol. XLI. Part I. P. 246.

তাঁহাদের "পূজা বলি চক্রসত্র" প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন ও রোগীদিগের আশ্রয়, ঔষধ ও সেবা সুশ্রূষা নির্ব্বাহ জন্য "তীরভুক্ত" * প্রদেশস্থিত কক্ষ বিষয়ির † অধীন মকুতিকা গ্রাম "ভগবন্ত শিবভট্টারক-মুদ্দিশ্য শাসনী-কৃত্য প্রদত্ত" হইয়াছিল। ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ

স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী।

শারদ জ্যোৎস্নার মত ফুট ফুটে, পাঁচ বছরের একটী দুধের মেয়ে পিতৃ-পার্শ্বে ঐ দাঁড়াইয়া,—পিতার দুটী আঙুল ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। ফুল্ল মল্লিকার মত প্রফুল্ল মোলাম মুখ খানি দেখিতে দেখিতে ঈষৎ আকুঞ্চিত ও স্ফীত হইল কেন? আহা, ডাগর ডাগর চোখ দুটী যে অশ্রুভরে ফেটে যায়! চোখের জল শতধারে ঠিক্‌রে পড়িল! কেন? মেয়ে ফুলে ফুলে গুমুরে গুমুরে কাঁদে কেন? পিতা দয়াবান কিন্তু কার্য্যকুশল বিষয়ী লোক। জনৈক অবাধ্য ইতর প্রজাকে কিঞ্চিৎ প্রহারের আদেশ করিয়াছেন। তাই মেয়ের দুই চোখে শতধারা। মেয়ে ফুলে ফুলে কাঁদিতেছে। এ মেয়ে কে? ইনি শৈশবে শরৎসুন্দরী।

অপর চিত্র দেখ ঐ;—কিশোর-বয়স্কা, ত্রয়োদশ বর্ষিয়া, উন্মুক্ত-কবরী বন্ধন, আলুলায়িত কুন্তল-রাশি ভূ-পতিত, বিদ্যুৎবৎ ভূমি-শয্যায় শায়িত ঐ বালিকা কে? ইনি রাজ্যেশ্বরী রাজ-বনিতা, বালিকা বিধবা শরৎসুন্দরী। চোখের জলে পৃথিবী ভাসাইতেছেন!!

তৃতীয় দৃশ্যে দেখ ঐ,—যৌবনে যোগিনী-পবিত্র ব্রহ্ম-চারিণী, সংসার-সুখ, সংসার-শান্তি মাত্র বিরহিতা সংসারবাসিনী রাজরাণী। মহারাণীর পরিধানে থানের ঠেঁটি। যুবতী জঞ্জাল বোধে কৃষ্ণ কুন্তলরাশি কাটিয়া ফেলিয়াছেন! মা আমার দিবা রাত্রির মধ্যে একবার মাত্র আহার্য্য দ্রব্য স্পর্শ করেন। সে আহার স্বহস্ত-সিদ্ধ মুষ্টিমেয় আতপ তণ্ডুল! মাতা নিদ্রা যান ভূমি-শয্যায়, শীত নিবারণ করেন সামান্য কম্বল গায়ে দিয়া। মায়ের জীবনের একমাত্র চিন্তা, ভগবানের পূজা আর পতির ধ্যান। কার্য্য, কেবল দান। ব্রত-উপবাস, দান ধ্যান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আর চোখের জল, আহা এই সব সামগ্রীর সমষ্টি ঐ যুবতী মহারাণী শরৎসুন্দরী!

আজন্ম-দুঃখিনী অন্যের দুঃখ নিবারণ করিতেই জন্মিয়াছিলেন। অন্যের দুঃখ দূর করিতে আর নিজে দুঃখ ভোগ করিতেই আজন্ম-দুঃখিনী জন্মিয়াছিলেন। দুঃখীর দুঃখ কেমন করে দূর করিতে হয়, মা তুমিই কেবল জানিতে! অন্নপূর্ণা ঐ অন্নদানে,

* আধুনিক ত্রিহুত।

† প্রাচীন কালে প্রদেশের এক একটী অংশকে বিষয় বলিত। মুসলমান শাসনকাল হইতে বিষয়ের পরিবর্ত্তে পরগণা ব্যবহার হইতেছে।

ক্ষুধার্থের ক্ষুধা-শান্তি করিতেছেন। রাজরাণী ঐ দরিদ্রের শিশুকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতেছেন। দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মচারী নিজের দুরাচারে দণ্ডিত, রাজ-সংসার হইতে দূরীকৃত। মা আমার, গোপনে, পিতার অগোচরে,—নিজের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের অগোচরে, যত লোককে লুকাইয়া, ঋণ করিয়া দুর্বৃত্ত কর্ম্মচ্যুত ভৃত্যকে অর্থ প্রেরণ করিতেছেন। 'আহা তার কষ্ট হবে, পূজার সময় তার ছেলেপিলে কাপড় পাবে না?' মা আমার কেমন করে তা দেখিবেন! ঋণ করিয়া দাসীর হাতে তাকে টাকা পাঠাইলেন, আর বলিয়া দিলেন যে,'দেখিস,ইহা যেন কেহ জানিতে না পায়'। কেননা যাকে টাকা পাঠান হলো,সে তাঁহার নিজেরই অনেক টাকা অপহরণ করিয়াছিল।

ব্রহ্ম-চারিণী স্বহস্তে অর্থ স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইত,কেবল লোককে দিতে। আহা, সে দানের জন্যও মায়ের কত সঙ্কোচ, কত লজ্জাশীলতা। মা যখন রাজ্যেশ্বরী, তখনও তাঁহার পিতার নিকট মুখ ফুটিয়া কোন অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেন না। সময়ে সময়ে রাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকটেও নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইতেন। অথচ দান যে করিতেই হইবে। যাহাকে যাহা দিবেন ভাবিয়াছেন, তাহা যে দিতেই হইবে, না দিলে যে চলিবেই না; নহিলে যে জগদ্ধাত্রী নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আহা,এই অর্থ সংগ্রহের জন্যও সময়ে সময়ে মায়ের কতই না কষ্ট, কতই না উৎকণ্ঠা হইত।

আর সে কি কেবল অর্থদান! যে দ্রব্য অর্থের অতীত, সংসারে সুদুর্লভ,—স্বর্গে আছে কি না কেহ জানে না, সেই অমূল্য অতি পবিত্র অশ্রু তিনি অজস্র দান করিতেন। দুঃখিনীর নিজের দুঃখাশ্রু দিনেকের তরে শুকায় নাই, তার উপর পরদুঃখকাতরতায় অভিভূত হইয়া, কতই না অশ্রুপাত করিতেন। আজি অমুকের অমুক পীড়িত, মা আমার কেঁদেই অস্থির! কেহ একটু সামান্য কষ্টে ক্লিষ্ট হইলে মায়ের চোখে জল ধরিত না। অভাগিনী কাঁদিতে আসিয়াছিলেন, কাঁদিয়াই গেলেন। পবিত্র অশ্রুপাত দ্বারা পৃথিবীর পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিবার জন্যই যেন মা আমার জন্মিয়াছিলেন।

হায় হায়, ঐ দেখ আর এক সাংঘাতিক দৃশ্য! যতীন্দ্র শ্মশানে শায়িত! অভাগিনী বিধবার দত্তক সন্তান,—পালিত পুত্র যতীন্দ্র,—শুষ্ক মরুভূমিতে একটী সুকুমার পল্লব, চির অন্ধকারে আবৃত রাজভবনে একবিন্দু জ্যোৎস্না-জ্যোতি, হায়, ঐ নিবিয়া গেল! বিধবা, সযত্নে ও অতি সন্তর্পণে পালিত যতীন্দ্রের জীবন-ছায়ায় দগ্ধহৃদয় ক্ষণেকের জন্য স্থাপিত করিয়া একটু জুড়াইবেন, হায়, সে আশাতেও ছাই পড়িল! যম যতীন্দ্রকে লইলেন। আশার ক্ষুদ্র কণিকা,—অতি ক্ষুদ্র কণিকা,—আহা, যাহা শত গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়াছিলেন,—অভাগীর অঞ্চল হইতে খসিয়া পড়িল!!! মা কাশী হইতে ফিরিলেন—পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে!!!

অহো অশ্রুজল, তোমার সীমা কোথায়! অহো নারায়ণ! তোমার লীলা কে বুঝিবে!!

পরের অশ্রু মোচন করা যাঁহার জীবনের ব্রত, এক মাত্র অবলম্বন,—তিনি নিজের

অশ্রু লইয়া কতক্ষণ থাকিতে পারেন। মা আমার অশ্রুবারি-পারাবার; কিন্তু নিজের অশ্রু হায় তখনি মুছিলেন। হৃদয়-বেগ হৃদয়ে চাপিলেন। দগ্ধ হৃদয়ের ভস্ম-রাশির মধ্যে নূতন আগুন লুকাইয়া, মা, আবার পর-অশ্রুমোচনে, পর-দুঃখ নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যৌবনে-যোগিনী, পুত্র-শোকাতুরা জননী, বিধবা ব্রহ্মচারিণী দেখ ঐ চিত্ত স্থির করিয়াছেন। পুত্র-শোক, পতি-শোকের পবিত্র মন্দির পার্শ্বে রাখিয়া, অন্নপূর্ণা আবার ঐ অন্ন বিলাইতেছেন!

দুঃখিত হই নাই, মা! বড় সুখী হইয়াছি, সন্তপ্ত হই নাই, মাগো! শান্ত হইয়াছি;—শুনিয়া যে, তুমি এই মৃত্যুময় পৃথিবীতে আর নাই। সুখী হইয়াছি, শান্ত হইয়াছি, মা শুনিয়া, এ জড় জীবনের জ্বালা তুমি জুড়াইয়াছ। মৃত্যুর তাড়না, জীবনের যাতনা আর সহিতে হইবে না, মা! শোকের সুতীক্ষ্ণ সহস্র শলাকা আর ও কুসুম-কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিবে না মা! তোমার জীবন্ত চিতা আশৈশব জ্বলিতেছিল,—যে চিতায় শচী-সন্নিভ সৌন্দর্য্য, দেবতা-দুর্লভ প্রেম, ক্ষীর-নিধি-নিন্দিত স্নেহ, পারিজাত-পরাজয়ী কোমলতা, মধুরতা, যে জীবন্ত চিতায় আশৈশব ধীরে নিঃশব্দে পুড়িতেছিল, পুড়িয়া পুড়িয়া পুড়িয়া আবার পুড়িতেছিল,—পুড়িয়া পুড়িয়াও হায় পবিত্র পরিমলে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিতেছিল, সেই অনন্ত জ্বালাময়ী জীবন-চিতা, মা তোমার আজি নিবিয়াছে। সন্তপ্ত হইব কোন্ প্রাণে মা!

মাগো! দেৱ হইয়াছে! যাও, এখন একটু জুড়াও গিয়া! যে সৎচিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণে শরীর-মন-জীবন যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলে, যাও মা তাঁহার নিকট জুড়াও গিয়া! যে পরব্রহ্মকে তুমি পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে, রূপ যৌবন নারীধর্ম্ম যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলে, মাত! ব্রহ্মচারিণি! তাঁহার নিকট যাইয়া শান্তি সম্ভোগ কর। স্বর্গে-সুরলোকে স্বস্থানে গিয়া বসো মা! আহা, তথায় শোক সন্তাপ বৈধব্য নাই, বিরহের বিষ নাই! তোমার "পুণ্য কর্ম্ম" পূর্ণ, এখন যাও

———স্বামী পাছে
অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত মহামঙ্গল।
অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা তৃপ্তি অনন্ত।
দম্পতি আছয়ে নাহি বৈধব্য ঘটনা,
মিলন আছয়ে নাহি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে নাহি কলহ গঞ্জনা,
রূপ আছে নাহি রিপু দুরন্ত॥

* * * *

সত্যযুগের সাবিত্রী নারীজাতিকে সতী-ধর্ম্ম, বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্যই যেন কলিতে শরৎসুন্দরীরূপে জন্মিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী প্রাতঃস্মরণীয়া।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীর প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী যাঁহারা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি তাহা একত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মহারাণীর একখানি জীবনী প্রণয়ন করেন,—ইহা করাই উচিত ও অত্যন্ত আবশ্যক,—তাহা হইলে দেশের পরম উপকার হয়। উপযুক্ত উপাদান সংগৃহীত হইলে, এরূপ পুস্তক লেখার জন্য বোধ হয় লিপিক্ষম সহৃদয়

লেখকের অভাব হইবে না। পুঁটিয়া রাজ-সংসার-সংশ্লিষ্ট কোন মহাশয় এ বিষয়ে মনোযোগ করুন।

শ্রীঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়।

সাবিত্রী প্রতিবাদের প্রতিবাদ। (১)

গত মাঘ মাসের "নব্যভারতে" বাবু বিজয় চন্দ্র মজুমদার "সাবিত্রী" পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি যথা সময়ে সে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধটী এত অসার যুক্তি ও হীন গালিগালাজে পরিপূর্ণ যে, সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে লজ্জাজনক মনে হইয়াছিল। তাই আমি এতদিন নীরব ছিলাম। কিন্তু অবশেষে ভাবিয়া দেখিলাম, আজকাল জনকয়েক যুবক তাঁহার মত ভ্রান্তমতগ্রস্ত হইয়াছেন; তদ্দ্বারা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধবগণের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব তাঁহারা যে কি বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিলে তাঁহাদের বিশেষ উপকার করা হইবে। তাই আমার এ চেষ্টা।

লেখক ভূমিকার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়কে যে গালাগালি দিয়াছেন, সে সকল কথার সহিত তাঁহার নিজের সম্বন্ধ; সুতরাং সে সকল কথার যৎকিঞ্চিৎ উত্তর উপসংহারে দিব। তিনি "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্য" প্রবন্ধটীর প্রতিবাদে বলিয়াছেন, "প্রবন্ধটী খুব সুন্দর, কিন্তু বড় ছোট। এবিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে একটা প্রকাণ্ড বই হয়" ইত্যাদি! একথাগুলির উত্তর দিবার আবশ্যক নাই; কারণ নব্যভারতের পাঠকমাত্রেই জানেন, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটী সভাস্থলে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে একটী প্রকাণ্ড পুস্তক পাঠকরা যে উন্মাদের কাজ, একথা তাঁহাদিগকে বলা বাহুল্য মাত্র! "আমাদের অভাব" প্রবন্ধটীকে তিনি যে 'অসম্পূর্ণ' বলিয়াছেন, তাহারও কোনও উত্তর নাই। প্রবন্ধের নামেই প্রকাশ হইতেছে, প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ হইবে। ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ কথা; কারণ কোন দেশের যাবতীয় অভাব সেই দেশের একটী লোকের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারেনা। পূর্ণ বাবু সেই জন্যই প্রবন্ধের আরম্ভে লিখিয়াছেন, "সব অভাব বলা হইল না।" তবে সাবিত্রীর বিজ্ঞ পাঠকগণ এটা দেখিতে পাইবেন যে, উক্ত প্রবন্ধে এরূপ অনেক মত ব্যক্ত করা হইয়াছে, সম্প্রতি যে সকল মতের বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

সাবিত্রীর ৩য় ও ৪র্থ প্রবন্ধ "হিন্দুপত্নী" এবং "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য।" এই বিষয় লইয়া অনেক দিন হইতে অনেক বক্তৃতা, তর্কবিতর্ক হইতেছে! এত বচসা, এত বাক্‌বিতণ্ডার মূল কারণ, হিন্দু বিবাহ প্রণালী এবং হিন্দু পতিপত্নীর সম্বন্ধ ইংরেজ

জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই প্রভেদ হইতেই অন্যান্য আপত্তির উৎপত্তি। যদি এ প্রভেদ না থাকিত, এ সকল আপত্তির ঘটা আদৌ উঠিত না। যাহা হউক, উক্ত প্রবন্ধ দুইটীর লেখকের পরিচয়, বোধ হয়, কাহারও নিকট দিতে হইবে না। চন্দ্রনাথবাবু যেরূপ জ্ঞানী ও পরিণামদর্শী এবং দেশের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, প্রবন্ধ দুইটী ঠিক তদুপযোগী হইয়াছে। তিনি মানব জীবনের চরম লক্ষ্য, বিবাহের মূলতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু পরিবারের মূল গ্রন্থি কি, কিসে হিন্দুনারী সর্ব্বজাতীয় নারীর আদর্শস্থল, কেন হিন্দু সংসারাশ্রম অপেক্ষা মনুষ্যত্ব শিক্ষাদায়ক প্রথা আর নাই, কি কারণে হিন্দুনারীর প্রেম জগতে অতুলনীয়,এই দুই প্রবন্ধে তাহা অতি বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। এক কথায়, বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ কেহ লেখেন নাই। যাঁহাদের বিশ্বাস, আত্মচরিতার্থই বিবাহের উদ্দেশ্য, তাঁহারা স্বভাবত আপনাদের পরিতোষই বুঝেন; পত্নী স্বস্ব রুচি প্রকৃতি সম্পন্ন হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। পরোপকারের জন্য, ধর্ম্মোন্নতির জন্য তাঁহারা বিবাহ করেন না, সমস্ত পরিবার বন্ধন দৃঢ় করা, সমস্ত পরিবারের সুখ শান্তি বিধান করা, সমাজ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করা,সমাজের অনিষ্ট দূর করা, সমাজোন্নতি করা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে।

লেখকের একটী ধারণা আছে যে,বিবাহ না করিয়া গৃহস্থাশ্রমী হওয়া যায়, এবং সমাজেরও উপকার করা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রম বলিতে কি বুঝায়, তিনি তাহা জানেন না বলিয়া, এবং চন্দ্রনাথ বাবু যাহার অতি সুন্দর ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়াই, এই বিপাকে পড়িয়াছেন। মনুসংহিতাতে গৃহস্থের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, সে সকল কার্য্য বিবাহ ব্যতীত কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না ; স্ত্রী ব্যতিরেকে গৃহস্থ সমাজের সে সমস্ত মহদুপকার করিতে অক্ষম। আজ কালকার বিলাতী নীতি দেখিয়া বিচার করিলেও বুঝিতে পারা যায়, অবিবাহিত যুবকের জীবন শীঘ্র এবং সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, চরিত্র গঠিত হইতে পারে না, সৎবৃত্তিনিচয় অচিরে শুকাইয়া যায়, দুর্দ্দমনীয় রিপু প্রবল হইয়া জীবন পাষাণবৎ করিয়া তুলে। তখন সে সমাজের ভীষণ অনিষ্ট করিতে থাকে। আগে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তারপর সমাজের উৎপত্তি হয়। বিবাহ ব্যতীত সমাজ গঠিত হইতে পারে না, সমাজের উন্নতি ও পূর্ণতাসাধন হয় না। বিবাহ ব্যতীত, মানুষ, মানুষ হইতে পারে না। তাই সকল দেশেই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। যে সকল দেশে আমাদের মত গৃহস্থাশ্রম নাই এবং যে সকল দেশের অধিবাসীগণ ধর্ম্ম সাধনার্থ বিবাহ করেন না,' তাঁহারাও স্বেচ্ছাচারিতাকে ভয় করেন ও ঘৃণা করেন। চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, "বোধ হয়, হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহই ধর্ম্মচর্য্যা,সমাজসেবা ও পরোপকারের জন্য দার পরিগ্রহ করে নাই ও করে না।" লেখক পাশ্চত্য রীতি নীতিপ্রিয়তা দেখাইতে গিয়া বলিতেছেন, "খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিবাহ বিষয়ক এইরূপ মত ও উপদেশের কথা ছাড়িয়া দি। বহু শতাব্দী পূর্ব্বের অখ্রীষ্টীয়ান, Stoic কুলোজ্জ্বল মার্কাস অরিলাস' এণ্টোনিনাসের কথা কি চন্দ্রনাথ বাবুর

মত পণ্ডিত ব্যক্তি ভুলিয়া গেলেন ?" তিনি অনুগ্রহ করিয়া কি নব্যভারতের পাঠক-বর্গকে এবং আমাকে সেই ব্যবস্থাগুলি দেখাইতে পারেন ? খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের কোথাও বলে না, "ধর্ম্মচর্য্যা, সমাজ সেবা ও পরোপকারের জন্যই বিবাহ করিতে হয়।" আর অরিলাস এণ্টোনিনাসের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এই জিজ্ঞাস্য যে, সেই মহাত্মার মতে রোমকেরা চলিয়াছিল কি ? কেবল ব্যক্তিবিশেষের মতে কোন কার্য্য হয় না ; দেশশুদ্ধ লোক ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য ভাবিয়া অবনত মস্তকে না পালন করিলে ত বলিতে পারিব না, অমুক দেশে অমুক মত প্রচলিত ছিল। দেখা যায়, প্লেটোর কোন কোন মত বেদান্তের সহিত মিলে ; তাই বলিয়া কি বলিব, প্লেটো অথবা গ্রীকেরা বেদান্ত ধর্ম্ম জানিতেন ? রোম বা গ্রীসে সেরূপ হয় নাই ; ভারতবর্ষে ঐ মত আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টিয়ান জীবন ও হিন্দুজীবন পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বিজয়বাবু নিজের ইতিহাসাভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া নিজেই ঠকিলেন। তাঁহার মত কেহ কেহ এইরূপ বৃথা পাণ্ডিত্য দেখাইয়া থাকেন।

বিজয়বাবু বলেন, "ধর্ম্মের অর্থ সাধারণ সীমায় দাঁড়াইয়া বুঝিতে গেলে এইরূপ বুঝি যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য যাহা, আদর্শ যাহা, কর্ত্তব্য যাহা, তাহারই সাধনের নাম ধর্ম্মসাধন।" প্রথমে "সাধারণ সীমা" কথার অর্থ কি, তাহা ত বুঝা গেল না। সুতরাং সাধারণ সীমায় দাঁড়াইয়া মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, কর্ত্তব্য কি, কিরূপ বুঝিব ? তবে তিনি যেন এইটুকু বুঝেন, তাঁহার কাছে মানবজীবনের যাহা উদ্দেশ্য, আমার কাছে বা আর কাহার কাছে তাহা হইতে পারে না। তাঁহার আদর্শ এক, আমার বা আর কাহারও আদর্শ অন্যরূপ। তিনি যাহাকে কর্ত্তব্য বলেন, আমি তাহাকে অকর্ত্তব্য বলিতে পারি। মনুষ্য ভেদে, দেশ ভেদে, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্ত্তব্য বিভিন্ন প্রকারের। তিনি বলেন, "সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম, জীবন বিজ্ঞানের মীমাংসায় স্থিরীকৃত হইবে।" 'জীবন বিজ্ঞান' কথাটা কোন্ অভিধানে আছে, এবং তাহার মীমাংসাই বা কিরূপ, তিনি বলিতে পারেন কি ? "যে কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে মত ভেদ দৃষ্ট হইবে, সেগুলিও মতগত সূক্ষ্ম কথার বিচার ছাড়িয়া দিলে ব্যবহারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়।" এ কথাগুলির অর্থ কি ? কোনও বঙ্গভাষাজ্ঞ, বোধ হয়, একথাগুলির অর্থ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন যে, "হিন্দু বিবাহ ধর্ম্মের জন্য।" বিজয়বাবু তাহা অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মের উপরোক্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চন্দ্রনাথবাবু হিন্দু বিবাহের আলোচনা করিয়াছেন ; সুতরাং সেই হিন্দুজাতি ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝেন, তাহাই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দু বিবাহ ধর্ম্মের জন্য।" হিন্দুর জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্ম। হিন্দুর "আচার ধর্ম্ম, ব্যবহার ধর্ম্ম, আহার ধর্ম্ম, উপাসনা ধর্ম্ম, ব্রত ধর্ম্ম"—প্রত্যেক কার্য্য, জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ধর্ম্ম। তাই শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু এক স্থলে বলিয়াছেন, "For Religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispence with the necessity of a name * * * To the Hindu his whole life was Religion. To other peoples,

their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life are incapable of being so distinguished."

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা হিন্দুজীবনের প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠানাদির যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, অর্থাৎ হিন্দুর পক্ষে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্পাদনের জন্য তাঁহারা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই সকল হিন্দুসমাজ গঠনকর্ত্তার মত বিবাহ দ্বারা হিন্দুসমাজের সেবা হইবে, এবং সেই জন্য তাঁহারা হিন্দুবিবাহ প্রণালী অন্য সকল জাতির বিবাহ প্রণালী হইতে বিভিন্নরূপ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাঁহারা আমাদের বিবাহ প্রণালীর আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন অগ্রে হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝিতে বিশেষ যত্ন করেন।

ইহার পর লেখক কতক স্থলে এমন কথা বলিয়াছেন, যাহা চন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ দুইটীতে নাই। কল্পনা করিয়াও লওয়া যায় না। তথাপি পাঠকবর্গকে তাঁহার জীবনের আদর্শ কি, দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার কতকগুলি কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। "তবে যদি এ কথা বলা যায় যে, স্ত্রী জাতির মধ্যে এমন সকল গুণ আছে, যাহা আমাদের লাভ করা উচিত। এবং না করিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না, তাহা হইলেও সিদ্ধান্ত হয় না যে বিবাহই প্রয়োজনীয়।" কেবল চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত যে এসকল কথার কোনও সম্বন্ধ নাই, এরূপ নহে,—ইউরোপ, আমেরিকা, এসিয়া—পৃথিবীর কোন অংশের অধিবাসীরা বলেন না যে, স্ত্রীর গুণ পুরুষে গ্রহণ করিবে বলিয়া, এবং কাজেই পুরুষের গুণ স্ত্রী গ্রহণ করিবে বলিয়া মনুষ্য জাতি মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত। আজ বিজয় বাবু মানবমনে একটী নূতনভাব প্রবেশ করাইলেন। তারপর তিনি বলিতেছেন "বন্ধুত্বসূত্রে সম্বন্ধ হইয়া অনেকানেক স্ত্রীলোকের হৃদয়গত মহত্বও সঞ্চয় করিতে পথ পাইতে পারি। আমার এই শেষ কথায় যদি কেহ অপবিত্রতার আশঙ্কা করেন, তবে আমি তাঁহাকে যে কি ভাষায় তিরস্কার করিব, তাহার অনুসন্ধান জন্য অভিধানের পৃষ্ঠা উল্টাইব।" আমি একথাগুলিতে কোন মতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের একটী প্রবাদ আছে, "ঠাকুর ঘরে কে, না আমি কলা খাইনে;" বিজয় বাবুর কথাতে আমার সেই প্রবাদটী মনে পড়িতেছে। তাই বলি, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আর লোকের চক্ষে ধূলি দিবার প্রয়াস কেন? আপনার এ কথা কয়টীর উত্তর দিয়া আপনার অভিধানের যাবতীয় তিরস্কার শুনিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। যদি নিতান্তই রাগ সামলাইতে না পারেন, তবে ফাল্গুন মাসের নব্যভারতের "যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" নামক প্রবন্ধ লেখককে যত পারেন, তিরস্কার করিবেন।*

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত।

---

*স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এই প্রবন্ধটী একবারে প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। একবারে প্রকাশ না করায় প্রস্তাবের সৌন্দর্য্য কিছু খর্ব্ব হইল, কিন্তু কি করি, উপায় নাই। প্রস্তাব-লেখক এবং পাঠকগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। ন, স।

বিল্বমঙ্গল।

মানব-হৃদয় যে প্রেমের বন্ধনে আজীবন আবদ্ধ, যোগী ঋষিগণ যে প্রেমের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নিবিড় কাননে পর্ব্বতগুহায় সমাধি লাভ করেন, উদাসী সন্ন্যাসী যে প্রেমে পাগল হইয়া দিনপাত করেন, বিল্বমঙ্গল সেই প্রেমের দাস, প্রেমিক বৈরাগী পাগল সন্ন্যাসী, তাঁহার আদর্শ প্রেমের ছবি নির্নিমেষ নয়নে দর্শনীয়।

বিল্বমঙ্গল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সন্তান, যৌবন আরম্ভেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দুর্ভাগ্যই বল, সৌভাগ্যই বল, আর কর্ম্ম ফলই বল, তিনি চিন্তামণি নামক একটী বারবনিতাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা জগতে দুর্লভ, অতি উচ্চ, অতি পবিত্র ও স্বর্গীয়।

পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন যখন তিনি চিন্তামণির নিকট বিদায় লইয়া আসেন। তখন বলিয়াছিলেন যে, আবার আমি কাল নিশ্চয় আসিব। পরদিবস শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন হইল, বাড়ীতে মহা সমারোহ, শত শত লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে কুলপুরোহিত সমীপে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিল, তিনি যথারীতি পাঠ করিতে লাগিলেন। সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন, চিন্তামণির নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল, অমনি খোলা ডোঙ্গা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, পিতৃপিণ্ড গড়াগড়ি যাইল। তিনি পুরোহিতকে বলিলেন, মহাশয়, আপনি শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপন করুন, আমি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, আমি চিন্তামণির নিকট যাইতেছি। আত্মীয় বন্ধুরা কত বুঝাইল, কত বিনয় করিল; কিন্তু কে বুঝে? বিল্বমঙ্গল বলিলেন, তোমরা আমাকে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিও না, আমি কিছুতেই থাকিব না। আজ যদি চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যায়, পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যায়, তবু আজি আমি চিন্তামণির নিকট যাইব। এ জগতে এমন কি আছে, এমন কে আছে, যে আমাকে বাধা দিতে পারে? এই বলিয়া বিল্বমঙ্গল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বাড়ীর বাহির হইলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখেন, আর বেলা নাই, জগৎ যেন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কি এক বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইল, সূর্য্যদেব নদীর বুকে মাথা লুকাইল, সাঁঝের গগনে ঘোর কাল মেঘে ছাইয়া চাঁদের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশ-বিজনে বিজলি খেলিতে লাগিল, চারিদিক হইতে সন্ সন্ করিয়া গাছপালা কাঁপিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল দেখিলেন, ভয়ানক ঝড় আসিতেছে। দৌড়িয়া নদীকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভয়ঙ্কর ঝড় আরম্ভ হইল, নদী সোঁ সোঁ করিয়া ভীষণ রবে গর্জ্জিয়া উঠিল, বড় বড় বৃক্ষ সকল মড় মড় শব্দে চুরমার হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল, মেঘের গর্জ্জনে, নদীর তর্জ্জনে, ঘোর

আঁধারে নদীকূলে দাঁড়াইয়া বিল্বমঙ্গল তখন শুধু সেই মুখখানি চিন্তা করিতেছেন। নদীতে নৌকা রাখা অসাধ্য হইয়াছে, মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া প্রাণভয়ে সকলেই পারে উঠিয়াছে। পার করিবার জন্য বিল্বমঙ্গল বড়ই অনুনয় বিনয় করিলেন, তাহারা পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। নদীতে তুমুল তুফান উঠিয়াছে, এখন কি করি, কেমন করিয়া পার হই, এই ভাবিয়া বিল্বমঙ্গল পাগলের ন্যায় চারিদিকে ছুটিতে লাগিলেন। এমন পাগলামি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?

জলস্রোতের সম্মুখে বাধা পড়িলে যেমন জলের বেগ সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে, আজ এই গভীর আঁধারে, ঘোর দুর্য্যোগে বিল্বমঙ্গলের নদী পার হইতে যেমন বাধা পড়িল, অমনি তাঁহার গভীর ভালবাসার উচ্ছ্বাস আরো শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। নদীকূলে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "আজি যদি চিন্তামণিকে দেখিবার জন্য এ তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমি তাহাও করিব," এই বলিয়া "হা চিন্তামণি ! হা চিন্তামণি !" করিতে করিতে সেই গভীর আঁধারে ঘোর গর্জ্জনে ভীষণ তরঙ্গায়িত সেই অকূলপাথারে বিল্বমঙ্গল ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। এই উদ্বেলিত ভালবাসার সীমা কোথায়, তুলনা কোথায় ? সাধক বিল্বমঙ্গল প্রেমিকের শিরোমণি, চিন্তামণি সতী কি কলঙ্কিনী দেখিবার আবশ্যক নাই, তুমি কি তোমার দেবতার গুণাগুণ বিচার করিয়া থাক ? তোমার ও বিল্বমঙ্গলের ভালবাসায় প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নত্ব নাই, কেবল দেখিতে হইবে, এই ভালবাসা হইতে মোক্ষ কত দূরে।

যখন চিন্তামণি-নাম জপ করিতে করিতে বিল্বমঙ্গল ঝাঁপ দিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, তখনও মুখে কেবল চিন্তামণি। চিন্তামণি ধ্যান, চিন্তামণি জ্ঞান, এক চিন্তামণির চিন্তা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। যখন নদী স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন, জীবনের আর আশা নাই, তখনও চিন্তামণিকে যে হারাইতে হইবে, এই ভাবনায় মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল। যমকে কে ভয় করে ? কিন্তু সেই মুখখানি যে আর দেখিব না, তাহাকে যে ভুলিতে হইবে, কোমলতার কঠোর শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইবে এইত কষ্ট, পিছনদিকে চাই আর একবার করিয়া চোখ মুছি। শেষ চক্ষু বুজাইয়া মায়ের কোলে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ি। যদি ভালবাসিবার কেহ না থাকিত, এ তুচ্ছ জীবন ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিতাম। সেই এক মাধ্যাকর্ষণের বাঁধুনিতে এখনও ঘুরিতেছি। যে দিন সেই বন্ধন কাটিবে, কোথায় ছট্‌কাইয়া পড়িব, কে জানে ?

নদী স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বিল্বমঙ্গল দেখিলেন, একখণ্ড কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া তিনি অতি কষ্টে নদী পার হইলেন। কোনও প্রকারে অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, চিন্তামণির বাটীর দ্বারবদ্ধ রহিয়াছে। যে মহা ঝড়ে পশু পক্ষী আপন স্থান ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে সাহস পায় না, সেই বিষম গভীর রজনীতে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে বিল্বমঙ্গল নদী পার হইয়া আসিবে, এ সম্ভাবনা কি চিন্তামণির হৃদয়ে একবারও স্থান পাইয়া ছিল ? না। তাঁহার

গভীর ভালবাসা কেহ কি বুঝিয়াছিল? না। বিল্বমঙ্গল নদী পার হইয়া অন্ধকারে চিন্তামণির বাড়ীর প্রাচীর হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, তখনও ঝড় থামে নাই, অন্ধকার টুটে নাই, নদী তেমনই সোঁ সোঁ করিতেছে, বিদ্যুৎ তেমনি চমকিয়া চম্‌কাইতেছে। সেই আঁধারে বিল্বমঙ্গল দেয়াল হাতড়াইয়া দেখিতেছেন, কোন কিছু মিলে কি না, যাহা ধরিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন। অতি কষ্টে বাগানের ভিতর নারিকেল গাছের নিকট দেয়ালের গায়ে একখণ্ড দড়ী ঝুলিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। সেই দড়া ধরিয়া দেয়াল ডিঙ্গাইয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, এ কি! বলিয়া চিন্তামণি শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল; আমি কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি? অথবা বিল্বমঙ্গল কি ভয়ানক লোক। এই ভয়ানক তুফানে নদী তোলপাড় করিতেছে, লোকে ঘরের বাহির হইতে পারে না, আর এ কেমন করিয়া নদী পার হইয়া আসিল। ইহার গাত্র হইতেই বা এমন ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে কেন? তখন বিল্বমঙ্গল অচৈতন্য হইয়াছে দেখিতে পাইল এবং অনেক যত্ন করিয়া সচৈতন্য করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "বিল্বমঙ্গল! তুমি সত্য সত্যই কি পাগল হইয়াছ? ভয়ঙ্কর রজনীতে নদীতে যে তুফান উঠিয়াছে, তুমি কেমন করিয়া পার হইলে? তুমি কি কাল বাড়ী যাও নাই? আমার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য এখানে কোথাও লুকাইয়া ছিলে? এ সময়ে নদী পার হওয়া মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে।" এই বলিয়া চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করিতে লাগিল। তখন বিল্বমঙ্গল বলিল "চিন্তামণি! তুমি জান না যে আমি তোমাকে কত ভালবাসি। কাল আমি বাড়ী গিয়াছিলাম, কিন্তু বাবার শ্রাদ্ধ দিন বলিয়া আজ আসিতে বিলম্ব হইল। যখন তাঁহার পিণ্ডদান করিতে ছিলাম, তখন সহসা তোমার নাম মনে পড়িল, অমনি সেই পিণ্ড ফেলিয়া শ্রাদ্ধ সমাপন না হইতেই আমি ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হই, নদী তীরে আসিয়া দেখি, তুমুল ঝড় উঠিয়াছে, তখন আর অন্য উপায় পাইলাম না, মাঝিরা পার করিল না, তখন তোমারি নাম স্মরণ করিয়া অকূল-সাগরে ঝাঁপ দিলাম, প্রাণ যায় যায় হইয়াছে এমন সময়ে একটুক্‌রা কাঠ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই টুকু আশ্রয় করিয়া নদী পার হইলাম! তোমার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া অনেকক্ষণ হাতড়াইয়া দেখিলাম, প্রাচীরের উপর একটী দড়ি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সেই দড়ি ধরিয়া দেয়াল ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি।"

তখন ধীরে ধীরে ঝড় আসিতেছিল, নদীর তর্জ্জন মেঘের গর্জ্জন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল, পৃথিবী শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যেন নীরবে ঘুমাইয়া পড়িল, আকাশে জ্যোৎস্না ফুট ফুট করিতে লাগিল। ভাঙ্গা চুরা মেঘের আড়ালে লুকাইয়া এক আধটী তারকা মিটি মিটি চাহিয়া সেই গভীর রজনীর নীরব নিস্তব্ধতায় মধ্যে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথোপকথন শুনিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জগতের

কি পরিবর্ত্তন? মনোজগতেও কি এইরূপ হয়? দেখা যাইবে।

চিন্তামণি তখনও আকুল প্রাণে ভাবিতেছে, বিল্বমঙ্গল কি সত্য সত্য আমাকে এত ভালবাসে? এ কখনও সম্ভব নয়। এ আমাকে প্রতারণা করিতেছে। এত ভালবাসা মানুষে যে দুর্লভ। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হয় না। এই ভাবিয়া চিন্তামণি বলিল "তুমি কেমন কাঠ ধরিয়া ভাসিয়া আসিয়াছ আমাকে দেখাইবে চল।" তাহাকে সঙ্গে করিয়া প্রান্তরে লইয়া বিল্বমঙ্গল দেখাইয়া দিল। চিন্তামণি নিকটে যাইয়া শিহরিয়া উঠিল—"ওমা কি ভয়ানক! এ যে মরা মানুষ। কাঠ কোথা?" বিল্বমঙ্গল বলিল "ঐ কাঠ বক্ষে ধরিয়া নদী পার হইয়াছি, ও কি তা আমি জানিনা। তখন চিন্তামণি সেই দড়ি দেখিতে চাহিল, বিল্বমঙ্গল দূর হইতে দেখাইয়া বলিল ওই নারিকেল গাছের কাছে সে দড়ি ঝুলিয়া রহিয়াছে। চিন্তামণি নিকটে যাইয়া দেখিয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! সে দড়ি নয় ভীষণ অজাগর!!

এতক্ষণে চিন্তামণির মোহ ভাঙ্গিল, চৈতন্য হইল। তিনি বিল্বমঙ্গলকে ডাকিয়া বলিলেন, "বিল্বমঙ্গল! তুমি সত্য সত্য পাগল হইয়াছ, নচেৎ শবকে কাষ্ঠ বলিয়া বক্ষে ধারণ করিবে কেন?" বিষধর অজাগরকে দড়ি বলিয়া ভুল করিবে কেন? বিল্বমঙ্গল বলিল "চিন্তামণি আমি পাগল সত্য, কিন্তু কিসের পাগল? তোমার প্রেমে পাগল, তোমাকে ভালবাসিয়া পাগল, তুমি আমাকে চিনিলে না, আমার ভালবাসা বুঝিলে না, নতুবা এত অবিশ্বাস করিতে না। আমি জানি না, তুমি দেবী কি রাক্ষসী, তুমি যাই কেন না হও, আমার চক্ষে তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।" রাক্ষসী চিন্তামণি এইবার দেবত্ব লাভ করিল। সে গলবস্ত্র হইয়া বলিল, বিল্বমঙ্গল, তুমি আমাকে অমর করিলে, তোমার প্রেমে আমি সে অমরত্ব ত্যাগ করিব। তুমি যে প্রেম আমাকে দিয়াছ, আমাকে বঞ্চনা করিয়া এ প্রেম যদি হরিপদে দাও তবে তোমার মুক্তি হইবে।" চিন্তামণি সতী না কলঙ্কিনী? দেবী না রাক্ষসী?

কর্ষিত ক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ রোপিত হইল। চিন্তামণির এই এক কথা হইতেই বিল্বমঙ্গলের দিব্য জ্ঞান জন্মিল, দিব্য চক্ষু লাভ হইল। সে দিন হইতে চিন্তামণির সহিত বিল্বমঙ্গলের আর কোন সম্বন্ধ রহিল না, এক উদ্যমে বিষম বন্ধন ছিন্ন হইল। তিনি বাড়ী ঘর সব ছাড়িয়া এক হরিনাম সহায় করিয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু যেরূপ লালসায় এত কাল তিনি মত্ত ছিলেন, চিন্তামণিকে ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দুদিনে তাহা ফুরাইল না। সংসার ছাড়িলেই লোকে সন্ন্যাসী হয় না। যে জীবন্ত অতুল রূপরাশির মধুর মূর্ত্তি নিয়ত হৃদয়ে ধ্যান করিতেন, এক দিনে তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া কাল্পনিক হরিপদে সেই প্রেম সেই ভালবাসা এক দিনে সমর্পণ করা, ইহা কি মনুষ্য-সাধ্য? সম্ভবপর? সন্ন্যাসী হইলেও বিল্বমঙ্গলের রূপলালসা এক দিনে নিবিয়া যায় নাই। গভীর অতলস্পর্শ সাগর জলে এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে সাগর-জল যেমন একটু কাঁপিয়া উঠে, বিল্বমঙ্গলের অসাধারণ হরিভক্তি [illegible] একবার টলিয়াছিল।

গৃহত্যাগী বৈরাগী এক দিন এক ধনবান বণিক-পত্নীর অসামান্য রূপে চমকিত ও বিচলিত হন। মুগ্ধ হইয়া তিনি বণিক-গৃহে উপস্থিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার স্ত্রীর রূপরাশি দেখিয়া আমার চিত্ত বিকল হইয়াছে। আমি আর একবার তাহাকে দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক করিতে আসিয়াছি।" ধর্ম্মপরায়ণ বণিক কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, আমি অতিথিকে কখন বিমুখ করি নাই, করিব না; একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার মোহিনীকে এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।" গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া সহধর্ম্মিনীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! আজ তোমার অগ্নিপরীক্ষার দিন উপস্থিত, হৃদয়ে বল ধারণ কর, স্বামীর ধর্ম্ম পালনের জন্য প্রস্তুত হও, একজন ভিখারী ব্রাহ্মণ তোমার অতুল রূপরাশি দেখিয়া একেবারে মত্ত হইয়া আমার নিকট তোমাকে ভিক্ষা চাহিয়াছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব।" ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা কি মহাধর্ম্মের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে?

পতিপরায়ণা স্বামিনী বাতাহত কদলীর ন্যায় স্বামীপদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। স্বামী ভিন্ন জগতের আর কিছু যে তিনি জানেন না, অন্য পুরুষের কখনও মুখদর্শন করেন না; বরঞ্চ চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি ব্রাহ্মণের আশ্রয় লইতে পারিবেন না। বণিক অকম্পিতকণ্ঠে অতি মধুর ভাবে কহিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি ত জান অতিথিসৎকারে আমি কখনও বিমুখ হইতে পারি না; যদি সত্যই আমাকে ভালবাস, আজ স্বামীর ধর্ম্মপালনে কদাপি বিমুখ হইও না। তোমার গভীর ভালবাসার আদর্শ দেখাও।" এই বলিয়া বিল্বমঙ্গলকে আনিয়া বলিলেন, "এই আমার স্ত্রী আজি হইতে আপনার দাসী হইলেন, আমি চলিলাম।" কর্ণ অতিথি সেবায় পুত্রকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বণিক স্ত্রীকে উৎসর্গ করিলেন, উভয়ের মধ্যে কে বড়?

তখন বিল্বমঙ্গল বলিলেন "আমি যে অতুল রূপরাশি দেখিয়া পাগল হইয়া তোমার স্বামীর নিকট তোমাকে ভিক্ষা চাহিয়াছি, এখন সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে কেন? মুখের কাপড়খানি সরাইয়া দাও, আমি বিষম তৃষিত চক্ষুর লালসা পূর্ণ করি।" পলকের জন্য মুখের আবরণ সরাইয়া মোহিনী প্রতিমা সম্মুখে দাঁড়াইল। বিল্বমঙ্গল একবার চাহিয়া বলিলেন "আমার বাসনা তৃপ্ত হইয়াছে। আমার আর এক প্রার্থনা। তোমার কবরী হইতে দুটী লৌহকণ্টক বাহির করিয়া দাও।" সেই দুইটী শলাকা লইয়া বিল্বমঙ্গল আপনার দুটী চক্ষু বিদ্ধ করিয়া জন্মের মত অন্ধ হইলেন এবং বণিকপত্নীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া বাহির হইলেন।

আজ লৌহকণ্টকে বিল্বমঙ্গল চক্ষের লালসা প্রাণের বাসনা উৎপাটন করিলেন। এতকাল যে জীবন্ত প্রতিমার চরণতলে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এক দিনে কাল্পনিক হরিপদে সে প্রেম সে ভালবাসা সে উচ্ছ্বাস সে আবেগ বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন কেন? যেমন পরীক্ষা তেমনি পরীক্ষিত, মহাপ্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হইলে যে পশ্চাৎপদ হয়, সে কাপুরুষ। যে যত মহান যত উচ্চ, তাহাকে সেই পরি-

মাণে ভাল বাসিতে না পারিলে, সেই পরিমাণে উন্মত্ত ও ব্যাকুল না হইলে তাহার ভালবাসা পাওয়া যায় না। একজন মনুষ্যকেও যদি আমরা প্রকৃত ভালবাসিতে পারি, তাহার জন্য জীবন তুচ্ছ করিয়া দুরন্ত নদীতে ঝাঁপ দিতে পারি, তবেই ঈশ্বরের জন্য চক্ষু দুইটা উৎপাটন করা সহজ হইয়া আসে। যে জীবন্ত মূর্ত্তিময়ী প্রতিমাকে ভাল বাসিতে শিখে নাই, সে অদৃষ্ট দেবতার প্রেমে পাগল হইবে, এ কথা সত্য নহে।

বিল্বমঙ্গল চক্ষুহীন হইয়া অতি দীন ভাবে পথে পথে হরিনাম গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এত দিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন, চিন্তামণিকে যে ভালবাসা দিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভালবাসা ও ব্যাকুলতা না দিলে পরম চিন্তামণিকে পাইবেন না। এই অবধি বিল্বমঙ্গল আর এক উচ্চতর সোপানে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। "হা হরি! কোথা দেখা দাও", এই বলিয়া দিবা নিশি কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মানুষে যাহা পারে, বিল্বমঙ্গল তাহা করিলেন, অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা দৈবকৃপা ভিন্ন ঘটে না।

বিল্বমঙ্গল যখন হরিনাম জপ করিয়া বনে বনে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, দৈবাৎ এক দিন এক রাখাল বালকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। সেই দিন হইতে সেই বালকটী তাঁহার সহায় হয়। সে অন্ধ ব্রাহ্মণের হাতটী ধরিয়া অতি যত্নে অতি সাবধানে পথ দেখাইয়া দিত। ক্ষুধা পাইলে আহার যোগাইত, যেখানেই থাকুক না কেন বিল্বমঙ্গল ডাকিলেই সে আসিয়া উপস্থিত হইত। ধর্ম্মের কঠোর পথে কোমলতা কি প্রীতি বন্ধক? না সহায়? চিন্তামণিকে ছাড়াইয়া, রূপলালসা বিসর্জ্জন করিয়া বিল্বমঙ্গল এখন এই বালকের প্রেমে এমনি মগ্ন হইলেন যে, এক দণ্ড তাহার কাছ ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। অথবা বুঝি কোমলতার চূড়ান্ত না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এক দিন একান্তচিত্তে বিল্বমঙ্গল হরির ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন, তখনও দেখেন সম্মুখে সেই রাখাল বালক। বিল্বমঙ্গলের জ্ঞান চক্ষুও অন্ধ, তাই বুঝিতে পারেন নাই যে, মনোমোহন বালকটী কে? ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "হায় আমার এ কি দশা হইল! সংসার ছাড়িলাম, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিলাম, এমন মহাধন চক্ষু তাহাও বিদ্ধ করিলাম, অবশেষে এই রাখাল বালকের ভালবাসায় জড়িত হইয়া পড়িলাম! এ নরাধমের কি স্থান কোথাও নাই? রাখাল, তুই কি অবশেষে আমার সর্ব্বনাশ করিবি? আমি যে তোকে ভুলিতে পারি না, আর হরিকে কেমন করিয়া পাইব? তোর কথা কানে গেলে আমার প্রাণ যে শিহরিয়া উঠে।" রাখাল বলিল, ভাই! কে জানে তোর জন্য আমার প্রাণটাও কেমন করে। তুই যে আমাকে 'বড় ভাল বাসিস্, তাই তোর ডাক শুনেই তোর কাছে ছুটে আসি। চল্ বৃন্দাবনে যাই, সেখানে গেলে হরিকে দেখিতে পাইবি।" বিল্বমঙ্গল বলিল "তুই পাগল, আমি যে অন্ধ, হরিকে কেমন করিয়া দেখিব?" রাখাল বলিল "যে ভালবাসে সেই হরিকে দেখিতে পায়।" এই বলিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে সে বিল্বমঙ্গলের হাত ধরিয়া বৃন্দাবনে চলিল। এক দিন পথে রাখাল বিল্বমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি তাহাকে অধিক

ভালবাসেন, কি হরিকে অধিক ভাল বাসেন। বিল্বমঙ্গল এ কথার একটা স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন নাই।

বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গলকে লইয়া রাখাল কত খেলা করিত, কত মিষ্ট কথা মধুর গান শুনাইত। কিছুতেই বিল্বমঙ্গলের তৃপ্তি হইত না। তিনি কেবলই বলিতেন, "কৈ রাখাল, আমাকে হরি দেখাইলে না? কোথা হরি আমাকে দেখা দেও" আর অন্ধ নয়ন হইতে দরদর জলধারা বহিত। অনেক অনুনয়ে রাখাল বলিল "সত্য সত্য কি হরি দেখিবে? তবে এই দেখ" এই বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ছদ্মবেশ ছাড়িয়া ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিলেন।

হাতে নিয়ে মোহন বাঁশী, অধরে মধুর হাসি
চূড়ার উপর ময়ুর পাখা তাতে রাধার নামটী লেখা
চরণে চরণ থুয়ে, ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে,
দাঁড়াইল মোহন মূরতী।

তখন বিল্বমঙ্গলের চক্ষু দান হইল, সমস্ত বৃন্দাবন রূপে ঝলমল করিতে লাগিল, বিল্বমঙ্গলের চক্ষু ঝলসিতে লাগিল। হঠাৎ পিছন হইতে রাখাল বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন বিল্বমঙ্গল, তোমার হরি দেখা হলো তো? আমি ত বলিতেছিলাম যে, বৃন্দাবনে আসিলে হরিকে দেখা যায়।" বিল্বমঙ্গল বুঝিলেন, বালক কে, তখন তার চরণে পড়িয়া বলিলেন, "হে ভক্ত বৎসল! ওই চরণতলে চিরদিন স্থান দিও।"

ওদিকে চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে হারাইয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। রাখাল বালক তাহাকেও সহায়তা করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া আসিল, বণিক ও বণিকপত্নী আসিয়াও উপস্থিত হইল। তখন ভক্ত-বৃন্দ মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য যুগল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। সকলে গাইতে গাইতে অনন্তের পথে চলিয়া গেল।

আজি বৃন্দাবন মাঝে
যুগল রতন রাজে
রতন ভূষণে কেমন সেজেছে মধুর সাজে।
হাতে নিয়া মোহন বাঁশী
অধরে মধুর হাসি
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু চরণে নুপুর বাজে।
সবে আজ হৃদয় ভরি
বলরে হরি হরি
রতন আসনে আজ কেমন সেজেছে;
আজি বৃন্দাবন মাঝে
হরি নামের বীণা বাজে
সবে হরি পদে মজ আজি এমন দিন আর হবে না যে।

ভক্ত-মালার কয়েকখানি কঙ্কাল লইয়া কবি গিরীশচন্দ্র ফুৎকারে কি অপূর্ব্ব সুন্দর সৃষ্টি করিয়াছেন। বনিয়ানের যাত্রিকের গতি বিল্বমঙ্গল হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

পালরাজগণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাগলপুরের তাম্রফলকের তারিখ ৯ বৈশাখ ১৭ সম্বৎ।

দিনাজপুর নগরীর প্রায় ২০ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে বোদাল নামক একটী স্থান আছে। প্রথমাবস্থায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটী কুটী তথায় বিদ্যমান ছিল। বোদাল পত্নীতলা পুলিষ ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে—পূর্ব্ব উত্তর কোণে অবস্থিত। এই স্থানটী বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমার নিকটবর্ত্তী। ইহার অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মঙ্গলবাড়ীর জঙ্গলের নিকট একটী প্রস্তর স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের নিকটে হরগৌরীর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মন্দির ও স্তম্ভ সমসাময়িক কিনা বলা যায় না। প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেবমন্দিরের নিকটেই একএকটী গুরুড় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বোধ হয় সেই প্রথমানুসারে এই মন্দিরের দ্বারদেশ সমীপে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। ইহার শীর্ষদেশে একটী প্রস্তরের গুরুড় মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। শুনা যায় বজ্রপাতে সেই গুরুড় মূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছিন্নশীর্ষ তাল তরুর ন্যায় কেবল স্তম্ভটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লোকে তাহাকে ভীমের পান্টি (লাটী) বলে। বিগত শতাব্দীর অন্ত ভাগে (১৭৮০ খৃঃ অঃ) সার চার্লস উইলকিন্স সাহেব যৎকাল বোদালের কুঠীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, সেই সময় তিনি এই স্তম্ভ গাত্র খোদিত লিপির মর্ম্মোদ্ধার করিয়া আনয়ন করেন। পরে তাহার ইংরেজি অনুবাদ তিনি এসিয়াটিক রিছার্চ্চের প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২ বৎসর অতীত হইল ওয়েষ্টমেকট্ সাহেব যৎকালে দিনাজপুরের মেজেষ্ট্রেট্ ছিলেন সেই সময় পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহার পাঠোদ্ধার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ অনুসারে বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। উইলকিন্স কিম্বা চক্রবর্ত্তী মহাশয় কেহই খোদিত লিপি সম্পূর্ণ ভাবে পাঠ করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে কতকগুলি অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা নিম্নে এই স্তম্ভ লিপি প্রকাশ করিব। তাহার সারাংশ এই রূপ—

শাণ্ডিল্য গোত্রে বীরদেব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তদ্বংশে পঞ্চাল জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পুত্র গর্গ। ইনি বৃহস্পতির ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী-ছিলেন। "সাধ্বী, বিমলহৃদয়া, প্রেমময়ী" ইচ্ছাদেবী তাহার পত্নী ছিলেন। ইচ্ছাদেবীর গর্ভে সচিবপ্রবর গর্গের এক নিরুপম পুত্র জন্মে। এই শিশু শ্রীদর্ভপাণি আখ্যা প্রাপ্ত হন। উত্তর কালে এই দর্ভপাণি মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেবের মন্ত্রী স্বরূপে এই বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাহার মন্ত্রণাশক্তি প্রভাবে বীরচূড়ামণি দেবপাল পার্ব্বতীয় পিতার (হিমালয়ের) পাদমূল হইতে, রেবার উৎপত্তি স্থান (মহেন্দ্র পর্ব্বত) পর্য্যন্ত—

উদয়সাগর হইতে অস্তসাগর (পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের) মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সচিবকুলতিলক শ্রীদর্ভপাণি শ্রীমতী শর্করা দেবীকে বিবাহ করেন। দর্ভপাণির ঔরসে ও শর্করা দেবীর গর্ভে সোম সদৃশ সোমেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন। শিবের পার্ব্বতীর ন্যায়, বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় তরলাদেবী সোমেশ্বরের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী ছিলেন। গুণে কুমার সদৃশ ভট্টকেদার নাথ মিশ্র সোমেশ্বর ও তরলার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাজাধিরাজ সুরপালের মন্ত্রী ছিলেন। (অন্যান্য তাম্রশাসনে সুরপাল বিগ্রহপাল নামে পরিচিত) তাঁহার মন্ত্রণাশক্তি প্রভাবে গৌড়েশ্বর উগ্রমূর্ত্তি হূণদিগকে শান্ত করিয়া, উৎকলজাতিকে আকুল করিয়া, গুর্জ্জর ও দ্রাবিড় দেশীয় রাজাগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এই বসুন্ধরা উপভোগ করিয়াছিলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ কেদার নাথ দেবগ্রামের বন্ধাদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণের ন্যায় বন্ধাদেবী ভট্ট গুরব মিশ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। গুরব মিশ্র দ্বিতীয় রামের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু সেই জমদগ্নবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয় বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। (অর্থাৎ তিনি ক্ষত্রিয় নরপতির মন্ত্রী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেন।) ভুবনবিজয়ী নারায়ণ পাল দেব বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া যাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মহত্ব ও ক্ষমতার অন্য কি প্রমাণের আবশ্যক করে? গুরব মিশ্র বেদজ্ঞ, ধার্ম্মিক, বিদ্বান ও ধনবান ছিলেন। তিনি বঙ্গবাসীর প্রিয় পাত্র ছিলেন।

এই প্রস্তর লিপির দ্বারা প্রাচীন মন্ত্রী বংশের নিম্ন লিখিত রূপ বংশাবলী সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

সাণ্ডিল্য গোত্র।

শ্রীবীর দেব
|
পঞ্চালদেব
|
গর্গ স্ত্রী ইচ্ছাদেবী
|
শ্রীদর্ভপাণি স্ত্রী শর্করা দেবী
(দেবপাল দেবের মন্ত্রী।)
|
সোমেশ্বর মিশ্র স্ত্রী তরলা দেবী
|
কেদারনাথ মিশ্র স্ত্রী বন্ধাদেবী
(সুরপাল দেবের মন্ত্রী)
|
গুরব মিশ্র (নারায়ণ পাল দেবের মন্ত্রী)।

সচিবপ্রবর গুরব মিশ্রের জনৈক আত্মীয়ের দ্বারা এই প্রস্তর ফলক লিখিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভাগলপুরের তাম্রফলক এবং এই স্তম্ভলিপি উভয়েই এক সময়ের হইতেছে। তাম্রফলক খানা মহারাজাধিরাজ নারায়ণ পাল দেবের শাসন পত্র। এবং প্রস্তর-স্তম্ভ লিপি সেই নারায়ণ পাল দেবের মন্ত্রী ভট্ট গুরব মিশ্রের অনুমত্যনুসারে লিখিত হইয়াছিল। তাম্রশাসন গুলির মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয়, ভারতবিজয়ী মহারাজাধিরাজ দেবপালের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল দেব গৌড়ের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীবংশের অনুমোদিত প্রস্তর লিপি পাঠে আমরা মহারাজাধিরাজ দেবপাল ও নারায়ণপালের মধ্যে সুরপালের নামোল্লেখ দেখিতেছি। এস্থলে সুরপাল বিগ্রহপালের নামান্তর ব্যতীত অন্য কিছুই অনুমান করা

যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ এক নরপতি ভিন্ন ভিন্ন শাসনপত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকায় প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

এই প্রস্তর লিপির ২৩শ হইতে ২৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকগুলির মর্ম্ম ভাল রূপে অনুভব করা যাইতে পারে না। এজন্য আমরা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম।

দিনাজপুরের অন্তঃপাতী আমগাছি গ্রামে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এক থানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। বিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমগাছি গ্রামে জনৈক কৃষক যৎকালে মাটী কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছিল, সেই সময় ভূগর্ভ হইতে এই তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। যে স্থানে এই তাম্র শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই স্থানটী বোদাল গরুড়স্তম্ভ হইতে ৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই তাম্রশাসনের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চ ও প্রস্থ ১৩ ইঞ্চ। কোলব্রুক সাহেব এই তাম্রশাসন খানা ভাল করিয়া পাঠ করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, আমি যতদূর ইহার মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই অনুভব হয় যে, এই বংশের প্রথম রাজা লোকপাল, তৎপরে ধর্ম্মপাল, ইহার পরবর্ত্তী নাম পাঠ করা যায় না। ইহার পরে জয়পাল তৎপর দেবপাল তদনন্তর ২।৩টি নাম পাঠ করা যাইতে পারে না; কিন্তু ইহার একটী নারায়ণ পাল হইবে। তৎপর রাজপাল, পালদেব, মহিপাল দেব, ন্যায়পাল এবং বিগ্রহ পাল ইত্যাদি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার হরণ্‌লি সাহেব এই তাম্র শাসনের পুনর্ব্বার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যদিও কোন কোন শ্লোকের কোন কোন অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি পাঠ করিতে পারেন নাই, তথাপি কোলব্রুক সাহেবের ভ্রম তিনি অনেকটা সংশোধন করিয়াছেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তাম্রশাসনের ৪র্থ পংক্তির "শ্রীমান লোকনাথ জয়তি" পদ পাঠ করিতে না পারিয়া কোলব্রুক সাহেব বংশের স্থাপয়িতাকে লোকপাল নামে পরিচিত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য তাম্র শাসন ও প্রস্তর লিপির ন্যায় আমগাছির তাম্রশাসনেও গোপালদেবকে বংশের স্থাপয়িতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

তাম্র শাসনের ষষ্ঠ পংক্তির মধ্যভাগে আমরা ধর্ম্মপাল নৃপতির নাম উল্লেখ দেখিতে পাই। ৭ম পংক্তির প্রারম্ভে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকপালের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। ৮ম পংক্তিতে বাকপালের দুই পুত্র দেবপাল ও জয়পালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এই শাসন পত্রেও ভ্রম ক্রমে ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালকে বাকপালের পুত্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেবপাল দেব মুঙ্গরের শাসন পত্রে আপনার পিতামাতার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্য। তদ্বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী লেখকদের লিখিত বাক্য কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, দেবপালের পর তাহার ভ্রাতষ্পুত্র মহারাজ বিগ্রহ পাল দেব সিংহাসন আরোহণ করে, তাঁহার নাম নবম পংক্তির প্রথম ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। দশম পংক্তির মধ্যভাগে মহারাজাধিরাজ নারায়ণ পালের উল্লেখ রহিয়াছে। শাসন পত্রে "নারায়ণঃ

সঃ প্রভুঃ” এইরূপ পাঠ করিয়া হরেন্‌লি সাহেব নারায়ণ পালকে “নারায়ণ প্রভু” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, সাহেবদিগের এরূপ ভ্রম স্বভাবসিদ্ধ। ইহাকে ততটুকু মারাত্মক বিবেচনা করি না। কিন্তু ইহার পরে তিনি একটী ভয়ানক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন। তদন্তর যে সকল নরপতির নাম উল্লেখ হইয়াছে, সেই সকল নামকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের নামান্তর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি,কোন হিন্দুসন্তান এই শাসনপত্র পাঠ করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না।

এক নরপতির দুই নাম হইতে পারে, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু একব্যক্তির দুইটা মাতামহ বা দুইটা পিতামহ হইতে পারে না। এই জন্যে বলিতেছিলাম যে, সাহেবের এইরূপ ভ্রম হওয়া সহজে হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুসন্তানের এইরূপ ভ্রম কখনই হইবে না। যাহা হউক, নারায়ণ পাল দেবের পর আমরা শাসন পত্রের একাদশ পংক্তির শেষ ভাগে রাজ্যপাল দেবের উল্লেখ দেখিতেছি। এই রাজ্যপাল দেবকে আমগাছির শাসন পত্রে স্পষ্টাক্ষরে নারায়ণ পালের পুত্র লেখা হইয়াছে। কিন্তু হরেন্‌লি সাহেব মুঙ্গেরের শাসন পত্রে লিখিত দেবপাল দেবের পুত্র, যুবরাজ রাজ্যপালের সহিত অভিন্ন অবধারণ করিয়াছেন। দুই পিতার এক পুত্র ইহা কেবল সাহেবেরাই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। হিন্দুসন্তানগণ ইহা পাঠ করিয়া অবশ্য হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পংক্তিতে রাজ্যপালের পুত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার নামটী পাঠ করা যাইতে পারে না। কেবল শ্রীমান শব্দটী মাত্র পাঠ করা যায়। ইনি রাষ্ট্রকুটা রাজবংশের দৌহিত্র। তাঁহার মাতার নাম ভাগ্যদেবী। তৎপরে চতুর্দ্দশ পংক্তিতে আমরা সেই রাজার পুত্র বিগ্রহপাল দেবের নাম উল্লেখ দেখিতেছি। বিগ্রহপাল দেবের পুত্র মহীপাল দেব; শাসন পত্রের ষোড়শ পংক্তির মধ্যভাগে তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। এই মহীপালের পুত্রের নাম ন্যায়পাল। সপ্তদশ পংক্তির মধ্যভাগে তাঁহার নাম খোদিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল দেবের নাম অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি এই শাসন পত্রের কর্ত্তা। ইহা তাঁহারই দানপত্র। তাহার পরিচয় এইরূপ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। “পরমেশ্বর — সেবাসময়াতাশেষ জম্বুদ্বীপ ভূপালানন্ত পাদাৎ ভরণম দবণেঃ (শ্রীমুদগগিরি)সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারত পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীন্যায়পাল দেব পরমাধ্যাত পরমেশ্বর (পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান বিগ্রহপাল দেব কুশলি।”

মুঙ্গেরের শাসন পত্রে কেবল তিনজন পাল রাজার নাম উল্লেখ আছে। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে পাঁচজন নরপতির নাম পাওয়া যায়। আমগাছির তাম্রশাসনে আমরা একাদশ জন নরপতির নাম প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা দেখাইব যে, মহারাজ মহীপাল দেব হইতে বাঙ্গালার পালবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। কিন্তু আমগাছির তাম্রশাসনে আমরা মহীপালের পর ন্যায়পাল ও বিগ্রহপাল নরপতিদ্বয়কে বঙ্গদেশের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে

পাই। সুতরাং শেষ পাল নরেশ্বর মহী-পালকে ন্যায় পালের পুত্র বিগ্রহ পালের পরবর্ত্তী রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

নালন্দার একটী বিখ্যাত প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দীরের দ্বারদেশে এইরূপ লিখিত আছে।

শ্রীমন্মহীপাল দে
ব রাজ্যে সম্বত
অগ্নি রাঘ (রাধ) দ্বার
ততদেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবর
মহায়ান যায়িন পর
মোপাসক শ্রীমত্তৈলাঢ়
কীয়জ্জীধীপকৌশাম্বী
বিনির্গতস্য হরদত্তনপ্তু
গুরু দত্ত সুতশ্রীবালা
দিত্যস্য যদত্র পুণ্যংত্ত
স্তবতু সর্ব্ব সত্ব রাশেরনুত্তর
জ্ঞানাবাপ্তয় ইতি॥

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (১৩শ)

(দ্বিতীয় বিবাহ।)

বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর গৌরচন্দ্র পুনরায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার টোল হইত; বঙ্গদেশে অনুপস্থিতি সময়ে টোলের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র পাঠার্থীগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার বিদ্যা চর্চ্চায় সঞ্জয়ের বাড়ী শর গরম হইয়া উঠিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, পত্নী বিয়োগের শোকের তীব্রতা ততই হ্রস্ব হইতে চলিল, শাণিত ক্ষুর ধারে মর্চ্যা পড়িয়া গেল; অবশেষে হৃদয়ের অন্তরস্তলে শোকের এক কাল আবরণ পড়িয়া রহিল; স্মৃতিপথের সুন্দর আকাশে একটী বিষাদের রেখা মাত্র থাকিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে নিমাই পণ্ডিত গভীর অধ্যয়নও অধ্যাপনায় নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি তাঁহার পড়ুয়াদিগের মধ্যে সন্ধ্যা বন্দনাদি ও কপালে তিলক ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের করণীয় অনুষ্ঠান না দেখিলে অথবা দুর্নীতি-পরায়ণতা লক্ষ্য করিলে, নানা পরিহাস ও উপদেশ চ্ছলে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহার জীবনের এই এক বিশেষ ভাব দেখা যায় যে, শেষ জীবনে বেদ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাগ বর্ত্মে ধর্ম্ম সাধন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইত্যাদি মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনধিকারী ব্যক্তিদিগকে কখন বেদ-বিহিত আশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম শূন্য হইতে উপদেশ দিতেন না। বরং তাহাদিগের বিশ্বাসানুসারেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। যেখানে বুঝিতে পারিতেন যে, প্রচলিত মত পরিত্যাগ করিয়া উপদিষ্ট ব্যক্তি উচ্চতর ও পবিত্রতর সাধনাঙ্গে উঠিতে পারিবে না, সেখানে তাহার বিশ্বা

সের উপর আঘাত করিয়া তাহাকে নাস্তিকতার সন্দেহ-দোলায় নিক্ষেপ করা তাঁহারে মতে অতীব দূষণীয় ছিল। এ সম্বন্ধে এক্ষণকার প্রকার প্রণালী অপেক্ষা তাঁহার পথ অতি পরিষ্কার ও সমুন্নত বলিয়া বোধ হয়। উপদিষ্টের বর্ত্তমান্ বিশ্বাসের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে এমন কৌশলে তাহাকে উপরের সিঁড়িতে লইয়া যাইতেন যে, অবশেষে তাহাব বুঝা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত যে, কেমন করিয়া তাহার জীবনে এত সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

প্রাণের প্রিয়তম ভার্য্যার পরলোক গমনেই হউক বা দুরতিক্রমনীয় স্বভাবের আবেগ সম্বরণ না করিতে পারার জন্যই হউক, এ বয়সেও গৌরচন্দ্রের বাল্যচপলতা আবার দেখা দিতে লাগিল; একটু একটু করিয়া দুষ্ট স্বরস্বতী স্কন্ধে ভর করিতে লাগিল। প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করত টোলে যাইতেন, মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে বিশ্রাম না করিয়াই আবার বিদ্যালয়ে যাইতেন, এবং নিশীথ রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। ইহার মধ্যে স্বায়হ্নে কেবল একবার সশিষ্যে গঙ্গাতীরে ও নগরীর পথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন। এই সময়ে নানারূপ হাস্য পরিহাসে সময় অতিবাহিত হইত। এমন লোক ছিল না যে, তাঁহার বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ না হইত। কেবল স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সমাদর ছিল। পথে ঘাটে তাঁহাদিগকে দেখিলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতেন।

"এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে;
হেন নাহি যারে না চালেন নানারূপে,
সবে পর স্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস;
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ।"

চৈঃ ভাঃ

পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে গৌরচন্দ্র বাঙ্গালের কথা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপে বাঙ্গালের অভাব ছিল না; সুতরাং পথে ঘাটে বাঙ্গাল দেখিলে আর রক্ষা থাকিত না। বাঙ্গালের কথা ও স্বর অনুকরণ করিয়া বিবিধ ভঙ্গী সহকারে বিদ্রূপ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। কোন কোন দিন শ্রীহট্টবাসীদিগের সহিত ভয়ানক ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়া যাইত। ইহার একটী চিত্র দেখুন।"

'বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া।
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে 'অয়ঃ অয়ঃ;
তুমি কোন্ দেশী তাহা—কহত নিশ্চয়।
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার;
বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার?
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়;
তবে ঢোল কর কারে? অন্যে দুঃখ পায়।
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ না মানে;
নানা মতে কদর্থেন সে দেশী বচনে।
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ার ঠাকুর:
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর।
মহা ক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া;
লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিকদার স্থানে;
লঞা যায় মহা ক্রোধ হইয়া দেয়ানে।
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর শিষ্যগণে;
সমঞ্জস করিয়া চলেন সেইক্ষণে।
কোন দিন থাকি কোন বাঙ্গালের আড়ে;
আওয়াস ভাঙ্গিয়া তার পলায়েন রড়ে।"

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৩ অধ্যায়।

অনেক দিন হইতে শচী-মাতা পুত্রের দ্বার পরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে-ছিলেন। এক্ষণে তনয়ের দিন দিন চঞ্চলতা বৃদ্ধি দেখিয়া ঐ চিন্তা তাঁহার মনে আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, নব বধূর মুখ দেখিলে নিমাই হয় ত চাপল্য পরিহার পূর্ব্বক সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু নবদ্বীপে পুত্রের উপযুক্ত কন্যা দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এমন সময় মনে হইল যে, "সনাতন রাজ পণ্ডিতের একটী সর্ব্ব গুণ-যুক্ত মেয়ে আছে; মেয়েটীকে তিনি বাল্যকালে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতে দেখিতেন। কন্যাটী যেমন সুশ্রী তেমনি নম্র ও মধুর প্রকৃতি নাম; বিষ্ণুপ্রিয়া; সেই মেয়েটীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটনা হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।'' সনাতন পণ্ডিত নবদ্বীপের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত বিষয়ী ব্যক্তি; অতি সচ্চরিত্র, উদার ও সরল স্বভাব এবং সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। তাঁহার বিষ্ণুভক্তি ও আতিথেয়তা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহার পদবী রাজপণ্ডিত। কি কারণে ঐ পদবী পান তাহা জানা যায় না; তবে তিনি যে একজন গণ্য মান্য ও ধন সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্য-ভাগবতে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

"সেই নবদ্বীপে বৈশে মহাভাগ্যবান্;
দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম।
অকৈতব পরম উদার বিষ্ণুভক্ত;
অতিথি সেবন উপকারে অনুরক্ত।
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবংশজাত;
পদবী রাজপণ্ডিত সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
ব্যবহারে তিনি ভাগ্যবন্ত এক জন;
অনায়াসে অনেকের করেন পালন।
তার কন্যা আছেন পরম সুচরিতা;
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রায় সেই জগন্মাতা।
শচী দেবী তাঁরে দেখিলেন যেইক্ষণে;
সেই কন্যা পুত্র যোগ্য বুঝিলেন মনে।"

শচী দেবী পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করত কাশীনাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিলেন ও তাহার প্রমুখাৎ সনাতন পণ্ডিতের নিকট আপন প্রস্তাব বলিয়া পাঠাইলেন। মিশ্র মহাশয় পণ্ডিতজীর সভায় গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে, রাজপণ্ডিত আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করতঃ বিশ্বম্ভরকে কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাশীনাথ এই শুভ সম্বাদ শচীকে অবগত করিলে, তিনি আত্মীয় স্বজন লইয়া মহা আনন্দের সহিত বিবাহের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান্ নামে একজন ধনী ছিলেন; তিনি বিশ্বম্ভরের পরম হিতকারী বন্ধু ও হিতৈষী ছিলেন। তিনি এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন যে, ইহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি একা নির্ব্বাহ কবিবেন; আর এ বিবাহ সামান্য বামুনে রকমে দেওয়া হইবে না; রাজপুত্রের পরিণয়ের ন্যায় ঘটা করিতে হইবে। মুকুন্দ সঞ্জয়ও এই প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। অধ্যাপকের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণে সকল শিষ্যেরাই মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলে গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ প্রথম বিবাহ হইতে যে শতগুণে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই:—

"প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্বশিষ্যগণ ;
সবেই হইলা অতি পরমানন্দ মন
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয় ;
মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়।
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে শুন সখা ভাই ;
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই।
বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই ;
বামনীয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই।
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন ;
রাজ কুমারের মত লোকে দেখিবেন।"

এ দিকে কন্যাপক্ষেও সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজনাদি হইতে লাগিল। সনাতন পণ্ডিত এক জন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন ; সুতরাং তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ যে রাজকীয় সমারোহে সম্পন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? এইরূপে সমস্ত আয়োজনাদি সমাধা হইলে বিবাহ সম্বন্ধ এক দিন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় যায় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রাজপণ্ডিত গণক ডাকাইয়া বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করিবার জন্য আদেশ দিলেন। গণক কহিল যে, পথে আসিতে আসিতে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিলে তিনি কাহার বিবাহ, কি বৃত্তান্ত বলিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে আপনার যে অভিরুচি হয় করুন্।"

"গণক আনিয়া বৈল বচন বিনয় ;
বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহ দিব করহ সময়।
শুনিয়া গণক কহে শুনহ পণ্ডিত ;
আসিতে দেখি সে বিশ্বম্ভর আচম্বিত।
তাঁ'রে দেখি' আনন্দিত হৈল মোর মন ;
কৌতুকে তাঁহারে আসি' বলিল বচন।
কালি শুভ অধিবাস হইবে তোমার ;
বিবাহ সংপ্রতি শুন বচন আমার।
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল উত্তর ;
কার কোথা বিবাহ কহ কেবা কন্যা বর ?
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল এমন ;
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর নিরূপণ।"

চৈঃ মঃ আদিঃ

গণকের মুখে এই কথা শুনিয়া সনাতন পণ্ডিত দুঃখে, অভিমানে ও ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, যখন গৌরাঙ্গ তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বড় একটা উৎসুক নহেন, তখন তিনি যাচিয়া কন্যা দান করিবেন না।

"সনাতন পণ্ডিত সে চরিত্র উদার ;
বন্ধুবর্গ লঞা করে অনুমান সার।
নানা দ্রব্য কৈল আসি' নানা অলঙ্কার ;
কাহারে বা দিব দোষ ? করম আমার।
আমি কোন অপরাধ কিছু নাহি করি' ;
কি কারণে আদর না কৈলে গৌরহরি।"

চৈঃ মঃ

লোচনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভরকে সনাতনের ঈশ্বর জ্ঞান ছিল ; সে জন্য যখন তিনি শুনিলেন যে, বিশ্বম্ভর তাঁহার কন্যার পাণি গ্রহণে তাদৃশ সমুৎসুক নহেন, তখন তাঁহার দুঃখের পরিসীমা থাকিল না। তিনি দিবা রাত্রি "গৌরাঙ্গ ধন হইতে বঞ্চিত হইলাম" বলিয়া ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন ও বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই চিত্রটী অতিরঞ্জিত। কারণ তখন পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ-জীবনে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যে তাহাতে তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান হইতে পারে। বিশেষত এ বিবাহের প্রস্তাব কিছু কন্যাপক্ষ

হইতে উঠে নাই। গৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী আচরণও এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে লোচন দাস একজন গৌর ভক্ত; চৈতন্যাবতারে তাঁহার অটল বিশ্বাস। চৈতন্যচরিতে তাঁহার গাঢ় প্রেমভাব। সেই ভাবাবেগের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের প্রতি কথায় প্রতি বর্ণনায় পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তদীয় মনের উচ্ছ্বাসিত ভাবের ঢেউ সনাতন পণ্ডিতের কার্য্যে ও কথায় যাইয়া লাগা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

গণকের বাক্যে এতদূর হইয়া উঠিয়াছে জানিতে পারিয়া বিশ্বম্ভর অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন; এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক প্রিয় ও বিশ্বাসী বয়স্যকে নিভৃতে ডাকিয়া সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন এবং নিম্নে এই প্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহার ভাবী শ্বশুরের নিকট পাঠাইলেন:—

"প্রিয় এক ছিল বয়স্যের মাঝে;
নিভৃতে কহিল কথা যত মনে আছে।
কোন কথা ছলে যাও পণ্ডিতের ঘর;
আমি নাহি জানি হেন কহিও উত্তর।
কৌতুক রহস্যে আমি গণকে কহিল;
না বুঝিয়া কার্য্যে কেন অবহেলা কৈল।
কার্য্যে অবহেলা তাহে নাহিক অধিক;
তাঁ সবার চিত্তে দুঃখ এ নহে উচিত।
মায়ে যে কহিল তাহে কি আছয়ে কথা?
তাঁহার উপরে আর কে'করে অন্যথা?"

চৈঃ মঃ

গৌরাঙ্গের বয়স্যের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজ পণ্ডিতের সকল সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি মহানন্দে ও উৎসাহে বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য করিলেন। বর কন্যা উভয়ের বাটীতেই মহা ধুম পড়িয়া গেল। প্রথমে অধিবাস। অধিবাস-দিনে বাটীতে বড় চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইল; চারিদিকে কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন ও আম্র শাখায় বেষ্টন করা হইল। মেয়েরা আঙ্গিনাতে আলিপনা দিয়া অনুরঞ্জিত করিলেন এবং মঙ্গল কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন বৈষ্ণব প্রভৃতিকে অধিবাসের পান গুপারী লওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল।

অপরাহ্ন অধিবাসের নিয়মিত সময়। একে একে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল; নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; ভাটগণ রায়বার গাইতে লাগিল ও পুরস্ত্রীরা মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। সভার মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র সমাসীন হইলে পান গুপারি বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইল। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণের অন্ত নাই; সুতরাং কত লোক আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা হইল না। বিতরণপদ্ধতিও মন্দ নয়; প্রত্যেকের কপালে চন্দন ও মস্তকে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া এক এক বাঁটা পান দেওয়া হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ জাতি চিরকালই লোভী; অনেকে একবার লইয়া বেশ বদলাইয়া প্রতারণাপূর্ব্বক বহুবার লইতে লাগিল। উদারস্বভাব গৌরচন্দ্র এই উৎপাত লক্ষ্য করিয়া তাহা নিবারণের একটী চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করত বন্ধুগণকে বলিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন জনের পরিমাণ দেওয়া হউক। এই উপায় অবলম্বন করাতে শঠতা প্রতারণা তো তিরোহিত হইল; বরং সকলে এক বাক্যে জয় জয়-

ধ্বনি করিয়া গৌরের প্রভৃত গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

"এই মত মাল্য, চন্দন, গুবাক, পান,
হইল অনন্ত মর্ম্ম কেহ নাহি জান।
মনুষ্য পাইল কত সে থাকুক দূরে,
ভূমিতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে।
সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়;
তাহাতেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্ব্বাহ হয়।
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস;
সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস।
লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে;
হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে।"

চৈঃ ভাঃ।

তৎপরে রাজপণ্ডিত আত্মীয় ও বিপ্রবর্গে পরিবৃত হওত নৃত্যগীত ও অধিবাস-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে উপনীত হইলেন ও বেদ-মন্ত্র পাঠ করিয়া গৌরের অঙ্গে গন্ধ স্পর্শ করাইয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বম্ভরের আত্মীয়গণও এইরূপে কন্যার আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলে সেদিনকার উৎসব শেষ হইল।

অধিবাসের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই স্ত্রীগণ নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে জল সহিয়া আসিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নান ও বিষ্ণুপূজা আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া সমাপন করিয়া নান্দীমুখ কর্ম্মাদি করিতে বসিলেন। এ দিকে গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, নারীদিগকে তৈল হরিদ্রাদি বিতরণ প্রভৃতি স্ত্রী-আচার সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ণে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দিগকে সামাজিক মান ও অবস্থানুসারে ভোজ্য বস্ত্র প্রভৃতি দান করা হইল। বেলা অবসন্ন হইলে বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল ও বরের বেশ-বিন্যাস হইতে লাগিল।

"অপরাহ্ণ বেলা আজি হইল লাগিতে;
প্রভুর সবাই বেশ লাগিলা করিতে।
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রী অঙ্গ;
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন;
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন।
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর;
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর।
দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে;
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে।
ধান্য দূর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন স্বর্ণ মুঞ্জরী দর্পণ।
সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতি মূলে সাজে:
নবরত্ন হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে।"

চৈঃ ভাঃ।

এক প্রহর বেলা থাকিতে বিবাহযাত্রা বাহির হইল। জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের পদধূলি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিচিত্র দোলায় চড়িয়া বিবাহ বিজয় করিলেন। এক প্রহরকাল নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া গোধূলি সময় কন্যালয়ে উপস্থিত হইবেন, এই পরামর্শ হইল। প্রথমে ভাগীরথী তীরে যাইয়া গঙ্গাদর্শন ও প্রণামান্তে নগরের পথে পথে বিবাহ যাত্রা মহা ধূমধামে বেড়াইতে লাগিল। সাজ সজ্জা ও বাদ্য ভাণ্ডের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস এইরূপে করিয়াছেনঃ—

"তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্ত খান;
হরিষে আনিয়া করিলেন বিদ্যমান।
বাদ্য গীত উঠিল পরম কোলাহল;
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল।

ভাটগণে লাগিলা পড়িতে রায় বার ;
সর্ব্ব দিকে হইল আনন্দ অবতার ।”
চৈঃ ভাঃ

বিবাহ যাত্রার ক্রম বর্ণনা দেখুনঃ—
“আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁব ;
চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার ।
নানাবর্ণে পতাকা চলিলা তার পাছে ;
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাছে ।
নর্ত্তক বালা জানি কতেক সম্প্রদায় ;
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায় ।
জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল,
দামামা দগড় শঙ্খ বংশীকরতাল ।
বরগোঁসিঙ্গা পঞ্চশব্দী বেণু বাজে কত ;
কি লিখিব বাদ্য ভাণ্ড বাজি যায় যত ।
সহস্রেক শিশু বাদ্য ভাণ্ডের ভিতরে ;
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে ।

বিবাহের চমৎকারিত্বের বর্ণনাঃ—
‘দেখি অতি অমানুষী বিবাহ সম্ভার ;
সর্ব্ব লোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার ।
বড় বড় বিভা—দেখিয়াছি লোকে বলে ;
এমন সংঘট নাহি দেখি কোন কালে ।
এইমত স্ত্রী পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া ;
আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতি নদীয়া ।
যার ঘরে রূপবতী কন্যা আছে ভাল ;
সেই সবে বিমরিষ রহে সর্ব্বকাল ।
হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে ;
আপনার ভাগ্যে নাহি হইবে কেমতে ?
চৈঃ ভাঃ

এই সব বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও অমূলক নহে। তবে কথা হইতেছে যে দুই বৎসর পরে এমন সাধের পরিণীতা ভার্য্যাকে যিনি পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গালের বেশে পথে পথে হরিনাম বিলাইয়া বেড়াইবেন, তার পক্ষে কি এমন ঘটা করে বিবাহ করা সাজে ? সাজে বৈকি ? নইলে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও অদূরদর্শিতা থাকে কোথায় ? গৌরচন্দ্র অসাধারণ মানুষ হইলেও মানুষ ; ভগবৎ-প্রেরিত হইলেও মানবীয় দুর্ব্বলতার অধীন ; তাই এই অপরিণামদর্শিতা। প্রিয় পাঠক ! ইহাকে লোক শিক্ষার্থ অমানুষী লীলা বলিতে চাও বল ; কিন্তু তাহাতে মানবত্ব ডুবে না। ভগবত্বে মানবত্ব অসম্ভব ; মানবত্বে ভগবত্বই তত্ত্ব কথা।

ঠিক্ গোধূলি সময়ে বৈবাহিক দল রাজ পণ্ডিতের বাটীতে প্রবেশ করিল। তখন উভয় দলের বাদ্য তরঙ্গে, লোক কোলাহলে ও আলোক মালায় উৎসব প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল। কন্যাকর্ত্তা স্বদলে সমবেত হইয়া জামাতাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ক্রমে বরণ, স্ত্রী আচার, সাত পাক, মালা বদল ও সম্প্রদান সকলই সম্পন্ন হইল। লোকের হৈ হৈ চৈ চৈ, স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি, উভয় দলের হাস্য পরিহাস, শঙ্খাদির মাঙ্গল্য রবে মিশিয়া অন্তঃপুরের গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সে রাত্রি সেই ভাবেই কাটিয়া গেল। বাসর শয্যায় পাড়ার মেয়েদের সরল ও কুটীল নানা রকমের তামাসা, ও গণ্ডগোলে নব দম্পতীর নিদ্রা মাত্র হইল না। প্রাতে কুশণ্ডিকাদি সমাপ্ত হইলে পণ্ডিতজী পরম সন্তোষে বর যাত্রীদিগকে ভোজন করাইলেন ও ধেনু, ভূমি, ধনরত্ন ও দাস দাসী প্রভৃতি যৌতুক দিয়া অপরাহ্নে কন্যাজামাতাকে বিদায় করিলেন। পূর্ব্ব দিনের ন্যায় স্বদলে সমস্ত নগরী প্রদক্ষিণ করিয়া গৌরচন্দ্র সন্ধ্যারাত্রে নবোঢ়া-বধূ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তাহা দেখিয়া জননীর আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল।

'শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বম্ভর,
চুম্ব দেই সে চাঁদ বদনে।
আনন্দে বিহ্বল হিয়া, আয়্যগণ মাঝে গিয়া,
বধূ কোলে শচীর নাচনে।'

গয়াগমন।

কথিত আছে, এই সময়ে ধর্ম্মশূন্য জগৎ দর্শন করিয়া নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণব দল সর্ব্বদাই দুঃখানুভব করিতেন; এবং জীবের দুঃখ দর্শনে রোদন করিতেন।

'শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার;
হা কৃষ্ণ! বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার।'

কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে এমন কয়জন আছে? সকলেই আপন আপন সুখৈশ্বর্য্যে মত্ত। কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক,তাঁহাদিকে দেখিলে লোকে বিদ্রূপ করিত, সঙ্কীর্ত্তনে ও ভজনে বাধা দিত, নানারূপে অত্যাচার করিত ও শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়া দিত। করুণহৃদয় বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া কায়মনোবাক্যে জীব নিস্তারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অসহায়ের সহায় যিনি, তিনি এই সময়ে একটী সরল প্রেমিক ও অকপট ভক্ত জুটাইয়া দিয়া ভক্ত মণ্ডলীর উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। যে প্রকারে হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্ত দলে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

লোকে বলে পাতাচাপা কপাল, আর পাথরচাপা কপাল। পাথর চাপা কপালে পাথরও উঠে না, কপালও ফলে না। গৌরের কপাল পাতা চাপা; একটু বাতাসে পাতাটী উড়ে যাওয়া মাত্র কপাল ফসে গেল। স্নিগ্ধ কোমল জলগর্ভা নির্ঝরিণীর মুখ দুই চারিটী তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত ছিল, কোথা হইতে একটু নির্ম্মল দক্ষিণা বাতাস বহিল, তৃণ কয়টী সরিয়া গেল, আর প্রমুক্ত মুখ দিয়া শীতল নির্ম্মল জল অনর্গল ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলতঃ গৌরের ধর্ম্ম জীবন বিকাশের গয়াগমন উপলক্ষ মাত্র। বিধাতা তাঁহার হৃদয়-প্রস্রবণে প্রেম ভক্তিরসে সুধারাশি স্বহস্তে পূরিয়া দিয়া উপরে শাস্ত্র জ্ঞানের একখানি শরাব আঁটিয়া দিয়াছিলেন। আবরণ খানি সরিয়া যাওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত বেগে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিল; জাতি কুল ধনমানের পর্ব্বত তাহাকে কিছুতেই আটক করিয়া রাখিতে পারিল না।

দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পিতৃকৃত্য করিবার জন্য জননীর আজ্ঞা লইয়া গৌরচন্দ্র গয়ায় চলিলেন; সঙ্গে অনেকগুলি শিষ্য ও কোন কোন আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন। সঙ্গীদিগের সঙ্গে নানারূপ শাস্ত্র ও ধর্ম্ম কথা কহিতে কহিতে শচীনন্দন বঙ্গ দেশের সীমা অতিক্রম করিলেন। নানা দেশের নানারূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে তাঁহার উদার চিত্ত আরও উদারতা লাভ করিল, মন যেন অনন্তের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল এবং তিনি অননুভূত নির্ম্মল সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তাঁহারও প্রাণে যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তাহা তিনিও তখন বুঝিতে পারেন নাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, উষাগমের ন্যায় শুভ ঘটনার পূর্ব্বাভাস প্রাণের অভ্যন্তরে দেখা দেয়। এখন বিশ্বম্ভরের

জীবনাকাশে সেই আভাস লক্ষিত হইতেছিল। এক জায়গায় পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটী কুরঙ্গ মিথুনের দাম্পত্য ক্রীড়া দর্শনে গৌরচন্দ্র সঙ্গী লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেনঃ—

"মৃগের কৌতুক দেখি হৈল কুতূহল ;
প্রাকৃত লোকের ন্যায় হাসে বিশ্বম্ভর।
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধে মত্ত পশুগণ ;
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত সর্ব্ব জন।
সঙ্গীগণে হাসিয়া কহয়ে ভগবান্ ;
যে বুদ্ধি পশুতে, মানুষের বিদ্যমান।
কৃষ্ণ জ্ঞান আছে মাত্র মানুষ শরীরে ;
মানুষ না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে।'

চৈঃ মঃ

গয়া-পথের আর একটী বৃত্তান্ত উল্লেখ করা উচিত। চির নামে নদীতে স্নানাবগাহন করিয়া যাত্রীদল মন্দার পর্ব্বতে উঠিয়া মধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং তথা হইতে নামিয়া বিগ্রহ পূজক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। সে দেশের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার এদেশের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক : তদ্দৃষ্টে সমভিব্যাহারী যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহস্বামীকে অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ তাহা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার প্রাণে মানুষের বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তের অপমান সহ্য হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। সঙ্গের শিষ্যগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার রোগ শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই ব্যাধির হ্রাস হইল না। তখন রোগী আপনার চিকিৎসা আপনিই করিলেন। কথিত আছে যে, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের পাদোদক লইয়া পান করায় তিনি ব্যাধিমুক্ত হইলেন। যাঁহারা সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থই এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। তাঁহারা আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিলে গৌরসুন্দর এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন ;—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"

অর্থ—তোমরা বামনাইর বড়াই করিও না ; ভক্তি বিহীন বামুনও চণ্ডাল, আর ভক্তিমান্ চণ্ডালও পূজনীয়।

কিছু দিনান্তে যাত্রীদল গয়া-ধামে উপনীত হইল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া যাত্রীগণ চক্রবেড়ের মধ্যে গিয়া বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শন করিলেন। গয়ালী পাণ্ডাগণ পাদচিহ্নের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ভগবৎ পাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল ; গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অমনি ভাবোচ্ছ্বাল উথলিয়া উঠিল ; কত ভাবলহরীই যে প্রাণে উঠিতে লাগিল, তাহা বর্ণনায় শেষ হয় না। তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই ভাবময়। এতদিন কেবল পাণ্ডিত্যের বাহ্যাড়ম্বরে তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। শুভক্ষণে আবরণ উন্মুক্ত হওয়ায় হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহার পর দেখা যাইবে যে, অল্প মাত্র উদ্দীপনাতেই তদীয় ভাবাবলি অসমোর্দ্ধভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। গয়া-পথে সেই উদ্দীপনার আরম্ভ। গয়াক্ষেত্রে তাহার গাঢ়তা; এবং শেষে তাহার অদম্য উচ্ছ্বাস। ইহাই তাহার জীবনের উজ্জ্বল ছবি ও এই প্রবলা ভক্তি শিখাইতেই তাঁহার মর্ত্ত্যে

অবতরণ। গয়ার প্রথম উদ্দীপনা বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের মুখে শুনুনঃ—

'চরণপ্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে;
আবিষ্ট হইলা প্রভু নিজানন্দ সুখে।
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে;
রোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে।
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র;
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ।
অবিচ্ছিন্না গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে;
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে।"

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৫ অঃ।

বিধাতার গূঢ় বিধান অতি বিচিত্র! 'যে যা চায় সেতা পায়, কথার সার্থকতা যদি কোন খানে থাকে, তবে তাহা সাধু জীবনেই লক্ষিত হইবে। হরি-চরণ পাইবার লালসায় ধ্রুব ব্যাকুল হইয়া বাহির হইলেন, অমনি সদুপদেষ্টা নারদের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। দেবনন্দন ঈশা পিতার অন্বেষণে ব্যাকুল; অবগাহক যোহন অমনি হাজীর। গোরাচাঁদের প্রাণে ভগবত্তৃষ্ণা যেই প্রবল হইল, তখনই সদ্‌গুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে হঠাৎ তাঁহার পুনর্ম্মিলন হইল।

"দৈব যোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে;
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে।"

সেই নবদ্বীপে সাক্ষাৎ, তাহার পর এই দেখা হইল। তখনকার অবস্থা আর এখনকার অবস্থা—আকাশ পাতাল ভেদ ভাবিয়া গৌরচন্দ্র কিছু লজ্জিত হইলেন। পুরীকে প্রণাম করিলে পুরীগোসাই গাঢ় প্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও উভয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শচীনন্দন পুরীকে সম্বোধন করিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "আমার গয়ায় আসা সার্থক হইল; কথিত আছে যে, যাহার নামে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া যায় সেই উদ্ধার হয়। কিন্তু আপনাকে দেখিলে কোটী কোটী পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়; আপনি সকল তীর্থের সার তীর্থ; আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করত চরণামৃতরস পান করান।"—

'প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার;
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার।
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ;
সেওযারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন।
তোমা নিরখিলে মাত্র কোটী পিতৃগণ;
সেইক্ষণে সর্ব্ব বন্ধ পায় বিমোচন।
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান;
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান।
সংসার-সমুদ্র হ'তে উদ্ধার আমারে;
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে।
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃতরস পান;
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান।"

চৈঃ ভাঃ

ঈশ্বর পুরীও গৌরের পাণ্ডিত্য ও গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন "ওহে নিমাই পণ্ডিত! আমি সত্য বলিতেছি যে তোমাকে দেখিলে আমার পরমানন্দ লাভ হয়; আমার বোধ হয় তোমাতে ঈশ্বরাংশ আছে; নইলে তোমাকে দেখিলে কৃষ্ণদর্শনের সুখ হইবে কেন?" এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেনঃ—

"শুনি প্রিয় ঈশ্বর পুরীর সত্য বাক্য;
হাসিয়া বলেন প্রভু তোমার বড় ভাগ্য।
এই মত কত আর কৌতুক সম্ভাষ;
যত হইল তাহা বলিবেন বেদব্যাস।"

ইহার পর কিছু সময়ের জন্য উভয়ে বিদায় হইলে গৌরচন্দ্র লৌকিকী কার্য্য

করিতে লাগিলেন। ফল্গু তীর্থে বালীর পিণ্ডদান, গিরি-শৃঙ্গে প্রেত গয়ার শ্রাদ্ধ, রাম গয়া, যুধিষ্ঠির গয়া, ভীম গয়া, যোড়শী গয়া, শিব গয়া, ব্রহ্ম গয়া প্রভৃতি স্থানে পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে গয়া-শিরে পিণ্ডদান ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ বাসায় আসিয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন। রন্ধন সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঢুলিতে ঢুলিতে ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরসুন্দর রন্ধনের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরম সম্ভ্রমে নমস্কার করতঃ পুরীকে বসাইলেন। পুরী গোঁসাই প্রস্তুতান্ন দেখিয়া বলিলেনঃ—

"হাসিয়া বলেন পুরী শুনহ পণ্ডিত।
ভাল ত সময় হইলাম উপনীত।"

গৌরচন্দ্র পুরীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেনঃ—

"প্রভু বলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়;
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়।"

পুরী বলিলেন "তুমি কি খাইবে?

গৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন "আমি আবার রাঁধিব?"

পুরী। "আর পাকের প্রয়োজন কি? যে অন্ন আছে তাহা দুই জনে ভাগ করিয়া খাইনা কেন?"

গৌরাঙ্গ। "তা হবে না! আপনাকে সব অন্ন খাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া দিয়া সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন স্বহস্তে পরিবেশন করতঃ ঈশ্বর পুরীকে ভোজন করাইলেন ও আপনার জন্য পুনঃ পাক করিয়া লইলেন এবং ভোজনান্তে মাল্য, চন্দন দিয়া পুরীর যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। অন্য দিনে গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বর পুরীকে নিভৃত স্থানে পাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা লইবার অভিলাষ জানাইলেন।

"আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বর পুরী স্থানে;
মন্ত্র দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে।"

পুরী গোঁসাই উত্তর করিলেনঃ

"পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা।"

তৎপরে ঈশ্বর পুরীর নিকট গৌরচন্দ্র দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ সাধারণ লোকের ন্যায় নহে। প্রথমে যত দিন পর্য্যন্ত ব্যাকুলতার উদয় হয় নাই, তত দিন তিনি পরমার্থ সম্বন্ধে চিন্তাও করেন্ নাই। ব্যাকুলতা আসিলে আত্মার বলাবল ও আভ্যন্তরীণ স্পৃহা পরীক্ষা করতঃ গুরু-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া লইলেন এবং শ্রদ্ধা ভক্তির উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিলেন। দীক্ষান্তে নব শিষ্য অভীষ্ট দেবকে নিবেদন করিলেন।

"তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে;
প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে।
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে;
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে।"

তখন গুরু শিষ্যে প্রেমে পুলকিত হইয়া পরস্পর গাঢ়তর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। উভয়ের পুলকাশ্রুতে উভয়ের শরীর অভিসিঞ্চিত হইল; মহা ভাবের পূর্ব্বাবস্থা দেখা গেল।

"শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বর পুরী;
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি।
দোঁহার নয়ন জলে দোঁহার শরীর;
সিঞ্চিত হইলা প্রেমে কিছু নহে স্থির।"

এখন হইতে দিন দিন তাঁহার ধর্ম্ম রাজ্যের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল; দিন

দিন ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতে চলিল। পূর্ব্বের বিদ্যা-গৌরব ও দাম্ভিকতা কোথায় পলায়ন করিল। ভগবৎ প্রেম সাগরে তিনি ভাসিতে লাগিলেন। সে নিমাই পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার সম্বন্ধে দিন দিন সকলই নূতন ও আশ্চর্য্য দেখা যাইতে লাগিল। বিধাতার করুণা হস্ত তাঁহার আত্মাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নবভাবে গঠন করিয়া জগতে হরিভক্তি ও হরিলীলা প্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিল। ইহা-রই নাম নব জীবন লাভ। দীক্ষা গ্রহণের পর কতক দিন তিনি গয়াতে ছিলেন; এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। "কোথা যাই, কোথা যাইলে তাঁহাকে পাই; কেমন করিয়াই বা প্রাণের তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়" নিরন্তর কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, আলাপে কিছুতেই স্বাস্থ্য নাই। কি যেন পাইতে চাই পাই না; কিসের জন্য যেন প্রাণে ফাঁক ফাঁক লাগে; এই যেন ধরি ধরি আবার ধরা দেয় না; কি যেন দেখি দেখি আর দেখিতে পাই না। এই ভাবে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অপ্রেমিক ব্যক্তির পক্ষে ঐ অবস্থা বর্ণনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যাহার অন্তরে এই স্বর্গীয় ব্যাকুলতা বিঁধি-য়াছে, কেবল সেই ইহার বিক্রম বুঝিতে পারে। সময়ান্তরে তিনিই এ কথা এই-রূপে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ—

"এই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে" ইত্যাদি। এক্ষণকার অবস্থা বৃন্দাবন দাস মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন;

"দিনে দিনে বাড়ে প্রেম ভক্তির বিজয়।
এক দিন গৌরচন্দ্র বসিয়া নিভৃতে;
নিজ ইষ্ট মন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে।
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু প্রেম প্রকাশিয়া;
কান্দিতে লাগিলা অতি উচ্চ করিয়া।
কৃষ্ণরে! বাপরে! প্রাণ জীবন শ্রীহরি;
কোন দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা।
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর;
সে প্রভু হইলা প্রেমে আপনে অস্থির।"

চৈঃ ভাঃ

তাঁহার সঙ্গী শিষ্যগণ তাঁহাকে অনেক প্রকারে শান্তনা করিয়া দেশে যাইতে অনু-রোধ করিলে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ! তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে ফিরিব না। আমার প্রাণনাথকে যেখানে যাইলে পাইব, আমি সেই দেশে চলিয়া যাইব।" গভীর রজনী যোগে সমভিব্যাহারী লোক-দিগকে না বলিয়া তিনি মথুরা যাইবেন বলিয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন এবং "কৃষ্ণরে! বাপরে! কোথায় পাইব" এই বলিয়া পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। কথিত আছে যে, যাইতে যাইতে তিনি প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। তিনি দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই-লেন, কে যেন মধুর অস্ফুট শব্দে বলিতে লাগিল—"এক্ষণে মথুরায় যাইবার সময় হয় নাই। সময় হইলে যাইও; এখন নবদ্বীপে প্রতিনিবৃত্ত হও; তোমাকে সংকীর্ত্তন প্রকাশ করিতে হইবে; জগৎবাসীকে প্রেম ভক্তি বিলাইতে হইবে; হরি প্রেমে বঙ্গ-দেশ ডুবাইতে হইবে; এ সব কাজ না করিয়া তোমার সংসার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র

অনেক শান্তি লাভ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই গয়া হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই খানে তাঁহার জীবন-ভাগবতের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নব জীবন লাভ করিয়া নব প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যে নব লীলা আরম্ভ করিলেন তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

তোমার আমার।

দেবি! তোমার আমার,—
কুমুদ সলিলে ভাসে, শশধর নীলাকাশে
বিষাদে মলিন মুখ চির অন্ধকার,
বঞ্চিত মিলন সুখে, সঞ্চিত বিরহ বুকে
অপূর্ণ আশার পূর্ণ ছবি দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

১

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে পাষাণময়, শোভে গারো গিরিচয়,
গগণ ভেদিয়া শির উঠিয়াছে যার,
আমরা উহারি সম, দু'জনেই নিরমম
কঠিন কর্কশ প্রাণ দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

২

দেবি! তোমার আমার,—
ভীষণ সাহারা যথা, নাহি তরু তৃণ লতা
ধূ ধূ করে বালুরাশি অনন্ত অপার,
নাহি বারি-বিন্দু লেশ, সর্ব্বনেশে মরুদেশ
মরীচিকা মাখা সেই প্রাণ দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৩

দেবি! তোমার আমার,—
স্রোত প্রতিকূল বাতে, ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
আছাড়ে আছাড়ে যথা ভাঙ্গে পারাবার,
আপনি আপন বুকে, লুঠিয়া পড়ি গো দুখে
আকুল উন্মত্ত সেই চিত্ত দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৪

দেবি! তোমার আমার,—
সুন্দর সোণার ছবি, ডুবিলেও রাঙ্গা রবি,
গ্রাসে লো জগৎ যথা ঘোর অন্ধকার,
হারায়ে গিয়েছি পথ, নাহি ভূত ভবিষ্যত,
তেমনি জীবন আজি দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৫

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে ভুজঙ্গচয়, ফণা বিস্তারিয়া রয়,
একটু দংশিলে প্রাণ বাঁচেনা কাহার,
ওর চেয়ে হলাহলে, সতত হৃদয় জ্বলে
তবুও মরণ নাই দেখ দু'জনার
প্রিয়ে তোমার আমার!

৬

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে ক্ষিপ্তের মত, জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক কত
অনন্ত গগন রাজ্যে ভ্রমে অনিবার,
আমরাও—হরি হরি! তেমনি সংসার করি
হৃৎপিণ্ড উল্কাপিণ্ড জ্বলে দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৭

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে জলদচয়, ব্যাপিয়া গগনময়
কাঁদিয়া বরষে কত আঁখিনীর ধার,
আমরা তেমনি দুখে, নিত্য কাঁদি অশ্রুমুখে

লুকা'য়ে অশনি বুকে রেখে দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৮

দেবি! তোমার আমার,—
এ'ত গো প্রণয় নহে, প্রণয়ে কি প্রাণ দহে?
হৃদয় পুড়িয়া এযে হ'ল ছারখার,
বুঝিতে পারিনা হায়, কিসে এ যাতনা যায়,
জ্বলিছে পতঙ্গ সম প্রাণ দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার।

৯

দেবি! তোমার আমার,—
আশা ভালবাসা যত; সকলি জন্মের মত
অপূর্ণ রহিল পূর্ণ হইল না আর,
শুধু হাহাকার করি, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি
আর ত হবে না আহা দেখা দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কৃষ্ণদাসী রাজনীতি।

"He came unto his own and they received him."—*Emerson.*

(১) বাবু রামগোপাল সান্যাল প্রণীত ও বেঙ্গলী যন্ত্রে রামকুমার দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ৺রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের জীবনচরিত।

(২) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের ইলবার্ট বিল এবং প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩) কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের বিবিধ আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের কার্য্য বিবরণ।

(৫) হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের লিখিত নানাবিধ প্রবন্ধ।

(৬) ইণ্ডিয়ান মিরর এবং অমৃত বাজার প্রভৃতি পত্রিকায় রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় সাধারণের মতামত।

ইংলণ্ডীয় সাহিত্য জগতের গৌরব লর্ড মেকলে জীবনচরিত-লেখকদিগের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। কখনও কখনও তিনি জীবনচরিত-লেখকদিগের পক্ষপাতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে মস্তিষ্কহীন (idiot) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুত এ সংসারে নিরপেক্ষ জীবনচরিত-লেখক অতি বিরল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, কিম্বা অনুগত লোকদিগের কর্ত্তৃকই প্রায় জনবিশেষের জীবনচরিত লিখিত হয়; সুতরাং পক্ষপাতিত্ব শূন্য প্রকৃত জীবনচরিত্রের অভাব দর্শনে কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই।

মেকলে ইংলণ্ডীয় জীবনচরিত লেখকদিগকে মস্তিষ্কহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের যে সকল সুবিজ্ঞ জীবনচরিত লেখক ভাটদিগের ন্যায় মৃত লোকের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের উপায় অবধারণ করেন, তাঁহাদিগকে কেবল মস্তিষ্কহীন বলিয়া অভিহিত করিলে তাহাদিগের প্রণীত পুস্তকের যথোচিত সমালোচন হয় না। তৃণভোজী বাঙ্গালী-

দিগের স্বভাবতঃই মস্তিষ্ক অতি অল্প। বাঙ্গালী গ্রন্থকার দুই একখানি চটি পুস্তক লিখিলেই তাঁহার তরল মস্তিষ্ক বিলোড়িত হয়। সুতরাং বঙ্গের জীবনচরিত লেখক-দিগকে মস্তিষ্কহীন বলিয়া অভিহিত করিলে তদ্বারা কেবল তাঁহাদিগের জাতীয় স্বভাব ব্যাখ্যাত হয়।

বঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের জীবনচরিত লিখিবার অভ্যাসও ছিল না। ভাটেরাই কেবল ব্যক্তি বিশেষের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া জীবন-চরিতের অভাব মোচন করিতেন। এখনও বঙ্গগ্রন্থকারগণ মধ্যে কেবল দুই একটী লোককেই জীবনচরিত লিখিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। জীবনচরিতের প্রকৃত উপকারিতা আজ পর্য্যন্তও বঙ্গবাসীগণের সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় নাই। জীবনচরিত লিখিবার প্রথা বঙ্গে বিশেষরূপে প্রচলিত না হইলে এবং জীবনচরিত পাঠের প্রকৃত উপকারিতার প্রতি বঙ্গবাসীদিগের দৃষ্টি না পড়িলে এই বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ পুস্তক প্রকাশিত হইবার বড় আশা নাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক, কি বঙ্গ ভাষায়, কি ইংরাজি ভাষায়, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর জীবনচরিত স্বরূপ যে কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই অঙ্গহীন এবং অসম্পূর্ণ। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে করি না। কিন্তু কেবল লেখকের দোষেই যে এইরূপ হয়, তাহা নহে। বাঙ্গালীর জীবন স্বার্থপরতার আধার। দাসত্ব-নিগড়াবদ্ধ বাঙ্গালীর জীবনে কোন উচ্চ ভাব নাই, কোন উচ্চ অভিলাষ নাই, বীরত্বের কোন চিহ্ন নাই, সুতরাং ঈদৃশ জীবনশূন্য লোকের জীবনী কিরূপেই বা শিক্ষাপ্রদ হইবে? বাঙ্গালীর জীবনচরিত সংক্ষেপে তিনটী কথায় নিঃশেষিত হয়—"তিনি জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ করিয়া-ছিলেন; চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার একাদশটী সন্তান জন্মিয়াছিল। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।—এই তো বাঙ্গালীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবনের সমুদয় ঘটনা যদি বিস্তারিত রূপে লিখিতে হয়, তবে আরও তিনটী কথা যোগ করিতে হইবে। তবে অবশ্যই লিখিতে হইবে যে, আজীবন তিনি স্ত্রী এবং কন্যাদিগের গহনার সংস্থানের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, কখন কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠানে যোগ প্রদান করেন নাই।

কিন্তু পরলোকগত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর এ সংসারে সাধারণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় কর্ম্মহীন, অলস জীবন যাপন করেন নাই। ভাল মন্দ সদসদ্ তিনি অনেকানেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে, কৃষ্ণদাসের জীবনী-লেখক ঈদৃশ কর্ম্মশীল জীবনের প্রকৃত ছবি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। কিন্তু বাবু রামগোপাল সন্ন্যাল পাঠকদিগকে সে বিষয়েও নিরাশ করি-য়াছেন।

এক দিকে যদ্রূপ অত্যাচার পীড়িত এবং মহত্ত্বহীন বাঙ্গালী জীবন নীচাশয়-তার আধার হইয়া পড়িয়াছে, পক্ষান্তরে

আবার বঙ্গীয় লেখকদিগেরও তদ্রূপ মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব অবধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালী লেখক কেবল মস্তিষ্কহীন নহেন, তাঁহাকে অধিকন্তু চক্ষু কর্ণ হীন বলিয়া মনে হয়।

আমরা অস্বীকার করিনা যে, মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল বাঙ্গালী নহেন, সকল দেশের লোকেরাই চিরান্ধতা প্রকাশ করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর অন্ধতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম। পিটার প্রাণের ভয়ে তিনবার খ্রীষ্টকে অস্বীকার করিলেন। তিনবার সত্যের অপলাপ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ রোমনগরে সেন্টপিটার কেথিড্রেল সংস্থাপিত হইল। পক্ষান্তরে ব্রুনো (Bruno) এবং গালিলিও সত্যপ্রিয়তার অনুরোধে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নাম বিস্মৃতির সাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া রহিল। ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে যাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যাহারা সত্য এবং ন্যায়ের রাজত্ব সংস্থাপনে যত্নবান, তাঁহারাই কেবল মহৎ বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত, তাহাদিগের জীবনীই কেবল, শিক্ষাপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব সম্বন্ধে সমগ্র মানবমণ্ডলীর চিরান্ধতা নিবন্ধনই প্রকৃত সাধু এবং প্রকৃত মহাপুরুষগণ জীবিতাবস্থায় কিম্বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও, জন সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করিতে কখনও সমর্থ হয়েন না। জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগকে সমাজপ্রচলিত বিবিধ পাপ ও অত্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়, সুতরাং জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহারা সর্ব্বদাই ঘৃণিত এবং অপমানিত হয়েন। প্রকৃত সাধু এবং প্রকৃত মহাপুরুষগণ মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে, জন সাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন। তখন ভাবী বংশ্যগণ তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন।

কিন্তু দেশহিতৈষীর পরিচ্ছদধারী, দেশহিতৈষীর ব্যবসাবলম্বী ঘোর সংসারাক্ত এবং যশোলিপ্সু লোকেরাই কেবল জীবিতাবস্থায় দেশহিতৈষী বলিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয়েন। সমাজপ্রচলিত বিবিধ কুসংস্কার, পাপ ও দুর্নীতি সমর্থন করিয়াই ইহারা চিরবাঞ্ছিত দুর্লভ দেশহিতৈষী নাম লাভ করেন। কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা দেশের অমঙ্গল ভিন্ন কখনও কোন মঙ্গলসাধন হয় না।

বাবু রামগোপাল সান্যালের পূজিত পরলোকগত দেশহিতৈষী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর দেশহিতৈষী ছিলেন, তাহা রামগোপাল বাবুর নিজের লিখিত পুস্তকই সপ্রমাণ করিতেছে। বাবু রামগোপাল সান্যালের পুস্তকের ১২২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে—"পরলোকগত কৃষ্ণদাস পাল কলিকাতা নগরে জলের কল সংস্থাপনের প্রস্তাব হইলে পর, তৎসম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কলের জল ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ—হিন্দুরা কখন কলের জল ব্যবহার করিবেন না—ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস পাল আপত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তিনি এই বিষয়ে আপত্তি করিলেন।"

আবার স্থানান্তরে রামগোপাল বাবু

উল্লেখ করিয়াছেন, (রামগোপাল বাবুর পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

"কৃষ্ণদাস পাল বঙ্গের নব্য সম্প্রদায়ের সমর্থনে তাঁহার "Young Bengal Vindicated" নামাঙ্কিত প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "নব্য বাঙ্গালী তাঁহার দেশের সংস্কারক।" নব্য বাঙ্গালী ওয়ালেসের সদৃশ অশঙ্কিত হৃদয়ে এবং লুথারের ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেশপ্রচলিত কুসংস্কার এবং অপধর্ম্মের দুর্গ আক্রমণ করিতেছেন। দুর্গের বহির্ভাগ, এবং অন্তর্বিভাগেরও কতকাংশ নব্য বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা সমাজ সংস্কারের কথায় কর্ণপাত করেন না, তাঁহারা তাঁহাদিগের ভগ্নী এবং কন্যার উন্নতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। কিন্তু নব্য বাঙ্গালীগণ এই সম্বন্ধে ভারতবন্ধুদিগের সকল প্রকার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগের সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন, সকল প্রকার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। নব্য সম্প্রদায়ই বেথুন সাহেবের অনুষ্ঠিত সংস্কার কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। নব্য সম্প্রদায়ই রাজা রামমোহন রায়ের পরম পবিত্র মহৎ অনুষ্ঠানকে এ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন। রাজা রাম রামমোহন রায়ের পবিত্র নাম শ্রবণে প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর শিরা চঞ্চল বেগে কার্য্য করিতে থাকে। প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। বিধবা বিবাহের আইন জারির প্রার্থনায় নব্য বাঙ্গালীগণই সহস্র সহস্র দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। নব্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগের বিনির্ম্মিত দেশাচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বিদেশ পরিদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। নব্য সম্প্রদায়ের কৃতকার্য্যতার বিষয় আর অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। এ দেশের যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তৎসমুদয়ই নব্য সম্প্রদায়ের যত্নে ও চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি।"

পরলোকগত কৃষ্ণদাস পাল যৌবনের প্রারম্ভে নব্যসম্প্রদায় সম্বন্ধে ঈদৃশ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন; দেশ-প্রচলিত কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। এই সময় ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায় একবার তাঁহার জীবনে ন্যায় ও সত্যপ্রিয়তার জ্যোতি বিকশিত হইল। কিন্তু ঈদৃশ দেশ সংস্কারকের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গসমাজে কথঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করিবামাত্রই তাঁহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল। লব্ধ প্রাধান্যের প্রতি তখন বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। সংস্কারের পথে অধিকতর অগ্রসর হইলে আর সে প্রাধান্য সংরক্ষিত হয় না, সুতরাং লব্ধ প্রাধান্য সংরক্ষণার্থ তাঁহাকে পথান্তর অবলম্বন করিতে হইল। বঙ্গসমাজে প্রাধান্য লাভের পর, কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর কি সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে, কি রাজনৈতিক কৌশল সম্বন্ধে স্বতন্ত্রপথ অবলম্বন করিলেন। জনসাধারণের সদ্ভাব রক্ষার্থ তিনি হরিভক্ত হইলেন; কলের জল ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া কলিকাতা নগরে জলের কল সংস্থাপন সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন। দেশকাল প্রচলিত অবস্থা কৃষ্ণ দাস পালকে আবার হিন্দুধর্ম্মের খোঁয়াড়ে লইয়া বান্ধিয়া রাখিল!!

বঙ্গের যুবক সংস্কারকদিগের ঈদৃশ পরিণাম দর্শনে আমাদিগের বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। কৃষ্ণদাস পাল স্বীয় অবলম্বিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল প্রকৃত দেশহিতৈষিতার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিলে, জীবিতাবস্থায় কখন তিনি প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। হঠাৎ দেশহিতৈষী হইতে হইলে সমাজপ্রচলিত বিবিধ কুসংস্কার, কুৎসিত দেশাচার, এবং রাজনৈতিক অত্যাচার প্রভৃতি সময়ে সময়ে সমর্থন করিতে হয়। রামগোপাল বাবুর উল্লিখিত দেশহিতৈষী কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রাধান্য প্রকৃত দেশহিতৈষীতারূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে। সমাজপ্রচলিত মত-সমর্থন স্বরূপ ভিত্তির উপরই সে প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর সমাজসংস্কারক ছিলেন না। তাঁহাকে সমাজ সংস্কারক স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করা হইবে। তিনি দেশের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপেও রাজনৈতিক সমালোচনাতেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার অবলম্বিত রাজনৈতিক কৌশল আত্মপ্রাধান্য (self-aggrandisment লাভের আশায় ব্যবহৃত হইতেছিল, না তিনি স্বদেশের হিতকামনায় তদ্রূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই কেবল এক মাত্র বিচার্য্য। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কারক স্বরূপ পরলোকগত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের দেশ হিতৈষিতার সমগ্র পরিচয় প্রদান এবং তাঁহার ভক্ত রামগোপাল বাবুর পুস্তকের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আমরা এই স্থানে অন্য একটী বিষয় উল্লেখ করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। অতএব সেই বিষয়টীই অগ্রে উল্লেখ করিতেছি।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে ইলবার্ট বিলের সমালোচনা আরম্ভ হইলে পর, সমগ্র ভারতে ঘোর রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধেও তখন আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই সময় এই সকল আন্দোলন সম্বন্ধে কোন একটী বঙ্গীয় লেখক হবীবর বেদান্তবাগীশ নামে আপন পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক রামায়ণ নাম প্রদানান্তর একখানি হাস্যরস পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের তৈলিকনন্দন শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা কিছু লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিয়া আমরা তখন মনে করিলাম যে, লেখক কৃষ্ণদাস পালকে তৈলিকনন্দন নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু লেখকের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। লেখক কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে তৈলিকনন্দন নামে অভিহিত করিয়াছেন, কি তৈলিকনন্দন লেখকের কোন কল্পিত নাম; তাহা নিশ্চয় অবধারণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। লেখক তৈলিক নন্দনকে বঙ্গীয় দেশ হিতৈষীর পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন। বঙ্গীয় সমুদয় দেশহিতৈষী, দেশসংস্কারক এবং ধর্ম্মসংস্কারক প্রায় এক সাজেই গঠিত। সুতরাং প্রাগুপ্ত হবীবরের কল্পিত তৈলিকনন্দন নাম দেশহিতৈষী চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু এবং ধর্ম্ম সংস্কারক সেন, দাস সকলের প্রতি সম-

ভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু এই লেখকের কল্পিত তৈলিক নন্দন যদ্রূপ দেশ হিতৈষী ছিলেন, আমরাও রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পালকে তদ্রূপ দেশহিতৈষী বলিয়া মনে করি। প্রাগুপ্ত লেখকের কল্পিত তৈলিক নন্দন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

—"বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিত ডার্ উইন বলেন যে, বানর সমুন্নত হইলে মানুষ হয়। কিন্তু আমাদিগের এই স্বর্ণ লঙ্কায় তদ্বিপরীতাবস্থা অবলোকন করিতেছি। হইতে পারে ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রদেশে বানর সমুন্নত হইয়া মনুষ্যাকার ধারণ করে। কিন্তু অস্মিন্‌দেশে মনুষ্যগণের বয়োবৃদ্ধি সহকারে যশঃ ও প্রভুত্ব লাভ হইবামাত্র যে তাঁহারা বানর রূপ ধারণ করেন, তাঁহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। লঙ্কাদ্বীপাধিবাসিগণ, স্কুল কলেজে বিদ্যাভ্যাস সময় ক্ষীণজীবি মনুষ্যের ন্যায় যৌবন মদে মত্ত হইয়া দুর্বুদ্ধি বশতঃ রাইট্‌স্ এবং প্রিভিলেজ (Rights and Previlege) বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু দেশ কাল মাহাত্ম্য অনুসারে তাঁহারা সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনাদিগের (গবর্ণমেণ্টের) কর্ত্তৃক রম্ভা প্রদত্ত হইবা মাত্র, তাদৃশ মনোহর ফলের সুগন্ধে বিমোহিত হইয়া নিস্তব্ধ ও গম্ভীরভাবে বৃক্ষ শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক, সর্ব্বচিন্তাপহারিকা সুষুপ্তিকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয়েন"।

হবীবর বেদান্তবাগীশ তাঁহার পুস্তকের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—

"মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্যাবসানে বলিতে লাগিলেন,—বৎস! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তোমার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হইয়াছে; সুতরাং বয়োবৃদ্ধি সহকারে তুমি সমুন্নত হইয়া বানরপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি একটা কোকিলের ডাক শুনিবামাত্রই তোমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়া থাকে; যদি একটা দাত্যূহ পক্ষীর ধ্বনিতে তোমাকে পাগল করিয়া তুলিয়া থাকে এবং আত্মসুখ এবং আত্মরক্ষাকেই যদি তুমি একমাত্র ধর্ম্ম মনে করিয়া থাক; তবে তোমার দ্বারা কস্মিনকালেও সীতার উদ্ধার হইবেক না। বৎস! তুমি সীতার আশা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক একটী অনাথা বঙ্গীয় বিধবাকে সনাথা কর। প্রকৃত বীরপুরুষদিগের মস্তকের উপরে শত শত কাক ও কোকিল উড়িয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের আন্তরিক প্রতিজ্ঞা—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—কিছুতেই বিচলিত হয় না।"

হবীবর বেদান্তবাগীশ বঙ্গের দেশহিতৈষীদিগকে যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, পরলোকগত কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর এবং বঙ্গের বর্ত্তমান অনেকানেক দেশহিতৈষী যে তদ্রূপ দেশহিতৈষী, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, যৌবনের প্রারম্ভে কৃষ্ণদাস পাল রাজা রামমোহন রায়ের এক জন বিশেষ ভক্ত ছিলেন, বিধবা বিবাহ এবং স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু পরে যখন কৃষ্ণদাস পালের বঙ্গ সমাজে প্রাধান্য লাভ হইল; যখন সার রিচার্ড টেম্পেলের সময় হইতে ক্রমান্বয়ে বঙ্গের সমুদায় লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কৃষ্ণ-

দাসের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখনই কৃষ্ণদাস পালের আচরণ রূপান্তরিত হইল। এক দিকে লোকানুরাগের অনুরোধে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অনুষ্ঠানের বিরোধী হইলেন, বিধবা বিবাহ অন্যায় বলিয়া প্রকাশ অরিতে লাগিলেন, এবং একেবারে হিন্দুসমাজের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের একটী সর্ব্বপ্রধান ভক্ত হইয়া উঠিলেন; পক্ষান্তরে আবার গবর্ণমেণ্টের দুই একটী অবৈধ * আচরণ সমর্থন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ইংরাজ সৈন্যের সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে তাহাদিগকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সৈন্য বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু এই সময় হইতে কৃষ্ণদাস বিশেষ রাজভক্ত হইলেন। ইংরাজ সৈন্যদিগকে "আমাদের সৈন্য" বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিলেন। আমাদের সৈন্য আফগানস্থানে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া পাওনিয়ার প্রভৃতি এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদিগের ধূঁয়া ধরিলেন। এইরূপে কৃষ্ণদাসের রাজনৈতিক কৌশল রূপান্তরিত হইতে লাগিল।

পাঠকগণ এই সকল বিষয় একটু বিশেষ চিন্তা সহকারে পাঠ করিলেই হবীবর বেদান্তবাগীসের চিত্রিত বঙ্গীয় দেশহিতৈষীদিগের সঙ্গে পরলোকগত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের আচরণের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, তাহা সহজেই অবধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

বস্তুতঃ এ হতভাগ্য বঙ্গ দেশীয় লোকের কোন প্রকার প্রাধান্য লাভ হইলেই তাঁহাদিগের আচরণ একেবারে রূপান্তরিত হইয়া যায়। কখনও কখনও তাঁহারা এতদূর রূপান্তরিত হইয়া পড়েন যে, পরে আর তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া চিনিবার সাধ্য থাকে না।

ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ও বিকাশের (Evolution) মূল কারণ বঙ্গের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বঙ্গের সামাজিক কুসংস্কার এবং বঙ্গের কুৎসিৎ দেশাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে, জন সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইতে হয়। আবার ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করিলে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, সুতরাং জন সাধারণের সদ্ভাব রক্ষার্থ সমাজ প্রচলিত বিবিধ দূষিত আচার ব্যবহারের সমর্থন, এবং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অন্যায়াচরণ সম্বন্ধে কৌশলপূর্ণ প্রতিবাদই এখন এ দেশীয় লোকদিগকে সহজে দেশহিতৈষী এবং দেশসংস্কারের পদ প্রদান করিতে পারে। বঙ্গের ঈদৃশ দেশহিতৈষী, ঈদৃশ সমাজ সংস্কারক এবং ঈদৃশ সমাজের অগ্রণীদিগের আচরণ ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আর অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশে যদি কেহ প্রকৃত দেশহিতৈষী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার যশ; এবং পদ প্রভুত্ব লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া এক দিকে সমাজ সংস্কারার্থ সর্ব্ব প্রকার সামাজিক কুসংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে; পক্ষান্তরে আবার গবর্ণমেণ্টের প্রসন্নতা লাভের স্পৃহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দেশের রাজনৈতিক অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। আর

* এই সকল অবৈধ আচরণ পরে যথা স্থানে উল্লিখিত হইবে।

কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার না করিয়া সমাজ সংস্কারক এবং দেশহিতৈষী হইবারও বিলক্ষণ উপায় রহিয়াছে। প্রাচীন "আর্য্য-ধর্ম্ম" "আর্য্য সভ্যতা" "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" বলিয়া কিছুকাল চীৎকার করিলেই লোক সহজে সমাজসংস্কারক হইতে পারে। এবং সার্ জন চাইল্ড * (Sir John Child.) সদৃশ দস্যু বৃত্তি অবলম্বনকারী গবর্ণরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সুদীর্ঘ অভিনন্দন প্রদান করিলেই অনায়াসে দেশহিতৈষী নাম লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

বাবু রামগোপাল সান্ন্যাল এই শেষোক্ত শ্রেণীর দেশহিতৈষীর জীবনী লেখক স্বরূপ সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রণীত পুস্তকখানি বোধ হয় তাহার প্রথম চেষ্টার ফল।

কৃষ্ণদাস পাল হবীবরের চিত্রিত বঙ্গীয় দেশহিতৈষী হইলেও, তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনা যে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহার জীবনের সেই সকল ঘটনা রামগোপাল বাবু বিশেষ সুস্পষ্টরূপে পাঠকদিগেরর দৃষ্টি পথে সংস্থাপন করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণদাসের বিবিধ কার্য্য-কলাপের মধ্যে রামগোপাল বাবু ঔচিত্য, ন্যায়পরতা এবং সঙ্গতভাব প্রদর্শন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। আজ কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে ভারতবর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা কোন কার্য্যের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, কাল লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কোন বিষয়ে তাহার সাহার্য্যের প্রার্থী হইলেন; এই সকল বিষয়ের সমুল্লেখ দ্বারাই রামগোপাল বাবু—স্বীয় আরাধ্য দেবতার মহত্ত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা কিম্বা লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের অনুরোধানুসারে কার্য্য করিয়া কৃষ্ণদাস পাল ন্যায়ানুগত আচরণ করিয়াছেন কিনা, তৎসম্বন্ধে রামগোপাল বাবু কিছুই বলেন নাই। লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা এবং লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের অনুরোধ স্বয়ং কৃষ্ণদাস পালকে তাঁহার জীবিতাবস্থায় যদ্রূপ উল্লসিত করিত, কৃষ্ণদাস পালের জীবন-চরিত লেখক বাবু রামগোপাল সান্ন্যালও তদ্রূপ উল্লসিত হইয়া এই সকল বিষয় তাঁহার প্রণীত পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের কার্য্যের ঔচিত্যানুচিত্য তিনি প্রদর্শন করেন নাই।

লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কিম্বা গবর্ণর জেনেরেলের সাদর সম্ভাষণ, অনুগ্রহ এবং অনুরোধ পত্রই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্ত্বের একমাত্র অখণ্ডনীয় প্রমাণ নহে। বঙ্গে হয়তো কোন কালে এইরূপ লেফটেনাণ্ট গবর্ণরও ছিলেন যাহার উষ্ণীষ বেশ্যা কিম্বা নারী-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতা কুলটাদিগের চরণেও অবলুণ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং যদি লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের সাদর সম্ভাষণই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র প্রমাণ হয়, তবে প্রাগুক্ত কুলটাদিগকেও অতি শ্রেষ্ঠ দেশহিতৈষী বলিয়া তাহাদিগের এক খানি জীবনচরিত লিখিতে হইবে। রাম-গোপাল বাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া অনি-

---

* Sir John Child is said to have seized thirteen large ships at Surat, the property of the merchants of the place, and to have retired with his shameful spoil to Bombay. It afterwards appeared on oath in the Court of Exchequer that the value of this spoil was 30,00,000 lacs of Rupees. Vide White's Account of Indian Trade.

বার্য্যরূপে আমাদিগের মনে এইরূপ সংস্কার হইয়াছে যে,গ্রন্থকর্ত্তা মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব অবধারণে একেবারেই অসমর্থ।

তৃতীয়তঃ, রামগোপাল সান্যালের প্রণীত পুস্তক খানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের শাসন সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান ঘটনার সঙ্গেই কৃষ্ণদাস পালের বিশেষ সংশ্রব ছিল। সেই সকল বিষয়ের বিস্তারিত সমুল্লেখ ভিন্ন রায় কৃষ্ণপাল বাহাদুরের কার্য্যকলাপের উপকারিতানুপকারিতা পাঠকগণ বিচার করিতে সমর্থ হইবেন না।

আমরা শুদ্ধ কেবল রামগোপাল বাবুর এই অসম্পূর্ণ পুস্তক সমালোচনার্থ এইরূপ দীর্ঘ কোন প্রবন্ধ লিখিতামনা। বঙ্গদেশের অনেকানেক লোকই কৃষ্ণদাসের অবলম্বিত রাজনীতির বিশেষ পক্ষপাতী। কৃষ্ণদাসী রাজনীতির সমালোচনাই আমাদের এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাবু রামগোপাল সন্যালের প্রণীত পুস্তক সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই অসম্পূর্ণ পুস্তকে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রকৃত ছবি প্রতিবিম্বিত হয় নাই। সুতরাং রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের মতামত পাঠকদিগের অবগত্যর্থ এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে কলিকাতা নগরের বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থিত একখানি ক্ষুদ্র গৃহে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল এই সময়ে পনের টাকা বেতনে শিবকৃষ্ণ দত্তের পাটের দোকানে কার্য্য করিতেন। কৃষ্ণদাসের পিতার বিশেষ অর্থের সংস্থান ছিল না। সুতরাং বাল্য শিক্ষার পর, কৃষ্ণদাস প্রগাঢ় অধ্যবসায় এবং আত্মাবলম্বন দ্বারাই ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেন। কিছুকাল তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রগাঢ় অধ্যবসায় এবং আত্মাবলম্বনই কৃষ্ণদাসের ভাবী উন্নতির একমাত্র মূল কারণ ছিল। বঙ্গদেশে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের ন্যায় অপর কেহ শুদ্ধ কেবল অধ্যবসায় এবং আত্মাবলম্বন দ্বারা এতদূর উন্নতি লাভ করেন নাই। বঙ্গদেশীয় লোকের তিনটী সদ্গুণের সম্পূর্ণ অভাব। বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই, বাঙ্গালীর মধ্যে আত্মাবলম্বন এবং আত্মসম্মানের ভাব নাই। কিন্তু এই তিনটী সদ্গুণই কৃষ্ণদাস পালের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, কৃষ্ণদাস পাল আলীপুরের জজের ট্রান্সলেটরের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদের বেতন বোধ হয় ১০০ এক শত টাকা ছিল। আত্মসম্মান-বিবর্জ্জিত বাঙ্গালীজাতি গবর্ণমেণ্টের অধীনে পদ লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই লালায়িত। কিন্তু এই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পাল বাঙ্গালী সাধারণের অসদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নাই। তিনি অনতিবিলম্বে এই পদ পরিত্যাগ করিয়া ১২৫ টাকা বেতনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণদাসের ঈদৃশ পদত্যাগ তাঁহার জীবনের একটী মহদ্গুণের পরিচায়ক। আবার এই পদত্যাগই তাহার ভাবী

সৌভাগ্যের বীজ বপন করিয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল সাধারণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় যদি গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ পদের প্রলোভন পরিত্যাগে অসমর্থ হইতেন, তবে আর তাঁহার নামের ধ্বনিতে সমগ্রভারত কখনও নিনাদিত হইত না। বঙ্গদেশে কৃষ্ণদাস পাল নামে যে কোন লোক জন্মিয়া ছিলেন, তাহাও জনসাধারণ জানিতে পারিতেন না। কৃষ্ণদাস পালের জীবনের এই ঘটনা বাঙ্গালীদিগের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণের উপযুক্ত। উচ্চাভিলাষ শূন্য ক্ষুদ্রাশয় বাঙ্গালীর জীবনের কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই। কৃষ্ণদাসের জীবনী স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দিতেছে যে, যাহার জীবনে উচ্চ লক্ষ্য নাই, উচ্চাভিলাষ নাই, তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বও নাই।

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের সময় হইতেই কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু পেট্রিয়টের সুবিখ্যাত সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তখন পর্য্যন্ত মৃত্যু হয় নাই। সম্পাদকের ভার এই সময় তাঁহার হস্তেই ছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর কিছু কাল বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হইলেন। তৎপর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পাল হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হইবার পর, ক্রমেই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে পেট্রিয়টের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর যে, বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে পেট্রিয়টের সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু তাঁহার পত্রিকার নাম পেট্রিয়ট ছিল বলিয়া তাঁহাকে আমরা পেট্রিয়ট কিম্বা দেশহিতৈষী নামের উপযুক্ত বলিয়া মনে করি না। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ লোক ছিলেন। অন্যান্য অনেকানেক সদ্‌গুণও তাঁহার মধ্যে ছিল। বঙ্গ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়া তিনি অনেকানেক লোকের উপকার করিয়াছেন। কিন্তু নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতকর কার্য্যে কখন ব্যাপৃত হয়েন নাই, সর্ব্বদাই হাতের পাঁচ হাতে রাখিয়া কার্য্য করিতেন।

তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিসনারের পদে নিযুক্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত মিউনিসিপালিটীর কার্য্য করিয়াছেন। একদিকে যেরূপ বঙ্গের অদ্বিতীয় রত্ন মহামান্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে, স্বীয় পদোচিত কর্ত্তব্যসাধন করিয়া, বাঙ্গালী যে উচ্চ পদের অনুপযুক্ত নহে, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে রায় কৃষ্ণদাসপাল বাহাদুর তদ্রূপ বিজ্ঞতা সহমিউনিসিপালিটীর কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মৃত রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একটী প্রধান অঙ্গ ছিলেন। লর্ড ইউলিক ব্রাউন (যিনি ইংরাজি ভাষা অপরিজ্ঞাত বাঙ্গালীদিগের নিকট উল্লুক নামেই পরিচিত) কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হইয়া, বাঙ্গালীদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্যোগ করিলে পর, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর বিশেষ তেজস্বিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কমিসনারদিগের অধিকার রক্ষার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।

রায় কৃষ্ণদাস পালের জীবনীলেখক কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে দেশহিতৈষীর পরিচ্ছদ প্রদানান্তর সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াই তাঁহার জীবনচরিত খানি শিক্ষাপ্রদ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। রায় কৃষ্ণদাস পালের সমুদয় কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে কেহই তাঁহাকে দেশহিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর যে বিশেষ বিজ্ঞতার সহকারে আপন পদোচিত বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের অবলম্বিত এবং তাঁহার প্রতিপাদিত রাজনৈতিক কৌশল আমরা যারপর নাই দূষিত এবং ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করি। তিনি বলিতেন, কলে কৌশলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বশীভূত করিয়া, স্তব স্তুতি দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিয়া, গবর্ণমেণ্ট হইতে এক একটী রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে হইবে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমার পর জাতীয় ভাণ্ডার (National Fund) সংস্থাপনের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর স্বীয় পত্রিকায় যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাও তিনি ঈদৃশ রাজনৈতিক কৌশল প্রতিপাদন করেন। কিন্তু বিগত কালের ইতিহাস-প্রতিপাদিত শিক্ষা এবং বিগত শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতা ঈদৃশ রাজনৈতিক কৌশলকে যে কেবল ভ্রমাত্মক বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে, তাহা নহে; ইতিহাস-প্রতিপাদিত শিক্ষা ঈদৃশ কৌশলের অসারতা এবং অপকারিতা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে।

প্রথমতঃ রাজনৈতিক কৌশল নামে অভিহিত বিবিধ কপটাচরণে ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিতে পারে, এইরূপ কোন জাতি পৃথিবীতে নাই। কৌশলের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতবাসী জন সাধারণ যে কোন অধিকার লাভ করিবেন, তাহার কোন আশা নাই। হীনবুদ্ধি ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা ইংরাজগণ শতগুণে অধিকতর বুদ্ধিমান ও কৌশলী। রাজনৈতিক কৌশল ও কপটাচরণ সম্বন্ধে পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটী গ্রাম্য বালক এবং চীনাবাজারের একজন চিরাভ্যস্ত প্রতারকের মধ্যে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে, ভারতবাসী এবং ইংরাজদিগের মধ্যে ঠিক তদ্রূপ বিভিন্নতা। সুতরাং রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রতিপাদিত কৌশলের মত যে নিতান্ত অসার, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ অতীত ইতিহাস আমাদিগকে কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুদ্ধ কেবল অর্থ সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত ভারতে আগমন করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ রাজ্য লাভের প্রারম্ভে এবং তৎপূর্ব্বে কখনও কখনও সাধারণ দস্যুদিগের ন্যায় এদেশীয় লোকের সম্পত্তি অপহরণ করিতেন। এবং তাহাদিগের ঈদৃশ দস্যুবৃত্তি কোর্ট অব ডিরেক্টর ইংলণ্ডীয় জন সাধারণের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। সার্ জন চাইল্ড (Sir John Child) নামে বম্বের একজন গবর্ণর সুরাটে (Surat) দেশীয় বণিকদিগের তেরখানা বাণিজ্যের নৌকার উপর ডাকাতি করিয়াছিলেন। এই বণিক-

দিগের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন বিবাদ ছিলনা। অর্থ লোভে সাধারণ দস্যুগণ যদ্রূপ ডাকাতি করে, সার্ জন্ চাইল্ড কেবল অর্থাপহরণ করিবার নিমিত্ত ঠিক তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টর এই ডাকাতি গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। কোর্ট অব এক্চিকার (Court of Exchequer) সম্মুখে হলপান জবানবন্দিতে এই অপহৃত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ত্রিশ লক্ষ টাকা সাব্যস্ত হইল। কোম্পানী আপন কর্ম্মচারীদিগকে ঈদৃশ কুকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু পরে এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার কিরূপে নিবারিত হইল? ভারতবাসীগণ কি স্তব স্তুতি করিয়া পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ঈদৃশ দুর্ব্ব্যবহার হইতে বিরত করিয়াছিলেন? না কোন রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইতে অব্যহতি লাভ করিলেন?

ইংলণ্ডেশ্বর প্রদত্ত চার্টার অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের অন্যান্য লোককে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করিতে দিতেন না। সুতরাং ইংলণ্ডবাসী অন্যান্য লোক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রহিত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে ঘোর রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। শতাধিক বৎসর যাবৎ এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রহিত করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের জন সাধারণ, ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুষ্ঠিত বিবিধ অত্যাচার, দুর্ব্যবহার, এবং নৃশংসাচরণ ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের গোচর করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ আন্দোলন হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার এবং দুর্ব্যবহার দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। বস্তুত ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে যে, রাজনৈতিক আন্দোলন ভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালী সংস্কারের অন্য কোন উপায় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন না হইলে তাহারা কখন ভারতের সুশাসনার্থ কোন সুনিয়ম অবলম্বন করিতেন না।

কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ঈদৃশ রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতার দিনে কেহ রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকারিতা অস্বীকার করিলে তৎক্ষণাৎই তাহাকে অপদস্থ হইতে হয়। সুতরাং পাল বাহাদুর রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকারিতা অস্বীকার করিতেন না। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি এক প্রকার স্বতন্ত্র মত প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই স্বতন্ত্র মত, তাঁহার লিখিত জাতীয় ভাণ্ডার (National Fund) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত অন্যান্য, শত শত প্রবন্ধে বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পাল বাহাদুর বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক বলিতেন যে, যেরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে বাধা প্রদান করে (agitation which embarasses the Government) তাহা পরিহার করিতে হইবে। হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত জাতীয় ভাণ্ডার (National Fund) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে

কৃষ্ণদাস পাল বলিয়াছেন, জাতীয় ভাণ্ডার সংস্থাপন দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী একটী চিরস্থায়ী পক্ষ সৃষ্ট হইবে, সুতরাং তদ্দ্বারা অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবার সম্ভব নাই।

কিন্তু যে সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের অন্যায়াচরণ নিবারণার্থ ঈদৃশ চিরস্থায়ী পক্ষের অভাব রহিয়াছে, সে সকল দেশের রাজনৈতিক সংস্কার কখন সম্ভবপর নহে। চীন এবং পারস্য প্রভৃতি দেশই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই সময় পাল বাহাদুর এদিকে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাকে ভারতসভার সভ্যদিগের কার্য্য কলাপের প্রতিবাদ করিতে হইত। কিন্তু আবার একেবারে প্রকাশ্যরূপে গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিলে দেশীয় লোকের উপর পাল বাহাদুরের কোন প্রভুত্ব থাকে না। সুতরাং পাল বাহাদুর অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য দ্বারা এক বাক্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকারিতা এবং অনুপকারিতা উভয়ই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। পাল বাহাদুরের মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করিয়া অমৃত বাজারের সম্পাদক বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে বলিয়াছেন যে, "দুই পক্ষ রক্ষা করিবার চেষ্টা কৃষ্ণদাস পালকে অত্যন্ত সঙ্কটে নিপতিত করিয়াছিল, এবং তদ্রূপ সঙ্কটাপন্নাবস্থাই কৃষ্ণদাসের অকাল মৃত্যুর অন্যতর কারণ।"

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর কখনও দেশহিতৈষী ছিলেন না। শুদ্ধ কেবল স্বার্থসাধনই তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল। সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদিত রাজনীতিকে আমরা "কৃষ্ণদাসী রাজনীতি" নামে অভিহিত করিয়া জন সাধারণের নিকট ঈদৃশ রাজনীতির অনুপকারিতা সপ্রমাণ করিলাম।

আমরা স্বীকার করি যে, কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক স্বরূপ প্রথম কয়েক বৎসর সাধারণের মঙ্গলার্থ বিশেষ তেজস্বিতা সহকারে লেখনি ধারণ করিয়াছিলেন। রোডসেস্ সংস্থাপনের সময় তিনি সার জর্জ কেম্বেলের কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, জমিদারদিগের প্রসন্নতালাভ ইত্যাদি নীচ অভিলাষ কৃষ্ণদাসকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য (Individuality) বিবর্জ্জিত করিয়াছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কৃষ্ণদাস পাল একেবারে জমিদারদিগের বেতনভোগী ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশ আইন জারির পর, প্রজা এবং ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনোভঙ্গ উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। ঈদৃশ মনোভঙ্গ ১৮৭৩ সনের পাবনা প্রজাবিদ্রোহের পর দিন দিন ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাগুপ্ত ১৮৭৩ সনের পর রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর জমিদারদিগের উকীল স্বরূপ কেবল জমিদারদিগের পক্ষই সমর্থন করিতেন। প্রজার মঙ্গলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

রায় কৃষ্ণদাস পালের জীবনচরিত লেখক বাবু রামগোপাল সান্যাল তাঁহার প্রণীত পুস্তকের ১৬৭ এবং ১৬৮ পৃষ্ঠায় প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পালের সুদীর্ঘ বক্তৃতা হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া, কৃষ্ণদাস পালের নিরপেক্ষতা সপ্রমাণ করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রামগোপাল বাবু একটু অল্প কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের সমুদয় বক্তৃতাটী পাঠ করিলে, পাল বাহাদুরের বক্তৃতার প্রাগুপ্ত কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতে কখনও সাহস করিতেন না। রামগোপাল বাবুর পুস্তকের প্রধান দোষ এই যে, এই পুস্তকে পাল বাহাদুরের কোন কোন বক্তৃতার দুই একটী কথা মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণদাস পালের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমাত্মক সংস্কার উপস্থিত হইবার সম্ভব।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ—ব্যবস্থাপক সমাজে প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপির সমালোচনা আরম্ভ হইলে পর, প্রথমত ইলবার্ট সাহেব কৌন্সিলে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত উপলক্ষে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিলেন। তৎপরে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিবিধ আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক আপন বক্তব্য বিষয় বলিতে লাগিলেন। পাল বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিলেন, তিনি কেবল জমিদারদিগের স্বার্থ সমর্থনার্থ কৌন্সিলে উপস্থিত হয়েন নাই, কোটী কোটী প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিও তাহার দৃষ্টি রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে প্রজার স্বার্থ সমর্থনের একটী কথাও ছিল না। জমিদারগণ কখনও কখনও গবর্ণমেণ্টকে ঋণ প্রদান করিয়া সাহায্য করেন, জমিদারগণ বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মুক্ত হস্তে চাঁদা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের আনুকুল্য করেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে ক্ষমতা প্রদান করিলেই ভাল হয়; এইরূপ কতকগুলি অসার কথা তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে ছিল। রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের বক্তৃতা শেষ হইবা মাত্রই উদারচেতা মেজর বেয়ারিং রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক পরিহাসচ্ছলে বলিলেন,—

"রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রজা ভূম্যধিকারী উভয়ের স্বার্থ সমর্থন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে প্রজার স্বার্থ সমর্থনের একটী শব্দও শুনিতে পাইলাম না। তিনি যাহা কিছু বলিলেন, তৎসমুদয়ই জমিদারের পক্ষ সমর্থন করে।" ইত্যাদি (১৮৮৩ সনের মার্চ্চ মাসের ইণ্ডিয়া গেজেট দ্রষ্টব্য)

জমিদারদিগের স্বার্থ রক্ষার আগ্রহাতিশয় রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে কখনও কখনও ন্যায় ও বিবেকের পথ ভ্রষ্ট করিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁইতি (কাঁথি) সব ডিবিসনের খাষ মহলের প্রজাদিগের কর বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যখন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বিবিধ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণদাস পাল গবর্ণমেণ্টের একজন বিশেষ সাহায্যকারী হইলেন। খাষ মহলের কর বৃদ্ধির আইনে কৃষ্ণদাস পাল সম্মতি প্রদান করিলেন। আমিরআলী কেবল এই আইন সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের মতানুসারে এই অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ হইল। কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের কোন বন্ধু তাঁহার নিকট লিখিলেন, ঈদৃশ অন্যায় আইনে তিনি কিরূপে সম্মতি প্রদান করিলেন? প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণদাস পাল লিখিলেন যে,

গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকেও ঈদৃশ কর বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদানার্থ শীঘ্রই নূতন আইন জারি করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সুতরাং জমিদারদিগের স্বার্থের অনুরোধে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইয়াছে। এই গোপনীয় বিষয় কাহারও জানিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের মৃত্যুর পর ইণ্ডিয়ান মিররের কোন পত্র প্রেরক এই বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়টী কত-দূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। কিন্তু এই ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। এই ঘটনা যদি সত্য হয়, এবং ইণ্ডিয়ান মিররের সংবাদদাতা যদি মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়া না থাকেন, তবে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর যে কিরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, তাহা জন সাধারণ সহজেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

আদালত অবজ্ঞার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দণ্ডিত হইলে পর, কৃষ্ণদাস পাল ইণ্ডিয়ান মিরর এবং ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদকের ন্যায়, বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষাবলম্বন করেন নাই, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য দর্শনে যখন দেশের সমগ্র লোক তাঁহার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি স্বীয় পদ সংরক্ষণার্থ ক্ষীণ স্বরে দুই চারি কথা লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

লর্ড লিটনের প্রণীত মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন (Vernacular Press Act) রহিত করাইবার উদ্দেশ্যে ভারতসভা বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ভারতসভার সঙ্গে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ মাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন রহিত করাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণদাস পাল কিঞ্চিৎ মাত্রও চেষ্টা ও যত্ন করেন নাই।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন (Vernacular Press Act) বিধিবদ্ধ হইলে পর, কৃষ্ণদাস পাল পেট্রিয়টে লিখিলেন—

"And when it is remembered that the Government is now presided over by a statesman, who is himself a votary of literature, and an advocate of free speech and writing, and that he takes the responsibility of the measure, the reader may rest assured that His Excellency would not have moved in the matter, without good and valid reason. It cannot be denied that the fate, which has evertaken the Vernacular Press is greatly due to the follies and indiscretions of many of its unworthy members."—অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে, লর্ড লিটনের ন্যায় সাহিত্যোপাসক এবং স্বাধীনতা সমর্থক এইরূপ আইন জারি করিয়াছেন, তখন পাঠকগণ জানিবেন যে, বিশেষ এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে লর্ড লিটন এই আইন জারি করিতেন না। দেশীয় সম্পাদকদিগের এই দুর্ভাগ্য শুদ্ধ কেবল তাহাদিগের মধ্যের অনুপযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর কার্য্যকলাপের ফল।

আমরা এই স্থানে কৃষ্ণদাস পালের ভক্তদিগকে এবং কৃষ্ণদাসী রাজনীতির অবলম্বিদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইনের কি সত্য সত্যই কোন প্রবল কারণ ছিল? মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইনের পাণ্ডুলিপি কৌন্সিলে সমালোচিত হইবার সময়, তৎ-

কালের কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর হাই-কোর্টের বারিষ্টার পল সাহেব, সুলভ সমাচার, সাধারণী এবং অমৃত বাজার প্রভৃতি বাঙ্গালা পত্রিকা হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, এই সকল কথা রাজবিদ্রোহ প্রতিপাদক। কিন্তু পল সাহেবের উদ্ধৃত কথা কয়েকটী কি সত্য সত্যই রাজবিদ্রোহ প্রতিপাদক ছিল ? পল সাহেবের উদ্ধৃত কথা কয়েকটী—ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের পক্ষপাতিত্ব প্রতিপাদক ছিল। কিন্তু কোন এক ইংরাজ কর্ম্মচারির পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন কথা বলিলেকি তাহা রাজবিদ্রোহ প্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তবে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, হণ্ট ম্যাকেঞ্জি, সার চার্লস মেটকাফ, জন ফ্রেডেরিক সোর প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারত রাজনীতি বিশারদগণ অত্যন্ত রাজবিদ্রোহী ছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টের কমিটীর সম্মুখে স্বীয় সাক্ষ্য-বাক্যে বলিয়াছেন যে ভারতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা মুসলমানদিগের গবর্ণমেণ্ট অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ছিল। সার জন ফ্রেডেরিক সোরের (Notes on Indian affairs) নামাঙ্কিত পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের কুকার্য্য গোপন করিবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু ক্ষুদ্র বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের লঘু দোষে গুরুদণ্ড প্রদান করেন। হণ্ট ম্যাকেঞ্জি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি বিশেষ দূষিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দেশীয় লোক উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে উচ্চ পদ প্রদান করা যাইবে, এই কথার অর্থ এই যে, দেশীয় লোকদিগকে কখনও উচ্চ পদ প্রদান করা হইবে না। কারণ অগ্রে তাহাদিগকে উচ্চ পদ প্রদান করিয়া উচ্চ পদের উপযুক্ত করিবার চেষ্টা না করিলে, তাহারা কখনও উচ্চ পদের উপযুক্ত হইবে না। বস্তুত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকদিগকে সর্ব্ব প্রকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া যেরূপ দুরবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় সম্পাদকগণ বিশেষ তীব্রভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ সমালোচনা করিলে যে তাহাদিগের বড় অপরাধ হয়, তাহা কোন সহৃদয় লোক মনে করিতে পারেন না। কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন যে "উপযুক্ত কারণাভাবে লর্ড লিটন দেশীয় সম্পাদকদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন দেশীয় সম্পাদকদিগের নিজের কুকার্য্যের ফল।"

এইতো বাবু রামগোপাল সান্ন্যালের পরমারাধ্য দেশহিতৈষীর ছবি !!!

রামগোপাল বাবু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে বিশেষ বিজ্ঞ, উপযুক্ত এবং কার্য্যদক্ষ লোক বলিয়া যদি কেবল প্রশংসা করিতেন, তবে আমরাও তাঁহার মতে সম্মতি প্রদান করিতাম। কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে তিনি দেশহিতৈষী নামে অভিহিত করিয়াই দেশহিতৈষী নাম কলঙ্কিত করিয়াছেন।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর স্বীয় দলবল সহ কেসউইক, হেনরী বেল এবং ব্রানসন প্রমুখ দলের সঙ্গে যোগ প্রদান করিয়া প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ইলবার্ট বিলের

আন্দোলন উপলক্ষে যাহারা ভারতবাসী-দিগকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, নীচাশয় এবং অসভ্য বলিয়া সহস্রবার গালি বর্ষণ করিয়াছে, স্বার্থের অনুরোধে তাহাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলে কতদূর নীচাশয়তা প্রকাশ পায়, তাহা পাঠক মাত্রেই সহজে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

পরলোকগত কৃষ্ণদাস পালের বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব পোষণ করি না। কৃষ্ণদাস পালের যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, তাহা আমরা বারম্বার স্বীকার করিয়াছি। মৃত লোকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করাকে আমরা অন্যায় বলিয়া মনে করি। কিন্তু সত্যের অপলাপ ও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করা তদপেক্ষা অধিকতর অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদিগকে উল্লেখ করিতে হইল।

পরলোকগত পরম বিজ্ঞ রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর এখন জীবন্মুক্ত হইয়া স্বর্গ রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন। এখন আর কোন প্রকার সংসারের স্বার্থপরতা তাঁহার বিচার শক্তিকে কলুষিত করিতে পারে না। সুতরাং স্বর্গ রাজ্যে বিরাজিত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের এখন এই সংসার-বাসী লোকের সঙ্গে কথা বলিবার সাধ্য থাকিলে, তিনি নিজেই সংসারে অবতরণ পূর্ব্বক বলিতেন—"Paint me as I was for the sake of truth and fair play."

শ্রীচ :—

বাঙ্গালীর খাদ্য--আমিষ ভক্ষণ। (১)

অধুনা বাঙ্গালির খাদ্যাখাদ্য লইয়া কতক পরিমাণ আন্দোলন হইতেছে, ইহা যে একটী সুলক্ষণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ বাঙ্গালির উপযুক্ত খাদ্য নিরূপিত হইলে, ও সেই খাদ্য ব্যবহৃত হইলে, জাতীয় উন্নতির অনেক আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিষয়টী যেরূপ গুরুতর এই আন্দোলনে তদপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না, এবং সমুদয় বিষয়টী যথেষ্টরূপে আন্দোলিত না হইয়া কেবল আমিষ ভক্ষণের আপত্তি উত্থাপন করাই যেন উহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রায় সকল বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্যানুসারে যুক্তি ও পরামর্শ দেওয়া হইতে পারে; অতএব তর্ক দ্বারা কোন একটী বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, পুর্ব্বে উভয় পক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্য কি, তাহা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। খাদ্য বিষয়ক আলোচনা করিতে হইলে শারীরিক উন্নতি, মানসিক উন্নতি, বা অধ্যাত্মিক উন্নতি ও জাতীয় বা ব্যক্তিগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে কি না, তাহা স্থির করা উচিত। কারণ কেহ কেহ বলেন, কোন প্রকার খাদ্য দ্বারা শারীরিক উন্নতি হইলেও মানসিক উন্নতি হইবে না; কেহ বলেন এক প্রকার খাদ্য ব্যবহার

করিলে আধ্যাত্মিক অধোগতি হইবে সুতরাং তাহা ব্যবহার করা উচিত নহে। অপর কেহ কেহ আবার খাদ্য বিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা অনুমান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। জীব হিংসা করা পাপ, সুতরাং মাংস ভোজনেও পাপ হয়, এরূপ সিদ্ধান্তও অনেক করিয়া থাকেন। প্রাচীন হিন্দুগণ নিরামিষ ভোজী ছিলেন, সুতরাং আধুনিক হিন্দুগণ কেন আমিষ ভক্ষক হইবেন, এরূপ আপত্তিও উত্থাপিত হয়।

স্বর্গীয় মহামতি অক্ষয়কুমার দত্ত আমিষ ভক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থ মধ্যে মত প্রকাশ করিবার পর অবধি ঐ বিষয়ে অনেকানেক মত প্রকাশিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিষয় সকলের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের সাধারণ খাদ্য সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্যের খাদ্য কি? যে সমস্ত বস্তু উদরস্থ হইলে মানবদেহের জীর্ণসংস্কার হয়, ব্যয়িত তেজ পুনঃ সঞ্চিত হয়, দেহের বিধান সকলের অভাব মোচন হয়, ও তাহাদিগের উন্নতি ও বৃদ্ধি হয়, এবং তাহা কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে; অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু উদরস্থ হইয়া পরিপাক হইলে দেহের ক্ষয় হ্রাস হয়, ও মনুষ্য উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত আপন কর্ত্তব্য সাধনে শক্তিশালী হয়,তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত খাদ্য।

মানব দেহের রাসায়নিক উপাদান সমূহের বিষয় আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, এই নরদেহ নানা প্রকার ধাতব, উপধাতব ও জৈবনিক পদার্থের সংমিশ্রনে গঠিত। আরও দৃষ্ট হয় যে, ঐ সমুদয় পদার্থের তুল্য পদার্থ ভূমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের অভাব মোচনের বিশেষ বিঘ্ন প্রায় ঘটিবার কারণ নাই।

দন্তহীন চর্ব্বণশক্তি-বিহীন অসহায় শিশুর পুষ্টির নিমিত্ত বিধাতা স্তন্য দুগ্ধ সৃজন করিয়াছেন। শিশুর শরীরের পুষ্টি-সাধন মাতার স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা সুসম্পন্ন হয় দেখিয়া, সুবিখ্যাত প্রাউট সাহেব স্থির করেন যে, ঐ দুগ্ধে যে যে সামগ্রী আছে, সেই সেই সামগ্রী দ্বারাই মানব দেহ পরি-পুষ্ট ও রক্ষিত হইবে। পরে তিনি সেই দুগ্ধের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া স্থির করেন যে, উহাতে চারি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যথা—

১। পনিরময়, অর্থাৎ যাহা হইতে ছানা উৎপন্ন হয়।

২। শর্করাময়, যাহা হইতে দুগ্ধের মিষ্টতা জন্মে।

৩। তৈলময়, যাহা হইতে মাখন, ঘৃত জন্মে।

৪। ধাতব ও উপধাতব সামগ্রী, যাহা জলের সহিত মিশ্রিত থাকে।

এই চারি প্রকার সামগ্রীর মধ্যে পনির-ময় অংশ যবক্ষারজান বিশিষ্ট (nitrogen-ous) ২য় ও ৩য় যবক্ষারজান শূন্য পদার্থ।

মনুষ্যের খাদ্যে ঐ চারি প্রকার পদার্থই থাকা আবশ্যক। শরীরপোষণের নিমিত্ত ঐ চারি প্রকার পদার্থই আবশ্যক কিনা, তাহা স্থির করিবার জন্য অনেকা-নেক পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কেবল যবক্ষারজান-ময় ও জলমিশ্রিত ধাতব উপধাতব পদার্থ

দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; ঐ সমুদয় পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্বেত সারময় ও তৈলময় পদার্থ ব্যবহার দ্বারাও স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; শ্বেতসার ও শর্করা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল সুস্থ থাকিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তৈলময় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল যবক্ষারজানময় (য়্যালবুমিনেট) শ্বেতসার, জল ও লবণাক্ত পদার্থ ব্যবহার করিয়া মনুষ্য যে সুস্থ থাকিতে পারে, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। আবার জল ও লবণাক্ত পদার্থ ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা করা যায় না।

ডাক্তার প্লেফেয়ার, পার্কস, পেভি, লেথবি ও স্মিথ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ সকলেই যবক্ষারজানময় পদার্থের আবশ্যকতা সপ্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও স্থির করিয়াছেন যে, ঐ চারি প্রকার খাদ্য নিরূপিত পরিমাণে মিশ্রিত না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; একের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে অপরের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

তাঁহাদিগের দ্বারা আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজন ইউরোপীয় মধ্যমাকার পরিশ্রমী পুরুষের দেহ হইতে প্রতি দিবস প্রায় ৩০০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪৬০০ গ্রেণ অঙ্গার, মল মূত্র এবং ঘর্ম্ম দ্বারা বহির্গত হয়। সুতরাং এরূপ খাদ্য ব্যবহার করা আবশ্যক, যদ্দারা দেহ মধ্যে ঐ দুই পদার্থ ঐ পরিমাণে প্রবিষ্ট হইতে পারে। তজ্জন্য কত য়্যালবুমিনেট ও কত তৈলময় এবং কত শ্বেতসারময় খাদ্য ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহাও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে,—

১। মনুষ্যের দেহভারের হ্রাস বৃদ্ধ্যনুসারে খাদ্যের হ্রাস বৃদ্ধি করা আবশ্যক, নচেৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে।

২। মনুষ্যের পরিশ্রমের সহিত খাদ্যের পরিমাণের বিশেষ সম্বন্ধ থাকে; সুতরাং একের বৃদ্ধি হইলে অন্যের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

৩। শম বিমুখাবস্থায় কেবল দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হেতু যে তেজ ব্যয়িত হয়, তদনুযায়ী সামান্য খাদ্য ব্যবহার করাই বিধেয়।

৪। জলবায়ু, ঋতু ও ব্যক্তিগত ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে ঐ পরিমাণের কতক তারতম্য আবশ্যক হইয়া থাকে।

উল্লিখিত উপদেশানুসারে আমরা, বঙ্গবাসীর দেহায়তন, ও দেহভার ও কর্ম্মণ্যতা বিবেচনা করিয়া অনুমান করিয়াছি যে, মধ্যমাকার কর্ম্মক্ষম ও বলিষ্ঠ বঙ্গবাসীর দেহ হইতে প্রতি দিবস ২২০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৫০০ গ্রেণ অঙ্গার বহির্গত হয়। অতএব বাঙ্গালীর এরূপ খাদ্য ব্যবহার করা আবশ্যক যাহাতে ঐ ক্ষতিপূরণ হইয়া শরীর সুস্থ থাকিতে পারে।

তৎপরে কতকগুলি দেশীয় খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি যে,(১) /২ সের দুগ্ধ, ৩ ছটাক ময়দার রুটি ও ১ ছটাক চিনি ব্যবহার করিলে প্রায় ২৪০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৮০০ গ্রেণ অঙ্গার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে; ইহাতে ঐ দুই পদার্থের পরিমাণ সামঞ্জস্য মত থাকে। তৎপরে (২) এক পোয়া চাউল, ৩ ছটাক ময়দা, ২½ ছটাক ডাইল, ৩ ছটাক মৎস্য, কিছু আনাজ ও ঘৃত আহার করিলেও প্রায় ২১৫ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৮৯০ গ্রেণ অঙ্গার উদরস্থ হইতে পারে। (৩) /২ সের দুগ্ধ ও এক

পোয়া চাউলের অন্ন ও এক ছটাক চিনি ব্যবহার করিলেও ২২৮ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪২০০ গ্রেণ অঙ্গার উদরস্থ হইতে পারে। এবং(৪)৬ ছটাক চাউল ও ডাইল খিচ্‌ড়িরূপে ব্যবহৃত হইলে ২২২গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪৩০০ গ্রেণ অঙ্গার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। (৫) আরও দেখিয়াছি যে ৮ ছটাক চাউলের অন্ন ও ৮ ছটাক মাংস ও অর্দ্ধ ছটাক ঘৃত ও উপযুক্ত পরিমাণ লবণ ব্যবহার করিলে ২২৮ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪২০০ গ্রেণ অঙ্গার ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য যেরূপ খাদ্য ব্যবহার করি না কেন,তাহাতে যবক্ষারজানের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ও অঙ্গারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইবেই হইবে। সুতরাং দেহে মেদ সঞ্চিত হইবে ও ক্রমে মেদাপকৃষ্টতা জন্মিবে। যাহারা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের শরীরে ঐ মেদ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে পারে না। কিন্তু যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন না, অথচ অধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাহাদের মেদাপকৃষ্টতা ও অন্যান্য গুরুতর স্নায়বীয় পীড়া জন্মে।

এক্ষণে বুঝিলাম যে বৈজ্ঞানিক মতে—

১। প্রত্যেক সুস্থ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক বঙ্গবাসীর শরীরে গড়ে ২২০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৫০০ গ্রেণ অঙ্গার-বিশিষ্ট খাদ্য প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

২। ঐ যবক্ষারজান অপেক্ষা অঙ্গার ১৬ গুণ অধিক হওয়া আবশ্যক।

৩। প্রত্যেক খাদ্যের তালিকায় ১ ভাগ যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য থাকিলে প্রায় ৪½ ভাগ শ্বেতসারময় এবং এভাগ তৈলময় পদার্থ থাকা আবশ্যক।

৪। অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিলে, সকল পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে তন্মধ্যে অঙ্গার অংশ অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। এবং অধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে যবক্ষারজানের পরিমাণ কিছু অধিক বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৫। ঋতু অনুসারে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। গ্রীষ্ম-কালে তৈলময় ও শর্করাময় পদার্থের পরিমাণ হ্রাস ও শীতকালে ঐ সকল পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৬। অসুস্থ বা অলসাবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যে যে সকল প্রকার খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা ও ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের পরিমাণের তারতম্য করা আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

খাদ্যসম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি অবগত হওয়া গেল; এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক কিরূপ খাদ্য ব্যবহার করে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারিব যে, ঐ সাধারণ নিয়ম কিরূপে ও কি পরিমাণে অবস্থিত হয় ও জলবায়ু বা অন্য কোন কারণে কি পরিমাণে উহার বিপরীতাচরণ ঘটে ও তাহার ফল কি?

ইংলণ্ডের কৃষক প্রতিদিন গড়ে ১৪ ছটাক রুটি, ৭ ছটাক আলু, ১½ ছটাক চিনি, ১ ছটাক মাংস,২½ ছটাক দুগ্ধ,এক ছটাকের কিঞ্চিদধিক পনির ও তৈলাক্ত পদার্থ আহার করে; তদ্দ্বারা মোট ৫৮১০ গ্রেণ অঙ্গার ও ২২৭ গ্রেণ যবক্ষারজান দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেইরূপ ওয়েলস্, স্কটলণ্ড, ও আয়রলণ্ড নিবাসী কৃষকের খাদ্যে ঐ সামগ্রী যে পরিমাণে থাকে, তদ্দ্বারা ক্রমান্বয়ে ৬৯০০, ৭০০০, ৬২০০ গ্রেণ অঙ্গার ও ২৯০, ৩৩৪ ও ৩৪৭ গ্রেণ যবক্ষারজান উদরস্থ

হয়। ইহারা দরিদ্র ও যথেষ্ঠ খাদ্য প্রাপ্ত হয় না, এজন্য ইহাদিগকে লোফেড (low-fed) বলা হয়। ইউরোপের উত্তমরূপে পরিপুষ্ট পরিশ্রমী ব্যক্তির খাদ্যে গড়ে ৫.৮ ভাগ [illegible]জানময়, ২.৪ ভাগ তৈলময়, ও ১৮.৬ ভাগ শ্বেতসারময় দ্রব্য থাকে, ও তাহা হইতে ৫৮৩১ গ্রেণ অঙ্গার ও ৪০০ গ্রেণ যবক্ষারজান উদরস্থ হয়।

ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রিণল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ইত্যাদি মেরুপ্রদেশের ও মধ্য আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পেরু, ব্রেজিল, ইত্যাদি উষ্ণপ্রধান দেশের লোকের খাদ্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার এস্কুইমো জাতীয় লোক প্রায় সম্পূর্ণ মাংসভোজী এবং তাহারা বসা ও তৈলাক্ত পদার্থ অতিশয় ভালবাসে।

আইসল্যাণ্ডনিবাসীগণ প্রায় মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। গ্রীষ্মকালে দুগ্ধ ও মাখন ব্যবহার করে, কিন্তু রুটি কি অন্য কোন উদ্ভিদ পদার্থের অত্যন্ত অনাটন, তজ্জন্য দরিদ্র লোকেরা স্কার্ভি নামক রোগে রুগ্ন হয়। সাইবিরিয়া নিবাসীরা রেন্‌ডিয়ার নামক মৃগ ও মৎস্য খাইয়াই জীবনধারণ করে, রুটী দুষ্প্রাপ্য। মেক্সিকোনিবাসীগণ প্রায় নিরামিষভোজী; তাহারা কৃষিকর্ম্মদক্ষ ও তদুৎপন্ন ফল শস্য ব্যবহার করিয়াই জীবন ধারণ করে; কথন কথন পক্ষী বা শুকরের মাংস খাইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া নিবাসীগণ প্রায় সর্ব্বপ্রকার মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে; তাহারা আরও নানা প্রকার উদ্ভিদ—বৃক্ষের ত্বক্, শিকড়, কোমল পত্র ইত্যাদি ভক্ষণ করে। নবজিলণ্ডনিবাসীগণও উভয় প্রকার খাদ্য ব্যবহার করে।

চীনেরা খাদ্যবিষয়ে কোন আপত্তি করে না; পুষ্টিকর সামগ্রী মাত্রই তাহাদিগের খাদ্য। আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার শ্রেণীস্থ বস্তুই তাহাদিগের সমান খাদ্য।

জাপানদেশীয় লোক চাউল, ডাইল, পক্ষীমাংস, তিমি, চিঙ্গিড়ী ও অন্যান্য মৎস্য, কর্কট ও অন্যান্য মাংস ব্যবহার করে।

মিসরবাসীরা উদ্ভিজ্জাত পদার্থ ও মাংস, এতদুভয় প্রকার খাদ্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

নিউবিয়া-নিবাসীরা প্রায় কেবল মাংস ভক্ষণ করে; উষ্ট্রমাংস ও দুগ্ধ তাহাদের প্রধান খাদ্য।

আবিসিনীয়ার অধিবাসীগণ কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে বিশেষ ভালবাসে।

উল্লিখিত উদাহরণ সমুদয় হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে মানব কেবল নিরামিষভোজী; কোথাও বা আমিষভুক, অনেকস্থলেই মিশ্রভুকরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইয়ুরোপ, আমেরিকা, চীন ও জাপান ইত্যাদি সভ্য দেশেও আমিষ ভক্ষণ চলিতেছে। কেবল মেক্সিকো নিবাসীগণ প্রায় নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে।

এই বিষয়ে ডাক্তার পেভি তাঁহার ((Food and Dietetics) নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল।

"It is upon a due admixture of the two that the principle of adjustment is founded and as nitrogenous principles preponderate in animal food, and the carbonaceous or non-nitrogenous in vegetable, we see that the teachings of science harmonize with the instinctive propensity which in-

clines man so universally to the employment of a mixed diet, whenever the circumstances under which he is placed admit of its being obtained." p. 472. "Food and dietetics."—

"Instances are to be found where life is sustained upon a wholly vegetable, a wholly animal, and a mixed diet. The mixed diet, however, may be regarded as that, which, in the place of nature, is designed for man's subsistance. It is upon this that he appears to attain the highest state of physical development and intellectual vigour. It is this which certainly in temperate climates he is led to consume by general inclination when circumstances allow the inclination to guide him, and lastly it is this which stands in conformity with the construction of his teeth and the anatomy of his digestive apparatus in general."

"Notwithstanding these considerations there are those but few in number it is true—who contend that vegetable food alone is best adapted to meet our requirements, under the style of vegetarians they act upon the principle they prefer." p. 491. "Food and Dietetics" by Dr. Pavy. M. D. F. R. S. F. R. C. P.

"এই উভয় প্রকার খাদ্যের যথোচিত মিলনেই যবক্ষারজান ও অঙ্গারের সামঞ্জস্য হইতে পারে এবং যেহেতু আমিষ খাদ্যে যবক্ষারজানময় পদার্থের পরিমাণ অধিক ও উদ্ভিজ্জে অঙ্গারক পরিমাণ অধিক, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিক উপদেশ মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত এমন সামঞ্জসীভূত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া মনুষ্য মিশ্র খাদ্য ব্যবহার করিবার সুযোগ থাকিলেই তাহা ব্যবহার করে।"

"কেবল নিরামিষ, কেবল আমিষ, মিশ্র খাদ্য বব্যাহার দ্বারা যে জীবন রক্ষা করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বভাবের সৃষ্টি কৌশলে পরিদর্শন করিলে বোধ হয়, মিশ্র খাদ্যই মনুষ্যের জীবন ধারণের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। এই খাদ্যই ব্যবহার করিয়া মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈহিক উন্নতি ও মানসিক তেজ লাভ করে। অন্যান্য ঘটনা ঐ প্রবৃত্তির বিরোধী না হইলে, সমমণ্ডলস্থ দেশে মনুষ্য নিশ্চয়ই সাধারণ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া এই মিশ্র খাদ্য ব্যবহার করে। কারণ, এই উভয়বিধ খাদ্যই মনুষ্যের দন্ত ও পাচকযন্ত্র সমুদয়ের গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।"

"এই সমুদয় কারণ সত্ত্বেও অতি অল্প সংখ্যক লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, কেবল নিরামিষ খাদ্যই আমাদের যথাবশ্যক পুষ্টিসাধনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী; এবং নিরামিষভোজী নামে তাঁহারা আপনাদের মতের অনুগমন করেন।"

ঐ বিষয়ে ডাক্তার পার্কস্ বলেন,—"জান্তব ও উদ্ভিজ্জ য্যালবুমিনেটের সমাস অত্যন্ত সদৃশ এবং তাহারা দেহমধ্যে সমান উদ্দেশ্য সাধন করে। আমিষভুক ও নিরামিষভুক (যাহারা অন্ন দাইল ব্যবহার করে) তাহারা উভয়ই সমপুষ্ট। কিন্তু ইহা অনুমিত হইয়াছে যে, ঐ দুই প্রকার খাদ্য ব্যবহার করিলে দেহের পরিপোষণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বা অসমান সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে; এবং আমিষভুক ব্যক্তি নিরামিষভুক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী বা অধিক হঠাৎ বল প্রকাশে সমর্থ, কারণ নিরামিষ ভোজীর খাদ্যেও ঐ সমুদয় তেজ সমানাংশে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা তত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় না; আমার মতে এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই।"

"ভারতবর্ষে যাহারা অন্ন ও অল্প পরিমাণ দাইল ব্যবহার করে, তাহারা অল্প বল প্রকাশ করে বটে, কিন্তু যাহারা প্রচুর

পরিমাণে শষ্য, অন্ন দাইল ব্যবহার করে, তাহারা শিক্ষিত হইলে আমিষভুকদিগের নিকট পরাভূত হইবে না।"

"ডাক্তার বোমাণ্টের পরীক্ষা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, আমিষ খাদ্য নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হয়, তজ্জন্য বোধ হয় মাংস, রুটি বা মটর অপেক্ষা শীঘ্র যবক্ষারজানময় পদার্থের জীর্ণ সংস্কার করিতে পারে; এবং ইহাও সত্য হইতে পারে যে, আমিষভুকের দৈহিক বিধান সকলের পরিবর্ত্তন শীঘ্র ঘটে এবং তজ্জন্য তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র আহার করিতে হয়, কিন্তু ইহাও এখনও সম্যকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এমত বোধ হয় না।"

"The chemical composition of animal and vegetable albuminates is very similar and they manifestly serve equal purposes in the body. The meat eater and the man who lives on corn or peas and rice are equally well nourished. But it has been supposed that either the kind or the rapidity of nutrition is different and that the men who feed on meat or the carnivorous animal will be more active and more able to exert a sudden violent effort than the vegetarian or the herbivorous animal whose food has an equal potential energy but which is supposed to be less easily evolved. The evidence in favour of this view seems to me to be very imperfect. And the evidence in men is the same.—In India the ill-fed people on rice and a little millet or pea may indeed show less power but take the welfed corn-eater or even the wellfed rice and pea-eater or and he will show when in training no inferiority to meat-eaters."

"It appears from Dr. Beaumont's experiments that animal food is digested sooner than farinaceous and possibly meat might therefore replace more quickly the wasted nitrogenous tissue than bread or peas, and it may be true as assumed that the change of tissue is more quick in meat-eaters who therefore require frequent supplies of food. Even this however seems to me not yet thoroughly proved." Manual of Hygiene" By Dr. E. A. Parkes. M. D. F. R. S.—p. 184.

ঐ বিষয়ে ডাক্তার স্মিথ যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। নিরামিষ ও আমিষ এতদুভয় প্রকার খাদ্যে সমান পুষ্টিকর সামগ্রী আছে এবং কতক পরিমাণে ঐ দুই প্রকার খাদ্য পরস্পরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই উভয় প্রকার খাদ্যই দুই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা যবক্ষারজানময় ও যবক্ষার শূন্য মাংসোৎপাদক ও উত্তাপোৎপাদক। ১

তবে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরিপোষণ কার্য্যের সম্বন্ধে বাস্তবিক প্রভেদ কি? উহাদিগের পুষ্টিকারিতার তারতম্য লোকের অভ্যাসের উপর নির্ভর করা সম্ভব। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, মাংসে পুষ্টিকর সামগ্রী সমুদয় বিশেষ সুবিধাক্রমে ও সুপাচ্যরূপে বিদ্যমান থাকে। নিরামিষ খাদ্যে অর্থাৎ বীজ সমূহে এমন অনেক দ্রব্য থাকে, যাহাকে বিশেষ প্রকারে জীর্ণ করিয়া পরিবর্ত্তন না করিলে তদ্দারা দেহের পুষ্টি বা জীর্ণসংস্কার হয় না।

ডাক্তার বোমান সাহেবের পরীক্ষা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, রুটি অপেক্ষা মেষ মাংস এবং আলু অপেক্ষা ডিম্ব শীঘ্র জীর্ণ হইবে।

আবার আমিষ ভক্ষণ করিলে যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক করে, নিরামিষ ভোজন করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহা অনুমিত হইবে যে, যদিও ঐ উভয় প্রকার খাদ্য দ্বারাই প্রাণ ধারণ করা যাইতে পারে—আমিষ খাদ্য অপেক্ষা নিরামিষ খাদ্য দ্বারা জৈবনিক ক্রীয়া সমুদয় অধিক মন্দ মন্দ বেগে হইয়া থাকে, শ্বাস ক্রিয়া, নাড়ীর গতি ও উত্তাপ উৎপাদন বিষয়ে ঐ রূপই ঘটিয়া থাকে। অতএব এই উভয় প্রকার

খাদ্যের তুলনা করিবার সময় ইহা সাধারণত বলা যাইতে পারে যে, নিরামিষ ভোজন করিলে, অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক হয়, এবং ঐ খাদ্য উত্তম রূপে রন্ধন করা আবশ্যক; এবং উহা জীর্ণ হইবার নিমিত্ত অধিক সময় ও পরিপাক শক্তি আবশ্যক করে এবং ইহা হইতে জৈবনিক ক্রীয়া সমুদয় অপেক্ষাকৃত অধিক ধীরে ধীরে ও অল্প পরিমাণে নিষ্পন্ন হয়।

"It has already been shown that the same nutritive elements exist in both vegetable and animal foods and that within certain limits the two classes of foods are interchangeable. Also that both are divisible into two sub-classes viz :—nitrogenous and non-nitrogenous, fleshformer and heatgiver. —What is the practical difference between them for the purposes of nutrition ? It is probable that this depends upon the habits of men. It is however a general rule that while flesh presents the elements of nutrition in a form the most compendious and easy of digestion, seeds are composed of substances which must not only be digested but thoroughly transformed before they can be used for the reparation of the body."

"The experiments of Dr. Beaumont have shown that mutton will be digested more quickly than bread and an egg earlier than potatoe. To this must be added the greater bulk of the vegetable than of animal food is required to provide a given amount of nutriment."

"It will be inferred from the above statement that although the vital actions may be sustained by both kinds they are more slowly moved by vegetable than by animal foods and this is true whether we regard the respiration, pulsation, or heat production : when therefore we compare them it may be stated generally that vegetable food must be eaten in larger volume and be better cooked, than animal food and that it requires a larger period for, and a greater power of digestion while it excites the vital processes more slowly and to a lower degree." P. 144-145. Foods, by Dr. E. Smith, M. D. L. L. B. F. R. S. F. R. C. P.

ঐ বিষয়ে ডাক্তার লেথবি তাঁহার খাদ্য বিষয়ক পুস্তকেও কতক পরিমাণে মাংস ভক্ষণের স্বাপক্ষতা করিয়াছেন। এবং তিনি ডাক্তার লিবিনের মত ও প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Indeed the instincts and habits of the human race show beyond all question that a comparatively rich nitrogenous diet is necessary for the proper sustenance of life especially when work is performed. It is very probable that nitrogenous matter assists the assimilation of hydrocarbons and in this way they may help in the development of force without contributing directly to it. This may serve to explain the fact that there is always the relation between the amount of nitrogen contained in the food and the labour value of it."

"Again the Hindu Novices who were employed in making the tunnel of the Bhoreghat Railway and who had very laborious work to perform found it impossible to sustain their health on a vegetable diet, and being left at liberty by their caste to eat as they pleased they took the common food of the English navigator and were then able to work as vigourously" According to Liebing it is the rich nitrogenous diet of Englishmen which is the great source of their indomitable energy, for it is only necessary,he says,to compare the performance of German workmen who consume bread and potatoes chiefly with those of English and American workmen, who eat meat, inorder to acquire a clear perception of the degree in which the magnitude, energy, and duration of the work done by the latter are augmented by the kind of food they live upon." p. p. 71. 72. On Food by H. Lethoby, M. B. M.A. Ph. D.

এতদ্ব্যতীত ডাক্তার কার্পেণ্টার, রিচার্ডসন, উইলসন্, ফদার গিল,ইত্যাদি সকলেই মিশ্র খাদ্য ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন।

এইত বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগের মত, এই মতের নানা প্রকার প্রতিবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটীর বিষয় আলোচনা করা যাউক।

ইতিপূর্ব্বে যে সমুদয় কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা অনুমিত হইয়া থাকিবে যে; আমরা কেবল আমিষ ভক্ষণের উপযোগিতা দেখাই নাই; তবে বলিয়াছি যে, যদিও মনুষ্য কেবল নিরামিষ

ভোজন করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, (যদিও তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই) তথাচ যেমন অন্যান্য সকল বিষয়ে যুক্তি ও পরামর্শ দ্বারা একটী প্রশস্ত উপায় অবলম্বিত হয়, তদ্রূপ এ বিষয়টীও বিশেষ অনুধাবন করিলে ও অপক্ষপাতী রূপে আলোচনা করিলে উদ্ভিজ্জের সহিত কতক পরিমাণে আমিষ খাদ্য ভক্ষণ করাই যে সাধারণতঃ শ্রেয়ঃ, ইহাই বোধ হয়। তাহারই কতক প্রমাণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা ঐ মতের বিরোধী, তাঁহাদিগের মতের অনুদারতা ও অন্যান্য অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

(১) কেহ কেহ বলেন যে, নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ ভক্ষণে শারীরিক বলবীর্য্য অধিক হয় না, এবং তদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দুস্থানীর সাহসিকতাও বলবীর্য্য ইত্যাদির উদাহরণ দিয়া থাকেন। ডাক্তার পার্কসের যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত ফল শষ্য ভক্ষণ করিতে পারিলে নির্বীর্য্য হইবার কারণ নাই; তবে উদ্ভিজ্জ হইতে তেজ বিলম্বে উদ্ভাবিত হয়, ও নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিতে হয়, তজ্জন্য অধিক পাচিকা শক্তির আবশ্যক করে ও যতক্ষণ পরিপাক না হয়, ততক্ষণ শরীর অলস হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পরে বিচার করুন যে, হিন্দুস্থানীরা যদি বাস্তবিকই বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বলিষ্ট, সাহসী ও পরাক্রমশালী হয়, তবে তাহা কি কেবল তাহাদিগের খাদ্যের গুণে, না জলবায়ুর গুণে, না পূর্ব্ব পুরুষদিগের গুণে, না শিক্ষার গুণে, না অন্য কোন কারণে? বঙ্গদেশের শতকরা ৯৫ জন ব্যক্তি বহুব্যাপক ম্যালেরিয়া রোগে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছে, সে দেশের লোক কি ম্যালেরিয়া শূন্য দেশের লোকের সমান হইতে পারে? যে বঙ্গভূমের আর্দ্র ও উত্তপ্ত বায়ু দৈহিক বিধান সকলকে এককালে অসংলগ্ন করিয়া ফেলে, সে দেশের নিবাসিগণ কখন কি শুষ্ক ও বলকারক জল বায়ুর নিবাসিদিগের সমান হইতে পারে? যে বঙ্গবাসী জলবায়ুর দোষে বা অন্য কোন কারণে প্রায় সহস্র বৎসর পরাধীন, তথাকার লোক স্বাধীন লোকের পুত্র পৌত্রাদির সমান সাহসী ও তেজস্বী কেমন করিয়া হইতে পারে? দেখুন, পশ্চিমাঞ্চলের লোক এখনও যদি রাত্রি ৪।৫ টার সময় পল্টন কুচ (মার্চ্চ) করিবে শুনিতে পায়, তবে তাহারা পৌষ মাসের শীতে দুই বৎসর বয়সের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রাজপথের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া পল্টনের প্রতীক্ষা করে। যাহারা আশৈশবকাল ঐরূপ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের সহিত কি বঙ্গবাসীর তুলনা হয়? যে বঙ্গবাসী পল্টনের নামে ঘরে পলায়ন করে, তাহাদের অন্তরে পল্টন্ শব্দ ভয় ও অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করে না। অতএব বাঙ্গালী যদি মৎস্য-ভোজী হইয়াও নিরামিষভোজী হিন্দুস্থানীর সমান বীর্য্যবান ও সাহসী না হয়, তাহার অনেক কারণ আছে। যথা পৈতৃক বলবীর্য্য, জলবায়ু, দেশের আচার ব্যবহার, সাধারণ স্বাস্থ্য। আবার দেখুন, হিন্দুস্থানী মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করে না বটে, কিন্তু একসের আটার রুটি, একপোয়া

দাইল ও অর্দ্ধপোয়া ঘৃত আহার করিয়া সচ্ছন্দে পরিপাক করে। বলুন, কয়জন বাঙ্গালীর পাকস্থলী ঐরূপ করিতে সমর্থ? হিন্দুস্থানীদিগের জোলাপের পর (এক ছটাক ক্যাষ্টর অইল) লঘু আহার খিচুড়ি; বাঙ্গালির আহার জলসাগু। পঞ্জাবনিবাসী শিকেরা আমিষভোজী এবং তাহাদিগের সহিত তো হিন্দুস্থানীর তুলনা হইতে পারে না; পল্টনে তাহা অতি স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি।

(২) আপত্তি।—আমিষ ভক্ষণে দৈহিক উন্নতি হইলেও মানসিক উন্নতি হয় না, কোন গুরুতর কার্য্য করিতে পারা যায় না, মন সমাহিত হয় না ইত্যাদি। ভাল, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে যে যে জাতি প্রধান চিন্তাশীল, রাজনীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, তাঁহারা কি নিরামিষভোজী না আমিষ ভোজী? মিল, স্পেনসার, কারলাইল, গ্লাডষ্টোন, ডিস্‌রেলী,—টেনিসন, হাক্সলি, টিণ্ডাল, ওয়াটস্‌, ব্রাইট, গেটে, বিস্মার্ক, টিয়ার্স, ফ্রেসিনে, ইমার্সন, মোক্ষমুলার ইত্যাদি ব্যক্তিগণ কি আমিষভোজী না নিরামিষভোজী? স্পেনসার নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী, কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে স্পেনসারের "এডুকেশন" নামক পুস্তকের ১৫২-১৫৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যদি আধুনিক সভ্য জাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মিশ্র খাদ্য ব্যবহার করিয়া সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাস্রোতের, জ্ঞান জ্যোতির, রাজনীতির ও দর্শন শাস্ত্রের বৃদ্ধি বা উন্নতি করিতে সমর্থ হয়েন, তবে মিশ্র খাদ্যে মানসিক উন্নতির অনুপযুক্ত বলা কি শোভা পায়? সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন ও জাপান সভ্য ও উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা কি নিরামিষ ভোজনের ফল? ঐ সমুদয় দেশে যাঁহারা নিরামিষভোজী আছেন, তাঁহারাও এমন বিশেষ কোন অলৌকিক কার্য্য করেন নাই। যদি করিতেন, তবে ও নয় মনে করা যাইত যে, আমিষভোজীদিগের অপেক্ষা তাহারা অধিক উৎকর্ষ করিয়াছেন।

(৩) আপত্তি।—মৎস্য মাংস ব্যবহার করিলে কাম, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে সচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, কোন এক নিরামিষভোজী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাম প্রবৃত্তির আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চিমের রুটি ও দাইল ভক্ষক হিন্দুরাও এবিষয়ে কোন প্রকার ন্যূন নহে এবং মৎস্য ভোজী বাঙ্গালীর মধ্যে ইহার আধিক্য দৃষ্ট হয় না। হিন্দু বিধবাদিগের বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বৃষ, বন্যমহিষ, বরাহ, বিসন ইত্যাদি নিরামিষভোজী জন্তুর ক্রোধ ও হিংসা সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে নিরামিষভোজী হইলে ক্রোধ ও হিংসা শূন্য হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এমন কি, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলন কালেও, ক্রোধ ও হিংসা দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং মনুষ্য নিরামিষভোজী হইলে যে, সমস্ত দেশ শান্তি সলিলে নিমগ্ন হইবে, ক্রোধ হিংসা এককালে তিরোহিত হইবে, শান্তিরক্ষক ও বিচারালয়ের আবশ্যক হইবে না, এরূপ তো মনে ধারণাই হয় না।

(৪) আপত্তি।—মাংস ভোজনে নানা প্রকার পীড়া হয়। সত্য, অসুস্থ প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলে পীড়া হইয়া থাকে। কিন্তু অসতর্ক হইয়া খাদ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করিলে পীড়া হওয়া তো বিচিত্র নহে। পীড়িত শষ্য ভক্ষণ করিয়া কি রোগ জন্মে না? বাঁকুড়া, বীরভূম, ও মানভূমে যে কুষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা কি মাংস ভোজনের না উদ্ভিজ্জ ভক্ষণের ফল?

লোকোমোটারএটাক্সি নামক পীড়ার কি এক প্রধান কারণ খেঁসারির দাইল নহে? নূতন চাউল ব্যবহার করিলে কি পেটের পীড়া হয় না? সিক্ত চাউল, অধিক দিনের ময়দা, বাসী দুগ্ধ বা তরকারী ব্যবহার করিলে কি রোগ জন্মে না? খাদ্য বিষয়ে অসাবধান হইলে রোগ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? যদি মাংস ভক্ষণ করাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে সুস্থ মাংস প্রাপ্ত হওয়ার যে কোন বিশেষ ব্যাঘাত হইবে, এমত বোধ হয় না।

অসুস্থমাংস ভক্ষণ করিয়া যতলোক পীড়িত হয়, অবিশুদ্ধ জল, দূষিত জল, মিশ্রিত দুগ্ধ, দূষিত পদার্থ-মিশ্রিত ময়দা, ঘৃত, সুজি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া তাহাপেক্ষা শতগুণ অধিক লোক পীড়িত হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তজ্জন্য দুগ্ধ, ময়দা, ঘৃত ব্যবহার করিতে কেহই ক্রটি করিতেছেন না। এমন কি, যাঁহারা মাংস ভোজনের বিরোধী, তাঁহারাও দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বিশুদ্ধ দুগ্ধ যে বিশুদ্ধ মাংস অপেক্ষা অধিক দুষ্প্রাপ্য, তাহা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় নাই। বিশুদ্ধ দুগ্ধ যে বিশুদ্ধ মাংস অপেক্ষা পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে অনেক মহার্ঘ, তাহা কি বিস্মৃত হইব? অবিশুদ্ধ দুগ্ধ যে বিসূচিকা, টাইফইড, উদরাময় ইত্যাদি রোগের এক প্রধান কারণ, তাহাও কি বিস্মৃত হইব?

(৫) আপত্তি।—আমিষ ভক্ষণ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্নকর। এ বিষয়ে সম্প্রতি একটী অতি উত্তম বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দর্শন শাস্ত্রেরও প্রকাশ আছে, সুতরাং আমি তাহার বিপরীতে কিছু বলিতে সাহস করি না। কিন্তু বাস্তবিক যদি তাহাই হইত, তবে আমাদের মানস ক্ষেত্রে আর ভাষা বা বিজ্ঞানের চিহ্ন থাকিত না; অন্তঃকরণে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ও পবিত্র ভাব কখন উপস্থিত হইত না। মোসেস্, জন, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য ও রামমোহন রায় আবির্ভূত হইতেন না। পরম পূজ্যপাদ আর্য্যঋষিগণও জন্ম গ্রহণ করিতেন না; কারণ তাঁহারা সকলেই মাংসভোজী ছিলেন। কতক বয়সের পর কেহ কেহ মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বাল্যকালে মৎস্য মাংস আহার করিয়া যে মস্তিষ্ক গঠিত হইয়াছিল, তাহাতেই তো প্রথমে বিশ্বপতির ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। পরে তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারে জীবন গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(৬) আপত্তি।—প্রাচীন হিন্দুরা মৎস্য মাংস আহার করিতেন না। এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাহারা মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ এবং হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই, এমত কি হইতে পারে? মনুসংহিতায় আর্য্য কোন্ কোন্ মাংস ভক্ষণ করিবেন

তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। মহাভারত ও রামায়ণে মৃগয়ালব্ধ মাংস ব্যবহারেরও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাগযজ্ঞে মাংস দান তো প্রথাই ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমাগত হইলে মাংসের আয়োজন অতি পরিপাটীরূপে হইত। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের "ইণ্ডুএরিয়ান" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, গোমাংস কি রূপে কর্ত্তন করা ও পাক করা হইবে, তাহারও সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। চরক, ভাবপ্রকাশ ইত্যাদি প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে বৎসরের কোন্ সময় কোন্ মাংস কি পরিমাণ ভক্ষণ করিবে, তাহাও এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত রোগ বিশেষে কোন্ কোন্ মাংস ভক্ষণ করা আবশ্যক, তাহাও বর্ণিত আছে। এই সমস্ত থাকিতেও যাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন হিন্দুরা নিরামিষভোজী ছিলেন, তাহাদিকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়?

এতদ্ব্যতীত আরও বলা হয়, মাংস যে মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, কেবল মাংস খাইয়া কেহই থাকিতে পারে না। সেই রূপ আমরাও কি বলিতে পারি না যে, কেবল উদ্ভিজ্জ ব্যবহার করিয়াও কেহ জীবিত থাকে, তাহারও প্রমাণ নাই। এদেশের বিধবাগণ নিরামিষ ভোজন করেন, কিন্তু "বাৎসল্য ও স্নেহভাব পরিপূর্ণ" গোদুগ্ধ ও তদুৎপন্ন ঘৃতাদি ব্যবহার করিতে আপত্তি করেন না; সুতরাং তাঁহারাও যে, বাস্তবিক নিরামিষ ভোজন করেন, তাহা কিরূপে বলিব? ইহারা যেরূপ প্রায়-নিরামিষ ভোজন করেন, তদ্রূপ প্রায়-আমিষ ভোজী লোকের কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য দিকে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ পরামর্শ দেন না যে, মনুষ্য কেবল আমিষ খাইয়া জীবন ধারণ করিবে। এই মাত্র বলা যায় যে, মনুষ্যের যথার্থ খাদ্য, মিশ্রখাদ্য; অর্থাৎ মিশ্র খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ যবক্ষারজানময় ও অঙ্গারময় দ্রব্য উদরস্থ হইতে পারে। এরূপ মিশ্রখাদ্য—উদ্ভিজ্জ ও আমিষখাদ্য—মৎস্য, মাংস ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি। খাদ্য সম্বন্ধীয় এসকল সাধারণ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; পরে ব্যক্তিগত অভাব মোচনের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বয়ং মনন করিবেন। এই বঙ্গভূমের ছয় কোটী লোক সকলেই ধর্ম্মশিক্ষক হইবেন, এমত নহে; সকলেই যোদ্ধা হইবেন, এমত নহে, সকলেই মিল, স্পেনসার, গ্লাডষ্টোন, বিস্মার্ক হইবেন না। সকলেই কেশব, কৃষ্ণদাস, অক্ষয়কুমার হইবেন না। সুতরাং খাদ্য সম্বন্ধে এমন কোন উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সমান উপযুক্ত হইবে। প্রত্যেকে আপনআপন ধাতু, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও জীবনগতি নির্ণয় করিয়া উপযুক্ত খাদ্য মনন করিবেন। এ বিষয়ে কতক পরিমাণ স্বাধীনতা থাকা অতি আবশ্যক।

শ্রীধর্ম্মদাস বসু।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

কেন বল স্মৃতিদেবি স্বপনের বেশে,
মরমে লুকান কথা জাগাইলে এসে?
কেন সে শৈশব কথা করালে স্মরণ
হৃদয় ভরিল লো রে পূরিল নয়ন।
অতি দূর দুরান্তরে
ধরণীর পরান্তরে
দুরন্ত তটিনী তটে ছিল মোর বাস।
বলিতে সে সব কথা
পরাণে বাজয়ে ব্যথা
বড় সুখে ছিলাম যে সেথা।
ক্ষুদ্র সে কুটীর মম
চির শান্তি নিকেতন,
হেরিলে সে রম্য স্থান
ঋষির ভুলিত প্রাণ
চিত্রকের সাধ্য কিতা তোলে তুলিকায়।
সম্মুখে বিশাল মাঠ ধূ ধূ করে,
শ্যামল কানন শোভে ধরণী উপরে,
হইলে প্রভাত বেলা
দেখেছি সে ছেলে বেলা
দলে দলে মাঠে যেত পয়স্বিনীগন,
হাম্বারবে বৎস সবে করিত গমন।
প্রফুল্ল কৃষক কত যেত মাঠ পানে
দেখিত নবীন শস্য অতি সাবধানে।
কচি ধান গাছ গুলি
চেয়ে র'ত মাথা তুলি
যেন আশ্বাসিত চাসাগণে দুঃখ যাও ভুলি;
সময়ে শ্রমের ফল পাবিরে নিশ্চয়,
সৎকাজে পুরস্কার নাহিক সংশয়।
হরিত বসনে মাঠ কি শোভা ধরিত
নানা জাতি ফুল গন্ধে হৃদয় ভরিত,
যে দিকে ফিরাই আঁখি
এখন তা সাম্‌নে দেখি
মনোহর সেই রম্য ঠাঁই।

হৃদয় সাগরে মোর কত ঢেউ খেলিছে
প্রকৃতির শোভা সেই মরমেতে মেলিছে।
ঘুমায়ে পড়িত যবে সাঁঝের সাগর
খেলিত দুলায়ে নদী তরঙ্গ নিকর।
কত কি মোহন ছবি শোভিত আকাশ পটে
গাইত অপ্‌সরা গান সুরপুরে অকপটে।
যখন আকাশে উঠিত শশী
তারকা উঠিত ফুটিয়া
মধুর জোছনা পড়িত খসি
তটিনী ছুটিত লুটিয়া।
জগত যখন ঘুমের আলসে
ঢলিয়া পড়িত প্রকৃতির কোলে,
চারি দিক হতে উঠিত লহরী
অনিল পরশে অবশ ধরণী
যখন পড়েলো মনে গভীর নিশীথে
ঘুমভাঙ্গা চোখ দুটী না পারি মেলিতে
সাড়া নাই শব্দ নাই
জনপ্রাণী কেহ নাই
তখন যেমন ধীরে
অতি দূরে অতি ধীরে
নাবিকের বাঁশরীর গান
উদাস করিত অলস পরাণ।
তালে তালে ফেলি দাঁড়
খুলিয়া প্রাণের দ্বার
গাইত যে দাড়ীমাঝী ভাটিয়ারী গান।
সাধের তরণী কত নদী বক্ষে ভাসিয়া
তালে তালে চলে যেত নাচিয়া নাচিয়া,
পুরাণ সে তানটুকু আজ কাণে বাজিছে,
শুনিতে সে মধু গীত আজ প্রাণ নাচিছে।
ছিল না সেথায় আমোদের শেষ
ছিলনা সেথায় কপটতা লেশ
বনের পাখীর মত নাচিয়া খেলিয়া,—
গাইয়া সুখের গান কুসুম তুলিয়া,

আনন্দে আনন্দে দিন করেছি যাপন ;
কেন সে পুরাণ কথা করালে স্মরণ ?
ছিল মোর এক খেলিবার সাথী
দুটী প্রাণ এক সারা দিন রাতি
এত ভালবাসা কোথায় না দেখি।
গুণ গুণ স্বরে দোহে কত কি গেয়েছি
বনের হরিণী মত বনে বনে ফিরেছি
প্রাণের প্রাণের কথা কত কি বলেছি।
অমিয় মাখান মুখ খানি তার
চেয়ে চেয়ে সাধ পূরিত না আর
দেখিনি রূপসী তাওত নয়।
কিন্তু দেখিনি তেমন মুখ সুমধুর ভাবময়।
তাই বড় সাধ হয় মনে দেখিতে তার হাসি
মধুর মুখখানি তার বড় ভালবাসি।
এখন ত কতদিন ভাবিতে ভাবিতে
বাতায়ন পাশে বসি মধুর জোছনা রেতে,
বড় সাধ হয় মনে যারে ভাল বাসি
মুহুর্ত্তের তরে সেই বসে কাছে আসি।
স্মৃতি ঢাকা চাঁদে সুধু বাড়ায় যাতনা
আধেক সুখেতে কার পূরেনা বাসনা।
ফুলের বাগান এক ছিল এক কোণে
স্বপনে সে সব কথা জেগে উঠে মনে,
শৈশবে যাহাই ছিল সব যেন ভাল
ফুলফল গাছ গুলি করেছিল আলো ;
সাধের বাগানে আমি অতিশয় যতনে
রোপণ করিয়াছিনু সেফালিকা রতনে।
সযতনে জল ঢেলে দিয়াছি দুবেলা
কাছে তার বসে কত করিয়াছি খেলা।
রেখেছিলাম শিউলিরে অতিশয় যতনে
দিন দিন বাড়িত সে আনন্দিত আননে,
কিন্তু বরষা সেথা আইল যে কালে
ডুবাল অতল জলে শিউলি অকালে ;
কচি প্রাণে সে আঘাত মরমেতে বাজিল
বুঝি প্রাণে বিঁধা শেল আছে মোর আজিল!

কখনও প্রভাত বেলা
সে সুখের ছেলে বেলা
শুনিয়া পাখীর গান
হরিষে ধরেছি তান
পাখীদের সনে মাতি প্রভাতী গাইতে
প্রতিমার আখি তুল
তুলি নানা জাতি ফুল
দিতাম মায়ের হাতে মনের হরষে
ফুলাঞ্জলি দিয়া তিনি পূজিতেন মহেশে।
করেছি সকল কাজ ভাই বোনে মিলিয়া,
সস্নেহে মোদের মাতা দিতেন বাঁধিয়া ;
চাকর বাকর সেথা ছিল না কাহার ;
পাচক বামন হাতে ছিল না আহার,
কাজ কর্ম্ম সেরে নিয়ে করিছি কত খেলা,
তখনত ছিলনা মোর বড় মানুষি মেলা।
ভাই বোন প্রতিবেশী ছিল সব ভাল
দেখিতে হত না কভু কার মুখ কাল,
অতীতে গিয়াছে যাহা,
আজ প্রাণ চাহে তাহা,
সুখ দুঃখ দুই তথা ছিল ত মিলন,
তবে কেন তার তরে বাসনা এমন ?
অদূরে দুরন্ত নদী হুহু করে যায়
কি জানি কি যেন গেয়ে কার পিছু ধায়।
দেখিতাম কত নারী আসি নদী কূলে
কহিত কতই কথা কত কাজ ভুলে।
মধুর অধরে কেহ মধুর হাসিয়া,
তটিনীর জলে দিত পরাণ ঢালিয়া।
সুধাইত মৃদুস্বরে কহলো তটিনি
কার তরে সদা তুমি এত পাগলিনী।
লজ্জা নাই ভয় নাই
সদা কর হায় হায়
তুমি কি লো প্রেমভিখারিনী ?
ফিরিতেছ কার উদ্দেশে
সে তোমার কোন্ দেশে
কহলো কহলো মোরে ধ্বনি।

দূরে দূরে অতিদূরে আছে সে আমার
যেমন প্রবাসে পতি আছেন তোমার।

তাইত চঞ্চল এত
সদা পাগলের মত
অন্ত নাই সীমা নাই
কোথাও যে নাই পাই
মোর সেই পরাণ রতন।

বলিতে নিদয় সাগরের কথা
তটিনী পাইত পরাণেতে ব্যথা
উছলি উছলি উছলি উঠিত,
সে দারুণ বেগ তার আর নাহি থামিত।
এক দিন ঢলে ঢলে আধ ঘুম ঘোরে
পড়িলাম সে দুরন্ত তটিনীর বুকে
দিগ্বিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞান হত
স্রোতমুখে ভাসিলাম বিদ্যুতের মত।
ভাসিতে ভাসিতে আসি ঠেকিলাম হেথা
পথ ঘাট নাহি চিনি যাই তবে কোথা?
শৈশবের কথা সব হইলে স্মরণ
পলকের তরে যেন
মনে মনে হয় হেন
যদি হইতাম পাখী
শুন লো প্রাণের সখি
শৈশব সঙ্গিনী
আকাশে ঢালিয়া দিয়া প্রাণ
গাইয়া সে পুরাতন গান
জনমের মত একবার
দেখিতাম মুখানি তোমার।
অতীতের সুখজ্ঞান
সুখ ভ্রান্তি বর্ত্তমান
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি ঘোর অন্ধকার
কি হবে গো কি হবে আমার?
তাই বলি বার বার
কেন স্মৃতি জাগিলে আবার?

বাই

সাবিত্রী প্রতিবাদের প্রতিবাদ। (২)

তারপর চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, যে "বিবাহ ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবার জন্য।" এবং "যে বিবাহ ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবার জন্য তাহাই মঙ্গলজনক।" "যদি তাহাই হয়, তবে বিবাহার্থে স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন না করাই ভাল।" বিজয় বাবুর মত তাহা নহে; তিনি সমাজ সেবা ও পারিবারিক সুখও চাহেন, অথচ নির্ব্বাচনপ্রথা বিবাহকারীর হস্তে রাখিতে চান। তিনি বোধ হয় এ কথাটী জানেন, আমরা যেরূপ মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ লইয়া একত্র বাস করি, হিন্দু পরিবার প্রথা যেরূপ, অন্য কোন জাতি সেরূপ আত্মীয়বর্গ লইয়া একত্র বাস করে না, তাহাদের পরিবারপ্রথা এ প্রকার নহে। তিনি যে, ইংরাজগণের আদর্শে হিন্দুজাতি মধ্যে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলনের আকাঙ্ক্ষী, সে ইংরাজগণ বিবাহিত হইয়াই স্ত্রীর সহিত স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। সুতরাং ইংরাজ মহিলার অনেক লোকের সহিত মতভেদ-জনিত অশান্তি ও অসুখ ভোগের আশঙ্কা নাই। হিন্দু মহিলাকে যেরূপ এক বিভিন্ন পরিবারস্থ সকলের রুচি প্রকৃতির সহিত আপনার রুচি প্রকৃতি মিশাইতে হয়, পরকে আপনার করিতে হয়, আপনাকে সেই পর হইয়া যাইতে হয়, ইংরাজ

মহিলাকে সে মহান আত্মত্যাগ করিতে, সেরূপ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয় না। কিন্তু এরূপ মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের যোগাড় করিবে কে? পরিবারের কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কেহ কি বুঝিতে পারেন, তাঁহার পরিবারে কিরূপ পরিবারের কন্যা আনিলে সেই কন্যা তাঁহার পরিবারোপযোগী হইবে? কি করিলে পরিবার বন্ধন দৃঢ় থাকিবে, পরিবারের উন্নতি হইবে, পরিবারে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিবে, বিজ্ঞ, বহুদর্শী অভিভাবক যেরূপ বুঝিতে পারিবেন, অনভিজ্ঞ, বিবাহকারী তরুণ যুবক কি সে কঠিন কার্য্যে সক্ষম? জিজ্ঞাসা করি, পরিবারের যাহাতে মঙ্গল, বিবাহকারী যুবকের কি তাহাতে মঙ্গল নহে? তাঁহার মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনের যাহাতে মানাপমান, সুখাসুখ, শান্তি অশান্তি হইবে, তাঁহার কি তাহাতে মানাপমান, সুখাসুখ, শান্তি অশান্তি হইবে না? লেখক ব্যক্তিগত সুখ কাহাকে বলেন, বুঝিলাম না। পরম রূপবতী বিলাসিনী পত্নী লাভে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তিই কি তবে ব্যক্তিগত সুখ? হিন্দুশাস্ত্রে নির্ব্বাচনের যে প্রণালী আছে, এবং চন্দ্রনাথ বাবু যাহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদি সেই প্রণালী মতে বর্ত্তমান সমাজে নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সকল সুখই সাধিত হইবে। চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়াছেন, তিনি বর্ত্তমান কালের টাকার পরিমাণে নির্ব্বাচনের নিয়ম করিতে হইবে, একথা বলেন নাই। কুলশীল না দেখিয়া, পিতৃমাতৃ কুলের সবিশেষ পরিচয় না লইয়া, পরিবারের প্রকৃত মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, আজিকার অদূরদর্শী, পরিণামজ্ঞানশূন্য যে সকল অভিভাবক বরকন্যা নির্ব্বাচন করেন, তিনি তাঁহাদের কথা বলেন নাই। শাস্ত্রানুযায়ী দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাচন হয় না বলিয়াই আজকালকার অনেক পতি ও পত্নী নানা দোষে দোষী হন, তাই বিজয় বাবুর মত ব্যক্তিরা স্থির চিত্তে এই মূল কারণটীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া বলিয়া বসেন, বয়স্থা হইয়া বিবাহিতা হইলে স্ত্রীর অন্তঃকরণের রুচি, প্রবৃত্তি ও গতি পতির সহিত মিশিয়া যাইবে। সকলেই জানেন, নদীর স্রোত প্রথমে নানা দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া, অবশেষে একটী পথ অবলম্বন করে। আমাদের মতি, গতি, রুচি, প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্রও অল্প বয়সে নানা মুখী থাকে, নিয়তই সে সমস্তের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু যখন বয়সের সহিত বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, তখন যে শিক্ষা, সংসর্গ ও অবস্থায় থাকা যায়, ঠিক সেইরূপে মন গঠিত হইয়া যায়। তখন যে পরিবারে কন্যা প্রবেশ করেন, সে পরিবারের সহিত কখনই তাহার মিশ খাইবে না। কারণ কোন দুইটী পরিবারের রুচি, প্রকৃতি, মতি গতি একরূপ নহে। সে পরিবারের সহিত যখন মিল হইল না, তখন সে পরিবারে পালিত বিবাহকারী যুবকের সহিতও তাহার মিলন হইতে পারে না। সেই জন্য বয়স হইয়া বিবাহে ব্যক্তিগত সুখ হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে অসুখ, পদে পদে স্বামী স্ত্রীতে মতভেদ, বিবাদ, বিসম্বাদ সর্ব্বদাই মনান্তর হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অল্প বয়সে, স্বভাবাদি স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ হয়, তবে স্বামী

স্ত্রীকে নিজ পরিবারানুযায়ী, নিজ মনোমত গড়িয়া লইতে পারেন। অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীর সহিত স্বামীকে মিশিতে চন্দ্রনাথ বাবু নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া বিজয় বাবু ভাবিয়াছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে পরিবারানুযায়ী গঠিত করিতেও পারিবেন না। না, তাহা নহে, চন্দ্রনাথ বাবু স্বামী স্ত্রীর সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়াছেন; স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রীর শিক্ষা নিষিদ্ধ নহে। বিজয় বাবু ৯০শ ও ৯১ শ পৃষ্ঠা দুটী ভাল করিয়া কাহারও নিকট বুঝাইয়া লইলে আমার কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, এরূপ জিতেন্দ্রিয় স্বামী হইতে গেলে কিরূপ ভাবে নিজ জীবন গঠিত করিতে হইবে, সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথাও চন্দ্রনাথ বাবু অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং লেখকের মতে "জীবনের নৈতিক দুর্গতি কিরূপে হইবে" তাহা তাঁহার মনই বলিতে পারে। আমি ত কিছু বুঝিলাম না। আমি ইহাও বুঝিলাম না, তিনি কোন্ রুচিতে, কি বিবেচনায়, নিম্ন লিখিত অপাঠ্য, আলোচনার নিতান্ত অযোগ্য কথা বলিয়াছেন;—"যুবতীর দিকে যুবক প্রেমের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করুন, ক্ষতি নাই, তাহাতে যদি ভ্রান্তি জন্মে, চিত্ত বৈকল্য হয়, তাহাও প্রার্থনীয়, কিন্তু বালিকাকে প্রেমময়ী করিয়া গড়িবার চেষ্টা করা কোন প্রকারে উচিত নয়।"

তারপর, তাঁহাকে বক্তব্য এই, তিনি যেন শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দেন যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও জাতিতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। আর তিনি যে বলিয়াছেন, "পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার না হইলে কন্যা বরগৃহে নীতা হয় না" সেটা কি ষোড়শ বা ঊনবিংশ বা দ্বাবিংশ বয়সে হয়? জানি না বিজয় বাবু বাঙ্গালি হইয়া কিরূপে বলিলেন, "বাল্যবিবাহ রীতি একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য কেবল প্রচলিত হইতে পারে না।" যে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা মানুষকে নীচ স্বার্থপরতা ভুলাইয়া দেয়, পরোপকার রূপ শ্রেষ্ঠ ব্রতে দীক্ষিত করে, যে প্রথা ভক্তি, প্রণয়, স্নেহ, মমতা, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি সংবৃত্তি নিচয়ের পূর্ণস্ফূর্ত্তি ও বিকাশের একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র; এক কথায় মনুষ্যত্ব শিক্ষার যাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সমগ্র হিন্দুসমাজনীতি যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, সেই একান্নবর্ত্তী প্রথার খাতিরে তিনি বাল্যবিবাহ দিতে চান না। যে দেশের কথাই ধর না কেন, সমাজের উৎপত্তি কোথা হইতে? পরিবার সমষ্টি কি সমাজের প্রসূতি নহে? সুতরাং সেই পরিবার প্রথার উন্নতি ও পূর্ণতাতে সমাজ উন্নত ও পূর্ণ হইবে না কি? যাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার প্রয়োজনীয়তা এবং মহত্ব উপলব্ধি করেন, বাল্য বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। ইহার পর রবীন্দ্র বাবুর "অকাল কুষ্মাণ্ড ও হাতে কলমে" প্রবন্ধের প্রতিবাদ। আকাশ পাতাল ভাবিয়া লেখক ইহার একটী দোষ বাহির করিয়াছেন যে, প্রবন্ধটী ইংলণ্ডের ম্যাথিউ আরনল্ড প্রভৃতি লেখকগণের লেখার মত গম্ভীর নহে। আমি এ ছেলেমানুষীর উত্তর দিতে অক্ষম।

"হাতে কলমে" প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবু কোথাও বলেন নাই, দেশের নির্ধন অথচ

শিক্ষিত সংবাদ পত্রাদির সম্পাদক, অর্থ দিয়া দেশের অনিষ্ট নিবারণ করুন। সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের তিনি কোনও প্রতিবাদই করেন নাই। তিনি সভা আহ্বান এবং বক্তৃতার বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুখের কথায় কিছু হইবে না, কার্য্যে দেশের অভাব দূর কর। তিনি, দেশের ধনীগণকে ঘরের ভিতর টাকা পূরিয়া রাখিয়া, নির্ধন ব্যক্তিগণকে উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিতে বলেন নাই। যাঁহারা দেশহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে, বক্তৃতা বা সভায় লোকের অভাব জ্ঞান ও তন্নিবারণের প্রবৃত্তি হইবে না। এক একটী অত্যাচার নিবারণ করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা, কার্য্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে হইবে। তিনি বড় বড় ব্যাপারের আন্দোলন না করিয়া, শেষ হইতে কার্য্য আরম্ভ না করিয়া, গোড়া থেকে, ছোট কাজ হইতে আরম্ভ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এমন সহস্র কাজ আছে, যাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের তোষামোদের প্রয়োজন নাই; আমাদের দ্বারাই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। রাজনীতি শিক্ষা দিতে গিয়া যাঁহারা ভ্রম পথে পড়িয়াছেন, রবীন্দ্র বাবু তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক তাঁহার প্রবন্ধটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য (Spirit) কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা কথা লিখিয়াছেন, এবং অবশেষে জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ, National Fund এর কথা এখনও বিস্মৃত হন নাই, বোধ হয়।

৭ম ও ৮ম প্রবন্ধ "সোণার কাটী রূপার কাটী" ও "সোণায় সোহাগা"— শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লিখিত। লেখক দ্বিজেন্দ্র বাবুকে অতি সঙ্কীর্ণমনা বলিয়াছেন। ইহাতে তিনি কেবল মিথ্যা কথা বলেন নাই, একথা বলাতে তাঁহার পাপ হইয়াছে। দিন দিন আমরা জাতীয়ত্ব হারাইতেছি দেখিয়া, আমাদের আত্ম মর্য্যাদাবোধ ক্রমে লোপ পাইল বুঝিয়া, মনুষ্যত্ব আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু মর্ম্ম ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছেন। প্রবন্ধ দুইটী যেকেহ পড়িবেন, এবং লেখার ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক কথা হৃদয়ের শোণিত দিয়া লিখিত। আগা গোড়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার উপহাস গভীর বিষাদের অভিব্যক্তি মাত্র। এ প্রবন্ধ আবার সঙ্কীর্ণ মতের পরিচায়ক! এরূপ উদারভাবে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া কয়জন লিখিতে পারেন? স্বদেশীয়ের হীনতা দেখিয়া, এবং সেই হীনতার জন্য রাজার নিকট স্বদেশীয়ের লাঞ্ছনা দেখিয়া কয়জন এমন করিয়া কাঁদিতে পারেন? জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা হ্যাট-কোট পরিধান করেন, তাঁহারা কি কারণে দেশীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছেন? কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না। অবশ্য, সেই জাতীয় চিহ্নটী তাঁহাদের মনোমত নহে বলিয়া, তাঁহাদের নানা প্রকার স্বার্থের বিরোধী বলিয়াই তাঁহারা জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছেন। জাতীয়তায় অনুরাগ কম বলিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন। এবং পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতি, জাতীয় পরি-

ছন্দের দোষই থাকুক বা গুণই থাকুক, জাতীয়তায় পূর্ণ অনুরাগ বশতঃই তাহা পরিত্যাগ করে নাই। জাতীয় পরিচ্ছদের দোষ থাকে, তাহা মোচন কর। কিন্তু এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিও না, যাহাতে তোমাকে স্বজাতীয় বলিয়া চিনিতে পারা না যায়, অথবা যাহাতে তোমাকে স্বজাতীয়-বিদ্বেষী বলিয়া লোকে মনে করে। লেখক হ্যাটকোটধারী কয়েক জনের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা পরম দেশহিতৈষী, এবং আমরা "ধুতি চাদর ওয়ালারা ঘরে বসিয়া জেঠাম করি।" মহাত্মা রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ধুতিচাদর ওয়ালারা ঘরে বসিয়া জেঠামো করিয়াছেন, না? তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার তালিকার ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার হইয়াছে বুঝি? আশা করি, যাঁহারা লেখকের মতাবলম্বী আমার কথাগুলিতে তাঁহাদের চৈতন্য হইবে।

"হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না" প্রবন্ধের প্রতিবাদে তিনি বলিয়াছেন, "বয়স্থা হইয়া বিবাহিতা হইলেও যদি কেহ বিধবা হয়, সেও অবশ্য পুনর্বিবাহ করিবে।" তাঁহার আর একটী মত, "অক্ষয় বাবু বিধবার বিবাহ নিষেধ করেন নাই।"

"তারপর ১০ম প্রবন্ধ—হিন্দু রীতি নীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে"। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে কর্তৃক লাইব্রেরীর গত বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। বীরেশ্বর বাবু শেষ বক্তা; কিন্তু কি জানি তাঁহার প্রতি বিজয় বাবুর বিদ্বেষই থাকুক বা অন্য কোন ভাবই থাকুক, প্রবন্ধের আরম্ভেই তিনি তাঁহাকে, ভদ্রলোকের বিশেষতঃ সাহিত্য চর্চ্চাকারীর অযোগ্য কটুকথায় অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বীরেশ্বর বাবু কোন এক বৎসরের বক্তার উপযুক্ত নহেন; তিনি লেখক নামেরই অযোগ্য। বোধ হয়, লেখকের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইতেছে; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তিনি কিছুই অবগত নহেন। তাঁহার অবগতির জন্য লিখিতেছি, বাঙ্গালা ভাষায় "মানবতত্ত্ব" নামে যে একখানি প্রগাঢ় চিন্তা, অসাধারণ বহুদর্শিতা, অদ্ভুত বিচারশক্তিপূর্ণ পুস্তক আছে, পণ্ডিত ও জ্ঞানী মাত্রেই যে পুস্তকের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার সহিত যে পুস্তক থাকিবে; শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে সেই পুস্তকের প্রণেতা। তিনি বহুকাল ধরিয়া তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভ করিতেও প্রবন্ধ রচনা শিখিতে পারেন। সুতরাং "বীরেশ্বর পাঁড়ের মত লোক দিয়া কেন প্রবন্ধ পড়ান হইল" এবং "তিনি সমাজ বিজ্ঞানাদি কখনও চোখে দেখিয়াছেন কি না" সে কথা তাঁহার জানিবার কোনও উপায় নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বিখ্যাত হইবার দুইটী উপায় আছে, এক নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে, নিজের প্রতিভাবলে; আর এক উপায় বড় লোকের স্কন্ধে চাপিয়া অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গালাগালি দিয়া। বিজয় বাবু বোধ হয় শেষোক্ত সুলভ উপায়টী অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি যেরূপে বড় হইতে পারেন হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু তিনি যে নব্যভারতের পাঠকগণকে "অসার ১০ম প্রবন্ধ সম্বন্ধে

কিছু বক্তব্য নাই” বলিয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে তাহা করিতে দিব না। বীরেশ্বর বাবুর প্রবন্ধে কি আছে, দুচারি কথায় পাঠকবর্গকে তাহা জ্ঞাত করাইতেছি।

বীরেশ্বর বাবু বলেন, আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এক দিকে দেখিতেছেন যে, তাহাদের স্বজাতির বর্ত্তমান অবস্থা ইয়ুরোপীয় জাতিগুলির সহিত তুলনায় অতিহীন, অতি শোচনীয়। তাঁহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে; তাঁহাদের পরাক্রম পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করিতেছেন। অন্যদিকে আমরা দিন দিন দরিদ্র হইতেছি, আমাদের প্রাচীন শিল্প বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়, আমাদের চারিদিকে শত শত অভাব। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান রীতিনীতি আচার ব্যবহার আমাদিগকে নিশ্চই দুর্ব্বল, নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য করিতেছে। ইংরাজগণের জীবন যেরূপে গঠিত হইয়াছে, আমাদের জীবন সেভাবে সেই রীতি নীতি অবলম্বনে গঠিত না হইলে, আমাদের দুরবস্থা ঘুচিবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। যে পাশ্চাত্যগণের জ্ঞান ও সভ্যতা এত সমুন্নত, সেই পাশ্চাত্যগণই প্রাচীন হিন্দুজাতির জ্ঞান ও সভ্যতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বৈদিক কালের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপরই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য। সে সময়কার আচার ব্যবহার পাশ্চাত্যগণের সহিত মিলে এবং উহারা যখন সেই অবস্থাকে অতিশয় গৌরবের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই সে সময় অত্যন্ত উন্নতির কাল। আমরা পুনরায় সে সমস্ত অবলম্বন করিলে পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্বমহত্ত্ব লাভ করিব, পাশ্চাত্য জাতিগুলির মত মহিমান্বিত হইব। ইহাতে জাতীয় রীতি নীতি সমূহে বিদ্বেষভাব ঢাকা পড়িবে, অথচ ফাঁকি দিয়া এক মহাজাতি বলিয়া গণ্য হইব। হায়! লাঙ্গুলহীন শৃগাল যে অন্য সকল শৃগালকে স্বস্ব লাঙ্গুল কাটিয়া তাহার দলভুক্ত হইতে বলিতেছে, ইংরাজ প্রভুগণের এ কূটনীতি শিক্ষিতগণ বুঝিতে পারেন নাই। বীরেশ্বর বাবু বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত শিক্ষিতগণের ফাঁকি ধরিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, বৈদিককাল য়ুরোপীয়গণের মতেই আমাদের সভ্যতার প্রথমাবস্থা। সে সময়ে আমাদের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তাহার অনেককাল পরে আমাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, তিনি আমাদের উন্নতির ক্রম অতিবিশদরূপে বিশেষ দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন। বৈদিককালে হিন্দুসমাজে যে বিশৃঙ্খলা ছিল, কত দিকের কত স্বেচ্ছাচারিতা অপনীত হয় নাই, তাহা তিনি সুন্দর প্রণালীতে বুঝাইয়াছেন। যে সময়ে আমাদের রীতিনীতি নিয়ত পরিবর্ত্তনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ ও অতিশয় উন্নত অবস্থায় আসিয়া পৌহুঁছিল, যখন হিন্দুজাতি মনুষ্যত্বের অনেক উচ্চ শিখরে উঠিলেন, সেই সময়কার—সেই মনুর, রামায়ণ ও মহাভারতের কালের অবস্থা তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এই সময় যে প্রকৃত উন্নতির সময়, তিনি ভারতবর্ষীয় আদিম অসভ্যজাতি ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতির রীতি নীতির আলোচনায় দেখাই-

য়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, অতি প্রাচীন কালের আর্য্যজাতি মধ্যে সেই সব রীতি নীতি অনেকগুলি প্রচলিত ছিল। যদি ভীল সাঁওতাল প্রভৃতির অনুকরণ বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি অবলম্বন করা কি যুক্তিসিদ্ধ? শিক্ষিতগণ কি সেই বর্ব্বর জাতি ভুক্ত হইতে উৎসুক? বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতির ক্ষমতা কম ছিল। সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী দেশ সমূহ মাত্র তাঁহাদের অধিকৃত ছিল। শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। যে সকল রীতি নীতি বর্ত্তমানকালে প্রচলিত, আমাদের প্রকৃত গৌরবের অবস্থায় সেই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনাদির প্রভাব সুদূর গ্রীস ও রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃতি হইয়াছিল, ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতির সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিতেছিল, সকল বিষয়ে যখন ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতির আদর্শ হইয়াছিল, বর্ত্তমান রীতি নীতি সমূহ সেই গৌরবকালের। হিন্দু রীতি নীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে। অবনতির কারণ স্বতন্ত্র। সামাজিক রীতি নীতিই যদি অবনতির কারণ হইত, তবে যে পাশ্চাত্যগণের কতকগুলি রীতিনীতির সহিত ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মিল আছে, সেই সকল ঘৃণিত, অসভ্য জাতি মহাপরাক্রমশালী হইতে পারিত।

তারপর বীরেশ্বর বাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, শিক্ষিতগণ ইংলণ্ডের অনেক রীতি নীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে তাহাদের জাতিভেদ নাই বলেন, বিবাহকালে বর কন্যার নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ ক্ষমতার কথা বলেন, তাহা মিথ্যা। তিনি ইংরাজ সমাজের আঁটাআঁটির কয়েকটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে স্বজাতীয় রীতি নীতির অনেক বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, তাহাও তিনি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। স্থানাভাবে সে সকল স্থল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তাহা হইলে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেন, বীরেশ্বর বাবুর যুক্তিপ্রণালী, কত উচ্চদরের, কত সূক্ষ্ম, কত উত্তম। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, লেখক কি প্রকারে এ প্রবন্ধকে অসার বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। আমরা এমন কথা বলিনা, তাঁহার প্রবন্ধে একটীও দোষ নাই। দুএকটী সামান্য দোষ দেখিয়া একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধকে অসার বলা অত্যন্ত অন্যায়, অতিশয় হীনতার পরিচায়ক।

পরিশেষে ভূমিকা সম্বন্ধে গুটিকতক কথা। আমি ভূমিকায় লিখিয়াছি, "আমাদের পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা আমাদের দ্বারা দেশের আর একটী হিতানুষ্ঠান হইতে চলিল, আজ আমরা আর একটী কীর্ত্তি স্থাপিত করিতে পারিলাম।" বিজয় বাবু এই কথা গুলির নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন, "কিন্তু সম্পাদক যখন এত অল্প দিনের মধ্যেই এটাকে (প্রতি বৎসর অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করানকে) একটা কীর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন, তখন ভয় হয়, যে পরিতৃপ্তির সুখ ভবিষ্যতের উন্নতির পক্ষে বাধা না জন্মায়।" এখন নিরপেক্ষ পাঠক বিবেচনা করুন, 'কীর্ত্তি' কথাটী আমি কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছি, এবং লেখক তাহা কি প্রকারে

বিপরীতভাবে ব্যাখা করিয়াছেন। "পরম সৌভাগ্য এবং গৌরব" এই দুইটী কথার ভাব কি? কীর্ত্তিটী আমাদের মনে উদিত হইয়াই স্থাপিত হয় নাই, ইহা সামান্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে সম্পন্ন হয় নাই; বিশেষ চেষ্টায়—তাহাও নহে—অদৃষ্ট বশে—মনুষ্যের অজ্ঞাত, মনুষ্যসাধ্যাতীত ঈশ্বরানুগ্রহে সাধিত হইয়াছে। এবং এই অনুগ্রহ প্রাপ্তি কি কম গৌরব ও আনন্দের বিষয়? আশা করি, লেখক এবার আমার কথা গুলির অর্থ বুঝিতে পারিবেন। একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, আমাদের "পরিতৃপ্তির সুখ, ভবিষ্যতের উন্নতির পক্ষে বাধা জন্মাইবে না"। তিনি যে বিষম ভয়ে আকুল হইয়াছেন, তাহা ত্যাগ করুন। আমার কথায় পরিতৃপ্তির কথা আসে না, তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আমার কথার যেরূপ মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়া সত্যের অবমাননা করিয়াছেন, যদি আমি সেই কথা গুলিই ব্যবহার করিতাম, তাহাতেই বা কি দোষ হইত? ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ধরণের অধিবেশন কি হইয়াছিল? অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা কি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ব্যাপার নহে? আমাদের এই সদনুষ্ঠান অন্যান্য লাইব্রেরী বা সভা সমূহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে না কি? এবং এইরূপ অনুষ্ঠানে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে না কি? তিনি যে সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনগুলিকে বালস্বভাব সুলভ তাচ্ছিল্যভাবে উড়াইয়া দিয়াছেন, আমরা বুঝিয়াছি, সেটা তাচ্ছিল্য নয়, ঈর্ষা। তিনি জানেন, দেশের অতি অল্প সভায় এত কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হয়; অতি অল্প সভায় এত সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য আমরা যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেরূপ অনুষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে অতি অল্পই হইয়াছে। আমাদের মুখে বলা শোভা পায় না, সাবিত্রী লাইব্রেরী জ্ঞান চর্চ্চার নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় নবোৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে। তিনি আমাদিগকে উপহাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া এত কথা বলিলাম। নহিলে সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বারা কত কাজ হইতেছে, এবং সেই সমস্ত কাজ যে কত নীরবে সম্পন্ন হইতেছে, একথা জনসাধারণ সকলেই জানেন। যশের আকাঙ্খায় নানা প্রকার স্বার্থে উত্তেজিত হইয়া আমরা কখনও লোকের দ্বারে দ্বারে প্রত্যেক সংবাদপত্রে জয়ঢাক বাজাই নাই। বিজয় বাবু আর এক স্থলে এইরূপে কেবল মাত্র সত্যের মস্তকে পদাঘাত করেন নাই, এক জন ভদ্রলোককে অকারণ মিথ্যাবাদী বলিতে চেষ্টা করিয়া সুরুচি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবুর প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া আমি লিখিয়াছি, "সভাস্থলে প্রধান প্রধান প্রতিবাদকারীদের প্রতিবাদ কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত উত্তর ও ইহাতে প্রকাশিত হইল।" বিজয় বাবু লিখিতেছেন, "কই? আমরা ত খুঁজিয়া তাহা পাইলাম না। * * বুঝি মুদ্রাকরের গুরুতর অপরাধে তাহা দেখা গেল না।" বিজয় বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিবেন, ২১২ শ পৃষ্ঠার শেষ প্যারা হইতে ২১৫ শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সভাস্থলে প্রতি-

বাদ-কারীদের প্রতিবাদ গুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে কি না। না দেখিয়া না শুনিয়া হঠাৎ সাধারণের সমক্ষে একজন ভদ্রলোককে অপদস্থ করিবাব চেষ্টা কি নিতান্ত অপরিপক্ক বুদ্ধির কাজ নহে? কাজটা কি অত্যন্ত গর্হিত হয় নাই?

পরিশেষে বক্তব্য, তিনি শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক লিখিত "বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা" "প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ," এবং "হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা" প্রবন্ধ তিনটীর প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আশা করি, ইংরাজি সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে যাঁহারা মোহিত হইয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহাদের মোহ দূর হইবে। তাঁহারা শান্ত হইয়া, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, স্থির ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রতিবাদ।*)

আপনি ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ এই তিন মাসের নব্যভারতে "যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" শীর্ষক যে তিনটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা এবং শেষ সংখ্যায় "তত্ত্বকৌমুদীর উত্তরে" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি

* বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছে। আমাদের এ সকল বিষয়ে কি মত, এই সময়ে ব্যক্ত করা উচিত বলিয়া তাহা করিতেছি। আমাদের কোন মতে ভুল থাকিতে পারে না, আমরা তাহা মনে করি না। যে সকল বন্ধু আমাদের ভ্রম প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চির ঋণী। বিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজে একটা বিশেষ আন্দোলন হয়, ইহা আমাদের প্রাণগত কামনা। কারণ, এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ যে কতকটা উদাসীন, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর হইতে কতক আন্দোলন উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা এখনও স্থান বিশেষে আবদ্ধ আছে, সমগ্র দেশের লোক তাহাতে যোগ দিতে পারে নাই। আমাদের কথা আমরা বলিয়া যাইলেই কিছু উপকার হয় না। অপর পক্ষের মত জানাও একান্ত উচিত। আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি খুব দক্ষতার সহিত অপর পক্ষ দেখাইতে পারিবেন, আমাদের আশা আছে। আমরা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে জয় লাভ করিয়া ধন্য হই, এ কামনা রাখি না। আমাদের কথায় ভুল থাকিলে তাহা সংশোধিত হয়, সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য বিস্তৃত হয়, পুণ্য ও পবিত্রতায় দেশ উজ্জ্বল হয়, ইহাই প্রাণের কামনা। সুতরাং আমরা বিজ্ঞ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তর্ক যুক্তির নিকট পরাস্ত হইলেও দুঃখ বা ক্ষোভ থাকিবে না। তাঁহার প্রতিবাদের আমরা অবশ্য সমালোচনা করিব। তার ফল কি হইবে, জানি না। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রবন্ধটা শেষ না হইলে প্রতিবাদের উত্তর দিতে আরম্ভ করিব না। কারণ, প্রতি সংখ্যায় এক বিষয়ে ৩।৪টী প্রবন্ধ দেওয়া যাইতে পারে না। পাঠকগণ দয়া করিয়া একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। আমাদের প্রস্তাব শেষ হইলে, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা গুলি আমরা খণ্ডন করিয়া দেখাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। ন. স।

অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি। মূলবিষয়ে অর্থাৎ বিবাহের উদ্দেশ্য যে ভোগ ও প্রজা বৃদ্ধি নহে, ইহা যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক প্রধান সোপান, সে সম্বন্ধে আমাদিগের উভয়ের মধ্যে মত বিভেদ নাই। আমি যতদূর জানি, এই মূল বিষয়ে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মই আপত্তি করিবেন না। ব্রাহ্মসমাজ এই উচ্চ লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে থাকিতে পারেন, এই লক্ষ্যের অনুযায়ী বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে না হইতে পারে, তথাপি ব্রাহ্মসমাজ ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে, এই লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া যে বিবাহ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিবাহ। মূল বিষয়ে মত বিরোধ না থাকিলেও আপনি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ প্রণালীর সমালোচনা করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথা আমি বিশেষ প্রতিবাদযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং তাহারই প্রতিবাদ করিবার জন্য এ প্রস্তাবের সূচনা।

আপনার কথার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহার প্রতি যেরূপ বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়াছেন, যাঁহারা আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগেরর প্রতি যেরূপ তীব্র উক্তি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে এই আশঙ্কা হইয়াছে যে, আমাকেও বোধ হয় সেই রূপ লাঞ্ছিত হইতে হইবে। আপনি তিরস্কারই করুন, আর পুরস্কারই করুন, আপনার যে সকল কথা আমার আপত্তিজনক বোধ হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন না করিয়া আমি বিরত হইতে পারিতেছি না। আপনি প্রতিপক্ষদিগের প্রতি উচিত ব্যবহার করেন নাই বলিয়া আপনাকে যে অনুযোগ করা হইল, আপনি হয় তো বলিবেন, সে অনুযোগ সঙ্গত হয় নাই। সুতরাং এস্থলে আমার অনুযোগের হেতু প্রদর্শন করা উচিত। আপনি দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, "ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা তাঁহারা (অনিষ্ট চেষ্টাকারী প্রতিপক্ষ) আমাদিগকে শত্রু মনে করিলেও আমরা যেন চিরকাল তাঁহাদিগকে বন্ধুর ন্যায় মনে করিতে পারি।" এখন দেখা যাউক, তত্ত্বকৌমুদীর উত্তরে আপনি সেই মিত্রদিগের প্রতি কিরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত বৈশাখমাসের নব্যভারতের ৩৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে আপনি লিখিয়াছেন, "আমাদিগকে অপদস্থ করিতে যে সকল বাক্‌পটু, ধর্ম্মব্যবসায়ী নব্যব্রাহ্ম প্রবীণের সাজ ধরিয়া আজ আসরে নামিয়াছেন এবং নানাপ্রকার কটূক্তি এবং ঈর্ষার ঢিল নিক্ষেপ করিয়া হিংসা বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা যদি এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে একটু ধর্ম্ম, একটু চরিত্র, একটু নীতির সেবা করিতেন, তবে এত দিন ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইত।" মিত্রের প্রতি যাঁহার এত সদ্ভাব, শত্রুকে তিনি কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আপনি বলিবেন "আমাদের পক্ষে শত্রু কেহই নন।" কিন্তু শত্রু মিত্রের অভেদত্ব যদি এইরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে "আমার বন্ধু হইতে আমাকে রক্ষা কর" একথা যে অনেকেই বলিতে বাধ্য হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিরোধী" কোন

কোন সম্পাদককে "শিথিল-বিবেক ও ব্যবসায়ী" বলাতে আপনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, "অন্য সম্পাদকদিগকে এই আখ্যায় অভিহিত করিয়া তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক প্রকারান্তরে আপনার ধার্ম্মিকতা এবং বিবেক প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কি অহঙ্কারের কথা! ছি, ধার্ম্মিকের পক্ষে কি ইহা শোভা পায়।" আপনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তত্ত্ব কৌমুদী সম্পাদক "ঘর বাহির শত্রু মিত্র গণনা" করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি আপনার শত্রুপক্ষকে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়া যদি "প্রকারান্তরে আপনার ধার্ম্মিকতা ও বিবেক প্রাধান্য" প্রদর্শন করিতে চাহেন, তাহাতে লোকে যত না বিস্মিত হইবেন, আপনার ন্যায় উদারচরিত্র ব্যক্তি যাঁহার "পক্ষে বাহির কিছুই নয়, শত্রু কেহই নন" তিনি যদি তাহার প্রতিপক্ষকে ধর্ম্মব্যবসায়ী, ঈর্ষাপরবশ, ধর্ম্ম, চরিত্র ও নীতি বিবর্জ্জিত ভণ্ডতপস্বী চটুল ব্যক্তি বলিয়া গালাগালি দিতে পারেন, তাহাতে লোকে অধিকতর বিস্মিত ও দুঃখিত হইবার কথা। ধার্ম্মিকের পক্ষে এরূপ ব্যবহার শোভা পায় কি না, সে বিচার আপনিই করিবেন। এস্থলে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নিজকে ধার্ম্মিক বলিয়া কোথাও কি পরিচয় দিয়াছি? একথার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকও ধার্ম্মিক বলিয়া আত্ম। পরিচয় দেন নাই। আপনি বলিবেন, প্রকারান্তরে পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি অপরকে শিথিল বিবেক ও ব্যবসায়ী বলায় প্রকারান্তরে আপনার ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিয়া থাকেন, আপনি অপরকে "ভণ্ডতপস্বী" "ধর্ম্মব্যবসায়ী" "স্বেচ্ছাচারী" "ধর্ম্ম চরিত্র নীতি" বিবর্জ্জিত বলিয়া কি প্রকারান্তরে আত্ম ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেন নাই? অথবা প্রকারান্তরেই বা বলি কেন? যিনি "গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে * * * আপন * * * হৃদ্‌পিণ্ডকে বিসর্জ্জন দিতে" পারেন, বিবেক বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্তি হওয়া যিনি অধর্ম্মের কাজ" মনে করেন, যিনি ঈশ্বরের উপর "নির্ভর করিয়া মরণকেও আলিঙ্গন করিতে" পারেন, তিনি যদি ধার্ম্মিক নন, তবে জগতে ধার্ম্মিক কে? তাই বলিতেছি, অপরে "আমাদিগকে শত্রু মনে করিলেও আমরা যেন চিরকাল তাঁহাদিগকে বন্ধুর ন্যায় মনে করিতে পারি" ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া শেষে তাঁহাদিগকে অত গালাগালি দেওয়া কি ভাল হইয়াছে?

"নব্যভারত সম্পাদকের অপেক্ষা তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক ও লেখকদিগের ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অধিক বই অল্প নহে" এই কথায় আপনি তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদককে "জ্যেষ্ঠতাত" বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যিনি আপনার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতার দাওয়া করেন, তিনি যদি "জ্যেষ্ঠতাত" হন, তাহা হইলে আপনি যখন বলিতেছেন যে, "আমাদিগের বিবেচনায় বিবাহবন্ধন একটী সংসারের বন্ধন নয়, ইহা একটী ধর্ম্ম বন্ধন। কেবল বিজ্ঞান সম্মত হইলেই ইহাতে মঙ্গল হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি সম্মত হওয়া একান্ত উচিত।" অথচ "ধর্ম্মসমাজের কার্য্য সংসারের দিক ও বিজ্ঞানের দিক বজায় রাখিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে, আধ্যাত্মিক দিকের কোনই খোজ খবর নাই।" তখন আপনাকে অপরে

কি আখ্যা প্রদান করিতে পারেন, তাহার মীমাংসার ভার আপনার হস্তেই সমর্পিত হইল। "আপনার বিবেচনায়, বিবাহ বন্ধন ধর্ম্ম ও নীতি সম্মত হওয়া একান্ত উচিত।" কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এই "আধ্যাত্মিক দিকের কোনই খোজ খবর রাখিতেছেন না" ইহার দ্বারা কেবল ব্যক্তি বিশেষের অপেক্ষা নহে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা আপনার বিবাহ বিষয়ক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে অধিক, ইহা কি প্রতিপন্ন হইতেছে না? আপনি কি এস্থলে নিজের "অধিক অভিজ্ঞতার অভিমান করেন নাই? আপনি অপরকে যে সকল দোষে অপরাধী করিয়াছেন, তাহা হইতে যখন আপনি নির্ম্মুক্ত থাকিতে পারেন নাই, তখন অপরের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত না করিয়াও ধীরতার সহিত সেই সকল অপরাধ প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এসকল গেল অবান্তর কথা। এখন মূল অভিযোগের হেতু অনুসন্ধান করা যাউক।

আপনি বলিয়াছেন, "আমাদের উদ্দেশ্য কুটিল, একথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে আজও চিনিতে পারেন নাই।" কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অপরে যে অবিচার করিয়াছেন, আপনি "বন্ধুদিগের" আন্দোলনকে "বিদ্বেষ পূর্ণ" বলিয়া কি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অবিচার করিলেন না? আপনি যদি অপরের আন্দোলনকে "বিদ্বেষপূর্ণ" বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনার আন্দোলনকে "ঈর্ষা প্রণোদিত" বলিলে দুঃখিত হইবেন কেন? পরস্পরের প্রতি এরূপ অবিশ্বাস গরল উৎপাদন করিতেছে, একথা উভয় পক্ষেরই স্মরণ রাখা উচিত ছিল। আপনি নীচ উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রস্তাব লিখিয়াছেন, আমার সে ধারণা নাই। তবে সাধু অভিপ্রায় থাকিলেও লোকের ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, অমৃত মন্থনেও গরল উৎপন্ন হইতে পারে, একথা আপনি বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। আপনার প্রস্তাবের লক্ষ্য সাধু হইলেও আপনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অতি অবিচার করিয়াছেন, ইহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে আপনার প্রধান অভিযোগ এই যে, ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ কার্য্য "সংসারের দিক ও বিজ্ঞানের দিক বজায় রাখিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে" কিন্তু আধ্যাত্মিক দিকের কোনই খোজ খবর নাই।" ১৮৭২ অব্দের ৩ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে ব্রাহ্মসমাজ সংসৃষ্ট দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রে এ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। সেই সাময়িক সাহিত্য যদি আপনি একবার পাঠ করিয়া দেখিতেন, আপনি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে এইরূপ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। ৺কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে লোকে আর যে কথাই বলুন না কেন, তাঁহার নীচতম শত্রুও কখনও, একথা বলিতে সাহসী হন নাই যে, আধ্যাত্মিকতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্য, বিবাহকালীন আচার্য্যের উপদেশ, উদ্বাহ সঙ্গীত প্রভৃতি হইতে এমন অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যদ্বারা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে, বিবাহের এক প্রধান লক্ষ্য যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহা ব্রাহ্মসমাজ

পূর্ব্বাপর স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে আপনি নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল গত হইল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণ ক্রমান্বয়ে কয়েকবার সম্মিলিত হইয়া বিবাহের লক্ষ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং অল্প কয়েক মাস হইল পুনরায় এবিষয়ে যে আলোচনা হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা সভায় যদি আপনি উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, ব্রাহ্মসমাজের বিবাহের লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা বিবর্জ্জিত নহে। উদ্বাহ সঙ্গীত হইতে দুই একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইব যে, ধর্ম্ম ও নীতিকে ভুলিয়া কেবল বিজ্ঞানের দিক বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করেন না।

(১)

"আজি এ সন্তান দুটী মিলিছে তোমার।
শিখাও প্রেমের শিক্ষা খোলহে দুয়ার।
যে প্রেম সুখেতে প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
যে প্রেম দুখেতে ধরে মঙ্গল আকার।

* * * * * *

যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে।"

(২)

"পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে জীবনে।
উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেম সিন্ধু পানে।

* * * * * *

এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী করে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে।"

(৩)

দুই হৃদয়ের নদী, একত্রে মিলিত যদি,
বল দেব, কার পানে, আগ্রহে ছুটিয়া যায়?
সম্মুখে রয়েছ তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়,
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে;
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে,যেনগো আশ্রয়মিলে
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়।"

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করা গেল না. এরূপ সঙ্গীত আরও অনেক আছে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ "ধর্ম্ম ভুলিয়া বিজ্ঞান সম্মত বিবাহ" দেন, একথা সত্য নহে। আপনি বলিতে পারেন, সঙ্গীতে, উপদেশে, ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যে যাহা আছে, ব্রাহ্মের জীবনে তাহা নাই। না থাকা সম্ভব বটে, কেননা হৃদয়ে যাহা অনুভব করা যায়, জীবনে তাহা পরিণত করা সহজ নহে। জীবনপথে ব্রাহ্মের লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে আপনার অভিযোগ লক্ষ্য ভ্রষ্টতা নহে, লক্ষ্যহীনতা। সে অভি-যোগ অমূলক। এখন আবার ইহাও দেখা আবশ্যক, ব্রাহ্মসমাজ যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ কিনা। মানুষ আপনার জীবনে ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে কিনা, ইহা কেবল অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন। মানুষ অপরের হৃদয়াভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে পারেন না, সুতরাং অপরের হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে

তাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যখন এক একটী সামান্য বিষয়েই দেখা যায়, একে অন্যের সম্বন্ধে মহা ভ্রম করিতেছেন, একে অন্যের প্রতি অযথা দোষারোপ করিতেছেন, তখন একে অন্যের ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবেন, একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আপনি নিজেই বলিয়াছেন, আপনার "উদ্দেশ্য কুটিল" একথা যাঁহারা বলেন, "তাঁহারা আপনাকে আজও চিনিতে পারেন নাই"। আপনি যখন বন্ধুদিগের আন্দোলনকে "বিদ্বেষ-ভাব পূর্ণ" বলেন, তখন যে আপনিও তাঁহা-দিগকে চিনিতে ভ্রম করেন নাই, একথা কি নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারেন। যখন সামান্য বিষয়েই এত গোলযোগ, পরস্পরের চিনাচিনি এত অল্প, তখন একে অন্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরি-মাণ করিতে যাইয়া যে ভ্রম করিবেন না, তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

আইনে "কন্যার বিবাহের ন্যূন বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর ও বালকের বিবাহের ন্যূন বয়স অষ্টাদশ বৎসর ধার্য্য হইয়াছে" ইহা দেখিয়া আপনি অনুমান করিয়াছেন যে, "এই সময়ে এ প্রশ্ন একেবারেই উঠে নাই যে, ১৪ ও ১৮ বৎসর বয়সে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ জ্ঞান জন্মি-বার সম্ভাবনা নাই।" এ প্রশ্ন সে সময়ে উত্থাপিত হয় নাই, এবং "এ সম্বন্ধে তখন কিছুই বিবেচনা" করা হয় নাই, আপনার এ অনুমান যথার্থ নহে। আপনি সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন নাই, সুতরাং বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া সে সময়ের কথা এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলা ভাল হয় নাই। আপনি যদি সেই সাম-য়িক সাহিত্য পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন, এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল "যুবক যুবতীর প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মে দীক্ষা" হয় নাই, আপনি তাহাদিগকে এবং সঙ্ক্ষেপতঃ এদেশের প্রায় সমস্ত লোককে "নরকের পথ ব্যভিচারের পথ" দেখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এদেশের প্রায় সমস্ত লোক, এই জন্য বলিলাম, কেননা এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে, বাল্যকালে ধর্ম্মভাব বিকশিত হয় না; আপনার মতে বিবা-হের উচ্চ আদর্শ "বাল্য বিবাহে সাধিত হইতেই পারে না" সুতরাং তাহাদিগের নরক ও ব্যভিচার ভিন্ন আর গতি নাই। কিন্তু অপর ব্রাহ্মেরা দেশের সমস্ত লোককে "নরকের পথ—ব্যভিচারের পথ" দেখা-ইয়া দিতে যদি কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, আশা করি তাঁহাদিগের এ দুর্ব্বলতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। বিবা-হের উচ্চ আদর্শ জীবনে রক্ষিত না হইলে নরক ও ব্যভিচারের পথ আশ্রয় করিতে হইবে, ইহা বীরত্বের কথা হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞতার কথা নহে। যে সকল মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের কুৎসার কথা শুনিয়া আপনার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি-তেছেন, তাঁহারা একবার আপনাদিগের নিজনিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিয়া-ছেন কিনা বলিতে পারি না। আপনার কথা সত্য হইলে তাঁহাদিগের চৌদ্দ পুরুষ যে নরকের কীট হইয়া বাস করিতেছেন, এবং ব্যভিচারে যে তাঁহাদিগের নিজের জন্ম, ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা শ্রবণ করিয়া উহ-

ফুল্ল হইবার সময়ে এ মর্ম্মব্যথায় যদি একবার নিপীড়িত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনার বিজ্ঞতার এত প্রশংসা করিতে সাহসী হইতেন কিনা, বলিতে পারি না। আদর্শ জীবনে পরিণত না হইলেই যদি নরকে গমন ভিন্ন আর উপায় না থাকে, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর মানুষের জন্য স্বর্গের ব্যবস্থা করেন নাই; নরকই তাহার বাসস্থান। এমন মানুষ জগতে কে আছেন, যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার জীবন আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে? আর কেবল এক আদর্শ পূর্ণ হইলেই হইল না, এক আদর্শের অপূর্ণতা হেতু যদি নরককে আশ্রয় করিতে হয়, তবে অন্য আদর্শের অপূর্ণতার ফলও তাহাই হইবে। সুতরাং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ যাঁহার ইহ জীবনে না হইয়াছে, তাঁহাকেই নরকাশ্রয় করিতে হইবে। এমন মানুষ কে আছেন, যাঁহার জীবনে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে? তবে সকলের পক্ষেই কি নরক এক মাত্র গন্তব্য পথ নহে? এ চিত্র কি ভয়ানক!!

আপনি নিজেই বিবাহের তিনটী লক্ষ্য স্বীকার করিয়াছেন;—শারীরিক,মানসিক, আধ্যাত্মিক। ইহার প্রত্যেক লক্ষ্যই যে ঈশ্বরের বিধান, একথা বোধ হয়, আপনি অস্বীকার করিবেন না। মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পতিপত্নীর সম্বন্ধে যেরূপ সংসিদ্ধ হইতে পারে, বন্ধুত্বে তাহা সম্পন্ন হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন দেখা যায় না। শারীরিক সম্বন্ধকে অনেকে বিবাহের নীচ লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন, জীব স্থিতি রক্ষাকে আপনি "অসার গণনা" বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরূপ। এ লক্ষ্য নীচ নহে, মানুষের উৎপত্তি অসার গণনা নহে। মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবার পূর্ব্বে মানুষের উৎপত্তি। বীজ ভিন্ন বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। যে ক্ষুদ্র বীজে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে মহেশের যে মহাশক্তি নিহিত রহিয়াছে, যিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন, তিনি রচনা কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হন, তিনি উহাতে নীচ লক্ষ্য বা অসারতার চিহ্ন দেখেন না। মহামতি পার্কার বিবাহের শারীরিক সম্বন্ধে পরম সুখ, অতি গূঢ় লক্ষ্য নিহিত দেখিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে ঈশ্বরের চরণে অবনত হইয়াছিলেন। অসার গণনার পরিবর্ত্তে—"মানুষের পক্ষে যে গণনা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ" বলিয়া আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, সে গণনাও কি সর্ব্বদা সিদ্ধ হয়? যদি তাহাই হইত, দেবতার গৃহে কখনও অসুরের সৃষ্টি হইত না, ধার্ম্মিকের সন্তান কখনও অধার্ম্মিক হইত না, পণ্ডিতের সন্তান মূর্খ হইত না। অপর দিকে অধার্ম্মিকের ঘরে ধর্ম্মাত্মার জন্ম, কামুকের ঘরে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, মূর্খের গৃহে পরম জ্ঞানীর উৎপত্তি হইতে দেখা যাইত না। সর্ব্বত্র মনুষ্যের গণনা ঠিক হয় না কেন, আমাদিগের চিন্তার অতীত কার্য্য ঘটে কেন, এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে আমি অসমর্থ। এস্থলে ফলাফল চিন্তা না করিয়াও একথা বলা যাইতে পারে যে, এক লক্ষ্য সিদ্ধি বা লক্ষ্যত্রয়ের আংশিক সিদ্ধি পাপ নহে, তাহাতে নরকের পথ প্রশস্ত হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পরিমাণে সম্পন্ন হয়, তাহাই পুণ্য। আপনার প্রদর্শিত উচ্চ লক্ষ্য যাঁহারা অনুভব না

করেন, তাঁহারাই পাপ করেন, একথা বলা অসঙ্গত। পতি পত্নীর শারীরিক সম্বন্ধ পালন নীতি ও ধর্ম্ম মূলক। পতি অন্য স্ত্রীতে এবং পত্নী অন্য পুরুষে অনুরক্ত হইলে তাহা যদি দুর্নীতি বলিয়া গণ্য হয়, তবে পতি পত্নীর শারীরিক ও মানসিক শুদ্ধাচার, একান্ত অনুরক্তি সুনীতি বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? সতীত্ব কি সুনীতি নহে, ইহার মূলে কি ধর্ম্ম ভাব নিহিত নাই? আপনি বলেন, বিবাহ "সংসারের জন্য নয়, স্বর্গের জন্য।" আমি বলি, সংসারের কর্ত্তব্য পালনেই স্বর্গ। সাংসারিক কর্ত্তব্য যাঁহারা বিস্মৃত হন, তাঁহারা স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু স্বর্গলাভ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। শরীরকে উপেক্ষা করিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যেমন সম্ভবপর নহে, সংসারকে উপেক্ষা করিয়া স্বর্গের প্রত্যাশাও সেইরূপ। ঈশ্বরের নিয়োজিত কর্ত্তব্য পালনেই স্বর্গ। সে কর্ত্তব্য শারীরিকই হউক, মানসিকই হউক, আর আধ্যাত্মিকই হউক, তাহার কাহাকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। শারীরিক কর্ত্তব্য পালনকে আপনি সংসারের কার্য্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহা যদি সংসারের কার্য্য হয়, আমি বলিব, এই সংসার কার্য্য পালনই বিবাহের প্রধান লক্ষ্য, জীবস্থিতি ইহার মূলে। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অন্য রূপেও সংসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং বিবাহের এই একটী লক্ষ্য সাধনাও পাপ নহে, ব্যভিচার নহে, ইহাতেও পুণ্য ও ধর্ম্ম আছে, সুনীতির সংশ্রব আছে, ইহা দ্বারা নরকের পথ প্রশস্ত হয় না। যাহারা এই এক লক্ষ্যেই বিবাহ করেন, সেই লক্ষ্যই প্রতিপালন করে, শারীরিক নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হন না, তাহারা নরকে গমন করেন না, বরং আংশিক স্বর্গাধিকারী হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ আদর্শ-বিবাহ না হইলেও উহা নরকের পথ—ব্যভিচারের পথ নহে।

"ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস" জন্মিবার পূর্ব্বে যে বিবাহ হয়, আপনি তাহাকেই "ব্যভিচার এবং দুর্নীতি" বলিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের বিবাহের এই জঘন্য চিত্র এই "গলদ দেখিয়া দারুণ নিরাশা আসিয়া "আপনার "প্রাণকে অস্থির করিয়া ফেলিতেছে।" এই অস্থিরতার চিহ্ন আলোচ্য প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তবে ইহাই সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, "ব্যভিচার এবং দুর্নীতি" বলিলে লোকে সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকে, আপনি চিত্তের এই অস্থিরতার অবস্থায়ও ব্রাহ্মসমাজের উপর সে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন নাই। আপনার সমস্ত প্রবন্ধ খুঁজিয়া ইহার অতি সামান্য আভাসও কুত্রাপি পাওয়া গেল না। আদর্শের নিকট ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ নিতান্ত হীনপ্রভ হইলেও, এই মহাকলঙ্ক হইতে যে উহা উন্মুক্ত, ইহাও অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

আপনি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহের আরও কয়েকটী "গলদ" ও "জঘন্য চিত্র" দেখাইয়াছেন "আজ যিনি দাদা কাল তিনি স্বামী" আপনার মতে ইহা একটা "ভয়ানক গর্হিত কার্য্য"। যাহাদেগের সহিত রক্ত মাংসের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে, ব্রাহ্মসমাজে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ দিবার রীতি নাই, আইনেও তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রক্ত সামীপ্য নিবন্ধন সন্তানাদি দুর্ব্বল হইয়া থাকে একথা বিজ্ঞানে বলে; ইহা কেবল "বিজ্ঞান সম্মত" দোষ বলিয়াই এ রূপ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি অনেক দেশে, অনেক সমাজে এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে; ইংরেজেরা শালীকে বিবাহ করিতে পারেন না, আইনে উহা নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু পিতৃব্য কিম্বা মাতৃব্য কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন, মুসলমান-দিগের মধ্যেও এরূপ বিবাহ প্রচলিত রহি-য়াছে। হিন্দুসমাজে মিথিলায় মাতুল কন্যাকে বিবাহ করার রীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে এমন অনেক বর্ণ অছে, যাহাদিগের মধ্যে ভাগিনেয়কে কন্যা সম্প্রদান করা রীতি। ব্রাহ্মসমাজের বিবাহে এরূপ রক্তসামীপ্য দোষ ঘটিতে পারেনা। যাহার সহিত কোন রূপ রক্ত সংশ্রব নাই, এমন ব্যক্তিকে এক সময়ে যদি কেহ দাদা ডাকিয়া থাকেন, তবে তাহাকে তিনি বিবাহ করিবার অধি-কারিণী হইবেন না, এমন স্থলে বিবাহ হইলে অতি গর্হিত কার্য্য হইবে, আপনি কেবল এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আত্মমতের পরিপোষক কোন যুক্তি দেখান নাই। সম্পর্কের পরিবর্ত্তনে কি নীতি দোষ ঘটে, তাহা না শুনিয়া কোন উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, এরূপপাতান সম্পর্কের পরিবর্ত্তন সকল সমাজে ঘটিয়া থাকে; রক্ত সম্পর্ক স্থলেও যে অনেক সমাজে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হই-য়াছে। বিবাহে সম্পর্কের "গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা" উপেক্ষিত হয়, ইহার অর্থ বুঝি-লাম না। এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য যে, আপনি শব্দ কি ভাবের পরিবর্ত্তনকে দোষ মনে করেন? ব্রাহ্মেরা যখন সকল লোক-কেই ঈশ্বরের সন্তান ভাবেন, ঈশ্বরের পুত্রকে ভ্রাতা, ঈশ্বরের কন্যাকে ভগিনী মনে করা যখন তাহারা একটী সাধনার বিষয় মনে করেন, তখন এভাব কথায় ব্যক্ত না হই-লেও ব্রাহ্মসাধকের হৃদয়ে তাহা পরিল-ক্ষিত হইবে। এই ভাবটী অন্য কোন ঘনিষ্ঠ ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়া যদি দোষ হয়, তাহা হইলে আপনি সাধনা-তৎপর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার যে বিবাহ দেখিতে চান, তাহা সম্ভব হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের সন্তান জ্ঞানে অন্য নারীকে ভগিনীর ন্যায় শ্রদ্ধা, সম্মান ও পবিত্রতার চক্ষে দর্শন করেন না, কেবল তাঁহারাই কি বিবাহের অধিকারী হইবেন? এক পবিত্র ভাব অন্য পবিত্রভাবে নিমগ্ন হইলে, তাহা অপবিত্র হয় না। অপবিত্র আকাঙ্ক্ষা যে কোন নারীর সম্বন্ধে করা যায়, তাহাতেই পাপ হইয়া থাকে।

"পাশ্চাত্য সমাজের কুপ্রথা সকল অল্পে অল্পে" ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে। সে "সমাজে যাহা গর্হিত কার্য্য এ সমাজে তাহাও চলিতেছে" আপনার আর একটী অভিযোগ এই। কিন্তু কোন গুলি পাশ্চাত্য সমাজের কুপ্রথা, তাহা আপনি উল্লেখ করেন নাই। কথার ভাবে বোধ হয়, বর কন্যার এক গাড়ীতে ভ্রমণ বা বিবাহের পূর্ব্বে এক বাড়ীতে বাস কুপ্রথা। অথচ আপনার আর একটী কথায় বোধ হয় আপনি "একত্রে ভ্রমণ উপবেশনের" বিরোধী নহেন, কেবল তাহা "যথাভাবে সম্পন্ন হইতেছে কি না, অভিভাবকের তাহাতে সম্মতি আছে কি না, এ সকলের প্রতি

দৃষ্টি” রাখাই আপনার উদ্দেশ্য। যদি আপনার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার ভ্রম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কোন্ বর কন্যা অভিভাবকের সম্মতি না লইয়া এক গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছেন? আর “যেখানে সেখানে” একথাটার অর্থ কি? এমন দৃষ্টান্ত কি একটীও দেখাইতে পারেন যে, বরকন্যা “যেখানে সেখানে” ভ্রমণ করিয়াছেন। বরকন্যা এক গাড়ীতে ভ্রমণ করিলে কি অপরাধ হয়, পাশ্চাত্য সমাজের এ প্রথাটার কি দোষ, তাহা বলিয়া দিলে ভাল হইত। বরকন্যা এক গাড়ীতে “যেখানে সেখানে” ভ্রমণ কালে সহিস, কোচমানকে বিদায় করিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী চালাইয়া ছিলেন কি না, একথাটা জানান উচিত ছিল। বিবাহ প্রস্তাব অবধারিত হওয়ার পর “বর কন্যা এক বাড়ীতে অনেক দিন বাস করিয়াছেন” এসংবাদ আমি অবগত নহি। আর যদি কোথাও সেরূপ বাস করিয়া থাকেন, তবে তাহারা একা ছিলেন, কি অন্য লোকের সহিত এক গৃহে বাস করিতেন, তাহা বলা উচিত ছিল। আর বিবাহের প্রস্তাব হইবার পূর্ব্বে এক বাড়ীতে বাস করিলে যদি তাহা দূষনীয় হয়, তবে আপনার “প্রদর্শিত ও অবলম্বিত” একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা “কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে? যাহাদিগের সহিত রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, আপনি কেবল তাহাদিগের মধ্যে একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা সংস্থাপন করিতে চাহেন না, ধর্ম্মবন্ধনও এই মিলনের উপযোগী মনে করেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করিতেছেন। তবে কি আপনি বলিবেন, যাঁহারা একবাড়ীতে বাস করিবেন, তাঁহাদিগের পরস্পর বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ? এই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে আপনার চিত্রিত বিবাহের উচ্চ আদর্শ কি দূরে নিক্ষেপ করিতে হয় না? এক গৃহে বাস করিয়া দুই হৃদয়ের যখন এক আকাঙ্ক্ষা হয়, একত্রে সাধনা করিয়া উভয়ের উন্নতির গতি যখন এক স্রোতে চলিতে থাকে, এক উদ্দেশ্যে উভয় জীবন উৎসর্গ করিতে যখন ইচ্ছা হয়, তখন যদি দুই জনকে চিরজীবনের জন্য একত্রে মিলিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে বিবাহের উচ্চ লক্ষ কেবল কল্পনার চিত্রে অঙ্কিত থাকিবে, জীবনে কখনও পরিণত হইবেনা। এক গৃহে কেবল একজন পুরুষ ও এক জন স্ত্রীলোকের অবস্থিতি দূষনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু বহু লোকের এক গৃহে অবস্থিতি যদি দোষের হয়, তাহা হইলে যে বাড়ীতে স্ত্রীলোক আছেন, সে বাড়ীতে পুরুষের স্থান হওয়া উচিত নহে। বন্ধু বান্ধব অতিথি সকলকেই বিদায় করিয়া দিতে হয়। কে বলিতে পারে যে, সে গৃহের কোন অবিবাহিতা স্ত্রী কোন অবিবাহিত পুরুষের প্রেমে মুগ্ধ হইবেন না? ব্রাহ্মসমাজের বরকন্যার প্রতি আপনার যেরূপ অবিশ্বাস, তাহাতে আপনি কোন্ সাহসে একান্নবর্ত্তী পরিবার স্থাপন, করিতে চাহিতেছেন? অথবা আপনি কি ইহাই বলিতে চাহেন যে, কেবল বরকন্যাই অবিশ্বাসের পাত্র, অপরকে বিশ্বাস করিতে কোন আপত্তি নাই। আপনার কার্য্য দৃষ্টে যেন ইহাই বোধ হয়। একগাড়ীতে অন্য যুবক যুবতীকে যাইতে দিতে কি আপনার আপত্তি আছে? আমি দেখাইতে পারি যে, আপনি যাঁহাদিগের

অভিভাবক, তাহাদিগের সম্বন্ধে আপত্তি করেন না।

আপনার অপর আপত্তি "যুবতী বিধবা ও প্রৌঢ় বিপত্নীকের" বিবাহ। আপনার মতে এরূপ বিবাহে "ধর্ম্মটা লক্ষ্য নয়"। আপনার নিজের কথায় আপনার নিজ মত রক্ষা হওয়া কঠিন। আপনি বলিয়াছেন, "বিবাহের মূলে যে ধর্ম্ম বন্ধন" বাল্যবিবাহে "সে ধারণা থাকে না।" সুতরাং আপনি "বাল বিধবা ও বালবিপত্নীকের" বিবাহে তত আপত্তি করেন না। কিন্তু এস্থলে ইহা ভাবা উচিত, বাল্যকালে যাহাদিগের বিবাহ হইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া সম্মিলিত হন নাই, একে অন্যের ভাল বাসার উপযুক্ত কি না, বিবাহের পূর্ব্বে একথা চিন্তা করিবার সুযোগ যাঁহাদিগের কখনও উপস্থিত হয় নাই, এমন স্বামী স্ত্রীর প্রেমের প্রবাহ যে "অনাবিল পবিত্র" ভাবে স্বর্গের দিকে ছুটিবে, তাহার কি কিছু নিশ্চয়তা আছে? আপনি নিজেইত চন্দ্রনাথ বাবুর মত খণ্ডন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "বয়স্থ পতি বিবাহের পর বালিকা পত্নীকে গড়াইয়া পিটাইয়া মিশাইয়া লইবেন, একথাটীরও অর্থ আমরা বুঝিলাম না। গড়াইয়া পিটাইয়া ভালবাসা বৃদ্ধি করা যায়, আমরা মনে করিতে পারি না।" যদি পরস্পরে ভালবাসা না থাকে, উভয়ের হৃদয়ের গতি, মনের আকাঙ্ক্ষা এক পথে ধাবিত না হয়, তাহা হইলে যে আপনার প্রদর্শিত "একাত্মকভাব" সাধন হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। এমন স্থলে পতি পত্নীর "কর্ত্তব্য ও জীবনের লক্ষ্য" এক হইল না, তাঁহারা জীবনের উচ্চ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারিলেন না। ইহার পর যদি এক পক্ষের মৃত্যু হয়, এবং অপর পক্ষ আপনার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া আপনার জীবনব্রত প্রতিপালনের জন্য আপন হৃদয়ের অনুরূপ ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহ করেন, তাহা হইলে কি তিনি পাপ করিবেন? এই বিবাহে যে তাঁহার ধর্ম্ম লক্ষ্য নয়, ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে? "ধর্ম্ম জীবন" লাভই যদি "বিবাহের পণ" হয়, তবে যে বিবাহে সে পণ ছিল না, কিম্বা পণ থাকিলেও যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাহাতো প্রকৃত বিবাহ নামেই গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং এমন ব্যক্তি যদি পুনরায় বিবাহ করেন, এবং ধর্ম্ম লাভ সেই বিবাহের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এমন বিবাহকে আপনি অধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিতে সাহসী হন কি রূপে? আপনি কি ইহাই বলিতে চাহেন, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, উচ্চ লক্ষ্য বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক, যাঁহারা একবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহকালে পরকালে এক হইয়া থাকিতে হইবে। যদি ইহাই হয়, তবে চন্দ্রনাথ বাবুর "গড়াপিটার" কথাটা তো ঠিক বলিয়াই মানিতে হয়। "যদি গড়া পিটায় ভালবাসা না জন্মে এবং প্রীতিহীন দুই আত্মাকে একত্র ভাবে ইহকালে পরকালে থাকিতে হয়, ও 'ঝগড়া' কলহ "বিবাদের" শোচনীয় অবস্থায় চিরজীবন কাটাইতে হয়, তাহা হইলে তো আপনি তাহাদিগের জন্য "অনন্ত নরক" সৃষ্টি করিলেন। কেবল ইহাই নহে, যাঁহারা না বুঝিয়া বা বুঝিয়াই দুর্ব্বলতা বশতঃ একবার জীবনে কোন অপরাধ বা ভ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংশোধনের পথও বন্ধ করিলেন। ইহাই

কি আদর্শবিবাহের লক্ষণ? মানুষ অন্য অপরাধ করিয়া তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিলে অপরাধী হয় না। কিন্তু বিবাহ, যাহা জীবনের একটী অতি প্রধান কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি কেহ কোন অপরাধ বা ভ্রম করিয়া থাকে, তবে তাহা হইতে ইহ পরকালে নিস্তার পাইবার সম্ভবনা নাই, ইহা কি সঙ্গত কথা?

"সম্বন্ধের পর অনেক দিন অপেক্ষা করা আপনার মতে বড়ই দূষণীয়। দোষটা কাহার পক্ষে? যদি অল্প বয়স্ক বালক বালিকা অথবা ধর্ম্মবিশ্বাসহীন স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে হয়, তবে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই। কেননা আমি পরে দেখাইব যে, অল্প বয়সের বিবাহে এবং ধর্ম্মহীন ব্যক্তিদিগের বিবাহে ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি নাই। এরূপ বিবাহ যাহাতে রহিত হয়, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে যাঁহারা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বিবাহিত হইতে চাহেন তাহাদেগের পক্ষেও যদি বাগ্দানের পর অধিক দিন অপেক্ষা করা অপরাধ হয়, তাহা হইলে ধার্ম্মিকের চিত্র অপরের চক্ষে বড় প্রীতিকর দেখাইবে না। এস্থলে উচ্চ লক্ষ অপেক্ষা ভোগাভিলাষেরই প্রাধান্য দেখাইতেছেন।

আপনি লোকের এরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ব্রাহ্মসমাজে সাধারণতঃ ১৪ বৎসরের বালিকার ও ১৮ বৎসরের বালকের বিবাহ হইয়া থাকে এবং কোন স্থলে "বর কন্যার পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়তঃ ১১।১২ বৎসর বয়সের সময় হইতেই আরম্ভ হয়।" এস্থলে ১১।১২ বৎসর বয়স কাহার, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বর কন্যা উভয়েরই ১১।১২ বৎসর বয়স বোধ হয়। ১১।১২ বৎসরের বালককে কোন ব্রাহ্ম পিতা মাতা বা অভিভাবক বিবাহ দিতে চাহেন এবং কন্যা মনোনয়ন করিয়া উভয়ের দেখা সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দেন, একথা আমি কখনও শুনি নাই এবং বিশ্বাস করিতে পারি না। ১১।১২ বৎসর বয়সের বালিকার "বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক" করিয়া বর কন্যার দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া কেহ দিয়াছেন, আমি একথাও শুনি নাই। কন্যার বয়স চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলেই বিবাহ দিবেন, এমন ইচ্ছা কোন কোন ব্রাহ্মের আছে জানি। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এবং তাঁহারা বর কন্যার দেখা সাক্ষাতের সপক্ষ নহেন। কন্যার ১১।১২ বৎসর বয়সের সময় হইতেই তাঁহারা বরকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। আপনার এ-কথা অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত বলিয়া বোধ হয়। আপনি কি এই কথার সমর্থনকারী দৃষ্টান্ত দুই চারিটী দিতে পারেন? ব্রাহ্মেরা সাধারণতঃ ১৪ বৎসরের বালিকার ও ১৮ বৎসরের বালকের বিবাহ দিয়া থাকেন, একথাও ঠিক নহে। ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক নারীর এবং ১৮ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হইতেই পারে না। উক্ত আইন প্রচলিত হওয়ার পর যত বিবাহ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল একটী বিবাহের পাত্র কেশব বাবুর পুত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন। আর একটী বিবাহে পাত্রের বয়স ১৯ বৎসর ছিল। তদ্ব্যতীত যত বিবাহ হইয়াছে, তাহার কোন বিবাহেই পাত্রের বয়স ২১ বৎসরের ন্যূন

নহে এবং ২১ বৎসর বয়স্ক পাত্রও কেবল মাত্র দুই তিনটী। সুতরাং ১৮ বৎসরের পাত্রের বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে সাধারণতঃ হইয়া থাকে, একথা অতি অসঙ্গত। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল বিধবার বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশই বিবাহকালে প্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন। ১৬, ১৭, ১৮ বৎসর বয়স্কা বিধবা ৭।৮ টীর অধিক বিবাহিত হন নাই। কেবল ১৫ বৎসর বয়স্কা দুইটী বিধবার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার একটীর বিবাহ হিন্দু পিতা মাতা নিজে যাজ্ঞিক হইয়া ব্রাহ্ম পাত্রের সহিত দিয়াছিলেন। অপরটী নব্যভারত সম্পাদকের নিজের গৃহে, তাঁহার নিজ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। যতদূর নির্ণয় করিতে পারা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া জানা যায় যে, ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ৬০টী কুমারীর বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল ১৪টী ১৪ বৎসর বয়স্কা ছিলেন। তন্মধ্যে তিনটী ব্রাহ্ম পিতা মাতার সন্তান নহেন এবং ব্রাহ্ম গৃহেও প্রতিপালিত হন নাই। ১৫ বৎসর বয়স্কা কুমারী ১৬টী, অবশিষ্ট ১৬ বৎসর ও তদধিক বয়স্কা। ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্ম কুমারীর ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা একষষ্ঠাংশের বড় অধিক নহে। ২০, ২১, ২২ বৎসর বয়সে অনেক ব্রাহ্মকুমারীর বিবাহ হইয়াছে এবং এই বয়সের অনেক ব্রাহ্মকুমারী এখনও অবিবাহিত আছেন। আপনি ইহাও জানেন যে, অনেক ব্রাহ্ম চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা বালিকার বিবাহে যোগ দেন না। চৌদ্দ বৎসরের বালিকার বিবাহ দান-রীতি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

তবে আপনি বলিবেন, অধিক বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইলেই বা কি হইল? "বিবাহের উপযুক্ততা বয়সানুসারে নির্দ্দেশ না করিয়া চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন গঠনানুসারে নির্দ্দেশ করা উচিত। অভিভাবকের মতামতের উপর এসম্বন্ধে অধিক পরিমাণে নির্ভর করা উচিত।" কেবল বয়সের উপর নির্ভর করিয়াই যে ব্রাহ্মসমাজ বিবাহ দেন, বর কন্যার চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, একথা কি সত্য? অভিভাবকের মতামতের উপর নির্ভর না করিয়া কয়টী বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে সম্পন্ন হইয়াছে? বর কন্যার বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ না হইলে তো অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ হইতেই পারে না। চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন গঠিত হইয়াছে কি না, ইহা নির্দ্ধারণের ভার আপনি অভিভাবকের হস্তে রাখিতে চাহেন। অভিভাবকের হস্তে এই ভার রাখিলে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে যে সকল কুমারীর বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদিগের বিবাহে "ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে কোন সংবাদই" ছিল না, একথা কি পরস্পর বিরোধী নহে? আর একটী কথা "চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন" গঠিত হইয়াছে কি না, তাহা নির্দ্দেশ করিবার সহজ উপায় কি? আপনি যাঁহাকে ধার্ম্মিক মনে করিতে পারেন, অপরের তাঁহার সম্বন্ধে সমুচিত বিশ্বাস না থাকিতে পারে, আবার অপরের যাহার ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রতি বিশ্বাস আছে, আপনার তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস থাকিতে না পারে। এক সময়ে যাঁহাকে আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন, অন্য সময়ে আবার তাহার প্রতি সেই বিশ্বাসের অভাব হইতে

পারে। এতদ্ব্যতীত আপনি এক প্রকারের কার্য্যকে প্রকৃত ধর্ম্মের কার্য্য মনে করিতে পারেন, অন্যে তাহাকে সেরূপ করিতে না পারে। সুতরাং ভিন্ন লোকের ভিন্ন সংস্কার বশতঃ এই বিষয়ে মতের একতা থাকা কঠিন। এই মত বিভেদ বশতঃই আপনি সম্ভবতঃ মনে করিয়া থাকিবেন, ব্রাহ্ম সমাজে পাত্র পাত্রীর ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না। ব্রাহ্মেরা এবিষয়ে উদাসীন, আমি একথা বলিতে পারি না।

"ব্রাহ্মসমাজে দুদশদিন যাপন করিতে না করিতেই বিবাহের আয়োজন চলিল" এরূপ ঘটনা ব্রাহ্মসমাজে কয়টা ঘটিয়াছে? আপনি কি ইহা অবগত নহেন যে, পাত্রপাত্রী ব্রাহ্মসমাজে অন্যূন এক বৎসর না থাকিলে অনেক ব্রাহ্ম তাহাদিগের বিবাহে যোগ দেন না এবং এরূপ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে ক্রমেই অতি অল্প হইয়া আসিতেছে। বর কন্যার সহিত সকলের পরিচয় থাকিতে না পারে, সে কারণে বিবাহে যোগ না দেওয়া সঙ্গত হইবে না। তবে অভিভাবককেও চিনেন না, কিম্বা অভিভাবকের উপর বিশ্বাস নাই, এমন কয়টী বিবাহে ব্রাহ্মেরা যোগ দিয়াছেন? বরং আমি ইহাই জানি যে, অভিভাবকের প্রতি বিশ্বাস থাকিলেও, কোন কোন বর প্রকৃতপক্ষে চরিত্রবান কি না, এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, অনেক ব্রাহ্ম সেরূপ বিবাহে যোগ দেন নাই; কোন কোন বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়াই গণ্য হয় নাই। এসকল কি সমাজের জীবনীশক্তির পরিচায়ক নহে?

আপনার মতে বরকন্যা নির্ব্বাচন করিবার ভার অভিভাবকের উপরই প্রধানরূপে থাকা আবশ্যক; তবে "বরকন্যারও কতক মতামত থাকা উচিত।" আপনি একাযটা ভাগাভাগী করিয়া ফেলিতে চাহেন। কিন্তু সুগঠিত চরিত্র ব্যক্তির পক্ষেও যদি এই কাযটা ভাগাভাগীর উপর নির্ভর করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার আদর্শ বিবাহ যে কি রূপে সাধিত হইবে, আমি বুঝিতে পারি না। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব, তবে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে স্থলে অভিভাবক এবং পাত্র কন্যার মত স্বতন্ত্র হইবে, তথায় কাহার মত প্রবল হইবে?

আপনি যে সকল অবান্তর বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন, একটী প্রস্তাবে তাহার আলোচনা হইতে পারে না, এই হেতু আমি কেবল মূল অভিযোগ গুলির সম্বন্ধেই আমার অভিমত ব্যক্ত করিলাম। পরিশেষে একটী কথা বলা আবশ্যক। আপনি অন্য দেশের লোকের প্রতি অতিশয় অবিচার করিয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন "বাল্য বিবাহে ভারতে যে কুফল ফলিতেছে, ধর্ম্মশূন্য যৌবনবিবাহে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে সহস্রাংশে তদপেক্ষা অধিক কুফল ফলিতেছে, একথা কোন ইতিহাসজ্ঞ, অস্বীকার করিতে পারেন না। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আমার অনভিজ্ঞতা দূরীকরণার্থ উল্লেখ করিবেন যে, কোন্ দেশের কোন্ ইতিহাসে উভয়ের ফলাফল তুলনা করিয়া এরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে?

শ্রীদ্বারকানাথ গাঙ্গোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

তরী বহে যায়।

১

তরী ব'হে যায়,
আঁধারের ছায়।
মেঘেরা আকাশে
ঘনাইয়া আসে।
বনানী দুধারে
শ্বসিছে আঁধারে।

দূরে, নদী পারে,
কুটীরের দ্বারে,
জ্বলিতেছে দীপ
করি টিপ্ টিপ্।

যা বেড়াই খুঁজি,
এ নির্জ্জন গ্রামে,
চাষীদের ধামে
তাই আছে বুঝি!
সে উপকথায়
দিন বুঝি যায়!

২

তরী ব'হে যায়,
আঁধারের ছায়।
মেঘেরা আকাশে
ঘনাইয়া আসে।

অশ্বত্থ নিবিড়,
ভগন মন্দির।
কাংস্য ঘণ্টা রোল,
বম্ বম্ বোল।
উদাস হৃদয়,
মায়া সমুদয়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

তারা।

রমণীর ভালে যেন সিন্দুর বিন্দুর
মৃদু রেখা,
সিন্ধুর বুকেতে যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ
আধ দেখা,
বিষাদ মাখান মুখে অধরের কোণে
ক্ষীণ হাসি,
অশ্রুভরা জ্যোতিহারা আঁখে যেন দ্রুত
জ্যোতিরাশি,
নিশার ললাট ভাগে নিত্য ওঠ ফুটে,
নিত্য যাও,
কি কাহিনী মিলাইয়ে প্রকৃতির ভালে
নিত্য গাও?
তুমি কিহে নিশার প্রহরী, দেব দূত
স্নেহধারা?
অন্তরের বাহিরের তুমি কি মিলন
ওহে তারা?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

তারকা।

তুমি দেবি নগ্ন প্রাণ, অসীম সুন্দর,
দূর—দূর, কত দূর, অতি উচ্চতর—
আমাতে তোমার সত্তা, তোমাতে আমার,
প্রাণে প্রাণে মেশামেশি একি একাকার,
যখনি গো গাই গান তুমি এস হেসে,
আঁখি কোণে কত কথা বল হোথা বসে।
দেখ দেবি! মনে কর ভাব একবার,
কি সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে তোমার আমার।
উপল-মণ্ডিত সেই সাগরের কূল,
একটী বোঁটায় সেথা ছিনু দুটী ফুল।
অবস্থার বিপর্য্যয়ে, তুমি জ্যোছনার ছবি,
আমি হেথা মরতের, প্রকৃতির দীন কবি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

সবে যায় ভুলে।

কক্ষ ভ্রষ্ট তারাটির মত ;—
কিম্বা নিশিথিনী বুকে বীণার ঝঙ্কার ;—
অথবা মধুর হাসি, বাসন্তি প্রকৃতি মুখে ;—
শ্যামল দুর্ব্বার দলে, অথবা শিশির হার ;—

রবি করে জলবিম্ব প্রায় ;—
অথবা নিদাঘে যথা মলয় পবন ;—
তেমতি দণ্ডের তরে ধরায় জীবন খেলা।
এই জাগরণে আছি, এই ঘুমে অচেতন!

পবন বহিয়ে যায় ধীরে।
জলবিম্ব মিশে যায় তটিনীর জলে।
নিদাঘের মেঘ ছায় বসন্তের হাসি মুখ।
শিশির শুকায়ে যায় ;—
মগ্ন তারা মহাশূন্য কোলে।
তেমতি ফুরালে খেলা,
অমনিই সবে যায় ভুলে!

শ্রীকিশোরীলাল গুপ্ত।

বসন্তের স্মৃতি।*

১

এক দিন মধু মাসে শুনেছি, দেখেছি,—
পাপিয়ার সুরে কাঁপিল সোহাগে
প্রেমের মধুর গান ;
প্রেমে ভোর বায়ু চুমি মাতাইল
মুকুল-বধূর প্রাণ ;
ছোট ছোট ছায়া পরী-নারী মত
নাচিল মনের সুখে,
সুতনু তনুতে করি কোলাকুলি
প্রশান্ত-আলোর বুকে।

২

শুনেছি, দেখেছি, হলো বহুদিন,
ক্ষণেকের তরে বসন্তে নবীন,—
পাখী-কল-কণ্ঠে প্রেমের কথা,
চূত মুকুলের মধুর ব্যথা,
ছায়া (রবি প্রিয়া) হরষে রঙ্গিনী
সুতনু-শরীর আলো-বিহারিণী ;—
জাগিছে স্মৃতিতে সকলি এখন
সুন্দরে মধুরে অপূর্ব্ব মিলন ;
কতই সুন্দর, মধুর কত
স্মৃতি-পথ-চারী বসন্ত বিগত।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

* After "Parblo's song" in George Eliot's "Spanish Gypsy."

চন্দ্রের প্রতি। (১)

কি আছে তোমার চাঁদ! যাহে বিচলিত
করেরে হৃদয়? হায়, শৈশবে সতত
পুঁছিয়াছি অশ্রুজল, তোর হাসি ভরে ;
বোনটী আমার যেন ; তোরি হাত ধোরে,
অন্তরীক্ষে সাঁঝাসাঁঝি যেতাম ছুটিয়া,
না হোলে প্রভাত আর আসিনি ফিরিয়া!
বৃক্ষ হোতে হেন ফল তুলিনি কখন,
ও মাধুর্য্যে স্নিগ্ধ যার না হত আনন!
ফলময় জল, ভাষে অদ্ভুত বচন,
যখন সে জল পরে, মিলে মিলে নৃত্য করে,
এক সাথে তোর আর আমার নয়নঃ
ও চারুনয়নে তুমি, না হেরিলে বনভূমি,
অরণ্যের শ্যামলতা, কুঞ্জের মাধুরী,
অপূর্ণ সতত যেন রহিত সুন্দরি!

* * * *

বয়স হোয়েছে এবে, এখনো তোমার—
মিশে আছে ও কিরণে আকাঙ্খার ধার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(১) Keats এর Endymion হইতে। ইংরাজিতে চন্দ্র স্ত্রীলিঙ্গ।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৪র্থ)

স্বেচ্ছাচারিতা, ধর্ম্মহীনতার একটী প্রধান কারণ। ভগবানের বিধান না বুঝিতে পারায়, এবং স্বেচ্ছা বা সংসারাসক্তির প্রবল উত্তেজনায়, মানুষ যথাস্থানে পরিণীত হইতেছেন না, বলিয়াছি। বিলাসিতা ধর্ম্মহীনতার আর একটী কারণ, তাহাও ইঙ্গিতে বলিয়াছি। বাস্তবিক বিলাসিতা বর কন্যা মনোনয়নের পথে এক কঠিন অর্গল দিয়া রাখিতেছে। বাহ্যবেশ ভূষার আচ্ছাদনে শরীর ঢাকিয়া, মানুষ যাহা নয়, তাহাই জগতে দেখাইতেছে। এ সকল কথা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়া মনোনয়ন-প্রথা সম্বন্ধে অন্যান্য কথা লিখিব।

নানা কারণে লোকের মন সংসারের দিকেই অধিক অনুরক্ত। সংসারটা প্রত্যক্ষ, স্বর্গটা কিছু অপ্রত্যক্ষ। সংসারের নানা সুখ কামনায় মানুষ বড় ব্যতিব্যস্ত। সংসার ধরিয়া স্বর্গে উঠা যায়,এ গণনা করিয়া অতিঅল্প লোক চলে। স্বর্গ বা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল সংসারের জন্য সংসার-সেবা করে—অধিকাংশ মানুষ। টাকা কড়ি, যশ মান, রূপ রস, এই সকল দিকেই মানুষের ঝোঁক অধিক। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব—এ চিন্তা অতি শৈশব হইতে মানুষকে ধরে। চরিত্রবান হইব, বিশ্বাসী হইব, ভক্ত হইব—এ সকল চিন্তা অতি অল্প লোকের মধ্যে নিবদ্ধ। দেশের প্রবীণ লোকদিগের প্রদত্ত শিক্ষাও সেরূপ নয়। পিতা, মাতা, সন্তানের বাল্যকাল হইতেই, বেশ ভূষার প্রতি অধিক মনোযোগী হইয়া পড়েন। বিদ্যা শিক্ষার জন্যও কেহ কেহ মনোযোগ করেন বটে, কিন্তু বালক বালিকার নীতি শিক্ষার প্রতি শতকরা একজন অভিভাবক মনোযোগী কিনা সন্দেহ। সংসার সাধনের জন্য, সংসারের শিক্ষা, অর্থকরী বিদ্যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে সকল মানুষের পরিণাম নয়। স্বর্গই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। স্বর্গের শিক্ষা,ভগবৎ প্রেমও জ্ঞান লাভ সহস্র গুণে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু কি এক দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে, এ দিকে দৃষ্টি অতি কম। এই একমাত্রলক্ষ্যের প্রতি মানুষ যেরূপ উদাসীন, এরূপ কিন্তু সংসার সম্বন্ধে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধী লাভের সহিত কত যুবক যে অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী, হইয়া সংসারে ফিরিতেছেন, কে না জানেন? কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও কত যুবক যে আজ কাল নীতি ও চরিত্রহীন হইয়া সাংসারিকতার দাস হইয়া ঘুরিতেছেন, তাহাই বা কে না জানেন। এই সকল চরিত্রহীন শিক্ষিত যুবক বৃন্দের উত্তেজনায়, ছলনায় দেশের যে কি শোচনীয় চরিত্রহীনতার ছবি ফুটিয়া পড়িতেছে,তাহা কল্পনা করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। পমেটম্, লেবেণ্ডার, হউডিকলং আতর, ও গোলাপ রঞ্জিত ফুরফুরে ধুতি পরিধেয়, চেন্ ঘড়ি শোভিত, অহঙ্কারস্ফীত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক। তাহাদের নিকট দেশ অনেক আশা করিয়া থাকিলেও, সে আশায় অনেক স্থানে ছাই

পড়িয়াছে। তাঁহারা সংসারের কীট হইতে বসিয়াছেন, তাহাই হউন। পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজের উজ্জ্বল ছবি সাংসারিকতার ঘোরতর বিলাসের ইন্ধনে ধূমময় হইয়া উঠিবে, কে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, কতিপয় সাধু ভক্ত সন্তান সমাজের এই প্রবল বিলাসের স্রোত ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টায় যে বড় সুফল ফলিতেছে, মনে করিতে পারিতেছি না। দিন দিনই বেশ ভূষার দিকে অনেকের ঝোঁক বাড়িতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় মহিলাদের অলঙ্কারের প্রতি অধিক ঝোঁক ছিল। গহনার উত্তেজনায়, এদেশের কত পত্নী স্বামীকে চরণে ঠেলিয়া খেয়ালের সেবা করিয়াছেন, সংখ্যা করা যায় না। ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ দৃশ্য ঘটে নাই। কিন্তু ব্রাহ্ম বালক বালিকার মধ্যে যে পরিচ্ছদাদির প্রতি একটা ভয়ানক আসক্তি বাড়িয়া উঠিতেছে, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। বিলাসের দিকে যখন মানুষের আন্তরিক ঝোঁক পড়ে, তখন যে ধর্ম্মে বড় একটা মতি থাকে না, এ কথায় সন্দেহ বড় কম। আজ কাল নানাপ্রকার নূতন নূতন প্রণালীতে এই বেশ ভূষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। একটা অতি সামান্য রকমের জ্যাকেট বা কোট প্রস্তুতে ৭৷৮ টাকা লাগে। কত প্রকারেই বাহ্য শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। ইহার সহিত ধর্ম্মে মতি গতিও অনেক কমিয়া যাইতেছে। এ দোষ কাহার? আমাদের মতে এ দোষ—উপদেষ্টা এবং অভিভাবকদিগেরই অধিক। হিন্দু অভিভাবকেরা যেমন স্কুলে বিদ্যা শিক্ষার জন্য বালকদিগকে পাঠাইয়াই অনেক স্থলে সন্তুষ্ট থাকেন, নীতি শিক্ষা যে তাদের একটা লক্ষ্য, কুকার্য্যে যোগ দেওয়া যে ভয়ানক গর্হিত কার্য্য, এ সকল বিষয়ে যেমন বিশেষ কোন শিক্ষা দেন না, ব্রাহ্ম উপদেষ্টা বা ব্রাহ্ম অভিভাবকগণও, সমাজে যাতায়াতের পথ খুলিয়া দিয়া, সেইরূপ, অন্য বিষয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত। কেবল কি নিশ্চিন্ত?-না। তাঁহারাই প্রকারান্তরে বালক বালিকাদিগের বিলাসের খেয়ালে ইন্ধন দিতেছেন—ধার কর্জ্জ করিয়াও পরিচ্ছদাদির উৎকৃষ্টতা বজায় রাখিতেছেন। ভিতরের দিকে দৃষ্টি পড়ুক, চরিত্র ভাল হউক, ধর্ম্মে মতি হউক, এ সকল ইচ্ছা, প্রকারান্তরে, যেন অভিভাবকদিগের মন হইতে বিদায় লইতেছে। কেন বলিতেছি?—না হইলে—বালক বালিকাদিগের বেশ ভূষা লইয়া তাঁহারা যত ব্যস্ত, চরিত্রগঠনে তদপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হইতেন। আমরা অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মের মুখে আক্ষেপ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, "গরীব লোকের ব্রাহ্ম হওয়া বড়ই দায় হইয়া উঠিল। নবাবের মত জাঁকজমকের জন্য এত টাকা কোথায় পাইব?" আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক সময়ে যাহারা আক্ষেপ করেন, তাঁহারাও অবশেষে দুর্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, ধার কর্জ্জ করিয়া, বালক বালিকাকে নানা সাজসজ্জায়, সাজাইয়া তোলেন। এ সকল অন্যায় কি সন্যায়, সে বিষয়ে মতভেদ থাকা সম্ভব। সভ্যতা রক্ষার জন্য পরিচ্ছদ ইত্যাদির উৎকৃষ্টতা সাধন প্রয়োজনীয় কিনা, সে গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চাই না। আমরা এই মাত্র বলি, যার অবস্থায় কুলায় না, তার এ সম্বন্ধে অধিক অগ্রসর হওয়া ভাল নয়। আমরা এই মাত্র বলি, ধর্ম্ম

সমাজের পক্ষে এ সকল বাহ্য-বিষয়ে ঝোঁক ভাল নয়। এই সকল দিকে আদর যত কম থাকে, ততই ভাল। চরিত্র গঠন ধর্ম্ম সমাজের প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র গঠিত হইলে আর চাই কি?—বাহ্য পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক ইত্যাদি কিছুই চাই না। ভিতরে যে দেবত্ব ঋষিত্ব পাইয়াছে, বাহিরে তার মলিন পোষাক থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। ধর্ম্মসমাজে জীর্ণ শীর্ণ মলিন বস্ত্রপরিধায়ী, চরিত্রবান ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর হওয়া উচিত। আর চরিত্রহীন হইলে, হাজার জাঁকাল বেশ ভূষায় শোভিত হইলেও, লোকের আদর পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলে তাহা হয় না। একজন চরিত্রহীন লোক খুব জাঁকজমক করিয়া বাড়ীতে আসুন, দেখিবে, অনেক স্থলে সে ব্যক্তি ঐ ছিন্নবস্ত্রপরিধায়ী চরিত্রবান লোকাপেক্ষা অধিক আদর সম্ভাষণ পাইবে। কেবল হিন্দু সমাজের কথা বলিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজও কতকটা ধন-গৌরব বাহ্য-গৌরব ইত্যাদির অধিক আদর করিতেছেন, কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কে জানে, চরিত্রবান ও ধার্ম্মিককে অবহেলা করিতেছেন। এই কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া বালক বালিকারা কত কুশিক্ষা পাইতেছে। কিন্তু তবুও বাহ্যাড়ম্বরের সাজসজ্জা অপ্রতিহত প্রভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বাহ্য বস্তু সকলের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ পড়ায়, বালক বালিকারা অন্তঃসারশূন্য হইয়া, দিন দিন ভয়ানক বিলাসের দাস দাসী হইয়া পড়িতেছেন। খোলার ঘরে বসিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে এখনকার শিক্ষিতা বালিকারা কত বিরক্ত। বাজার হইতে মৎস্য তরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিতে এখনকার বালকেরা কত লজ্জা বোধ করে। কথায় কথায় মান বাড়ে, কথায় কথায় মান যায়। মান সম্ভ্রম পাইবার জন্য প্রাণের একটা গভীর লালসা। বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য, গৌরব আস্ফালন, এখনকার সময়ের লোকের একটা প্রধান আদরের সামগ্রী। বরকন্যার মনোনয়নের সময় এই বাহ্য বিলাসপ্রিয়তা যে কত স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা সংক্ষেপে বলা যায় না। চরিত্রের বলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা অপেক্ষা, শোভা সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেই যেন বর কন্যা অধিক মনোযোগী. আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসারটা প্রত্যক্ষ, স্বর্গটা কিছু অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং এই সংসারের বাহ্য সম্পদ বিভব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর পাইবে, তাতে সন্দেহ কি? বাস্তবিক, খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, মনোনয়ন-প্রথায় ঢাকাঢাকি চাপাচাপি ভাব বাহ্য সৌন্দর্য্যের তাড়নায় অধিক স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। বিবাহের প্রস্তাবের পর যে দেখা সাক্ষাত হয়, তাতে বরকন্যার ভিতরের সৌন্দর্য্য বড় একটা অধিক জানা যায় না, কারণ উভয়ই তখন কিছু সতর্ক হন। অন্য দিকে উভয় যদি উভয়কে ঠকাইতে প্রস্তুত হন, তবে মিষ্ট আলাপে, মিষ্ট হাসিতে পরস্পর যে পরস্পরকে অল্পেই ভুলাইয়া ফেলিতে পারেন, তাতেই বা বিচিত্র কি? বস্তুত অনেক স্থলে ইহা হওয়াই সম্ভব। অনেক সময়, বাহ্য সৌন্দর্য্যের চাকচিক্যে যে অনেকে ভুলেন, তাতে বড় ভুল নাই। অনেক সময় দেখা যায়, বাহ্য শোভার জন্যই বর

কন্যা অধিক লালায়িত। অন্তরের গুণ না জানিয়া কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে মজিলে, মিলন কিছুতেই গাঢ় হইতে পারে না। কারণ বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য অধিক দিন স্থায়ী থাকে না। অন্তত কতক ভিতরের সৌন্দর্য্য জানিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বাহ্য আকৃতিতে কতক ভিতর জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাও অনেক স্থলে বেশ ভূষায় ও বাহ্য জাঁকজমকে চাপা থাকে। অভিভাবকগণ যদি এস্থলে চরিত্র সম্বন্ধে মতামত দিতে অনধিকারী হন, তবে এস্থলে বর কন্যা যে পরস্পরকে চিনিতে ভুল করিবেন না, কেমনে বলিব ? চারিত্র্য,মহত্ত্ব ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব অল্প দিনের দেখা সাক্ষাতে বুঝা কিছু কঠিন। তার পর পরস্পরকে ঠকাইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বুঝা যে আরো কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বরকে ভুলাইতে কন্যা চেষ্টা করেন ; কন্যাকে ভুলাইতে বর চেষ্টা করেন। উভয়ে উভয়ের হৃদয়জাত ভাবরাশিকে চাপিয়া রাখিয়া, বাহ্য শোভার আকর্ষণে উভয়ের মন পাইলেন। তারপর বিবাহ-মিলন হইল। তারপর দুবৎসর বাদে উভয় উভয়কে প্রকৃতরূপ চিনিলেন। এমন কি, পূর্ব্বে যেরূপ পরস্পরকে বুঝিয়াছিলেন, মনে কর, এখন তার ঠিক বিপরীত রূপ বুঝিতেছেন। এখন ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত—দারুণ অশান্তি উপস্থিত। বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা যখন প্রচলিত নাই, এবং থাকাও যখন উচিত নয়, তখন ভাব, কত অশান্তি ভোগ করিতে হয়। পরস্পরের মত যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন অন্য কারণেও ভবিষ্যতে অমিল হইতে পারে। কিন্তু সে কথা এখানে বিচার্য্য নয়। ভুল বুঝাতে যে দুর্ব্বিসহ কষ্ট হয়, সে কষ্টের সহিত অন্য কষ্টের তুলনা হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহারা নিজেরাই যখন পায়ে শৃঙ্খল দিয়াছে, তখন আর কে কি করিবে ? আমাদের বিবেচনায়, একথাটী সঙ্গত নয়। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আবশ্যকতা পৃথিবীতে এই জন্য যে, সকল বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যাইবে। এই সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কেহই সুখ শান্তিতে থাকিতে পারেন না। অন্যান্য সময়ে যেমন পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন, এই কঠিন ব্রত গ্রহণের সময়ও সেইরূপ প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায়, এই জন্যও বর কন্যার মনোনয়নের ভার কতক অভিভাবকের উপর রাখা একান্ত উচিত। অভিভাবকেরা পূর্ব্বে সৎ পাত্র বা কন্যা মনোনীত করিবেন। চরিত্রগত মহত্ত্বে এবং প্রকৃতিতে উভয়ের সহিত সামঞ্জস্য আছে কিনা, প্রথম অভিভাবকেরা বিচার করিবেন। তার পর বর কন্যাকে দেখা সাক্ষাতের অধিকার দিয়া, ভগবানের বিধান প্রভৃতি বুঝিতে দিবেন। যাহাদের অভিভাবক নাই, তাদের পক্ষে, প্রতিপালকদের মতামত মান্য করা উচিত। যদি প্রতিপালকের মতের সহিত বর কন্যার মত না মিলে, তবে সমাজের এই বিষয়ে হাত দিয়া মীমাংসা করা উচিত।

এস্থলে আর একটী কথা। অভিভাবকদিগের এবং তদভাবে সমাজের প্রবীণ লোকদের অজ্ঞাতে বিবাহসম্বন্ধে কোন প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। হঠাৎ যদি অনুরাগ হইয়া উঠে, তবে তাহাও সর্ব্বাগ্রে অভিভাবককে জানান উচিত। অভিভাবকের যদি তাহাতে অমত থাকে, তবে তখ-

নই তাহা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বহু দিন চেষ্টা করিয়াও যদি প্রতিরোধ না হয়, তবে অগত্যা ২।৩ বৎসর পর তাহাদের স্বভাবচরিত্রের কঠোর পরীক্ষা করিয়া, সমাজ বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন। এই অপেক্ষার সময়ে, কয়েক জন লোকের অন্ততঃ বর কন্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। গোপনে গোপনে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইলে, বা বিবাহের প্রস্তাবের পর অনেক দিন অপেক্ষা করিলে ভিতরে যে কি গরল উৎপন্ন হয়, তাহা আবার বলিতে হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল স্থানে দেবতারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। সামান্য মানুষের মনে যে গরল জন্মিবে, বিচিত্র কি? সামাজিক নিয়মের কঠোরতা অন্য কোন স্থানে না রাখিতে চাও, না রাখ, কিন্তু এই অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে কতক রাখিতেই হইবে। চিরকালের জন্য অবশ্য কোন নিয়ম প্রণয়নের আমরা পক্ষপাতী নহি। তবে বর্ত্তমান কালের জন্য নিয়ম বা আচার ব্যবহার প্রণালী নির্দ্ধারিত না থাকিলে, যৌবন বিবাহ প্রবর্ত্তনে যে কুফল ফলিবে, নীতি-শিথিলতা জন্মিবে, তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয়।

যাঁহারা চরিত্র এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এসকল ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক লক্ষের মধ্যে একজন মেলা ভার। চলিত ভাষায় যাহাদিগকে ধার্ম্মিক বলে, বিবাহরূপ কঠিন পরীক্ষার সময়, তাহাদিগের অনেকেরই পদস্খলন হয়, দেখা গিয়াছে। সুতরাং খুব সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত উচিত। সর্ব্বপ্রযত্নে বিলাসিতা এবং সাংসারিকতার স্রোত নিবারণ করিতে সকলের চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা কেবল বক্তৃতায় নহে, কথায় নহে, কিন্তু দৃষ্টান্তের দ্বারা করা উচিত। সাংসারিকতার স্থানে স্বর্গের চিন্তা, বিলাসিতার স্থানে চরিত্রের মাহাত্ম্য যাহাতে বালক বালিকাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এ কার্য্যের সহায়তার জন্য সর্ব্বদাই চরিত্রবান লোকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং বেশভূষামূলক বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি ঘৃণা দেখাইতে হইবে। এবং বর কন্যা মনোনয়নের সময় উভয়ের মনে যাহাতে বাহ্য সৌন্দর্য্য স্থান না পায়, তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে এ সম্বন্ধে অভিভাবকদিগের যে গুরুতর দায়িত্ব আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে, এবং সমাজকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বাহ্য চাকচিক্যাধিক্যে, অল্প দিনের দেখা সাক্ষাতে, হৃদয়গত মহত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। আমরা অন্যত্র এ কথাও বলিয়াছি যে, বিবাহের কথাবার্ত্তার পর আর অধিক দিন অপেক্ষা করাও উচিত নয়। আবার স্থানান্তরে একথাও বলিয়াছি যে, বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার এক বাড়ীতে অবস্থিতি করা উচিত নয়। * চিন্তা সূক্ষ্ম ভাবে না করিলে এ সকল কথাতে ইহাই বুঝা যায়, আমরা বিবাহের

* কেন যে আমরা এই সকল প্রথার বিরোধী, পূর্ব্বে কতক কতক তাহার আভাষ দিয়াছি। আমরা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদের উত্তর দিবার সময় এ সকল কথার আবার আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বর কন্যাকে পরস্পরের মহত্ত্ব জানিতে দেওয়ার কিছু বিরোধী। বাস্তবিক তাহা নয়। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ যখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় সরল এবং পবিত্র হয়, যখন বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, তখন ভগবানের বিধানে বরকন্যা অতি অল্প সময়েই পরস্পরকে চিনিতে পারে। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেই স্থানেই যত গোল। বিবাহ কার্য্য কিছু অপবিত্র কার্য্য নয়। যাঁহারা খুব মনোযোগের সহিত আমাদের স্বামী স্ত্রী নামক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই মিলনকে আমরা কত পবিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে বিবাহের পূর্ব্বে গর্হিত নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য না হয়, এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা একান্ত উচিত। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ অতি অল্প। সংসারাসক্ত লোকদিগের সম্বন্ধেই যত ভয়, এবং অনেক স্থলে তাহাদের দ্বারাই সমাজ কলঙ্কিত হয়। পরস্পরকে চিনিতে তাদেরই অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্ম ও চরিত্রহীন যুবক যুবতীর জন্যই এই সকল সতর্কতার কথা। রিপুর উত্তেজনায় স্বর্গের দেবতারও পদস্খলন সম্ভব, মানুষ কোন্ ছার জীব। এই জন্য বাধ্যবাধকতার বড়ই প্রয়োজন। এই সময় এ কথা গুলি ব্রাহ্মসমাজ এবং সমগ্র দেশ চিন্তা করেন, এই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দুসমাজে কোন্ ঘরের পাত্রের সহিত কোন ঘরের পাত্রীর বিবাহ হইতে পারিবে, তার একটা নির্দ্দিষ্ট রেখা আছে। কিরূপ সম্বন্ধ থাকিলে,তাহা ভাঙ্গিয়া পাত্র পাত্রীর সহিত বিবাহ হইতে পারিবে, তারও একটী নিয়ম আছে। অধিকন্তু সেখানে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই। পক্ষান্তরে সেখানে অভিভাবকেরাই বাঁধা ঘরে পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধ ঠিক করেন। অন্যদিকে,সেখানে বাল্য বিবাহ অনেকটা প্রচলিত। সুতরাং সেখানে এ সকল বিষয়ে বড় একটা নীতি-শিথিলতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের অবস্থা সেরূপ নয়। এখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, এখানে বর কন্যার মনোনয়নের প্রথা আছে, এখানে যৌবন বিবাহ প্রচলিত,—অথচ সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হয় না,এবং জাতিভেদ ইত্যাদি না থাকায় বাঁধা ঘর ইত্যাদিরও প্রয়োজন হয় না। এ সমাজের বিবাহপ্রণালী নির্দ্ধারণে যে কি গভীর চিন্তার প্রয়োজন,বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনায়াসেই বুঝিবেন। ঈশ্বর পিতা,আমরা সকলে ভ্রাতা ভগ্নী—এই উদার এবং পবিত্র সম্বন্ধের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে কয় জন ব্যক্তি? যে এত উপরে উঠিয়াছে, সে রিপু পরিচালনা না করিয়াও প্রেমের সাধনা করিতে পারে। প্রজাবৃদ্ধির কামনা, নিতান্ত অসার কামনা, যদি তাহার মূলে ভগবদ্ভক্তি না থাকে। আধ্যাত্মিক ভক্তি বিশ্বাসহীন লোকের দ্বারা যে প্রজাবৃদ্ধি হয়, সেটা নরকের ছবি; জগতের তাতে উপকার হয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তারপর ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধেই বা সকলের একরূপ ধারণা হইবে কেন? লোকের নিকট উপদেশ পাইয়া ঈশ্বরের যে স্বরূপ-বোধ জন্মে, সেটা প্রকৃত স্বরূপ-বোধ নয়। যাহারা শাস্ত্র মানে না, তাহারা সার্ব্বভৌমিক ঈশ্বর-স্বরূপ যে কি সূত্রে স্বীকার করিবে, বুঝি না। এখানে আদেশ বা

বিবেকের কথাই অধিক প্রতিপাল্য। ভগবান যার নিকট যে স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহাই সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। স্বরূপ স্বীকার করা ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা, স্বতন্ত্র কথা। সন্দেশের মিষ্টত্ব অন্যের মুখে শুনিয়া স্বীকার করা এবং নিজে আহার করিয়া যে মিষ্টত্বের বোধ জন্মে, তাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সার্ব্বভৌমিক স্বরূপ স্বীকার, গুরু ও শাস্ত্র-তন্ত্রবিরোধী ব্রাহ্মের পক্ষে অসম্ভব। ভগবান যার ভিতরে তাঁর অনন্ত স্বরূপের যে দিকটা প্রকাশ করিতেচান, সেইটাই হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি যে স্বরূপে যে ভাবে মানুষের কাছে উপস্থিত হন,সেই ভাবই তার হৃদয়ঙ্গম হয়। অনন্তস্বরূপ স্বয়ং এই রূপে অনন্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত না হইলে, কার সা ধ্য আছে, তাঁকে স্বরূপতঃ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবে? তাঁর আদেশেই কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ ভাই, কেহ ভগ্নী, কেহ স্বামী, কেহ স্ত্রী, ইত্যাদি। ঈশ্বরের পিতৃত্বই যে সকলের পক্ষে সাধনার বস্তু,তা নয়। কেহ পিতারূপে, কেহ স্বামীরূপে, কেহ শক্তি-রূপে, নানা রূপে নানা সাধক তাঁকে দেখেন, তাঁর স্বরূপ যে সকলের নিকট একরূপ, তা নয়। যাঁর নিকট তিনি যে ভাবে প্রকাশিত, সে তাঁর সেই রূপই ধরিবে, সেই রূপই বুঝিবে। যে তাঁকে স্বামীরূপে দেখিবে,সে কিছু পৃথিবীর নরনারীকে ভাই-ভগ্নীরূপে দেখিবে না। এসকল কথা একটু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা যে কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছি, সে কথাটী এই—ভগবান যাকে ভগ্নীরূপে হৃদয়ে সম্বন্ধ পাতাইয়া দিয়াছেন, তাকে আর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যায় না। আজ একরূপ কাল অন্য রূপ, এরূপ তাঁর বিধানই নয়। ভগবান যদি ভগ্নীকে চিনাইয়া না দিয়া থাকেন, তবে তাকে ভগ্নী বলিয়া ডাকিব না। আর যদি চিনাইয়া দিয়া থাকেন, তবে চিরকাল ঐ এক সম্বন্ধ। সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে, ঘটিতে পারে তখন, যখন মানুষ রক্ত মাংসের সম্বন্ধও মানে না, এবং বিধাতার আদেশও বুঝে না,বা মানে না। তখন —যখন মানুষ আপন খেয়ালে,কাহাকে মা, কাহাকে দিদি, ইত্যাদি কথায় সম্বোধন করে। এরূপ খামখেয়ালির ডাকাডাকিতে যে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে, বুঝাইয়া বলিতে হইবে কি? তবে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

মনে করুন, একটী গৃহস্থ কয়েকটী অনাথ বালক এবং অনাথ কয়েকটী বালিকাকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন। সকলেই খেয়াল অনুসারে দাদা দিদি বলিয়া ডাকিতেছে। অভিভাবক এ পবিত্র সম্বন্ধের মধ্যে কোন অপবিত্র ভাব আসিতে পারে,তাহা বুঝিতে-ছেন না। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এদিকে ভিতরে ভিতরে কোন বালক বালিকার মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হই-য়াছে। কিন্তু বাহিরের যেমন ডাকা ডাকি, তেমনই চলিতেছে। পূর্ব্ববৎ অভি-ভাবক নিশ্চিন্ত আছেন। ক্রমে ক্রমে কীট দেখা দিল। ক্রমে কীটে কুসুম কাটিল;—নীতির মূল ছিন্ন হইল। অবশেষে অভিভাবক বুঝিলেন। তখন হায় হায় পড়িয়া যাইল। আর কিছু বলিব না। এরূপ প্রতারণার জন্য দায়ী কে? এরূপ প্রতারণা নিবারণের জন্য সমাজ কি কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? স্ত্রী স্বাধীনতা ও যৌবন বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত,

সে সমাজে, দুশ্চরিত্রতা নিবারণের জন্য, সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করা কি সর্ব্বতোভাবে উচিত নয়? সম্বন্ধের ভিতরে ভগবানের যে বিধান বর্ত্তমান, সেই বিধান না বুঝিলে সম্বন্ধ পাতান উচিত নয়। ঈশ্বরের বিধান তোমার আমার সুযোগে কিছু পরিবর্ত্তিত হইবার নয়। সুতরাং যখন বিধানানুসারে এক সম্বন্ধ ঠিক হইল, সে সম্বন্ধের আর অন্য রূপ হইতে দেওয়া উচিত নয়। এ যদি না হয়, তবে স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, রিপুর উত্তেজনায়, মানুষ যে এইরূপে বাহিরের পাতান-সম্বন্ধ-রূপ আচ্ছাদনে লুকাইয়া লুকাইয়া, পদে পদে কত ঘৃণিত কার্য্য করিতে প্রশ্রয় পাইবে, তার ইয়ত্তা নাই। অতএব সম্বন্ধের গাম্ভীর্য্য এবং স্থায়ীত্ব রক্ষা করা আমাদের মতে একান্ত উচিত। *

একবাড়ীতে যে সকল নরনারী বাস করেন, আমাদের মতে তাহাদের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত হইতে দেওয়া উচিত নয়। তবে স্থান বিশেষে, অপরিহার্য্য হইলে, অনেক বৎসর অপেক্ষার পর হয়, হউক। এক বাড়ীতে থাকার সময় বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত উচিত নয়। যদিও বা পাকে চক্রে হয়, তবে তাহা তখনই অভিভাবকদিগকে জানান উচিত। তারপরই পৃথক রাখা উচিত। এরূপ স্থলে এক বৎসর—দুই বৎসর অন্তত অপেক্ষা করা একান্ত উচিত। নচেৎ চরিত্রহীনতার অনিবার্য্য কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার আর উপায় থাকে না। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার পক্ষপাতী, কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার একটা বিবাহ-পাতানের আড্ডা হয়, ইহা আমরা চাই না। বিবাহটা অপবিত্র কার্য্য বলিয়া নয়, কিন্তু এরূপ স্থলে পতনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা বিরোধী। আমরা মনে করি, প্রতিপালক, অভিভাবক বা শিক্ষকের সহিত অধীনস্থ বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। এ সকল স্থানে খুব সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতায় দারুণ গরল উৎপন্ন হইবে।

আমরা বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, সংক্ষেপে আবার বলি। কার কার সহিত কোন্ কোন্ স্থানে বিবাহ হইতে পারিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। সম্বন্ধের পবিত্রতা ও স্থায়ীত্ব রক্ষা করা উচিত। এক বাড়ীতে থাকা কালীন, এবং এক স্কুলে অধ্যয়নের সময় সম্বন্ধ পাতান উচিত নয়। সম্বন্ধের পূর্ব্বে অভিভাবকদিগের মতামত জানা উচিত। তারপর, সম্বন্ধ ঠিক হইল কিনা, ইহা জানিবার জন্য ভগবানের বিধান বুঝা উচিত। তারপর আলাপাদির সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। সে সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের উপর বর কন্যার আচার প্রণালী পরীক্ষার ভার রাখা উচিত। ইহার পূর্ব্ব হইতে সাংসারিকতা দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত। বাহ্য রূপ যে কিছুই নয়, ইহা বুঝান উচিত। মোট কথা, খুব সতর্কভাবে তাহাদের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। সম্বন্ধ হইলে অধিক দিন অপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ, তাহাতে মন এক চঞ্চলতার অবস্থায় থাকে, তাতে মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটা অসম্ভব নয়। তবে

* গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রতিবাদের' উত্তর দিবার সময়ে এই সব কথা আরো বিশদ করিয়া আলোচনা করিব।

যে স্থলে সাধারণ নিয়মের অন্যথা হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে কতকটা দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেখানে বর কন্যাকে অনেক দিন ধরিয়া পৃথক রাখিয়া মন পরীক্ষা করা উচিত। এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে অনেক দিন পর বিবাহ দেওয়া উচিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ বাঁধাবাঁধি করিয়া কি সমাজকে পবিত্র রাখা যায়?—এমন আরো কত স্থান আছে, যেখানে লোক পাপ কার্য্য করিতে সুবিধা পাইবে। এ সকল কথা খুব সত্য। বিধাতা মানুষকে পবিত্র না রাখিলে, মানুষ মানুষকে পবিত্র রাখিতে পারে না। তবুই বলিয়া মানুষ না ভাবিয়া না চিন্তা করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার ভিতরেও ভগবানের বিধান রহিয়াছে। মানুষ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই করিবে। তাতে সমাজ রক্ষা না হইলে, আর মানুষের হাত নাই। চেষ্টা করিয়া ফল না পাইলে দুঃখ কি, ক্ষোভ কি?

অন্যান্য কথা ক্রমে ক্রমে লিখিব।

বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা। (৪র্থ)

টোল ও চতুষ্পাঠী।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে নবদ্বীপে সংস্কৃতের কীদৃশী চর্চ্চা হইয়াছে,সেই সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বলিতে পারি নাই। অদ্য সে বিষয়ে যাহা কিছু জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে যে স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহাও প্রদর্শন করিতেছি।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত সামান্য গ্রামের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে জনৈক যোগী আসিয়া তথায় এক দেবীর ঘট সংস্থাপন করেন। যোগী সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই নিমিত্ত নানা স্থান হইতে ধর্ম্মানুরাগী জনগণ আসিয়া ঐ মহাপুরুষকে দর্শন ও দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল।

নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশই সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রধানতম স্থান বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মিথিলা হইতেই নবদ্বীপে সংস্কৃত দর্শন ও স্মৃতি আনীত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মিথিলায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামক একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও তার্কিক প্রাদুর্ভূত হন। তিনি প্রত্যক্ষ-অনুমিতি-উপমান-শব্দ, এই চারি খণ্ডে তত্ত্বচিন্তামণি নামক বঙ্গদেশের এক মাত্র প্রামাণিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রায় পাঁচশত বৎসর অতীত হইল (খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে) জয়ধর উপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মিশ্র মিথিলা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির আলোক (চিন্তামণ্যালোক বা চিন্তামণি-প্রকাশ) নামক সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। আলোকই চিন্তামণির প্রাচীনতম

টীকা। জয়ধর উপাধ্যায় পক্ষধর * মিশ্র নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গমন পূর্ব্বক পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া, নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগর গ্রামে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন। চৈতন্যদেব, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি, হরিদাস সার্ব্বভৌম এবং শ্রীপাদ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চিন্তামণির কতিপয় অংশের টীকা করেন। তাহা সার্ব্বভৌমনিরুক্তি নামে প্রসিদ্ধ।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে চৈতন্যদেব জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক নবদ্বীপে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি গঙ্গাধর পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃতে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া, অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা চৈতন্যদেব এবং তাঁহার শিষ্য বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাই সবিশেষ ঋণী। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া তাঁহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্টরূপে উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা বঙ্গবাসীর চির প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা ভাজন, সন্দেহ নাই।

চৈতন্যদেবের মতানুযায়ী বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকগণের মধ্যে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

রূপ ও সনাতন দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। জীব গোস্বামী তাঁহাদের ভ্রাতষ্পুত্র। এই তিন জনেই সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের প্রণীত বহুতর গ্রন্থ আছে। ইঁহাদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সংশাধিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

সনাতন গোস্বামীপ্রণীত গ্রন্থের মধ্যে

---

* পক্ষধর নামের অর্থ সম্বন্ধে তিনটী মত প্রচলিত আছে। (১) তিনি চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে এক দিন মাত্র ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। (২) তিনি একবার মাত্র যাহা শুনিতেন, স্মৃতিশক্তির অতি প্রখরতা বশতঃ চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত তাহা মনে রাখিতে পারিতেন। (৩) তাঁহার এরূপ অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল যে, তিনি যুক্তি ও তর্ক প্রয়োগ পূর্ব্বক যে কোন মত অব্যাহত রাখিতে পারিতেন। গীতগোবিন্দ ও প্রসন্নরাঘব প্রণেতা জয়দেবদ্বয়ের মধ্যে কেহই এই পক্ষধর নহেন। তাঁহারা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। (See Dr. Mitra's Notices of Sanskrit mss. vol. I. p.285-86.

বাসুদেব সার্ব্বভৌমই মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া প্রথমত নবদ্বীপে টোল সংস্থাপন করেন। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে শব্দ কল্পদ্রুমে লিখিত ন্যায় শব্দ দৃষ্টে পক্ষধর মিশ্রকে রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বলিয়া লিখিয়াছিলাম। রঘুনাথ পক্ষধরের নিকট অধ্যয়ন করেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ যে শব্দকল্পদ্রুমের লিখনানুসারে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের অধ্যাপক বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাও বোধ হয় ভ্রমাত্মক।

ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, গীতাবলী, দিক্‌প্রদর্শিনী নাম্নী ভাগবতের টীকা, লীলাস্তব-টীপ্পনী সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণি নামক অলঙ্কার গ্রন্থ,—হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, শ্রীরূপচিন্তামণি ও ছন্দোঽষ্টাদশ নামক কাব্য,—বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব নামক নাটক, দানকেলি নামক ভাণিকা (নাটক),—উৎকলিকাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, বৃন্দাদেব্যষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলি-স্তব নামক স্তোত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি মথুরামহাত্ম্য, পদ্যাবলী, সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীহরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু, এবং নাটকচন্দ্রিকা নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

জীব গোস্বামী প্রণীত বৈষ্ণবতোষিণী, লঘুতোষিণী, ষটসন্দর্ভ, গোপালচম্পূ, গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা, রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা সুপ্রসিদ্ধ।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাঁহার কৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সুবিখ্যাত।

বিদ্যা ও ভক্তির জন্য কায়স্থজাতীয় রঘুনাথ দাস 'দাস গোস্বামী' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি-স্তোত্র ও মনোশিক্ষা নামক পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন।

গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দ স্বরস্বতী বিবেকশতক নামে কৃষ্ণ ভক্তি বিষয়ক এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক চৈতন্যদেবের স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **প্রাচীন আর্য্যরমণীদিগের ইতিবৃত্ত।**—শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত; মূল্য ।৵১০। মৈত্রেয়, লীলাবতী, গার্গী ও বাক প্রভৃতি ২১ জন আর্য্যরমণীর বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্ধকারময় গভীর সাগর হইতে এই সকল রত্নোদ্ধার করিতে গ্রন্থকারকে যে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের এই যুগে এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থকার বাঙ্গালীর যথেষ্ট উপকার করিলেন। বিনা আড়ম্বরে স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের যে পথ গ্রন্থকার এই সদনুষ্ঠানের দ্বারা পরিষ্কার করিলেন, তার ব্যাখ্যা হয় না। যদিও বিবরণ গুলি খুব সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে কিছু কিছু নীরস কথোপকথনের উল্লেখে সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে, তবুও, যে সময়ের কাহিনী গ্রন্থকারকে লিপিবদ্ধ করিতে

হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে গ্রন্থকারকে আর দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি কোথায় বিবরণ পাইবেন? এক এক জনের কাহিনী সংগ্রহ করিতে হয়ত তাঁহাকে কত পুস্তক, কত জীবনের ঘটনা, কত লোকের উক্তির পানে তাকাইতে হইয়াছে। সুতরাং এ সকল ত্রুটী ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করা যায় না। আর্য্যরমণীগণ বেদ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কত গৌরবের কথা। মহেন্দ্র বাবু সেই গৌরব আজ বাঙ্গালায় গভীর-স্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন;—আর্য্য-কীর্ত্তির অক্ষয় যশ ঘোষণা করিতেছেন। মহেন্দ্র বাবুকে শত শত ধন্যবাদ।

কিন্তু দুটী কথা। পুস্তকের ভাষা কিছু কর্ক্শ, কিছু নীরস এবং স্থানে স্থানে কিছু দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার সহায়তার জন্য যে সকল পুস্তক প্রণীত হয়, সে সকল পুস্তকের ভাষার দিকে দৃষ্টিরাখা খুব উচিত। মহেন্দ্র বাবু সে কার্য্যটী করেন নাই বলিয়া আমরা কিছু দুঃখিত হইয়াছি।

২। **একাদশ অবতার বা পঞ্চানন্দ মঙ্গল।** শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটি প্রণীত। মূল্য ॥০মাত্র; ৪১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তক খানি অনেক দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি ব্যঙ্গোক্তিময় গ্রন্থ আমরা সমালোচনারজন্য অতি অল্প দিন হইল পাইয়াছি। এই পুস্তক খানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত, সে উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। একজন প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে এইরূপ কার্য্যে রত দেখিলে আমাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। এই চেষ্টা, এই অধ্যবসায় ভাল কার্য্যে ব্যয়িত হইলে, না জানি বাঙ্গালা ভাষার কত গৌরব বাড়িত। যে সে একজন লোক এই কার্য্য করেন, তাতে ক্ষোভ নাই। কিন্তু একাদশ অবতার-প্রণেতা যে সে লোক নন্। তাঁহার বর্ণনাশক্তি, তাঁর ভাষা-জ্ঞান, তাঁর অলঙ্কার যোজনার ছটা, সর্ব্বোপরি তাঁর কবিত্ব-শক্তি দেখিলে মোহিত হইতে হয়। আমাদের ক্ষোভ এই, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে যে শক্তি বিকীরণ করিয়াছেন, তাহা জগতের লোকে দেখিবে না, তাহা জগতে স্থায়ী হইবে না। কারণ ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া যে পুস্তক লিখিত, তার আদর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নয়। মহাকবি ধূর্জ্জটি পঞ্চানন্দের এক মহৌষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে,—এ ঔষধের ক্ষমতা যে অসাধারণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই; এবং ধূর্জ্জটিই যে এই ঔষধ ব্যবস্থা দিবার উপযুক্ত লোক, ঠিক কথা; কিন্তু পঞ্চানন্দকে আমরা যে কারণে আদর করিতে পারি নাই, ধূর্জ্জটিকেও সেই কারণে আদর করিতে পারিলাম না। ইঁহারা উভয়েই আপন আপন শক্তির অপব্যবহার করিতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উভয় গ্রন্থকারই প্রতিভাশালী সুলেখক;—দুঃখ এই, ইঁহাদের উভয়ের পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, তৈল শোষণ অপব্যয় হইতেছে। এই পুস্তকে ধূর্জ্জটি মহাকবি আশ্চর্য্য কবিতা লিখিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, এজন্য সমাজে তাঁর আদর পাওয়া উচিত। তাঁর এই কবিত্ব শক্তির খাতিরে—নীচ উদ্দেশ্য-মূলক হইলেও, সকলের গ্রন্থখানি এক একবার পাঠ করা উচিত।

৩। **ভারত-কোকিল কাব্য—** শ্রীতারিণী চরণ সেন প্রণীত; মূল্য ॥০।

এ কাব্য খানির আগাগোড়া উত্তেজনা পূর্ণ। পড়িতে পড়িতে লেখকের স্বদেশ প্রেমের পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। এখানি ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা, হিতৈষীর বিলাপ, মাতার সুপুত্রের প্রাণের উচ্ছ্বাস। কবিত্বাংশে পুস্তকখানি শ্রেষ্ঠ না হইলেও, ভাবে, উৎসাহে ও স্বাধীন চিন্তায় আদরের জিনিস। পুস্তক খানির মূল্য আরো সুলভ হওয়া উচিত। আশা করি, তাহা হইলে অনেকে পাঠ করিবেন।

৪। অশ্রুকণা—শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত—মূল্য ॥০। পুস্তকখানি অল্প দিন হইল বাহির হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে সমগ্র পুস্তক খানি দুই তিনবার পড়িয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর যে যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ পাইল,তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, গ্রন্থকর্ত্রী বাঙ্গলায় আর অপরিচিত থাকেন, আমরা ইচ্ছা করি না। শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী দাসী কে, আমরা জানি না। তবে এ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, তিনি একজন বঙ্গবিধবা। যে বঙ্গবিধবা এরূপ উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে শিখিয়াছেন, তিনি দাসী নন, তিনি দেবী। ইঁহার বৈধব্যদশায় বাঙ্গালা ভাষা অনেক উপকৃত হইলেন। তিনি বিধবা না হইলে এই "অশ্রুকণা" বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিত কি,না সন্দেহ। গ্রন্থকর্ত্রী দুঃখ করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—" সংসার সুখের অভিলাষী, শোকাশ্রু কি কাহারও ভাল লাগিবে ?" আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছি,—ভাল লাগিবে,—ভাল লাগিয়াছে। প্রাণ ভাসাইয়া অন্যের গলা ধরিয়া, যেকাঁদিতে জানে,তাঁর ক্রন্দনে পাষাণ সদৃশ প্রাণও গলে। কে এমন আছেন, বঙ্গবিধবার এইরূপ ক্রন্দনে যাঁর প্রাণে আঘাত না লাগে ;—

১। * * *

মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চ'লে যাই সে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।
হে ধরণি, খুলে দেগো,স্নেহের শিকল তোর !
দেগো ছেড়ে,যাই উড়ে, জনম-তরতে মোর !
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছ হীন প্রাণ ?
কোন্ কাজ হবে, ধরা,আমা হতে সমাধান !
ও শুভ্র তোমার বুকে কালিমার বিন্দু হ'য়ে,
থাকিতে পারি না আর এ ভার জীবন ল'য়ে॥"

স্থানান্তরে—" * * *

পাব কি না পাব, কোথায় যাইব ?
চাহিনা মরণ-পার।
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
এ অতি সুখ আমার।"

আবার—" * * *

শুয়েছে বিছায়ে স্মৃতি শুষ্ক পর্ণ-রাশি।
শুয়েছে অশ্রুর কোলে হরষের হাসি,
কাঁদিয়া শুয়েছে মোর প্রভাতের প্রাণ।
এ জনমে করিবে না কেহ গাত্রোত্থান।"

অন্যত্র—

"রয়েছে কুসুম ঢালা,
গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ-জ্বালা,—শুকাইয়া যায় !
আশার শিশির-বারি
সতত সিঞ্চন করি
বাঁচায়ে যে রাখিতেছি, হবে কি বৃথায় ?
সে কি মোর ফুল-হার দেবে না গলায় !"

বঙ্গবিধবার এই গভীর বিলাপে আমাদের প্রাণ অবসন্ন—শরীর নিস্তেজ,নয়ন অশ্রুপূর্ণ—কিন্তু বিরহ-গানের পাশেই আশার সুমধুর বাণী ;—বঙ্গবিধবার গভীর প্রেমের

আত্মত্যাগমন্ত্র হৃদয়কে বৈরাগ্যে লইয়া যায়।—দেখ,তাহা কত গভীর,—কত মধুর—

১। "কোথা আছ নাহি জানি,
জানি না হৃদয় তব!
যা ছিল সকলি দেছি,
লও হে শোকাশ্রু নব।"

২। * * * * *
"তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তার নামে সব সুখ!
* * * * *
তাহার এদেহ, তাহার বিরহ,
ত্যজিতে নাহিক সাধ!

৩। "অতি ক্ষুদ্র ফুল আমি, প্রবল তরঙ্গ-ঘায়
কতক্ষণ রব টিকে, এমনি ভাসায়ে কায়!
দয়া ক'রে,ফেল মোরে ভাসাইয়া উপকূলে,
নহিলে ডুবে যে মরি,প্রাণের অতল তলে!
তীরে প'ড়ে শুকাইতে,ভাল বাসি,—তা-ই চায়
শুকাতে জনম মোর, শুকায়ে ত্যজিব কায়।"

৪। "আজীবন ও মূরতি বসায়ে মানসে,
প্রেমের কুসুম-হার দিব গলদেশে!
এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুখাবে
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত রহিবে।"

৫। "তুমি কি গিয়াছ চ'লে?
না না, তা ত' নয়।
য'দিন বাঁচিব আমি,
ত'দিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো
সুধু তোমাময়।
তুমি ছাড়া আমি কেবা—
—শূন্য—শূণ্যময়।"

তারপর মৃতপতির জন্য সাধ্বীর হৃদয়ের প্রার্থনা। দেখ, সে মধুর প্রার্থনায় কত আত্মত্যাগের ভাব—

"এই ভিক্ষা দাও নাথ,
যা দেবে আমারে দিও, দুখ বা যাতনাভার!
ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।
বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হতে চলে গেছে,
স্নেহেতে ডাকিয়া তারে,লও, নাথ লও কাছে।"

এরূপ সতী যে স্বামীর ভাগ্যে মিলে, সে স্বামী চির অমর। ৺নরেশচন্দ্র দত্ত বাঙ্গালা প্রদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, দেবী গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিত্বশক্তি কেবল বিলাপ উক্তিতেই প্রস্ফুটিত। না—তা নয়, কবির প্রকৃতির বর্ণনা আরো মধুর। সমস্ত কবিতা তুলিয়া না দেখাইতে পারিলে কিছুতেই সাধ পূরে না। সর্ব্বত্রই নূতন চিন্তা, নূতন ভাব,—নূতন গান, সে সব শুনিতে শুনিতে প্রাণ মোহিত,হৃদয় স্তম্ভিত। এরূপ প্রতিভাময়ী ললনার আবির্ভাবে বাঙ্গালা আজ ধন্য। এতদিনে এদেশ স্ত্রীশিক্ষার সুফল ফলিয়াছে। এদেশে গিরীন্দ্রমোহিনীর সমতুল্য মহিলা-কবি আর আছেন বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার পূর্ণিমাগীত, যমুনাকূলে, গ্রাম্যছবি, গার্হস্থ্য চিত্র,জ্যোৎস্না, —বর্ষা,বরুণা যাত্রা,সমাধি স্থান,পর্ব্বত প্রদেশ, পাড়া গাঁ প্রভৃতি কবিতায়, ঐ শক্তি আশ্চর্য্য রূপ বিকশিত হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ কেবল একটী স্থান দেখাইব—

"শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্য্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হ'য়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে আয় চাঁদ, মা বলিছে আয় চাঁদ,
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা নাই ঘরেতে যার,ছেলে কোলে নাই যার!
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি, চাঁদে চাঁদে মেশামিশি,
স্বর্গে মর্ত্তে প্রভেদ কি আছে।"

প্রশংসার কথা অনেক বলিয়াছি। আর বলা সম্ভব নয়। আমরা তাঁর গ্রন্থখানি

সমগ্র তুলিয়া না দিতে পারিলে সকল সৌন্দর্য্য দেখান যায় না। আমাদের তত স্থাননাই। বিশেষত সে কার্য্যে ইচ্ছাও নাই। এ পুস্তকখানি ঘরে ধরে থাকে, এই ইচ্ছা। এ ইচ্ছা কি সফল হইবে?'

(এ গ্রন্থে যে কোন দোষ নাই, তা নয়। চাঁদেও কলঙ্ক থাকে, কমলেও কণ্টক থাকে। এ অশ্রুকণাতেও মলিনতা আছে। স্থানে স্থানে রবীন্দ্র নাথের ছায়া পড়িয়াছে। উভয়ই সম-সাময়িক-কবি বলিয়া আমরা এ দোষ ধরিতেছি, নচেৎ ধরিতাম না।)

"আশার স্বপনে থেকে বহিয়ে যে গেল বেলা
কখন খেলিবে আর সাধের প্রাণের খেলা?
দিগন্ত আঁধার ক'রে আসিছে তামসী নিশি,
এই বেলা ধীরে ধীরে পরাণেতে যাও মিশি।"

এ সকল কবিতা পড়িলে রবীন্দ্রনাথ-কেই মনে পড়ে, গিরীন্দ্রমোহিনীর সৌন্দর্য্য যেন কিছু খর্ব্ব হয়। আর একটী কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। দুই তিনটী স্থানে গ্রন্থকর্ত্রী যেন কিছু পথ-হারা হইয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোক, তাঁর লেখায়—

"উরস সরসে কণক মুকুল
রূপের সলিলে ভাসে।" এর ন্যায় পদ না থাকিলেই ভাল হইত।

গ্রন্থকর্ত্রী শেষে সকলের প্রাণে মিশিতে চাহিতেছেন। হৃদয়ের দ্বারা উন্মুক্ত করিয়া সকলকে ডাকিতেছেন—

"উন্মুক্ত ক'রেছি হৃদি কুটীরের দ্বার,
কে আছ আশ্রয়হীন এস, এস ভাই!
সবারে রাখিতে প্রাণে সাধ মোর যায়,
সবার মাঝারে আমি মিলাইতে চাই।
* * * * * * *
তোমাদেরি সুখে দুখে মিশাইয়া প্রাণ,
সাধ—হারাইব এই তুচ্ছ সুখ দুঃখ;
তোমাদেরি মাঝে থেকে লভি নব প্রাণ,
দেখিবারে পাই যদি সন্তোষের মুখ!
এস সবে, পারি যদি হারাতে আপনা,
জীবন-সমুদ্র-জলে ক্ষুদ্র বারি-কণা।"

ইহাই স্বাভাবিক। সীমাবদ্ধ প্রেম এখন অসীম। এখন জগতে মিলিতে কবির প্রাণের সাধ। জগৎ কি কৃপণের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে? না। ঘরে ঘরে, প্রাণে প্রাণে এই অশ্রুকণা মিলিয়া থাকিবে। ভাবে ভাবে মিলন—অনন্ত মিলন হইবে। (বঙ্গবিধবার প্রাণ আজ বাঙ্গালীর অনন্ত প্রাণে মিশিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার কি মিষ্ট, কি নীরব, মনমুগ্ধকর ছবি। ধন্য গিরীন্দ্রমোহিনী, ধন্য বঙ্গদেশ।)

৫। জীবনপ্রদীপ। উপন্যাস—শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৵০। বিষ্ণু বাবু যদিও এই প্রথম গ্রন্থকার রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু নব্য-ভারতের পাঠকগণের নিকট তিনি অপ-রিচিত নহেন। নব্যভারতের পাঠকগণ বিষ্ণু বাবুকে উত্তম রূপে জানেন। সুতরাং তাঁহার অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

গ্রন্থ খানি খুব বিস্তৃত। অল্প কথায় সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। আমরা বিবরণ না দিয়াই সমালোচনা করিব। যাঁহারা পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে কিছু অসুবিধা হইবে, কিন্তু উপায় নাই। তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থের দোষ গুণ সম্বন্ধে যাহা বলিবার কেবল তাহাই বলিতেছি।

এই সুলভ গ্রন্থ খানির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধর্ম্ম এবং চরিত্রের শ্রেষ্টত্ব প্রতিপন্ন করাই

গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সংসারের ধন ঐশ্বর্য্য, মান অভিমান, রূপ যশ, এ সকল যে প্রকৃত চরিত্রবান ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট কোনই আকর্ষণের বস্তু নয়, মহাত্মা হরগোবিন্দের চরিত্রে গ্রন্থকার তাহা অতি দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য, ভ্রাতার নির্য্যাতন প্রভৃতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হরগোবিন্দ যখন অতুল বিষয় বিভব পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখনকার সে দৃশ্যটী অতি চমৎকার। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—চক্ষে জল পড়ে। এমন স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল ছবি আমরা আর কোথাও পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। হরগোবিন্দের চরিত্র বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্র—ভবানীশঙ্করের। ভবানী শঙ্কর একজন নৃসংস চরিত্রহীন জমীদার। ইহার নৃশংস চরিত্রের বর্ণনাও সুন্দর হইয়াছে। সুখদার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যখন ভবানী-শঙ্কর, তার ভগ্নী মধু ও পূর্ব্ব স্ত্রী সরমার রক্তে ধরাকে সিক্ত করিতেছিল, তখন এই হতভাগ্যের প্রতি বাস্তবিকই বিষম ঘৃণা হইয়াছিল। তারপর ছলনা করিয়া নৃশংস যখন হরগোবিন্দের বিষয় কাড়িয়া লইল, তখন এই পিশাচের প্রতি ক্রোধ এবং ঘৃণা এত বৃদ্ধি হইল যে, আর সহ্য করা যায় না। তারপর কিন্তু হরগোবি-ন্দের সাধুতার দৃষ্টান্তে ইহার জীবনে পরিবর্ত্ত-নের ভাব আসিল। পরিবর্ত্তনটা হঠাৎ হইল বলিয়া ভাব কিছু মন্দীভূত হইল। এ ত্রুটী স্বত্তেও ভবানীর চিত্র বড় মন্দ হয় নাই।

সকলের উপরে—কুন্তলা এবং শশাঙ্ক-শেখরের চিত্র। কুন্তলা যমবরা মেয়ে। হরিগোবিন্দের দৌহিত্রী। হরগোবিন্দ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া চরিত্রে, ধর্ম্মে ও শিক্ষায় জন্ম দুঃখিনী কুন্তলাকে একটী আদর্শ বালিকা করিয়া তুলিয়াছিলেন। জীবনের বিষম সংগ্রামে, দুঃখ কষ্টে—কুন্তলা অচলা;—কোন ঘটনাতেই বিচলিত হইবার নয়। কুন্তলাকে গ্রন্থকার সর্ব্বগুণে বিভূষিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এচিত্রে অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের চিত্রের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তবুও কুন্তলার ছবি সুন্দর। এ সৌন্দর্য্যরাশির কালিমা, শশাঙ্কশেখর। যেরূপে, যেভাবে এই শশাঙ্ক-শেখরের প্রেম, উছলিয়া প্রণয়ে পরিণত হয়, তাহা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাহা আদর্শ নয়। এই কারণে, গ্রন্থকার কুন্তলাকে প্রেমিক করিয়াও প্রণয়িনী করেন নাই। কুন্তলা সকলকেই ভাল বাসিয়াছে, কিন্তু কাহারও সহিত শরীর বিনিময় করে নাই। নিঃস্বার্থ জীবনব্রত, পরোপকারেই উদ্যাপিত হই-য়াছে। কুন্তলার নিঃস্বার্থ জীবনে অনেক শিখিবার জিনিস আছে।

কিন্তু থাকিলে কি হয়, কুন্তলার চরিত্র স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক হইয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে এই কুন্তলার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বড়ই অস্বাভাবিক। অতি অল্প সময়ে যুদ্ধের দিন তিনি যাহা করিলেন, তাহা মানুষে পারে বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, তারপর ঘটনাক্রমে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, জলে ভাসিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৫।৬দিনের পথ অতিক্রম করিয়া নদী সৈকতে আসিলেন। এ কিরূপ হইল, বুঝি-লাম না। সেইখানেই আবার ভবানীশঙ্কর হা-জির! এসকল ঘটনাওঅবস্থার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা না ভাবিয়া এরূপ করাতে পুস্তকের

অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছে। তারপর যেখানে সেখানে কুন্তলা খোলা চুলে বেড়াইতেন ;—এটাও ভাল বোধ হইল না। যাহা হউক, মোটের উপর চিত্রটী ভাল।

এই কয়েকটীই প্রধান চিত্র। অবান্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অনেক আছে। কুন্তীর চিত্র তন্মধ্যে প্রধান। এ চিত্র বঙ্কিম বাবুর বিমলা এবং শান্তির উজ্জ্বল ছায়ায় অঙ্কিত। বিলাসপুরের রাজার বর্ণনা, ব্রহ্মচারী, নন্দনগিরি, হেন্‌রি সাহেব প্রভৃতির চিত্র গুলিতে বৈচিত্র্য থাকিলেও তাহা অনুকরণ দোষে দূষিত বলিয়া বিশেষ চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনা গুলিতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

তারপর খাসিয়া পাহাড়ের দৃশ্যও মতিরায় প্রভৃতির কথা। এ সকলও পুস্তকের যথেষ্ট কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে নাই। কারণ, কুন্তলার জীবনের যে অংশ এই পাহাড়ের ছায়ায় প্রস্ফুটিত, তাতে নূতনত্ব নাই। কুন্তলার সে সকল গুণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। এক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দশবার বলিলে লাভ কি?

আর একটী চিত্র ধরণীধরের। ধরণীধরের চিত্র স্থানে স্থানে পরিস্ফুট, স্থানে স্থানে অস্ফুট। মরিশস্ দ্বীপ হইতে ভাসিয়া সাগর পার হইয়া ইনি হরানন্দ ব্রহ্মচারী বেশে ডাকাতের সর্দ্দার হন। ইনি কুন্তলার মাতুল সম্পর্কিত। ইনিই কুন্তলাকে বন্দী করেন। তারপর, আবার দ্বিপান্তরিত হন। এ চিত্রটীতেও অস্বাভাবিক অনেক ঘটনা আছে।

এ পুস্তক খানি প্রকৃতির বর্ণনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার যাকে হাতের সন্মুখে পাইয়াছেন, তারই রূপের বা গুণের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের ভাবের যথেষ্ট ব্যত্যয় হইয়াছে। কৃতী লেখকেরাও কোন কোন চিত্র অঙ্কিত করেন বটে, কিন্তু সে কেবল কোন বিশেষ ঘটনাকে বা কোন বিশেষ চিত্রকে পাঠকের মনে চির-অঙ্কিত করিবার জন্য। এ গ্রন্থে সকলেরই বর্ণনা আছে। এই রূপ অতিরিক্ত বর্ণনায়, এবং গ্রন্থকারের কল্পিত কথায় পুস্তক খানি আগাগোড়া গোলমেলে হইয়াছে। পড়িবার সময় খুব আকর্ষণ হয় না। বর্ণনা-শক্তি গ্রন্থকারের অতি আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই, স্থানে স্থানে পড়িতে পড়িতে মোহিত হইয়া যাইতে হয়, বটে, কিন্তু তাতে পুস্তকের ঘটনার সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। পুস্তকের কোন ঘটনা, কোন চিত্রই হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিতে চায় না। এই এক দোষে পুস্তকখানি সাধারণের নিকট খুব নীরস লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত, অনেক স্থলে গ্রন্থকার অগ্রে পরবর্ত্তী ঘটনা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়া তারপর পূর্ব্বের ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন। দুই এক স্থলে এরূপ হইলে বিশেষ দোষ ঘটিত না বটে, কিন্তু যেখানে সেখানে এরূপ হওয়ায় পুস্তক খানিকে খাপ-ছাড়া বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে, গ্রন্থের উল্লিখিত এক জন একটা প্রশ্ন করিয়াছে, সেই প্রশ্নের উত্তর ৭।৮ পৃষ্ঠা পরে রহিয়াছে। এই ৭।৮ পৃষ্ঠা, হয়, স্বভাবের বর্ণনায়, না হয়, লোক বিশেষের পূর্ব্ব পরিচয়ে পূর্ণ। এরূপ হওয়াতে পুস্তক খানি বড়ই কর্কশ হইয়াছে।

তৃতীয় কথা, এই পুস্তক খানিতে না পাওয়া যায়, এমন কথা নাই, এমন ঘটনা নাই। একখানি পুস্তকে জীবনের সকল

কথা লিপিবদ্ধ করা ভাল নয়। পাঠকের এত ধৈর্য্য থাকিবে কেন? জীবন-প্রদীপে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে তাতে সুন্দর ৩ খানি পুস্তক হইতে পারিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। কারণ, যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে।

এ সকল কথা ভিন্ন, কতকগুলি অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ আছে। সে গুলিকে ইচ্ছা করিলেই গ্রন্থকার রূপান্তরিত করিতে পারিতেন। না করায় বড়ই অনিষ্ট হইয়াছে। ১ম ঘটনা,—টাকা না পাইয়া খতদলিল রেজেষ্টারি করা। (২য়) গৌহাটী হইতে খাসিয়া পর্ব্বতে নৌকায় যাওয়া। (৩য়) ভবানীশঙ্করের হঠাৎ পরিবর্ত্তন। (৪র্থ) ভবানীশঙ্করের সহিত কুন্তলার মিলন। (৫ম) কুন্তলার সহিত ধরণীধরের মিলন। (৬ষ্ঠ) দস্যু গৃহে কুন্তলাকে আনিবার জন্য শশাঙ্কশেখরের গমন। (৭ম) শশাঙ্কশেখরের দগ্ধ শরীরে জীবনপ্রাপ্তি। (৮ম) শশাঙ্কশেখরের সহিত তাঁহার পিতার মৃত্যু সময়ে সাক্ষাৎ, এবং মৃত্যু সময়ের সুদীর্ঘ উপদেশ। (৯ কুন্তলার আরোগ্য। ১০) হরগোবিন্দের সহিত কুন্তলার শেষ মিলন। এই সকল ঘটনা গুলি কেমনে ঘটিল বুঝা কিছু কঠিন। যেরূপে গ্রন্থকার যাহা মিলাইয়াছেন, তাঁহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল।

আরো একটী কথা আছে। বিষ্ণু বাবুর কতকগুলি প্রিয় কথা আছে, এবং কতকগুলি প্রিয় চিত্র আছে। অনেক স্থানেই সেই কথা এবং সেই চিত্র গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বার বার এক কথা কি ভাল লাগে? একথাটী মনে রাখা খুব উচিত ছিল।

এই সকল দোষ স্বত্বেও জীবনপ্রদীপ বাঙ্গালীর এক আদরের জিনিস। ইহাতে অনেক অমূল্য চিত্র, অমূল্য কথার সমাবেশ হইয়াছে। শশঙ্কশেখরের শেষ পত্র থানি এক আশ্চর্য্য জিনিস। খাসিয়া পর্ব্বতের মহিলাগণের বর্ণনা, নির্ম্মলচন্দ্রের রোগশয্যা, বিলাসপুরের ছিন্নমস্তার বাড়ী, লীলার মৃত্যু, হরগোবিন্দের বিচার গৃহ, এবং দস্যুর বাড়ী প্রভৃতির বর্ণনা অতি আশ্চর্য্য, অতি সুন্দর। ইহার সমতুল্য বর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প আছে।

গ্রন্থকারের ভাষা কবিত্বময়, ভাবময়, তেজোময়। তাতে বীণার ঝঙ্কার আছে, কুসুমের সুবাস আছে, হৃদয়ের কমনীয়তা আছে, বীরের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আছে। তবে ব্যাকরণ দোষ নাই, একথা বলিতে পারি না। দোষ ত্রুটী স্বত্বেও একথা বলিতেই হইবে, বিষ্ণু বাবুর লেখনী উপন্যাসের বিশেষ উপযোগী।

বিষ্ণু বাবুর গ্রন্থের দোষ এবং গুণের কথা অনেক বলিলাম। এই পুস্তকের অবান্তরিক চিত্রের বর্ণনায় তাঁহার হৃদয়ের যে মহত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই মহত্ত্ব স্থায়ী হইয়া থাকিলে, কালে তাঁর হাতে আমরা আরো অনেক মহত্ত্বময় চিত্র পাইব। ভাবের বেগ সম্বরণ এবং ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে শিখিলে কালে তিনি এক জন কৃতী লেখক হইতে পারিবেন। বিষ্ণু বাবুর গ্রন্থের শত শত দোষ স্বত্বেও, যিনি এই গ্রন্থ একবার পড়িবেন, তিনিই তাঁর সাধুতা ও ধর্ম্মপিপাসার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইবেন। বিধাতা তাঁকে আরো শক্তি দিন, তিনি বাঙ্গালা ভাষার আরো উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হউন।

পাষাণী।

আমি কত দূর হইতে আসিলাম। দূরে দূরে গভীর গিরি গহ্বরে আমার জন্ম। কত বনভূম-আঁধারে আবরিত, ক্ষণসৃষ্ট ক্ষণ-বিধ্বংসী জলদজালে পরিবেষ্টিত, দ্বিপী ভল্লুক-নিনাদিত অন্ধকার বনভূমের মধ্য দিয়া তোমারই জন্য ছুটিয়া আসিলাম। অন্ধকারে ভীষণ জীব-জন্তু-দুরধিগম্য, কীট পতঙ্গ-নিবারিত-প্রবেশ-ভুবন, ভাস্বর ভাস্করের হিরণ কিরণে নিরালোকিত গিরি-গুহার ভিতর আছে স্থান অতি ভয়ঙ্কর, না চলে ভানুর ভাতি, তমোময় দিবা রাতি, সেই স্থান দিয়া অতি ধীরে অতি ধীরে, কেহ না জানিতে পারে, না চিনিতে পারে, তাই ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে চুপে চুপে আসিয়াছি। পথে রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ রাশি রাশি বিশাল প্রস্তরে বাধা দিয়াছিল, কুল কুল করিয়া কাতর স্বরে তাহাদের নিকট কতই কাঁদিয়াছি, নিরাশ্রয় কুমারী দেখিয়া রাক্ষসেরা দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করে নাই। অনাথিনীর কাতরতায় কয় জনের দর-বিগলিত-হৃদয় দেখিয়াছ? শেষে অনাথবন্ধুর শরণ লইয়া কোনও প্রকারে চলিয়া আসিয়াছি। হৃদয়ের গভীর গুহায় নিঃশব্দে পরিপোষিত ভালবাসার কত বল; লক্ষ২ বৎসরের জন্য পরিচয় দিবার নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছি। ইহাও বলিব, কোথায়ও কুসুম-কলিকার ভ্রমরের অনুরাগ গুঞ্জনে, শ্যামল লতিকায় পাদপের সস্নেহ আলিঙ্গনে, তরু-শাখায় কলকণ্ঠ বিহঙ্গের প্রণয়-চুম্বনে উৎসাহ পাইয়াছি। শোকে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, রোগে স্বাস্থ্যে দূরে দূরে—অতি দূর হইতে তোমারই মুখখানি স্মরণ করিয়া, বুকে অপরিমিত প্রণয়-কুসুমের রাশি লইয়া, বালিকা নবপ্রণয়ের গাঢ় উচ্ছ্বাস লইয়া তোমার চরণতলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বঁধুহে, সখাহে, আমাকে চরণ তলেই ফেলিয়া রাখিলে! বুকে তুলিয়া লও না!

আমি বনমালতী, অটুট যৌবনভারে অবনত, শাখায় পাতায় প্রফুল্ল, বুকভরা মদ-গন্ধে দিগন্ত আমোদিত,—উড়ে উড়ে কত দূর হইতে মধুপগণ ছুটিয়া আসিতেছে; বাতাসে বেচারীদের উল্টে পাল্টে দিতেছে, কুয়াশা উঠে চক্ষু অন্ধ করে দেয়, পথভ্রম ঘটে, তবু আমার বুকপোরা গন্ধে সব ছুটে আসে, গুণ্ গুণ্ করে কাণের কাছে কতই প্রণয়সঙ্গীত গাহিয়া থাকে, কত কথাই বলে। দুর্ব্বল নব-বিকসিত কুমারী মল্লিকা যাতী যূথী তাদের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া যায়; আমার তাদের ক্রন্দন কাতরতায় কাতরতা হয় না; ভালবাসার উচ্ছ্বাস দেখিয়া আনন্দ হয় না; আমি অচল অটল, ইচ্ছার দৃঢ়তায় পাষাণের সমান কঠোর। এক আশায়, এক উৎ-সাহে আমায় মনুষ্যের দুর্ব্বলতার অতীত করিয়াছে। লোকের দুর্ব্বলতার পরিমাণ আমি বুঝিতে পারি না। আমি অহৃদয় নহি; যখন দুঃখ বুঝিতে পারি, তখন চোখের জলে তাদের সন্তাপের শান্তি করি, কিন্তু আমি যা বুঝিনা, তার জন্য কাতর

হই না। লোকে আমাকে তজ্জন্য অহ-ঙ্কারী বলে, গরবী বলে, কত কি বলে। তাদের নিন্দায় আমার দুঃখ হয়, আমি কাঁদি যে কেন তারা আমায় বুঝে না। যাই হউক, আমার সকল তেজ, সকল বল তোমার কাছে উঠিয়া যায়, আমি তখন ননীর পুতলীর মত গলিয়া পড়ি। তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আছি, ফুলের পরাগে তোমার বুকখানি ধূসরিত করিয়া দিতেছি, আতপতাপিত মস্তিষ্ক পল্লবে ঢাকিয়া রাখি, বায়ু-তাড়িত দেহ আপন দেহ দিয়া আচ্ছাদন করি। ফোয়ারার মত আমার ভালবাসা একটী ঊর্দ্ধ রেখায় তোমারি পানে ছুটিয়াছে। বঁধুহে! সখাহে! আমাকে বুকের বাহিরে রাখিয়াছ কেন? ভিতরে পূরিয়া লও, বুকের ভিতরে ভিতরে তোমার অন্তরের অন্তরে আমাকে লুকা-ইয়া ফেল; উন্মত্ত যুবকগণের বিড়ম্বনা হইতে আমাকে আশ্রয় দাও।

বিশাল বিশ্বব্যাপী মহাসাগর—জলে ভরা, প্রাণে ভরা, মুক্তারত্নে ভরা! তবুও তার হৃদয়ের ভিতরে কি অব্যক্ত দুর্দ্দম বাসনা। কিসের জন্য সে বুক ফুলাইয়া ফুলাইয়া উঠিয়া থাকে, ছুটিয়া গিয়া ধরণীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে, মনের কথা ফুটিতে না পারিয়া গুমরে গুমরে কাঁদে, আর লুটাইয়া পড়ে। প্রলয়ের সাক্ষী, অনন্তের আদর্শ, অতলস্পর্শ মহাসাগর;-তাহার এত চঞ্চলতা, তাহার অতলস্পর্শ বুক পূর্ণ করিয়া উছলা-ইয়া পড়ে এমন তার কিসের বাসনা? সে আর কোন দিকে যায় না কেন? তাহাকে লোভ করে জগতের কে না? রত্ন ত কাহাকে অন্বেষণ করে না, সবাইত রত্নকে অন্বেষণ করে। তবে সমুদ্র—প্রাণভরা যৌবনভরা সমুদ্র, কাহার জন্য পাগল? ধরণী—ফলপল্লব সুশোভিতা শ্যামাঙ্গিনী কোমলা কোথায় কেমনে তাহার প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে তাহার পর আর তাহার সঙ্গে কথাটীও কয় নাই; বুঝি, তাহার কথা গুলি শুনিয়াও বুঝে না—তাহার প্রাণের গভীর আশা উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রণয়োচ্ছ্বাস তর-ঙ্গায়িত করিয়াছে, মর্ম্মস্থল তাড়িতচালিত করিয়াছে; তাই সে—

আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে।

বাহুলতায় ধরণীর সমগ্র দেহ আবেষ্টন করিয়া সমুদ্রের পিপাসা মিটে নাই, চুম্বনে চুম্বনে তুফান তুলিয়াছে, তবুও ধরণী কথা কয় নাই, তাই তার পিপাসা বাড়ি-য়াছে। সে ধরণীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে চায়, দুই এক হইতে চায়, দুই খানি তনু এক করিতে চায়—

বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন শ্মশানে
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্নপ্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর!

যে যত বড় তার তত উচ্চ আশা। নির্ঝ-রিণী পর্ব্বতের পদতল হইতে বুকের উপরে উঠিতে চায়, মালতী বুকের বাহিরে থাকিতে চায় না, ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়; মহা-সমুদ্রের আশা আরো মহান—সে দুয়ে মিলিয়া এক হইতে চায়। এই খানে প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

পাষাণি,—হৃদয়ের এ মর্ম্মব্যথা কি ঘুচি-বেনা? কত কথা চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, একটা কি তার শুনিলে না? অস্ফুট অনন্ত বাসনা ফুটিয়া আর কি হইবে, আর ফুটিব না। প্রাণের আশা

নিশ্বাসের সহিত বুকের ভিতর চাপিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া চলিলাম।

এখন আমার একটী প্রার্থনা—বুকটা পাতিয়া দিই, পা দুখানি বুকের উপর চাপিয়া দিয়া বুকটা দলিয়া দাও। এ চির দিনের হুহু হুহু বাতাসের শব্দ, অনন্ত ঝটিকা আর সহে না, প্রাণ তোলপাড় হইয়াছে, আর সামলাইতে পারি না। একবার শ্যামারূপে বুকের উপর দাঁড়াইয়া, বুকের আশা ভরসার সহিত জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচাইয়া দাও—অনন্ত কাল মহাপুরুষ—যখন এতই সহিতে পারিলাম, বুকের উপরে পাইয়া ভিতরে পূরিতে চাহিলাম, সে আশা মিটাইলে না, তাহাও সহিতে পারিলাম তবে কি আমি মহাপুরুষ নহি? মহাপুরুষ শান্ত সদাশিব হইয়া, চরণ তলে পড়িয়া পড়িয়া স্তিমিত নয়নে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকি, তুমি কালী কঠোর নির্ম্মম হৃদয়ে বুকের উপর চির দিন দাঁড়াইয়া থাক, যেন কালে কালে কখন কোন বাসনা পুরুষের হৃদয়কে বিচলিত না করিতে পারে। একাকিনী অনন্তকাল হৃদয়ে রাজত্ব কর—রাধা প্রেমের কোমল বন্ধনও যেন তোমাকে বদ্ধ করিতে না পারে—কালের, স্থানের, হৃদয়ের, স্বর্গের, মর্ত্ত্যের, পাতালের অধিশ্বরী হইয়া রাজত্ব কর,—কেবল আমার চোখের উপর চোখ দুটী রাখিও, আমি মুখ খানি দেখিতে দেখিতে যেন অনন্তে মিলাইতে পারি। পাষাণি, পাষাণি, আর কিছু বলিব না।

না না—ও মুখের দিকে আর চাহিব না। আকাশের পাখী—তোমার মুখখানি দেখিয়া বাগুরায় বন্দী হইয়া ছিলাম—তুমি কঠোর চরণে বুক দলিয়া দিলেও ওমুখখানি দেখিলে আবার বুক ফুলিয়া উঠিবে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমার বন্ধন ঘুচাইয়া দাও, আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, সর্ব্বনাশি, আমাকে গৃহবাসী কেন করিয়াছ? ছেড়ে দাও, চলে যাই; এমোহ ভাঙ্গাইয়া দাও, এ মায়া কাটাইয়া দাও। যদি তোমাতেই মিশিতে না পাইলাম, অনন্তেও মিশিতে চাহি না। ছেড়ে দাও, চোক বুজিয়া ধরণীর শান্তিময় ক্রোড়ে প্রবেশ করি। এ তুফান সহেনা! বড় জ্বলিয়াছি। চলিলাম, চলিলাম। পাষাণি, পাষাণি, তুই একাকিনী সুখে থাক্। মরণেও তোর মঙ্গল কামনা করিব। চলিলাম,—

"জগতের মরুভূমে, দ্বিপ্রহরে রবিতাপে
শুষ্ক কণ্ঠে করিতে চীৎকার
সে পাষাণী কোথায় আমার?"

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা। (৫ম)

টোল ও চতুষ্পাঠী।

পরমানন্দ দাস (কবিকর্ণপুর) ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কাঞ্চনপল্লী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্য জাতীয় শিবানন্দ সেনের পুত্র। কাব্য রচনায় তাঁহার অসীম চাতুর্য্য ও কৌশল সন্দর্শনে চৈতন্যদেব তাঁহাকে কবিকর্ণপুর উপাধি প্রদান করেন। কবিকর্ণপুর অলঙ্কার কৌস্তভ নামক অলঙ্কার,—চৈতন্য

চন্দ্রোদয় নামক নাটক,—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা নামক চৈতন্যবিষয়ক খণ্ড-কাব্য,—বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা নামক কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ, আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ্যগদ্যময় কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের টীকাকারের নাম বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী।*

স্মার্ত্ত চূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে জন্মেন, কি স্থানান্তর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার পূর্ব্বে মিথিলায় দায়ভাগ-প্রণেতা ও ধর্ম্মরত্ন নামক স্মৃতি গ্রন্থের সংগ্রাহক জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহ-কারগণের ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশে কর্ম্ম কাণ্ড প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হইত। রঘুনন্দন স্বকৃত ব্যাখ্যাদ্বারা প্রাচীন স্মার্ত্তগণের মতের দোষ প্রদর্শন করিয়া, সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রকে শুদ্ধি প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত ও সংগৃহীত করেন। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র পূজা বিবাহাদি কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার মত অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে। অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের দুই খানি টীকা প্রচলিত আছে। একখান গোঁসাই ভট্টাচার্য্য প্রণীত, অপর খানি কাশীরামী টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নৈয়ায়িক-শিরোমণি রঘুনাথ (কাণাভট্ট শিরোমণি) স্বীয় অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও তর্কপ্রভাবে ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক মিথিলা প্রদেশের অবিসংবাদিত প্রাধান্য খর্ব্বীকৃত করিয়া নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মিথিলাই ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রধানতম স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া মিথিলার চতুষ্পাঠী সমূহে দর্শন ও স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ততার্কিক, নৈয়ায়িক ও দার্শনিক মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার বিমল যশঃপ্রভাব দিগ্‌দিগন্তে বিস্তারিত করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ন্যায়-শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করিয়া আসিয়া-ছিলেন। রঘুনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব মানসে তথায় গমন করেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সেই সময়ে মিথিলাতে পক্ষধর মিশ্র নামে এক অলৌকিক প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বর্ত্তমান ছিলেন। রঘুনাথ প্রথমে তাঁহার সুপণ্ডিত শিষ্যগণকে, তদনন্তর সেই দিগন্তবিশ্রুত-কীর্ত্তি দিগ্‌বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপককে বিচারে পরাভূত করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করেন। তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রঘুনাথ চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ন্যায়শাস্ত্রের একমাত্র অধ্যয়ন-স্থান বলিয়া নবদ্বীপ গণ্য হইতে লাগিল। মিথিলার যশঃপ্রভা দিনে দিনে ম্লান ও হীনপ্রভ হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা ও ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক নানা গ্রন্থ বির-

---

* শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম ভাগ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-দিগের গ্রন্থাবলী, ১২৭—১৫৪ পৃষ্ঠা।

চিত হইতে আরম্ভ হয়। রঘুনাথ তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের দীধিতি (চিন্তামণি-দীধিতি বা শিরোমণি) নামক টীকা, বৌদ্ধাধিকারের টীকা এবং অনেক বাদার্থ রচনা করেন।

রঘুনাথ শিরোমণির পর রামভদ্র সিদ্ধান্ত, উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির রামভদ্রীয় নামে টীকা রচনা করেন। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ রঘুনাথ প্রণীত দীধিতি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাম তর্কালঙ্কার নামক জনৈক ছাত্র স্বীয় প্রতিভা ও বিদ্যাবলে রঘুনাথ শিরোমণির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। প্রবাদ আছে যে, কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বশতঃ তিনি গুরুদেবের বিরাগ-ভাজন হন। অধ্যাপক রঘুনাথ প্রিয়তম শিষ্য শ্রীরামকে সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গণ্ডমূর্খ ছিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও আদর করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নিজে কোনও রূপে না লইয়া, মরণ সময়ে স্বীয় ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রকে তাহার প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন। শ্রীরাম-তনয় ন্যায়শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ থাকায়, পিত্রাদেশ প্রতিপালনার্থ পিতৃগুরু রঘুনাথ শিরোমণিরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। রঘুনাথের নিকট পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবৎসল শ্রীরাম-তনয় দীধিতির টীকা প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি সমগ্র তত্ত্বচিন্তামণির বিশদ টীকা প্রণয়ন পূর্ব্বক পিতৃদায় হইতে মুক্ত হন। রঘুনাথের দীধিতি চিন্তামণির প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের হেত্বাভাস প্রকরণ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি স্থানে স্থানে 'জানন্তি কেচিৎ হেত্বাভাসন্তং' বলিয়া গুরু রঘুনাথের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকা রঘুনাথের দীধিতি অপেক্ষা স্পষ্ট ও বিশদতর। শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের এই গুণধর পণ্ডিতাগ্রণী তনয়ের নাম মথুরানাথ তর্কবাগীশ। তাঁহার প্রণীত টীকা মাথুরানাথী টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাথুরানাথী দীধিতির ও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা নৈয়ায়িক-শিরোমণি জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের মণিদীধিতিপ্রকাশিকা ও গদাধর ভট্টাচার্য্য বিরচিত টীকা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। জগদীশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নামক সুপ্রসিদ্ধ বাদার্থ গ্রন্থ প্রণেতা। গদাধর শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, ও বুৎপত্তিবাদ রচনা করত রঘুনাথকৃত বৌদ্ধাধিকারের টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। *

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও রঘুনাথ শিরোমণির প্রাদুর্ভাব-সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে একজন অসাধারণ তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আবির্ভূত হন। তিনি বহুবিধ তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে তন্ত্রসার সঙ্কলন পূর্ব্বক আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপে বিবিধ গ্রন্থ রচিত ও সঙ্কলিত হইতে আরব্ধ হইল। চতুষ্পাঠীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চতুষ্পাঠীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা অঞ্চল হইতে বিদ্যার্থীগণের সমাগম-স্রোতও বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পাঠ সমাপন করিয়া,

* Dr. Mitra's Notices of Sanskrit. Mss. vol. I. p. 286.

এই খানেই অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হই লেন। নবদ্বীপের বিদ্যোৎসাহী রাজারা অধ্যাপকগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ছাত্রমণ্ডলীকেও ছাত্রবৃত্তি প্রদানাদি বিবিধ প্রকারে সংস্কৃতের উন্নতির প্রতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র অদ্বিতীয় স্থান হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল।

নবদ্বীপের নরপতিগণ শাণ্ডিল্যগোত্রজ বেণীসংহার নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটক-প্রণেতা স্বনামখ্যাত ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা নানা অঞ্চল হইতে বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণকে আনাইয়া রাজধানীতে সমাদরে রাখিতেন, অথবা স্বীয় অধিকারমধ্যে সংস্থাপন করিতেন। তাঁহারা টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণকে তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী ভূমি প্রদান করিতেন, এবং পাঠার্থীগণের আবশ্যকীয় ব্যয়ের নিমিত্ত প্রত্যেক টোলে কিছু কিছু বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। যখন কোন ছাত্র পাঠ সমাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিবার মানস করিতেন, তখন তিনি রাজসভায় সমাগত হইয়া আপন বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। অধ্যাপনক্ষম হইলে তিনি নিয়মিত বৃত্তি পাইতেন। পুরাণব্যবসায়ী পাঠকগণ অধ্যয়ন সমাপ্তি করিয়া, রাজসন্নিধানে পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক উপাধি গ্রহণ করিতেন। পুরাণেতর শাস্ত্রশিক্ষার্থীগণও সময়ে সময়ে রাজসমীপে আসিয়া স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিতেন। রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। সময় সময় রাজারা চতুষ্পাঠীতে যাইয়া অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহারা নানা উপায়ে পণ্ডিতগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা সভাস্থ ও অভ্যাগত পণ্ডিতগণের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রের আলাপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ রাজসদনে উপস্থিত হইতেন। রাজারা তাঁহাদিগকে গুণানুরূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়া সসম্মানে বিদায় দিতেন। ইঁহারা যে স্বদেশীয় পণ্ডিতগণেরই আনুকূল্য করিতেন, এমন নহে। বিদেশীয় ও ভিন্ন অধিকারবাসী প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণেরও নানাপ্রকারে উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। বাক্‌লা, বিক্রমপুর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের পণ্ডিতগণ ইঁহাদের নিকট যে ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছেন, অধুনাও তাঁহাদের বংশীয়েরা তাহা ভোগ করিতেছেন।

রাজারা স্ব স্ব সন্তানগণকে সংস্কৃত সাহিত্যাদি শিখাইতে বিশেষ যত্নবান হইতেন। তাঁহারা সংস্কৃতে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিতেন যে, অনায়াসে সুন্দর সুন্দর শ্লোক সংস্কৃতে রচনা করিতে পারিতেন। রাজবাটীতে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বদা এতদূর ব্যবহৃত হইত যে, রাজপরিচারকের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে কথোপকথন বেশ বুঝিতে পারিত। *

---

*শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত ৪৮—৫০,

ভট্টনারায়ণ হইতে একবিংশতিতম বংশধর ভবানন্দ মজুমদার রাজোপাধি সহ চতুর্দ্দশ পরগণার আধিপত্য দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীর হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভবানন্দের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামজীবন ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বিদ্যোৎসাহী ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা এ প্রদেশে বিদ্যার উন্নতি সাধন বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী ও যত্নবান ছিলেন। তিনি অধ্যাপকগণের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদিগকে ভূরি ভূরি নিষ্কর ভূমি দান করেন। নবদ্বীপে বিদেশীয় ছাত্রদিগের ব্যয়ের নিমিত্ত তিনি অনেক টাকার সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াদেন। যখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত জমীদারী দশসালা বন্দোবস্ত হয়, তখন যে সম্পত্তির আয় হইতে রাজারা ঐ টাকা দিতেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বহস্তে লইয়া অধ্যাপকগণকে সরকারী রাজকোষ হইতে মাসিক দুই শত টাকা দিবার বন্দোবস্ত করেন। অদ্যাপি অধ্যাপকেরা নদীয়া জেলার কলেক্টরী হইতে মাসিক এক শত টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা নানাবিধ বিদ্যা-বিশারদ বহু পণ্ডিত দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। তাঁহার সময়ে (১৭১০-১৭৮২) নবদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন —সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত গোপাল ন্যায়লঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, —ষড়দর্শনবিৎ শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ বর্ত্তমান ছিলেন। গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়ত রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ রাজার আহ্বান অনুসারে উপস্থিত হইতেন। রাজা ইঁহাদিগকে ও বিদেশীয় অভ্যাগত পণ্ডিতবর্গকে বহু যত্ন ও সমাদর সহকারে রাখিয়া, তাঁহাদের সহিত নানা শাস্ত্রের আলাপ ও বিচার করিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিতেন।

বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রায় নিরন্তর রাজসদনে থাকিয়া, প্রসঙ্গানুসারে বিবিধ ভাবের কবিতা রচনা পূর্ব্বক রাজা ও অপরাপর শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড় ও হাস্যার্ণব, ইঁহারাও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এদেশে যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার যেরূপ

৬৩৭—৩৮ পৃষ্ঠা। কার্ত্তিকেয় বাবু বহুবৎসর পর্য্যন্ত নবদ্বীপের রাজসংসারে দেওয়ানী করিতেন। তৎকৃত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত নামক নদীয়া রাজবংশের উৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ্চা সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় সংগৃহীত হইল।

অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল—তাহাতে বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিগর্হিত রীতি নিরসন পূর্ব্বক অনেক সমাজের কল্যাণকর রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সামাজিক কুরীতি সংশোধনে হস্তক্ষেপ করা কখনও স্বীয় কর্ত্তব্য মধ্যে গণনা করেন নাই। প্রথিত আছে, বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণবয়স্কা কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা দূরীকরণ মানসে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরীতে নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। রাজা শিব চন্দ্র সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যে সকল পণ্ডিতগণ এতদ্দেশে বিদ্যাজ্যোতি বিকীরণ করিতেছিলেন, তাঁহার সময়েও তাঁহাদের অধিকাংশই বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা শিবচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশান চন্দ্র তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র ঈশ্বর চন্দ্রের বিরুদ্ধে নবদ্বীপের জমীদারী সম্পর্কীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্র শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে নালিশ উপস্থিত করেন। বিচারপতি এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ জ্ঞাত হইবার জন্য উভয় পক্ষকে কতিপয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। তদনুসারে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র নবদ্বীপনিবাসী কৃপারাম তর্কভূষণ, ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কলিকাতা সভাবাজার নিবাসী হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম—এই তিনজন পণ্ডিতের নাম লিখিয়া দেন। তাঁহারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকৃত দানপত্র শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দেন। এই মোকদ্দমার সময় মুরসিদাবাদের গৌরহরি, দিনাজপুরের সদাশিব, শম্ভুনাথ, গোকুলচন্দ্র ও কালীশঙ্কর শর্ম্মা, ঢাকার রামজীবন বিদ্যালঙ্কার রামনাথ বিদ্যাভূষণ, মহাদেব পঞ্চানন, পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ও রঘুনাথ বাচস্পতিও —ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা প্রেরণ করেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে বিনয় বাচস্পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সারদামঙ্গল নামে একখান সংঙ্গীতগ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচনা করেন। কৃষ্ণনগরের গোপ, তৈলকার ও আচার্য্য ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল গীত গাইয়া বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করিত। রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ,—রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামদাস সিদ্ধান্ত, কালীকিঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, কৃপারাম তর্কভূষণ প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্মার্ত্তগণ বর্ত্তমান ছিলেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও শান্তিপুরবাসী রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও তদানীং বিদ্যমান ছিলেন।

রাজা গিরীশচন্দ্র যদৃচ্ছা ব্যয় করিয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অনর্গল কহিতে ও অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি স্মার্ত্তাচার্য্যগণ নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বাড়েবাঁকা গ্রামবাসী কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (রসসাগর) নামক একজন অসা-

ধারণ সুরসিক, সদ্বক্তা ও দ্রুতকবি তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন।

রাজা শ্রীশচন্দ্র বাল্যাবস্থায় সংস্কৃতশাস্ত্র ভালরূপে শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু যৌবনে স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ও পণ্ডিতগণের সহিত তাহার আলোচনা করিয়া এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, প্রায় সকল প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থেরই মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার বহুল প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও যত্ন ছিল। বার্ষিক বৃত্তি প্রভৃতি দিয়া তিনি টোলের অধ্যাপকগণের যথাসাধ্য আনুকূল্য করিতেন।

নবদ্বীপাধিকারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য, ঘটক ও কুলজ্ঞদিগের সন্তানেরা প্রায় সকলেই বাল্যাবস্থায় সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভাষা অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কামালপুর, কুমারহট্ট, শান্তিপুর উলা, বাহিরগাছি, বিল্বপুষ্করিণী, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি কয়েক স্থানে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। বিদ্যার্থীগণ নানা প্রদেশ হইতে ঐ সকল স্থানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টোল ছিল। তন্নিকটবর্ত্তী শিক্ষার্থীরা ঐ সকল গ্রাম্য টোলেই অধ্যয়ন করিতেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের অধিক বিদ্যালাভের অভিলাষ হইত, তাঁহারা ঐ সকল টোলে কিয়দ্দূর পাঠ সমাপন করিয়া, প্রাগুক্ত কোন এক স্থানের টোলে প্রবিষ্ট হইতেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ধর্ম্মালোচনা ও গ্রন্থরচনা—এই সকল অনুষ্ঠানেই জীবন যাপন করিতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের দান গ্রহণ করিতেন না। তাঁহাদের সংসারযাত্রা ও ছাত্রগণের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবদ্বীপের রাজারা যে কিছু ভূমি দান বা বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা পরিতুষ্ট থাকিতেন।'

"পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সমূহে পূর্ব্বে সংস্কৃতের যেরূপ আলোচনা ছিল, ইদানীং আর সেরূপ নাই। কোন স্থানের টোল চতুষ্পাঠী এককালে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কোন স্থানে উহা অতি সামান্যাবস্থায় রহিয়াছে। নবদ্বীপের রাজারা নিঃস্ব হওয়াতে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণ ইদানীং পূর্ব্ববৎ রাজদত্ত আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এদিকে বিষয়ী লোকদিগের ন্যায় তাঁহাদের ভোগাভিলাষও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র অধ্যাপনা আরম্ভ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পাইয়া অর্থলাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়েই তাঁহাদের মন ধাবিত হইতেছে। এ কারণ অধুনা ছাত্রগণ ব্যাকরণ, অভিধান, ভট্টিকাব্য ও নৈষধ-চরিতের কিয়দংশ পাঠ করিয়া কেহ বা স্মৃতি শাস্ত্র, কেহ বা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির কিয়দংশ অথবা ন্যায়শাস্ত্রের দুই এক খণ্ডের মাথুরী ও জাগদীশী টীকা এবং গাদাধরী পাতড়া পাঠ করিয়াই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। আর যাহাতে অধিক নিমন্ত্রণ-পত্র পান এবং সভায় বৃথা বাগ্বিতণ্ডা পূর্ব্বক জয়ী হইতে পারেন, তৎপ্রতি ঐকান্তিক যত্ন করিতে থাকেন; এদিগে অনেক মূলগ্রন্থ তাঁহাদের নয়ন-গোচরও হয় না।

অধুনা (১৯৩২ সংবৎ) কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ ব্যতীত এ অঞ্চলে নবদ্বীপ

ও ভাটপাড়ায় সংস্কৃত শাস্ত্রের অধিক আলোচনা আছে। যদিও ইদানীং নবদ্বীপে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের তুল্য অধ্যাপকের অভাব হইয়াছে, তথাপি নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থীরা তথায় আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে নবদ্বীপে স্মৃতির ৯, ন্যায়শাস্ত্রের ৭, এবং বেদান্তাদি অপরাপর দর্শনের ১ খানি টোল আছে।' *

প্রস্তাব ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া উঠিল। টোল ও চতুস্পাঠী সম্বন্ধে আমাদের আরও যাহা যাহা বক্তব্য আছে তাহা প্রস্তাবান্তরে সন্নিবেশ করিতে বাসনা রহিল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র দাস।

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
আজ কাল করি কত, বছর হইল গত,
চাহিয়া রয়েছি পথ সতত আশায় !
কোথায় গিয়েছ ভাই, তত্ত্ব নাই—বার্ত্তা নাই,
এমন করিয়া নাকি কেহ কোথা যায় ?

১

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
তুমি ভিন্ন নাহি আর, শূন্য মম এ সংসার :
জগতের বন্ধু হ'য়ে জগদ্বন্ধু ! হায়,
দাদারে একাকী ফেলি, বল্ ভাই কোথা গেলি,
হলনা একটু দয়া পাষাণ হিয়ায় ?

২

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
আকুল উন্মত্ত প্রাণে, চেয়ে আছি পথপানে,
লইয়া শ্মশান বুকে, মুখে হায় হায়,
ঢালিয়া নয়নজল, নাহি নিবে এ অনল,
আয়রে প্রাণের ভাই আয় বুকে আয় !

৩

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
তোমারে হইয়ে হারা, পিসী মা পাগল পারা
দিবা নিশি অভাগিনী করি হায় হায়,
তোমারি উদ্দেশে গেছে, আর নাহি আসিয়াছে,
ভুলিয়া রয়েছে বুঝি পাইয়া তোমায় !

৪

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
ত্যজিয়া মরত ভূমি, কোথায় গিয়েছ তুমি,
কোথা সে স্বর্গের রাজ্য—কত দূর হায়,
শুধাই কাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
সে দেশে এ দেশে লোক নাহি আসে যায় ?

৫

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
ফুটিলে কুসুম রাশি, পরিমলমাখা হাসি
স্বর্গের সুগন্ধ ভাবি মাখা তার গায়,
শুধাই তাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
দেখেছে দেবের দেশে দেবতা তোমায় ?

৬

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বসিয়া বকুলশাখে, কোকিল যখন ডাকে
উন্মত্ত করিয়া চিত্ত স্বর্গীয় ভাষায়,
শুধাই তাহার কাছে, কোথা হ'তে আসিয়াছে,
দেখেছে কি ভাই তোরে—হায় হায় হায় !

---

* ক্ষিতীশবংশাবলি চরিত, ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা।

৭

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
ঊষায় উঠিলে রবি, সুন্দর সোণার ছবি,
ভাবিয়া স্বর্গের দূত শুধাই তাহায়,
"দেখেছ কি হে দিনেশ! কোথা সে ত্রিদিব দেশ
প্রাণের সোদরে মম দেখেছ তথায় ?

৮

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বরষি অমৃত কর, আসে যবে সুধাকর,
ভাবিয়া ত্রিদিববাসী দেবতা তাহায়,
শুধাই তাহার কাছে, সেকি কভু দেখিয়াছে
দেব-বালকের সনে দেবের সভায় ?"

৮

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
শীতল মলয়ানিলে, ধীরে অঙ্গ ছুঁয়ে দিলে,
স্বর্গীয় পরশে উঠে শিহরিয়া কায়,
অমনি আকুল মনে, শুধাই সে সমীরণে
স্বর্গের সংবাদ দিতে এসেছ আমায় ?

১০

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
সায়াহ্নে সুনীলাকাশে, যখন তারকা হাসে
ব্যাপিয়া অসীম সীমা স্বর্গীয় শোভায়,
শুধাই তাদের কাছে, কে তোমারে দেখিয়াছে
কোথা সে ত্রিদিব দেশ হায় হায় হায় !

১১

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
যেখানে মায়ের কাছে, সারদা প্রমদা আছে
ভগিনী জনকদেব বিরাজে যথায়,
সেখানে গে'ছ কি তুমি, ত্যজিয়া মরত ভূমি
ফেলিয়া দাদারে তব একা—অসহায় ?

১২

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বসিয়ে মায়ের কোলে, জনকের স্নেহবোলে
সারদার প্রমদার প্রীতি মমতায়,
ভুলে কি রহিলে ভাই.দাদা ব'লে মনে নাই,
অথবা আসিতে তারা দিল না তোমায় ?

১৩

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
শুধাইও মার কাছে, আমারে কি মনে আছে
তোর মত করে কোলে করিতে আমায় !
শুধাইও সারদারে, এত ভালবাসি যারে,
ভুলিয়া করে কি মনে দেবের দয়ায় ?

১৪

ভাই গিয়াছ কোথায় ?
যদিও দেবের দেশ,নাহি দুঃখ—নাহি ক্লেশ,
চিরশান্তি চিরসুখে পূর্ণ সমুদায়,
জনক জননী আছে, কি ভয় তাদের কাছে,
আদরে সারদা সদা রেখেছে তোমায় !
এদেশে কেহই নাই, শুধু ছিনু দুটী ভাই,
আত্মীয় বান্ধবে পূর্ণ রয়েছ তথায় !
তথাপি আকুল মন, তবু চিন্তা অনুক্ষণ,
জানিতে কুশল তব প্রাণ সদা চায়,
ভাই গিয়াছ কোথায় ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা। (৪র্থ)

(ধর্ম্ম)

হিন্দুধর্ম্মের বৈদিক, বৈদান্তিক অথবা ঔপনিষদিক এবং পৌরাণিক এই অবস্থা-ত্রয় অতিক্রম করিয়া এখন আমরা ইহার তান্ত্রিক যুগে পদার্পণ করিতেছি। বৈদিক-কালে হিন্দুধর্ম্মের কোমল কৈশোর দশায় অগ্নি, দ্যৌঃ, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ-পুঞ্জের উপাসনাপূর্ণ সরল এবং সুললিত কবিতাময় ঋকমালার মধ্যেও আর্য্য ঋষি-গণের অন্তরে অল্পে অল্পে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি এবং এমন কি ইহাও দেখিতে পাইয়াছি যে,সেই সকল ঋষিগণ বিশ্বকারণ পরমেশ্বরের মূলতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত না হইয়াও পূর্ব্বোক্ত আরাধ্য পদার্থ সকলের প্রতি বিশ্বকারণের স্বরূপাবলী আরোপিত করিতে নিরস্ত হয়েন নাই। বৈদান্তিক যুগে উপনিষদের রত্নময় কোষাগার সকলের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের সুন্দর এবং সতেজ আলোক অতি পরিস্ফুট রূপে বিকীর্ণ করিয়াছেন এবং পুরাণে নানা দেব দেবী ও মত-বিসম্বাদের কোলাহলের ভিতরেও পরব্রহ্মের সিংহাসন সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের এই বিগত তিন অবস্থার মধ্যে কোন না কোন রূপে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই প্রাধান্য—ব্রহ্মোপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমরা দেখিব তন্ত্রকার ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মকে কি অবস্থায় অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। তন্ত্রের ভাষা এবং বর্ণিত বিষয় সকলের প্রতি বিশেষ অবধানপুরঃসর দৃষ্টিপাত করিলে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এত আধুনিক যে কোন কোন খানিকে মুসলমানরাজত্বকালে, কোন খানিকে বা ইংরাজ রাজত্বকালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। অমরকোষনামক বিখ্যাত অভিধানের স্বর্গবর্গে তন্ত্র শব্দের নামোল্লেখ নাই; ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে—অমরকোষের রচনাকালে তন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। কোন কোন তন্ত্র যে মুসলমান এবং ইংরাজ-রাজত্বকালে রচিত হইয়াছে, পশ্চাল্লিখিত বাক্যে তাহা সুন্দররূপে প্রতীত হয়। যথা—

পশ্চিমাম্নায় মন্ত্রাস্ত প্রোক্তাঃ পারস্য ভাষয়া।
অষ্টোত্তরশতাশীতি যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
পঞ্চ খানা সপ্তমীরা নবসাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম্মপ্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ॥

অর্থাৎ—পশ্চিম বেদে একশত অষ্টাশীতি মন্ত্র পারস্য ভাষায় কথিত হইয়াছে, যাহার সাধন করিয়া কলিকালে খাঁ উপাধিধারী পাঁচজন, মীর উপাধিধারী সাত জন এবং সাহ উপাধিধারী নয়জন মহাবল ও হিন্দুধর্ম্মসংহারক সম্রাট হইবে।

পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গি ভাষয়া মন্ত্রা স্তেষাং সংসাধনাৎকলৌ।
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥

অর্থাৎ—পূর্ব্ব বেদে নয় শত ছিয়াশীটি মন্ত্র ফিরিঙ্গি ভাষায় (ইংরাজিতে) কথিত

হইয়াছে; তাহা সাধন করিয়া কলিকালে নয়, ছয় ও পঞ্চ জন যুদ্ধে অপরাজিত লণ্ড্র-দেশোৎপন্ন (লণ্ডনজাত) ইংরাজ মণ্ডলেশ্বর হইবে।

এই সকল তন্ত্রোক্ত বচনে যখন মুসলমান সম্রাটদিগের খাঁ, মীর, সাহ প্রভৃতি উপাধি, তাহাদিগের সাম্রাজ্য এবং হিন্দু-ধর্ম্মবিনাশের কথা, ইংরাজ জাতি, তাহাদিগের ভারতআক্রমণ, লণ্ডন নগর এবং নিতান্ত আধুনিকতার পরিচয় স্বরূপ ফিরিঙ্গি শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ সকল তন্ত্র ইংরাজও মুসলমানরাজত্বের সময় বিরচিত। তৃতীয়তঃ তন্ত্র সকল যে নিতান্ত ইদানীন্তন কালের শাস্ত্র, তাহার কারণ এই যে তন্ত্র-বিশেষে অতি অল্পকালপ্রচারিত কোন কোন দেবীপূজার বিধি নিবদ্ধ আছে। বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত শ্যামা-পূজা ও জগদ্ধাত্রী-পূজা তন্ত্রানুমোদিত পূজা। এই উভয় পূজাই অতি অল্পকাল হইল বঙ্গভূমিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নবদ্বীপ-নিবাসী আগম বাগীশ নামক জনৈক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের দ্বারা শ্যামা-পূজা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রীপূজা প্রচলিত করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে এই দুই পূজা বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই দুই দেবী-পূজা ইদানীন্তন সময়ে বঙ্গসমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক এই দুই ব্যক্তি যে এই দেবীদ্বয়ের নবারাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার দৃঢ়তা ও চিরস্থিতি সাধনের নিমিত্তও তাহাদিগের মহিমা ও প্রাধান্য সংস্থাপন উদ্দেশে অনেক স্তুতিকর বচনাবলী রচনা করিয়া তন্ত্রের কলেবর পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চতুর্থতঃ আর একটী কারণের দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয়। সেটী এই যে তন্ত্রের প্রভুত্ব এবং প্রাধান্য বঙ্গদেশে যে পরিমাণে প্রচলিত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সে পরিমাণে প্রচলিত নয়; এমন কি কোন কোন স্থানে তন্ত্রের কিছুমাত্র প্রাধান্য নাই। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি, যে সকল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন, সে সকল গ্রন্থের প্রভুত্ব ভারতের সকল প্রদেশে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখাইতেছি যে নবদ্বীপের স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যসঙ্কলিত অষ্টাবিংশতিতত্ব নামক স্মৃতি গ্রন্থ, যাহার বিধি ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গীয় সমাজের শ্রাদ্ধ উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সকল ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহিত হয়, সেই অষ্টাবিংশতি-তত্বের মত ও অনুসাশন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের নানা খণ্ডে অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত রহিয়াছে। আজিও পূর্ব্বোক্ত প্রদেশবাসী লোকদিগের সামাজিক অনুষ্ঠান সকল প্রাচীন স্মৃতি মনুসংহিতানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা-বাণী সকল বঙ্গদেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ; হিন্দু সমাজের এক সামান্যাংশেই পরিগৃহীত; আজিও তাহা হিন্দুসমাজের বিশালতর খণ্ডে অধিকার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। নব্যতর কালের বিরচিত শাস্ত্র সকলকে ভারতের সকল খণ্ডের লোক গ্রহণ করেন নাই, সেই জন্য তন্ত্রের প্রভুত্বশক্তি বঙ্গসমাজমধ্যেই

পরিব্যাপ্ত। যাহা হউক এখন বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল যে, তন্ত্র সকল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন সময়ের গ্রন্থ। সমগ্র তন্ত্রই যে আধুনিক কালের সঙ্কলিত তাহা নয়। যাবতীয় তন্ত্রই যখন কোন এক বিশেষ নির্দ্দিষ্টকালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন সমগ্রাংশকেই কিরূপে অপ্রাচীন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে? তন্ত্রের কোন কোন খণ্ডকে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সময়ের সঙ্কলিত বলিয়া বোধ হয়। এখন বিচার্য্য এই যে তন্ত্রশাস্ত্রের রচয়িতা কে? বেদ সম্বন্ধে যেমন চিরপ্রবাদবাক্য আছে যে,সকল বেদই প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখপ্রসূত, পুরাণের বিষয়েও যেমন চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী আছে যে সমগ্র পুরাণসংহিতাই মুনিপুঙ্গব ব্যাসের বিরচিত,তন্ত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ এক পরম্পরাগত প্রবাদ আছে যে, সকল তন্ত্রই পার্ব্বতীপতি মহাদেবের সঙ্কলিত। তন্ত্রোক্তি সকল শিবোক্তি ভিন্ন কিছুই নহে, এ কথাতে বঙ্গদেশের দৃঢ় বিশ্বাস। তন্ত্রের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিব পার্ব্বতীকে "হে দেবি! হে মহেশ্বরি!" ইত্যাদি কথা সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; ইহাতে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, তন্ত্র সকল মহাদেব ও পার্ব্বতীর কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। লোকপতি ব্রহ্মার বিরচিত বলিয়া বেদচতুষ্টয় যেমন একেবারেই ভ্রমপ্রমাদশূন্য অভ্রান্ত, বেদের সকল কথাই ধ্রুব এবং সত্য, সেইরূপ তন্ত্রোল্লিখিত বিষয় সকলও শিববাক্য বলিয়া একেবারেই ভ্রমবিরহিত। বেদবাক্যের প্রতি অবমাননাতে যেরূপ ব্রহ্মার অবমাননা, তন্ত্রোক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবমাননাতে ও সেইরূপ মহাদেবের অবমাননা। তন্ত্রকে বেদের সহিত তুল্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তন্ত্রকারগণ যে অসামান্য চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তন্ত্র সকল যে শিবোক্তি নয়, তন্ত্রই তাহার মুখ্য প্রমাণ;—কারণ মনোনিবেশের সহিত পাঠ করিলে, বিষয় বিশেষের উপর তন্ত্রের বিভিন্ন স্থলে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কখনই বোধ হয় না যে,ঐ সকল এক ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত। ব্যক্তিবিশেষের মত কোন বিষয় বিশেষের উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যক্ত করা যদ্যপি যুক্তি ও মানবপ্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ ব্যাপার হয়, তবে তন্ত্রকেও ব্যক্তিবিশেষের বিরচিত বলিয়া ঘোষণা করাতে যে সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করা হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানবচিত্তের চিন্তা এবং বিচারশক্তির গতিই এই প্রকার যে, তাহা বিষয় বিশেষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও বিধি নিষেধের পক্ষে কখন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত ও ব্যবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে না। যাহা হউক এবিষয়ে আমরা আর সময়ক্ষেপ না করিয়া পাঠক মাত্রকেই অনুরোধ করি যে, তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রয়াস ও শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক মনোনিবেশের সহিত তন্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া দেখিবেন যে, আমাদের সহিত কখনই তাঁহাদের মতের বিরোধ উপস্থিত হইবে না। এই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থমালা যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুচিও প্রকৃতিসম্পন্ন পণ্ডিত মণ্ডলীর ভাব, চিন্তা এবং কল্পনাপ্রসূত পদাবলীতে পূর্ণ

হইয়া অবশেষে তন্ত্র নামে অভিধেয় হইয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

তন্ত্রের প্রতি নেত্রপাত করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তন্ত্রকার পণ্ডিতগণ যেন অনেক স্থলে বেদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। বৈদিক সন্ধ্যা ও বেদবর্ণিত গায়ত্রীই আবহমান কাল হিন্দু সমাজে প্রচলিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তন্ত্রকারগণ বেদোক্ত সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে, আর এক প্রকার অভিনব সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর সৃজন করিয়াছেন। বেদের সহিত প্রতিযোগিতা বা সমবায়িতা সাধনই যে এই অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তনের মূল তাহাতে আর সন্দেহ কি? অধিক কি, বেদশাস্ত্রের প্রাধান্য এবং প্রভুত্বশক্তিকে পর্য্যুদস্ত ও বিলুপ্ত করিবার জন্যই যে এক প্রকার তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা বলিলেও আমাদিগকে অত্যুক্তিবাদজনিত দোষে দূষিত হইতে হয় না। তন্ত্রের সাধনপ্রণালী, ধর্ম্মপ্রণালী, নীতি ও ব্যবস্থা সকলের সহিত বৈদিক ধর্ম্মপ্রণালী ও ব্যবস্থার যে কিছু মাত্র সামঞ্জস্য আছে, তাহা বোধ হয় না। মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মসংস্করণব্রতে ব্যাপৃত হইয়া অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে "বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রায় বঙ্গসমাজে দেখা যায় না, সকলেই তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া ব্যস্ত।" বাস্তবিক তৎকালে বঙ্গসমাজে বেদের প্রভুত্ব একেবারেই তিরোহিত হইয়াছিল। কেবল সে সময়ে কেন? তন্ত্রের প্রবর্ত্তনাবধিই এদেশে বেদাধ্যয়ন ও বেদানুশীলন ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এরূপও বলা যায় যে, তন্ত্রকারগণ বেদের মহিমা ও প্রাধান্যকে খর্ব্ব করিয়া সেই আসনে তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বেদের সহিত প্রতিযোগিতা সাধন করিয়া বেদপ্রভাব পরাহত করা যে তন্ত্র সৃষ্টির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং তন্ত্র সকলকে শিবোক্তি বলিয়া বর্ণনা ও ঘোষণা করা যে এই উদ্দেশ্য সাধনের একটি অন্যতর উপায় তাহাও আমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছি।

বৈদিক ব্রাহ্মণ বিভাগের মধ্যে পৌরহিত্যপদের যেরূপ প্রবল প্রতাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্ত্রের মধ্যেও সেইরূপ গুরুপদবীর অযথোচিত প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কুলার্ণব তন্ত্রের কয়েকস্থল উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকবর্গের নিকট তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

দেবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

অর্থাৎ—দেবতা রুষ্ট হইলে গুরু পরিত্রাণ করেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহ পরিত্রাতা নাই।

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্য দেবতাঃ।
প্রযাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥

অর্থাৎ—গুরু সন্নিকটে থাকিতে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সে ঘোর নরকে গমন করে এবং সে পূজা বিফল হয়।

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিন্তু কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করে সে নরকে গমন করে। এই সকল উক্তিদ্বারা সুস্পষ্টরূপে বোধ হইতেছে যে তান্ত্রিক সময়ে গুরুপদের

প্রভুত্ব সীমা ও পরিমাণ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসমাজে গুরুবাদ যে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে, তাহার ফল এই সকল তন্ত্রোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রাদি সকল জাতির মধ্যেই যে গুরুদীক্ষা-প্রথা প্রচলিত আছে, ইহা হিন্দু সমাজের চিরাগত প্রথা নয়। তন্ত্রোল্লিখিত গুরুবাদ অবলম্বনেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্ত্রের মধ্যে কতক গুলি বীজ মন্ত্র আছে, গুরুগণ শিক্ষার্থিদিগের কর্ণে তাহার এক একটী প্রদান করিয়া দিয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সে সকল মন্ত্র কিছুই নহে, অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এক একটী অক্ষর মাত্র। সে সকল অক্ষর বিশেষের মধ্যে এমন কি বা শক্তি নিহিত আছে যে, মানুষ তাহার চিন্তনে মুক্তিরূপ পরমপদের অধিকারী হইতে পারে? দীক্ষা বিনা মানবের পশুত্ব বিমোচন হয় না, গুরু মনুষ্য নন, মনুষ্যদেহধারী হইয়াও তিনি দেবতা, গুরুপদপরিচারণাতেই মুক্তি, তিনি ইহপারলৌকিক সকল সদ্গতির এক মাত্র নেতা, ইত্যাকার মানবাত্মার মহত্ত্ববিনাশক এবং ধর্ম্মপথের ঘোর অন্তরায়স্বরূপ বাক্যাবলী তন্ত্র শাস্ত্রের প্রভুত্বেই বঙ্গভূমির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্ত্র সকল এক দিকে যেমন গুরুপদের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে মানবাত্মাকে সংযত করিয়া তাহার উন্নতি ও বিকাশের পথ রোধ করিয়াছে, অপর দিকে সেই রূপ এক প্রকার কুসংস্কার ও ভ্রান্তিপ্রমাদপূর্ণ নিকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া এদেশীয় লোকের আত্মার শ্রী ও সৌন্দর্য্যকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে। মনুষ্যকে ধর্ম্মের নামে, নিষ্কলঙ্ক পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের নামে, বিবিধ প্রকার জুগুপ্সিত পাপমূর্ত্তির পরিচারণা করিতে, ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গস্বরূপ মৈত্রী ও প্রেমের পরিবর্ত্তে লোকহিংসা ও অচিন্তনীয় জিঘাংসাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে, স্বর্গীয় পবিত্রতার নামে নানা প্রকার কদাচার ও পাপাচারের পোষণ করিতে, চিত্তশুদ্ধি ও অন্তরের সুনির্ম্মলা শান্তির নামে উন্মাদকর গরলরাশি পান করাইয়া বিভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল এবং উন্মত্তবৎ হইতে একমাত্র তন্ত্রই শিক্ষা দান করে। এরূপ লোকানর্থকর শাস্ত্রের প্রভুত্ব লোকসমাজ হইতে যতই অন্তর্হিত হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। যাহা হউক ধর্ম্মপথের এবম্বিধ বিঘ্নকর মত সকলের সমর্থন করিয়াও তন্ত্রকারগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে অঙ্কিত করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যে ব্রহ্মজ্ঞানের আভা বৈদিক কালের ছন্দোবিভাগ হইতে অল্পে অল্পে উন্মেষিত হওত উপনিষদের মধ্যে অধিক উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং যাহার তেজ পুরাণপ্রতিষ্ঠিত দেবাড়ম্বরের মধ্যেও চতুর্দ্দিকে প্রতিভাসিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই ব্রহ্মোজ্ঞানের আলোক তন্ত্রের মধ্যে ও স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মহানির্ব্বাণকর্ত্তা ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মোপাসনাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ভূরি ভূরি স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানকেই মুক্তির অদ্বিতীয় কারণ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা সে সকল স্থল উদ্ধৃত করিয়া আর প্রস্তারবাহুল্য করিতে চাহি না; ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারেন। তবে এ স্থলে আমরা একটী শ্লোক

মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। মহানির্ব্বাণে উক্ত হইয়াছে—

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপ নামাদি কল্পনাং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠ যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ—রূপনামাদি কল্পনাকে বালকের ক্রীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সৎ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা মুক্ত হয়েন, তাহাতে আর সংশয় নাই। এখন আমরা দেখিলাম, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপ্রয়োজক স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে অবিসম্বাদিত রূপে ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমা এবং শ্রেষ্টত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শাক্যসিংহের পুর-নিষ্ক্রম।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ভগবান্ শাক্য সিংহের তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া বিমান-বাহী দেবগণ হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দ-নিনাদ করিয়াছিলেন এবং নিম্ন লিখিত গাঁথা গান করিয়াছিলেন।

"নরজ্যতে পুরুষবরস্য মানসং
নভো যথা তম রজ ধূমকেতুভিঃ।
ন লিপ্যতে বিষয় সুখেষু নির্ম্মল
জলে যথা নবনলিনং সমুদ্ভবম॥"

[এই শ্রেষ্ট পুরুষের মন কিছুতেই অনুরক্ত নহে, সংসক্ত নহে। তমঃ বা অন্ধকার, রজঃ বা ধূলি, এবং ধূমকেতু প্রভৃতি আকাশে দৃশ্য হয়, অথচ আকাশে সংসক্ত হয় না। ভগবান্ শাক্যসিংহের চিত্তও তদ্রূপ। যেহেতু ইনি বিষয়সুখে লিপ্ত হন না, পূর্ণ নির্ম্মল, সেই হেতু জলে যেমন নবনলিন উদ্গাত হয়, অথচ তাহা জলে অলিপ্ত, আমাদের এই ভগবানেরও চিত্ত সেইরূপ বিষয়ে সঞ্চারিত হয়, অথচ তাহাতে অলিপ্ত]

সেই ভীষণ অর্দ্ধরাত্র সময়ে কপিলবস্তু মহানগর মহা প্রস্বাপনে অভিভূত। জীব মাত্রেই নিদ্রিত ও হতচেতন, কেবল মাত্র ভগবান্ শাক্যসিংহ ও ছন্দক জাগরিত। ছন্দক অনেক রোদন করিলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, কিছুতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভগবানের মনঃ প্রতিনিবৃত্ত হইল না। ছন্দক একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, ভগবানও পুনঃ পুনঃ "অশ্ব দাও" বলিয়া উত্তেজনা করিতেছেন। সমস্ত নগর সুপ্ত, মহা প্রস্বাপনে অভিভূত। অর্দ্ধ রাত্র পরিপূর্ণ হইল, চন্দ্র নির্ম্মল আকাশে পুষ্যনক্ষত্রের সহিত উদিত হইলেন, পুরনিষ্ক্রমের শুভক্ষণ বা শুভ সময় আগত হইল, তাহা দেখিয়া ভগবান শাক্য-সিংহ রোরুয়মান ছন্দককে পুনরপি বলিতে লাগিলেন;—

"ছন্দক! আর কেন দুঃখ দাও? আর কেন বিলম্ব কর? শীঘ্র আমার একটী সজ্জিত অশ্ব দাও—বিলম্ব করিও না।" শুনিয়া ছন্দক পুনর্ব্বার বলিলেন,—

আর্য্যপুত্র! আপনি কালজ্ঞ—কোন্ কালে কি করিতে হয় তাহা উত্তমরূপ জানেন,—আপনি সময়জ্ঞ—কোন্ সময়ে

কি কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষরূপ জানেন,—আপনি সমাজ্ঞ—কোন্ সময়ে কি নিয়মে কি করিতে হয়, তাহাও জানেন। আমিও দেখিতেছি, এই কাল আপনার গমনের উপযুক্ত নহে; তবে কেন আপনি বার বার আমাকে আদেশ করিতেছেন? বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ছন্দক! ইহাই আমার সেই কাল—সেই শুভক্ষণ—অকাল বা অসময় নহে।"

ছন্দক বলিলেন, দেব! ইহা কোন্ বিষয়ের কাল? বুদ্ধদেব বলিলেন" ছন্দক!

"যন্ময়া প্রার্থিতু দীর্ঘ রাত্রং সত্ত্বত্রাণার্থং পরিমার্গ তাহি।
অবাপ্য বোধিমজরামরং পদং মোচেজ্জগত্তস্য ক্ষণা উপস্থিতঃ॥

আমি যাহা জীব পরিত্রাণের জন্য বহু কাল অন্বেষণ করিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি, হে ছন্দক! সেই অজর অমর বুদ্ধ পদ লাভ করিয়া জগৎ ত্রাণ করিবার উপযুক্ত শুভক্ষণ এত দিন পরে অদ্য উপস্থিত হইয়াছে। আর বিলম্ব করিও না, খেদ করিও না, বাধা দিও না, শীঘ্র আমায় একটী সজ্জিত অশ্ব দাও।

"শ্রুত্বা ছন্দক অশ্রুপূর্ণ নয়ন স্তং স্বামিনমব্রবীৎ,
ক ত্বং যাস্যসি সত্ত্ব সারথিবর! কি মশ্ব কার্য্যঞ্চতে?
দ্বারাস্তে পিহিতা দৃঢ়ার্গল কৃতাঃ কো দাস্যতে তানৃতব?"

শুনিয়া ছন্দক রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন? অশ্ব লইয়া কি করিবেন? সমস্ত দ্বার পিহিত—আবদ্ধ—কে আপনাকে তাহা খুলিয়া দিবে? এই কথা বলিবা মাত্র—

"শক্রেণ মনসাথ চেতনবশাৎ তে দ্বার মুক্তাঃ কৃতাঃ।"

ইন্দ্র কর্তৃক সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইল, ছন্দক দেখিলেন, সমস্ত-দ্বার উন্মুক্ত।

"দৃষ্ট্বা ছন্দক হর্ষিতঃ পুন দুখী অশ্রুণি সোহবর্ত্তয়া।"

দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া ছন্দক হৃষ্ট হইলেন, পরক্ষণেই আবার দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে অজস্র অশ্রু নির্গলিত হইল।

"দেবাঃ কোটি সহস্র হৃষ্ট মনসঃ স্তং ছন্দকমব্রুবন্।
সাধু ছন্দক! দেহি কণ্টকবরং মা খেদয়ো নায়কম্।"

ঐ সময়ে আকাশবাণী হইল, অন্তরীক্ষচর দেবগণ হৃষ্ট চিত্তে ছন্দককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ছন্দক! শীঘ্র অশ্ব দাও—প্রভুকে দুঃখ দিও না।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ছন্দক! ঐ দেখ, আকাশে স্বর্গীয় জ্যোতির শোভা দেখ। ঐ দেখ, শচিপতি ইন্দ্র তোমার দ্বারদেশে উপস্থিত।

ছন্দক তখন অদৃশ্যময় দেবগণের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, সুজাত নামক একটী সজ্জিত অশ্ব আনিয়া দিলেন। রোদন করিতে করিতে বলিলেন, প্রভো! এই অশ্ব, গ্রহণ করুন, আপনার অভীষ্ট নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হউক।

আরূঢ়ঃ শশিপূর্ণমণ্ডলনিভং তমশ্বরাজোত্তমম্,
মালা পাণি বিশুদ্ধ পদ্ম বিমলা ন্যস্যঞ্চ অশ্বোত্তমে,

* * * * *

খেদ, দৈন্য, ভয়, শঙ্কা, মায়া, মমতা, কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইল না, কিছুতেই

তিনি ব্যথিত বা কাতর হইলেন না, অনায়াসেই প্রফুল্ল চিত্তে অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন। সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রভু অশ্বরাজের পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন।

কথিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহের গমনকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গন্তব্য পথে পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল, দিব্য বাদিত্র বাদিত হইয়াছিল, দেবগণ ও অসুরগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিয়াছিল। এই ভয়াবহ ব্যাপার সেই অর্দ্ধ রাত্র সময়ে সংঘটিত হইল, ছন্দক ভিন্ন অন্য কেহ জানিল না। শাক্যপুরের পুর দেবতা (রাজলক্ষ্মী) মূর্ত্তিমতী হইয়া এই মহাপুরুষের নেত্রপথে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিও রোরুদ্যমানা হইয়া করুণ বিলাপ করিয়াছিলেন,* কিছুতেই এই মহাপুরুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হয় নাই। রোরুদ্যমান ছন্দক পশ্চাতে তিনি অগ্রে। ছন্দক পাদচারে, তিনি অশ্ব-পৃষ্ঠে। সমস্ত নগর মহা প্রস্বাপনে অচেতন, সুতরাং তিনি নির্ব্বিঘ্নে ও বিনা বাধায় স্বভবন হইতে ঐরূপ বিধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। বহির্গত হইয়া একবার তিনি রাজভবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং নিম্ন লিখিত প্রকার প্রতিজ্ঞা ও সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

"ব্যবলোক্য চৈব ভবনং মতিমান্
মধুরস্বরোগির মুদীরিতবান্।
নাহং প্রবেক্ষি কপিলস্য পুরং
অপ্রাপ্য জাতি মরণান্তকরম্॥
স্থানাসনং শয়ন চংক্রমনং
ন করিষ্যেহহং কপিলবস্তু মুখং
যাবন্ন লব্ধং বরবোধি ময়া
অজরামরং পদবরং হ্যমৃতম্॥"

রাজ্যসুখের প্রলোভন, স্ত্রী পুত্রাদির স্নেহ, ইন্দ্রিয় সেবার সুখ, এ সমস্তই তিনি মনোবলে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে চলিল, ছন্দক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদসঞ্চারে চলিলেন। ক্রমে রাজধানীর সীমা অতিক্রান্ত হইল, ক্রমে নগরসীমা ও রাজ্যসীমা পশ্চাৎ পাতিত হইল, তথাপি রাত্রের শেষ হইল না। অশ্বও অবিশ্রান্ত পদচালনা করিতেছে, ছন্দকও তৎসমবেগে পদচালনা করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা স্বরাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া কোড্য দেশে পদার্পণ করিলেন; ক্রমে কোড্যদেশ অতিক্রান্ত হইল; সম্মুখে মল্লদেশ। অচিরাৎ তাহাও অতিক্রম করিলেন। যখন তাঁহারা মল্লদেশ অতিক্রম করিয়া মৈনেয় দেশের বেণুবনসমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত হইল। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই স্থান কপিলবস্তু নগর হইতে ৬ যোজন দূর।*

রাত্রি প্রভাত হইল, ভগবান বুদ্ধ এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্তিকোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছন্দককে বলিলেন, ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও

* এ সকল কথার ললিতবিস্তর গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল।

* ৪ ক্রোশে এক যোজন; ৬ যোজনে ২৪ ক্রোশ। কোন লেখক লিখিয়াছেন, ৪৫ ক্রোশ দূরে অনোমা নদীর তীরে তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। আন্দাজী বা অমূলক কথা কতদূর আদরনীয়, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

আভরণ গ্রহণ কর এবং গৃহে গমন কর। এই বলিয়া একে একে সমুদায় আভরণ উন্মোচন করিলেন এবং ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ছন্দক অনেক রোদন করিল, অনুনয় করিল, অনুরোধ করিল, প্রার্থনা করিল, বিনয় বচন বলিল, কিন্তু প্রভু বুদ্ধ সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন--

ছন্দো গৃহীত্ব কপিলপুরং প্রয়াহি
মাতাপিতৃনাং মম বচনেন পৃচ্ছেঃ
গতঃ কুমারো নচ পুনঃ শোচিণাঃ
বুদ্ধিত্ব বোধি পুনরহ মাগমিষ্যে
ধর্ম্মং শুনিত্ব ভবিষ্যথ শান্তচিত্তাঃ।

ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও এই আভরণ লইয়া কপিলপুরে যাও, আমার পিতা মাতা যাহাতে শোকসন্তপ্ত না হন, তাহা করিও, বলিও। কুমার গিয়াছে বলিয়া আপনারা শোক করিবেন না, কুমার বোধি অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান জ্ঞাত হইয়া পুনর্ব্বার আসিবেন এবং ধর্ম্ম শুনিয়া তখন আপনারা শান্তচিত্ত হইবেন, সুখী হইবেন।

ছন্দক আবার কাঁদিল, আবার বলিল,—

"নমেঽস্তি শক্তি বলপরাক্রমো বা
হনেয়ু মহ্য নরবর জ্ঞাতি সংঘাঃ
ছন্দা=ক নীতো গুণধর বোধিসত্বঃ ?

* * * *

ছন্দক কাঁদিয়া বলিল, প্রভো! আমার শক্তি নাই, নিঃশক্তি হইয়াছি, বল নাই—দুর্ব্বল হইয়াছি, পরাক্রম নাই—নিস্তেজ হইয়াছি। হে প্রভো! রাজপরিবারগণ, রাজার জ্ঞাতিগণ, শাক্যগণ, আমাকে প্রহার করিবে আর বলিবে, "তুই গুণধরকে কোথায় লইয়া গিয়াছিলি? এবং কোথায় রাখিয়া আইলি?"

বোধিসত্ব বলিলেন, ভয় কি? ভীত হইও না, আমি বলিতেছি, তোমাকে কেহ মারিবে না।

"তুষ্টা ভবিত্ব অপি মম জ্ঞাতি সংঘাঃ।"
"প্রেমেণ মহ্যং ত্বয়ি নো বিবর্ত্তিষ্টন্তে।"

আমার জ্ঞাতিগণ—রাজা ও রাজপুরুষগণ—কেহ তোমাকে মারিবে না, কটু বলিবে না—কোপ করিবে না, সকলেই তুষ্ট হইবে। আমার প্রেমে তাহারা সকলেই তোমাকে আদর করিবে।

ছন্দক আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। বার বার প্রভু-আজ্ঞা অবহেলা অসঙ্গত ভাবিয়া ছন্দক অগত্যা রোদনসহকারে প্রদত্ত আভরণাদি গ্রহণ করিল, অতি কষ্টে শাক্যপুর গমনে সম্মত হইল।

ললিত বিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ছন্দক যে স্থান হইতে ফিরিয়াছিল, সেই স্থানে এক চৈত্য (স্মারক স্তম্ভ বা বৃক্ষ) স্থাপিত হইয়াছিল। সেই চৈত্য অদ্যাপি বিদ্যমান আছে * এবং লোকে তাহাকে ছন্দক নিবর্ত্তন নামে খ্যাত করিয়াছে।

ছন্দক কিয়দ্দূর গমন করিলে পর সিদ্ধার্থ মনে মনে বিচার করিলেন, সন্ন্যাসী হইলাম অথচ চূড়া (সুদীর্ঘ কেশ পাশ) থাকিল, ইহা কি প্রকার হইবে? ভাবিয়া তিনি এক খড়্গের (১) দ্বারা ভ্রমরকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব কেশ পাশ ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, দেবগণ তাহা পূজার নিমিত্ত গ্রহণ

*ললিতবিস্তর লেখকের সময় পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু এখন আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা।

(১) খড়্গ কোথায় ছিল, তাহা লিখিত নাই।

করিয়াছিলেন এবং সেই চূড়াচ্ছেদস্থানে চৈত্য স্থাপিত হইবায়, সে চৈত্য চূড়াপ্রতিগ্রহণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শরীর নিরলঙ্কার ও মস্তক কেশবিহীন হইল, তথাপি সিদ্ধার্থের মন পরিতুষ্ট হইল না। তিনি স্বপরিধেয় কৌষিক বা কাশিক বস্ত্রের (১) প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এবস্ত্র সন্ন্যাসীদের বস্ত্র নহে। যদি বনবাসের উপযুক্ত কাষায় বস্ত্র পাই, তাহা হইলেই ভাল হয়। এই সময়ে এক ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সমাগত হইল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ বোধিসত্ব হৃষ্ট চিত্তে ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহাশয়! আপনি যদি আমাকে আপনার পরিহিত বস্ত্র দেন, তাহা হইলে আমি এই কৌষিক বস্ত্র আপনাকে দেই (২)। ব্যাধ বলিল, হাঁ—এই বস্ত্রই আপনার শোভনীয় এবং ঐ বস্ত্রই আমার শোভনীয়। বুদ্ধদেব বলিলেন, সেই জন্যই উহা আমি যাচ্ঞা করিতেছি।

ব্যাধ তন্মুহূর্ত্তে আপনার পরিহিত কাষায় বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে প্রদান করিল, বুদ্ধদেবও আপনার কৌষিক বস্ত্র ব্যাধকে প্রদান করিলেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই ব্যাধ প্রকৃত ব্যাধ নহে, ইনি এক দেবপুত্র। ব্যাধরূপী দেবপুত্র ভগবানের প্রদত্ত বস্ত্র মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিল, ছন্দক ইহা নাকি দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। এই বস্ত্রপরিবর্ত্তনের স্থানেও এক উচ্চতর চৈত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই চৈত্য অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে খ্যাত আছে।

এইরূপে ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজ্য, রাজভোগ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, দাস, দাসী, সকল পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অশোক ও অমৃতপদ অন্বেষণার্থ সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার অনুচর ছন্দক দূর হইতে প্রভুর তাদৃশ বেশ সন্দর্শন করিয়া যারপর নাই ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া অবিরল ধারে রোদন করিতে করিতে কপিলবস্তু নগরে গমন করিল। কণ্টকনামা তাঁহার অশ্ব প্রভুবিরহে কাতর হইয়া স্খলিতপদে রোদন করিতে করিতে অতি কষ্টে ছন্দকের অনুগামী হইল।

শ্রীরামদাস সেন।

(১) কাশিক=কাশি দেশজাত। কৌষিক =রেশমী কাপড়।

(২) বৌদ্ধেরা বলে, এই ব্যাধ প্রকৃত ব্যাধ নহে, কোন দেবতা ঐরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্যাধ বেশে দেখা দিয়াছিল।

পালরাজগণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহারাজ নয় পালের * শাসনকালে সোম নামক জনৈক সম্মানী ভূম্যধিকারী গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের অনতিদূরে হরিহর মূর্ত্তি স্থাপনার্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দির-গাত্রে সংযোজিত খোদিত

* জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ বশত নয়পাল "ন্যায়পাল" নামে পরিচিত হইয়াছেন।

লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ নয়পাল দেবের রাজ্যাভিষেকের ১৫শ বৎসরে এই লিপি খোদিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছেঃ—

সমস্তভূমণ্ডল রাজ্য ভারমাবিভ্রতি শ্রীনর—
পালদেবে।
বিলিখ্যমানা দশপঞ্চসংখ্য সংবৎসরে সিদ্ধি-
মত সাহুকীর্ত্তিঃ॥

নারায়ণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি মহারাজ নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। এই নারায়ণের পুত্র চক্রপাণি দত্ত একজন বিখ্যাত বৈদ্য গ্রন্থকার। চক্রপাণি স্বয়ং তাহার গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। †

বিহার উপবিভাগ হইতে মহাত্মা ব্রোডলি সাহেব বিগ্রহ পালের নামসংযুক্ত আর একটী প্রস্তরলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা বুদ্ধমূর্ত্তির প্রস্তরসিংহাসনে খোদিত হইয়াছে। যথাঃ

শ্রীমদ্বিগ্রহ পাল দেবস্য রাজ্য সম্বত ১২ মার্গ দিনে ১৫ দে (য় ধর্ম্মা) সং স্ববর্ণকার দেহে।*

গৌড়েশ্বর মহীপালের শাসনকালে তাঁহার সভাসদ পণ্ডিত ক্ষেমীশ্বর রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক উপন্যাস অবলম্বন করিয়া "চণ্ডকৌশীক" নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বারনেল চোলরাজ কুলতুঙ্গার যে তামিল শাসনপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, "এই নরপতি তাঁহার ২৯ সম্বতে বাঙ্গালা ও সেই দেশাধিপতি মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন।" রাজসাহির প্রস্তরফলকে লিখিত আছে সেন বংশের স্থাপয়িতা বিজয় সেন গৌড় জয় করিয়াছিলেন। এইরূপ কতকগুলি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া "সেনরাজগণ" পুস্তকে দেখান হইয়াছে যে, চোলরাজ কুলতুঙ্গা মহীপালকে জয় করিয়া তাঁহার সেনাপতি বিজয় সেনকে গৌড়ের রাজাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং গৌড়েশ্বর মহীপাল বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়া বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় পালদিগের রাজ্য সীমা পশ্চিম দিকে কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান কাশীর দুই ক্রোশ উত্তর দিকে বৌদ্ধদিগের যে বারাণসী ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি শরনাথ নামে পরিচিত। এই শরনাথ নগরে গৌড়েশ্বর মহীপাল ও বসন্তপাল এবং তাঁহার ভ্রাতা স্থিরপালের নামাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা এইরূপঃ—

মনোবুদ্ধায়। বারাণসী
সরস্যাং গুরোঃ শ্রীধামরাশি পাদাব্জং।
আরাধ্য নমিত নৃপতি
শিরোরুহেঃ শৈবালাকীর্ণং। ১
ভূপাল চিহ্নে ষষ্ঠাদি
কীর্ত্তি রত্ন ধারা নিচয়
গৌড়াধিপ, মহীপালঃ
কাশ্যাং শ্রীমান কারয়ৎ। ২
সহজী কৃত পণ্ডিতৈঃ
বোধ্যাকার [illegible]

† চক্রপাণি লিখিয়াছেন—
গৌড়াধিনাথ রসত্যাধিকারি পাত্র
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়ো দন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃ পদাধিকারী।
টীকাকার শিবদাস সেন বলেন—"গৌড়াধিনাথ—নয়পালদেবঃ তস্য রসবতী মহানাসং তস্যাধিকারী তথা পাত্রমিতি-মন্ত্রী—ঈদৃশো যো নারায়ণঃ তস্য তনয়ঃ—"

যো ধর্ম্মরঞ্জিকান্
সঞ্চান্ ধর্ম্মচক্র পুনর্ন্নবং। ৩
কৃতবন্তৌ চ নবীন
যেষু মহাস্থানে শৈলরাজ কুটমং
এনাং শ্রীস্থিরপালো
বসন্তপালানুজ সমানৈঃ। ৪
সম্বৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে।

আমগাছির তাম্রশাসনের যোড়শ পংক্তিতে ও নালন্দার বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তর লিপিতে মহীপালের নাম খোদিত রহিয়াছে, রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শরনাথ প্রস্তরলিপিতে অঙ্কিত গৌড়েশ্বর মহীপালকে পূর্ব্বোক্ত মহীপাল হইতে অভিন্ন অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মিত্র মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ আমগাছির শাসনোক্ত মহীপালের পর যে নরপাল ও (তৃতীয়) বিগ্রহপালদেব বাঙ্গলা শাসন করিয়া গিয়াছেন, আমগাছির তাম্রশাসনই তাহার উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাদের এইবাক্যকে অপ্রামাণ্য অবধারণ করিবার জন্য কোন প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। আমাদের মতে তৃতীয় বিগ্রহ পালের পর দ্বিতীয় মহীপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহাকে জয় করিয়া চোলরাজ কুলতুঙ্গার সেনাপতি বিজয় সেন বাঙ্গলার রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। নালন্দার বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তরলিপিতে যে মহীপালের নাম খোদিত রহিয়াছে, ইনি প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় মহীপাল, এবিষয় পশ্চাৎ যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় মহীপাল দেবের পর পাল বংশীয় আর ১৮ জন নরপতি ধারাবাহিক রূপে বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকাশ করা গেল।* মুসলমানদিগের বিহারবিজয়ের পরেও প্রায় আড়াই শত বৎসর ইঁহারা বিহারের কোন কোন অংশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ছিলেন। ১৩৬২ শকাব্দের (১৪৪০ খৃঃ অঃ) পর আমরা আর বিহার প্রদেশে পালবংশের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না।

যে সময় বিজয়সেনদেব বাঙ্গলা শাসন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় চন্দ্রদেব নামক এক ব্যক্তি কনোজ নগরে নূতন রাজপাঠ স্থাপন করেন। এই চন্দ্র দেব ও তদ্বংশীয় রাজন্য বর্গ রাজস্থানের ইতিহাসে "রাটোর" বংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজস্থানের ভট্ট কবিগণ যদিচ ইঁহাদিগকে "রাটোর" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদিগের শাসনপত্রে "রাটোর" শব্দের কোন উল্লেখ নাই। চন্দ্রদেবের বংশধরদিগের প্রদত্ত অনেকগুলি শাসন পত্র আমরা দর্শন করিয়াছি। †

---

* বারাণসী ও বিহার প্রদেশে পালবংশীয় যে সকল নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা।

১।	বসন্ত পাল।	১০।	নয়ন পাল।
২।	স্থির পাল।	১১।	সিন্ধু পাল।
৩।	মদন পাল।	১২।	অভয় দেব।
৪।	রাম পাল।	১৩।	মল্লদেব।
৫।	গোবিন্দ পাল।	১৪।	কাশী রাজ।
৬।	ভূমি পাল।	১৫।	সিংহ দেব।
৭।	কুমার পাল।	১৬।	ভানু দেব।
৮।	লক্ষণ পাল।	১৭।	সোমেশ্বর।
৯।	চন্দ্র পাল।	১৮।	ভৈরবচন্দ্র।

(১৩৬২ শকাব্দ)

† শাসনপত্র হইতে এই বংশাবলীটী প্রস্তুত করা হইল।

১।	—বিগ্রহ।	৫।	গোবিন্দ চন্দ্র
২।	মহী—।	৬।	বিজয় চন্দ্র।
৩।	চন্দ্র দেব।	৭।	জয়চন্দ্র।
৪।	মদন পাল।		

সেই সকল শাসনপত্রে ইঁহারা "গাহড় বাল'' বংশজ বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। পুরাতত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, "ঘর-ওয়ার'' রাজপুতদিগের মৌলিক আখ্যা "গাহড়বাল''। সে যাহাই হউক, এই গাহড়বাল বা ঘরওয়ার বংশজ চন্দ্র দেবের পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রভৃতি ভূপতিগণের শাসনপত্রে চন্দ্রদেবের পিতা ও পিতামহের নাম কিরূপ লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

গোবিন্দ চন্দ্রের ১১৬৩ সম্বতের শাসনপত্রে লিখিত আছে

''অভূন্নৃপো গাহড়বালবংশে মহীতলো
নাম জিতারিচক্রঃ।

১১৬৩ সম্বতের গোবিন্দ চন্দ্রের দ্বিতীয় শাসনপত্রে চন্দ্রদেবের পিতা ও বংশের এই রূপ উল্লেখ আছেঃ—

"বংশে গাহড়বালাখ্যে বভুব বিজয়ী নৃপঃ।
মহিআলসুতঃ শ্রীমান্ নলনাভাগসন্নিভঃ।

গোবিন্দ চন্দ্রের ১১৭৪ সম্বতের শাসনপত্রে তাঁহার পিতা, পিতামহ ও বংশের নিম্ন লিখিত রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়ঃ—

* * * * *

সাক্ষা) দিবস্যা (নিব ভূরি ধাম্না) নাম্না
(যশোবিগ্র)হ ইত্যুদারঃ॥
তৎসুতোঽভূন্মহীচন্দ্রশ্চন্দ্রধামনিভং নিজম্।

একমাত্র মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্রের তিন খানা শাসন পত্র হইতে দুই একটী পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, চন্দ্রদেবের পিতার নাম কোন্ টীতে "মহীতলো'' কোনটীতে "মহীআল" ও কোনটীতে "মহীচন্দ্র" লিখিত হইয়াছে। এবং তাঁহার পিতামহের নামের প্রথমাংশ নষ্ট হওয়ায় পণ্ডিত প্রবর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় "হ" অঙ্কের সহিত "যশোবিগ্র"যোগ করিয়াছেন। এমত স্থলে আমরা অতর্কিত ভাবে চন্দ্রদেবের পিতামহের নাম "বিগ্রহ'' ও তাঁহার পিতার নাম ''মহী—' গ্রহণ করিতে পারি। যদি আমরা তৃতীয় বিগ্রহপালদেব হইতে পালবংশের বংশাবলী কনজ রাজবংশাবলীর সহিত যোগ করি, তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপ বংশাবলী প্রস্তুত হইতে পারে।

বিগ্রহপাল।
মহীপাল।
চন্দ্রদেব।
মদন পাল।
গোবিন্দ্র চন্দ্র।
বিজয়চন্দ্র।
জয়চন্দ্র।

ডাক্তার হরেন্‌লি সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

চন্দ্রদেবের পিতাকে মহীপালের পরিবর্ত্তে যে সকল তাম্রশাসনে মহীতাল বা মহীআল বলিয়া লিখা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শাসনপত্রের লিখক কিম্বা শাসনপত্রের পাঠকর্ত্তাদিগের দ্বারা এই ভ্রম সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। আমাদের মতে পাল গৌড়েশ্বর বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইলে পাল বংশ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। একশাখা পৈতৃক ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (উত্তর কালে তাঁহারাও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।) অন্য শাখা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করত কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিলেন। সুতরাং বাঙ্গালা হইতে তাড়িত মহারাজ মহীপাল কনোজ ও বিহার রাজ বংশের জনক হইতেছেন।

এই পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বর পাল রাজন্যবর্গের যে সমস্ত তাম্র শাসনপত্র ও প্রস্তরলিপি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সমস্তের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমরা তাহাদের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করিলাম।

বংশাবলী।

১। গোপাল দেব রাজ্ঞী বাগীশ্বরী দেবী।(১)

২। ধর্ম্মপাল— রাজ্ঞী কণ্ণাদেবী * | বাক্‌পাল।

৩। দেবপাল দেব। | জয়পাল

যুবরাজ রাজ্যপাল। | ৪। বিগ্রহ (সুর) পাল। রাজ্ঞী লজ্জাদেবী। †

৫। নারায়ণ পাল।

৬। রাজ্যপাল। রাজ্ঞী ভাগ্যদেবী। ‡

৭। শ্রীমান—পাল।

৮। বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়)

৯। মহীপাল।

১০। নয়পাল।

১১। বিগ্রহপাল।(তৃতীয়)

১১। মহীপাল। (দ্বিতীয়)

মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুলফাজেল তাঁহার আইন আকবরী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে গৌড়েশ্বর পাল রাজাগণের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১।	ভূপাল।	রাজ্যকাল	৯৫	বৎসর
২।	বীরপাল।	,,	৫৫	,,
৩।	দেবপাল।	,,	৮৩	,,
৪।	ভূপতিপাল।	,,	৭০	,,
৫।	ধনপতি পাল।	,,	৯৫	,,
৬।	বিজ্ঞান পাল।	,,	৭৫	,,
৭।	জয়পাল।	,,	৯৮	,,
৮।	রাজপাল।	,,	৯৮	,,
৯।	ভোজপাল।	,,	৫	,,
১০।	জগৎপাল।	,,	৭৪	,,

তিব্বত দেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পালবংশের যে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১।	গোপাল।	১০।	সৃষ্টিপাল।
২।	দেবপাল।	১১।	সখ্যপাল।
৩।	রাসপাল।	১২।	বীরপাল।
৪।	ধর্ম্মপাল।	১৩।	ন্যায়পাল।
৫।	মনুরক্ষিত।	১৪।	অমরপাল।
৬।	বেনপাল।	১৫।	হস্তীপাল।
৭।	মহীপাল।	১৬।	ক্ষান্তিপাল।
৮।	মহাপাল।	১৭।	রামপাল।
৯।	সোমপাল।	১৮।	যক্ষপাল।

আবুল কাজেল এবং তারানাথ প্রায় সমসাময়িক, বোধ হয় ইঁহারা দেশ প্রচলিত প্রবাদ কিম্বা অপ্রমাণ্য কোন গ্রন্থ হইতে এই সকল নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল তালিকা সমসাময়িক প্রমাণ তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপির বিরোধী বলিয়া অপ্রামাণ্য বোধে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

(১) বল্লভী অর্থাৎ গুজরাটের রাজকন্যা।

* রাষ্ট্রকূটাপতি প্রবলের দুহিতা।

† চেদী অর্থাৎ ত্রিপুরার রাজকন্যা।

‡ রাষ্ট্রকূটার রাজকন্যা।

নব্যবঙ্গ।

উপসংহার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলিতে নব্য বঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের মত ও মনের ভাবগুলি নিতান্ত এ'লো মে'লো ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, নব্যবঙ্গ নানা বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহারের সংঘর্ষণে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিবিধ বিপ্লবে একটী নূতন এবং জটিল মিশ্র পদার্থ, হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজে, মানব-চরিত্রে, ভাষায়, রুচিতে সর্ব্বত্রই বিমিশ্র ভাব। এই জটিল মিশ্রণ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোন চিত্রই পৃথক্ এবং সুস্পষ্টরূপে আঁকা সহজ নয়। আর এক কথা, নব্যবঙ্গ বলিয়া যে একটা জিনিষ আমরা নির্দ্দেশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি, তাহা এখনও বীজ-গর্ভস্থিত অঙ্কুরের মত অস্ফুট। এই অঙ্কুর দেখিয়া, কেহ বলিতে পারেন, ইহা কালে একটী ছায়াপ্রদ বটবৃক্ষে পরিণত হইবে। কেহ বলিতে পারেন, ইহা হইতে কোন ভাল গাছ হইবে না। কেহ বলিবেন, ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। পৌত্তলিক, অপৌত্তলিক, নিরীশ্বর নানা প্রকার মতই অবাধে দেশে প্রচারিত ও প্রচলিত হইতেছে। ব্রাহ্ম ভাবিতেছেন, বঙ্গ দেশে কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্মই দাঁড়াইবে। আবার দলে দলে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ-সংস্কারকগণ দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ স্বমতানুযায়ী বেদবিহিত ধর্ম্মে, কেহবা স্বকীয় অভিরুচি-সম্মত বৈদান্তিক ধর্ম্মে, কেহবা নূতন ধরণের কৃষ্ণ-প্রেম-পূর্ণ ভাগবত ধর্ম্মে, এইরূপে সকলে যুটিয়া কত কি নূতন নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেশকে আহ্বান করিতেছেন। "থিয়োসফিষ্ট" সাত সমুদ্র পার হইয়া বঙ্গ-ভূমিতে স্বমতাধিকার বিস্তার-জন্য ব্যগ্র ও আগ্রহান্বিত হইয়া ছুটিয়াছেন। "মুক্তি-সেনা" আপনার রণ-ভেরীর শব্দে সর্ব্ব স্থান নিনাদিত করিতে কতই আশার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বিবিধ পুরাতন ও নূতন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আশ্বস্ত চিত্তে বঙ্গের জেলায় জেলায় পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেছেন। কত মিল্ এবং কোমত্-শিষ্যগণও বঙ্গদেশকেই অনুশিষ্য করিতে ব্যস্ত। সকলেরই বুক-ভরা আশা, প্রাণ-যোড়া উৎসাহ, উদ্যম। কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই জটিল মিশ্রণ হইতে প্রকৃত তত্ত্ব বিশ্লেষ করা সহজ নয়।

ফল কথা এই, আমাদের সমাজটী সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিতে বসিলে, যেমন অজস্র ধারার রাশি রাশি অভাব ও নিরাশা উপস্থিত হইয়া মনে অন্ধকার ঢালিয়া দেয়, তেমনই অন্ধকারের মধ্যদিয়া নানা দিক্ হইতে নানা ভাঙ্গা ভাঙ্গা নূতন নূতন আশার এক আধটী কিরণও চক্ষে ভাসিতে থাকে। বস্তুত, যেন এসকল ভাবিতে গেলে, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসি পায়, হাসিতে গেলে, গভীরতর আবেগে বুক ভাঙ্গিয়া কান্না পায়। কি করিলে এই নব অঙ্কুর ফলবান গাছে পরিণত হইবে, কোন্ দিকে ইহার গতি হইবে, কিরূপ বৃক্ষে ইহার পরিণতি দাঁড়াইবে, এসকলই সাতিশয় জটিল মীমাং-

সার কুক্ষিগত সমস্যা। সুতরাং যে যেদিক্‌টার চিন্তা করে, সে সেইদিকেই ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এক রকম করিতে চায়। নদী-তীরের কাদা মাটীর মত ইহা ছেলের পুতুল এবং প্রবীণের প্রতিমা গড়াইবার সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এতক্ষণ এই কাদা লইয়া পুতুল বা প্রতিমা কিছুই গড়াইতে চেষ্টা করি নাই। ইহার প্রকৃতি বর্ণনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য আশা নিরাশার সকল কথাই সমভাবে বলিয়াছি। কিন্তু এই কর্দ্দম তুল্য নরমভাব ঘুচিয়া গিয়া যত দিন না ইহার একটী প্রকৃত এবং নির্দ্দিষ্ট আকার হইবে, তত দিন এ জাতিতে অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক জাতীয় ভাব ফিরিবে না এবং তৎপূর্ব্বে পৃথিবী ও স্বর্গের চক্ষে আমরা কখনও যথার্থ মানুষ নামের উপযুক্ত হইতে পারিব না।

এখন একটী কথা আপনা হইতেই উপস্থিত হইতেছে। কথাটী এই, একটা নির্দ্দিষ্ট আকার চাওত, আকারের কল্পনা কর। আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে জন-সমাজের আদর্শ ভাব লইয়া অনেক দীর্ঘ বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে সাধ্য সত্বে বড় ত্রুটী করি নাই। স্থূল কথা এই, মানুষের মন আদর্শ ভুলিতে না পারিলেও, একজন আর একজনের আদর্শ ঠিক করিয়া দিতে পারে না। যখন আমি আমাছাড়া আর একটী মাত্র ব্যক্তিরও আদর্শ ঠিক করিতে অধিকারী নই, তখন একটা বিস্তীর্ণ মানব-সমাজের আদর্শ কি করিয়া ঠিক করিব? সত্য কথা বলিতে গেলে, আমিও আমার সমস্ত জীবনের আদর্শ কোন এক সময়ে ঠিক করিয়া রাখিতে পারি না। স্থল-বিশেষে পলে পলে মনের আদর্শ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিশিয়া যায়। আবার কখনও কখনও মানুষ কোন কোন বিষয়ে একটীমাত্র আদর্শ অবলম্বন করিয়াই জীবন কাটাইয়া দেয়। মানব-মনের সমস্ত আদর্শই এইরূপ আপেক্ষিক। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতানুসারে মনের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয়। এই জন্য ব্যক্তি-বিশেষ বা বহু ব্যক্তির কল্পিত আদর্শানুযায়ী সমাজ-গঠন প্রণালীর পক্ষপাতী হইতে পারি না। আমরা জানি, নিয়ম-তন্ত্র প্রণালীর অনুসারে দশজনে যুক্তি পরামর্শ করিয়া একটা সমাজকে নিয়মসূত্রে গাঁথিয়া গড়াইতে পারে না। ভূত এবং বর্ত্তমানের সমস্ত সমাজই একথার প্রমাণ। ভাষা যেমন স্বভাবের মূল নিয়মেই প্রতি মানব-কণ্ঠে ফুটিয়া এক একটা জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করে, সামাজিকতাও তেমনই প্রকৃতির অনুগ্রহে প্রতি মানব-হৃদয়ে ফুটিয়া এক একটা জাতির সমাজ গঠন করে। ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান যেমন ভাষার পুরবর্ত্তী এবং অনুযায়ী, সমাজের বিজ্ঞান এবং স্মৃতি বা আইন কানুনও তদ্রূপই সমাজের পরবর্ত্তী ও অনুযায়ী। আবার প্রতি মানবের প্রকৃতি যেমন উন্নতিশীল অর্থাৎ সামান্য শোনিত শুক্র-বিন্দু বা গ্যাষ্ট্রুলা প্রভৃতির অবস্থা হইতে অনন্তকাল-ব্যাপী একটা ক্রম-বিকাশ-শীলতা যেমন মানবমাত্রেরই প্রকৃতিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তেমনই সমাজ উন্নতিশীল এবং সমাজ-প্রকৃতিতেও তেমনই একটা অনন্ত উন্নতির বিকাশ-ভাব রহিয়াছে। সুতরাং যত বড় একটা সমাজই হউক্ না কেন, এবং যত বড় একজন মানুষই তাহার নিয়ম বা ব্যবহার-শাস্ত্রাদি লিখুক্ না কেন, সেই শাস্ত্র কখনই চিরদিনের অবলম্বন হইতে পারে না। তাহা অভ্রান্ত হইলেও, তখন

কার সেই সমাজের জন্যই। কিন্তু চিরকালের এবং সকল অবস্থার জন্য নয়। পরন্তু মানুষ যত বড়ই হউক্, ভ্রান্তিশূন্য হয় না। "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"

সমাজোন্নতির সাধনা কি? এই কথাটীই এখন বিচার্য্য। এসম্বন্ধে কতক গুলি উদার এবং সর্ব্বজনীন বিশেষ মূল সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তুসেই সূত্র সকলের উল্লেখের পূর্ব্বে সাধারণত সমাজ যে সকল মূল মন্ত্রকে ভিত্তির স্বরূপ করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পুনরালোচনা করা উচিত। সেই মন্ত্র গুলি এই,

১। আমি যে সমাজে রহিয়াছি, তাহা, আমার ধন, মান, ধর্ম্ম এবং জীবনরক্ষা সম্বন্ধে নিরাপদ স্থান, এই বিশ্বাস।

২। ইহাতে থাকিয়া আমি আমার পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারি, এই বিশ্বাস।

৩। সর্ব্ব প্রকার বিপদে, জীবিকানির্ব্বাহে ও বিবাহাদি সাংসারিক বিষয়ে এবং সদনুষ্ঠানাদি সাধনে এখানে আমি সাহায্য পাইতে পারি, এই বিশ্বাস।

এই তিনটী এবং আরও একটী মূল মন্ত্র সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। এই চতুর্থ মন্ত্রটীর কথা আমরা ইহার পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। কিন্তু সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক এবং প্রকৃত মূল-বীজ-মন্ত্র। সে কথা এই, অন্তর্নিহিত একটী আসঙ্গ-লিপ্সা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই মানুষ মানুষের সঙ্গে প্রথম মিশিয়াছে। বাহ্যিক ঘটনাবলী এবং প্রয়োজন মানুষকে, মানুষের সঙ্গে স্থায়ীরূপে একত্র করিয়া রাখিবার একটী উপকরণ হইলেও, প্রধান সাধন নয়। কিন্তু সেই বীজের আকারবিশিষ্ট অস্ফুট আসঙ্গলিপ্সা যখন পাত্রের গুণাদিদর্শনে এবং তদতিরিক্তও কোন অবোধ্য, অজ্ঞাত, প্রাকৃতিক, মিলনকারী বিমোহন মন্ত্রে পূর্ণ বিকশিত হইয়া অনুরাগরূপ ধারণ করে, তখন শত হিমাদ্রি বা শত প্রশান্ত সমুদ্র ব্যবধান স্বরূপ হইয়া বাধা দিলেও, মানুষের প্রতি মানুষের প্রাণের টান বিনাশ করিতে পারে না। এই অনুরাগই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন চিরস্থায়ী করিবার প্রধান সাধন। যেমন বিশেষ ব্যক্তিতে বিশেষ ব্যক্তির অনুরাগ সঞ্চার হয়, তেমনই বহু ব্যক্তির সমষ্টিস্বরূপ সমাজেও মানুষের অনুরাগ আকৃষ্ট হয়।

পৃথিবীর সকল মানুষই এক। নীতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রও এক ভাবিতেই উপদেশ দেয়। তবুও যে আমার সমাজ, আমার দেশ বলিয়া, আমরা উন্মত্ত ও মোহিত হই, তাহার কারণ শুধুই অনুরাগ। এই অনুরাগে মানুষ সমাজ বা স্বদেশের জন্য প্রাণ দেয়, কত কি স্বার্থ ত্যাগ করে। কিন্তুএসকল কথাই পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। যাহা হউক্, সমাজের চতুর্থ ভিত্তিমূল বা মূলবীজমন্ত্র এই সমাজানুরাগ। অতএব এই চারিটী মূলমন্ত্র সমাজ মাত্রেরই ভিত্তি।

এখন সমাজোন্নতির প্রকৃতসাধন পথের কথা বিবেচনা করিবার প্রণালী আরও পরিষ্কৃত হইল। অতঃপর এতৎ-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সূত্র কয়টীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাহা এই,

১। প্রতি মানুষই লোকত এবং ধর্ম্মত আপনার জন্য আপনি দায়ী। অর্থাৎ আপনি ভাল হইলেই, লোকত এবং ধর্ম্মত পরোপকার বল, পৃথিবীর বা সমাজের

উন্নতি সাধন বল, বা আর যাহাই বল, সকলইতাহার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হয়। "আপ্ ভালাত জগৎ ভালা"—এই বোধ।

২। এই বোধের মূলে বিশুদ্ধ জ্ঞান, পবিত্রতার প্রতি অগাধ নিষ্ঠা, ভগবানে অটল বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় ভক্তি থাকা চাই। এই বোধ।

৩। আমি মানুষ ও ঈশ্বরের নিকটে পুরস্কৃত হইব, এইজন্য পুণ্য করি না। আর দণ্ডভয়েও পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকি না। আমার কার্য্যের নিয়ামক ভগবানে বিশ্বাস ভক্তিজনিত ভিতরের উচ্ছ্বাস। অর্থাৎ আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমি তাঁহার ছায়া, আমার কার্য্যও তাঁহার কার্য্যের বা ইচ্ছার ছায়া, ভগবানে ভক্তি ও প্রীতিজনিত প্রাণের এই উচ্ছ্বাস আমার কার্য্যের নিয়ামক। ইহার ব্যতিক্রমেই আমার আন্তরিক অরুচি এবং অনুক্রমেই প্রাণের রুচি থাকা উচিত। এই বোধ।

৪। ভগবান আমাদের সকলের পিতা মাতা, গুরু এবং রাজা। আমরা তাঁহার একই রূপ ভালবাসার অধিকারী সন্তান, শিষ্য ও প্রজা। অতএব চিত্তকে আকাশের মত বাধাশূন্য ও উদার করিতে হইবে। যেন ব্যক্তি বিশেষের মতের ভিন্নতায়, রুচির পার্থক্যে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে আত্মদ্রোহী করে না। এই বোধ।

সংক্ষেপ করিবার জন্য মূল সূত্রাকারে যে চারিটী বোধের কথা উল্লেখ করিলাম, সমাজের প্রতি ব্যক্তির হৃদয়ে যাহাতে ইহার ক্রম বিকাশ হইতে পারে, তদ্রূপ শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। ইহা দ্বারা মানুষের মন হইতে পাপের বীজ পর্য্যন্ত দূরীকৃত হইবে। পাপের মূলের উৎপাটনের চেষ্টা না করিয়া দণ্ডবিধি অবলম্বন করা বর্ব্বরতা মাত্র। এক দিন এই বর্ব্বরতা পৃথিবী হইতে দূরীভূত হইবে। কিন্তু ভাবী শুভ দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে, রাজনীতির কয়েকটা কঠোর নিয়ম মুখস্থ করিলে হইবে না। উদার এবং উচ্চ শিক্ষা চাই—মহা সাধনা চাই। এইরূপ উচ্চ শিক্ষা বিস্তার ব্যতীত প্রকৃত সমাজোন্নতি সাধনের উপায়ান্তর আমাদের স্থূল চক্ষে পতিত হয় না। যখন কোন সমাজাকাশ অবনতির ঘোর ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হয়, চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত ঝটিকায় আন্দোলিত হইতে থাকে,ঘন ঘন আত্মদ্রোহিতারূপ বাজ পড়িয়া দেশ ছারখার হইতে থাকে, তখনই দেখা যায়, শত মধ্যাহ্ণ-সূর্য্যের তেজ বিকীর্ণ করিয়া এক এক জন মহাপুরুষ উত্থিত হন এবং তিনিই স্বর্গীয় গম্ভীর স্বরে সামাজিকগণকে এই শিক্ষাবিধান করিয়া অন্তর্হিত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে বহুকালব্যাপী ঘোর অন্ধকারে যখন ভারতবক্ষ নিবিড় রূপে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখনই পতিত আর্য্য সন্তানগণকে এই স্বর্গীয় শিক্ষাদান করিতে শিক্ষকরূপে বুদ্ধদেব আর্বিভূত হইয়াছিলেন। মহর্ষি মুসা পতিত ইহুদী জাতিকে এই শিক্ষা দিতেই ইহুদীদের সেই বিপদের দিনে জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন। যখন ইয়ুরোপাদি দেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন ঈশা তাহাদের এইরূপ শিক্ষকরূপে প্রাদুর্ভূত হন।

আমরা অনেক সময়ে প্রাচীন ও আধুনিক উন্নত সমাজ সকলের বাহিরের লেখা পড়ার চর্চ্চা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যাদির উন্নতি এবং সামরিক বলাদি

দেখিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হই। তদ্ভিন্ন এই সকল কাজের ভিত্তি-মূলস্বরূপ জাতীয় একতা, অধ্যবসায় ও সাহসাদি দেখিয়াও গম্ভীর এবং স্তম্ভিত হইয়া যাই। এইরূপে যখন আধুনিক বা প্রাচীন কোন এক জাতির প্রতি প্রাণ আকৃষ্ট হয়, তখন সেই জাতীয় লোকের আচার, ব্যবহার, আহার, পরিচ্ছদ ও বাসাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস জানিতে ব্যগ্র হই এবং তাহার অনুরূপে নিজেদের নিকৃষ্টতর সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তখন কেবল তাঁহারা কি ভাবে জীবনের প্রাত্যহিক ব্যাপারে চলিতেছেন বা চলিতেন, কি ভাবে কি করিতেছেন বা করিতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি রূপ নানা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং মনে কেবলই অনুকরণ-পিপাসা উদ্রিক্ত হইতে থাকে। এইরূপে কেহ অমুকের হ্যাটটী, কেহ অমুকের টিকিটী, কেহ চামচ খানি, কেহ বা কোশা কুশি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করেন। এই রকম ছোট ছোট অনুকরণ লইয়াই মতামত, যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। কেবল ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি চক্ষু পড়ে। কেহ বলে কৃষ্ণ ভজ, কেহ বলে খ্রীষ্ট ভজ, কেহ বলে মন্দির গড়াও, কেহ বলে গির্জ্জা সাজাও, কেহ বলে দোল, দুর্গোৎসব, রাসে মাত, কেহ বলে বড় দিন বা ইষ্টার পর্ব্বে মাতিয়া যাও, কেহ বলে ব্রহ্ম পূজাই সার, আর এক জন বলে, যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম কাণ্ড-পূর্ণ-পৌত্তিলিকতাই ভাল। এইরূপে ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্প, কল, কৌশল, লিখা, পড়া সকল বিষয়েই অনুকরণপ্রিয়তা বশতঃ নানা বাহিরের মতামত ভেদাভেদ উপস্থিত হয়। আমরা অনেক সময়েই বাহিরের দিক্ দিয়া সমাজাদির বিষয়ে বিচার ও আলোচনা করিয়া থাকি।

আমরা যে সকল মূলমন্ত্র বা মূল সূত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইচ্ছা হইলে তাহা কেহ সংশোধন করিয়া পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত কিম্বা সংক্ষিপ্ত করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনের ভাব এই যে, মানুষের মধ্যে পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম জ্ঞানের বিকাশ ব্যতীত জন-সমাজের উত্থানের উপায়ান্তর নাই। সাহস বল, উদ্যম বল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-নিপুণতা বল, সকলই ধর্ম্মের ফল। ধর্ম্ম—ভয়ের ধর্ম্ম নয়, লাভের ধর্ম্ম নয়--ঈশ্বরে গভীর প্রীতি ও ভক্তির ধর্ম্ম চাই। দেখাযায়, লোক-ভয় বা ধর্ম্ম-ভয়ে মানুষের মন হইতে প্রকৃত পাপের অঙ্কুর নির্ম্মূল হয় না। কিন্তু পবিত্রস্বরূপ ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে, পাপাদি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভবপর হয়। এই রূপ ধর্ম্মবল না পাইলে, কি করিয়া সমাজের মূল মন্ত্র সকল—মূল সূত্র সকল প্রতিপালিত হইবে? কি করিয়া মানুষ ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র ও জীবনের ভার সমাজের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত মনে উন্নতি সাধন করিবে? যখন নিতান্ত রক্তমাংসের সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তেও ধনরাশিপূর্ণ সিন্দুকের কুঁজির বা রূপ রাশিময়ী স্ত্রী কন্যার ভার ন্যস্ত করিয়া অনেক সময় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, তখন এমন অবিশ্বাসীর মুল্লুকে কি করিয়া কোটি কোটি প্রলোভন লইয়া জীবনের মহাব্রত সকল উদ্যাপন করিতে ঘর বাঁধিব?

কেহ বলিতে পারেন, কোটি কোটি লোকপূর্ণ সমস্ত সমাজটাকে এই রূপ ধর্ম্ম-

ভাবে গঠিত করা কখনই সম্ভবপর নয়। আমরা স্বীকার করি, এক দিনে সম্ভবপর নয়, দুই দিনেও নয়, কিন্তু বহুকালে সম্ভবপর। এমন কোন্ উপায়ই বা আছে, যদ্দ্বারা এক দিনে বা দুই দিনে একটা সমাজ ঠিক হইতে পারে? কত যুগ যুগান্ত হইতে ত রাজ-শাসন, সমাজ-শাসন, ধর্ম্ম-শাসন চলিয়া আসিতেছে? কৈ কোন সমাজইত উহার উপরে দাঁড়াইয়া উন্নতির পথে অটল থাকিতে পারিতেছেনা? রোম বল, গ্রীশ বল, মিসর বল, ভারত বল, এ সকলের পতনের মূল কি ঐ সকলের অভাব? কেন আজওত ভারতে ঐ তিনেরই বিদ্যমানতা আছে—বরং কঠোরতর ভাবে আছে? তবুও আমরা পতন পতন বলিয়া দিন রাত চীৎকার করি কেন? শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানের বা সৈনিক বলের অভাবই কি এই পতনের কারণ? তবে যে সকল সভ্য জনপদ বর্ত্তমান যুগে ঐ সকলের ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া মদগর্ব্বে ধরা কাঁপাইতেছে, তৎ সমুদয়েরও ভাবী পতন বড়ই শীঘ্রগামী বোধ হইতেছে কেন? বস্তুত, জন-সমাজের পতনের মূল কি প্রকৃত ধর্ম্মভাবেরই অভাব নয়? যাহা হউক, সকল উপায়ই যখন বহুকাল ব্যাপী শিক্ষা বা সাধনা সাপেক্ষ, তখন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃত উপায়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পথান্তরে যাইব কেন? আজ না হউক, কাল না হউক, এক যুগে না হউক, দশ যুগে না হউক, শত শত যুগের সাধনাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে হয়, তবুও বলি, প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব বা ধর্ম্ম-বোধ জন-সাধারণের প্রাণে জাগ্রত করিতেই দেশময়—সংসারময় শিক্ষা ও সাধনার উদ্যোগ কর। যুগে যুগে ঈশা, মূশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবির, রাম মোহন শিক্ষক রূপে আসিয়া কত শিক্ষা, কত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ কত শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদেরই শিক্ষাবলে পৃথিবী আজও মহাপ্রলয়ের কবলে পতিত হয় নাই। এস, আমরা তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশ ও শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হই। সকল জ্ঞান, সকল পবিত্রতা, সকল নীতির আলোকময় মহাপ্রস্রবণ হইতে দিন রাত্রি শিক্ষা ও উপদেশ, অনন্ত অপার সাগরের ন্যায় স্রোত বহিয়া আসিতেছে। সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, পলে পলে, তিলে তিলে অনন্ত অজস্র ধারায় তাহা হইতে নব নব শিক্ষা ও উপদেশ আমাদের হৃদয়-মধ্যে অবশ্যই উদিত হইতে থাকিবে। এভাবের কথা নয়, দোকানদারি বা আসর জমকানের কথা নয়। হয়ত, অধ্যবসায়, সাহস, উদ্যম, একতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প-নৈপুণ্য, সৈন্য-বল, ইত্যাদির কথা না বলিয়া, শুধুই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলাম বলিয়া, ইহা কাহারও নিকট ভাল লাগিবে না। কিন্তু লাগুক্ বা না লাগুক্, বিশ্বাস করি, ইহাই সত্য কথা। আশার বিষয়, এই বঙ্গ দেশে দুই এক দল শিক্ষিত লোক দেশকে ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ভারত চন্দ্র ও বিদ্যাসুন্দর। (৩য়)

ভারতচন্দ্র মালিনীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে মালিনীকে বড়ই স্বার্থপর করা হইয়াছে। স্বার্থপর করাতে চিত্রটী স্বাভাবিক হইয়াছে। ফলতঃ মালিনীর মত লোক স্বার্থপর হইয়া থাকে। মালিনী টাকা কড়ি পাইলে যত খুসি হয়, আর কিছুতেই তত নহে। মালিনী সুন্দরের জন্য বাজার করিতে গিয়াছে—তখন তাহার কি প্রকার ব্যবহার, একটুকু মনোযোগ পূর্ব্বক সে অংশ টুকু পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। তখন আর তাহার সে রূপ যৌবন নাই, সুতরাং সে আর দোকানী পসারীকে ভুলাইতে পারে না, এখন সে শুধু কথা দ্বারা সকলকে ভুলাইয়া বাজার করিতে পারে। সে কি প্রকারে মন্দ টাকা দিয়া আসল টাকার পয়সা হিসাব করিয়া নেয়, কি প্রকারে একগুণ দ্রব্য কিনিয়া তৎ পরিবর্ত্তে দশগুণ নেয়, কি প্রকারে কৌটালকে কহিয়া বেনিয়াকে ফেরে ফেলে, কি প্রকারে যে দোকানী বড় আঁটা আঁটি করে, তাহাকে নাস্তা নাবুদ করে, একটু পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। তারপর মালিনী বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুন্দরকে বাজারের যে হিসাব দিয়াছিল, তাহা অতি চমৎকার। ইহাতে তাহার চরিত্র উত্তমরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের লিপিকৌশল আরও চমৎকার। এমন সুন্দর মাজা ঘসা লেখা আর কাহারও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। দৃষ্টান্তের পক্ষে মালিনীর বাজারের হিসাব হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি। মালিনী সুন্দরকে কহিতেছে,—

আটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায় ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥

ইহাতেই এই বিষয়ের বেশ আভাস পাওয়া যায়। অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর আহারান্তে সুন্দর যখন রাজবাটীর কথা ও বিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মালিনী সবিস্তারে সকল কথা কহিল, এ পর্য্যন্ত সে বিদ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলে নাই। ইহাতে মালিনী যে খুব চতুরা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। মালিনী যতদূর পারিল, ততদূর বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিল। এ রূপ বর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের লিপি-কৌশল কত মধুর, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তারপর সুন্দরের মনোগত অভিপ্রায় বলিয়া, রাজা রাণীকে কহিয়া, ঘটকালী করিতে হীরা সুন্দরকে কহিল। সুন্দর তাহাতে নারাজ। কেন যে নারাজ, তাহারও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অন্যপক্ষে সুন্দর বিদ্যার মন বুঝিতে চাহিলে, হীরা সেই দৌত্যে স্বীকৃতা হইল। ইহা মালিনীরই কাজ। সুন্দর ফুলের মালা গাঁথিলেন। হীরা তাহা লইয়া বিদ্যার কাছে গেল। মালা গাঁথিতে সুন্দর বড় দেরী করিয়াছেন, অধিক বেলা হওয়াতে বিদ্যা কুপিতা হইয়া মালিনীকে বড় শাসাইল। তাহাতে হীরা কিছু ভীতা হইয়া, বিলম্বের কারণ বিনয়ের সহিত বলিল। এবং চিকণ মালা দিল। মালা দিয়াই হীরা ফিরিয়া আসিল না। কারণ সে জানিত, মালাতে

সুন্দর কি কল করিয়াছেন, সুতরাং শেষ ফল কি হয়, তাহা দেখিবার জন্য হীরা অপেক্ষা করিল। হীরা যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক, তাহার পক্ষে এই প্রকার ব্যবহারই খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। তারপর বিদ্যা কল দেখিয়া খুব চমৎকৃতা হইল। এবং সবিশেষ জানিবার জন্য হীরাকে বড়ই অনুনয় করিতে লাগিল। হীরাও সময় পাইয়া আপন পসার বাড়াইয়া লইল। এবং সে যাহা যাহা জানিত, সমস্ত সবিস্তারে অবগত করাইল। বিদ্যাকেও সে এই পরামর্শ দিল যে, বাপ মাকে কহিয়া এ বিবাহ সংঘটন কর। এই প্রকার পরামর্শ দিবার কারণ এই যে, হীরা জানিত, এ রাজার বাড়ীর ঘটনা, সুতরাং কিছু গোলমাল হইলে আগে তাহাকেই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অন্য কাহারও বাড়ীর ঘটনা হইলে সে এইরূপ করিত কিনা, জানি না। বিদ্যা যখন ইহাতে রাজি হইল না, তখন মালিনী কিছু বিপদে পড়িল, কিন্তু উভয়ের দর্শনব্যাপার সংঘটন করিতে আপত্তি করিল না। লুকাইয়া বিবাহ দিতে তাহার ঘোরতর আপত্তি। তাই বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত কাণ্ড মালিনীর নিকট লুকান রহিল।

সুতরাং হীরা এসমস্ত ঘটনা তখন কিছুই জানিল না। কিন্তু এক দিন হীরা এ সমস্তই জানিয়াছিল। যখন সুন্দর ধরা পড়িয়াছেন, তখন সুড়ঙ্গের অনুসন্ধান করিতে করিতে কোটালেরা মালিনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। এবং হীরাকেই ইহার মূল জানিয়া তাহাকে বড় নিগ্রহ করিল। তখন হীরা এ ঘটনা সমস্তই বুঝিয়াছিল। কিন্তু যখন কোটালেরা তাহাকে কুটিনী বলিয়া তিরস্কার করিতেছে, তখন হীরা কেমন রোষভাব দেখাইতেছে এবং কবি সেই সকল কেমন স্বাভাবিক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর সুন্দরকে দেখিয়া হীরার যে রাগ হইয়াছিল; তাহাও খুব স্বাভাবিক। রাজদরবারে হীরা যাহা বলিয়াছিল, তাহা হীরারই অনুরূপ বটে। হীরা এখন বড় দুঃখে পড়িয়াছে। কোটালেরা তাহার বড় অপমান করিয়াছে। রাজার সাক্ষাতে সে যাহা জানিত, তাহা অকপটে বলিল। এবং আপনার এই প্রকার অভাবিত বিপদে বড়ই হতাশ হইল। তাই সে মনোদুঃখে বলিয়াছিল ;—

"নাজানি কুটিনীপোনা দুঃখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী।
নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে হেন সিন্ধুর বন্ধন॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয়॥"

রাজা হীরার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অন্য কোন দণ্ড না দিয়া শুধু মাথা মুড়াইয়া, গালে চুন কালী দিয়া নগর হইতে তাড়াইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ফলতঃ হীরার মত যাহাদের কুটিনীপোনা ব্যবসা, তাহাদের এই প্রকার দণ্ড হওয়াই উচিত। ভারতচন্দ্র এই প্রকারে মালিনীকে নিগ্রহ করিয়া সমাজশাসনের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র যে অতি সুন্দর কৌশলে মালিনীর চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। ফলতঃ মালিনীর যে প্রকার হওয়া উচিত, ভারতচন্দ্র তাহাকে সেই প্রকারেই গঠন করিয়াছেন। বাস্তবিক হীরা হীরাই বটে—কাজেও বটে, কথায়ও বটে। যেখানে যাউক না কেন, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক না কেন, মালিনী সমস্তই ঠিক মত করিয়া আসিবে। তাহার অসাধ্য

কোন কার্য্যই নাই। ইহা যথার্থ মালিনীর চিত্র। এমন মালিনী যাহার আছে, তাহার কোন বিষয়ের অপ্রতুল হয় না। কিন্তু এমন মালিনী না থাকাই ভাল, কারণ তাহা হইতে অনেক সময়ে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। ইহারা বড়ই স্বার্থপর, টাকার লোভে সে না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই।

ভারতচন্দ্রের রচনা যে উত্তম, সে বিষয়ে মতভেদ নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে অনেকে তাঁহার গ্রন্থ না পড়িয়া অযথা অনেক কথা বলিয়া থাকেন, সেই জন্য আমরা তাঁহার গ্রন্থ বিস্তৃত ভাবে সমালোচনা করিয়াছি। আমরা এই সমালোচনায় ভারতের যাহা ভাল, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তবে তাঁহার গ্রন্থে অনেক কথা এমন আছে, যাহা খুব অশ্লীল এবং সুরুচিসঙ্গত নহে, এবং যাহা তাঁহার গ্রন্থে না থাকাই উচিত ছিল। আমরা এইক্ষণ তৎসম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব।

ভারতচন্দ্র সুন্দর ও বিদ্যার চরিত্র আঁকিতে যাইয়া সুন্দরকে বড়ই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এত উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, অন্যান্য সমস্ত তাহাতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থ বড় রুচিবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যদি ভারতচন্দ্র সুন্দরের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাকে বিদ্যার প্রেমবর্ণনা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিয়া, বিদ্যার প্রেমকে আরও উজ্জ্বল রূপে বর্ণনা করিয়া তৎপ্রাধান্য সংস্থাপন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য উত্তম হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। সুতরাং বার বার উজ্জ্বলরূপে সুন্দরের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বর্ণন করিয়া তিনি তাঁহার কাব্য কলঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রকার বর্ণনাতে তাঁহার কাব্য বড় অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। ইহা না হওয়াই ভাল ছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতচন্দ্র যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে লোকে আদিরসঘটিত সমস্ত কাব্যই ভাল বাসিত এবং আদর করিত। যাহার রচনায় আদিরস বর্ণনা নাই, লোকে তাহাকে বড় সমাদর করিত না। এমন কি, ভারতচন্দ্র যখন অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তাহা উপহার প্রদান করিলেন, তখন মহারাজ তাহাতে আদিরসঘটিত বর্ণনা নাই দেখিয়া বড় খুসী হইলেন না। ভারতকে আদিরসঘটিত বর্ণনাযুক্ত বিদ্যা-সুন্দর রচনা করিতে আদেশ করিলেন। তাই ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রকার অশ্লীল হইবার চারিটী কারণ আমরা দেখিতে পাই। প্রথমত, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ রচনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত ভারতচন্দ্র তাঁহার সময়ের রুচি অনুসারে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালী বড় বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আজিও বাঙ্গালী বিলাসপ্রিয়, তবে আগের মত নহে। এখন বাঙ্গালী কিছু কার্য্যক্ষম হইতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। তৃতীয়ত, তিনি যে বররুচির বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থত, বর্দ্ধমানের রাজ কর্ম্মচারী ও রাজা কর্তৃক ভারতচন্দ্র বার বার বড় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাই

তিনি সুবিধা পাইয়া পূর্ব্ব আক্রোশ মিটাই-বার জন্য তাঁহার গ্রন্থ এই ভাবে লিখিয়াছেন। যদিও ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের সমস্ত কর্ম্মচারী ও স্ত্রীলোকদিগকে নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপন নায়িকা বিদ্যার চরিত্র খারাপ করিয়া চিত্রিত করেন নাই।

ভারতচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও সুন্দরের এই প্রকার গোপনীয় বিবাহ, সমাজের শাসন অতিক্রম করিয়াছে এবং ইহা যদি সমাজে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে সমাজ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। তাই তিনি বিদ্যাকে রাণীর মুখে তিরস্কার করাইয়াছেন, তাই তিনি সুন্দরকে চোররূপে রাজ সভায় আনয়ন করিয়া পরে মশানে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু যখন বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, বিদ্যা-সুন্দরের এই প্রকার ঘটনাতে নীতির মূলে কোন দোষ ঘটে নাই, তখন তিনি রাজার মুখ হইতে "কাটিতে বাসনা নাই ঠেকেছি মায়ায়"—এই বাক্য বহির্গত করাইয়াছিলেন। সমাজশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়া মালিনী দেশান্তরিত হইল। বাস্তবিক ভারতচন্দ্র সর্ব্বদাই সমাজিক প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গীয় কবিই ভারতের মত এত দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে চরিত্রের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পান নাই। সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে কবিরা বরাবর চরিত্রের সমতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন বঙ্গকবিই সেরূপ করেন নাই। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে আমরা প্রথমে চরিত্রের সমতা রক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ভারত চন্দ্রের উচ্চ শ্রেণীর মানবের প্রকৃতি বিলক্ষণ জানা ছিল, তাই তাঁহার রচনা এত উৎকর্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এবং তাঁহার রচিত চরিত্র গঠন হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতচন্দ্র প্রত্যেক চিত্রই বিশেষ যত্নের সহিত লিখিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের আরও একটী গুণ ছিল। তিনি উপাখ্যানকে মধুর করিতে জানিতেন। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অতি সরল, মধুর এবং স্বাভাবিক। যখন যেস্থানে পাঠ করা যায়, তখনই সেই সমস্ত ভাব আমাদের মনে প্রতিভাত হয়। ফলতঃ ভাবের উদ্দীপনা এবং সেই উদ্দীপনা দ্বারা মানবহৃদয়কে মোহিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। ভারতচন্দ্র তাহাতে অদ্বিতীয়।

তবে আজিও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন বলিয়া গালি দিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় সে সমস্ত গালির কিছুই মূল্য নাই। যাঁহারা ভারতচন্দ্রকে মন্দ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সংসার সম্বন্ধে বড়ই অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান অথবা নীতি-জ্ঞান পুস্তকলিখিত মতামত হইতে সংগৃহীত; তাঁহারা সামাজিক রীতি নীতি নিজ বুদ্ধিতে মীমাংসা করিতে অক্ষম। ভারত-চন্দ্রের গ্রন্থের যে দোষ নাই, তাহা বলা আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ সামান্য দোষের জন্য ভারতচন্দ্র নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে গুণ ভাগ এত অধিক যে, যাঁহারা উদারপ্রকৃতি, তাঁহারা ভারতকে কখনই অবহেলা করিতে পারিবেন না। বরং ভারতের কবিত্বে ও লিপিকৌশলে

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর দেশমধ্যে এত প্রচার হইয়াছে যে, বঙ্গে এমন কেহ নাই, যে ইহার বিষয় অবগত নহে। সামান্য লোক হইতে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত সকলেই ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। ভারতের বিদ্যাসুন্দর দ্বারা কত গান, কত যাত্রা---বঙ্গে গীত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ইহার এই প্রকার বহুল প্রচার দেখিয়াই আমরা ইহার এত বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা বাস্তবিক বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল কিনা? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় উপাখ্যান লোকসমাজে যে ঘটিতে পারে না, তাহা আজি কালির লোকদিগকে বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। ইহা কবির কল্পনা মাত্র। বররুচি তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরে উজ্জয়িনীকেই এই ঘটনার স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা অনুবাদক গুণাকরের পূর্ব্বে কেহ ইহা বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বীরসিংহ বলিয়া বর্দ্ধমান রাজবংশে কোন রাজা কোন কালে বর্দ্ধমানে রাজত্ব করেন নাই। ইহা কবির কল্পনা মাত্র। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ার পর সকলে ইহার বিষয় অবগত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্র যে শুধু বর্দ্ধমান রাজপরিবার ও রাজ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়াই এ ঘটনা বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ প্রচার হওয়ার পরে লোকের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাই তাহারা আজিও বর্দ্ধমানে ২টী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া একটীকে মালিনী পোঁতা ও অন্যটিকে বিদ্যা পোঁতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান উপলক্ষ করিয়া কেহ কেহ বর্দ্ধমান রাজপরিবারের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ কটাক্ষপাতের যে কোন মূল নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। এঁকেত এ ঘটনা কবি কল্পনা মাত্র। যদি কবি কল্পনা না হইয়া সত্য সত্যই এ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাতেই বা দোষ কি? ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সুন্দরকে কালীর কিঙ্করী ও কিঙ্কর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুর মতে, যে কুলে কালীর কিঙ্করী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে কুলে কালীর কিঙ্কর বিবাহ করেন, সে কুল খুব সম্মানিত হইয়া থাকে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বর্দ্ধমানের রাজাদিগের প্রতি রোষপরবশ হইয়া গুণাকরদ্বারা বর্দ্ধমানের রাজবংশে কলঙ্ক নিক্ষেপ অভিপ্রায়ে বিদ্যাসুন্দর রচনা করাইয়াছিলেন। এ কথা কতদূর সত্য,তাহ আমরা জানিনা। বোধ হয়, ইহা লোকের কল্পনা মাত্র। কারণ তাহা হইলে বর্দ্ধমানের রাণী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভূমি ইজারা লইতেন না। অথবা কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহাকে ইজারা দিতেন না। তবে গুণাকর যে কারণে এ ঘটনা বর্দ্ধমানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরজনীকান্ত রায়।

ওরেরে সোণার শশি তোরে আমি ভাল বাসি।

ওরেরে সোণার শশি,
তোরে আমি ভালবাসি;
তাই তোরে মনে হলে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া;
শরীর কেমন করে,
থাকিতে পারিনা ঘরে,
দেখিতে বদন তোর আসি হেথা ধাইয়া।

মোহন মূরতি তোর,
প্রেম রসে ভোর ভোর,
প্রেমিকের প্রাণে দেয় প্রেম-উৎস খুলিয়া;
ও তোর মধুর আলো
প্রাণে বড় লাগে ভালো,
তাই কবি যায় ভাবে আপনাকে ভুলিয়া।

সুন্দর নয়নে তব
ফোটে হাসি নব নব,
সুন্দর রূপেতে ভাসে সুবিমল অমিয়া;
ইচ্ছা হয় ধেয়ে যাই,
অবিরত মধু খাই,
ও সুরস মুখ খানি ধীরে ধীরে চুমিয়া!

মধুর ফুটন্ত হাসি
আমি বড় ভাল বাসি,
তাই তোর রূপে থাকি একবারে মজিয়া;
দেখিতে দেখিতে রঙ্গে
ভাবের তরঙ্গসঙ্গে
প্রাণের মোহন-বাঁশী ধীরে উঠে বাজিয়া।

বল বল ভাই মোর
কেন এত হলি চোর?
কেন এত-চুপ করে কুটীরেতে ঢুকিলি?
মোহন মায়ার বলে
প্রাণটীকে ধরি ছলে,
অনন্ত স্বপন-জালে একেবারে বাঁধিলি?

পিঞ্জর ছাড়িয়া হায়
প্রাণটী উড়িয়া যায়,
"আয় আয় আয়" বলি তবু ফিরে চায় না,—
চাঁদনির ইশারায়
পাগলের মত ধায়,
কোথায় চলিয়া যায় কাহাকে জানায় না!

অই অই মরি মরি
বিরহীর বেশ ধরি,
পাখিটী ছুটিয়া যায় মৃদু মৃদু ডাকিয়া;
অই তোর গায়, শশি,
গেলরে গেলরে মিশি,
পাছেতে রহিল মাত্র ক্ষীণ স্বর পড়িয়া!

কেন চাঁদ, বলো বলো
প্রাণটী এমন হলো?
শরীর ভেদিয়া তোর কোথা সে লুকায় রে?
কেন যায়, কোথা যায়?
কাঁহাকে দেখিতে চায়?
তোর মধু খেতে যেয়ে কার মধু খায় রে?

জানি নাই বুঝি নাই,
কেবল দেখিতে পাই,
সোণার একটী ছায়া ভাসে তোর বদনে,
দলের ভিতরে দল
প্রেম-রসে ঢল ঢল,
মধুর ভিতরে মধু উথলয় নয়নে!

ওরেরে সোণার শশি,
তোরে আমি ভাল বাসি,
চেয়ে তোর মুখ পানে কারে মনে হয় লো
ও তোর মুরতি হেরি,
কার ছবি মরি মরি
হৃদয়-আকাশে আসি ধীরে দেখা দেয় লো

নির্ম্মল মুকুর-দেশে
যেন প্রতিবিম্ব ভাসে,
ও মোহন রূপ খানি' কাঁর রূপ ধরে লো?
ও হাসি ভিতর দিয়া
কার হাসি উথলিয়া
বিমলা চপলা সম উকি ঝুকি মারে লো?
বুঝেছি সোণার শশি,
কাহার ছায়াটি আসি
ফুটন্ত নয়নে তোর খল খল হাসিছে;—
বিমল অমৃতময়
কাহার মাধুরি চয়
চঞ্চল জোছনা সঙ্গে ধীরে ধীরে ভাসিছে।
ওরেরে সোণার শশি
তোরে আমি ভাল বাসি,
তুমি মোরে কৃপা ক'রে হারাধন দিয়েছ,
নিয়ত যাঁহার তরে
কাঁদিতাম হা হা ক'রে
তাঁকে দিয়ে তুমি মোর প্রাণে সুধা ঢেলেছ।
তোমারি মূরতি হেরে
চিনিতে পেরেছি তাঁরে,
যাঁহার শোকেতে আমি দিবা নিশি জ্বলিছি,
সেই মোর কোলাকুলি
হৃদয়ের গলাগলি
আবার তোমারি কাছে ভাল ক'রে শিখেছি।
হাস হাস বিধু মোর
প্রেম-রসে হয়ে ভোর,
আমিও তোমার সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসিব;
তুমি আমি এক হয়ে,
সুরে সুর মিলাইয়ে,
চিরকাল প্রেম ভরে তাঁর গুণ গাহিব;
আমার দুফোঁটা জল
প্রেম রসে ঢল ঢল
তাঁর সঞ্জীবনী কোলে গড়াইতে থাকিব;—
গড়াইয়ে গড়াইয়ে
দুটি প্রাণ এক হয়ে
অনন্ত কালের তরে অনন্তেতে ডুবিব!

শ্রীমতি লাল দাস।

বোম্বে ও পুনা ভ্রমণ। (২য়)

পর দিন প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর একটী ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত মহারাষ্ট্রীয় ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ইহার নাম মেঃ ওপ্টে, ইনি সরকারি ব্যয়ে বিলাতের প্রদর্শনীতে বোম্বাই মিউজিয়মের কিউরেটার স্বরূপে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আহারাদির আয়োজন করিতে বলিলাম, কারণ সেই দিনই এলিফান্টা দ্বীপ দেখিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইলাম। আহারাদি করিয়া প্রায় ১টার সময় এপলো বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের সঙ্গে ছাত্রনিবাসের ৬।৭ জন ছাত্র ছিল। সেখানে একখানি সুন্দর নৌকা ভাড়া করিলাম। এ নৌকাগুলির অনুরূপ নৌকা কলিকাতা ভাগিরথীর ঘাটে দেখা যায় বটে, কিন্তু নৌকা গুলির চলাফেরা ও গঠন কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, এবং পাল ইত্যাদির বন্দোবস্ত ভাল। কিছু জলযোগের সামগ্রী লইয়া, নৌকায় উঠিলাম। মাঝিরা পাল তুলিয়া দিয়া গান ধরিল। সমুদ্র হইতে বোম্বাইর শোভা বেশ দেখিতে লাগিলাম। গুলি-

য়াছিলাম, সমুদ্রের জল অতি লবণাক্ত ও বিস্বাদ, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটু জল তুলিয়া মুখে দিলাম, তাহার এত বিকৃত স্বাদ পাওয়া গেল যে, কখনও তাহা মনেও করি নাই। তখনই মনে হইতে লাগিল যে, নাবিকেরা এই অপার জলরাশির মধ্যে থাকিয়াও এক বিন্দু জলও পান করিতে পারে না। বায়ুর অনুগ্রহে আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এলিফাণ্টায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই দ্বীপটী বোম্বাই হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত, ইহাকে দ্বীপ না বলিয়া, সমুদ্রস্থিত পাহাড়-পুঞ্জ বলিলেও চলে। ইহাতে লোকের বাসস্থান আছে কিনা, জানি না। আমরা যে স্থানে অবতরণ করিলাম, তথা হইতে ক্রমোচ্চ সোপানমালা গিরিগহ্বরস্থ মন্দির পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এত বড় সহরের নিকটবর্ত্তী দর্শনীয় স্থান বলিয়াই সর্ব্বদা ইহা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ থাকে। আমরা ক্রমে ক্রমে পাহাড়ে উঠিলাম। দ্বারে একটী বৃদ্ধ সাহেব টিকেট বিক্রয় করে, টিকেট লইয়া আমরা গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। একটী রাজকীয় ভৃত্য আমাদিগকে সমস্ত বস্তু দেখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পাহাড় কাটিয়া এ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তম্ভগুলিও অতি পরিষ্কার ও সুন্দর, আর চারিদিকে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত। এত বড় দেবমূর্ত্তি আর জন্মে দেখি নাই, ১৩। ১৪ হাত দীর্ঘে ও ১৫।১৬ হাত প্রস্থে কয়েকটী দেবমূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল এ সমস্ত বৌদ্ধ মন্দির হইবে, কিন্তু এখানে আসিয়া সে ভ্রম দূর হইল। ত্রিমূর্ত্তি, গণপতি, পার্ব্বতী এ কয়েকটী দেবমূর্ত্তিই অতি প্রকাণ্ড। এক অতিবৃহৎ শিবলিঙ্গও দেখিতে পাইলাম। কেহ কেহ ইহাকে জৈনমন্দিরও বলে। আমাদের হিন্দু মন্দির বলিয়াই প্রতীতি জন্মিল। সূক্ষ্মদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় কি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, জানিনা। মন্দিরটী দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম, কি উপায়ে এই প্রকাণ্ড পর্ব্বত-গহ্বর খোদিত হইয়াছে, কি অস্ত্র দ্বারাই বা এই অমানুষিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, আর যাহারা এই অভেদ্য শিলাখণ্ড খুদিয়া এত বৃহৎ ও মনোরম দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই শিল্পীদিগের শিল্পনৈপুণ্যই বা কত ছিল; কত শ্রমজীবী লোকই বা এই বৃহৎব্যাপার সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল; এবং কতকাল ধরিয়া এই সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে;— কল্পনার সাহায্যে এসকল ভাবিয়া স্থির করা কঠিন। এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা ভৌতিক বলিয়া মনে হয়। দেবমূর্ত্তির অনেক গুলিই ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাইলাম। ইংরাজ মহোদয়েরা নিজ দেশীয় মিউজিয়ম শোভিত করিবার জন্য অনেক দেব দেবীর মস্তক ও নাসা ছেদন করিয়াছেন। আজ কাল যাহা আছে, তাহা রক্ষার জন্য বেশ বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে হস্তীর প্রতিমূর্ত্তির জন্য এই দ্বীপটী এলিফাণ্টা নামে অভিহিত হইয়াছে, সেটী কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম না। মন্দির দেখা শেষ হইয়া গেলে, পাহাড়ের শীর্ষ স্থানে উঠিবার জন্য আমাদের বড় সাধ হইল। পথ একবারেই নাই, তাই গাছ পালা ধরিয়া কত দূর উঠিলাম; তাহাতেই অনেক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। নামিবার সময়ে হামাগুড়ি দিয়া নামিতে হইল।

সন্ধ্যার সময়ে নৌকাযোগে আসিয়া বোম্বাই যাত্রা করিলাম। সমুদ্রের মধ্যে সন্ধ্যা-বাতাস সেবন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম। ইচ্ছা ছিল, প্রার্থনা সমাজে গিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংস্কৃত উপাসনাপ্রণালী দেখিব, কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখি, তাহাদের পূজা অর্চ্চনা শেষ হইয়া গিয়াছে, উপাসকেরা গৃহে গমনোন্মুখ। উপাসকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আমাদের ছাত্র বন্ধুটী উপাসকদিগের মধ্য হইতে দুই তিনটী প্রধান লোককে দেখাইয়া দিলেন। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাংকে দেখিতে পাইলাম, বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীণ ডাক্তার আত্মারামকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাদিগকে বিদেশীয় দেখিয়া আমাদিগের সহিত আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া কিছুকাল সুমিষ্ট আলাপ করিলেন। তাঁহার সৌজন্যে আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছিলাম।

তার পরদিন প্রত্যুষে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বিলাতপ্রত্যাগত বন্ধু ওপ্টের সহিত অত্রত্য হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার মেঃ বামন আবাজি মোড়কের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ইনি বোম্বাই সহরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জ্ঞান, প্রতিভা ও শিষ্টাচারে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি সংস্কারকদিগের এক জন নেতা, এবং প্রার্থনা সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য। আমরা জানিতে পারিলাম যে, ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম গ্রাডুয়েট। ইহার গৃহে আমাদিগকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, কারণ আমাদিগের যাওয়ার পূর্ব্বেই তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে ঘরের টেবলস্থিত সংবাদ পত্র ও গ্রন্থাদি পড়িতে লাগিলাম। ইহার পুস্তকাদি দেখিয়াই বোধ হইল, ইনি এক জন মার্জ্জিতরুচি ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থাদি দেখিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই ইনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার বিনয়ে, জ্ঞানগর্ভ আলাপে ও শিষ্টাচারে আমরা যথেষ্ট প্রীত হইলাম। ইহার শিক্ষা অতি উচ্চ শ্রেণীর। দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। যদি ও প্রাচীন দলের লোক, তবু আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনে ইঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাইলাম। ইনি অনেকক্ষণ যাবৎ খ্যাতনামা প্রাতঃস্মরণীয় দাদা ভাই নরোজির গুণগান করিলেন, এবং বলিলেন, ইনি বাস্তবিকই স্বাভিলাষশূন্য (Self-less) মনুষ্য ; দাদা ভাইর ন্যায় আর কয়েকটী লোক জন্ম গ্রহণ করিলে ভারতের দুঃখদারিদ্রের কথঞ্চিত অবসান হইবে। বিখ্যাত অনারেবল টেলাং ও মেঃ মেটার বিষয়ে অনেক কথা হইল। মেঃ টেলাং অসুস্থতা নিবন্ধন জাতীয় সম্মিলনীতে যাইতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রতি ইঁহার বিশেষ বিদ্বেষ দেখা গেল। ইঁহার সকল সমাজের সহিতই সহানুভূতি আছে। ইনি বঙ্গদেশীয় যুবক দিগের ধর্ম্মানুরাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকেরা মিল স্পেন্সার কম্‌টি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের গ্রন্থাদি পড়িয়া ঐ সমস্ত বিষয়ে ক্রমেই উদাসীন হইয়া পড়িতেছে ; ধর্ম্মে তাহাদিগের বিশেষ আস্থা নাই। তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তরলমতি বালকেরা ঐ সমস্ত দর্শনের নিগূঢ় ভাব ও একদেশদর্শিতা

হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই অবিশ্বাসের রাজ্যে উপস্থিত হয়। ইঁহার সহিত কথোপকথনে ইঁহাকে সমস্ত বিষয়েই সংস্কার-পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হইল। ইহার গৃহে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম,ইহাতে বাঙ্গালী বলিয়া মনে একটু গৌরবের উদয় হইল যে,ভারতের সর্ব্বত্র পূজিত ও সম্মানিত হইবার যোগ্য পাত্র আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সময়াভাবে চা ও ধূমপানের বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আহারাদির পর মেঃ ওপ্টের সহিত বোম্বাই জিজাভাইশিল্পবিদ্যালয় (Bombay School of Arts)দেখিতে গেলাম। বোম্বাই আসিয়া বুঝিতে পাইলাম—এদেশীয় ধনীদিগের দানশীলতা কত উচ্চ দরের। পারসী ও ভাটিয়াদিগের প্রতি কমলা অতি প্রসন্না, এবং ইহারাই বাস্তবিক কমলার অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার করিতে জানে। মূক, খঞ্জ, বধির, অন্ধ, ও সর্ব্ববিধ প্রকার রুগ্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশাপনোদনের জন্য ইহাদের দানশীলতা কি না করিয়াছে? সংবাদপত্রপাঠকেরা ইঁহাদের দানশীলতার কথা অনেক পড়িয়া থাকিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসংরক্ষণার্থে বোধ হয় যেন বোম্বেবাসীরা অজস্র অর্থব্যায় করিয়াছে। বলিতে হইবে না যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রতি বৎসর প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি দেওয়া হয়, সেই প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বোম্বেনিবাসী। এস্থলে তাহাদের দানশীলতার দুএকটী উদাহরণ উল্লেখ করিব। মেঃ ওপ্টে (Curator) বলিয়াই ছুটীর দিনে এই দর্শনীয় স্থানটী দেখিতে পাইলাম, অন্যথা দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ গৃহটী পারসী মহাত্মা জিজাভাইর অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। শিল্পবিদ্যালয়ের গম্ভীর শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

অধ্যাপকেরা পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা দিয়া থাকেন;—কোথাও চিত্রবিদ্যা, কোথাও স্থপতিবিদ্যা ইত্যাদি।

ইটালীর জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদিগের চাতুর্য্যের নিদর্শন অনেক দেখিতে পাইলাম। মৃণ্ময়ী ও প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তিগুলি অতি আশ্চর্য্যজনক। একটী বালক কণ্টকবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত অভিনিবেশসহকারে কণ্টকটী উদ্ধার করিতেছে, একটী প্রতিমূর্ত্তি ইহা প্রকাশ করিতেছে; সেই বালকটীর মুখে যেন যন্ত্রণা ও একাগ্রতা জীবন্তভাবে প্রতিফলিত। ধন্য শিল্পচাতুর্য্য! ইটালীয়ান ফ্রেস্কো (Italian Fresco) অনেক দেখিতে পাইলাম। চিত্রফলকে অনেক মনোমদ স্বভাবের ছবি, ও সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। ইলোরা প্রভৃতি গহ্বরমন্দিরের চিত্রাবলীও অঙ্কিত রহিয়াছে। একটী স্থানে দেখিতে পাইলাম, একটী ছাত্র দর্পণে স্বীয় প্রতিকৃতি দেখিয়া একটী মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে। শুনিলাম, সে কলেজের একটী সর্ব্বপ্রধান ছাত্র, এবং কালে একজন বিখ্যাত শিল্পী হইবে। ঐ বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট এই কয়েকটী কারখানা আছেঃ—(১) মৃণ্ময় পাত্রাদি নির্ম্মাণের, (২) লৌহ ঢালাইর, (৩) ফটোগ্রাফ তুলিবার, (৪) রং করিবার। এই কারখানা গুলি এক একটী বিখ্যাত ছাত্রের তত্ত্বাবধানে আছে। শুনিলাম—তাহারা উহা হইতে মাসিক ৩০০।৪০০ শত টাকা

লাভ করিয়া থাকে। এদেশে যে সমস্ত ইংরেজ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমাও আমরা বেশ্ জানি; যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ইঁহারা প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী। দেশে যাইয়া ইহারা শিল্প সম্বন্ধে পরিমার্জ্জিত রুচির বিশেষ পরিচয় দিতে চান্, কাজেই দেশে যাইবার সময় ভারতীয় শিল্পের নমুনা লইয়া যান্। প্রায় ইংরেজই বোম্বের পথে ইংলণ্ডে গমন করেন, সুতরাং ঐ সমস্ত কারখানাজাত দ্রব্যের বিশেষ সমাদর। কলিকাতায় একটী চিত্রশালিকা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ নয়নানন্দকর কি আছে, জানিনা। বোম্বেতে জিজাভাইর অর্থে নির্ম্মিত ভারতেশ্বরীর একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। কলিকাতায় গড়ের মাঠে ও মিউজিয়মে পাঠকবর্গ অনেক বড় লোকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছেন; কিন্তু ইহার সহিত তুলনা হইতে পারে, কলিকাতায় এমন কিছু নাই। প্রস্তরে বস্ত্রাদির সূক্ষ্মতম ভাজ্ এমন নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শিত হইতে পারে, ইহা কখনও মনে করি নাই। টাউন-হল্ প্রভৃতি অনেক বড় বড় অট্টালিকা দেখিলাম, সে সমস্ত বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

বোরীবন্দরষ্টেসন নামক একটী প্রকাণ্ড ষ্টেসন বোম্বাইতে নির্ম্মিত হইতেছে শুনিয়া থাকিবেন। শুনিতে পাই, পৃথিবীর মধ্যে যত ষ্টেসন আছে, তাহাদের মধ্যে এটী একটী প্রধান ষ্টেসন হইবে। ষ্টেসনটী এখনও সম্যক-রূপে নির্ম্মিত হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবে। আমরা উহার অনেক স্থান ঘুরিয়া দেখিলাম। গৃহনির্ম্মাণে নিয়োজিত একটী ভদ্রলোক আমাদিগকে সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন। ঐ গৃহের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছিলাম। চূড়াটী এখনও সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয় নাই। সেখানে গেলে মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাই অল্পেতেই নামিয়া আসিলাম।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পুরাতন।

নূতনের এতই আদর!
পুরাতন কেহই কি নয়?
পুরাতনে নাহি রম্য কিছু—
শুধু সে কি বিভীষিকাময়?
সে কি জানে কাঁদিতে কেবল,
আনিতে প্রাণের দীর্ঘশ্বাস?
সাগরে সে আনে শুধু ঝড়—
দেয় না কি উষার বাতাস?
গাহে সে কি বিলাপের গান,—
কেবল সে বিলাপে মাতায়?
দেয় না কি কণামাত্র সুখ
বিন্দুজ্ঞান নবীন ধরায়?

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ঘোষ

কাল।

(Shelly.)

গভীর অতল সিন্ধু বরষ তরঙ্গ তব
কাল, মহা পারাবার মনস্তাপ তব বারি।
মানব-নয়ন-নীরে হয়েছে বিস্বাদ ঘোর;
সীমা হারা অম্বুরাশি, প্লাবিতেছে উঠি পড়ি,

বিশাল বিস্তৃত এই অনন্ত মরণদেশ।
গ্রাসি গ্রাসি পরিশ্রান্ত,গরজিয়া আর চাও,
উগারিয়া ফেল পুনঃ মরুময় তব তীরে;
শান্তিতে বিশ্বাস নাই, ঝটিকায় ভয়ঙ্কর,
সীমাহারা পারাবার,কে ভাসিবে তব নীরে?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়।

স্মৃতি।

(Shelly)

সঙ্গীত, বিলীন হোলে মৃদুল সুস্বর,
অভিঘাত করে স্মৃতি মাঝে;
সুগন্ধ, শুকায়ে গেলে ভায়োলা সুন্দর,
গন্ধদীপ্ত ইন্দ্রিয়ে বিরাজে।
গোলাপের পাতা গুলি, গোলাপ মরিলে,
রহে প্রণয়ীর শয্যা তরে;
তেমতি তোমার চিন্তা, আছে,তুমি গেলে
ঘুমাইবে প্রেম তার' পরে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

সাঁজের বেলায়।

(Tennyson.)

সাঁজের বেলায় দুজনাতে মিলি,
ফোটা ফোটা ফুল বেছে বেছে তুলি—
গোলাপ, টগর, শেফালিকা বেলি,
সাধের বাগানে পূরিয়া সাধ;
প্রিয়াতে আমাতে সেখানে দুজনে,
কুসুম তুলিতে, কি জানি কেমনে,
কি জানি কেমনে বলিতে পারিনে,
কেমন করিয়া হ'ল বিবাদ;
আবার তখনি সব ভুলে গেনু,
ধীরে ধীরে তার বদন চুমিনু,
দুজনের পানে দুজনে চাহিনু,
দুজনেরই চোখ্ ভাসিল জলে;
কত বার মনে হইল বাসনা,—
এ বিবাদ কেন সদাই হয় না,
এই অশ্রুজল কেনই ঝরে না,
কেনই কাঁদিনা পরাণ খুলে?
কত মধুময় হয়রে জীবন,
কত দৃঢ় হয় প্রেমের বাঁধন,
অশ্রুজলে ভাসি করিবে চুম্বন
যখনি তাহারে প্রাণের সখী।
আবার যখন—দুজনে যখন,
অতীতের ব্যথা করিনু স্মরণ,
আবার কাঁদিয়া করিনু চুম্বন
দুজনের পানে দুজনে দেখি।

শ্রীপ্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়।

উচ্ছ্বাস-সঙ্গীত।

১

বসন্তপ্রভাত লাগি
ঘুমন্ত হৃদয় জাগি
উঠিয়াছে আজ,
নাহি তথা অন্ধকার
নিরাশ-হিমানী ধার
বাষ্পময় করি।

২

আশার অরুণ-করে
কুহেলিকা গেছে সরে;
হৃদয় কাননে
চারুপুষ্প দলে দলে
ফুটিয়াছে পরিমলে
সুরভি ঢালিয়া

৩

ভাবের ভ্রমরগণে
মানস-নিকুঞ্জ-বনে
করিছে গুঞ্জন,
প্রজাপতি কল্পনার
রঞ্জিয়াছে চারিধার
সৌন্দর্য্যে উড়িয়া।

৪

চিন্তার বিহঙ্গকুলে
ঊষার লাবণ্যে ভুলে

গাহিছে কেবল,
ললিত বন্দনা-স্বরে
বসুধা চেতন করে
উল্লাস-ঝঙ্কার।

৫

খুলিয়া গিয়াছে মোর
প্রাণের কপাট, ভোর
বিষাদ-শর্ব্বরী,
উথলিছে অবিরল
ভালবাসা সুবিমল
জাহ্নবী-প্রপাতে।

৬

মর্ম্মতল ভাসাইয়া,
উচ্ছ্বাস-সঙ্গীত নিয়া,
বহে স্নেহ-ধার;
বিলাইব আজি ভবে
হিয়ার মমতা সবে
নূতন জীবন।

৭

সঙ্কীর্ণতা নাহি আর,
এক স্রোত,—শত ধার
প্রবাহে হিল্লোলে,
সেই প্রেম এক স্থানে
উপজিল পূর্ণ প্রাণে
ধরেনা এখন।

৮

প্রেমমন্দাকিনী দানে,
মহাসিন্ধু প্রতিদানে
লভিয়া হৃদয়,
আনন্দে শতধা হয়ে
পড়িতেছে উথলিয়ে
জগতের দ্বারে।

৯

স্নেহের সাগর-জলে
কে ভাসিবি কুতূহলে
আয়রে ছুটিয়া,
সুকুমার শিশুগণ
জীবন দুর্ল্লভ-ধন
আয়রে সকলে।

১০

উত্তাল তরঙ্গহীন
এজলধি, রাত দিন
মৃদুল লহরে,
বহিছে লহনা তুলি,
প্রাণের বাছনী গুলি
খেলে দুলে আয়।

১১

হাসিভরা ফুল্ল মুখে,
পবিত্রতাপূর্ণ বুকে,
শত দল সম
এ স্নেহ অম্বুধি নীরে
আয় তোরা ফুটিবিরে
ত্রিদিব-কুসুম।

১২

প্রেম-সিন্ধু আলো করে
ফুটে থাক থরে থরে
মাধুরী ছটায়;—
অন্তর-বাসনা যত
সুখদ ভাস্কর মত
রশ্মি বরষিবে।

১৩

হৃদয়ের কোমলতা
পিয়াইবে মধুরতা
শীতল করিয়া;
নিশ্বাস-পবন-সনে
খেলিবিরে জনে জনে
আহ্লাদে ভাসিয়া।

১৪

সমীরণ-দূতবরে,
প্রচারিতে ঘরে, ঘরে,
উৎসব-বারতা,—
পাঠায়েছি, বিশ্বময়
নিমন্ত্রিবে সমুদয়
উচ্ছ্বাস-সঙ্গীতে।

১৫

প্রেমাম্বু ছুটিয়া যায়,
শত স্রোতে গান গায়,
বাধা নাহি মানি;
ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণী গণ
এস, প্রীতি বিতরণ
করিব সবারে।

১৬

ভগবত-ভক্তি-নীরে
বহে চিত্ত-পারাবারে
প্রীতির উচ্ছ্বাস,
তাই, ভাই, আর কেন
দূরতা রহিবে হেন
এ জীবজগতে?

১৭

সে চরণে সবাকার
গতি, মুক্তি, চিরাধার
সেপদ আশ্রয়ে;
এক হয়ে যাই সবে,
দ্বিধা কভু না রহিবে
প্রেমের ধরায়।

১৮

মুক্ত প্রাণে দাঁড়াইয়া
এস বন্ধু, প্রীতি দিয়া,
জীবের দুর্গতি
আজি করি বিমোচন,
উদ্ধারি শোকার্ত্ত জন
বিশ্বপ্রেম ধারে!

১৯

প্রাণীর মঙ্গল তরে
এস, প্রীতি অকাতরে
দেইগে আমরা,
অভিন্ন আত্মার যোগে
পূর্ণানন্দসহ ভোগে
জীবদুঃখ হরি।

শ্রীমতী নীহারিকা-রচয়িত্রী।

চৈতন্য-চরিত ও চৈতন্য-ধর্ম্ম। (১৪শ)

নূতন মানুষ।

গৌরচন্দ্র গয়া হইতে নবজীবন লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে মানুষ নাই, সে ভাব নাই, সে চেহারা নাই। স্বর্গের নূতন আলোকের জ্যোতিঃ পড়িয়া সকলই নূতন হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডিত্য গর্ব্ব ও চঞ্চলতার স্থান ব্যাকুলতাও বিনয় অধিকার করিয়াছে; অনুরাগে ডগমগ ও প্রেমাবেগে গরগর হইয়া যখন নদীয়ার রাজপথ দিয়া তিনি স্বভবন অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখনকার ভাব দেখিয়া নবদ্বীপবাসী অবাক্ হইয়া গেল। আত্মীয়গণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে, তিনি, জননীর পদধূলি লইয়া সকলের সঙ্গে শিষ্টালাপ করিলেন। পুত্রের পুনর্ম্মিলনে শচীর মনে আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল; নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিভৃত

হৃদয়-কন্দরে প্রেমোল্লাস উচ্ছ্বসিত হইল, তাহা আর কেহ জানিতে পারিল না। গৌরের শ্বশুরগৃহেও উৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের ভালবাসার পাত্র আর ক্ষুদ্র পরিবারে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না, অনন্ত-বিশ্ব রাজ্যপানে ছুটিতেছে। যাহা হউক, গৌরচন্দ্র কোন মতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "নিমাই, তোমার অনুপস্থিতিকালে তোমার পড়ুয়াবর্গ আর কাহারও নিকট পাঠ লইতে চাহে নাই; অন্যের নিকট পড়িয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না; তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় তাহারা সতৃষ্ণ হইয়াছে; কল্য হইতে তুমি আবার অধ্যাপনা আরম্ভ কর।" গৌরচন্দ্র গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অধ্যাপনার স্থান মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে আসিলেন। সেখানে তাঁহার শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; এবং পুনরায় টোলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ২।৪টী বিষ্ণুভক্ত বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, গোপনে তাঁহাদের নিকট গয়ায় যে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে নয়নযুগল দিয়া অজস্র অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অলৌকিক ভাবাবেশে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ও বাহ্য জ্ঞান শূন্য হওয়ায় তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। কতক্ষণ পুর প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি এই মাত্র বলিলেন

"প্রভু কহে বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ;
কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ।
তোমা সবাসনে নিভৃত এক স্থানে;
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে।
কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে;
তুমি আর সদা শিব আসিবা সত্বরে।"

এই অলৌকিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া বন্ধুগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ইঁহার তো এরূপ ভাব আর কখন দেখি নাই, তবে কি কৃষ্ণ ইঁহাকে কৃপা করিয়াছেন? অথবা গয়াপথে ইনি বা ঈশ্বরের কি ঐশ্বর্য্য দেখিয়া থাকিবেন;—

"মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার;
এমন ইঁহার কভু না দেখি যে আর।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে;
কি বিভাব পথে বা হইল দরশনে।"

সরলমতি শচী দেবী পুত্রের ঈদৃশ ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কত কি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। যখন উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পুত্র কাঁদিয়া উঠিতেন, তখন মায়ের প্রাণে ভয় ও আতঙ্কের সীমা থাকিত না। কখন তিনি গোবিন্দের নিকট পুত্রের কামনায় প্রার্থনা করিতেন কখনও বা স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং পাড়াপ্রতিবাসী ও আত্মীয় স্বজনকে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিতেন।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন;
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন।
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ;
কর যোড়ে গেলা আই গোবিন্দ শরণ।"

তখনকার বৈষ্ণবমণ্ডলী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে প্রতিদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে সম্মিলিত হইতেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায়

এক ঝাড় বৃহৎ কুন্দফুলের গাছ ছিল; তাহার চারিদিক্ বেড়িয়া বৈষ্ণবগণ সাজি হাতে ফুল তুলিতেন ও নানা প্রকার ধর্ম্মালাপে আনন্দানুভব করিতেন। মধ্যে মধ্যে স্থানীয় সংবাদ ও অন্যান্য নানা রূপ কথা বার্ত্তারও আলোচনা চলিত এবং ভক্তিশূন্য দেশ দেখিয়া কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশও করিতেন। যে দিন নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে বাটীতে পৌছিলেন, তার পর দিনে বৈষ্ণবেরা ফুল তুলিতেছেন, এমন সময় শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব দিন যে যে লোকের সমক্ষে গৌর চন্দ্র শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে আপন দুঃখের কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীমান পণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এই শুভ সংবাদ বলিবার জন্য আজ তাঁর হাস্যমুখ। সকলে তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমান কথাটী একটু গুমর বাড়াইয়া বলিলেন, "অবশ্য কারণ আছে।"

বৈষ্ণবগণ ব্যাকুলতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি কারণ?'

শ্রীমান বলিতে লাগিলেন "বড় অদ্ভুত ও অসম্ভব কথা! নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে পরম বৈষ্ণব হইয়া আসিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বদিনের ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন;—

"পরম মঙ্গল এই কহিলাম কথা,
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা।"

শ্রীমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং উদারমতি শ্রীবাস পণ্ডিত এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে "কৃষ্ণ আমাদের দলপুষ্টি করুন"।

"শ্রীমান বচন শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ,
হরি বলি মহাধ্বনি করিল তখন।
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার,
"গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার।"

চৈঃ ভাঃ

তখন সকলে আনন্দোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণ-কথা ও কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন;—

"আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ সংকথন;
উঠিল মধুর ধ্বনি কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
তথাস্তু, তথাস্তু! বলে ভাগবত গণ;
সবেই ভজুক কৃষ্ণ চন্দ্রের চরণ।"

এদিকে নির্দ্ধারিত সময়ে শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্ব্বদিনের কথানুসারে একে একে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে আসিয়া একত্রিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিতকে আসিতে না বলিলেও তিনি নিমাই পণ্ডিতের মনোদুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্য অতীব ব্যাকুল চিত্তে ব্রহ্মচারীর গৃহের প্রকোষ্ঠান্তরে লুকাইয়া থাকিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব; ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবন যাপন করেন। নানা তীর্থ পর্যটন করত নবদ্বীপে আসিয়া তিনি জাহ্নবীতীরে এক নিভৃত স্থানে কুটীর রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবদলের তিনি একজন সভ্য এবং বিশ্বম্ভরের সুপরিচিত। তাঁহারই গৃহে গৌরাঙ্গের এই প্রথম সঙ্গত হইল। বন্ধুগণ সকলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শচীনন্দন ভক্তিউদ্দীপক শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আসিয়া দেখা দিলেন এবং 'ঈশ্বরকে পাইয়া হারাইলাম', বলিয়া পাগলের ন্যায় স্বরের

স্তম্ভ ধরিয়া আলুলায়িত কেশে কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।

"দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ;
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ।
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা;
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা।
"ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে;
'কৃষ্ণ কোথা' বলিয়া পড়িলা মুক্তকেশে।"
চৈঃ ভাঃ

এইরূপ গভীরব্যাকুলতাসহকারে যখন শচীনন্দন কাঁদিতে ছিলেন ও পুনঃ পুনঃ অনুতাপ প্রকাশ করিতে ছিলেন, তখন শুক্লাম্বরের গৃহ প্রেমময় হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে কিছু সুস্থ হইয়া তিনি শুক্লাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘরের ভিতর কেরে?' শুক্লাম্বর বলিল, গদাধর। গদাধরের নাম শ্রবণে বিশ্বম্ভরের অনুতাপানল আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রাণে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পাঠক মহাশয় জানেন যে, গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপের মাধব মিশ্রের পুত্র ও গৌরাঙ্গের একজন বাল্যসখা। ইনি আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধশান্তরূপে ভগবদারাধনা করিতেছিলেন। কুঠরী হইতে গদাধর বাহিরে আসিলে বিশ্বম্ভর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

"প্রভু বলে গদাধর! তুমি সে সুকৃতি;
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলে দৃঢ়মতি।
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে;
পাইনু অমূল্য নিধি গেল মোর দোষে।"

এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক বন্ধুর গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং ব্যাকুলভাবে সকলকে বলিতে লাগিলেন—'তোমরা আমাকে কৃষ্ণ দিয়া আমার দুঃখ খণ্ডন কর, তাঁহার তৎকালের ভাব দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। সমবেত বন্ধুগণ সকলেই কাঁদিয়া অস্থির হইলেন এবং সেই স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া কতই বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিবাবসান হইলে সভাভঙ্গ হইল। গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ বৈষ্ণবসমাজে যাইয়া সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে নানা জনে নানা রূপ অনুমান করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "ভগবান বা অবতীর্ণ হইলেন?" কোন উদ্ধত ভক্ত মনের উৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন "নিমাই পণ্ডিত ভাল হইলে আগে পাষণ্ডী বেটাদের মুণ্ড ছিড়িব।" একজন সুবোধ ভক্ত উত্তর করিলেন, "আরে ভাই! এত ব্যস্ত কেন? ধীর চিত্তে অপেক্ষা কর; প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন কি না দুদিন পরে অবশ্যই জানা যাইবে?"

তাঁহাদের মধ্যে একজন সুচতুর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "সাধু সঙ্গের কি মহিমা! ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ হইতেই নিমাইয়ের ধর্ম্মজীবনে এই মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" এইরূপে আনন্দকোলাহলে ভক্তগণ বিতর্ক করিতে করিতে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলসূচক ধ্বনি করিলেন, আর সকলে সমস্বরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেনঃ—

"সবে মিলি লাগিলা করিতে আশীর্ব্বাদ,
হউক! হউক! সত্য কৃষ্ণের প্রকাশ।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শচী দেবীর দিন দিন উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সরলমতি শচী এসকল ব্যাপারের কিছুই বুঝেন না। স্নেহময়ী জননীর প্রাণ কেবল পুত্রস্নেহই জানে। তিনি মনে করিলেন যে, নিমাইয়ের কোন উৎকট ব্যাধি হইয়াছে। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াও যখন কিছুতে কিছু

হইল না, তখন নানা রূপ খেদ করিতে লাগিলেন ;—

"পুত্রের চরিত্র আই কিছুই না বুঝে ;
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে।
স্বামী নিল, ধন নিল, পুত্র কন্যাগণ ;
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন।
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ দেহ এই বর ;
সুস্থ হঞা ঘরে মোর রহু বিশ্বম্ভর।"

বধূর মুখ দেখিলে পুত্রের মন ভাল হইবে, বিবেচনায় শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। অবোধ মায়ের প্রাণ ইহা বুঝিল না যে, বধূতে এ প্রেম চরিতার্থ হইবার নয়। এ যে বিশ্বজনীন প্রেমের তৃষ্ণা! বিন্দুতে এ তৃষ্ণা যাইবে কেন? প্রেম-সিন্ধুর তৃষ্ণা কি বিন্দুতে যায়? যে প্রেমের জন্য নারদ শুক পাগল, এ যে সেই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, শচী তাহা বুঝিলেন না। যাঁহাকে কত জাঁকজমক করিয়া দুই বৎসর আগে বিবাহ করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ তাহাকে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না। ছি! ইন্দ্রিয় সুখ, না তাহা হইবে না। এই ভাবিয়া বিশ্বম্ভর বধূর পানে না তাকাইয়া, যেরূপ ভক্তি-শ্লোক পড়িতেছিলেন, পড়িতে লাগিলেন, এবং কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একবার তিনি এমন ভাবে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন যে, তাহা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ভীতা হইয়া পালাইয়া গেলেন ; শচীও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ফলে এই সময়ে তাঁহার অনুতাপের চরম দশা উপস্থিত, রাত্রিতে নিদ্রা নাই, প্রাণে সর্ব্বদাই হুতাশ ও "কিসে পাব, কবে পাইব," এই চিন্তা সার হইল। অপরিচিত লোক দেখিলে কিন্তু ভাবাবেগ সম্বরণ করিয়া শিষ্টের ন্যায় তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন, তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে তাঁহার পরিবর্ত্তনের অবস্থা বুঝাই ভার হইত।

"লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়,
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়।
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন ;
কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বলে অনুক্ষণ।
কখন কখন যেবা হুঙ্কার করয় ;
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়।
নিদ্রা নাহিক প্রভুর কৃষ্ণানন্দ রসে ;
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে, পড়ে, বৈসে।
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
উষাকালে গঙ্গা স্নানে করেন গমন।"

চৈঃ ভাঃ

অধ্যাপনা শেষ।

গুরুর অনুরোধে ও পূর্ব্বকৃত স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার্থে, ইচ্ছা না থাকিলেও, নিমাই পণ্ডিত আবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এবারে আর সে মন নাই, সে আসক্তি নাই ; প্রাণ, মন, আসক্তি, সকলই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে ; সুতরাং যাহা পড়াইতে যান, কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছু আইসে না। চিরপদ্ধতি অনুসারে শিষ্যগণ হরিনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পুঁথির ডোর খুলিতে লাগিল ; এই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে কতবার প্রবেশ করিয়াছে ; তখন ইহাতে কোনই ভাবান্তর হইত না। এবারে কাণের শক্তি ফিরিয়া গিয়াছে ; তাই শ্রবণমাত্রেই ভাবাবেশ ও মত্ততা ; বাহ্যজ্ঞান নাই ; যে যে প্রশ্ন করে ও যাহার যে পাঠ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতেই হরিনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"প্রভু বলে সর্ব্বকালে সত্য কৃষ্ণনাম;
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন।
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর;
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে;
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য কথনে।
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন;
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তিধন।
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়;
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে ধায়।
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন;
সেবক-বৎসল নন্দ গোপের নন্দন।
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মরি;
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি।
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম;
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম।
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়;
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়।
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে;
সে অধমে কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে।
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে;
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে।
পড়িয়া শুনিয়া লোকে গেল ছার খারে;
কৃষ্ণ মহামহোৎসব বঞ্চিত তাহারে।"

এই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন যে, "যাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে ছলনারূপিনী পূতনা উদ্ধার হইয়াছে, অঘাসুর আদি দুষ্ট পাপী সকল পরাজিত হইয়াছে, যাঁহার নামে জগৎ পবিত্র হয় ও সন্তাপিত জীবের দুঃখ দূর হয়; যাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তনে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিহ্বল ও যাঁহার প্রভাবে মহাপাপী অজামিল পরিত্রাণ লাভ করিল; হায়! জীব বৃথা ধন-কুল-বিদ্যামদে মত্ত হইয়া তাহার আস্বাদ বুঝিল না; কেবল অমঙ্গলময় গীত বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিল। ভাই সকল! আমার কথা শুন! আর কেন বৃথা সময় নষ্ট কর। অমূল্য ধন কৃষ্ণ-পদারবিন্দ ভজন করিয়া কৃতার্থ হও।" পড়ুয়াগণ অধ্যাপকের নবজীবন লাভের বিষয় কিছুই জানিত না। অকস্মাৎ তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল এবং পরস্পরের মুখচাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বম্ভর বাহ্য জ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "এতক্ষণ আমি কি বলিতেছিলাম?" পড়ুয়াগণ বলিয়া উঠিল—"আজ আমরা আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। সকল পাঠেতেই আজ আপনি কেবল কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিলেন।"

বিশ্বম্ভর ভাবব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা! আজ তবে পুঁথি বন্ধ কর; চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাওয়া যাক্; অন্য সময় আবার পাঠ ব্যাখ্যা করা যাইবে।"

"হাসিয়া বলে গৌরচন্দ্র শুন সব ভাই,
পুঁথি বাঁধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই।"

সে দিনকার পড়ান সেই পর্য্যন্ত। গঙ্গা-স্নানান্তে শিষ্যগণ চলিয়া গেলে, বিশ্বম্ভর যথাবিধি পূজা অর্চ্চনার পর মাতৃ-সন্নিধানে ভোজন করিতে বসিলেন। পুত্রের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা নিমাই? আজ কি পুঁথি পড়াইলে; কাহারও সঙ্গে ত কোন্দল কর নাই?" পুত্র উত্তর করিলেন,—

"আজ কেবল কৃষ্ণনাম পড়ান হইল।"
"প্রভু বলে আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম;
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম।"
সত্য কৃষ্ণ নাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন;
সত্য সত্য কৃষ্ণের সেবক যেই জন।

সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণ ভক্তি কহে যায় ;
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়।
চণ্ডালী চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে ;
দ্বিজ নহে দ্বিজ যদি অসৎ পথে চলে।"

বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়া বিশ্বম্ভর জননীকে, ভগবদ্ভক্তিই মানব জীবনের সার, এই বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা, শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ কর ; কৃষ্ণ ভক্তের জীবনই ধন্য। কালচক্রেও কৃষ্ণ-দাসের কিছুই করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসে জীবের যে দুর্গতি, তাহা ত জান ; এই দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় একমাত্র হরিভক্তি। অতএব হরি-পদাম্বুজ আশ্রয় কর।"

"জগতের পিতা কৃষ্ণ ; যে না ভজে বাপ ;
পিতৃ দ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।"

পর দিন প্রাতে শচীনন্দন আবার বিদ্যামন্দিরে যাইয়া বসিলেন ; পড়ুয়াগণ আসিয়া আবার পাঠ চাহিতে লাগিল। কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল —"সিদ্ধবর্ণ সমন্বয় কি ?" "গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপ্রেমে বাহ্য জ্ঞান-শূন্য। উত্তর করিলেন "সকল বর্ণে নারা-য়ণই সিদ্ধ।"

শিষ্য। "কিরূপে বর্ণ সিদ্ধ হইল ?"

উত্তর। "শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাত হেতু।"

শিষ্য। "আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না"।

উত্তর। "সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ কর ; আদি, মধ্য, অন্ত্যে, সর্ব্বত্রে শ্রীকৃষ্ণ ভজনই বুঝা যাইতেছে।"

ঈদৃশ প্রলাপবাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল ও পরস্পর বলা বলি করিতে লাগিল যে, "পণ্ডিতের বিষম বায়ু রোগ উপস্থিত, নৈলে এমন প্রলাপ বকিবেন কেন ?" হায় রে ! সংসার তুই না পারিস এমন কাজ নাই। তোর চক্ষে সোণা রাং, আর রাং সোণা। তা না হইলে কি আর দেবনন্দন ঈশার ক্রুশে প্রাণ যায় ? হরি-দাস ঠাকুর বাইশ বাজারে প্রহারিত হন ? শৃগাল কুকুরের ন্যায় শাক্যকে গ্রামে গ্রামে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায় এবং গৌরা-ঙ্গকে পাগল সাজায় ? সাবাস, তোর বুদ্ধি। তোর বুদ্ধি তোতেই থাকুক ; ভগবান উহা হইতে আমাদের দূরে রাখুন। এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিয়া গৌরের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"পণ্ডিত মহাশয় ! আপনি আজ কি আবল তাবল বকিতেছেন ? আমরা শাস্ত্রার্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। "গৌরাঙ্গ একটু অপ্রতিভের ন্যায় উত্তর করিলেন "কেন আমিতো ঠিক ব্যাখ্যা করিতেছি ; তবে তোমরা যদি বুঝিতে না পার, এখন থাকুক। বিকালে আসিও, ইহার মধ্যে আমিও পুঁথি দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিব ; তখন ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শিষ্যগণ পুঁথিতে ডোর দিয়া উঠিয়া গেল, এবং দলবদ্ধ হইয়া বিশ্বম্ভরের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া আদ্যো-পান্ত নিবেদন করিয়া উপদেশ চাহিল।

"সর্ব্ব শিষ্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে ;
কহিলেন যত সব ঠাকুর বাখানে।
এবে যত বাখানেন নিমাই পণ্ডিত ;
শব্দ সঙ্গে বাখানেন কৃষ্ণের চরিত।
প্রতি সূত্রের শব্দ অর্থ একত্র করিয়া,
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া।
এবে তাঁর বুঝিবারে না পারি চরিত ;
কি করিব আমি সববল হ পণ্ডিত।"

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদাস ওঝা ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন, "বিকালে তোমরা বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিও, আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, যেন পূর্ব্বের ন্যায় ভাল করিয়া অধ্যাপনা করেন।" ছাত্রেরা নিমাইকে গুরুর ইচ্ছা জানাইলে, তিনি অপরাহ্ণে গঙ্গাদাসের গৃহে আসিয়া অধ্যাপকের চরণবন্দনা করিলেন। গঙ্গাদাস শাদাশিদে লোক; সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থের কর্ত্তব্য সকল সাধন করিতেন; এবং তাহার মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানও ছিল, না ছিল, এমন নয়। কিন্তু নিমাইকে যে সাপে দংশন করিয়াছে, তাহার তিনি ওঝা ছিলেন না; সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি খুলে নাই; সুতরাং যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। সংসারের মুরুব্বিপক্ষ চিরকালই ঐরূপ উপদেশ দিয়া আসিতেছে; তিনি বলিলেন:—

"—বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য!
ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা অল্প নহে ভাগ্য।
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর;
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
"উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার;
তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার।
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্ত হয়;
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়?
ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন;
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ দ্বিজ জানিব কেমনে?
ইহা জানি কৃষ্ণ বলি কর অধ্যয়নে।
ভাল মতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও;
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও॥"

গুরুর উত্তেজনায় ও উপদেশে আবার একবার বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বভাব উদয় হইল। বিদ্যাগৌরবে নবজীবনের প্রেমজ্যোতি একবার মাত্র আচ্ছন্ন হইল; কালো মেঘে প্রাতঃসূর্য্য কিরণ একবার ঢাকা পড়িল। তিনি অহঙ্কারব্যঞ্জক বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করিলেন "দেব! আপনার শ্রীচরণকৃপায় এই নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত দেখি না, যে, আমার সঙ্গে বিচারে আঁটিয়া উঠিবে; আমি যে ব্যাখ্যা করিব, দেখি দেখি কে আসিয়া তাহা দূষিতে পারে? আপনার আজ্ঞায় শিষ্যবৃন্দ লইয়া এই আমি অধ্যাপনায় চলিলাম।" এই বলিয়া গুরুর পদধূলি লইয়া নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে চলিলেন। গুরুর আনন্দের সীমা রহিল না; শিষ্যবৃন্দ উৎসাহ-ধ্বনিতে চারি দিক পূর্ণ করিল। গঙ্গাদাস! সাবধান, এ পড়ান তো পড়ান নয়; এ যে নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখার আলো, অস্তমিত সূর্য্যের প্রখর কিরণ। যে হৃদয় অনন্তের দিকে ছুটিয়াছে, তোমার সাধ্য কি যে, তাহার আবেগ ফিরাও। ভাই শিষ্য বৃন্দ! তোমাদেরও বলি, এই বার মরণ খাওয়া খাইয়া লও; যত দূর পার পাঠ চাহিয়া লও; আর কিন্তু হবে না।

শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় গর্ব্বের সহিত পড়াইতে লাগিলেন। ছাত্রদের আনন্দের সীমা নাই; যাহার যত সন্দেহ ছিল ও নূতন পাঠ লওয়ার প্রয়োজন হইল, সকলই সম্পূর্ণ হইল। নিমাইয়ের মুখশ্রীতে পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য আবার দেখা দিল; ছাত্রেরা মনে করিল, অধ্যাপকের বায়ুরোগ আরোগ্য হইয়াছে। সকলের পাঠ দেওয়া সমাপ্ত হইলে, গৌরচন্দ্র প্রচলিত বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতে

লাগিলেন ;—

"প্রভু বলে সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার ;
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার।
শব্দ জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাথানে ;
আমারে তো প্রবোধিতে নারে কোন জনে
যে আমি খণ্ডন করি, যে করি স্থাপন ;
দেখি তাহা অন্যথা করুক কোন জন।"

ও কিও! বিদ্যাগৌরবের মধ্যে ও কি হলো! সর্ব্বনাশ! নিমাই পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেন কেন? শিষ্যেরা অবাক্ হইয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল। অবশেষে মূর্চ্ছার কারণ বাহির হইয়া পড়িল। যে দরজায় বসিয়া নিমাই পণ্ডিত পড়াইতেছিলেন, রাস্তার অপর পার্শ্বে আর এক দরজায় রত্নগর্ভ আচার্য্য নামে একজন শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ একাকী বসিয়া সুমধুরস্বরে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার উচ্চারিত ভক্তিরসাত্মক শ্লোকের আভাস বিশ্বম্ভরের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। আর যাবে কোথায়! প্রচ্ছন্ন অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল ; কৃপাবাতাসে দম্ভের মেঘ কাটিয়া গেল ; আর মহাভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। নিমাই! তুমি যে প্রভুর ফাঁদে পড়িয়াছ,আর কি তোমার স্বাধীনতা আছে? বৃথা অধ্যাপনার চেষ্টা। যা করিতে প্রেরিত হইয়াছ, তাহা না করিয়া কি তুমি থাকিতে পার? ধন্য প্রভু! তোমার লীলা বুঝে কে? মূর্চ্ছাভঙ্গে গৌরচন্দ্র কতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণসুখসাগরে নিমগ্ন থাকিলেন ; রত্নগর্ভও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিল। পুলক, অশ্রু, কম্পে গৌরাঙ্গ বিভোর হইয়া গেলেন। পথে রথের লোক জুটিল। একটা মহাব্যাপার হইয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া গৌরচন্দ্র শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?" তাহারা উত্তর না করায়,তিনি সকল বুঝিলেন ও তাহাদিগকে লইয়া ভ্রমণার্থে জাহ্নবী তীরে চলিলেন।

বার বার তিন বার। পড়ুয়াগণ আজ্ দেখিয়াই পড়া ছাড়িবে। প্রাতে তাহারা আসিলে গৌরচন্দ্র পড়াইতে বসিলেন। পূর্ব্বদিনের ভাবে তখনও বিভোর। ইহার মধ্যে এক জন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল"ধাতুর সংজ্ঞা কি?" নিমাই উত্তর করিলেন "হরি শক্তিতেই ধাতু প্রকাশিত হয়।"

"পড়ুয়া সকল বলে ধাতু সংজ্ঞাকার?
প্রভু বলেন হরিশক্তি ধাতুর প্রচার।
ধাতু সূত্র বাখানিয়ে শুন সর্ব্ব জন ;
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন।
যত দেখ রাজা প্রজা দিব্য কলেবর ;
অনেক শোভিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর।

* * *

ধাতু গেলে শুন তার যে অবস্থা হয়।
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া ;
কেহ হয় ভস্ম কারে এড়েন গাড়িয়া।
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বসে হরিশক্তি ;
তাহারে যে করি স্নেহ, তাহারে যে ভক্তি
বিদ্যাবান অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া।
এবে যারে নমস্কার করি মান্য জ্ঞান ;
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান।
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে ;
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে।
এমন পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি ;
হেন হরি ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি।"

বলিতে বলিতে উৎসাহে প্রাণ নাচিয়া উঠিল ; তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দশমুখে

ভগবানের মহিমা বর্ণন করিতে লাগিলেন, এবং ব্যাকুলতা ও আগ্রহ সহকারে শিষ্যদিগকে হরিপাদপদ্মপূজা করিতে উপদেশ দিলেন। অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কিরূপে ধাতু ব্যাখ্যা করিলাম? শিষ্যগণ উত্তর করিল,যাহা "বলিলেন. তাহার একটুও মিথ্যা নয়। কিন্তু আমাদের যে উদ্দেশে পড়া, তাহার অর্থ সে নয়।"

নিমাই। "আচ্ছা! তোমরা কি মনে কর, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে?"

শিষ্য। "এক হরিভক্তি ও হরিনাম ভিন্ন আপনার মুখে আসিতেছে না। ইহাতে যা মনে করুন!" এই বলিয়া গয়া হইতে আগমনের পর তাঁহার যে যে ভাব তাহারা দেখিয়াছিল, সকল বিবৃত করিল। গৌরচন্দ্র শিষ্যদিগের কথা শুনিয়া বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য। আমি দিবা রজনী সর্ব্বত্রে কেবল শ্রীহরির বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতেছি; সমস্ত জগতে তাহার পবিত্র মন্দির লক্ষিত হইতেছে; শ্রবণ-বিবরেও তাঁহার নাম ভিন্ন আর কিছু প্রবেশ করে না। সেই জন্য সকল কথাতেই হরিনাম বাহির হইয়া যায়। এ কথা অন্যত্রে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে? তোমাদের কাছে না বলিলে নয়, তাই বলিলাম। অতএব ভাই সকল! আমাকে ক্ষমা কর; আমা হইতে আর অধ্যাপনা চলিবে না। তোমরা অন্যত্র যাইয়া আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধ কর।" এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে পুস্তকে ডোর দিলেন।

"তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার।
তোমা সবাকার যার স্থানে চিত্ত লয়;
সে স্থানে পড়হ আমি দিলাম বিদায়।"

শিষ্যগণ তখন গৌরের অবস্থা কিছু বুঝিতে পারিল এবং সজলনয়নে বলিতে লাগিল "পণ্ডিত! আমরা আপনার কাছে যাহা পড়িলাম তাহাই ভাল; অন্য ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিতে ইচ্ছা নাই, আর পড়িবারও খেদ নাই।" তাহাতে বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন্ "যদি তোমাদের ইহাই অভিলাষ, তবে আর পড়ায় কাজ নাই; এসো সকলে একত্রে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি। তাঁহার কৃপায় আমাদের সকল শাস্ত্রের জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইবে।"

"দিব সে কে যদি আমি হই হরিদাস,
তবে সিদ্ধ হউক তো সবার অভিলাষ।
তোমরা সকলে লও হরির শরণ;
হরিনামে পূর্ণ হউক সবার বদন।
যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই
সবে মিলি কৃষ্ণ ভজিবাঙ এক ঠাঁই।
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার;
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার।"

শিষ্যগণও তদনুরূপ আচরণ করিল। পাঠক মহাশয় এ অধ্যায়ে যে চিত্রটী দেখিলেন, তাহা কি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের কোন সিদ্ধান্ত নাই; আপনারা স্ব স্ব আলোকে মীমাংসা স্থির করিবেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম।

"সবাই এক মায়ের ছেলে কারে দেব ছেটে ফেলে
ভাই বলে সকলেরে হৃদয় মাঝে দিব ঠাঁই।"

চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ধর্ম্ম মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ কিছু সোজা কথা নয়। এতদ্ভিন্ন আরো কত মত অপ্রচারিত রহিয়াছে। আকাশের নক্ষত্র এবং পাতালের বালুরাশির পরিমাণ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মানব সমাজের বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের পরিমাণ হয় না। সংখ্যাতীত ধর্ম্মসম্প্রদায় এ জগতে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, একথা বলিলেও কিছু অত্যুক্তি হয় না। এত বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের বিদ্যমানতা স্বত্বেও, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই আশা করেন যে, তাহাদের ধর্ম্ম মতই জগতের ভাবী ধর্ম্মমত হইবে। কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করিয়া লিখি। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিশ্বাসীগণ মনে করেন, জগতের সকলেই খ্রীষ্টীয়ান হইবে, মুসলমানেরা মনে করেন, জগতের ভাবী ধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্ম। হিন্দু মনে করেন, হিন্দু ধর্ম্মই জগতের সার ধর্ম্ম, বৌদ্ধ মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মই এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম। যে যে মত মানে, সেই মতই জগতের ভাবী মত হইবে, স্বতঃ এবং পরত ইহাই তাহার প্রাণগত বিশ্বাস। জগতে যখন যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত বা প্রচারিত হইয়াছে, তখন সেই ধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম নামে অভিহত করা হইয়াছে। মিথ্যা জানিয়া কেহ কোন ধর্ম্মমত মানে না। সুতরাং সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট আপনাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা থাকা সম্ভব। অতএব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, সকল ধর্ম্মই লোক বিশেষের নিকট সত্য ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মই যদি সত্য ধর্ম্ম হয়, তবে কোন্ ধর্ম্ম জগতের ভাবী ধর্ম্ম? কোন্ মত সকল মতকে উপেক্ষা বা পরাস্ত করিয়া জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিবে? একথার উত্তর দেওয়া বড় সোজা নয়।

মানুষ বড়ই কল্পনার উপাসক। কল্পনার উপর পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত। এই কল্পনাটা পৃথিবীতে অনেক স্থানে বিশ্বাস নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। যুক্তি তর্ক—এ সকল যা কিছু বল, এ সকল অধিকাংশ স্থলেই কল্পনার সহচর। তুমি খুব যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছ, পরকাল আছে; আর এক জন ততোধিক যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন যে পরকাল নাই। এক জন খুব যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন, ঈশ্বর আছেন, আর একজন ততোধিক যুক্তি সহকারে বলিতেছেন যে—ঈশ্বর নাই। একজন খুব যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিতেছেন, পূজা বা উপাসনার আবশ্যকতা আছে, আর একজন ততোধিক যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, পূজার প্রয়োজন মোটেই নাই। কার কথা সত্য বলত? যুক্তি উভয়েরই সমান তেজপূর্ণ, কেহ কাহাকে হটাইতে পারেন না। নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্য, যিনি যাহাই মনে ধরিয়া লউন

না কেন, যুক্তি তর্কতে লোকদিগকে হটান বড়ই শক্ত। আমি মনে করি, তুমি হটিতেছ, তুমি মনে করিতেছ, আমি হটিতেছি। সচরাচর এইরূপেই হইয়া থাকে। বাস্তবিক কেহই হটিবার নয়, কেহই হটে না। অন্ততঃ লোকের বিশ্বাস এইরূপ। আপন মত লইয়াই সকলে বসিয়া থাকে। সে মতটা কি? অধিকাংশ স্থলেই আপনার কল্পনা-প্রসূত কিছু। কল্পনা ভিন্ন সারবস্তুও কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। অধিকাংশ মানুষই কল্পনাকে লইয়া জীবিত। প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া, কষ্টি পাথরে কষিয়া লইয়া ধর্ম্মমত গ্রহণ করে, অতি অল্প লোকে। ভাসা ভাসা ভাব, ভাসাভাসা ধর্ম্ম মত। কল্পনার ভিত্তি, বালির ভিত্তি। কল্পনা লইয়া মানুষ জন্মিতেছে, কল্পনার সেবা করিয়াই মরিতেছে। খাটী ধর্ম্ম পৃথিবীতে বড়ই বিরল।

কল্পনার ধর্ম্মও যাহা, পৌত্তলিকতাও তাহা। কল্পনার ধর্ম্মের আর এক নাম পৌত্তলিকতা। জগতের প্রথম অবস্থায় অধিকাংশ লোকই পৌত্তলিক ছিল। পৌত্তলিকতা বা কল্পনার ধর্ম্ম লইয়া মানুষ অনন্ত জীবনের পথে যাইতে পারে না, সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে ভয়ানক ধর্ম্ম-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মানুষের প্রাণের ভিতরে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সমাজে কোন না কোন সময়ে তাহারই ফুটন্ত ছবি প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসের কথা যাহা শুনা যায়, সে সকল আর কিছুই নয়, সে সকল কেবল সত্যের সহিত কল্পনার সংগ্রামের ফুটন্ত কাহিনী মাত্র। সত্যের সহিত অসত্যের সংগ্রাম চিরকাল চলিতেছে, আজিও তাহার বিরাম হইল না। সার পাইবার জন্য মানুষ কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত করিয়াছে, কিন্তু আজিও সারধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল না। আজিও কল্পনার পূজাই অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। পৌত্তলিকতা যে পৃথিবী হইতে কবে যাইবে, কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না।

নিরাকার একেশ্বরবাদ কি পৃথিবীতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই? হইবে না কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মই বল, আর ইস্‌লাম ধর্ম্মই বল, উপনিষদের ধর্ম্মই বল, আর শিক ধর্ম্মই বল—এসকলই খাটী একেশ্বরবাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ সকল ধর্ম্মের অবস্থা আজ এরূপ পঙ্কিলময় কেন? কলঙ্কিত মানুষের হৃদয়ে স্বর্গের পবিত্র জিনিষ কেমনে খাটী থাকিবে? মানুষের ব্যক্তিগত কল্পনা এই সকল ধর্ম্মের মধ্য স্থান পাইয়া সারকে কত মলিন করিয়া ফেলিতেছে, একবার চিন্তার চক্ষে চাহিয়া দেখ। সত্যে অসত্য, সারে অসার মিশ্রিত হইয়া কত কদাকার ধারণ করিয়াছে, ভাবিলেও কষ্ট হয়! কল্পনার এতই আধিপত্য।

আবার একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতেছে, আবার নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু এখানেও কল্পনা আসিয়া সত্যের স্থান অধিকার করিতেছে। তাই আবার দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে। দল ভাঙ্গিতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় তাহা আবার নূতন নূতন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে! দলের মূল কোথায়? কেবল ব্যক্তিগত ভাবে। ব্যক্তিগত ভাব কি? না অনেক স্থলে কল্পনার সমষ্টি। কল্পনাটা কি? না মোহ; আসক্তি। ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে দলের অভ্যুদয়। এক ঈশ্বর, সকল শাস্ত্রে বলে; অথচ পৌত্তলিকতা জগতে থাকে কেন?—এই জন্য যে, ব্যক্তিত্ব

প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ক্রমাগত চলিতেছে। যার একটু ক্ষমতা, যার একটু প্রতিভা, সে ই অন্যকে দলস্থ করিয়া আপনার মতে গ্রাস করিতে চায়। আপনার মত প্রচারের চেষ্টা ভাল কি মন্দ, সে কথা এখানে তুলিব না। কিন্তু একথা অবশ্যই বলিব, আপন মতে না চলিলে অন্যকে অপদার্থ ভাবা বড়ই অন্যায়। এই অন্যায় হইতেই পৃথিবীতে দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে। মানুষের প্রাণে ভগবান যে সত্য প্রচার করেন, সে জিনিষ অনাবিল, অতি পবিত্র, অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু সেই পবিত্র স্বর্গের কুসুমে সংসারের মোহ ও আসক্তিরূপ কল্পনাকীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে গোপনে গোপনে মলিন করে। জগতে মানুষের দ্বারা যে সত্য প্রচারিত হয়, তাহা সেই মলিনতা মিশ্রিত জিনিষ। অর্থাৎ স্বর্গের পবিত্র জিনিসের সহিত মানুষ আপন স্বাধীনতা-অর্জ্জিত অনেক নরকের পূতিগন্ধময় কালিমা মিশ্রিত করিয়া জগতে ঢালে। এই উভয়ের সংমিশ্রনে ধর্ম্মমত নূতন আকার ধারণ করিয়া জগতে শোভা পায়। এক নিরাকার চিৎস্বরূপই যদি ধর্ম্মের প্রস্রবণ, তবে ধর্ম্মমত এত বিভিন্ন প্রকার কেন? তাহার কারণ এই, সত্য জিনিষ অসত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া কিছু নূতন হয়। এই নূতন কীর্ত্তি যখন জগতে যায়, তখন মনের গতির বিভিন্নতানুসারে তাহা জগতে বিভিন্ন রূপ প্রতীয়মান হয়। অথবা একই জিনিষ ভিন্ন২ পাত্রের দোষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখায়। খাটী ধর্ম্মমতের সহিত ব্যক্তিগত মত প্রচারের যদি এত চেষ্টা না হইত, তবে পৃথিবীতে এত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতে হইত কি না, সন্দেহ। স্বর্গের ধর্ম্মমতের সহিত ব্যক্তিগত মত প্রচারিত হওয়াতে জগতের যে অনিষ্ট হইয়াছে, একথা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত প্রভুত্ব প্রচারের চেষ্টাতে, খাটী জিনিষের সহিত অনেকস্থলে ব্যক্তিগত দূষিত মত বা কল্পনার খেয়াল মিশ্রিত হইয়া অন্য ব্যক্তির বিষম অনিষ্ট করিতেছে। এ কথা অনেকেই জানেন, মানুষ অন্যের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া চলিতে সর্ব্বদাই লালায়িত। বড় বড় লোকদিগের প্রচারিত মত অনেকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে। এইরূপে গুরুবাদ বা অবতারবাদের সৃষ্টি হইতেছে। মানুষ আপনার চিন্তা ও বিবেকের কথায় জলাঞ্জলি দিয়া, অপরের প্রদর্শিত পথে অবনত মস্তকে চলিতেছে। এই হইতেই দলাদলি ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শেষে কত ঝগড়া বিবাদ চলিতেছে। সে সকল কথা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

এইরূপে দেখিতেছি, ক্রমে ক্রমে পৃথিবী খাটী ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে আসিয়া সরিয়া পড়িয়াছে! নানা মত, নানা ভাব, নানা প্রণালী, নানা অনুষ্ঠান,—কোন্‌টা মানি, কোন্‌টাকে উপেক্ষা করি, বল ত? যাঁহারা সত্যের সেবক হইতে চান, তাহারা এইরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন। জগতে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসহীনতা, নানা প্রকার সন্দেহবাদ মানুষকে বিষম আক্রমণ করিতেছে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের প্রাণ সদা সশঙ্কিত, বুঝি বা ধর্ম্ম আর জগতে টিকে না! ধর্ম্ম-প্রচারকেরা হতবুদ্ধি হইয়া এই প্রবল স্রোতের

সন্মুখে আপন শক্তির লঘুতা অনুভব করিয়া স্থিরভাবে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন! এই আন্দোলনের ভিতরে আবার কত চটুল ব্যক্তি গোপনে গোপনে নূতন ধর্ম্ম-মত দ্বারা নূতন দল গঠনে চেষ্টা পাইতেছেন! হা বুদ্ধি, তোমার সীমা কোথায়? দলে দলে পৃথিবী উচ্ছন্ন গিয়াছে, আবার দল!! পৃথিবীতে এক বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। জগত সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে সার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যাহা ভাবিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, পৃথিবীর গতি ক্রমাগত স্বাতন্ত্র্যের দিকে চলিতেছে। পৃথিবীতে দলের পরে ক্রমাগত যে দলবৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতেও প্রমাণ করে যে, স্বাতন্ত্র্যই জগতের লক্ষ্য। অনন্ত প্রকৃতির সকলই বিভিন্ন, একথা আমরা অনেক বার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। সকলই পৃথক পৃথক, ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়াতেই সকলের যেন সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব রক্ষা পায়। একটী গোলাপ তুমি দেখ একরূপ, আমি দেখি অন্যরূপ। তোমার ভাব, তোমার দেখা আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সকলই পৃথক পৃথক। বিভিন্ন বিভিন্ন শোভায়, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতিতে, সেই এক অনাদি অনন্তের অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং অনন্ত রূপ প্রতিফলিত হইতেছে। পৃথিবীর কোন দুটী বস্তু একরূপ নয়। সকলের ভিতরেই যেন কিছু কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে। একটী ফুল অন্য ফুল হইতে বিভিন্ন, একটী মানুষ অন্য মানুষ হইতে বিভিন্ন। প্রতি বস্তুতে, প্রতি কীট পতঙ্গে কত আকাশ-পাতাল বিভিন্ন রূপ শোভা পাইতেছে। খুব ধীর ও সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্থির রূপে ধারণা হয়, ভগবানের এই যেন বিধান যে, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পথে হাটিবে, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক চিন্তার পথ ধরিবে। এই যে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা চলিতেছে, অনুসন্ধান কর, দেখিবে, ইহার ভিতরের লোকদিগের ধর্ম্ম মতেও কিছু বিভিন্নতা আছেই—কিছু কিছু পার্থক্য আছেই। দুই জনের সকল মত একরূপ নয়। ইহার কারণ কি? মানুষ মানুষের সহিত মিলিয়া একমত হইয়া যাইবে, ইহা যেন বিধাতার ইচ্ছা নয়। বিধাতা প্রত্যেকের ভিতরেই যেন কিছু নূতনত্ব প্রতিনিয়ত ঢালিয়া দিতেছেন। প্রতিনিয়তই যেন বৈষম্যের ভেরী বাজিতেছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পৃথিবীতে কোন একটা ধর্ম্ম মত চিরকাল স্থায়িত্ব লাভ করিবে না, সময়ের গতিতে সকলই নূতন হইবে। অনন্ত জড় প্রকৃতির যেমন অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত মানুষের তেমনি অনন্ত ধর্ম্মমত। সকলই ক্রমবিকাশের অধীন। এই যে দলাদলি, বোধ হয়, ইহাও থাকিবে না, অনন্তের তরঙ্গাঘাতে অনন্তে যাইয়া বিলীন হইবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উঠিয়া যাইবে এবং বিধাতার অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তস্বরূপে দীক্ষিত হইয়া সেই অনন্তের দিকে সকলে ধাবিত হইবে। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে, কে জানে?

এইরূপই যদি হয়, তবে কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-মত প্রচারের আর প্রয়োজন নাই? আছে,

আবার নাইও। আছে, এই জন্য বলি, প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিবার আমরা পক্ষপাতী নই। প্রকৃতির ভিতর দিয়া বিধাতার যে খাটী জিনিষ বাহির হয়, তাহা হউক, বাধা দিতে বলি না। কিন্তু ব্যক্তিত্ব প্রচার না হয়। আবার নাইও, এই জন্য বলি ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া স্বর্গের মত প্রচার করা বড় কঠিন, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে। বিশেষত, লোক ধরিয়া দল বাঁধিবার জন্য প্রচার করিলে কিছুই পুণ্য লাভ হয় না। লোক আসুক বা না আসুক, সেদিকে মানুষের লক্ষ্য রাখা উচিত নয় : লক্ষ্য এই— "বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" তিনি প্রচার করিতে বলেন, কর ; কিন্তু অন্য কোন কারণ সম্মুখে রাখিও না। তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যে চলে, ফলাফলের দিকে তাঁর দৃষ্টি যায় না। আমি দল করিব? আমি বাহাদুরী দেখাইব—ছি, এ নরকের কথা দূর হউক। তাঁর যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হউক। বিশ্বাসী ব্যক্তির এইরূপ উক্তি। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, জগতকে বিশ্বাসের পথে রাখিবেন, কেহ অবিশ্বাস-বিষ দিয়া প্রকৃতিকে জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না। আর তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, সকলকে অবিশ্বাসী করিয়া রাখিবেন, কাহারও শক্তি নাই, জগৎকে বিশ্বাসের পথে স্থায়ী করিয়া রাখে? প্রকৃত ধর্ম্মই এ নয়। তর্ক যুক্তি করিয়া যে ধর্ম্ম বিশ্বাস উৎপন্ন, তাহাই কল্পনার ধর্ম্ম। তিনি আপনি যদি মানুষের প্রাণে প্রকাশিত না হন, কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে না। বিধাতার কৃপায় বিধাতাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তাঁর প্রদর্শিত পথে চলাই প্রকৃত ধর্ম্ম। প্রকৃত ধর্ম্মে সমাজ নাই, দল নাই, ঝগড়া নাই, বিবাদ নাই, কিছুই নাই। আছেন,—প্রত্যক্ষ জীবন্তভাবে কেবল এক অবিনাশী সত্য পুরুষ। তাঁতেই সঞ্জীবিত, তাঁতেই নিমগ্ন; বিশ্বাসী সন্তান। তিনি উঠিতে বলিলে, ভক্ত উঠেন, তিনি বসিতে বলিলে, ভক্ত বসেন। তিনি বিপদে ফেলিলে, তাহাই ভক্তের নিকট স্নেহের আশীর্ব্বাদ। তাঁর কথা যে শুনে নাই, তাঁর সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই ব্যক্তিই অন্যের প্রদর্শিত কল্পিত ধর্ম্মপথে চলিতে চায়, চলিতে পারে ; কিন্তু যে তাঁকে দেখিয়াছে, তাঁকে যে প্রাণে পাইয়াছে, সে আর কাহারও কথা শুনিয়া, বা কল্পনা লইয়া জীবন পথে চলিতে চায় না। সে প্রতিনিয়ত কেবল একের ইচ্ছাতেই ডুবিয়া থাকিতে চায়। সে আর কিছু জানে না, আর কিছু বুঝে না। বিধাতার ইচ্ছাকেই সে জয়যুক্ত হইতে দেখিতে চায়।

কিন্তু তাঁকে সকলে কিছু একভাবে পাইবে না। অনন্তরূপিনীর সকল স্বরূপ একজনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। তিনি যাহাকে যা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহাই হইতে হইবে,—কাহাকে ভক্ত, তাহাকে জ্ঞানী, কাহাকে কর্ম্মী কাহাকে সংসারী, কাহাকে সন্ন্যাসী ইত্যাদি। তিনি কাহাকে কি করিতেছেন, আমরা জানি না। সুতরাং কে তাঁর প্রিয় সন্তান, কে নয়, সে বিচারও আমরা করিতে পারি না। যাকে আমরা ভয়ানক পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, সে যে বিধাতার কৃপাস্রোতে পড়ে নাই, একথা আমরা মনে করিতে পারি না। সুতরাং তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা উচিত নয়। লীলাময়ের অনন্ত লীলা, মানুষ কি বুঝিবে? অমুক বড়, অমুক

ছোট, অমুক পুণ্যাত্মা, অমুক পাপী, এ সকল গণনা না করিয়া,আমাকে তিনি যে আদেশ করেন, তদনুসারে চলাই উচিত। তাঁর আশীর্ব্বাদ সকলের প্রতি। আমাকে উদ্ধার করিতেছেন, তোমাকে মারিয়া ফেলিবেন ? না—এ বিশ্বাস আমরা রাখি না। তিনি সকলকেই উদ্ধার করিবেন। তিনি সকলকেই কৃপার হস্তে রক্ষা করিতেছেন। মোট কথা, তাঁর হাতের পুতুল হইতে না পারিলে, কিছুতেই মঙ্গল নাই। তাঁকে কে কি ভাবে পূজা করিবে, কে কিরূপে দেখিবে, আমরা কিছুই জানি না। তিনি যাহার নিকট যেরূপে প্রকাশিত, মানুষ সেই রূপেরই পূজা করুক। অন্যথা করিলেই কল্পনার পূজা হয়। সাম্প্রদায়িকতা জগতের লক্ষ্য নয়, দলাদলিও লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য—এই অনন্ত স্বাতন্ত্র্য, এই অনন্ত দেবতার অনন্ত বিভিন্নস্বরূপে অনন্ত লোকমণ্ডলীর দীক্ষা। এই অনন্ত প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া যিনি একত্ব সাধনে যত্নবান, তিনি যে বিধাতার লীলা-মাহাত্ম্যের কি ভয়ানক অনিষ্টকারী জীব, আজ জগত না বুঝিলেও, এক দিন তাহা বুঝিবে। এই অনন্ত স্বাতন্ত্র্যের ভিতরেই এক-চিন্ময়ত্ব বিদ্যমান। মানুষ যখন তাঁতে নিমগ্ন হয়, তখন মানুষ সকল ঘটেই তাঁকে দেখে, অন্য কিছুই দেখে না। একমেবাদ্বিতীয়ম নামের গভীর সত্য তখনই উপলব্ধি হয়। তখনই মানুষ কল্পনা ছাড়িয়া,উপধর্ম্ম ছাড়িয়া,একের কোলে মাথা রাখিয়া অটল বিশ্বাসী হয়। তখন আর কেহকেই পর বলিয়া মনে হয় না তখন সকলকেই একের হাতের জিনিস জানিয়া সে মধুর ভাবে প্রেমালিঙ্গন করে। তখনই একতা এবং সাম্যের ভেরী প্রাণে বাজিয়া উঠে, তখনই জাতিভেদ উঠিয়া যায়। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পৌত্তলিকতা, উপধর্ম্ম,কল্পনার রাজত্ব এবং দলাদলি, কাটাকাটী, রক্তারক্তি থাকিবেই থাকিবে। হাজার চেষ্টা করিলেও জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

আমরা এই যে উদার জীবন্ত ধর্ম্ম মতের কথা বলিতেছি, ইহাকে যে কথায় অভিহিত করিতে চাও, কর, আপত্তি নাই। আমরা ইহাকেই অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া বুঝি। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম,—দলাদলির ধর্ম্ম নয়। দল ভাঙ্গিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। দল ভাঙ্গিবার জন্য যে ধর্ম্মের অভ্যুদয়, স্বতন্ত্র দলে পরিণত হওয়া তাহার পক্ষে উচিত কি না, এই এখন প্রশ্ন। আমাদের বিবেচনায়, উচিত নয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভাবে, যে রূপে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহা দল গঠনেই যে অধিক মনোযোগী, ইহাই বোধ হয়। দল গঠনে মনোযোগী হওয়ায় ইহা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। এই এক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইতেছে। এখন এত দূর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, এখন আদান প্রদান, আহারাদি সম্বন্ধেও বাদ বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য যে সকল সম্প্রদায়ের উত্থান হইয়াছিল, কালে জাতিভেদের এক নূতন শাখায় তাহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে আশঙ্কা হয়, সময়ে এই ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও বুঝি বা সেইরূপ হয়। উদারতা দিন

দিনই লোপ পাইতেছে, তৎস্থানে দল গঠনের সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা আসিয়া স্থান লইতেছে। বড়ই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। অহঙ্কার, আত্মাভিমান হাড়ে হাড়ে জড়িত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আকাশ হইতেও মহান, অতি পবিত্র, অতি সুন্দর। যাহার ভিতরে যাহা ভাল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৃথিবীর যেথানে যে সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের। পৃথিবীর সমস্ত নর নারী—এই ধর্ম্মভুক্ত ;—এখন এবং অনন্তকাল। আমি, তুমি, সে, সকলেই বিধাতার ইচ্ছা-স্বরূপ-সাগরে নিমগ্ন, সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে তাঁর ধর্ম্মে দীক্ষিত। শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলেই কতক ব্রাহ্ম। ভেদাভেদ মানি না, ভেদাভেদ জানি না। একের ধর্ম্ম--বিশ্বব্যাপিয়া রহিয়াছে। ভাষার বিভিন্নতায় তাঁকে নানা জনে নানা কথায় ডাকিয়াছে, কিন্তু এক বই আর দুই নাই। সকল ডাকের লক্ষ্যই তিনি। তাঁর ধর্ম্মই জগতের ধর্ম্ম। এই উদার ধর্ম্ম অনন্তকাল ধরিয়া সেই উদার দেবতা প্রচার করিতেছেন। অনন্ত প্রকৃতিতে ইহা পরিস্ফুট। কেহই এ ধর্ম্ম ছাড়া নয়। অনন্ত দেবতার অনন্ত লীলা অনন্তভাবে প্রকৃতিতে পরিস্ফুট। যে ইহাকে নূতন দলরূপ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে চায়, সে মূর্খ বই কি? যে এই উদারধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়াও অহঙ্কারী হয়, এবং পৃথিবীর অপর সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে,সে ভ্রান্ত বই আর কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নয়—ইহা উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। পৃথিবীর সকলেই কোন না কোন রূপে এই ধর্ম্ম ভুক্ত। এক দেবতা জগন্ময়—এক ধর্ম্ম ভুবনময়। অনন্তের অনন্তত্ব, মহানের মহত্ত্ব যে সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবার নয়, একথা আবার বলিতে হইবে কি?—যে ব্যক্তি ইহাকে সম্প্রদায়ের নিগড়ে, দলাদলির সংকীর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে চায়, সে আজও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতে দীক্ষিত হয় নাই। মানুষ, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া, অনন্ত দেবতার অনন্ত লীলার পানে তাকাও, একবার হৃদয়পুরে প্রবেশ করিয়া তাঁকে চিনিয়া লও ; ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতে তবেত মজিতে পারিবে। ছি, বালকের ধূলা খেলা, ঝগড়া বিবাদ লইয়া চিরকাল থাকিবে? খুটী নাটী ছাড়িয়া এখন একবার অনন্তরূপিনীর অনন্ত স্রোতে ডুব দিয়া পবিত্র হও, সমাহিত হও। কল্পনা ছাড়িয়া একবার সারধর্ম্মের গভীরতায় ও উদারতায় নিমগ্ন হও।

জীবন নহেক স্বপ্ন--উদার মহান্।

সে যে দেশে গেছে সেথা নাহি অভিমান,
মলিনতার নাহি লেশ,
সরল পবিত্র দেশ,
ঢালে কুসুমের গন্ধ কুসুম পরাণ।

জীবন লতিকা সেথা মায়া তরুমূলে—
জড়াইয়া শত পাকে,
এক ভাবে নাহি থাকে,
আঁধারে বিভোর হয় আপনারে ভুলে।

জীবন হয়েছে তার ধ্যানের সমান!
চিরস্তব্ধ ধ্যানে তার
চন্দ্র সূর্য্য বার বার,
মাগে জ্যোতি সমুজ্জ্বল করিতে বয়ান।

তারি অধিকারে ফোটে নক্ষত্র নিচয়,
যামিনীর এত হাসি,
এত স্নেহ শান্তি রাশি,
পরশ করিয়া তার পবিত্র হৃদয়।

অবিচল নির্ব্বিকার হর্ষ বিভাসিত,
সুমহান প্রাণ লয়ে,
দেব ভাবে ভোর হয়ে,
ব্রহ্মানন্দ সুখে চিত্ত করিছে মোহিত।

ভালবেসে শিক্ষা এক করে গেছে দান,
তাই যেন আগে ভাগে
আসিয়া মনেতে জাগে,
জীবন নহেক স্বপ্ন—উদার মহান্।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৫ম)

আমরা গতবারে বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করার কথা বলিয়াছি, তাহার কোন্‌টী অগ্রে পালনীয়, কোন্‌টী পরে, সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। মোট কথা, অভিভাবকের মত জানা, ভগবানের বিধান বুঝা, বর কন্যার মতামত গ্রহণ করা, এ সকলই প্রয়োজনীয়। তবে কোন্‌টী অগ্রে কোন্‌টী পশ্চাতে, সে সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখা সম্ভব নয়। যে স্থলে যেরূপ দাঁড়ায়, সেস্থলে সেই রূপই হইবে। মোট কথা, ঐ সমস্ত কথা গুলি প্রতিপালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করা একান্ত উচিত।

কেহ কেহ এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই স্বাধীনতার যুগে স্থান বিশেষে যে বিবাহ হইতে পারিবে না, ইহা ধার্য্য করা কি উচিত? ইহাতে ত স্বাধীনতার খর্ব্ব হয়! বলেন, শিক্ষক ও ছাত্রীর সহিত, অবিভাবক ও তাহার অধীনস্থ পাত্রীর সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না কেন? স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিলে বিবাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে কিরূপে?

এসকল কথার উত্তর দিতে আমাদের ইচ্ছাও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। আমরা এরূপ স্বাধীনতার বড় পক্ষপাতী নই। যে খানে রক্ত মাংসের সংশ্রব আছে, সেখানে বিবাহ হইতে পারা যদি বিজ্ঞান সম্মত না হয়, এবং তাহাতে যদি স্বাধীনতার খর্ব্ব না হয়, তবে যেখানে একটা সম্বন্ধ ভগবানের বিধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেখানে সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া অন্য সম্বন্ধ পাতানও নীতি-বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে না। সে ব্যক্তির স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হওয়া অন্যায়, যে ব্যক্তি ছাত্রীকে পবিত্রচক্ষে দেখিতে না পারে, এবং সে ব্যক্তির কোন বালিকার অভি-ভাবক স্থানীয় হওয়া উচিত নয়, যে ব্যক্তি বালিকাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে না পারে। এরূপ নিয়ম না থাকিলে বিশ্বাসের একটী ভিত্তি থাকে না—সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। একটী ছাত্রীকে যখন স্কুলে দেওয়া হইয়াছে, তখন একথা ভাবিয়া কিছু দেওয়া হয় নাই যে, শিক্ষকের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিবে, এই উদ্দেশ্য। এখানে

সুযোগ পাইয়া যদি শিক্ষক তলে তলে ছাত্রীর সহিত প্রণয় পাতায়, তবে তাহা যে পবিত্র নীতিবিগর্হিত কার্য্য হয়, এবং সে ব্যক্তিকে যে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে কি না, জানি না। স্থানে স্থানে এইরূপ অনুরাগ সঞ্চার হইতে দেখা গিয়াছে বলিয়া, আজ কাল অনেক ব্যক্তি বালিকাদের শিক্ষার জন্য পুরুষ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অত্যন্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখিতে গেলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল স্থলে স্বাধীনতাকে একেবারে খর্ব্ব না করিলে, কোন মতেই নীতি রক্ষার সম্ভাবনা নাই। পিতা মাতা, ও ভ্রাতা ভগ্নীর সম্বন্ধ যেরূপ ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট, শিক্ষক ও ছাত্রীর, অভিভাবক এবং তাহার অধীনস্থ বালিকার সহিত সেইরূপ সমাজ-নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ,মনে করা উচিত। সমাজ অনেক স্থলে ঈশ্বরেরই দূতের ন্যায় কার্য্য করেন, সুতরাং এ সম্বন্ধও প্রকারান্তরে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। যাহারা তাহা মনে করিতে না পারে, সে শিক্ষক বা সেই অভিভাবকের হস্তে কোন বালিকার ভার দেওয়া উচিত নয়। এস্থলে স্বাধীনতা যত শীঘ্র কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল।

আর একটী স্থলে স্বাধীনতার কথা শুনিতে২ পাওয়া যায়। পাত্র ক্রমাগত দুই দশটী পাত্রী দেখিতেছেন, কিন্তু কোন পাত্রী মনোনীত হইতেছে না। পাত্র অন্যত্র আবার অন্য পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতেছেন। এইরূপ ক্রমাগত নূতন নূতন পাত্রী দেখিয়া বেড়ানে স্বাধীনতা আছে কি না? একথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটী প্রশ্ন করি। মনে কর, পাত্রীর বর পছন্দ হইতেছে, কিন্তু পাত্রের পাত্রী পছন্দ হইতেছে না, —এরূপ স্থলে পাত্রীর মন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? ক্রমাগত নূতন বর আসিতেছে, কিন্তু যাকে পছন্দ হইতেছে, তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না, এস্থলে মনে দুশ্চিন্তা বা অভিমানের উদয় হওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয়, তবে ইহার জন্য দায়ী কে? এদেশ এবং অন্য দেশের কাহিনীতে এরূপও শুনা গিয়াছে, বরের নিকট আশ্বাস পাইয়া, মনের মধ্যে একটী বাসনাকে বসাইয়া, এবং সময়ে সেই বরকে না পাইয়া কত বালিকা আজন্মের জন্য অবিবাহিতা থাকিয়াছেন। এইরূপ আশ্বাসিতা কত বালিকা,অন্যত্র বিবাহিতা হওয়া স্বত্বেও, স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। এসকল যে কি গভীর চিন্তার বিষয়, ধারণাও করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন বালক, স্বীয় বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, ক্রমাগত নূতন নূতন পাত্রী দেখিয়া ফিরিতেছেন; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"পছন্দ হয় না কি করিব? যাকে তাকে ত আর বিবাহ করিতে পারি না। স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে বলেন"? এইরূপ স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না? ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে একটা প্রধান যুক্তি এই ধরিয়াছেন যে, বর কন্যার মনোনয়নে ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার কি অধিকার আছে? এই স্বাধীনতা যে মানুষের কত দূর আছে, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করা উচিত। ১৪ বৎসরের সময় না ১৮ বৎসরের সময়, কোন্ সময় বালক বালিকারা স্বাধীন? মনে কর, আজ স্বাধীন মতে একজনকে

এক ব্যক্তি বিবাহ করিল। পাঁচ বৎসরের পর স্বাধীন স্বামী আর স্ত্রীতে মন বাঁধিতে পারিতেছেন না; তাঁর মন অন্য পাত্রীতে পড়িয়াছে। এরূপ স্থলেও কি স্বাধীনতার কথাই জয়যুক্ত হইবে? একথাও নয় ছাড়িলাম। মনে কর, একটী পাত্র একটী পাত্রীকে প্রলোভন দেখাইয়া আপনাতে অনুরক্ত করিয়াছে, তাঁর সহিত এমন সকল ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে কিছু নীতি-শিথিলতার পর্য্যন্ত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিছু দিন পর সেই যুবক আর পাত্রীকে বিবাহ করিতে চায় না—সে বলে, আমি মন বাঁধিতে পারিতেছি না। এরূপ স্থলেও তার স্বাধীনতাকে পূজা করিয়া চলা উচিত কি না? আমরা জানি না, এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি না, যিনি এই সকল স্থলেও বলিবেন যে—স্বাধীনতার পূজা করাই উচিত। আমরা এরূপ স্বাধীনতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। ইহা স্বাধীনতা নয়, ইহা স্বাধীনতার আচ্ছাদনে স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ। ইহা যত শীঘ্র বিদূরিত হয়, ততই মঙ্গল। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন। আমরা পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে এ সকল কথার অনেক আলোচনা করিয়াছি। আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি, মানুষ কেবল স্বাধীনতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই—সে অধীনও। মানুষ পিতা মাতার অধীন, ভ্রাতা ভগ্নীর অধীন, আত্মীয় বন্ধুর অধীন, সমাজের অধীন, দেশের অধীন, রাজার অধীন। অধীন হইতেও অধীন। পরস্পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা যেন উন্নতি লাভ করিতেছি। পরস্পরের সাহায্য, পরস্পরের সদুপদেশ, পরস্পরের উপকার ভিন্ন মানুষ, মানুষ হইতে পারে না। হাজার বল প্রকাশ করিলেও এই বিশ্বব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল—সংসারের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। এই মোহময় পৃথিবী, এই মায়াপূর্ণ গৃহ পরিবারের কেন্দ্র—দাস-ব্যবসায়ের আড্ডা মাত্র। এমন দেশ নাই, যেখানে এই দাসত্ব প্রথা চলে না। যেখানে মনুষ্য, সেই খানেই পরিবার, সেই খানেই সমাজ, সেই খানেই রাজা। শাসন ভিন্ন, উপদেশ ভিন্ন, সাহায্য ভিন্ন, এক দিনও মানুষের চলে না। অন্যান্য স্থলে পরস্পরের সাহায্য পরস্পরে লইব, কিন্তু এই বিবাহের সময় নয়? একথা, কথাই নয়। সর্ব্ব দেশে—বিবাহের সময় সমাজের শাসন, অভিভাবকের আদেশ বা রাজার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইয়াছে।

ইউরোপ খণ্ডে খুব স্বাধীনতার প্রচার হইয়াছে, কিন্তু সে দেশ সম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক বলেন, "It is certainly not in India only, that parents choose the life partner of their children. Over the greater part of Europe young people have we suspect little practical choice in the matter." ভারতবর্ষে যেরূপ অভিভাবকেরা পাত্রী মনোনয়ন করেন, ইউরোপেও প্রায় তদনুরূপ হয়। আমরা বলি, ইহা সুপ্রণালী। তবে যাহারা বিবাহ করিবে, তাহাদের মতামতকে একেবারে উপেক্ষা করা উচিত নয়। ধর্ম্মহীন অল্প বয়স্ক বালক বালিকাকে সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনতার উপর ছাড়িয়া দিলে, তাহারা যে কতদূর দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিবে, কল্পনাও করা যায় না। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হয়, যে পর্য্যন্ত চরিত্র গঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ পদে পদে অন্যের অধীন। বয়স

অধিক হইলেই মানুষ স্বাধীনতা পাইবার অধিকারী হইতে পারে না। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাজাকে বাধ্য হইয়া বয়সের উপর উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম রাখিতে হইয়াছে, কিন্তু সেটা আদর্শ নয়। যে সমাজের লক্ষ্য ধর্ম্ম, সে সমাজে চরিত্র, এবং ধর্ম্মজ্ঞানের উৎকর্ষতার উপরই স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রশ্ন নির্ভর করা উচিত। যে যত ধর্ম্ম ও চরিত্রহীন, সে তত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সমাজ ও রাজার অধীন। চরিত্রহীন ব্যক্তির স্বাধীনতা—স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ, তাহার কথা মুখে আনিও না। তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতির কোন একটা মূল্য নাই। দেখা যায়, আজ যে কার্য্যে তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কাল সে কাজে তাহারা শিথিল-প্রতিজ্ঞ। আজ যাতে তাদের সম্মতি, কাল তাতে তাদের অসম্মতি। চরিত্রহীন, ধর্ম্মভিত্তিহীন লোকের দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই। তাহারা ক্রমাগত স্রোতের শৈবালের ন্যায় এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। তাদের সম্মতি বা অসম্মতির কোনই মূল্য নাই। বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে আরো যে শত সহস্র যুক্তি আছে, সেই গুলি প্রয়োগ করিতে চাও, কর, কিন্তু ১৪, ১৫ বা ১৮ বৎসরের বালক বালিকার সম্মতির অধিকারের কথা তুলিও না। তাহাদিগকে অধিক স্থলেই অভিভাবক এবং সমাজের কথা মান্য করিয়া চলিতে হইবে। তাদের পক্ষে, তাহা অধর্ম্মও নয়। অভিভাবক এবং সমাজকে উপেক্ষা করিতে যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহাদের যে কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিবে, কল্পনা করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। আমরা এরূপ স্থলে সমাজকে উদাসীন দেখিয়া সময়ে সময়ে মর্ম্মে দারুণ আঘাত পাইয়াছি, লোকের উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয় না। খুব যাহাদের প্রতি আশা ছিল, পরীক্ষারূপ ঝটিকার দিনে দেখিয়াছি, তাহারা স্রোতের শেওলার ন্যায় কোন্ পূতিগন্ধময় নরক প্রদেশে ভাসিয়া যাইতেছে! নীতির বন্ধনে, সমাজ বন্ধনে মানুষকে আঁটিয়া না বাঁধিলে, সমাজকে ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া রাখিবার আর কি উপায় আছে, আমরা জানি না।

যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অপরাধী, তাঁহারা আমাদের কথার প্রতিবাদ করিবেন, আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। যাঁহারা অবিবাহিত রহিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল বাঁধাবাঁধির কথা শুনিলে বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু চরিত্রবান, যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা সংসারের অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে কেন আমাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন, আমরা আজও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের বিরক্তি দেখিয়া, আমরা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু আশা-শূন্য হইয়া পড়িতেছি।

যে উপলক্ষে যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধ আমরা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে উপলক্ষটী মালাবারি মহোদয়ের বাল্য বিবাহ রহিতের জন্য আইন করার প্রস্তাবের আন্দোলন। ক্রমে রুক্মাবাই সংক্রান্ত মকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। আন্দোলনের পর আন্দোলন চলিতে লাগিল অবশেষে, বর কন্যার বিনা সম্মতিতে যে বিবাহ হইয়াছে, কিম্বা বিবাহের পর যাহাতে কোন সম্মতিসূচক কার্য্য ঘটে নাই, সেই বিবাহ রহিত করিবার জন্য

গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা উচিত কিনা, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই প্রশ্ন লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। এক পক্ষ বাল্য বিবাহের পোষকতা করিতেছেন, অন্য পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে লিখিতেছেন। যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে আমরা এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা কতক সংসিদ্ধ হইয়াছে। উভয় পক্ষের মধ্যেই অনেক ব্যক্তি বিবাহ ভঙ্গের জন্য আইন করার বিরোধী। এটী একটী সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই। বিবাহভঙ্গ-প্রথা প্রচলিত হইলে, যে বিবাহে সম্মতি ছিল, তাকেও অসম্মতিসূচক বিবাহ বলিয়া প্রতিপন্ন করা বড় কঠিন কথা নয়। ইচ্ছা হইলে, সন্তান উৎপন্ন হইলেও, চরিত্রে দোষারোপ করিয়া অসম্মতিসূচক বিবাহ বলিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে লোক প্রস্তুত হইতে পারে। মোট কথা, বিবাহ ভঙ্গ প্রথায় দোষের ভাগই অধিক, গুণের ভাগ থাকিলেও অতি অল্প। খামখেয়ালির প্রশ্রয় পায়, ইহা কখনই উচিত নয়। এক বাক্যে এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট সাধারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা উচিত। ইহাতে হিন্দু বিবাহের মূল ভিত্তিহীন হইবে। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সে সমস্ত অতি উদার এবং চিন্তা পূর্ণ কথা। "What god hath joined together let no man put sunder". এটী খ্রীষ্টের অতি সুন্দর কথা। ভগবান দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে ভঙ্গ করিও না। কি অলন্ত বিশ্বাসের কথা। সেণ্টপল বলিয়াছেন, "The woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth." খ্রীষ্টান সমাজ, খ্রীষ্ট এবং সেণ্টপলের এই মহৎ বাক্যকে অমান্য করিয়া চলিয়া যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সে কথা থাকুক। জয়গোবিন্দ বাবুর কথার সহিত এ পর্য্যন্ত আমরা খুব ঐক্য। কিন্তু যে সকল বিবাহে ভগবানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই, সে স্থলে কিরূপ হইবে?—এসম্বন্ধে তিনি বলেন, ("In after times God has accomplished this union through human agencies") পরে ভগবান মনুষ্যের দ্বারায় এই মিলন সংঘটন করিয়াছেন। বিধাতা, কোন কোন সময়ে, মানুষের ভিতর দিয়া সমাজের ভিতর দিয়া বা রাজার ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, সত্য, কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (free-will) স্বীকার করিতে গেলে, মানুষের সকল কার্য্যই যে বিধাতার কার্য্য, তা কখনই মনে করা যায় না। মানুষ স্বেচ্ছা, স্বার্থ, বা খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করে, তা বিধাতার কার্য্য নয়। যদি তা হয়, তবে যাহারা বিবাহ ভঙ্গ করে, তাহাদের সে কার্য্যকেও বিধাতার কার্য্য বলিয়া মনে করিতে হয়। যাঁহারা পাপ পুণ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা মানুষের সমস্ত কার্য্যকে কখনই বিধাতার কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না। অনেক স্থলে দেখা যায়, ৫০।৬০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সহিত, টাকার লোভে, কেহ বা অন্য স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ১১।১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ দিতেছেন! এইরূপ কার্য্যও কি বিধাতার কার্য্য? না—তাহা কখনই নয়। এই রূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, বিবাহ-ভঙ্গ হইতে দেওয়া উচিত কি না, আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। এ সম্বন্ধে

তিনিও একরূপ নির্ব্বাক। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এরূপ স্থলে বিবাহ ভঙ্গ প্রথা যদি প্রচলিত থাকে, তাহাতে দোষের বিষয় না থাকিলেও, আমরা ইহাকেও আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারি না। কেন পারি না, সে সমস্ত বিস্তৃত কারণ এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। সুবিধা পাইলে পরে আলোচনা করিব। তারপর তিনি বলিতেছেন—"In the case of the first marriage on record, God actually brought the woman unto the man and gave her unto him, to be his wife, &c."—এ স্থলে তাঁর কথার সামঞ্জস্য কেমন করিয়া রক্ষা পায়, তাহা বুঝিলাম না। বিধাতা যখন রমণীকে প্রথম পুরুষের নিকট আনিয়াছিলেন, তখন কি রমণী এবং পুরুষ বালক বালিকা ছিল? সে কথার স্পষ্ট মীমাংসা জয়গোবিন্দ বাবু করেন নাই। আমাদের বিবেচনায়, তাহারা তখন বালক বালিকা ছিলনা। কারণ—বিধাতার বিধান সেরূপ নয়। জীবনে এমন একটা সময় আছে, যে সময়ে বিধাতা পুরুষকে রমণীর প্রতি আকৃষ্ট করেন। যে সময়টী যৌবনকাল। এই যৌবন কালের পূর্ব্বে বিধাতা রমণীকে পুরুষের নিকট আনিতেছেন, একথা কথাই নয়। তাহা হইলে, যৌবন নামক একটী বিশেষ সময় মানুষের জীবনে ঘটিত না। শরীরের বিকাশের সহিত মনের বিকাশ, মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির সহিত ধর্ম্মজ্ঞানের উন্মেষ, রিপুর বিকাশের সহিত দাম্পত্য প্রেমের বিকাশ, এই যৌবন কালেই হয়। এ সকল প্রত্যক্ষ সত্য। ইহার প্রমাণের জন্য আর ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হয় না। পিতা মাতাকে বালক বালিকা ভালবাসে, সুতরাং বালক স্বামী বালিকা স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারিবে না কেন? জয়গোবিন্দ বাবুর এটা যে কিরূপ যুক্তি, বুঝিলাম না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যৌবনকালের পূর্ব্বে বালক বালিকার সন্তান হয় না কেন? পিতা মাতাকে ভালবাসা ও দাম্পত্য প্রেম, এদুটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ; উভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই অযৌক্তিক কথার উত্তর দিতেও ইচ্ছা করে না। একমাত্র উত্তর এই—ঈশ্বরের ইচ্ছা এই,—বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিবে; এবং যৌবন কাল হইতে দাম্পত্য প্রেমের উদয় হইবে। বিধাতার এই ইচ্ছার ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল, সুতরাং এসম্বন্ধে আর কিছু অধিক বলিতে চাই না। আমরা জয়গোবিন্দ বাবুর সহিত যখন একবাক্যে বলি যে, বিবাহ ঈশ্বরের বিধান; ঈশ্বর যে মিলন সংঘটন করেন, তাহা ভঙ্গ করা যাইতে পারে না, (Marriage is a heaven-ordained relation, that the union is effected by God Himself, that it is in its very nature indissoluble &c.)—তখন এ-কথাও বলি যে, এই বিবাহ শৈশবকালে হইতেই পারে না। এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তি আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। আর প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা জয়গোবিন্দ বাবু এই বলেন যে, এদেশে বাল্য বিবাহে কি কি অপকার হইয়াছে, তাহার কোন তালিকা নাই। এটা তাঁর কি রূপ যুক্তিযুক্ত কথা? তালিকা থাকুক বা না থাকুক, দোষ ঘটুক, আর না ঘটুক, সে পৃথক কথা। বাল্য বিবাহে যখন

বিধাতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিবাহকে প্রশ্রয় দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? বাল্যবিবাহে শারিরীক অপকার হয় কি না, সে পরের কথা। ধার্ম্মিক সর্ব্বাগ্রে দেখিবেন, বিবাহ ভগবানের আদেশ বা ইঙ্গিত সম্মত হইতেছে কি না। তারপর বিজ্ঞান, তারপর দর্শন। ভগবানের ইঙ্গিত বা আদেশের সহিত দর্শন বিজ্ঞানের অমিল হইতে পারে না। তাঁর ইঙ্গিতে যে বিবাহ হয়, তাহাতেই সুফল ফলে। তাঁর যাতে ইঙ্গিত নাই, তাতেই কুফল ফলিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের সকল কার্য্যই বিধাতার কার্য্য নয়, সুতরাং সকল বিবাহই যে বিধাতার ইঙ্গিতে হয়, একথা মনে করিতে পারি না। অদ্বৈতবাদী ভিন্ন, কোন দ্বৈতবাদী বা ত্রিত্ববাদীদিগের মধ্যে কেহ মনে করিতেপারেন কিনা,তাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। তাহা যদি হইত, তবে আর কোন কাজেই দোষ ঘটিত না। সুতরাং যে বিবাহ মনুষ্যকৃত, যাহাতে বিধাতার আদেশ নাই, তাহা যে অধর্ম্মের কার্য্য, তাতে আর সংশয় কি? অধর্ম্ম অপেক্ষা, ধার্ম্মিকের পক্ষে আর কোন্ দোষ অধিক? যাতে অধর্ম্ম, তাতেই সকল দোষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত। বাস্তবিকও তাই। বাল্য বিবাহে যে সকল অনিষ্ট হইতেছে, তিনি চক্ষু ও বুদ্ধি থাকিতে, অনিষ্টের বিবরণ সংগ্রহ নাই বলিয়াই সে সকল কেমনে অস্বীকার করিবেন, আমরা বুঝি না। দিন রাত্রি চক্ষের সম্মুখে যে সকল বীভৎস ঘটনা ঘটিতেছে,তাহা দেখিয়াও কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, বাল্য বিবাহে অনিষ্ট হয় না? এই রূপ অনিষ্ট দেখিয়া দেখিয়াই, সাধারণত ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি বাল্য বিবাহের বিরোধী হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর মতামতের যে একখানি বিবরণ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। তাতেই এ কথা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বাল্যবিবাহে এদেশের ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে। নচেৎ এত গণ্য মান্য ব্যক্তি কখনই বিরোধী হইতেন না। তারপর ডাক্তারদের কথা। ডাক্তারেরাও বাল্য বিবাহের কুফল পরীক্ষা করিয়াই এক বাক্যে সকলেই বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, বাল্য বিবাহে এদেশে যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। আর প্রমাণ তালিকার প্রয়োজন কি?

তারপর একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার যুক্তি। এ যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, জয়গোবিন্দ বাবু তাহাপেক্ষা একটীও নূতন কথা বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই।

তার পরের যুক্তি এই—বাল্য কালে বিবাহ হইলে চরিত্রহীনতা ঘটে না। দেখা যাউক, ইহা কতদূর সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক বাক্যে বাল্য বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা এ স্থলে তুলিব না। উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ দিতে মনুও নিষেধ করিয়াছেন।* সুতরাং

* "I admit that infant-marriage is an evil; I also admit Manu only enjoined that a girl should be married when she was fit for marriage." &c.—Max Muller.

উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে যে বিবাহ, হিন্দু শাস্ত্রেও তাহা গ্রাহ্য নয়। মনুর কথা হিন্দু সমাজের শিরোধার্য্য। তারপর সুশ্রুত-সংহিতায় "পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শ বর্ষ অবধি বয়সই পরস্পর সহবাসের উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ উক্তকালে উভয়ের বীজই সম্যক পক্ক ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ন্যূন বয়স্ক পুরুষ কিম্বা স্ত্রীর সংযোগে গর্ভ সঞ্চার হইলে তদ্গর্ভজ সন্তান গর্ভাশয়েই মৃত হয়। অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়াও অধিক কাল জীবিত থাকে না। কিংবা জীবিত থাকিলেও নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। কারণ পূর্ব্বোক্ত বিহিত কালের ন্যূন বয়সে উভয়েরই বীজের সম্যক পরিপক্কতা বা পরিপুষ্টি সাধিত হয় না।*" বালক বালিকাকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া সহবাস হইতে বঞ্চিত রাখা যাঁহাদের মত, তাঁহারা একথা কোন মতেই বলিতে পারেন না যে,বাল্য বিবাহে চরিত্রহীনতা ঘটে না। কারণ, অসময়ে দাম্পত্য সুখের চিন্তাকে মনে স্থান দিয়া, নূতন আস্বাদনে দীক্ষিত করিয়া, তাহা হইতে দূরে রাখিলে আরো চরিত্রহীনতা ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক হয়, বালকেরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে রিপু চরিতার্থ করে। তারপর বিধাতার ইঙ্গিত যাঁহারা মানেন, কিন্তু শাস্ত্র যাঁহারা মানেন না, তাহারাও যৌবন কালের পূর্ব্বে বিধাতার সে ইঙ্গিতের নিদর্শন দেখিতে পান না।

* "উন ষোড়শ বর্ষায়াং প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ সবিপদ্যতে।
জাতোবা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"
সুশ্রুত সংহিতা।

তারপর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে ত কত অনিষ্টের কথা স্মরণ হয়। রাশি রাশি অনিষ্টের সম্ভাবনা যে বাল্য বিবাহে, এবং শাস্ত্রেও যাহা নিষিদ্ধ, তাহাতে চরিত্রহীনতা ঘটিবে না, এ কিরূপ কথা? চরিত্রহীনতা কাহাকে বলে? সে সময়ের যে কর্ত্তব্য, সে সময়ে তাহা পালন না করিলেই চরিত্রহীনতা ঘটে। বাল্যকালে বিবাহ না করাই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে তাতে চরিত্রহীনতা নিবারণ করিবে কিরূপে? বরং তাতেই আরো চরিত্রহীন করে। বাস্তবিক, বাল্যকালে বিবাহ হইলে, বালক বালিকারা অসময়ে পরিপক্ক হয়, জ্যেষ্ঠতাতত্ত্বে দীক্ষিত হয়, অসময়ে রিপু চালনা করিয়া নীতিহীন ও চরিত্রহীন হয়। এ সকল কিছু নূতন কথা নয়। সুতরাং বাল্যবিবাহেতে চরিত্রহীনতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

তারপর মনে কর, বাল্যবিবাহে চরিত্রহীনতা না জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। তাতেই বা কি? যে বাল্যবিবাহে শত শত অনিষ্ট, তাহা দ্বারা চরিত্র রাখা কি উচিত? একটা অন্যায় দ্বারা একটা ন্যায়কেও রক্ষা করা উচিত নয়। একটা অনিষ্ট নিবারণের জন্য বালক বালিকাকে চিরকালের জন্য রোগের অধীন, শোকের অধীন, চিন্তাবিহীন, জ্ঞানবিহীন করিয়া রাখা কি উচিত? অকাল মৃত্যু-মুখে ফেলা কি উচিত? বাল্যবিবাহে অনেক রোগ জন্মে, অসময়ে পুত্রশোক পাইতে হয়, মস্তিক দুর্ব্বল হয়, বিদ্যাশিক্ষায় শিথিলতা জন্মে, এ সকল অতি পুরাতন কথা। অন্যান্য কাগজে এ সকল কথার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। অনিষ্ট নিবারণের

জন্য আরো অনিষ্ট ডাকিয়া আনিতে পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়।

তারপর তিনি বলেন, বাল্যকালে বিবাহ না দিলে পাত্র জুটিবে না।—এটা কোন কাজেরই কথা নয়। সকল বালিকাই যদি উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তবে পাত্র জুটিবে না কেন, বুঝি না। পাত্রীর সংখ্যার অল্পতাই যদি ইহার কারণ হয়, তবে সে অভাবেও বাল্যবিবাহেও দূর হয় না।

তারপর কথা হইতেছে, যৌবন বিবাহে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক সে কথা সত্য। ধর্ম্মহীনতাই তাহার প্রধান কারণ। ইয়ুরোপ এবং অন্যান্য যে সকল প্রদেশে যৌবন বিবাহে কুফল ফলিতেছে, ধর্ম্মহীনতাই সে সকল স্থলে প্রধান কারণ, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এজন্য মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? যাহাতে লোক ধার্ম্মিক হয়, জীতেন্দ্রিয় হয়, ইহাই কর্ত্তব্য। আগুনে বাড়ী ঘর পুড়িয়া যায় বলিয়া আগুনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা কি উচিত? যাহাতে বাড়ী না পুড়ে, বরং তাহাই করা উচিত। রিপুর অত্যাচারে মানুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় বলিয়া, অঙ্গ বিশেষ চ্ছেদন করিতে কোন ক্রমেই ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না। সাবধান হওয়া উচিত, এই পর্য্যন্ত বলা যায়। আমরাও এই ব্রাহ্মসমাজের অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, বাস্তবিক খুব সতর্ক না হইলে যৌবন বিবাহে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা ভিন্ন আর উপায় দেখা যায় না। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ বায়ু যাহাতে দেশ মধ্যে প্রবাহিত হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। অন্যরূপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়।

তারপর বাল্য বিবাহের পোষকতায় জয়গোবিন্দ বাবু আর সে সকল কথা বলিয়াছেন, তাতে না আছে যুক্তি, না আছে তর্ক, না আছে চিন্তাশীলতা। সে সকল, কথা সম্বন্ধে আর আলোচনা করিব না। তবে তিনি যে উদ্দেশ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সে উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের প্রাণের গভীর সহানুভূতি আছে। এ সম্বন্ধে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। হিন্দু সমাজের বিরোধী ব্যক্তি এরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারের চেষ্টা করিতেছেন, ভাবিলেও আনন্দ হয়। ঈশ্বর তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। কি কারণে বিবাহ ভঙ্গ প্রথা সমাজে চলা উচিত নয়, এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই যুক্তিযুক্ত। তাহার সে সকল কথার সহিত আমাদের মতের বড় অনৈক্য নাই। ১৩।১৪ বৎসরের বালিকা বা ১৫।১৬ বৎসরের বালকের সম্মতি বা অসম্মতির যে কোন একটা মূল্য নাই, সে সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে তাঁর সহিত এক বাক্যে বলি, এরূপ বিবাহ ভঙ্গ প্রথায় মত দেওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নয়।

অন্যান্য কথা ক্রমে ক্রমে লিখিব।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। হিমাদ্রি-কুসুম।—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ, প্রণীত। মূল্য এক টাকা। ভাল গ্রন্থ পড়া সমালোচকের ভাগ্যে বড় ঘটে না। গ্রন্থকারেরা সে জন্য হয়ত সমালোচককেই নিন্দা করিবেন। আমরা বলি যে, সমালোচকের আর কিছু নিন্দনীয় হউক আর না হউক, ভাগ্যটী নিন্দনীয় বটে। সে যাহাই হউক, চারিদিকের রাশি রাশি অসার পদ্য গ্রন্থের মধ্যে হিমাদ্রি-কুসুম পড়ার সুখ, বড় সুখ। শিবনাথ বাবু সুকবি বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিচিত; পল্লিগ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত তাঁহার অতি সুন্দর, অতি মনোহর "ফুল" "পাখী" "চৈতন্যের সন্ন্যাস" প্রভৃতি পড়িয়া,সৌন্দর্য্য কি, নৈতিক বল কি, ইহা বুঝিতে শিখিতেছে। মনোহর ছন্দে একটা দুইটা ভাল কথা ভাল করিয়া বলিতে পারিলেই লোকে কবি হয় না। সৃষ্টি দেখিয়া যদি কবিত্বের ওজন করিতে হয়, তবে শিবনাথ বাবু একজন প্রকৃত কবি। যে মহান্ উদ্দেশ্য তাঁহার "উৎসর্গ" নামক কবিতায় পড়িয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্য,সেই শিষ্ঠাচার ও সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠার সংকল্প হিমাদ্রি-কুসুমের ছন্দে ছন্দে স্ফুরিত হইয়াছে। ভাল কথা, ও ভাল ভাব শুনিলে বা বুঝিলে যে সকল সময়েই একটা বড় ফল হয়, তাহা নয়; কিন্তু কবিত্বের মধুময় বীণার রবের সঙ্গে যখন তাহারা হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন যে ফল হয়, তাহা বর্ণনারও অতীত। "দীক্ষা" হইতে "বিদায়" পর্য্যন্ত এমন একটী কবিতা নাই, যাহা পড়িয়া উঠিলে সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ-সুখের সঙ্গে সঙ্গে সংভাব ও সাধু সংকল্প হৃদয়ে উদিত হয় না। যদি স্থানাভাব না হইত, তবে আমরা অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু ভরসা করি, পাঠক মহাশয় নিজে নিজেই সেগুলি দেখিয়া লইবেন।

২। অযোধ্যার বেগম।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রতি ভাগের মূল্য ৸০। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। চণ্ডী বাবু নব্যভারতের পাঠকদিগের নিকট খুব পরিচিত। তাঁহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বেশ আছে। হেষ্টিংসের সময়ে এদেশে কিরূপ অত্যাচার হইত, তাহা চণ্ডী বাবুর মহারাজা নন্দকুমার, অযোধ্যার বেগম প্রভৃতি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালার যে সময়ের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন, ইংরেজ ঐতিহাসিকের মিথ্যা বর্ণনে পূর্ণ, চণ্ডী বাবু সেই সময়ের ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া এদেশের শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকার করিতেছেন। তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ক্রটী লক্ষিত হইলেও একথা বলিতে পারি যে, অযোধ্যার বেগম পাঠকেরা উপন্যাসের মত পড়িতে পারিবেন এবং স্থান বিশেষের বর্ণনায় খুব উত্তেজিত হইবেন। "এমানুষ নহে,রাক্ষস" নামক অধ্যায় পড়িতে পড়িতে আমরা গভীর উত্তেজনা অনুভব করিয়াছিলাম।

৩। শক্তিকানন।—(উপন্যাস) শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১৷০। গ্রন্থকারের বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার বেশ

ক্ষমতা আছে। উপন্যাসের বর্ণনার বিষয়-টীও অতি সুন্দর; কিন্তু গল্পটীতে খুব জমাট বাঁধে নাই। এই শ্রীশবাবুর প্রথম গ্রন্থ; ভরসা করি, ভবিষ্যতে তাঁর গ্রন্থে খুব সুপক্কতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৪। আশালতা।—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রণীত।—এখানি পদ্য গ্রন্থ। স্থানে স্থানে কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এখনও পরিপক্কতা জন্মে নাই। অনেক স্থানেই ভাষার দোষ, ছন্দের দোষ, এবং কোটেসনের অসংলগ্নতা দেখা যায়।

৫। গীতগোবিন্দ।—শ্রীহরিমোহন বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত; মূল্য ১॥০ মাত্র। কবি জয়দেবের নাম এবং তৎপ্রণীত গীতগোবিন্দের কথা জানে না—ভারতের সভ্য সমাজে এমন লোক নাই। কিন্তু নাম জানে বলিয়াই সকলেই যে জয়দেবচরিত বা গীতগোবিন্দের কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানেন, এমন নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত জয়দেব-চরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই বিস্তৃত গ্রন্থে জানিবার মত কথা অতি অল্পই আছে, এবং যাহাও বা আছে, তাহারও অধিক কথারই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বড় কম। তাহার পরে গীতগোবিন্দ গ্রন্থ। যদিও বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় এই গ্রন্থের অপরিসীম আদর; কিন্তু কোন দেশেই এমন ভাবে এগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, যাহার সাহায্যে সকলেই গীতগোবিন্দের কবিত্বরস আস্বাদন করিতে পারে। কিন্তু শুভক্ষণে এ বঙ্গদেশে আবার সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে; কাব্য গ্রন্থাদি হইতে বেদ বেদান্ত পর্য্যন্ত সকলই সাধারণের দৃষ্টি ভূমিতে আনীত হইতেছে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার এই গ্রন্থে যে বিজ্ঞাপন, জয়দেবের জীবনী, টীকা, অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রজনী বাবু এক বিস্তৃত গ্রন্থে জয়দেবের যে জীবনী দিয়াছেন, ইহার ১০ পৃষ্ঠার জীবনীর নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক কথায় বলি, যদি কেহ জয়দেব চরিত জানিতে চান, গীতগোবিন্দ ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িতে চান, তবে হরিমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই গ্রন্থই তাঁহার পক্ষে সমধিক উপযোগী হইবে। পাথুরিয়াঘাটায় ৭ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে প্রকাশক স্বয়ং এ গ্রন্থ বিক্রয় করেন।

৬। সাম্যবাদী।—মাসিক পত্রিকা, উড়িয়া ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু ললিত মোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। সাম্যবাদী প্রকৃতই সাম্যবাদী। ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব উদার মত প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন আমরা প্রার্থনা করি।

৭। কর্ণধার।—মাসিক পত্র ও সমালোচন; বার্ষিক মূল্য ১৲—শ্রীহারণ চন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্পাদকের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দিই। যেরূপ উৎসাহের সহিত এ পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতেছে, স্থায়ী হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, আশা করা যায়। মধ্যে মধ্যে লেখা ভাল।

ক্রমশঃ।

পালরাজগণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণ আমরা পাল রাজন্যবর্গের সময়াবধারণ জন্য চেষ্টা করিব। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে যে, মহারাজ গোপালের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মালবাধিপতি (দ্বিতীয়) কর্কারাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কর্কারাজ ৭৩৭ শকাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। এই ঘটনার অন্তত ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বে গোপালদেব সিংহাসন আরোহণ করেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব আমাদের মতে ৭৩০ শকাব্দে গোপালদেবের অভিষেককাল গণনা করা যাইতে পারে।

ইহা বারংবার উল্লেখ করা গিয়াছে যে, পালরাজকে বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিজয়সেন এই দেশের রাজদণ্ড ধারণ করেন। * ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়, ১০৪৬ খ্রীষ্টাব্দ (৯৬৮ শকাব্দ) বিজয়সেনের অভিষেককাল গণনা করিয়াছেন, আমরাও ইহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। সুতরাং ৭৩০ শকাব্দ হইতে ৯৬৮ শকাব্দ গণনা দ্বারা আমরা ১২ জন পাল নরপতির রাজত্বকাল ২৩৮ বৎসর প্রাপ্ত হইতেছি, গড়ে প্রত্যেকের রাজত্বকাল ১৯ বৎসর ১০ মাস হইতেছে। মিত্র মহাশয় পালদিগের রাজত্বকাল গড়ে ২০ বৎসর গণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এইরূপ গণনা দ্বারা ইহাদের রাজ্যাভিষেকের যে অব্দ লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্তই কাল্পনিক হইয়া পড়িয়াছে। কারণ কোন কোন নরপতি ৩০ বৎসরেরও অধিক কাল রাজ্য শাসন করিয়া ছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বস্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

তিব্বত দেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ বলেন যে, পাল বংশের স্থাপয়িতা গোপাল প্রবল পরাক্রমের সহিত ৪৫ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।* মহারাজ গোপাল দেবের রাজ্য শাসন এইরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

পাল বংশের দ্বিতীয় নরপতির ধর্ম্মপালদেব প্রায় ৩০ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে। টীকায় উদ্ধৃত ক্ষোদিত লিপি † পাঠে অবগত হওয়া

* বিজয় সেন প্রথমতঃ তাহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিনিধি "Viceroy" স্বরূপে বাঙ্গালা দেশ শাসন করেন। তৎপর তাঁহার বংশধরগণ স্বাধীন ভাবে এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন। "সেনরাজগণ" পুস্তকে সেন রাজগণের দক্ষিণাপথ হইতে আগমন সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রচার করিয়াছিলাম, ক্রমে সেই মত সমর্থনোপযোগী আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

* He began to reign in Bengal, but afterwards reduced Magadha also under his power. He built the Nalandra (নালন্দা) temple not far from Otantapura, (উদানন্দপুর) and reigned forty-five years.

Taranatha's Account of the Magadha Kings.

† ১। ত্বদব্দ্য (১)×শীয়নভরস্য উজ্জলস্য শিলাভিদঃ।×।

২। শকাধ্যেন পুত্রেণ মহাদেব শ্চতুর্মুখ॥ শ্রেষ্ঠ×

যায় যে, ধর্ম্মপালের রাজ্যাভিষেকের ২৬ অব্দে শক নামক ব্যক্তি দ্বারা একটী চতুর্ম্মুখ মহাদেব মূর্ত্তি ও একটী পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। তারানাথের মতে ধর্ম্মপাল ৬৪ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ‡

মুঙ্গেরের শাসনপত্র পাল বংশের তৃতীয় নরপতি দেবপাল দেবের ৩৩ অব্দে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং দেবপালদেবের রাজ্যকাল অন্তত ৩৫ বৎসর গণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তারানাথের মতে দেবপালদেব ৪৮ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ¶

আমরা ইতিপূর্ব্বে বিগ্রহ পালদেবের নামাঙ্কিত যে প্রস্তরলিপি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, এই বিগ্রহ পাল দ্বাদশবৎসরের উর্দ্ধকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি প্রথম, দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বিগ্রহপাল, তাহা স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না।

ভাগলপুরের তাম্রশাসনের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা বিগ্রহ পালের পুত্র নারায়ণ পাল প্রদত্ত। এই শাসন পত্রের অব্দ ১৭। সুতরাং নারায়ণ পাল সত্তর বৎসরের অধিক কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

আমগাছির শাসন পত্রোক্ত পাল বংশের ৯ নবম নরপতি মহীপাল দেব এবং বুদ্ধ গয়ায় ও শরনাথের প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ মহীপাল দেব দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

নালন্দার প্রস্তরলিপির "অগ্নি (৩) রাম (১) দ্বার (৯)" শব্দ পাঠ করিয়া মিত্র মহাশয় প্রথমত ইহাকে ৯১৩ সম্বত অবধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ তিনি "রাঘ" কে "রাধ" পাঠ করিয়া; ৩ বৈশাখ দ্বারদেশে এই দান কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার কোন্‌টী সঙ্গত, তাহা আমরা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। এবং এই বিষয় লইয়া আমরা তাঁহার সহিত আপাতত কলহ করিতে নহি। ফলত তাহার দ্বিতীয় ব্যাখ্যা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াও ৯১৩ সম্বত স্থির রাখা যাইতে পারে। যদি এই প্রস্তর লিপিতে, মহীপালের পিতা কিম্বা পুত্রের নাম লিখিত থাকিত, তাহা হইলে আমরা সহজেই, ইনি প্রথম কি দ্বিতীয় মহীপাল, তাহা স্থির করিতে পারিতাম। তাহা নাই বলিয়াই আমরা এই প্রস্তর লিপির প্রতি কোনরূপ নির্ভর করিতে পারি না। ফলত আমগাছির শাসনোৎকীর্ণ মহীপাল ও শরণাথের প্রস্তর লিপির মহীপাল যে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, এরূপ অবধারণ করিবার

৩। ম×ম× মহাবোধি নিবাসিনাং ॥ স্নাতক×
৪। × অক্ষয়াস্‌ শ্রেয়সে প্রতিষ্ঠাপিতঃ পুষ্করি
৫। ণ্যস্তা (ত্র)×র্যা চ পূতা বিষ্ণু পদীসমা ॥ ত্রিতয়ে
৬। ন সহস্রেণ দ্রম্মাণাং খনিতা+তা ॥
৭। ষড়বিংশতিতমে বর্ষে ধর্ম্মপালে মহীভুজি
৮। ভাদ্রবহুলপঞ্চম্যাং স্নাতোমাস্ক
৯। রস্যাহতি ॥

বুদ্ধ গয়ার ২নং ক্ষোদিত লিপি
P. A. S. B. page 80 for 1880.

‡ Dharma pala was raised to the throne, reigned sixty-four years. He subdued Kamrup, Terahuti, &c., so that his dominions streteched east to the sea, west to Tili (Delhi), north to Jalandhara, and south to the Vindhya mountains,

Taranath's account of the Magadha kings.

¶ Deva pala greatly increased his power reigned forty-eight years.—*Taranath.*

বিশেষ কারণ আছে। স্থির পাল ও বশন্ত পালের নাম ও ফলকাঙ্কিত ১০৮৩ সম্বত (৯৪৯ শকাব্দ) ই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের প্রধান কারণ। ইতিপুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ৯৬৮ শকাব্দে মহারাজ মহীপাল বাঙ্গলা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ঘটনার ১৯ বৎসর পূর্ব্বে প্রোক্ত প্রস্তর ফলক ক্ষোদিত হইয়াছিল।

মহীপাল প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তারানাথের মতে তাহার শাসন কাল ৫২ বৎসর। আমরা ক্ষোদিত লিপিতে মহীপালের ৪৮ অব্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং তারানাথের উক্তি কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় ২৫।৩০ বৎসর রাজ্যশাসনের পর মহীপাল বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়া বিহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট কাল তিনি বিহার ও বারাণসী প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পালরাজগণ কে কোন্ বৎসর সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ৭৩০ শকাব্দে কিম্বা শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পালদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হয় এবং শকাব্দের দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বাঙ্গালা দেশে ইঁহাদের শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ-দ্বিশত বৎসর দ্বাদশ জন পাল নরপতি বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত আর কিছুই স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। কিন্তু মিত্র মহাশয় কিম্বা কনিংহাম সাহেবের ন্যায় একটী তালিকা প্রস্তুত করিতে হইলে আমরাও নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।

গোপাল দেব	৭৩০	শকাব্দ	৪৫	বৎসর
ধর্ম্মপাল দেব	৭৭৫	”	৩০	”
দেবপাল দেব	৮০৫	”	৩৫	”
বিগ্রহপাল দেব	৮৪০	”	১৫	”
নারায়ণপালদেব	৮৫৫	”	২০	”
রাজ্যপাল দেব	৮৭৫	”	৮	”
—পালদেব	৮৮৩	”	৮	”
বিগ্রহপাল (২য়)	৮৯১	”	৮	”
মহীপাল দেব	৮৯৯	”	৮	”
নয়পাল দেব *	৯০৭	”	১৮	”
বিগ্রহপাল(৩য়)	৯২৫	”	১৮	”
মহীপালদেব (২য়)	৯৪৩	”	২৫	”

পাঠকগণ আমাদিগের এই তালিকার সহিত মিত্র মহোদয়, কনিংহাম ও হরেন্লি সাহেবের প্রকাশিত তালিকা পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন, এজন্য আমরা পর পৃষ্ঠায় তাহাও প্রকাশ করিলাম।

পালরাজগণ কোন্ জাতি ছিলেন? দুই একটী কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফাজেল ইহাদিগকে কায়স্থ জাতীয় লিখিয়াছেন। আকবরের শাসন কালে বঙ্গ দেশীয় সামন্ত নরপতিগণ প্রায় সকলই কায়স্থ ছিলেন, বোধ হয় এজন্যই আবুল ফাজেল বঙ্গদেশীয় প্রাচীন নরপতি সেন ও পালদিগকেও কায়স্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ প্রমাণাভাবে আবুল ফাজেলের এই সকল বাক্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

* Neyapala reigned thirty-five years.
Taranath

পালরাজগণের তালিকা।

প্রবন্ধ লেখকের মত।

১।	গোপালদেব	৭৩০ শকাব্দ
২।	ধর্ম্মপালদেব	৭৭৫ „
৩।	দেবপালদেব	৮০৫ „
৪।	বিগ্রহ (সুর) পাল	৮৪০ „
৫।	নারায়ণ পাল	৮৫৫ „
৬।	রাজ্যপাল	৮৭৫ „
৭।	—পাল	৮৮৩ „
৮।	বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়)	৮৯১ „
৯।	মহীপাল	৮৯৯ „
১০।	নয়পাল	৯০৭ „
১১।	বিগ্রহপাল (তৃতীয়)	৯২৫ „
১২।	মহীপাল (দ্বিতীয়)	৯৪৩ „

মহীপালের শাসনকালে নির্ম্মিত একটী পিত্তলের দেব মূর্ত্তিতে তাঁহার ৪৮ অব্দ খোদিত রহিয়াছে। সুতরাং তিনি ৪৮ বৎসরের অধিককাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, প্রায় ২৫ বৎসর রাজ্য শাসনের পর বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হন। তৎপর অবশিষ্টকাল বিহার ও বারানসী প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কনিংহাম সাহেবের মত।

১।	গোপাল দেব	৭৩৭ শকাব্দ
২।	ধর্ম্মপাল দেব	৭৫২ „
৩।	দেবপালদেব	৭৭২ „
৪।	রাজ্যপাল *	৮০৭ „
৫।	সুরপাল *	৮০৯ „
৬।	বিগ্রহপাল	৮২২ „
৭।	নারায়ণপাল	৮৩৭ „
৮।	রাজ্যপাল	৮৬২ „
৯।	—পাল	৮৮৭ „
১০।	বিগ্রহপাল	৯১২ „
১১।	মহীপাল	৯৩৭ „
	হইতে	৯৬২ „

* দেবপাল তাঁহার পুত্রকে যৌবরাজ্য অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভাগলপুরের তাম্র শাসনে লিখিত আছে, যে দেবপালের পর বিগ্রহপাল সিংহাসন আরোহণ করেন।

মিত্র মহাশয়ের মত।

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে।

১।	গোপালদেব	৭৭৭ শকাব্দ
২।	ধর্ম্মপালদেব	৭৯৭ „
৩।	দেবপালদেব	৮১৭ „
৪।	বিগ্রহপাল	৮৩৭ „
৫।	নারায়ণপাল	৮৫৭ „
৬।	রাজপাল	৮৭৭ „
৭।	—পাল	৮৯৭ „
৮।	বিগ্রহপাল (২য়)	৯১৭ „
৯।	মহীপাল	৯৩৭ „
১০।	নয়পাল	৯৬২ „
১১।	বিগ্রহপাল প্রভৃতি বিহার প্রদেশ।	

মিত্র মহাশয়ের মতে প্রকৃত বাঙ্গালার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ অর্থাৎ বঙ্গদেশ পালরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয় নাই। যাঁহাদের ভুজবলে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত স্থিত গুর্জ্জর দেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল.—যাঁহাদের ভয়ে মালবরাজ মহারাষ্ট্র পতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এহেন পালরাজগণ যে তাহাদের রাজ্যের কিয়দংশ অন্য এক জন ক্ষুদ্র নরপতিকে প্রদান পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ছিলেন, ইহা কি বিশ্বাস করিতে পারা যায়? তবে বঙ্গদেশে তাঁহাদের অধীনস্থ কোন সামন্ত রাজা ছিলেন, এরূপ অনুমান করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা অবশ্যই হেমন্ত সেন, সামন্ত সেন ও বীরসেন নহেন। (সেন রাজগণ পুস্তক দেখ।)

হরেন্‌লি সাহেবের মত।

১।	গোপালদেব	৮২৮ শকাব্দ
২।	ধর্ম্মপালদেব	৮৪৮ „
৩।	দেবপালদেব	৮৭৮ „
৪।	বিগ্রহপাল	৯১৩ „
৫।	মহীপাল—বিহার	৯২৮ „
৬।	নারায়ণপাল বঙ্গালা	৯২৮ „

ডক্তার হরেন্‌লি সাহেব আমগাছির তাম্র শাসনে লিখিত ১১ জন পাল নরপতিকে ৬ জন স্থির করিবার জন্য এক এক জনকে দুইটী নাম প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে হরেন্‌লি সাহেবকে আমরা বিশেষ কিছু বলিতে ইচ্ছা করিনা। ডাক্তার সাহেব যদি দিনাজপুরের মহীপাল দীঘিটী কোনরূপে বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়া বিহারে রাখিয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহার সকল কথা ঠিক হয়।

পাল গৌড়েশ্বরগণ তাঁহাদের শাসন পত্র কিম্বা খোদিত লিপিতে তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করান নাই। গরুড়স্তম্ব লিপিতে মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের মন্ত্রী গুরব মিশ্রের গুণানুবাদ স্থলে লিখিত হইয়াছে যে—

জমদগ্নিকুলোৎপন্ন সম্পন্ন ক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামসেনইবাপরঃ॥

অর্থাৎ দ্বিতীয় রামের ন্যায় সেই জমদগ্ন কুলে উৎপন্ন হইয়াও গুরব মিশ্র ক্ষত্রিয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, পালরাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। সেই জমদগ্ন কুলোৎপন্ন দ্বিতীয় রাম সদৃশ গুরুবমিশ্র ক্ষত্রিয় রাজার হিতানুষ্ঠানে রত ছিলেন বলিয়াই এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পালরাজগণ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহার অবস্থা ঘটিত আরও কতকগুলি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা বিবাহ বন্ধন দ্বারা যে কয়েকটী বিখ্যাত রাজ বংশের সহিত আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সকল রাজগণ সকলই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

প্রস্তাবের প্রারম্ভে পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন যে, বংশের স্থাপন কর্ত্তা মহারাজ গোপালদেবের রাজ্ঞী বাগীশ্বরী দেবী বল্লভী দেশের রাজকন্যা ছিলেন। এই বল্লভী দেশের নাম শ্রবণেই আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। যে সময় পাল গৌড়েশ্বরগণ প্রবল প্রতাপের সহিত পূর্ব্ব ভারত শাসন করিয়াছিলেন, সেই সময় পশ্চিম ভারতে বল্লভী রাজাদিগের দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

বোধ হয় আমাদের পাঠকগণ আধুনিক গুজরাট দেশের ভৌগলিক বিবরণ অবগত আছেন। ইহার প্রাচীন নাম গুর্জ্জর ও সৌরাষ্ট্র।

অতি প্রাচীনকালে গুর্জ্জরদেশ যদুবংশীয় রাজাদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, কিন্তু তাঁহারা কিরূপে গুর্জ্জরদেশ হইতে তাড়িত হইলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। মগধের মৌর্য্য নরপতিদিগের প্রবল উন্নতির সময় এই দেশ তাহাদের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। তৎপর প্রবল প্রতাপশালী “ক্ষত্রপ” বা “সাহ” রাজগণ গুর্জ্জর শাসন করিয়াছিলেন। সাহ রাজদিগের তীরোধানান্তে আরও দুই একটী বংশ সেই দেশের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপর শকাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে মগধের গুপ্ত সম্রাট গুর্জ্জরদেশ অধিকার করেন। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের শাসনকাল তাহার কুলতিলক পুত্র সৌরাষ্ট্রে বিজয়ী পতাকা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপর মহারাজাধিরাজ স্কন্ধ গুপ্তের মৃত্যুর পর তাহাদের সেনাপতি ভট্টারক (কণক সেন) কিয়ৎ পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া গুর্জ্জর শাসন করিতে লাগিলেন। যদিচ কণক সেন ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধার সেন কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনভাবে গুর্জ্জর শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা গুপ্ত সম্রাটদিগের ভয়ে রাজোপাধিধারণ করিতে পারেন নাই, ইহারা উভয়েই গুপ্ত সম্রাটদিগের সেনাপতি বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। কণক সেনের দ্বিতীয় পুত্র দ্রোণ সেন প্রথমত মহারাজাধিরাজ বুধ গুপ্ত হইতে “মহারাজ” উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বংশীয় ১৯ জন নরপতি প্রায় পাঁচ

শতাব্দী গুর্জ্জরদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা বল্লভী নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে অসভ্যদিগের অত্যাচারে কণক সেনের বংশধরগণ গুর্জ্জর হইতে তাড়িত হন।*

এই ঘটনার পর ৬১৮ শকাব্দে আর একটী রাজপুত বংশ বল্লভী অধিকার করিয়াছিলেন, ইহারা সাধারণত সৌর (চৌড়) বলিয়া পরিচিত। এই রাজ বংশ অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। আরব দেশীয় ভ্রমণকারী ও প্রাচীন লেখকগণ ইহাদের সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত আরব ভ্রমণকারী সুলেমান ৭৩৭ শকাব্দে লিখিয়াছিলেন যে, সমতা অনুসারে গণনা করিতে হইলে আরব রাজ প্রথম, চীন সম্রাট দ্বিতীয়, গ্রীক রাজ তৃতীয় ও বল্লভী রাজ চতুর্থ হইতে পারেন। ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লভী রাজ সর্ব্ব প্রধান। ৮৩৪ শকাব্দে বিখ্যাত মুসলমান গ্রন্থকার ইবন খোরদাদবে লিখিয়াছিলেন, বল্লভীপতি ভারতের সর্ব্ব প্রধান নরপতি; সকলেই তাহাকে "রাজার রাজা" অর্থাৎ সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন। ৮৭৮ শকাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিখ্যাত আরব গ্রন্থকার মসৌদি লিখিয়াছিলেন যে, বল্লভীপতি সমস্ত ভারতের সম্রাট। আমরা ইতি পূর্ব্বে মহারাজ গোপাল দেবের যে সময় অবধারণ করিয়াছি, প্রায় সেই সময়ে চৌড় বংশীয় বনরাজ রাজন্যবর্গ পূজিত বল্লভীর রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। সম্ভবত ইনিই গৌড়েশ্বরী বাগীশ্বরী দেব্যার জনক। যে গোপালদেব চৌড় রাজপুতের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাকে অবশ্যই ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মুঙ্গেরের তাম্রশাসন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, মহারাজ ধর্ম্মপাল রাষ্টকুটাপতি প্রবলের দুহিতাকে বিবাহ করেন। তৎপর পাল বংশীয় ষষ্ঠ নরপতি রাজ্যপালদেবও সেই বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র কুটাপতিগণও অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন, তাঁহাদের অনেকগুলি শাসন পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইহারা সুবিখ্যাত যদুবংশোৎপন্ন। যে বংশীয় নরপতিগণ যদুবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ভাগলপুরের তাম্র শাসনে লিখিত আছে যে, মহারাজ বিগ্রহপাল হৈহয় বংশীয় লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই লজ্জাদেবীর গর্ভে মহারাজ নারায়ণপালদেব জন্ম গ্রহণ করেন। হৈহয় বংশের পরিচয় পাঠকদিগকে আর অধিক কি দিব, যে বংশ রাক্ষসরাজ রাবণের দর্প চূর্ণকারী সহস্র বাহু সন্নিভ পরাক্রমশালী অর্জ্জুন জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বংশই হৈহয় বংশ নামে পরিচিত। চন্দ্রবংশীয় সম্রাট যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর পৌত্র হৈহয়

* এই কণক সেনের বংশ হইতে মিবারের রাজাগণ আপনাদের বংশের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। (See Tod's Rajasthan, vol. I. p. 156.) কিন্তু ইহারা যে সূর্য্যবংশীয় ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহাদের প্রভু অর্থাৎ গুপ্ত সম্রাটগণ সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। ভারতে যে কয়েকটী প্রাচীন রাজবংশ এইক্ষণ বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্তের উৎপত্তি বৃত্তান্ত কাল্পনিক বর্ণনায় পরিপূর্ণ। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা টড সাহেবের ভ্রম প্রদর্শন করিব।

হইতে তদ্বংশধরগণ এই আখ্যাটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সময় পালরাজগণ প্রবল পরাক্রমের সহিত পূর্ব্ব ভারত শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় হৈহয় বংশজ "কুলাচুড়ী" রাজগণ চেদীর রাজ সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, ত্রিপুরা নগরীতে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। আধুনিক ঝব্বলপুরের অনতিদূরে ত্রিপুরার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আবিষ্কৃত শাসনপত্র হইতে ত্রিপুরাপতি হৈহয়দিগের সুদীর্ঘ বংশাবলী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহারা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। আমরা ইহা বিশেষ আনন্দের সহিত উল্লেখ করিতে পারি যে, পালদিগের সমকালে ভারতে যে কয়েকটী প্রতাপশালী রাজবংশ বর্ত্তমান ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই পালবংশে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিল, ইহা দ্বারা পাল রাজন্যবর্গের প্রবল প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহাহউক, চন্দ্র বংশজাত হৈহয় কুলের রাজকুমারী লজ্জাদেবীকে যে বিগ্রহপাল বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাকে ক্ষত্রিয় ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত সমস্ত কারণে আমরা বলিতেছি যে, পালরাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

ছুঁয়ো না।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!
লাগিলে গায় গায়,
সহজে ভেঙ্গে যায়,
রাখহে ভালবাসা বাসনা-হীন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

১

নিশ্বাসে যাবে গ'লে,
পাবে বিশ্বাসী হ'লে,
আশ্বাসে থাক চিরদিন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

২

থাকিলে দূরে দূরে,
পাবে ভুবন যু'ড়ে,
দেখিবে সদা তারে নিতি নবীন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

কি কায দেখাদেখি,
থাক একাএকী,
করহে পরাণে পরাণে লীন:
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৪

স্বচ্ছ সরল বুকে,
গোপনে রাখ সুখে,
সরসী রাখে যথা হরষে মীন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

৫

পরশে হয় কালা,
দরশে বাড়ে জ্বালা,
মানসে ফোটে শুধু প্রেম-নলিন!
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন!

* See Princep's Useful Tables p. 168.

৬

কেন এ কাঁদা হাসা
আকুল এ পিপাসা,
কলঙ্কে শশী কালা—কোলে হরিণ !
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৭

কিছুই চেয়ো নাক,
কেবলি দিতে থাক,
শোধিতে বাড়িবে সে মধুর প্রেমঋণ !
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

৮

ধরাতে দেবতা সে,
যে হেন ভালবাসে,
বিরহ হা হুতাশে মরেনা সে কোন দিন !
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন !

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

নির্ঝরিণী।

দিন নাই,রাত্রি নাই, অস্ফুট কুলকুল স্বরে মধুর বাঁশরী বাজাইয়া, মধুর লহরী ঢালিয়া পর্ব্বত-দুহিতা নির্ঝরিণী কোথায় চলিয়াছে, কে জানে ? পাহাড়ে মেয়ে বড় কুশ্রী, বড় কঠোর, নির্ঝরিণী সুরূপা কামিনী,—মধুর ভাষিনী, কোমল হৃদয়া। দেখ আধ ফুট স্বরে, আকুল বিলাপে পথ-বিরোধী রাক্ষসের পাষাণ চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে।

আর কাঁদিয়া বলিতেছে, কে তুমি সম্মুখে অবলার প্রেমপথে ? সর সর, আমায় বাধা দিওনা, আমায় ধরিয়া রাখিও না, যেখানে যাইব বলিয়া এ কঠিন পাষাণ-ময়, দুর্ভেদ্য মঙ্গলময় পথে পদচারণা করিয়াছি, যে প্রকারে হউক, সেখানে আমার যাইতেই হইবে। কোমল বুকের ভিতর এত দৃঢ়তা আর কোথায়ও দেখিয়াছ ? আমায় বাধা দিও না, বাধা দিও না, এই বলিয়া ধীরে ধীরে অচলার বক্ষ এড়াইয়া শান্তিময়ী নির্ঝরিণী পাষাণে আগুন জ্বালিয়া আবার সেই প্রেম সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কাহার উদ্দেশে কোথায় চলিল ? এ প্রেম-হার কাহার গলায় পরাইবে ? এই বিশাল বিশ্বের নির্জন নিভৃত কাননে কুসুমের সুবাসের সহিত কাহার মধুমাখা শান্তিপূর্ণ মুখখানি তাহার মনে জাগিয়াছে ? কে জানে, কাহার হাসিটী, দু ফোঁটা চোখের জল সাথে নিয়ে তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে ? ঐ শান্তিময় গভীর বিজনে, সুদূর পর্ব্বতের আড়ালে লুকাইয়া উদাসিনী আপন মনে কি গান গাহিতে গাহিতে ধীরে ধীরে পর্ব্বত গুহায় নামিয়া আসিতেছে ? যৌবনে সন্ন্যাসিনী, বড় সুন্দর। চল পথিক চল, একবার ঐ প্রেমময়ীর প্রেম মাখা মুখখানি দেখিয়া ওর প্রাণ ভরা উদাস প্রেমের বিরহ গানটী শুনিয়া আসি। চল শুনিয়া আসি, ঐ মধুর বাঁশরী কি বলে। যে প্রেমের দয়ায় যোগী সাজে,

"রাধা নাম জপ করে মুখে রাধা রাধা বলে
রাধা নামে হয় সে উদাসী"

সে আমার বড় প্রিয়। তেমন সুন্দর ছবি জগতে আর মিলে না।

মুগ্ধ মধুপের মত গান গাহিতে গাহিতে

আপন মনে একাগ্র চিত্তে নির্ঝরিণী বন্ধুর শিলাভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। অসীম সুনীল সুন্দর সাগরে প্রাণের সাধ মিটাইতে, প্রাণে প্রাণে মিশাইতে, মুমূর্ষু প্রাণে সাগরের চরণতলে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িল। তবুও তার আকুল বিলাপ কেন ঘুচিল না? শ্রান্ত পদে ক্লান্ত কলেবরে, আকুল নয়নে, বিষাদ প্রাণে আবার সে কিসের গান তুলিয়াছে?

"সহস্র বন্ধনী ছিঁড়ে একটী বন্ধনী ধরে
ছুটে ছিল দূরে মেঘপুরে,
পৃথিবীর তীর ছেড়ে, সময়ের কূল ছেড়ে
জীবনের গণ্ডগোল দূরে
রুদ্ধশ্বাসে রুদ্ধ নেত্রে, কি নিগূঢ় আকর্ষণে
আপনায় অক্ষম হইয়া
শান্তির অসীম বুকে প্রাণের গভীরতায়
একেবারে পড়ে ছিল গিয়া।"

এত করিয়া এমন লোকের স্থানে তাহার এমন আশা কি মিটে নাই? সাধ হয়, এমন কয়জন দুর্ভাগা আর আছে, আর কয়জন হতভাগিনী আমার মত আশায় নিরাশ হইয়া, প্রাণের প্রাণ ভরসা ছাড়িয়া, স্ফূর্ত্তি হারাইয়া জীবনে সমাধি লাভ করিয়াছে, একবারে সব গণিয়া লই। চল পথিক চল,সন্ন্যাসিনী আবার কি গায়,শুনিয়া আসি।

শৈশবে যখন মায়ের কোলে শুইয়া মধুর হাসি হাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিতাম, আপন মনে দিবানিশি গান করিতাম, তখন কে জানিত আমার অদৃষ্টে কি অভিশাপ ছিল?

"দুই করে চাপি যবে দগধ হৃদয়
সংসার মরুতে ছুটে দেখিবে আঁধার
তখন পড়িবে মনে সংসার আশয়
তখন চাহিবে তুমি ফিরিতে আবার।"

যৌবনারম্ভে প্রাণের বেগে কত পর্ব্বত শিখর নির্জন অরণ্য শত সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পদে মহা জলধির চরণতলে আসিয়া পড়িলাম, ভাবিলাম, অসীম সাগরের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র জলবিন্দু মিশাইয়া দুয়ে এক হইয়া যাইব, প্রাণের বাসনা ও প্রেমের সাধ মিটাইব। আর আমি রহিব না, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া দুয়ে এক হইয়া জীবনের স্বতন্ত্রতা ঘুচাইব, কিন্তু তা হইল কৈ? প্রাণের তৃষ্ণা মিটিল কৈ? আশা পূরিল কই? আমার মনের মত কিছুই হইল না। ভাবিয়াছিলাম, যাহার আশ্রয় পাইলে চিরদিন হাসিয়া খেলিয়া প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়া নিরাপদে ক্ষুদ্র জীবনটা কাটাইয়া যাইব, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল কৈ? অসীম জলধি আপনাতে আপনি মত্ত, গভীর গর্জ্জনে ভীষণ তরঙ্গ তুলিয়া আপন মনে কোথায় চলিয়া যায়, কে জানে? আমার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহে না। আমি কি করিব? চরণে পড়িয়া কুলকুল রবে আকুল বিলাপে দিবানিশি রোদন করি, কিন্তু আমার আকুল বিলাপ কে শুনে? যে প্রাণের বেগে অজ্ঞ পর্ব্বত ভেদ করিয়া অসীম সাগর জলে প্রাণ ঢালিয়া দিতে আসিয়াছি, দেখিতেছি, সে পাষাণ হইতেও কঠোরতর, নচেৎ কেন সে ফিরিয়া চাহে না, কেন আমাকে ডাকিয়া লয় না? অভিমানে নির্জ্জনে নীরবে চরণতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করি, সতত মনের ব্যথা মরমে লুকাইয়া তাঁরি সাথে হাসি, তাঁরি সাথে কাঁদি, নিজের মনুষ্যত্ব ভুলিয়া তাঁহারি ধ্যান করি। নিতান্ত যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া অকূলে ঝাঁপ দিলাম, সে যদি

ভুলিয়াও আমার পানে একবার না চাহিল, আমার চক্ষের জল না মুছাইল, তবে এ জীবনে সুখ কি? তবে কি ক্ষুদ্র প্রাণে মহা প্রাণে মিলন হয় না, যুবাতে শিশুতে ভালবাসা হয় না? মহানের সহিত মহানের মিলন, সাগরের সহিত তটিনীর মিলন, তবে বল দেখি দুঃখিনী নির্ঝরিণীর কি গতি হবে? ঝটিকা উঠিয়া একেবারে আমাকে অস্থির করিয়া তোলে, সহস্রধারে অশ্রুবারি ঝরিতে থাকে, তখন প্রাণের বেগে পাগলিনী হইয়া সাগরে ঝাঁপ দিয়া জীবনের সকল সাধ, সকল জ্বালা মিটাইতে চাই—কিন্তু কোথা যাব?

"এই স্বপনের দেখা, এই স্বপনের কথা
এখনি ফুরাবে
অনন্ত আঁধারাকাশে, কক্ষ ভ্রষ্ট তারাটুকু
এখনি লুকাবে?"

সাগর আমাকে চাহে না, হাত বাড়াইয়া আমাকে বুকে তুলিয়া লয় না। প্রাণ হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠে। ঈশ্বরের অবিচার, প্রণয়ের অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠে, প্রাণের জ্বলন্ত অনল আর ঢাকিয়া রাখিতে পারি না। সকল আশা সকল সাধ বিসর্জ্জন দিয়া, আবার মার বুকে ফিরিয়া যাইতে বাসনা হয়। হা বিধাত, ভাবিতে যে লজ্জা করে! আশায় নিরাশ হইয়া আবার ফিরিয়া যাইব, লোকে বলিবে কি? আমার কপালে কি এই লেখা ছিল?

শিশুকালে যখন নিভৃত গুহায় মার কোলে লুকাইয়া ছিলাম, আপন মনে কত নাচিতাম, কত খেলিতাম, কত গান গাহিতাম, মনে কতই আনন্দ ছিল। মার বুকে মাথা রাখিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া জগতের কত বিষম ব্যাপার দেখিয়াছি। মেঘের গর্জ্জনে চপলার চমকে চমকিয়া মাকে বুকে জড়াইয়া ধরিতাম, অমনি নিশ্চিন্ত হইতাম, মার কোলের মত নিরাপদ স্থান শিশুর পক্ষে জগতে আর একটী নাই। পূর্ণিমা রজনীতে পাখীরা আমার মাথার উপরে চারি ধারে নাচিয়া নাচিয়া গান করিত, তখন সুমন্দ হিল্লোলে মধুর তানে শৈশব হৃদয় নাচিয়া উঠিত। বরষার আগমনে প্রাণের উল্লাসে কুল কুল রবে আমিও হৃদয় খুলিয়া তান ধরিয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। সেই সব সুখের দিন আমার কোথায়? অন্ধকার আঁধারে সকলই ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতি গুলি শৈশবস্বপনের মত ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতেছে। জগতের অবিচার, সমাজের অত্যাচার, প্রেমের পরিণাম দেখিয়া আবার কোন্ প্রাণে উজানে ফিরিয়া যাইব? যাইলে কি আবার তেমনটী পাইব? যাহা ছিল, তাহা কি আর আছে? ভগ্ন দেহে ভগ্ন হৃদয়ে অনাথিনীকে প্রতিবেশিগণ আবার কি সম্ভাষণ করিবে?

জুড়াবে না এ হৃদয় সহকার আর
জুড়াবে না এ হৃদয় চাঁদিনী যামিনী
জুড়াবে না এ হৃদয় বিহঙ্গ আমার
জুড়াবে না এ হৃদয় গভীরা তটিনী,

এত সুদীর্ঘ পথ আসিয়াছি, আর যে ফিরিবার শক্তি নাই; এইখানে শুইয়া শুইয়া যাহার চরণ আশ্রয় লইয়াছি, তাহারই চরণে জীবন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমব্রতের উদ্যাপন করিব।

জলধি, জলধি, অম্বুনাদী মহান বারিধি, জলরাশি বুকে লইয়া আনন্দে মাতিতে মাতিতে কোথায় চলিয়াছ? সখাহে, একবার ক্ষণ কালের জন্য দাঁড়াও।

শুন তবে একবার এ প্রাণের জ্বালাময়ী
　　দুঃখের কাহিনী
বলিতে বলিতে সুখে, জন্মমত একেবারে
　　ঘুমাই অমনি ।

*　*　*　*　*

একটু অপেক্ষা কর নির্ব্বাপিত করি দীপ
　　সম্মুখে তোমার
দেখিয়া নিমেষ তরে, প্রাণের যাতনা শূন্য
　　শূন্যময় দেহ,
তারপর ধীরে ধীরে যেখানে মনের সাধ
　　সেই খানে যেও ।

সাগর হো হো করিয়া উঠিল, হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে জল রাশিকে বুকে তুলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। অভাগিনী, অভিমানিনী আর কথাটী কহিল না, ধীরে ধীরে সাগরের পদপ্রান্তে, সেই সিকতাময় বেলাভূমে, নীরবে, নিঃশব্দে, বায়ু-বিচ্যুত লতিকার ন্যায় লুটাইয়া পড়িল ; শয়নেও সে নয়ন সেই দূর দূর গামী সাগর মুখে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার প্রাণ বায়ু কোথায় চলিয়া গেল। প্রেমের পরিণাম সেখানেও কি এইরূপ ?

শ্রীবাই

ছন্দকের প্রত্যাবর্ত্তন ও পুরবৃত্তান্ত ।

কুমার সিদ্ধার্থ অর্দ্ধ রাত্র সময়ে পুরবাসিগণের অজ্ঞাতে পুর পরিত্যাগ করিলে পর প্রভাত সময়ে দেবমায়া সমুদ্ভূত মহা প্রশ্বাপন অন্তর্হিত। পুরন্ধ্রিবর্গ জাগরিত, গোপা জাগরিত, তাঁহারা সকলেই দেখিলেন, যুবরাজ সিদ্ধার্থ অন্তঃপুরে নাই। অমনি প্রাণ উড়িয়া গেল, ভয়ভীত-চিত্ত ও শোক-সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহারা এঘর ওঘর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

সুন্দরীগণ ক্রমে গ্রৈষ্মিক, বার্ষিক, হৈমন্তিক গৃহ সমুদায় অন্বেষণ করিয়াও যখন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন আর তাঁহাদের হৃদয়ে শোকাবেগ সম্বৃত থাকিল না, সকলেই হাহাকার রবে কাঁদিয়া উঠিলেন। রোদনের তুমুল শব্দ পুরব্যাপ্ত হইল, সে শব্দে সমুদায় শাক্যপুর ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল।

অন্তঃপুরের শোক নিনাদে বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদনের নিদ্রাচ্ছেদ হইয়াছে, তিনি দিশাহারা হইয়া সসম্ভ্রমে শাক্যদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, শাক্যগণ অন্তঃপুরে এত রোদন ধ্বনি কেন ? শাক্যগণ শুষ্কমুখে ও ভগ্ন হৃদয়ে তদ্বার্ত্তা বিজ্ঞাত হইয়া বলিলেন, মহারাজ ! অন্তঃপুরে কুমারকে দেখা যাইতেছে না। শুনিয়া রাজার মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, তিনি বলিলেন, শীঘ্র নগর দ্বার রুদ্ধ কর, করিয়া পুরি মধ্যে, নগর মধ্যে কুমারের অন্বেষণ কর।

সর্ব্বত্র অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু কোথাও কুমাকে দেখা গেল না। শাক্যনগর ক্রমে ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিল। কোথাও

কোন নারী কুররীর পক্ষিনীর ন্যায় আর্ত্তরবে রোদন করিতেছে, কোন রমণী বক্ষে করাঘাত করত ভূপতিত হইতেছে, কেহ মস্তক বিঘট্টন পূর্ব্বক হতচেতনা হইতেছে, কেহ ধূলি ধূসরিত হইয়া রোদন করিতেছে, কেহ শরবিদ্ধ কুরঙ্গীর ন্যায় ছটফট করিতেছে, কেহ বায়ু প্রকম্পিত কদলী পত্রের ন্যায় বিকম্পিত হইতেছে কেহ ধরণীতলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, কেহবা জালোৎক্ষিপ্ত মৎস্যের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ ছট্‌ফট্ করিয়া অবশেষে নিশ্চেষ্ট হইতেছে, এবং মহা প্রজাবতী গৌতমী শোকে উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া সবেগে বৃদ্ধ রাজার সম্মুখে আসিয়া "মহারাজ! আমাকে পুত্রের সঙ্গিনী করুণ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইতেছেন।

রাজা শুদ্ধোদন কুমারের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দশ অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিলেন, বলিয়া দিলেন, তোমরা শীঘ্র যাও—কুমারের অন্বেষণ কর—কুমারকে না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিও না।

দূতেরা তন্মুহূর্ত্তে মঙ্গল দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিল, জনৈক অপরিচিত মনুষ্য রাজকুমারের পরিধেয় কাশিক বস্ত্র মস্তকোপরি ধারণ করিয়া আগমন করিতেছে।* তাহা দেখিয়া দূতগণ ভাবিল, এবং পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, ঐ দেখ, আমাদের কুমারের পরিহিত বস্ত্র। এই ব্যক্তি ত বস্ত্রের লোভে তাঁহাকে বিনাশ করে নাই! ধর—এই ব্যক্তিকে ধর এবং নিগ্রহ কর। কথা শেষ না হইতে তাহারা দেখিল, ছন্দক তাহার পশ্চাৎভাগে কুমারের রত্নাভরণ ও অশ্ব লইয়া * আগমন করিতেছে। তাহা দেখিয়া তাহারা হর্ষবিষাদে আপ্লুত হইল এবং বলিতে লাগিল, না—এ ব্যক্তিকে ধরিবার ও নিগ্রহ করিবার আবশ্যক নাই। ঐ ছন্দক কুমারের অশ্ব লইয়া এদিকে আসিতেছে. আগে উহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।

ছন্দক! এই ব্যক্তি ত বস্ত্রের লোভে কুমারের জীবন বিনাশ করে নাই?

ছন্দক বলিল, না, কুমার এ ব্যক্তিকে আপন কাশিক বস্ত্র দিয়া এ ব্যক্তির কাষায় বস্ত্র লইয়াছেন।

অনন্তর সেই অপরিচিত পুরুষ ভগবানের বস্ত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক যথাগত স্থানে প্রস্থান করিলে পর দূতগণ পুনর্ব্বার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করিল, ছন্দক, কুমার কোথায়? বলিয়া দাও, আমরা সেই স্থানে যাইব। ছন্দক! তুমি কি বিবেচনা করি- তেছ যে, আমরা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে (ফিরাইয়া আনিতে) পারিব না?

ছন্দক বলিলেন, না; পারিবে না। তিনি বলিয়াছেন, আমি অনুত্তরা সম্যক সংবোধি লাভ না করিয়া কপিলপুরে প্রবেশ করিব না। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই করিবেন, তোমাদের প্রয়াস বৃথা হইবে।

---

* কোন কোন বাঙ্গালা পুস্তকে লিখিত আছে, ব্যাধরূপী মনুষ্য সিদ্ধার্থের নিকট যে কাশিক বস্ত্র পাইয়াছিল সে বস্ত্র বিক্রয় করিয়াছিল। একথা মূল গ্রন্থে নাই।

* বুদ্ধচরিত লেখক লিখিয়াছেন, সিদ্ধার্থের অশ্ব পথে মরিয়া গিয়াছিল। একথাও মূল গ্রন্থে নাই।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে ছন্দক সেই সকল আভরণ, ও অশ্ব সহ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আভরণ কিছু দিন মহাপ্রজাবতী গোতমী যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন। পরে তিনি শোক বৃদ্ধি দেখিয়া এক পুষ্করিণী মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলে, কপিল বস্তু নগরের সেই পুষ্করিণী অদ্যাপী আভরণ পুষ্করিণী নামে প্রসিদ্ধ আছে।

শাক্যসিংহের পুর প্রয়াণের পর হইতে, ছন্দকের পুর প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত, যেরূপ যেরূপ হইয়াছিল, সে সমস্ত ললিতবিস্তর গ্রন্থে শ্লোকাকারে নিবদ্ধ আছে। শ্লোক গুলি পাঠ করিবা মাত্র সমুদায় পুর বৃত্তান্ত উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। যথা

নিষ্ক্রান্ত শূরো যদ বিহু বোধি সত্ত্বো
নগরং বিবুদ্ধং কপিলপুরং সমগ্রং
মন্যান্তি সর্ব্বে শয়ণ গতঃ কুমারো
ন্যোন্য হৃষ্টাঃ প্রমুদিতা আলপন্তে ॥১
গোপা বিবুদ্ধা তথাপি ইস্ত্রিগারে
শয়ণং নিরিক্ষী ন দর্শি বোধিসত্ত্বং।
উৎক্রোশ মুক্তা নরপতি নোহ গারে
হা বঞ্চিতাস্মঃ কহিং গতুং বোধিসত্ত্বঃ ॥২
রাজা শুনিত্বা ধরণীতলে নিরস্তো
উৎক্রোস্থ কৃত্বা অহো মম এক পুত্রো।
সো স্তোমিতো হী জলপট সংপ্রসিক্তো
আশ্বাসয়িতো বহুশত শাকিয়ানাং ॥৩
গোপা শমাতো ধরণীতলে নিপত্য
কেশাং লুনাতি অবশিরি ভূষণানি।
* * * ॥৪

নপাস্যে-পানং ন চাৎস্যে সুপ্রসাদং
ভূমৌ শয়িষ্যে জটা মকুটং ধরিষ্যে।
স্নানং উহিত্বা ব্রততপা আচরিষ্যে
যাবন্ন দ্রক্ষ্যে গুণধর বোধিসত্ত্বং ॥৫।

* * *
মাতৃস্বসা চ পরম সুকৃচ্ছ প্রাপ্তা
আশ্বাসয়তো মা রুদ শাক্যকন্যে।
পূর্ব্বে চ উক্তং নর পুঙ্গবেন
কর্ত্তায় লোকে জরমরণাৎ প্রমোক্ষং ॥৬
সোচ মহর্ষী কুশল সহস্র চীর্ণ
ষট্ যোজনানি প্রতিগন্ত রাত্রি শেষে।
ছন্দস্য দেতো হরবরু ভূষণানি
ছন্দো গৃহিত্ব কপিল পুরং প্রযাহি ॥৭
মাতা পিতৃণাং মম বচনেন পৃচ্ছেঃ
গতঃ কুমারো ন চ পুনঃ শোচয়ে খা
বুদ্ধিত্ব বোধি পুনরহ মাগমিষ্যে
ধর্ম্মং শৃনিত্ব ভবিষ্যথ শান্ত চিত্তাঃ ॥৮
ছন্দো শুনিত্ব প্রতিভাণি নায়কস্য
ন মেস্তি শক্তি বল পরাক্রমো বা।
হনেয়ু মহ্য নরবর জ্ঞাতি সংজ্ঞাঃ
ছন্দা কনীতো গুণধর বোধিসত্ত্বঃ ॥৯
মা ত্রাহি ছন্দো প্রতিভণি বোধিসত্ত্বঃ
তুষ্টা ভবিত্ব অপি মম জ্ঞাতি সংঘাঃ ॥১০
ছন্দো গৃহিত্ব হয় বরু ভূষণানি
উদ্যান প্রাপ্তো নরবরু পুঙ্গবস্য।
উদ্যান পালঃ প্রমুদিতু বেগজাতঃ
আনন্দ শব্দ প্রতিভণি শাকিয়ানাং ॥১১
অয়ং কুমারো হয়বরু ছন্দকশ্চ
উদ্যান প্রাপ্তো ন চ পুনঃ শোচিতবেগ।
রাজা শুনিতব পরিবৃতু শাকিয়েভিঃ
উদ্যান প্রাপ্ত প্রমুদিতু বেগজাতঃ ॥ ১২
গোপা বিদিত্বা দৃঢ়মতি বোধিসত্ত্বং
নো বাপি হর্ষো ন চ গিরং শ্রদ্ধধাতি।
দৃষ্টাতু রাজা হয়বরু ছন্দকশ্চ
উৎক্রোস্থ কৃত্বা ধরণি তলে নিরস্তঃ।
হা মহ্য পুত্রা সুকুশল গীতবাদ্যা
কং ত্বং গতো সি বিজহায় সর্ব্বরাজ্যম্ ॥১৪
সাধু ভণাহি বচনং মমেহ ছন্দ

কোবা প্রয়োগঃ কচ গস্ত বোধিসত্ত্ব।১৫
ছন্দো ভণাতি শৃনু সম পার্থিবেন্দ্র
রাত্রৌ প্রসুপ্তে নগরিষু বালবৃদ্ধে।
সো মঞ্জু ঘোষো মম ভণি বোধিসত্ত্বঃ
ছন্দো দদাহি মম লঘু অশ্বরাজং॥১৬
সো রোদ মানো দদি অ হু অশ্বরাজং
হস্ত ব্রজাহি হিতকর যেন কামম্।১৭
আরুঢ় শূরঃ প্রচলিত স্ত্রি সহস্রঃ
মার্গৌ ন ভেশ্মিন সুবিপুল যেন ক্রান্ত।১৮
ছন্দো গৃহিত্ব হয়বরু ভূষণানি
অন্তঃপুরে সো উপগতু রোদমানঃ।
দৃষ্টাতু গোলা হয় বরু ছন্দকশ্চ
সংমুর্চ্ছয়িত্বা ধরণিতলে নিরস্তা॥১৯
উদ্‌যুক্ত সর্ব্বো সুবিপুল নারী সংঘঃ
বারি গৃহীত্বা স্নপয়িসু শাক্য কন্যাং॥২০

* * *

সাধু গোপি মাথলু ভূয় রোদিহি
তুষ্ট ভোহি পর পরম প্রহর্ষিতা।
দ্রক্ষসে নচিরতো নরোত্তমং
বোধি প্রাপ্তং অমরৈঃ পুরস্কৃতম্॥*২১

এই সকল শ্লোক প্রায় উক্তার্থ, সুতরাং এসকলের আর পৃথক অনুবাদ দিবার প্রয়োজন নাই।

ছন্দক পুরপ্রবেশ করিয়া প্রথমে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন, পরে গোপার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। রাজা, রাজ পরিবার, মহা প্রজাবতী গোতমী এবং শাক্যবধূ গোপা ছন্দকের মুখে কুমার সিদ্ধার্থের প্রব্রজ্যা জ্ঞাত হইয়া যার পর নাই শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। ললিতবিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে যে, কুমারের প্রব্রজ্যাগমনে ৭ দিন ৭ রাত্রি পর্য্যন্ত কপিলবস্তুনগর শোকে মোহে আচ্ছন্ন ছিল এবং শ্মশানাকার ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। গোপা ৭ দিন পর্য্যন্ত ছন্দককে নিকটে রাখিয়া এক একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, আর রোদন করিতেন। ছন্দকও শোক নাশক কথা বলিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা করিতেন। দিবা রাত্রের অতিক্রম, সময়ের গতি, মানব মনের পরিণামশীলতা, ছন্দকের শোক নাশক কথা, ভবিষ্যৎ আশার প্রলোভন, নানাকারণে ক্রমে তাঁহাদের শোকের হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। কুমার সিদ্ধার্থ সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবেন, পুনর্ব্বার শাক্য নগরে আগমন করিবেন, আবার তাঁহারা সেই চন্দ্রমুখ মণ্ডল দেখিতে পাইবেন, এই আশা তাঁহাদিগকে জীবিত রাখিল, মরিতে দিল না। গোপা গৃহে থাকিয়া তপস্বিনী হইলেন। রাজা নিস্তেজ নির্বীর্য্য হইয়া ধ্যান্ পরায়ণ হইলেন। সিদ্ধার্থের জননী সিদ্ধার্থের জন্মের সপ্তাহ পরে মৃতা হন, তৎ কারণে তাঁহার মাতৃস্বসা (মাসী) মহা প্রজাবতী

* সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। এবং মধ্যে শ্লোক ও শ্লোকার্দ্ধ ত্যাগ করিয়াছি। গোপার শোক, মহা প্রজাবতীর কাতরতা, বৃদ্ধ রাজার দুঃখ এরূপ ভাবে বর্ণিত আছে যে, পাঠ করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। শেষোক্ত একবিংশ শ্লোকটা ছন্দকের উক্তি। গোপা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ছন্দককে বহুকথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, ছন্দক সে সকলের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। যুবরাজ শাক্য সিংহ যে রূপে ও যে উদ্দেশে পুর পরিত্যাগ করেন, সে সমস্ত কথাই ছন্দক গোপাকে বলিয়া ছিলেন। প্রমাণ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়া ছন্দক গোপাকে শোকাপনোদন কথা বলিয়া ছিলেন। সেই সকল শোকাপনোদন কথার প্রারম্ভ শ্লোক এইটী।

তাহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন। আজ সেই হতভাগিনী মাতৃষ্বসার দুর্ভাগ্যের পরাকাষ্ঠা। সিদ্ধার্থের শোকে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন, কিন্তু ছন্দকের আশ্বাস বাক্যে আর তাহা পারিলেন না। কুমার বুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার ভবনে আসিবেন, এই দুরাশা সমস্ত শাক্য নগর জীবিত রাখিল, মরিতে দিল না। কুমারের গমনাবধি শাক্য নগরে কোনরূপ আনন্দ উৎসব হয় নাই। নগর শ্রীহীন, শোভাহীন, নিরানন্দ, নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ এবং মৃতকল্প হইয়া রহিল।

শ্রীরামদাস সেন।

বৈদিক সাহিত্য।

(প্রথম প্রস্তাব)

বেদ হিন্দুদিগের প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ। সমুদয় হিন্দুধর্ম্ম বেদ রূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। বেদই সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মের আদি মূল। হিন্দুগণ বেদকে নিত্য, অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। গৌতম ভিন্ন সমুদয় প্রধান প্রধান দার্শনিকগণও বেদ ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদ হিন্দু মাত্রেরই মাননীয় ও পূজনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। বেদ পৃথিবীর সভ্যতম জাতির প্রাচীনতম ইতিহাস। ঋগ বেদ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ পৃথিবীর কোন স্থানেই বিদ্যমান নাই। বেদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়াই, সংস্কৃত সভ্য জগতে মধুরতম বর্ষীয়সী দেব ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, বেদ আমাদের দেশে নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে বেদ সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মের আদি প্রস্রবণ, যে বেদ না জানিলে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইত, যে বেদ পূর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশৎ বা অষ্টাদশ বৎসর কাল গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচারীগণ অধ্যয়ন করিত, সেই বেদ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সেই বেদ আমাদের নিকট আকাশ-কুসুম সদৃশ। আমাদের যে পৈতৃক সম্পত্তি সংরক্ষণে আমরা উদাসীন, তাহা ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকট অতি আদরের ধন। ইউরোপ ও আমেরিকায় তাহার সম্মাননা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বেদের অধ্যয়ন, প্রচার ও গবেষণা দ্বারা তাঁহারা সভ্য জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বেদচর্চ্চায় তাঁহারা তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবন অতি আহ্লাদের সহিত অতিবাহিত করিতেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রযত্নেই বিলুপ্তপ্রায় বেদ শাস্ত্রের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। বেদ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিতেছি, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরই প্রসাদে ও অনুগ্রহে।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম রবার্ট ডি নোবিলী নামক জনৈক মান্দ্রাজবাসী জেসুইট্ সম্প্রদায়স্থ খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজক হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া বেদ সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হন।

তাঁহার পরামর্শানুসারে সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন সুচতুর মান্দ্রাজ প্রদেশীয় পণ্ডিত একখানি কৃত্রিম যজুর্ব্বেদ (Ezur Vedam) প্রণয়ন করেন। ফরাসীদেশীয় লেখক চূড়ামণি ভলটেয়ার উহা প্রাপ্ত হইয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজকীয় পুস্তকালয়ে প্রেরণ করেন। তৎপরে সংস্কৃত বিদ্যা-বিশারদ মহামতি কোলব্রুক লুপ্তপ্রায় বেদশাস্ত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। আচার-ভ্রষ্ট ম্লেচ্ছকে বেদের ন্যায় পবিত্রতম ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান অন্যায় বলিয়া, জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রী (পণ্ডিত) তাঁহাকে বৈদিক ছন্দে দেব দেবীর স্তব পূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান পূর্ব্বক প্রতারিত করিয়াছিলেন। ম্লেচ্ছ বলিয়া ইঁহাদের উভয়েরই বেদ সংগ্রহের চেষ্টা বিফল হয়।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল পলিয়র জয়পুরের মহারাজ প্রতাপ সিংহের পুস্তকালয় হইতে সমুদয় বেদ সংগ্রহ করিয়া স্যর জোসেফ বেঙ্ক সাহেব দ্বারা "ব্রিটিস মিউজিয়াম' নামক সুপ্রসিদ্ধ চিত্র শালিকায় প্রেরণ করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তথায় অধ্যাপক রজেন (Rosen) সাহেবকে ঋগ্‌বেদ সংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হন। তাহার পূর্ব্বে পণ্ডিতবর রাজা মহোদয় কোথায়ও ঋগ্‌বেদ দর্শন করেন নাই।*

বেদের অপর নাম ত্রয়ীবিদ্যা। ইহার অপর নাম স্বাধ্যায় ও ছন্দ। বিদ্‌ ধাতু হইতে বেদ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যদ্দ্বারা জ্ঞান বা পরম মোক্ষ লাভ হয়, তাহারই

---

* মহাত্মা কর্ণেল পোলিয়র কিরূপে সমগ্রবেদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব প্রথম ইউরোপে প্রেরণ করেন, তাহা এস্থলে বিবৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "মুসলমানেরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থের বিশেষ বিদ্বেষী। তাহারা ১৭৭৯ (?) খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানায় সকল তীর্থস্থান এবং ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় ধ্বংস করিয়াছিল। কিন্তু জয়পুরাধিপতি মির্জ্জারাজ জয়সিংহ দিল্লীশ্বরকে নানা বিষয়ে উপকার করাতে মুসলমানগণ জয়পুরের কোন অনিষ্ট করে নাই। এজন্য তথায় হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া সুলভ বিবেচনায়, কর্ণেল পোলির মহারাজা প্রতাপসিংহকে রাজ চিকিৎসক ডন পিদ্রো ডি মিলভার দ্বারা (চতুর্ব্বেদের প্রতিলিপি প্রাপ্তির নিমিত্ত) এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি পত্র পাঠে সানন্দচিত্তে চতুর্ব্বেদের প্রতিলিপি এক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া কর্ণেল পোলিয়রকে প্রদান করেন। ইউরোপে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে,বেদ লোপ হইয়াছে। সুতরাং এ বেদও অনেকে কাল্পনিক মনে করিতে পারেন, এই ভাবিয়া কর্ণেল পোলিয়র সে সময়ের বিখ্যাত পণ্ডিত রাজা আনন্দরামের নিকট সমুদয় গ্রন্থ পরিদর্শনের জন্য প্রদান করেন। তিনি তাহা অকৃত্রিম দৃষ্টে বহু পরিশ্রম করত পারসী ভাষায় চারি ভাগের সূচিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।" "শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম ভাগ, ১১৯ ১২০ পৃষ্ঠা।

এইরূপে বেদ সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপে মহাত্মা কর্ণেল পোলিয়র কর্ত্তৃক নীত হয়। এইরূপে লাসেন, বার্ণুফ, উইলসন, রোজেন, বেন্‌ফে, রোয়ার, ষ্টিভেনসন, অফ্রেকট, গোলড্‌ষ্টুকার, মক্ষমূলার, ওয়েবার, হুইট্‌নী, রোথ, বার্ণেল, লাংলোয়া, হগ্‌ বুলার, বপ্‌, বোলব্রুক, কাউয়েল, জেকোবি, কুন্‌, কিলহরণ, মুইর, ওয়েষ্টারগার্ড, রোষ্ট, বোথলিং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ভাবী প্রসিদ্ধি লাভের সূত্রপাত হয়। এইরূপে বিলুপ্তপ্রায় বেদকে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কালক্রমে মৃত্যু সঞ্জীবন মুদ্রা যন্ত্রে অধিরূঢ় ও অঙ্কিত করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন।"

নাম বেদ। সমুদয়ে চারি বেদ। ঋগ্‌ বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ব বেদ। অথর্ব্ববেদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অথর্ব্ববেদের কিয়দংশ যে অধিকতর প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার কোন কোন অংশ ঋগ্‌বেদ সংহিতার মধ্যে, বিশেষতঃ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে, সন্নিবেশিত দেখা যায়। ঋগ্‌বেদে ঋগ্‌, সাম, যজুঃ এই তিন বেদেরই মাত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনতর তিন বেদ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজিত হয়, কিন্তু অথর্ব্ববেদ যজ্ঞের অনুপযোগী অভিচারাদি সাংসারিক বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া, মহামতি কুল্লুকভট্ট মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

'অথর্ব্ব বেদস্য চতুর্থবেদত্বেঽপি প্রায়েণাভিচারাদ্যর্থত্বাৎ যজ্ঞবিদ্যায়ামনুপযোগাত্ত্রয়ী-নির্দ্দেশঃ।

শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ এবং অমরকোষ প্রভৃতি প্রাচীনতর গ্রন্থেও বেদ ত্রয়ীবিদ্যা নামেই অভিহিত।*

প্রত্যেক বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা। অগ্রে মন্ত্রভাগ, ও তৎপরে ব্রাহ্মণ ভাগ বিরচিত হইয়াছে। লৌকিক বাক্য সকল যেরূপ পদ্য, গদ্য ও গীত এই তিন ভাগে বিভক্ত, বৈদিক মন্ত্রও এই তিন প্রধানভাগে সংবিভক্ত; যথাক্রমে ঋগ্‌ যজুঃ ও সাম নামে অভিহিত।

মন্ত্র সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা প্রস্তুত হইয়াছে। সমুদয়ে পাঁচটী সংহিতা, ঋগবেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, কৃষ্ণ যজুঃ (তৈত্তিরীয়) সংহিতা, শুক্লযজুঃ (বাজসনেয়ী) সংহিতা, ও অথর্ব্ব সংহিতা। ঋগবেদ ও সামবেদ সংহিতার সমুদায়ই পদ্যময়। অথর্ব্ব ও যজুর্ব্বেদ সংহিতার কিয়দংশ গদ্য বিরচিত, অবশিষ্ট সমস্ত ভাগই পদ্য। সংহিতা ভাগের তাৎপর্য্য, রচনা প্রণালী ও ব্যাকরণ ঘটিত বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক-সংহিতাগুলির তুল্য আর কোন প্রাচীন পুস্তক নাই। বৈদিক সংহিতা হিন্দুধর্ম্মের আদিম অবস্থা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক সকল দ্বিতীয়, কল্পসূত্র ও স্মৃতিসংহিতা সমুদয় তৃতীয় অবস্থা, এবং পুরাণ ও তন্ত্র চতুর্থ অবস্থা প্রকটন করিতেছে।

সচরাচর মন্ত্রভাগই বেদ বলিয়া পরিচিত। আর্য্যগণের প্রত্যেক কুলোৎপন্ন কবিদিগের দ্বারা পুরুষ পরম্পরায় বৈদিক সূক্ত সকল বিরচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে।

"সর্ব্বকালং সর্ব্বদেশেষু প্রতিচরণং অবিভাগেন একৈকো মন্ত্ররাশি বৈদ ইত্যুচ্যতে।'

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ যে সকল সূক্ত রচনা করেন, তাহা তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক সযত্নে পরিরক্ষিত হয় এবং নূতন নূতন সূক্তের সংযোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়া কাল ক্রমে এক এক কুলে বহুসূক্ত বিরচিত হয়। অনন্তর এক সময়ে সেই সকল সূক্ত একত্র সংগৃহীত হইয়া বেদ নামে পরিচিত হইয়াছে।

বহুকাল ধরিয়া বহু কবির রচিত কবিতা একত্রে সংগৃহীত হইয়া বেদ আখ্যা

* পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগ উপক্রমণিকার ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ ও দুরায়ত্ত হইয়া উঠিল। এই নিমিত্ত যে যে শ্রেণীর পুরোহিতের জন্য বেদের যে যে অংশ আবশ্যক, সেই বিবেচনায় বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ভাগ চতুষ্টয় ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বন্ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। এই চারিভাগের মধ্যে হোতৃদিগের নিমিত্ত ঋক্, উদ্গাতৃদিগের নিমিত্ত সাম, অধ্বর্য্যুদিগের নিমিত্ত যজুঃ এবং ব্রহ্মা পুরোহিতের জন্য অথর্ব্ব। অথর্ব্ববেদে মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, আপন্নিবারণ প্রভৃতির মন্ত্র ও বিধি আছে। ব্রহ্মা পুরোহিত উহা বিশেষ রূপে অভ্যস্ত করিয়া অসুর-দৌরাত্ম্য প্রভৃতি নানাবিধ আপৎ ও বিঘ্ন হইলে দেবতোদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের রক্ষা বিধান করিতেন। বেদবিভাগের বহুপরে যে সকল সূক্ত রচিত হইয়াছিল, তাহা বালখিল্যসূক্ত নামে সংহিতার শেষভাগে যোজিত হইয়াছে।

বৈদিক গীতি সমূহ অপূর্ব্ব কবিত্বময় স্বভাবোক্তি অলঙ্কার পূর্ণ। উহা এত মধুর ও মনোহর যে, নিয়মিত সুরে বেদগান হইলে বোধ হয় পশু পক্ষীও মোহিত হয়।

নিরুক্তের ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য বলেন—

'বেদং তাবদেকং মন্তং অনিমহত্বাদ্ দুরধ্যেয়ং অনেক শাখাভেদেন সমাম্নাসিষুঃ। সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ। একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং, এক শতধা আধ্বর্য্যবং, সহস্রধা সামবেদং, নবধা আথর্ব্বণং।'

সমগ্র বেদ বহ্বায়তন থাকায় দুরধ্যেয় ছিল। বেদব্যাসের তত্ত্বাবধানে বেদের চারি ভাগ বহুতর শাখায় বিভক্ত হয়। ঋগ্বেদ একবিংশ শাখায়, যজুর্ব্বেদ একশত শাখায়, অথর্ব্ববেদ নয় শাখায়, সামবেদ এক সহস্র শাখায় বিভক্ত হয়। বায়ু পুরাণের মতে সামবেদের শাখা সংখ্যা ১০৪০ *। আমরা পশ্চাৎ যথা স্থানে শাখা ভেদের সবিশেষ বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মণভাগ বেদের দ্বিতীয় অংশ। উহা বেদসংহিতার প্রাচীনতম ও সুবিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা পুস্তক স্বরূপ। উহা প্রায় গদ্যে লিখিত। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্রাহ্মণভাগ গদ্য রচনার প্রথম আদর্শ বলিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রোথ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদোক্ত গাথা সমূহের অর্থ বিশেষ লইয়া পরিবর্ত্তী কালে যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির মত সৃষ্টি হইয়াছে, বেদের ব্রাহ্মণাংশেই তাহার প্রথম সূত্রপাত হয়। পুরাণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সকল পুরাণ বলিয়া খ্যাত ছিল।

প্রাচীনত্ব হেতু মন্ত্র (সংহিতা) ভাগ সাধারণের বুদ্ধির অগম্য হইয়া উঠিল। মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যান, প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রবাদাদি অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ বিধি প্রদান, কর্ম্মকাণ্ডের বিধান এবং মন্ত্রোক্ত অঙ্কুর লইয়া শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ইতিহাস ও আখ্যায়িকা প্রভৃতি কথন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই সকল গ্রন্থ প্রাচীনতম কর্ম্ম কাণ্ড, ভাষাতত্ত্ব, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ বলিয়া ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস-সংগ্রাহকের অতি আদরের ধন।

মন্ত্রভাগের ন্যায় ব্রাহ্মণভাগের অংশ সকলও ভিন্ন ভিন্ন চরণে বহুকাল হইতে সংগৃহীত হইয়া কালক্রমে ব্যক্তিবিশেষ

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রথম পরিশিষ্ট দেখ।

দ্বারা একত্রীভূত হয়। তৎপরে সংগ্রহকারের নাম অনুসারে তাহার নামকরণ হয় বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যেক বেদশাখা ও চরণের পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ ছিল। *

"সংহিতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মরূপ বিশাল পুষ্পের কলিকা মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণভাগে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা প্রস্ফুটিত হইয়া যারপর নাই জটিল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সংহিতার অধিকাংশ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি ও তাঁহাদের সমীপে অন্নাদি প্রার্থনার বিবরণেই পরিপূর্ণ। কিন্তু ব্রাহ্মণভাগে যজ্ঞাদি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ ও তৎ সম্বন্ধীয় উপাখ্যানই অধিক। বোধ হয়, ব্রাহ্মণভাগ প্রস্তুত হইবার সময়ে যে সকল ক্রিয়া কলাপ প্রচলিত হইয়াছিল, গ্রন্থকর্ত্তারা তাহারই প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ সংহিতা-নিবিষ্ট মন্ত্র, নিবিদ্ (দেবতা বিষয়ক অতি প্রাচীন বাক্য-বিশেষ), গাথা এবং সে সময়ের প্রচলিত উপাখ্যানাদি সঙ্কলন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণভাগে অগ্নিষ্টোম, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ইষ্টি, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও নরমেধাদি বৃহৎ ও অবৃহৎ নানা যজ্ঞের বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুত্র, ধন, যশ, পশু, বিদ্যা ও স্বর্গাদি লাভ ঐ সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। †

ব্রাহ্মণের অন্তর্গত কয়েকটী পরিচ্ছেদের নাম আরণ্যক। ইহা বেদের সার। "আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য,ঔষধিভ্যাঽ মৃতং যথা।" উহা অরণ্যচারীগণ অরণ্যে তপস্যায় নিযুক্ত থাকার কালে অধ্যয়ন ও গান করিতেন। ব্রাহ্মণগ্রন্থের আরণ্যকভাগ জগতের অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি পাণিনির আবির্ভাব কালের পরে বিরচিত। কারণ পাণিনি আরণ্যক শব্দের অরণ্যবাসী মনুষ্য ভিন্ন আর কিছু লিখেন নাই।

অরণ্যান্ মনুষ্যে।৭।২।১২৯

অরণ্য ইত্যেতস্মান মনুষ্যেঽভিধেয়ে বুঞ্ স্যাৎ। আরণ্যকো মনুষ্যঃ।

"ব্রাহ্মণভাগে যেরূপ ধর্ম্ম ও যেরূপ ক্রিয়াকলাপের প্রসঙ্গ ও বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত আছে, কল্পসূত্রে তাহাই সুপ্রণালী ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ ভাগ ইতিহাস, উপাখ্যান, শব্দ-ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি অশেষ প্রকার প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ; কিন্তু কল্পসূত্রে সুস্পষ্ট রূপে ও সুপ্রণালী ক্রমে ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক সমস্ত বিষয় নিঃশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই সমুদায় সূত্র অতি প্রাচীন ও প্রায়ই ব্রাহ্মণ ভাগের অব্যবহিত কালপরে বিরচিত, তাহার সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ ভাগের ন্যায় উহাতেও সরসিক (লৌকিক) ব্যাকরণের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। (শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়) শতপথ ব্রাহ্মণে সূত্রশাস্ত্রের বিষয় উল্লিখিত আছে। অতএব কোন কোন সূত্র-গ্রন্থ ঐ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রাচীন। কল্পসূত্র সমুদায় অতাদৃশ প্রাচীন হইয়াও বেদ-পদবীতে অধিরূঢ় হয় নাই। হিন্দুদিগের মতানুসারে ও মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ

* বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত প্রথম পরিশিষ্ট. ২৩০—৩১ পৃষ্ঠা, and Weber's Indian Literature, p. 12.

† ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগের উপক্রমণিকা ৬৩—৬৭ পৃষ্ঠা।

ঈশ্বর প্রণীত (অপৌরুষেয়), কল্পসূত্রাদি অপরাপর যাবতীয় শাস্ত্র মনুষ্য-বিরচিত (পৌরুষেয়)। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম শ্রুতি: উহা স্বতঃই প্রমাণ—উহাতে ভ্রম-সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কল্পসূত্র ও মনু-সংহিতাদি স্মৃতি বলিয়া উল্লিখিত হয়: উহা যতদূর শ্রুতিমূলক ততদূর মাত্রই প্রমাণ, যে যে অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ সেই সেই অংশ অপ্রমাণ।

"শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।"

ঐ সমস্ত কল্পসূত্র সাক্ষাৎ বেদ না হউক, ছয় বেদাঙ্গের অন্তর্গত এক বেদাঙ্গ। উহার মধ্যে যে যে অংশ ধর্ম্ম ও মোক্ষ সম্বন্ধীয়, তাহা বেদ হইতে সঙ্কলিত। আর যে যে অংশ অর্থ ও সুখ বিষয়ক, তাহা লৌকিক ব্যবহার দৃষ্টে ও পরম্পরাগত লোকাচার অবলম্বনে সংগৃহীত হইয়াছে।

"তত্র যাবদ্ধর্ম্মমোক্ষ সম্বন্ধি তদ্বেদ প্রভবং। যত্ত্ব অর্থসুখবিষয়ং তল্লোকব্যবহার পূর্ব্বকমিতি বিবেক্তব্যং। এবৈবেতিহাস-পুরাণয়োরপ্যুপদেশ বাক্যানাং গতিঃ।" কুমারিল ভট্ট প্রণীত তন্ত্রবার্ত্তিক।

"কল্পসূত্র তিন প্রকার—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্র। শ্রৌতসূত্রে দর্শপৌর্ণ মাসাদি বহুতর প্রধান যজ্ঞের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। গর্ভাধান, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন প্রভৃতি যাবতীয় সংস্কার বিধি, উদ্বাহানন্তর অগ্নি স্থাপন ও শ্রাদ্ধাদি বার্ষিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রণালী স্মার্ত্ত বা গৃহ্যসূত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি বিবিধ আশ্রমের আচার, সন্ধ্যাবন্দনাদি দৈনন্দিন ক্রিয়া-পদ্ধতি, রাজনীতি বিষয়ক ব্যবস্থাবলী প্রভৃতি আশ্রমধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্মাদির বিষয় সাময়াচারিক সূত্রে বিশেষরূপে বিনিবেশিত হইয়াছে। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের সমুদায় বা অধিকাংশ ধর্ম্ম সংহিতা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসূত্র সমূহ হইতে সঙ্কলিত ও পদ্যচ্ছন্দে বিরচিত। মানব কল্পসূত্র নামে একখানি সূত্র গ্রন্থ আছে। মনুসংহিতা ঐ গদ্যময় মানবসূত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়া পদ্যচ্ছন্দে বিরচিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যদিও স্মৃতি সংহিতা (ধর্ম্মশাস্ত্র) সমুদায়ের অধিকাংশই সূত্র মূলক, কিন্তু সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কোন ভাগ বেদ সংহিতা ও ব্রাহ্মণোক্ত বচনাদি অনুসারেও রচিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।" *

অসভ্য অবস্থায় মনুষ্যগণ স্ব স্ব ধন প্রাণ ও পালিত পশ্বাদি পরিরক্ষণেই নিযুক্ত থাকে। যাহাতে শত্রুগণ তাহাদের কোনও রূপ অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে, তদ্বিষয়েই সতত যত্নশীল থাকে। অসভ্যাবস্থা দূরীভূত হইয়া ধনপ্রাণাদির বিঘ্ন ও ভয় হইতে ক্রমশ যত তাহারা বিমুক্ত হয়, ততই তাহাদের দুর্ভাবনা-মুক্ত মন নানাবিষয়িণী চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে অবসর প্রাপ্ত হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি প্রণালী ইহার উৎপাদক ও তাঁহার স্বরূপ প্রভৃতি দুর্ব্বোধ ও অতি নিগূঢ় বিষয়ের তত্ত্ব অন্বেষণে তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মন ধাবিত হয়। ভারতীয় আর্য্যেরাও এই চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে এই সকল বিষয়ে অনুধাবনা করিতে লাগিলেন। যুক্তি পরম্পরা অবলম্বন করিয়া বিচক্ষণ জ্ঞানীগণ একমাত্র

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগের উপক্রমণিকা ২০-২২ পৃষ্ঠা।

অদ্বিতীয়-স্বরূপ বিশ্বকারণের অস্তিত্ব-জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ গুলি উপনিষদ্ বলিয়া বিখ্যাত। ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন দশম মণ্ডলে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা ও স্বরূপ বিষয়ক যে সকল সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এরূপ দুরুহ ও প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ যে তাহা কদাচ পরম্পরাগত বহুকালব্যাপিনী পরমার্থ পর্য্যালোচনা ব্যতিরেকে অল্পবুদ্ধি সরলমতি আদিম ঋষিগণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভাবিত নয়। যদিও ঋগবেদে পরমার্থ বিষয়ক জ্ঞানানুশীলন প্রথমত আরব্ধ হয়, কিন্তু উপনিষদ্ বিরচনের পূর্ব্বে সেই জ্ঞান বহুলীকৃত ও প্রণালীবদ্ধ হয় নাই। উপনিষদ্ গ্রন্থ সকলে নানা সময়ের নানা লোকের প্রণীত নানাবিধ শ্লোক সঙ্কলিত হয়। তাহাতে মন্ত্র ভাগের অনেকানেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণোক্ত কোন কোন উপাখ্যান পুনরায় বিবৃত হইয়াছে। (২৪৪ পৃষ্ঠার নোট দেখ)

আদিম উপনিষদ্গুলি আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্গত। উপনিষদে ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রথম বীজ রোপিত হয়। প্রাচীন উপনিষদ গুলিতে একেশ্বরবাদ (জ্ঞানকাণ্ড) বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে এমন মহারত্ন সকল নিহিত আছে যে, বিখ্যাত সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক মক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, তত্তুল্যভাব ও উদারতা ও সরলতা জগতের সাহিত্য মধ্যে দুর্ল্লভ। * আর্য্যদিগের নিকট শ্রুতি প্রতিপাদক ধর্ম্মই আদরণীয় বিধায়, পরবর্ত্তী সময়ে বেদান্তাদি দর্শন ও বিজ্ঞান যাহা জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাদের সকলেই আত্মমত পরিপোষক উপনিষদের কোন না কোন স্থলের আশ্রয় অবলম্বন করিয়াছে। তাহা দেখিয়া অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকেরাও স্বমত প্রতিপাদক অভিনব উপনিষদ সঙ্কলন ও রচনা করিয়া উপনিষদের সংখ্যা সবিশেষ বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উদারমতি দারাশকো যে পঞ্চাশ খানি উপনিষদ্ পারসীক ভাষায় অনুবাদিত করান, তাহা Anquetil duc Perron নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত লাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। মুক্তিকোপনিষদ্ ও মহাবাক্য রত্নাবলী উপনিষদে এক শত আট খানি উপনিষদের নাম উল্লিখিত আছে। কলিকাতা আসিয়াটিক সোসাইটী নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্দিগের সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকায় পণ্ডিতবর রোয়ার ১৩৮ খানি উপনিষদের নাম অবধারণ করিয়াছেন। কোন কোন উপনিষদের এক এক অংশ এক একটী ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহা ধরিয়া গননা করিলে উপনিষদের সংখ্যা ১৫৪ হইয়া উঠে †। পণ্ডিতবর বার্ণেল Indian antiquary নামক মাসিক পত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭০ খানি উপনিষদ বর্ত্তমান আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অধ্যাপক ওয়েবার প্রথমত ৯৬ খানি উপনিষদের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তদনন্তর তিনি ২৩৫ খানি উপনিষদ এখনও বিদ্যমান আছে বলিয়া স্থির করিয়াছেন ;

* "There are passages in these works, unequalled in any language for grandeour, boldness and simplicity." (Maxmuller's Ancient Sanskrit Literature.)

† Journal of the Asiatic Society c Bengal, vol. xx. p. 607-619.

‡ Weber's Indian Literature, p. 154-5!

কোন দেশীয় জাতীয় ধর্ম্ম বিনা বিবাদ বিসম্বাদে প্রচলিত হয় নাই। ধর্ম্ম প্রচারার্থ পৃথিবীতে যত যন্ত্রণা, যত নরহত্যা ও যত শোণিতপাত হইয়াছে, এত রক্তপাত আর কিছুতে হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কি পুরাতন, কি অধুনাতন, কি প্রলীয়মান, কি অভ্যুদয়বান্—সকল ধর্ম্মই বিদ্বেষ-কলুষে কলুষিত হইয়া অধর্ম্ম ও অশান্তির ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত, পরিপালিত হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। অনতি প্রাচীন শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যেরূপ ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, পূর্ব্বকালীন বৈদিক সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যেও যে তদনুরূপ পরস্পর বিরোধ ও বিদ্বেষ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সংহিতাদি শাস্ত্র পাঠে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। পরম জ্ঞানী উপনিষদ্ বক্তারাও এই বিদ্বেষানল হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহারা বেদ-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কর্ম্মকাণ্ড বিষয়ক বেদ চতুষ্টয়কে অবিদ্যা (নিকৃষ্ট বিদ্যা) বলিয়া অনাদর করিতে ছাড়েন নাই।

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ। অথ পরা যয়া তদক্ষরং অধিগম্যতে। তত্রাপরা ঋগবেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।" মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৪-৫

শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয়টী বেদাঙ্গ নামে; ধর্ম্ম শাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও ন্যায়—এই চারিটী উপাঙ্গ নামে বিখ্যাত।

(শিক্ষা)।—যদ্দ্বারা বেদ বিদ্যার বর্ণ, স্বর গত (উচ্চারণ গত) হ্রস্বাদি বৈষম্য মাত্রা (উচ্চারণ—কাল) বল (কণ্ঠাদি উচ্চারণে ব্যবহৃত শারীরিক অঙ্গ, সাম (উচ্চারণ) এবং সন্তান (সুশ্রাব্যতা) বিষয়ে উপদেশ পাওয়া যায়—তাহাকে শিক্ষা বলে। সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন, 'শিক্ষ্যন্তে বেদ বিদ্যায়ৈ উপদিশ্যন্তে স্বরবর্ণাদয়ো যত্রাসৌ শিক্ষা।' শিক্ষা বৈদিক ব্যাকরণেরই অন্তর্ভুত। পাণিনীয়, নারদীয়, ও মাণ্ডুকীয় প্রভৃতি নামক শিক্ষাগ্রন্থ প্রচলিত আছে। ঋগবেদ ও যজুর্ব্বেদের মতানুযায়ী ইহার এক একখানি শিক্ষাগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ বর্ত্তমান আছে।*

(কল্প)।—কল্পসূত্র যে তিন ভাগে বিভক্ত, তাহা ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা বৈদিক ক্রিয়া পদ্ধতি বিজ্ঞাপিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহার নাম কল্প সূত্র। কল্পসূত্রের যে ভাগে দৈনিক ও সাময়িক ক্রিয়া কলাপের বিধি আছে, তাহা (১) গৃহ্যসূত্র বা স্মার্ত্তসূত্র, (২) সাময়াচারিক বা ধর্ম্মসূত্র, এই দুই অংশে বিভক্ত। কল্পসূত্রে বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডেরই বিশেষ আধিক্য ও আদর দেখা যায়। গৃহ্য ও সাময়াচারিক সূত্রে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কার্য্যবিধি, ছাত্রবর্গের শাসন প্রণালী, বিবাহ, গর্ভাধান, জন্ম, নামকরণ, সূর্য্যদর্শন, অন্নপ্রাসন, চূড়াকরণ, দাম্পত্য ব্যবহার, রাজধর্ম্ম, দায়াধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ এবং বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।'

ঋগ বেদের কল্পসূত্র তিন খান—আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন ও শৌনকসূত্র।

---

* Weber's Indian Literature, p. 60-61.

ও বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্তের প্রথম পরিশিষ্ট—২৭২-৭৩

সামবেদের কল্পসূত্র এগার খান—মাশক (আর্ষেয় কল্প), লাট্টায়ন, দ্রাহ্যায়ন, গোভিলীয়, অনুগাদ সূত্র, নিদান সূত্র, পুষ্পসূত্র, কর্ম্মপ্রদীপ (কাত্যায়ন প্রণীত), খাদিরগৃহ্য, পিতৃমেধসূত্র, এবং গৌতম ধর্ম্মসূত্র।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র ১১ খান—কঠসূত্র, মনুসূত্র, মৈত্রসূত্র, লৌগাক্ষিক সূত্র, সত্যাষাঢ় হিরণ্যকেশী সূত্র, বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব, বাধুন, বেখানস ও বরাহ সূত্র।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র তিন খান—কাত্যায়ন সূত্র, বৈজবাপসূত্র ও কাঠীয় গৃহ্যসূত্র। †

অথর্ব্ববেদের কল্পসূত্র এক খান—কৈশিক সূত্র।

(ব্যাকরণ)।—"অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ভক্তিরসাদ্রচিত্তে স্বীয় আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে বেদ গান করিতেন। এই উপগীয়মান স্বর গ্রামের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অবিশুদ্ধ স্বরসংযোগ ও উচ্চারণ বৈষম্য সংঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রনষ্টশক্তি মনে করিতেন। এই কল্পিত আশঙ্কা জাগরূক থাকাতে, আর্য্যগণ বেদের উচ্চারণ বিশুদ্ধতা রক্ষার্থ নিরতিশয় যত্নপর হইয়া বৈয়াকরণিক জ্ঞানের তত্ত্ব উদ্ভাবনে প্রয়াসবান হয়েন। কালক্রমে বেদসংহিতার বিভিন্ন শাখাস্থ স্বরগ্রামের উচ্চারণ-পদ্ধতি-জ্ঞাপক সূত্র সমূহ বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়া প্রাতিশাখ্য নামে অভিহিত হয়। প্রতি বৈদিক শাখায় ভিন্ন ভিন্ন সূত্র উপন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ইহা প্রাতিশাখ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাতিশাখ্য ব্যাকরণ স্থানীয় নহে। সুতরাং প্রাতিশাখ্য দ্বারা ব্যাকরণের উদ্দেশ্য সংশোধিত হয় না।" * প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ সমূহে শব্দ বিভাগ লক্ষিত হয়। তাহাতে বিশেষ্য, কারক, বিভক্তি, ক্রিয়া, ও উপসর্গাদি সুন্দর রূপে নির্ণীত হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের স্থানে স্থানে অক্ষর, পদ প্রভৃতি ব্যাকরণের সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। উহাতে এক বচন, দ্বিবচন ও বহু বচন এইরূপ বচন বিভাগও দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বর, স্পর্শ, উষ্মা প্রভৃতি বর্ণবিভাজক সংজ্ঞার উল্লেখ দেখা যায়।

ব্যাকরণ-বেদাঙ্গ বলিলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণই বুঝায়। ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রণয়নেও ভারতীয় আর্য্যগণ অপেক্ষা সভ্য জগতের অন্য কোন জাতিই যে অধিকতর নৈপুণ্য ও প্রাবীন্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই, পাণিনির ব্যাকরণ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ ও অবিনশ্বর সাক্ষী।

ঋগবেদীয় শৌনক-প্রাতিশাখ্যে নিম্ন লিখিত আটজন বৈয়াকরণের নাম দৃষ্ট হয়। শাকল্য, শাকটায়ন, গার্গ্য, মাণ্ডুকেয়, পনিয়াল-বাভ্রব্য, বেদমিত্র, ব্যালী, বৈকাক্ষ। শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় কাত্যায়ন প্রাতিশাখ্যে পূর্ব্বোক্ত শাকল্য, শাকটায়ন ও গার্গ্য ভিন্ন ঔপশিবি, গাটুকর্ণ্য †, কান্ব, কাশ্যপ ও শৌনক—এই পাঁচজন ব্যাকরণাচার্য্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় একখানি

---

† Weber's History of Indian Literature.

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি—১১ ও ১২ পৃষ্ঠা।

† ঐতরেয় আরণ্যকে গাটুকর্ণ্য, গালব ও অগ্নিবেশ্যায়ন, এই ব্যাকরণাচার্য্য ত্রয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

প্রাতিশাখ্যে অগ্নিবেশ্য, অগ্নিবেশ্যায়ন, আত্রেয়, ভারদ্বাজ, শৈতায়ন, শাংখ্যায়ন, গৌতম, কাণ্ডমায়ন, কৌহলীপুত্র, কৈণ্ডিন্য, মাশাকীয়, পৌষ্করসাদি, প্লাক্ষি, প্লাক্ষ্যায়ন, সংকৃত্য, উখ্য, বাল্মীকি, বাৎসপ্র, বাতভিকার, এবং হারীত, এই বিংশতি জন ব্যাকরণাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়। মহর্ষি যাস্ক প্রণীত নিরুক্তে ঔপমন্যব, ঔদুম্বরায়ণ, অগ্রায়ন, ঔর্ণবাভ, চর্ম্মশিরঃ, শতবলাক্ষ, শাকটায়ন, শাকপূনি, গার্গ্য, গালব, কস্থক্য, কৌৎস, ক্রোষ্টুকি, মৌদ্গাল্য, স্থৌলষ্ঠিবি, তেতীকি, এবং বর্ষায়ন—এই সপ্তদশ ব্যাকরণাচার্য্য ও ভাষ্যকারের নাম দৃষ্টিগোচর হয়। *

ডাক্তার বোতলিঙ্ক স্বপ্রকাশিত পাণিনি ব্যাকরণের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মণ, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক, ও স্ফোটায়ন এই দশ জন বৈয়াকরণকে পাণিনির পূর্ব্ব-সাময়িক ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের কেহই বৈয়াকরণ শাস্ত্রে পাণিনির ন্যায় প্রাচীন্য ও বিদ্যাবত্তা প্রদর্শনে সক্ষম হন নাই। তাঁহাদের পরবর্ত্তী মহর্ষি পাণিনিই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি সহকারে বৈয়াকরণ জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যাকরণাচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। †

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বেদ সংহিতার বিভিন্ন স্বরগ্রামের উচ্চারণ পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করণার্থ প্রাতিশাখ্য সূত্র সকল সঙ্কলিত হয়। এই প্রাতিশাখ্যসূত্র সমূহই বেদের প্রাচীনতম ব্যাকরণ। প্রাতিশাখ্য সূত্রকারগণের পূর্ব্ব হইতেই বেদ প্রকৃত প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ হইতে আরব্ধ হয় বলিয়া সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতবর রোথ ও হুইট্নী স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাতিশাখ্যসূত্র সমূহ কি উদ্দেশ্যে বিরচিত হয়, তাহা এস্থলে নির্দ্দিষ্ট করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

বৈদিক সংহিতায় লিপিবদ্ধ করণার্থ তিনটী প্রণালী প্রচলিত আছে। প্রথমত সন্ধি বিশ্লেষ না করিয়া সংস্কৃতের সুপ্রচলিত লিখন প্রণালী অনুসারে সংহিতা সকল লিখিত হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া ও সমাসবদ্ধ শব্দগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত পূর্ব্বক উহা লিখিত হইতে পারে। এই দ্বিবিধ লিখন প্রণালী যথাক্রমে সংহিতা পাঠ ও পদপাঠ নামে প্রসিদ্ধ। ব্যাকরণাচার্য্য মহর্ষি শাকল্য কর্ত্তৃক পদ-পাঠ উদ্ভাবিত হইয়াছে বলিয়া নিরুক্তকার যাস্কাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যৎকালে বৈদিক সংহিতার অর্থ ব্রাহ্মণাদি মন্ত্র-ব্যাখ্যান গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকেই আর্য্য সমাজের হৃদয়ঙ্গম হইত, সন্ধি ও সমাস বিশ্লেষ দ্বারা পদপাঠ সেই সময়ে বেদের প্রাচীনতম ও সরলতম ব্যাখ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত। বৈদিক মন্ত্রগুলি অবিকৃতভাবে পরিরক্ষণ করাও পদপাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। পদ-পাঠ হইতে সংহিতা পাঠের উদ্ধার সাধন করাই প্রাতিশাখ্য সূত্র গুলির প্রাধানতম উদ্দেশ্য ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থই

* Dr. Roth's 'The Most Ancient Grammar of the Vedas.' (See Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1848, p.13-14.

† রজনী বাবুর পাণিনি, ১৪ পৃষ্ঠা।

প্রাতিশাখ্যসূত্র বিরচিত হইতে আরব্ধ হয়। *

বৈদিক সংহিতার অবশিষ্ট লিখন-প্রণালী ক্রম-পাঠ নামে প্রসিদ্ধ। ক্রমপাঠ দুই ভাগে বিভক্ত, বর্ণক্রম ও পদক্রম। ক্রম শব্দ বভ্রু-পুত্র পঞ্চাল নামক ঋষি কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। বর্ণক্রমে বহুব্যঞ্জনবর্ণাত্মক শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন বর্ণটীর নিয়ত দ্বিরাবৃত্তি হয়। পদক্রম প্রণালী অনুসারে বাক্যস্থিত দুইটী শব্দ গৃহীত হয়, তাহার দ্বিতীয় শব্দটীর পরবর্ত্তী শব্দের সহিত দ্বিরভ্যাস হয়।

দ্বাভ্যামভিক্রম্য প্রত্যাদায়োত্তরা তয়োঃ।
উত্তরেণোপসন্দধ্যাৎ তথার্দ্ধর্চ্চং সমাপয়েৎ॥
(শৌনক প্রাতিশাখ্য)

বশিষ্ঠ প্রণীত নিম্নোক্ত ঋচার্দ্ধের পদক্রম পাঠ উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

পর্গন্যায় প্রগায়ত দিবষ্পুত্রায় মিলহুষে।
পর্গণ্যায় প্র। প্রগায়ত। গায়ত দিবঃ। দিবষ্পুত্রায়। পুত্রায় মিলহুষে। মিলহুষৈতি মীলহুষে।

জটাপাঠ নামক ক্রমপাঠের একরূপ পাঠ আছে। ক্রমপাঠ জটাপাঠে সুবিশেষ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এস্থলে নিম্নলিখিত ঋচার্দ্ধের জটাপাঠ উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

উরু বিষ্ণো বিক্রমস্ব উরুক্ষয়ায় নস্কৃধি।—

উরু বিষ্ণো বিষ্ণ উরূরু বিষ্ণো। বিষ্ণো বি বি বিষ্ণো বিষ্ণো বি। বিষ্ণো বিষ্ণো। বিক্রমস্ব ক্রমস্ব বি। ক্রমস্বোরূরু ক্রমস্ব ক্রমস্বোরু। উরুক্ষয়ায় ক্ষয়ায়োরূরুক্ষয়ায়। ক্ষয়ায় নো নঃ নস্কৃধি কৃধি নো নস্কৃধি। কৃধীতি কৃধি।

.বৈদিক মন্ত্রগুলি কোন রূপে বিকৃত ও অঙ্গহীন না হয়, ইহাই ক্রম-পাঠের এক মাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য *। এই রূপ জটিলতা পূর্ণ লিখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত থাকা হেতুই বেদের বিশুদ্ধতা অব্যাহত রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে পড়িয়া পুরাণাদির ন্যায় ইহার অঙ্গ-বৈরূপ্য সংঘটিত হয় নাই।

প্রাতিশাখ্যসূত্র গুলিতে ভারতীয় আর্য্যগণের ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ক্রমে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। যাস্কাচার্য্য প্রণীত নিরুক্তে তাহার সবিশেষ পরিপুষ্টি সাধিত হইয়া পাণিনির সূত্রে তাহার পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। উপগীয়মান বৈদিক মন্ত্রের স্বরগ্রামের উচ্চারণ হইতে ব্যাকরণ আরব্ধ হইয়া ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আর্য্যদিগের দৃষ্টি ক্রমে প্রসৃত হয়।

(নিরুক্ত)। যদ্দ্বারা বৈদিক ভাষার শব্দ ও ধাতু জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তাহাকে নিরুক্ত বলে।ঋক্‌সংহিতা ভাষ্যের অবতরণিকায় সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"অর্থাববোধে নিরপেক্ষ তয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম।"

বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ।
দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকার নাশৌ।
ধাতো স্তদর্থাতিশয়নে যোগ
স্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং॥
(শব্দকল্পদ্রুম)

নিরুক্তকার বলিলে যাস্কাচার্য্যকেই সচরাচর বুঝাইয়া থাকে। নিরুক্ত-বেদাঙ্গ

* Weber's Indian Literature p. 23.

* Dr. Roth's Two Papers on the Vedas in the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1847 (p. 812-846) and for 1848 (p. 6-26).

পদবীতে যাস্কপ্রণীত নিরুক্তই বর্ত্তমান কালে অধিষ্ঠিত। যাস্কাচার্য্যের পূর্ব্বেও যে অনেক বৈয়াকরণ ও নিরুক্তকার বিদ্যমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ইঁহাদের নাম ইতি পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যাস্কাচার্য্য প্রণীত নিরুক্ত দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত।

যে পুস্তক অবলম্বনে নিরুক্ত বিরচিত, যে পুস্তকের ভাষ্যরূপে নিরুক্ত প্রণীত,—সেই বৈদিক গ্রন্থের নাম নিঘণ্টু। ইহা পাঁচটী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিন অধ্যায়ে একার্থ বাচক বিভিন্ন বৈদিক শব্দ গুলি অভিধানের আকারে সংগৃহীত হইয়াছে। লৌকিক শব্দ সমূহের পক্ষে যেমন অমরকোষ অভিধান একান্ত প্রয়োজনীয়, বৈদিক শব্দমালার পক্ষে সেইরূপ নিঘণ্টুর প্রথম তিন অধ্যায় উপযোগী। নিঘণ্টুর চতুর্থ অধ্যায়ে সবিশেষ দুরূহ বৈদিক-শব্দাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার পঞ্চম অধ্যায়ে বৈদিক দেবতাগণের নাম শ্রেণী বিভাগক্রমে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে *। প্রথম তিন অধ্যায় নৈঘণ্টুক কাণ্ড, চতুর্থ অধ্যায় নৈগম কাণ্ড, ও পঞ্চম অধ্যায় দৈবত কাণ্ড নামে সুপ্রসিদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় বৈদিকাচার্য্য সায়নাচার্য্য বলেন—

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং,দ্বিতীয়ং নৈগমন্তথা।
তৃতীয়ং দৈবতঞ্চেতি সমাম্নায় স্ত্রিধা মতঃ॥

একার্থবাচিনাং পর্য্যায়শব্দানাং সঙ্ঘো যত্র প্রায়েণোপদিশ্যতে, তত্র নিঘণ্টুশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ। তাদৃশেষমরসিংহ বৈজয়ন্তী হলাযুধাদিষু দশ নিঘণ্টব ইতি ব্যবহারাৎ। এব মত্রাপি পর্য্যায় শব্দ সঙ্ঘোপদেশাৎ আদ্য-কাণ্ডস্য নৈঘণ্টুকত্বং। তস্মিন কাণ্ডে ত্রয়োঽধ্যায়াঃ।........ নিগমশব্দো বেদ-বাচী। তস্মিন নিগমে এব প্রায়েণ বর্ত্তমা-নানাং শব্দানাং চতুর্থাধ্যায়রূপে দ্বিতীয়স্মিন্ কাণ্ডে উপদিষ্টত্বাৎ, তস্য কাণ্ডস্য নৈগমত্বং। মঞ্চমাধ্যায়রূপস্য তৃতীয়কাণ্ডস্য দৈবত্বং বিস্পষ্টম।" †

নিগম পরিশিষ্ট নামক শুক্ল যজুর্ব্বেদের একখানি নিঘণ্টু (অবিধান) বর্ত্তমান আছে। অথর্ব্ববেদেরও একখানি নিঘণ্টু বিদ্যমান আছে বলিয়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোগ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(ছন্দঃ।—) ছন্দোবদ্ধ লালিত্যময় পদই পদ্য বলিয়া অভিহিত। পদ্য কর্ণ ও মনকে যেরূপ আশু পরিতৃপ্ত করিতে পারে, যেরূপ অল্প সময়ে ভাবুক শ্রোতার হৃদয়ে অসংখ্য ভাব সঞ্চারিত করিতে পারে, গদ্য পাঠে কখনও সেরূপ হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস ইহা সপ্রমাণিত করিতেছে যে, গদ্যের পূর্ব্বে পদ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, পদ্য রচনার পর ক্রমে ক্রমে গদ্য সাহিত্যের অঙ্গসৌষ্টব ও পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়াছে। পদ্যে অল্প কথায় গভীরতম ভাবাবলী সংগ্রথিত হইয়া থাকে। পদ্য সহজেই অভ্যস্ত হইয়া দৃঢ়-রূপে লোকের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে। ভারতীয় আর্য্য সাহিত্যেও এই জন্যই গীতিকার্য্য় ঋক্ ও সামবেদের পরে পদ্য গদ্যময় যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ বিরচিত হইয়াছে। সংহিতাভাগের পর বেদের ব্রাহ্মণভাগ সঙ্কলিত হইয়াছে। বেদের সংহিতাভাগ প্রায়ই ছন্দে বিরচিত। বৈদিক ছন্দোজ্ঞান ব্যতিরেকে বেদানুমোদিত

* Weber's History of Indian Literature p. 25.

† বেদবিৎ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সাম-শ্রমী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'নিরুক্ত' ৭ পৃষ্ঠা।

যজ্ঞাদি ক্রিয়া সফল না হইয়া বরং অনিষ্টকারী হয়। প্রতি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ জানা একান্ত আবশ্যক।

"আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং বিনিয়োগ পুনঃ পুনঃ
বেদিতব্যং প্রযত্নেন, ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ॥"

ছন্দঃ বেদের পাদ, কল্প বেদের হস্ত, জ্যোতিষ চক্ষুঃ, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এবং ব্যাকরণ বেদের মুখ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। এই নিমিত্তই ইহারা বেদের ষড়ঙ্গ বলিয়া পরিচিত।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য,হস্তৌ কল্পোঽয় পঠ্যতে
জ্যোতিষাময়নং চক্ষু, নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥
শিক্ষা ঘ্রাণস্তু বেদস্য, মুখং ব্যাকরণং স্মৃতং।
তস্মাৎ সাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥'

বেদে সাতটী ছন্দঃ আছে—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, পংক্তি, বৃহতী, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী। গায়ত্রী ত্রিপদা। ইহার প্রত্যেক পদে বা চরণে আট আটটী অক্ষর। ইহাতে চারি চারি অক্ষর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে অন্যান্য ছন্দগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সাতটী আদিম্ বৈদিক ছন্দ হইতে আধুনিক ছন্দ নিচয় উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অন্যূন ৩৫০টী ছন্দের নাম ভারতকোষে উল্লিখিত হইয়াছে। এত ছন্দ ভূমণ্ডলের কোন ভাষায়ই বিদ্যমান নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই ছন্দোরাশির মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশটী ছন্দ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।*

যেমন ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্যে পাণিনীয় ব্যাকরণ বেদাঙ্গ পদবীতে অধিরূঢ়, যেমন নিরুক্ত—বেদাঙ্গ-পদ-বাচ্য যাস্কাচার্য্য প্রণীত নিরুক্ত, সেইরূপ পিঙ্গলাচার্য্য প্রণীত ছন্দ সূত্রই ছন্দো-বেদাঙ্গ-পদে অধিষ্ঠিত। পিঙ্গলাচার্য্য ক্রোষ্টুকি, তাণ্ডী, যাস্ক, শৈতব, রাত, এবং মাস্তব্য এই কয়জন আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান্ সময়ে তত্তৎশ্রেণীস্থ গ্রন্থগুলি বিলুপ্ত হওয়াতে, এক একখানি গ্রন্থ মাত্র ব্যাকরণ ছন্দ ও নিরুক্ত শ্রেণীর বেদাঙ্গের স্থান অধিকার করত কালের কুটিল গতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ কত গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। এক্ষণেও যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহারই বা অনুসন্ধান কে করে? তাহার সংরক্ষণেই বা কে যত্নশীল হয়? ভারতীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রযত্নে সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা সংকলিত ও মুদ্রিত হইতেছে। জর্ম্মণীতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গের চেষ্টায় সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা জানিতে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমাদের অমূল্য ভাণ্ডারের রত্ন আমরা চিনি না, চিনিতে চেষ্টাও করি না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

(জ্যোতিষ) বেদবিহিত যাগ যজ্ঞাদি, অনুষ্ঠানের সমুপযুক্ত সময় নিরূপণার্থ আর্য্যদিগের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা প্রথমত আরব্ধ হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায়, বাজসনেয়ী সংহিতায়, ছান্দোগ্য উপনিষদে, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধিনী নানা কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বেদা হি যজ্ঞার্থং অভিপ্রবৃত্তাঃ
কালানুপূর্ব্ব্যা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং
যো জ্যোতিষং বেদ, স বেদ যজ্ঞান্॥"

* ভারতকোষ, ৩১২ পৃষ্ঠা।

কান্যকুব্জনিবাসী বলভদ্র প্রণীত সন্ধ্যা-য়নরত্নে মহর্ষি কশ্যপের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্ব কালে নিম্নলিখিত অষ্টাদশ জন জ্যোতিঃ-শাস্ত্র প্রবর্ত্তক প্রাদুর্ভূত হইয়া স্ব স্ব নামে এক একটী সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত সিদ্ধান্তকারদিগের নাম—সূর্য্য, ব্রহ্মা, ব্যাস, বশিষ্ট, অত্রি, পরাশর, কশ্যপ, নারদ, গর্গ, মরীচি, মনু, অঙ্গিরা, লোমশ, পৌলিষ, চ্যবন, যবন, বৃহস্পতি ও শৌনক *। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু, সোম, ত্র্যাধ, গৌতম, দেবল, কৃষ্ণাত্রেয়, ভাগুরি, ক্রোষ্টুকি প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র-কারগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় †।

পূর্ব্বোক্ত ছয় বেদাঙ্গ ব্যতীত অনুক্রমণী, পরিশিষ্ট ও পদ্ধতি নামে বিবিধ বৈদিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। অনুক্রমণীতে বেদের স্তোত্র সংখ্যা, প্রত্যেক স্তোত্রের আদি বাক্য, ছন্দঃ, স্তোতাঋষি ও স্তবনীয় দেবতার নাম—ইংরেজী সূচীর (Index) ন্যায় বিবৃত হইয়াছে। কল্পসূত্রে যে ধর্ম্মা-নুষ্ঠান এবং যজ্ঞাদি বিষয়ক মীমাংসা ও ব্যাখ্যা পরিত্যক্ত বা সামান্যরূপে উল্লি-খিত হইয়াছে, পরিশিষ্ট ও সিদ্ধান্তে তাহাই বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে। প্রত্যেক বেদের গ্রন্থাবলীর বিবরণ প্রদান সময়ে ইহাদের যথাযথ বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

স্কন্দস্বামী, ভবস্বামী, গুহ দেব, শ্রীনি-বাস, মাধবদেব (বেঙ্কটাচার্য্য-তনয়), উবট ভট্ট, ভাস্কর মিশ্র, ভারত স্বামী, মাধবাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য, এবং মহীধর প্রভৃতি মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ বেদের ভাষ্য প্রণ-য়ন করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য প্রভাবে জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। দেবরাজ যজ্বা, স্কন্দ স্বামী ও দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের ভাষ্য রচনা করেন। বৈদিক সাহিত্য ইহাদের অনুগ্রহেই অদ্য পর্য্যন্তও জীবিত রহিয়াছে।

বেদাঙ্গ ও উপাঙ্গ ভিন্ন চারিটী উপবেদ প্রচলিত আছে। তাহারাও যে বৈদিক সাহিত্যের অঙ্গভূত, ইহা তাহাদের স্ব স্ব নামে সপ্রমাণিত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহাদের সম্বন্ধে দুই চারিটী অবশ্য জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়া দীর্ঘায়তন বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। ভবিষ্যতে যথা-স্থানে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে বাসনা রহিল।

বেদের ন্যায় উপবেদও ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই উপবেদ চারিভাগে বিভক্ত,—আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। বেদের ন্যায় উপবেদের কোন বিশেষ গ্রন্থ বিদ্য-মান নাই। উপবেদ শব্দ দ্বারা তত্তৎ শ্রেণীস্থ গ্রন্থাবলী অভিহিত হইয়া থাকে। পক্ষী, সর্প, অশ্বাদি পশু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ উপবেদের ন্যায় বর্ত্তমান আছে। পাণিনির সূত্র দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার সময়ে সর্পবিদ্যা, বিষবিদ্যা, বয়ো-বিদ্যা প্রভৃতি প্রাণীবৃত্তান্ত বিষয় গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদ, শতপথ ব্রাহ্মণ, অথর্ব্ববেদ প্রভৃতি

---

* শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত ভারতকোষ ৩৯১ পৃষ্ঠা।

† Dr. Aufrecht's Catalogue of Sanskrit Mss. in the Library of Trinity College, (Cambridge).

প্রাচীনতর গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সকলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক মহর্ষিমণ্ডলীর মধ্যে ভরদ্বাজ, পুনর্ব্বসু, কপিস্থল, আত্রেয়, অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, চরক, ধন্বন্তরী, সুশ্রুত, আশ্বলায়ন, বাদরায়ন, কাত্যায়ন, বৈজবাপি, কুশ, কৃষ্ণাত্রেয়, সাংকৃত্যায়ন ও কাঙ্কায়ন ঋষির নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ভাবপ্রকাশ নামক সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে নিম্নলিখিত চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ঋষিগণের নাম লিখিত আছে।

"ভারদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ।
ততোঽঙ্গিরা স্তুতো গর্গো মরীচির্ভৃগু
ভার্গবৌ॥
পুলস্ত্যোঽগস্তিরসিতো বশিষ্ঠঃ সপরাশরঃ।
হারীতো গৌতমঃ সাংখ্যো মৈত্রেয়শ্চ্যবনোঽ
পিচ॥
জমদগ্নিশ্চ গার্গ্যশ্চ কাশ্যপঃ কশ্যপোঽপি চ।
নারদো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ কপিঞ্জলঃ।
শাণ্ডিল্যঃ সহ কৌণ্ডিন্যঃ শাকুনেয়শ্চ
শৌনকঃ।
আশ্বলায়ন-সাংকৃত্যেই বিশ্বামিত্রঃ পরীক্ষকঃ॥
দেবলো গালবো ধৌম্যঃকাম্যকাত্যায়নাবুভৌ।
কাঙ্কায়নো বৈজাপায়ঃ কুশিকো বাদারায়ণঃ॥
হিরণ্যাক্ষশ্চলোগাক্ষিঃ শরলোমাচ গোভিলঃ।
বৈখানসা বালখিল্যা স্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ॥*"

ভারদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র ধনুর্ব্বেদ (যুদ্ধবিদ্যা) মর্ত্ত্যলোকে প্রচারিত করেন। তৎপ্রণীত প্রস্থানভেদ নামক পুস্তকে মধুসূদন সরস্বতী রাজর্ষি বিশ্বামিত্র প্রণীত ধনুর্ব্বেদের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাভারত ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে, কামন্দকীয় নীতিসার ও শুক্রনীতি প্রভৃতি নীতিবিষয়ক পুস্তকে, এবং মহাকাব্যাদিতে ধনুর্ব্বেদসম্বন্ধীয় নানা উপদেশ সঙ্কলিত ও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ধনুর্ব্বেদ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই।

গান্ধর্ব্ববেদ ভগবান ভরত মুনি প্রণয়ন করেন। তিনি স্বর্গলোকে নাট্যশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ভরতমুনি ভিন্ন ঈশ্বর, পবন, কল্লিনাথ, নারদ, হনুমন্ত ও সোমেশ্বর সঙ্গীত শাস্ত্রাচার্য্য বলিয়া সুবিখ্যাত। ইঁহাদের প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যমান আছে কি না সন্দেহস্থল। নারদীয় শিক্ষা গ্রন্থে সামবেদের গ্রাম্য ও আরণ্য গানের বিধি ও স্বরাদি নিরূপিত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীতে আরো কয়েক জন প্রাচীনতম সঙ্গীতাচার্য্যের নাম পাওয়া যায়।

"ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ।
দশাস্য-বায়ুরম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রকাশকাঃ॥*

বৈদিক সাহিত্যের অবতরণিকা এস্থানেই পরিসমাপ্ত করিয়া অদ্য পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ভবিষ্যতে অবসরক্রমে এই সুবিস্তীর্ণ বিষয় সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিতে বাসনা রহিল।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

* ভারতকোষ, ৯৮ পৃষ্ঠা।

* ঐতিহাসিক রহস্য, তৃতীয়ভাগ, ১১৮ পৃষ্ঠা।

চৈতন্য-চরিত ও চৈতন্য-ধর্ম্ম। (১৫শ)

সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ।

টোল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার পড়ুয়াদিগকে লইয়াই গৌরচন্দ্র প্রথম সঙ্কীর্ত্তন দল গঠন করিলেন। মৃদঙ্গ নাই, করতাল নাই, রাগ রাগিনী সংযুক্ত স্বর তাল নাই, কয়েক জন বন্ধু একত্রিত হইয়া ব্যাকুলতা সহকারে হাতে তালি দিয়া আঙ্গিনায় বসিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যে কীর্ত্তনের মধুর লহরী কিছু দিন পরে বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল; যাহার তরঙ্গাঘাতে কত পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল এবং যাহা ধর্ম্ম জগতে সাধন ভজনের এক অমূল্য সামগ্রী হইয়া আজ পর্য্যন্ত কত পাপীকে পুণ্যপথে আকর্ষণ করিতেছে, তাহার জন্ম এইরূপে হইল। জগতের মত কিছু মহদ্বিষয় এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। বিজ্ঞান জগতে মাধ্যাকর্ষণ, বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার প্রভৃতি সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

পরমার্থ সাধনে সঙ্কীর্ত্তন যে একটী প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা কেহই অস্বীকার করেন না। তানলয় বিশুদ্ধ স্বর সংযোগে প্রাণের সুকোমল ভাব কুসুম সকল যখন প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, যিনি তাহা সাধনা করিয়াছেন, তিনিই জানেন, তদ্দ্বারা শিব সুন্দর রূপ বিদ্ধ হয় কি না। গৌরের দেহ মন প্রাণ সকলই ভাবময়, মহাপ্রেমের উৎস তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত; ভগবানের শিবসুন্দররূপে তিনি একান্ত মগ্ন; সুতরাং তদীয় সাধন পথে সঙ্কীর্ত্তন যে প্রধান সহায় হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

এক সময়ে সঙ্কীর্ত্তন মাহাত্ম্য তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং, ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং॥

শ্রীকৃষ্ণের নাম সঙ্কীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়; সংসার-দাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ইহার কৌমুদী আলোকে শ্রেয়ঃ কুমুদ বিকশিত হয়; ইহা দ্বারা (অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া) বিদ্যাবধূ সঞ্জীবিত হয়; আনন্দ জলধি সম্বর্দ্ধিত হয়; ইহার প্রতিপদ অমৃতের পূর্ণ আস্বাদযুক্ত; এবং ইহা প্রাণমন প্রভৃতি সর্ব্বাত্মার তৃপ্তিকারী॥

যে সকল ছাত্র পাঠ ছাড়িয়া গৌরের সঙ্গে ভগবদারাধনা করিতে ইচ্ছুক হইল, তিনি তাঁহাদিগকে সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। সঙ্কীর্ত্তন কাহাকে বলে ও কিরূপে সাধন করিতে হয়, তাহারা তাহার কিছুই জানিত না। গৌরচন্দ্র নিজে পদ বাঁধিয়া ধুয়া গাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সংকীর্ত্তনে তাঁহারা প্রথমে যে পদ গাইতেন, সেটী এই;—

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

হাতে তালি দিয়া স্বশিষ্যে এই পদের ধূয়া গাইতে গাইতে বিশ্বম্ভর নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখন হুঙ্কার ও উচ্চহাস্য করেন ও কখন মগ্ন অবস্থায় থাকেন। কখন কখন প্রেমে বিভোর হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেন, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইত; তথাচ বাহ্য জ্ঞান হইত না। চীৎকার ও গণ্ডগোল শুনিয়া প্রতিবাসী ও পথের লোক আসিয়া জুটিত, এ সব রঙ্গের তাহারা কিছুই বুঝিত না; সুতরাং অবাক্ হইয়া দেখিত ও যাহার যাহা মনে আসিত, বলিত। অদ্বৈতের বৈষ্ণব দলেরও ২।৪ জন লোক কীর্ত্তনের সময় আসিতেন; তাঁহারা এই ভাবের ভাবুক, সুতরাং অন্য লোকের মত তাঁহারা বাজে কথা বলিতেন না; বিশ্বম্ভরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও প্রেমদর্শনে তাঁহাদের মনে কত চিন্তারই উদয় হইত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া অদ্বৈতের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অচিরাৎ ভগবৎশক্তি অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের দমন করিবে ও ধর্ম্ম সংস্কার করিবে। নিমাই পণ্ডিতের জীবনের এই পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের ঐ বিশ্বাস একটু একটু করিয়া উদ্দীপিত হইতে লাগিল।

'নিকটে নিকটে যত বৈষ্ণবের ঘর;
কীর্ত্তন শুনিয়া সবে আইলা সত্বর।
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ;
পরম অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনে মন।
পরম সন্তুষ্ট সবে হইলা অন্তরে;
এবে সংকীর্ত্তন হৈলা নদীয়া নগরে।
এমন দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে;
নয়ন সফল হয় যে ভক্তি দেখিতে।
যত ঔদ্ধত্যের সীমা এই বিশ্বম্ভর;
প্রেম দেখিলাম নারদাদির দুষ্কর।
হেন উদ্ধতের যদি এ ভক্তি হইল;
তবে বুঝি আমা সবার দুঃখ নিরারিল।"

মানবাত্মায় অবতীর্ণ ভগবচ্ছক্তির বিকাশই অবতার; গৌরের হৃদয়ে সেই শক্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল। এত দিন বিদ্যার মেঘে ঢাকা ছিল; এখন দিন দিন প্রকাশ পাইতে লাগিল। মানবাত্মা দুই প্রকার উপায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে সক্ষম। এক আপনার মধ্যে, দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টির মধ্যে। আমি যাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি এবং আমার মধ্যে যে সকল স্বর্গের ভাব উপলব্ধি করিতেছি, ইহা হৃদয়ঙ্গম করাই নিরালম্ব জ্ঞান। তুমি বলিতে পার, ঈশ্বর নাই বা তাঁহাকে জানা যায় না, তুমি পণ্ডিত, জ্ঞানী ও সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী আমাকে নানা যুক্তি কৌশলে ফেলিয়া তোমার মত বুঝাইয়া দিলে; কিন্তু আমার প্রাণ তাহা মানিল না, আমি যে তাহাকে হস্তামলকবৎ স্পর্শ করিয়াছি; প্রাণের প্রাণ বলিয়া অনুভব করিয়াছি এবং রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু বলিয়া আস্বাদ করিয়াছি, সুতরাং তোমার কথায় ভুলিব কিরূপে? কিন্তু এই জ্ঞান আপনা আপনি সকলের অন্তঃকরণে সকল সময়ে বিকশিত হয় না। আর যদিও অল্প কিছু হয়, তাহা সংসারের পাপ প্রলোভন কাটিয়া উঠিয়া সর্ব্বাবস্থার মানুষকে কল্যাণের পথে, পরিত্রাণের পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হয় না। হৃদয় ক্ষেত্রে বীজ রোপিত আছে, তাহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপ জল বায়ু না দিলে অঙ্কুরিত হয় না; কুসুম কলিকা গাছে আছে; কিন্তু বসন্ত মারুত না লাগিলে ফুটে না। তাই বাহিরের আলোক প্রয়োজন, স্বাবলম্ব জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞান

সৃষ্টি রাজ্য হইতে লাভ করিতে হয়। তাহা আবার দুই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমত জড় জগতের মধ্য দিয়া, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পর্ব্বত, কানন, মেঘ, গাছ, পাতা, নদী, পুষ্প, বায়ু জল, প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু নানা দেশে, নানা ভাবে ও নানা উপায়ে এই জ্ঞান মানবাত্মায় ঢালিয়া দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী হইতে মানব মণ্ডলী পর্য্যন্ত সকলে অন্য প্রকারে, অন্য ভাবায় সেই জ্ঞান পুষ্টির সাহায্য করিতেছে। এই উভয়বিধ পদার্থ সকলেই সেই বিশ্ব গুরুর ভাষারূপে তাঁহারই ভাব প্রকাশ করিতেছে, স্বয়ং কেহই গুরু নয় কিন্তু মহাগুরুর মহা মন্ত্র। এই প্রভেদ টুকু স্মরণ না রাখাতেই, জগতে গুরুবাদের মধ্যে, মহা পাপ অবতারবাদের মধ্যে নর পূজা প্রবেশ করিয়াছে। গাছ পাথর, জীব, জন্তু মানুষ, ও গুরু দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক, জগতের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এই বিশাল জ্ঞান রাশিও মানবাত্মার পরিত্রাণের পক্ষে সকল সময়ে যথেষ্ট হয় নাই, পাপের প্রবল শক্তির নিকট এই সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানও পরাস্ত হইয়া গিয়াছে। সে জন্য করুণাময় বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধিতে মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ আলোক আসিয়াছে, আসিতেছে ও চিরকালই আসিবে। সেই আলোক মানবাত্মার ভিতর দিয়া আসিয়া অধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, ধর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিতেছে ও বিশেষ বিশেষ জাতির দুরবস্থা মোচন করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। যে সকল পাত্র অবলম্বন করিয়া এই আলোক আসিয়া থাকে, পৃথিবীর ভাষায় তাঁহারা মহাপুরুষ, প্রেরিত বা অবতার প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। শব্দে কিছু যায় আইসে না, বস্তু জ্ঞান ঠিক থাকিলেই হইল ; তাহা না থাকিলেই মহা বিপদ।

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

'সম্ভবামি যুগে যুগে'—তবে কি অনন্ত নিত্য সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জরা মরণ শীল ক্ষুদ্র মানব শরীর ধারণ করেন ? না, তাহা অসম্ভব। সম্ভূত হওয়ার অর্থ প্রকাশিত। যে আধার অবলম্বন করিয়া তিনি প্রকাশিত হন, তাহা হইতে তাঁহার 'তিনিত্ব' সম্পূর্ণ পৃথক্, সমস্ত সৃষ্টিতেই তিনি প্রকাশিত ; অথচ তাহা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক।

'আমিত জগতে বসি জগত আমাতে ;
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে।'
চৈঃ চঃ

ঈশা, মুষা, শাক্য, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ব্যক্তিত্ব যাহা, তাহা হইতে অবতীর্ণ ভগবত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটী আধার অপরটী আধেয়, একটী উপায় আর একটী প্রাপ্য। গৌরের আভ্যন্তরীণ প্রেম যতই বিকসিত হইতে লাগিল, তদীয় শিষ্যগণ ততই উপকৃত হইতে লাগিলেন, চারিদিকের অজ্ঞানান্ধকার কাটিয়া গিয়া ততই প্রেম চন্দ্রমার আলোকে নবদ্বীপ আলোকিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল, কুসুম-কোরকে কীট প্রবেশ করিল। গৌরের ব্যক্তিত্ব হইতে ভগবত্ত্ব পৃথক করিতে না পারায় শিষ্যগণ গোলে পড়িলেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিনাশের বীজ লুক্কায়িত রহিল। যাহা

হউক, এইরূপে নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন প্রচার হইতে লাগিল।

"এইরূপে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস;
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ"

ভক্ত সেবা।

এই সময়ে বিশ্বম্ভর সাধু সেবা করিতে যত্নবান্ হইলেন। নবদ্বীপের অধ্যাপকদিগের আচার ব্যবহার তাঁহার নিকট কিছু অবিদিত ছিল না; সুতরাং তাঁহাদিগকে তিনি ভক্তি করিতে পারিলেন না। তবে যাহাদিগকে তিনি পূর্ব্বে পরিহাস ব্যঙ্গ করিতেন, অদ্বৈতের দলভুক্ত সেই বৈষ্ণবদিগের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বাপরই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহারা শাস্ত্র ব্যুৎপত্তিতে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও সরল বিশ্বাসী, ভক্তিমান্ ও প্রেম-পিপাসু ছিলেন, গয়া হইতে আগমনের পর তাঁহাদিগের প্রতি গৌরচন্দ্রের শ্রদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হইল। তখন তিনি এই সকল লোকের সহবাসে থাকিবার জন্য ও তাঁহাদিগকে সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইয়া শ্রীবাসাদিকে দেখিলেই ভক্তি পূর্ব্বক প্রণাম করেন্; তাঁহারাও 'কৃষ্ণে মতি হউক' বলিয়া দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, কাহারও পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করেন, কাহারও আর্দ্র বস্ত্র নিঙরাইয়া দেন, কাহারও দেবার্চ্চনার ফুলের সাজি বহিয়া যান। ধন্য প্রেম, তোমার মহিমা! সত্য সত্যই তুমি পাষাণ গলাইয়া জল করিতে পার। পূর্ব্বে যাহার ঔদ্ধত্যে বৈষ্ণবগণ অস্থির হইতেন, তোমার মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আজ্ সেই নিমাই কি করিতেছে? আরও কত কাণ্ড হইবে, তাহা কে জানে? নিমাই বয়ঃকনিষ্ঠ; বৈষ্ণবেরা বর্ষীয়ান্ এবং তখনও তাঁহাতে ঈশ্বর বুদ্ধি হয় নাই; সুতরাং নিঃশঙ্কে তাঁহারা তদীয় সেবা গ্রহণ করিতেন এবং নানারূপে আশীর্ব্বাদ করিতেনঃ—

"শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে;
প্রীতহঞা ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে।
তোমার হউক ভক্তি শ্রীহরি চরণে;
মুখে হরি বল হরি শুনহ শ্রবণে।
শ্রীহরি ভজিলে বাপ সব সত্য হয়,
না ভজিলে কৃষ্ণরূপ বিদ্যা কিছু নয়।
কৃষ্ণ সে জগত পিতা; কৃষ্ণ সে জীবন;
দৃঢ় করি ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ।"

বিশ্বম্ভর অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনি এখন ভক্তি পথ অবলম্বন করিতেছেন, ইহাতে বৈষ্ণবদিগের প্রাণে মহানন্দের সঙ্গে সঙ্গে মহতী আশা-তরু বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নবদ্বীপে পাষণ্ডীর সংখ্যা বড় কম নয়। পাষণ্ডীদিগের উৎপাতে ও বিদ্রূপে তাঁহারা জর্জ্জরিত। এখন বিশ্বম্ভরের দ্বারা তাহারা পরাজিত ও ভক্তিপথে নীত হইতে পারিবে, এই আশায় তাঁহারা আরও উল্লাসিত হইলেন, নিমাইয়ের সেবাতে তুষ্ট হইয়া অন্যান্য আশীর্ব্বাদের মধ্যে তাঁহাদের এ বিষয়ের আশীর্ব্বাদও শুনা যাইতে লাগিলঃ—

"কৃষ্ণ বই আর নাহি স্ফুরুক তোমার;
তোমা হইতে দুঃখ যাউক আমা সবাকার।
যে অধম লোক সব সঙ্কীর্ত্তনে হাসে;
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণ রসে।
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সবার;
তেন কৃষ্ণ ভক্তি কর পাষণ্ডী সংসার।
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল,
সুখে কৃষ্ণ বলি নাচি হইয়া বিহ্বল।

এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক;
কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক।
কি সন্ন্যাসী, কি তপস্বী, কিবা গৃহী যত;
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত।
কেহ না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন;
দেখিলেই পরিহাস করে সর্ব্বজন।
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ দেহ সবাকার;
কোথাও না শুনি কৃষ্ণ কীর্ত্তন সঞ্চার।
এখনে প্রসন্ন কৃষ্ণ হৈল সবাকারে;
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে।
তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়;
মনেতে আমরা ইহা জানিল নিশ্চয়।
চিরজীবি হও তুমি লও কৃষ্ণ নাম;
তোমা হৈতে ব্যক্ত হউক কৃষ্ণ গুণ গ্রাম।'
চৈঃ ভাঃ

ভক্তের আশীর্ব্বাদ শুনিয়া গৌরের সুখের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মধুর স্বরে কত কথাই বলিলেন, 'ভক্তের আশীর্ব্বাদে সকল সিদ্ধ হয়; আপনারা যখন প্রসন্ন হইলেন, তখন অবশ্যই আমি কৃষ্ণ ভক্তি পাইব, ভক্তাধীন ভগবান অবশ্যই ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।'

"ভক্ত আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়;
ভক্ত আশীর্ব্বাদে যে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।
প্রভু কহে তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত;
তোমরা যে কহ সেই হইবে নিশ্চিত।
ধন্য মোর জীবন তোমরা বল ভাল,
তোমরা রাখিলে গরাসিতে নারে কাল।
কোন্ ছার হয় পাপ পাষণ্ডীরগণ;
সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন।
সেবক বলিয়া মোরে সবেই জানিবা;
এই বর কভু মোরে নাহি পাশরিবা।"

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থকারগণ এই সকল ব্যবহারের সহিত গৌরের পূর্ণ ব্রহ্মত্বের অসংলগ্ন দেখিয়া কৌশল করিয়া উভয় দিক্ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'ভক্তাধীন ভগবান্' এই মহা বাক্য অবলম্বন করিয়া কলে কৌশলে আপনাদের মত রক্ষা করিয়াছেন। ভক্তের সকল কার্য্যই ভগবান্ সম্পন্ন করিয়া থাকেন; গৌরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান্; অতএব তিনি আপন কিঙ্করের সেবা করিলেন। দ্বিতীয় তর্ক এই যে, গৌর রূপে ভগবান্ ভক্তাবতার হইয়াছেন; নিজে আচরণ করিয়া অপরকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াই এ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধু সেবা ও সাধু সম্মাননা ভক্তি সাধনের প্রধান অঙ্গ। সেই উপদেশ দিবার জন্যই গৌরচন্দ্র এইরূপ বৈষ্ণব সেবা করিয়াছিলেন। আর বৈষ্ণবদিগের প্রোক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথিত হইয়াছে যে তখনও গৌর আপনার ঈশ্বর স্বরূপ প্রকাশ করেন নাই, তাই বৈষ্ণবগণ চিনিতে না পারিয়া সামান্য মানবের ন্যায় তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদাদি প্রয়োগ করিয়াছিলেন—

"সেই প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর বিশ্বম্ভর;
গূঢ় রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর।
চিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার;
যা সবার লাগিয়া হইলা অবতার।
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে;
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে।"

উপরে যথাযথ ঘটনা বিবৃত হইল। তাহা হইতে যে পক্ষের সিদ্ধান্ত প্রকৃত বলিয়া বোধ হইবে, পাঠকগণ তাহাই অবলম্বন করিবেন। আমরা পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, সাকার রূপে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বৈষ্ণবীয় সিদ্ধান্ত হইতে

আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে যদি কোন পাঠক বিরক্ত হন্, তবে নাচার।

অদ্বৈত-মিলন

অদ্বৈতের নিকট বিশ্বম্ভর চির পরিচিত; তবে আবার অদ্বৈত-মিলন কি? বাহিরের পরিচয়ে মিল হয় না; প্রাণে প্রাণে মিলই মিল। আমরা জগতের অনেক লোককে চিনি; কিন্তু সে চেনায় কি কিছু ফল হয়? যখন দুটী আত্মা এক প্রাণে, এক ভাবে, এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনন্তের দিকে ছুটে, তখনই প্রকৃত রূপে মিলন হয়। অদ্বৈত-মিলনের প্রসঙ্গেও তাহাই বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিশ্বম্ভরের অগ্রজ বিশ্বরূপ অদ্বৈতের টোলে গীতা-ভাগবত অধ্যয়ন করিতেন। বিশ্বম্ভর তখন ৭।৮ বছরের বালক, হেলিতে দুলিতে মাতৃ আজ্ঞায় কখন কখন অগ্রজকে ডাকিতে যাইতেন; অদ্বৈত তখন হইতেই বালকের মনোহর কান্তি ও স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তদবধি তিনি বিশ্বম্ভরের প্রতি বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার পরে বিশ্বম্ভরের বিদ্যা বিলাস ও ভক্তিহীন শাস্ত্র জ্ঞান এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের সময় তাঁহার সহিত বড় একটা মাখামাখি ছিল না। এখন মণ্ডলীর লোক মুখে নিমাইয়ের অপূর্ব্ব ভক্তি লাভের কথা শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বড় সুখী হইলেন। চারি দিকে বিষ্ণু ভক্তি শূন্য ধর্ম্মহীন লোক দেখিয়া অদ্বৈত প্রাণের দুঃখে কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না, ভগবান্‌কে অবতীর্ণ করাইবার জন্য সর্ব্বদা সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং অবশিষ্ট সময় ২।৪ জন সমদুঃখী বৈষ্ণব লইয়া ভক্তি আলোচনার সময় যাপন করিতেন। এমন সময় এক দিন তাঁহার দলস্থ বন্ধুগণ আসিয়া বিশ্বম্ভরের পরিবর্ত্তিত জীবনে আশ্চর্য্য মহা ভাবের লক্ষণ সকল যাহা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলেন। তখন অদ্বৈতও পূর্ব্বে রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, গীতার এক স্থানের একটী পাঠ ও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনোদুঃখে উপবাস করতঃ আমি কাল রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিলাম; এমন সময় একজন আসিয়া যেন আমাকে সেই অর্থ বলিয়া দিয়া উঠাইয়া পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং বলিলেন যে "আর দুঃখ করিও না, যাহাকে অবতীর্ণ করাইবার জন্য এত সাধ্য সাধনা করিতেছিলে, সেই প্রভু আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বর্গের দুর্ল্লভ ভক্তি দেশে প্রচারিত হইবে, কোটি কোটি নর নারী উদ্ধার হইয়া যাইবে, আর এই শ্রীবাসের গৃহে সকল বৈষ্ণব একত্রিত হইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তনে ও নৃত্য গীতে মগ্ন হইয়া থাকিবে।" আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, চক্ষু মিলিয়া সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে স্তব্ধ হইয়া গেলাম। দেখিলাম বিশ্বম্ভর দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে অমনি অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। এই বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বলিলেন;—

"কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে
কোন্ রূপে প্রকাশক হয়েন কাহাতে?

অদ্বৈত আবার বলিতে লাগিলেন যে, বিশ্বম্ভরের যেরূপ রূপ ও আকৃতি, যেরূপ ভদ্র বংশে তাঁহার জন্ম ও অশেষ শাস্ত্রে

তিনি যেমন পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণ ভক্তি হওয়াইত উচিত, আজ আমি তোমাদের কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। তাঁহার যে এরূপ স্বভাব হইয়াছে, এ শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। যে বস্তুর জন্য আমি লালায়িত, যদি সত্য সত্য তিনি সেই বস্তু হন্; তবে অধিক দিন আর অপ্রকাশ থাকিবে না। অবশ্যই এক দিন সকলেই বুঝিতে পারিবে। এই বলিয়া অদ্বৈত রায় হরি হরি বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিলেন, আর ভক্তগণ জয় জয় রবে প্রেমোন্মত্ত হইয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সে দিনের কথা এই পর্য্যন্ত।

বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে, অদ্বৈত প্রভু স্নানান্তে তুলসী সেচন করিতেছেন ও মনের অনুরাগে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন; কখন দুই নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে; কখন অট্ট হাসি হাসিতেছেন; কখন ভীম রবে হুঙ্কার করিতেছেন এবং পাষণ্ডী উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছেন; এমন সময় বিশ্বম্ভর প্রিয় বয়স্য গদাধরকে সঙ্গে লইয়া অদ্বৈত ভবনে যাইয়া উপনীত হইলেন। দূর হইতে আচার্য্যের তাৎকালিকের ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া তিনি প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

"একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে;
মনেতে হইল বড় কৌতুকের রঙ্গে।
অদ্বৈত সভায় গেলা প্রভু দুই জন;
দেখিলা অদ্বৈত করে তুলসী সেচন।
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে হরি হরি;
ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে আপনা পাসরি।
মহা মত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার,
ক্রোধ দেখি যেন মহা রুদ্র অবতার।
অদ্বৈত দেখিবা মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর;
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর।"

কথিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্য্য ভক্তি-যোগে ও মনোবলে বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি নানা উপচারে মূর্চ্ছাবস্থায় পূজা করিয়াছিলেন; এবং 'নমোঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায়চ; জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ এই শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহার চরণ যুগলে' প্রণত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই রহস্য নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বর্ণনা করিয়া চৈতন্য ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

"ভক্তি যোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল
এই মোর প্রাণনাথ জানিল সকল।
কোথা যাবে চোরা আজি বলে মনে মনে
এত দিন চুরি করি বুলে এই খানে।
অদ্বৈতের ঠাঁই তোর না লাগে চোরাই;
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই।
চুরির সময় এই বুঝিয়া আপনে;
সর্ব্ব পূজার সজ্জা লই নামিলা তখনে।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন লই সেই ঠাঁই;
চৈতন্য চরণ পূজে আচার্য্য গোঁসাই।

নিকটে গদাধর দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি অদ্বৈতের ঈদৃশ অসঙ্গত আচরণ দৃষ্টে জিহ্বা কামড়াইয়া বৃদ্ধ আচার্য্যকে বলিলেন যে "নিমাই বালক; বিশেষতঃ মূর্চ্ছিত, এ অবস্থায় তাহার প্রতি আপনি এমন অসঙ্গত ব্যবহার কেন করিতেছেন?

"হাসি বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াই
বালকেরে গোঁসাই হেন করিতে না যুয়ায়।"

অদ্বৈত ভাব ব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন"হাঁ বালক কি,কি,তাহা পরে জানিবে।"

'হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে;
গদাধর! বালক জানিবা কত দিনে।

গদাধর কিছু বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন না কি। এমন সময় চৈতন্যের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অদ্বৈতাচার্য্যকে তখনও আবেশময় দেখিয়া তিনি দুই হাত যুড়িয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে লাগিলেন এবং আপনার দেহ প্রাণ মন সমলই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "আচার্য্য! আমাকে কৃপা করুন। আপনার কৃপাব্যতীত আমার কৃষ্ণলাভের আশা নাই; আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

"অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর।
নমস্কার করি তাঁর পদধূলি নিয়া,
আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদিয়া,
অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়,
তোমার সে আমি হনু জানিহ নিশ্চয়।
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে;
তবকৃপা বিনা কার কৃষ্ণ নাহি স্ফুরে।
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ নাশ;
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সতত প্রকাশ।"

বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের মতে বিশ্বম্ভর ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার ঈশ্বরত্ব গোপন করিলেন। অদ্বৈত মনে মনে ভাবিলেন যে, আমার কাছে তোমার চতুরালি খাটে না। আমি আগে থাকিতে চোরের উপর বাটপারি করিয়াছি ও প্রকাশ্যে উত্তর করিলেন "বিশ্বম্ভর, তুমি আমার কাছে সকল অপেক্ষা বড়; আমার এবং সকল বৈষ্ণবগণের ইচ্ছা এই যে, যেন আমরা সর্ব্বদা তোমাকে দেখিতে পাই ও সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকিয়া কৃষ্ণ গুণানুকীর্ত্তন করিতে পাই।"

"হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর;
সবা হইতে তুমি বড় বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণ কথা কৌতুকে থাকিব এক ঠাঁই;
নিরন্তর তোমা যেন দেখিবারে পাই।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে;
তোমার সহিত কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে॥"

অদ্বৈতের করুণ বাক্যে প্রীত হইয়া বিশ্বম্ভর বিদায় হইলেন। এদিকে বৃদ্ধ আচার্য্য, সত্য সত্য প্রভু প্রকাশিত হইলেন কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; উদ্দেশ্য, যদি সত্য বিশ্বম্ভরই শ্রীকৃষ্ণ হন, তবে অবশ্যই আমাকে অচিরাৎ বাঁধিয়া আনিবেন।

"জানিলা অদ্বৈত হৈল প্রভুর প্রকাশ,
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস।
সত্য যদি প্রভু হয় আমি হই দাস;
তবে মোরে বাঁধিয়া আনিবে নিজপাশ।"

কথাটা কিছু অসংলগ্ন হইল। আগে দৃঢ় ঈশ্বর জ্ঞান না হইলে ঘোর ঘটা করিয়া পূজা করা হয় না। আর যদি ঈশ্বর জ্ঞানই হইল, তবে আবার গুরু হইয়া শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ দেওয়া হয়, সেরূপ উপদেশ কেন দেওয়া হইল? আবার তাঁহার ঈশ্বরত্বে সন্দিহান হইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরেই বা পলায়ন কেন? এই মাত্র কথা ঠিক হইয়া গেল যে, সকলে একত্রে ভগবানের আরাধনা করিবেন; তাহারই বা ব্যত্যয় কেন? তবে কি ঈশ্বর জ্ঞানের কথা ও পূজার কথা অতিরঞ্জিত চিত্র নয়? সন্দেহ আপনা হইতে উদিত হয়। এই সময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাহার কিছু পরেই অদ্বৈতের শান্তিপুর গমন বৃত্তান্ত সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আর প্রথম দর্শনেই নিমাইয়ের অলৌকিক ভাবাবেশ ও মূর্চ্ছা দেখিয়া অদ্বৈতের মনে তাঁহার প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রমের উদ্রেক হওয়াও

অসম্ভব নহে। তবে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজার ব্যাপারটা অতিরঞ্জিত কি না, বিচার্য্য। গ্রন্থকারও গ্রন্থ রচনার সময় এ বিচার করিয়া ছিলেন; তা না হইলে তিনি বলিবেন কেন?—

"অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবারে শক্তি কার
যাঁর শক্তি কারণে চৈতন্য অবতার।
এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত;
অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল নিশ্চিত।"

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলা যাক্। গ্রন্থকর্ত্তা যাঁহাদিগের নিকট হইতে গ্রন্থের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে অটল বিশ্বাসী। মূল ঘটনা, দেখিতে দেখিতে, স্মরণ করিয়া রাখিতে রাখিতে, পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে যে প্রেমের ও ভক্তির রঙ্গে কল্পনার তুলি দিয়া চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা সহজ-বোধ্য। তাহাতে বিচার শক্তি প্রয়োগ করিলে পাছে ভক্তির রং লুকাইয়া যায়, অসামঞ্জস্য বাহির হইয়া পড়ে, তাই বিশ্বাসের দুয়ারে আপীল করিয়া একটা ছোট রকম মাথার দিব্বি দেওয়া হইয়াছে,—অর্থ, কেহ যেন তর্ক বিচার না করেন।

বায়ু রোগ ও শ্রীবাস মিলন।

এখন হইতে বিশ্বম্ভরের মধ্যে এক এক আশ্চর্য্য নূতন ভাব দেখা যাইতে লাগিল। গৌরের হৃদয় ভাবপ্রবণ; যখন তাহাতে যে ভাব উঠে, তাহার তরঙ্গ না হইয়া যায় না। নির্ম্মল সরসীর স্বচ্ছ সলিলে ক্ষুদ্র উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন কুল্যের উপর কুল্য উঠিয়া শেষে সমস্ত সরসী তরঙ্গময় হইয়া যায়; তেমনি বাহিরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা তদীয় চিত্ত-সরসীতে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাবের পর ভাব বীচি উৎপাদিত হইয়া প্রাণ মন সকলই ভাবময় করিয়া তুলিত। তাঁহার স্বভাবের এই মধুর ভাবই স্বর্গীয়। ইহারই চমৎকারিত্বে সমস্ত ভারতবর্ষ সমাকৃষ্ট হইয়াছিল এবং ইহাই অবশেষে গাঢ় মহাভাবে পরিণত হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের উপর পাষণ্ডীদিগের অত্যাচারের কথা শুনিতে শুনিতে ও ভাবিতে ভাবিতে পাষণ্ডী উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটা বাসনা প্রবল হইল। তার পক্ষে বাসনাও যাহা; আর মন প্রাণের সকল ভাব ঐ চিন্তায় পর্য্যবসিত হইয়া তদ্ভাবময় হইয়া যাওয়াও তাহাই। তাই এখন হইতে 'সংহার করিব' 'আমি সেই' এই প্রকার নানা রূপ অলৌকিক কথা বলিতে লাগিলেন।

"আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ হইল প্রচুর।
সংহারিব সব বলি করয়ে হুঙ্কার;
মুই সেই, মুই সেই, বলে বারেবার।"

এই ভাবে বিভোর হইয়া কাঁদিতে হাঁসিতে ও হুঙ্কার করিতে লাগিলেন; কখন ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, এবং কখন ভার্য্যাকে দেখিলে মারিতে যান। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্নেহময়ী জননীর মনে কতই বিপদাশঙ্কা হইতে লাগিল। তিনি পুত্রের পূর্ব্ব ব্যাধির কথা মনে করিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; এবং যাহাকে দেখেন, তাহাকেই পুত্রের লক্ষণ বলিয়া উপদেশ চাহিতে লাগিলেন।

"এই মত হৈলা প্রভুর বৈষ্ণব আবেশ;
শচী না বুঝয়ে কিছু ব্যাধি কি বিশেষ।
পুত্র বিনে শচী কিছু নাহি জানে আর;
সবারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যবহার।
বিধাতা যে স্বামী নিলে, নিলে পুত্রগণ;

অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন।
তাহার কেমন রীতি বুঝন না যায়;
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আপনা আপনি কহে মনে মনে কথা;
ক্ষণে বলে ছিণ্ডি ছিণ্ডি পাষণ্ডীর মাথা।
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চড়ে;
নাবিলে নয়ন দুই ভূমি তলে পড়ে।
দন্ত কড় মড়ি করে মাল সাট মারে:
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে।"

লোকের যেমন বুদ্ধি, তেমনি উপদেশ দিতে লাগিল। কেহ বলিত, বিষম বায়ু উপস্থিত, ইহাকে বাঁধিয়া রাখ ও নারিকেলের জল খাইতে দাও; তাহা হইলে উর্দ্ধবায়ু অধঃ হইবে, কেহ বলে, অপদেবতার বাতাস লাগিয়াছে; কেহ শিবাঘৃত পাক তৈল সেবন করাইতে বিধি দেয়। এইরূপ যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাহাই বলে। আসল রোগ কেহই বুঝিলনা। মূর্খ পৃথিবীর লোক; কৃষ্ণানুরাগে শিবাঘৃতের ব্যবস্থা? প্রেম-রোগে বন্ধনের ব্যবস্থা! তোমরা নইলে এমন অপূর্ব্ব বিধি আর কে দেয়? এইরূপ পাঁচ জনের পাঁচরূপ কথা শুনিয়া শচীদেবী বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং এক দিন জনৈক লোক দিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে ডাকাইয়া আনিলেন। ভক্ত দর্শনে গৌরের ভক্তিভাব উথলিয়া উঠিল। অশ্রু কম্প, লোম-হর্ষাদি হইয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। রোজার কাছে রোগ লুকান থাকে না। শ্রীবাস পণ্ডিত গৌরের অবস্থা দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। বিশ্বম্ভরও চৈতন্য লাভ করিয়া শ্রীবাসকে বলিলেন, পণ্ডিত, আপনি আমার সম্বন্ধে কি বুঝিলেন? লোকে বলিতেছে, আমার বাই রোগ হইয়াছে।

"বাহ্য পাই প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে
কি বুঝ পণ্ডিত; তুমি আমার বিধানে
কেহ বলে মহা বাই বাঁধিবার তরে;
পণ্ডিত তোমার চিত্তে কি লয় আমারে?

শ্রীবাস সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, তোমার বাইর মত আমার একটু বাই হইলে বাঁচিয়া যাইতাম।

"হাসিবলে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাল বাই
তোমার যেমত বাই আমি তাহা চাই।
মহাভক্তি যোগদেবী তোমার শরীরে;
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে।"

শচীকে দেখিয়া শ্রীবাস বলিলেন,—

"শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিল বচন;
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন।
বায়ু নহে কৃষ্ণ ভক্তি বলিল তোমারে;
ইহা নাকি অন্য জন বুঝিবারে পারে?
ভিন্ন জন স্থানে কিছু কথা না কহিবা;
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা।"

শ্রীবাস শচীকে এইরূপে প্রবোধ দিতেছেন শুনিয়া, বিশ্বম্ভর মহা সুখী হইলেন এবং শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন

"সকলে বলয়ে বাই আশংসিলে তুমি
আজিবড় কৃতকৃত্য হইলাম আমি।
যদি তুমি বাই হেন বলিতে আমারে;
তবে আজি প্রবেশিতাম গঙ্গার ভিতরে।"

তখন ভক্ত শ্রীবাস বলিতে লাগিলেন যে, এখন হইতে আর আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত নহে; সকলে একত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করিব। আমরা একত্রিত হইলে পাষণ্ডীরা কিছুই করিতে পারিবে না:—

"সবে মিলি এক ঠাঁই করিব কীর্ত্তন
যত কেন না বলুক পাষণ্ডীরগণ।"

শ্রীবাস বিদায় হইয়া গেলে শচীদেবীর

মন হইতে যদিও বায়ু রোগের আশঙ্কা দূর হইল; কিন্তু তাহার স্থানে আর এক নূতন আশঙ্কা সমুপস্থিত হইল। বিশ্বরূপের কথা মনে পড়িয়া গেল। সে ও তো এইরূপ ভক্তি-পিপাসু হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তবে কি বিশ্বম্ভরও সেই পথে যাইবে? কে জানে, ভাঙ্গা কপালে আবার বুঝি ভাঙ্গে। শচি! আশ্বস্ত হও, সকলেই ঈশ্বর ইচ্ছা।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র---অন্ত্যজীবন।

(মানসিংহ।)

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত করিয়া অন্নদা মঙ্গলের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ মানসিংহ রচনা করেন। এই মানসিংহ রচনাতে মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন বর্ণন উপলক্ষ করিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদিপুরুষ সুবিখ্যাত ভবানন্দ মজুমদারের দেব অংশে জন্ম ও তৎপ্রতি অন্নদার বিশেষ কৃপা বিশদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা যে ভারতচন্দ্র শুধু মহারাজার মন সন্তুষ্ট করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা মহারাজাদিগের স্তুতিবাদ করিয়া আজিও অনেকানেক কবিতার উৎপত্তি হইতেছে এবং তাহা লোক সমিতি প্রচলিত হইতেছে। এই মানসিংহ যদি অন্য কাহারও রচিত হইত তাহা হইলে বোধ হয় ইহার নাম পর্য্যন্ত আমরা জানিতাম না, শুধু ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া ইহা আজিও জগতে জীবিত রহিয়াছে। আমরা এই স্থলে ইহার স্থূল ঘটনা বিবৃত করিব।

মানসিংহ কিছুকাল বর্দ্ধমানে অবস্থান করিয়া, তথায় বিদ্যাসুন্দর ঘটিত উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, যশোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখনও ভবানন্দ মানসিংহের সঙ্গে সঙ্গে। পথে যাইতে যাইতে মানসিংহ ভবানন্দের বাড়ী দেখিতে চাহিলেন, সুতরাং তাঁহারা ভবানন্দের বাসস্থল বাগোয়ানের পথে অগ্রসর হইলেন। মহারাজা মানসিংহ ভবানন্দের বাড়ী যাইবেন, সুতরাং ভবানন্দ তাঁহার উপযোগী সরঞ্জম ও আহার সামগ্রী যোগাড় করিবার জন্য মানসিংহের নিকট বিদায় লইয়া অগ্রে বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। এদিকে মানসিংহও সৈন্য সামন্ত সঙ্গে করিয়া বাগোয়ানের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভবানন্দ চলিয়া গেলে অন্নদার মায়ায় পথে তুমুল ঝড় বৃষ্টি হইল, তাহাতে মানসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ বড় বিপদে পড়িলেন। এমন কি, কয়েক দিন পর্য্যন্ত খাদ্য সামগ্রী কিছুই পাওয়া গেল না। ভবানন্দ এই ব্যাপার অবগত হইয়া, মানসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন, এবং অন্নপূর্ণার কৃপায় তাঁহাদিগকে সপ্তাহকাল বিবিধ দ্রব্য সামগ্রী ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিলেন। মানসিংহ ইহাতে পরম প্রীতি লাভ করিলেন এবং ভবানন্দের খুব প্রশংসা করিলেন। ভবানন্দ তাহাতে মানসিংহকে অন্নদার কৃপা ও তৎ পূজার

পদ্ধতি অবগত করাইলেন। মানসিংহ ও অন্নদার পূজা করিয়া সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

মানসিংহ এই প্রকারে অন্নদার পূজা করিয়া পরে ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া যশোর যাত্রা করিলেন। তথায় প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এক তুমুল সংগ্রাম হয়। সে সংগ্রামে মানসিংহ জয় লাভ করেন, এবং প্রতাপকে বন্দী করেন। এক লৌহ পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রতাপকে বদ্ধ করিয়া মানসিংহ তৎ সমভিব্যাহারে দিল্লি যাত্রা করেন। পথি মধ্যে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়। মানসিংহ দিল্লি গমনকালে ভবানন্দকে রাজ্য প্রদান করিবার আশা দিয়া দিল্লিতে লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ে বাদসাহ খুব সুখী হইলেন এবং পরিশ্রমের জন্য মানসিংহকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন। মানসিংহ অন্নপূর্ণার কৃপায় ও ভবানন্দের অনুগ্রহে পথিমধ্যে সমস্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন বলিয়া, ভবানন্দকে স্বদেশে রাজা করিবার জন্য বাদসাহকে অনুরোধ করিলেন। তখন জাহাঙ্গীর দিল্লির বাদসাহ। জাহাঙ্গীর হিন্দু দেব দেবীতে কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। জাহাঙ্গীর হিন্দুর দেবীর এই প্রকার ক্ষমতার বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বড়ই রুষ্ট হইলেন এবং দেবীকে ভূত বলিয়া বড় নিন্দা করিলেন। ভবানন্দের প্রাণে এ দেবী-নিন্দা সহ্য হইল না, তাই তিনি বাদসাহকে যথোচিত উত্তর প্রদান করিলেন। ইহাতে দিল্লীশ্বর বড়ই কুপিত হইয়া ভবানন্দকে কারাবদ্ধ করিলেন। আর বলিলেন যে, যে পর্য্যন্ত তোদের ভূতের ক্ষমতা না দেখাইতে পারিবি সে পর্য্যন্ত আর উদ্ধার নাই।

অন্নদার প্রিয় ভবানন্দের এই প্রকার বিপদ দেখিয়া অন্নদা বড়ই কুপিতা হইলেন। তাই তিনি দিল্লিতে ভয়ঙ্কর ভূতের উৎপাত আরম্ভ করিলেন এবং ভবানন্দকে অভয় প্রদান করিলেন। সে ভূতের উৎপাত-বর্ণন বড়ই চমৎকার। ভূতের উপদ্রবে সমস্ত নগরবাসীর তিষ্ঠান ভার হইল। বাদসাহ ইহাতে বড়ই ভীত হইলেন এবং অন্নদার স্তুতি করিলেন। দেবী তাহাতে বাদসাহের উপর সন্তুষ্ট হইয়া ভূতের উপদ্রব নিবারণ করিলেন। বাদসাহ তাড়াতাড়ি ভবানন্দের নিকট গমন করিয়া তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দিলেন, এবং তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া কিছু অনুনয় করিলেন। তৎপরে বাদসাহ ভবানন্দকে রাজত্বের ফরমান দিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। বাটী প্রত্যাগমন কালে ভবানন্দ অযোধ্যা ও বারাণসী দর্শন করিয়া নিজালয়ে উপস্থিত হন। বাটী আসিয়া দেবীর পূজা করিয়া ভবানন্দ কিছু দিন সুখে রাজত্ব করিলেন। দেবী ভবানন্দের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। এবং তাঁহার পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। তৎপরে তাঁহার বংশে কে কে জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারা কিরূপ কার্য্য করিবেন, তৎ বিস্তারিত দেবী ভবনেন্দকে বলিয়া, তাঁহাকে চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নাম্নী দুই পত্নীর সহিত স্বর্গধামে লইয়া গেলেন।

ভারতচন্দ্রের মানসিংহে উপরোক্ত ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র ইহার মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে জগন্নাথপুরী, বারাণসী,

অযোধ্যা ও রামচন্দ্র প্রভৃতির বিষয় আনয়ন করিয়াছেন, এবং ঐ সকল বিষয় সম্যক বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরে সমস্ত অন্নদামঙ্গলকে অষ্ট মঙ্গলা নাম প্রদান পূর্ব্বক আট ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক ভাগের বিবরণ সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

অন্নদার কৃপাতে ভবানন্দের কি প্রকার উন্নতি হইয়াছিল, এবং ভবানন্দ কিরূপে মহারাজ মানসিংহের অনুকম্পায় দিল্লির দরবারে রাজত্বের ফরমান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝানই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ভবানন্দ কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার বিবরণ ক্ষিতীশ বংশাবলী পাঠে সম্যক অবগত হওয়া যায়। আমরা এই স্থলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিতেছি।

১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ সর্ব্ব প্রধান। এই ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জের কোন প্রদেশের ক্ষিতীশ রাজার পুত্র। ইনি প্রভূত ধনশালী ছিলেন, সুতরাং বাঙ্গলায় আসিয়া নিজ অর্থে জমিদারী ক্রয় করিয়া তথায় অবস্থান করেন। ইনি বিক্রমপুরের সন্নিহিত কোন স্থানে আপন আলয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ পুরুষ বাস করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে যিনি নির্ব্বিবাদে উক্ত স্থানে বাস করেন, তাঁহার নাম কামদেব। ইনি ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। ইহাতে দেখা যায় যে ইঁহারা সর্ব্বশুদ্ধ ৩২২ বৎসর উক্ত রাজ্য ভোগ করেন। কামদেবের চারি পুত্র জন্মে। ইঁহারা রাজ্য লইয়া বিরোধ করিলে, জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ দিল্লির সম্রাটের আনুকূল্যে জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু এই আনুকূল্যের জন্য তাঁহাকে দিল্লির দরবারে রাজস্ব দিতে হইয়াছিল। সম্রাট তাঁহাকে আরও কয়েকটী পরগণা প্রদান করেন।

কামদেব হইতে কাশীনাথ পর্য্যন্ত ৭ পুরুষ, ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯৮ বৎসর উক্ত জমিদারী ভোগ করেন। কাশীনাথের সহিত বাঙ্গলার নবাবের প্রীতি ছিল না; তাই নবাব কলে কৌশলে কাশীনাথকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কাশীনাথের অনাথিনী পত্নী কিছু টাকা ও লোকজন সঙ্গে লইয়া বাগোয়ান পরগণার জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লইলেন। হরেকৃষ্ণের সন্তান ছিল না। তিনি উক্ত কামিনীকে আপন দুহিতার ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। কাশীনাথ-পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন। যথাসময়ে তিনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। হরেকৃষ্ণ তাহার নাম রামচন্দ্র রাখিলেন। হরেকৃষ্ণ মৃত্যুর সময় সমস্ত জমিদারী রামচন্দ্রকে প্রদান করিয়া গেলেন। এই রামচন্দ্রের পুত্রের নামই ভবানন্দ। ভবানন্দ অল্প বয়সেই আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভবানন্দ ১৩।১৪ বৎসর বয়সে প্রভূত সাহস গুণে দিল্লির এক রাজপুরুষের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। উক্ত রাজপুরুষ তাঁহাকে এক অনুরোধ পত্র দিয়া বাঙ্গলার নবাবের

নিকট প্রেরণ করেন। নাবাব তাঁহাকে কাননগোঁইয়ের পদে অভিষিক্ত করিয়া মজুমদার উপাধি প্রদান করেন। তৎপরে ভবানন্দ মানসিংহের অনুকম্পায় রাজা উপাধি লাভ করিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবংশ সংস্থাপন করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহারই বংশধর।

আজিকালি বঙ্গবাসী যেমন "ভেতো বাঙ্গালী" নামে অভিহিত হইয়াছে, চিরকাল তেমন ছিলনা। বঙ্গের অনেক বীরপুরুষের কথা শুনা যায়। তন্মধ্যে মহারাজা প্রতাপাদিত্য একজন। মহারাজা প্রতাপাদিত্য যশোরে রাজত্ব করিতেন। আজিকালি যাহা যশোর বলিয়া অভিহিত, মহারাজা প্রতাপ সে যশোরের রাজা নহেন। তাঁহার যশোর এক্ষণে জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে এবং তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ইনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ও প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। ইনি কাহাকেও ভয় করিতেন না। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। ভারতচন্দ্র ইহার বিষয়ে লিখিয়াছেন ;—

"যশোর নগর ধাম   প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।"

এই মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অনেক সৈন্য ছিল। প্রতাপ দিল্লির সম্রাটকে অবমাননা করিতেন। ইনি ইঁহার খুড়া বসন্ত রায়কে সবংশে বিনষ্ট করেন, কিন্তু বসন্ত রায়ের একটী শিশু পুত্রকে রাণী কচুবনে লুকাইয়া রাখিয়া রক্ষা করেন। তাই এই পুত্র কচুরায় নামে প্রসিদ্ধ। এই কচুরায় বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট প্রতাপের অত্যাচার বিবৃত করেন। বাদসাহ প্রতাপকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। মানসিংহ যশোরে উপস্থিত হইয়া প্রতাপকে সম্রাটের শাসন মানিবার জন্য আহ্বান করিলে, প্রতাপ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বীরোচিত বটে। আমরা সে স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"কত গিয়া ওরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মুনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥"

তখন মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় হয় এবং প্রতাপ বন্দী হইয়া দিল্লিতে প্রেরিত হন। পথে মানসিংহের নৃশংসতায় অনাহারে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মানসিংহ প্রতাপের মৃতশরীর ঘৃতে ভাজিয়া নবাবকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন। যশোরে কচুরায় রাজ্য পাইলেন। প্রতাপের বংশের কথা এখন আর শুনা যায় না। তাঁহাদের রাজ্য কালের অতলগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

মানসিংহ রাজপুত কুলে কুলাঙ্গার। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই মানসিংহের বিষয় অবগত আছেন। ইনি আকবর ও জাহাঙ্গীরের শাসন সময়ে উক্ত মুসলমান সম্রাটদিগের সেনাপতী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মানসিংহ খুব যোদ্ধা ছিলেন। ইনি বিরুদ্ধবাদী হওয়াতে, রাজপুত জাতির পতন হইয়াছে। ফলতঃ মুসলমান রাজগণ রাজপুতদিগের দ্বারাই আপন অধিকার বৃদ্ধি ও তৎসংরক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আকবর ও

জাহাঙ্গীরের সময়ে যে যে কঠিন ও ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্তেই মানসিংহ অগ্রণী ছিলেন। মানসিংহ বিরুদ্ধে থাকাতে রাজপুত-কুলতিলক প্রতাপের এই দুর্দ্দশা। ইনি বাঙ্গলার রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সম্রাটকে যখন মানসিংহের ন্যায় যোদ্ধাকে প্রতাপাদিত্য দমন জন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, তখন প্রতাপ যে খুব মহাবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। মানসিংহ যদি মুসলমানদিগের সহায়তা না করিয়া, প্রতাপের ন্যায় নিজ জন্মভূমি উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টিত হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মুসলমান রাজ্য একেবারে বিলুপ্ত হইত। তিনি অমিততেজা পরম যোদ্ধা ছিলেন বটে, কিন্তু সেই তেজ ও যুদ্ধ-কৌশল স্বদেশ-রক্ষক না হইয়া স্বদেশ-লুণ্ঠক হইয়াছিল, তাই বলিতেছিলাম, মান-সিংহ রাজপুত কুলে কুলাঙ্গার।

মানসিংহ রচনা মধ্যে কিছুই ঘটনা-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না। তবে ভারতচন্দ্র চিরকালই লিপি-কৌশলী, তাই ইহারও ভাষা পরিমার্জ্জিত। দামু বাবুর খেদ, ভূতের উপদ্রব প্রভৃতি বর্ণনে ভারতের কবিত্বের সুন্দর ভাব সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। সামান্য সামান্য বিষয় গুলিকে ভারত সরস ভাব যুক্ত করিয়া বড়ই মধুর করিতে জানিতেন। ভবানন্দ বাটী আসিলে পর তাঁহার দুই স্ত্রীতে পরস্পর যে ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছিল, তদ্দারা ভারত-চন্দ্র এক স্ত্রী থাকা স্বত্বে পুনরায় দার পরি-গ্রহ করিলে মানুষকে যে প্রকার বিপদে পতিত হইতে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন। সামাজিক ঘটনা সকল গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার সমালোচনা করিতে ভারত সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তাই তিনি সাধী ও মাধীর ঝগড়া বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ লোকসমাজে এই প্রকার ঘটনা প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তারপর অন্নদার মায়া প্রপঞ্চ বর্ণনা দ্বারা ভারতচন্দ্র আমাদের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের ভাব আনয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক বলিতে গেলে, ভারতচন্দ্র যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং ঐ ক্ষমতা বলে তিনি যে সামান্য বিষয়কে বর্ণনাগুণে সরস, মধুর ও মানব-মন-প্রীতিকর করিতে পারিতেন, সেই বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গলকে আপন সভাসদ্গণ দ্বারা সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন, তাই অন্নদামঙ্গলে দোষ ভাগ খুব কম। আমাদের একথা বিশ্বাস হয় না। কারণ, ভারতচন্দ্র মানবচরিত্র উত্তম রূপে বুঝিতেন। তাহার পরিচয় বিদ্যাসুন্দর সমালোচনা সময়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানবচরিত্র বুঝিতে পারিতেন বলিয়াই তিনি তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র এইরূপে অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া, তাহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন, মহারাজ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিলেন এবং ভারতচন্দ্রের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যগুণে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্দিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতের সাংসারিক সমস্ত খবর লইতে আরম্ভ করিলেন। এই

সময় হইতে ভারতচন্দ্রের দুঃখ অবসৃত হইয়াছিল। ভারত নিজ প্রতিভাবলে মানুষের মনে যে স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। একবার কোন কৌশলে মানব মনে রাজ্য স্থাপন করিতে পারিলে, সে রাজ্য অটলভাবে অবস্থিত হয়।

একদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে তাঁহার পরিবার সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারতচন্দ্রও আপনার অবস্থা সবিস্তারে রাজাকে অবগত করাইলেন। ভারতচন্দ্র বলিলেন যে, আমার ভ্রাতাদিগের সঙ্গে আমার তত সদ্ভাব নাই। আমার পরিবার শ্বশুরালয়ে আছেন। ভ্রাতাদিগের সহিত মনোমালিন্য থাকার জন্য আমি আর তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার এই প্রকার অবস্থা শুনিয়া এক্ষণে তিনি কি করিবেন, অর্থাৎ কোথায় বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। ভারতচন্দ্রের প্রতি কৃষ্ণচন্দ্রের মন যে কি প্রকার আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই সমস্ত ঘটনাই তাহার সম্যক পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ভারতচন্দ্র রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন যে, আমি স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করি। ভারতচন্দ্র আরও বলিলেন যে, গঙ্গাতীরে বাস করিতেই আমার ইচ্ছা। বাস্তবিক গঙ্গাতীরে বাস করিতে সমস্ত হিন্দুরই ইচ্ছা হইয়া থাকে এবং অনেকে জীবনের শেষ অংশে গঙ্গাতীরে বাস কবিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া থাকেন। গঙ্গাসলিলে অবগাহন করিতে পারিলে শরীর সমস্ত পাপ-মুক্ত হয়, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস। তাই ভারতচন্দ্র গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষ জানাইলেন। ভারত কিন্তু যাহা হইতে এই অভাবিত সম্পদ অর্থাৎ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান সুবিখ্যাত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে ভুলিলেন না। ভারতচন্দ্র রাজাকে কহিলেন যে, যে মহাত্মার অনুকম্পায় আমি কল্পতরু সদৃশ মহারাজের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই মহাত্মা চোধুরী বাবুর বাড়ীর নিকট গঙ্গাতীরে বাটী প্রস্তুত করিবার জন্য আমার আন্তরিক অভিলাষ। কেন না, তাহা হইলে সদাসর্ব্বদা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও তৎসঙ্গে আলাপাদি করিয়া খুব সুখী হইতে পারিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার খুব বিস্তৃত ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত স্থানই তাঁহার অধিকার-ভুক্ত ছিল। তিনি ভারতচন্দ্রের এই প্রকার অভিলাষ অবগত হইয়া, ভারতচন্দ্রের মনোমত স্থানেই তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর বাড়ীর সন্নিকটে মূলাজোড় বলিয়া একটী গ্রাম আছে। ভারতচন্দ্র ঐ মূলাজোড়ে অবস্থান করিবার অভিলাষ জানাইলে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। মূলাজোড় মহারাজার অধিকার ভুক্ত ছিল। তিনি উক্ত গ্রাম ভারতচন্দ্রকে বার্ষিক ৬০০৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইজারা দিলেন। ৬০০ টাকা রাজস্ব দিয়া উক্ত গ্রামের খাজানা হইতে ভারতচন্দ্রের ব্যয়োপযোগী যথেষ্ট টাকা থাকিত এবং

তাহাতেই ভারতচন্দ্রের সাংসারিক ব্যয় সমস্ত বিনা কষ্টে নির্ব্বাহ হইত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে শুধু ভারতকে উক্ত গ্রাম ইজারা দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এমন নহে, তিনি ভারতচন্দ্রকে বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য আরও ১০০টাকা দান করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র এইরূপে ১০০ টাকা এবং মূলাযোড়ের ইজারার সনন্দ পাইয়া উক্ত গ্রামে গমন করিলেন। এবং গঙ্গাতীরে বাটী নির্ম্মাণোপযোগী একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। বাটী নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি তথায় ঘোষালদিগের বাটীতে বাসা করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে মূলাযোড়ে আনয়ন করিয়াছিলেন। যে পর্য্যন্ত না নূতন বাটী প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত তিনি সস্ত্রীক উক্ত ঘোষালদিগের বাটীতেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হিন্দুরা বাটী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করিবার পূর্ব্বে গৃহ সঞ্চার উপলক্ষে ঠাকুর পূজা ইত্যাদি নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকেন। ভারতচন্দ্রও নূতন বাটী প্রস্তুত হইলে গৃহপ্রতিষ্ঠা ও গৃহসঞ্চার ইত্যাদি বিধিমত নানা প্রকার ক্রিয়া করিয়া যথারীতি সস্ত্রীক নূতন বাটীতে প্রবেশ করিলেন। এবং যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ভারতচন্দ্র ঐ স্থানেই বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি মূলাযোড়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শ্রীরজনীকান্ত রায়।

সাগরবক্ষে পরলোক চিন্তা।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এক বৃহৎ অর্ণব পোতে আরোহণ করিয়া মরিসস্ দ্বীপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম। যখন আমরা বিষুব রেখার সমীপবর্ত্তী হইলাম, তখন শুক্ল পক্ষ;—শশধর শৈশব, কৌমার ও যৌবন কাল অতিক্রম করিয়া এক্ষণ প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত, পূর্ণচন্দ্র তারকা-খচিত নভোমণ্ডলে সমুদিত হইয়া ষোল কলার শোভা বিকাশ করিতেছিলেন। স্নিগ্ধ নির্ম্মল সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল। এক্ষণে সমুদ্রের সে স্বাভাবিক ভীষণ মূর্ত্তি নাই, শ্রবণ-বধিরকারী সে কোলাহল নাই, সে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব-নৃত্য নাই। সমুদ্র এক্ষণে স্থির ও শান্ত। এ সময়ে মনুষ্যের মন স্বভাবতই কল্পনা-বক্ষে আরোহণ করিয়া অনন্তের অভিমুখে ধাবিত হয়। কবিত্ব-বিহীন হৃদয়েও কবিতা-কুসুম স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি ইতি পূর্ব্বে কখনও কবিতা পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, কখনও এক পঙ্ক্তি কবিতা রচনা করে নাই, যাহার তান মানলয় কিছুরই বোধ নাই, সেও তখন নীরব থাকিতে পারে না। বাস্তবিক সমুদ্র-জগতের অপার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মোহিনী শক্তির নিকট সকলকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালে আকাশের বিচিত্র শোভা ও মনোহর পরিবর্ত্তন সন্দর্শন করিলে কাহার না হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে? কিন্তু মধ্যাহ্ন সময়ে সে

শোভা ও পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। অবিরত এই সুখ সম্ভোগ করিয়া পাছে মনুষ্যের মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাই বুঝি বিধাতা মধ্যাহ্ন কালকে সমুদ্র-বিহারী মনুষ্যের বিশ্রাম জন্য আকর্ষণ-শূন্য করিয়া রাখিয়াছেন।

সেই অনন্ত বিস্তার নীলাম্বু মণ্ডল বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে যখন সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলাকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন মন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল। সেই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার নভোমণ্ডলের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে হৃদয়ে অপূর্ব্ব কবিতা-স্রোত ও মধুর কল্পনা-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, কেমন দৃশ্যের পর দৃশ্য, আলেখ্যের পর আলেখ্য, এবং সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য পটলে পটলে প্রকাশ করিয়া চিরসুহৃদের ন্যায় মনুষ্যের সুখ দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে! এ পৃথিবীর মনোহর দৃশ্য দর্শন করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না এবং ঘটিলেও অনবরত একইরূপ দৃশ্য সন্দর্শন করিতে করিতে মন একেবারে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। আকাশের প্রকৃতি মনুষ্যের ন্যায়, কখনও প্রশান্ত, কখনও দুরন্ত, কখনও প্রীতিপ্রদ, কখনও মনোরম্য, এবং কখনও বা অনন্ত স্নেহশীল। পৃথিবীর ভাবগ্রাহী হৃদয় ইহার সহিত যতই কথোপকথন করিতে থাকে, ততই অপূর্ব্ব জ্ঞান রত্নের অধিকারী হয়। পশু, পক্ষী ও উদ্ভিদের ন্যায় আমরা যে শুদ্ধ ইহা হইতে আলোক ও উত্তাপ, শিশির ও বৃষ্টি গ্রহণ করিয়া সুখী হই, তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে এই সুবিশাল মহা গ্রন্থ হইতে সেই দেব দেব মহাদেবের মঙ্গলময় ইচ্ছা অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান ও সুখ লাভে চির সমর্থ হইতে পারি, তন্নিমিত্ত সকলেরই প্রাণপণে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য।

কবির সহিত এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে পরকাল বা পরলোক চিন্তা হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্ব্বে পরকাল চিন্তায় মন আর কখনও অধিকক্ষণ ব্যাপৃত থাকে নাই। পরকাল থাকা সম্ভব, তখন কেবল মাত্র এইরূপ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু পরলোকে মনুষ্য কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, সেই অবস্থা সুখময় কি দুঃখময়, এই সকল বিষয় আলোচনায় কখনও মস্তিষ্ক সঞ্চালন করি নাই। যখন ইহ জীবনে যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি নাই, তখন পরলোক সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার কোথায়, মনোমধ্যে এইরূপ ভাবই জাগরূক ছিল। ইহাই আমার মনের প্রথম অবস্থা। অনন্তর যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলাম, অন্ধ, খঞ্জ, ও অপর সাধারণের সামান্য উপকার সাধন করিয়া অপর্য্যাপ্ত সুখানুভব হয়, তখন মনে হইতে লাগিল, পরলোক যদি ধার্ম্মিকগণের সুখের নিকেতন ও অধার্ম্মিকদিগের দুঃখের নিবাসভূমি হয়, তাহা হইলে সেরূপ পরলোক না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। কেন না, ইহ জীবনে ভগবানের নিয়ম পালন করিয়া পরোপকার ব্রতে যাঁহারা জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারা কি ইহলোকেই যথেষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন না? কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, যাঁহারা স্বার্থ সাধনায় দিন যামিনী যাপন করেন, তাঁহারা কি প্রথম শ্রেণীর সুখ ভোগে বঞ্চিত হইয়া যথেষ্ট দুঃখ বা শাস্তি ভোগ করেন না?

পরলোকে যদি অধিকতর সুখ সম্ভোগের কোন সামগ্রী থাকে, তবে তাঁহা ঈশ্বর সহবাস। যাঁহারা কখনও ঈশ্বর-সহবাস-সুখ-গ্রাহিণী বৃত্তি ইহজগতে বিকশিত করেন নাই, তাঁহারা সেই বৃত্তির পরিণতি ও উপভোগে পরলোকে কদাচ সুখী হইতে পারেন না। এই সুখ হইতে বঞ্চিত থাকাতেই তাঁহাদের শাস্তি, দুঃখ বা নরক ভোগ। পরকাল সম্বন্ধে ইহাই আমার মনের দ্বিতীয় অবস্থা।

সেই সুনীল সাগর-বক্ষে, স্ফুট চন্দ্রালোকে একান্তে বসিয়া কল্পনার সহিত যখন মধুর সম্ভাষণে নিবিষ্ট ছিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল, পরলোক পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ উন্নতি। ইহাই সুখ, ইহাই স্বর্গ, ইহার অভাবই দুঃখ বা নরক। পরকাল বা পরলোক বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ হইলেও সচরাচর একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মনুষ্য মৃত্যুর পর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া যথায় অবস্থান করেন, তাহাকেই সাধারণত পরকাল বা পরলোক বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে সচরাচর পরলোকে দুইটী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। একটী স্থল স্বর্গ এবং অপরটী নরক। এই স্থান যে কোথায়—সূর্য্যলোকে, চন্দ্রলোকে, কি নক্ষত্রলোকে,কি এই সকলের অতীত কোন লোকে, তাহা কোথাও মীমাংসিত রূপে উল্লিখিত নাই।

যদি সম্পূর্ণ জ্ঞান ও উন্নতি,পরলোক সম্বন্ধে মনুষ্য বিশ্বাসের চরম সীমা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমি মনে করি, সেই জ্ঞান কখনও এ পৃথিবীতে লাভ করা যাইতে পারে না। উহা প্রাপ্ত হইতে হইলে সকল পৃথিবীতে মনুষ্যকে ন্যূনাধিক কাল অবস্থান করিতে হইবে। কোন পৃথিবীর সকল জ্ঞান লাভ করাও সম্ভবপর নহে। আর সকলেই যে তুল্য রূপ জ্ঞান ও উন্নতি লাভে সমর্থ হইবে, তাহাও নহে। মনুষ্য জাতির মধ্যে এই বৈষম্য দুইটী কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথমটী অনুশীলনের তারতম্যে, দ্বিতীয়টী কোন পৃথিবীতে অবস্থান কালের ন্যূনাধিক্যে ঘটে। সম্ভ্রান্তাবস্থাপন্ন ১০ বৎসরের একটী বালক ৫ পাঁচ বৎসরের একটী বালক অপেক্ষা যে পৃথিবীর জ্ঞান লাভে অধিকতর সমর্থ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। পক্ষান্তরে শিক্ষিত লোকের আট বৎসর বয়স্ক বালক যথাযোগ্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, কোন কৃষকের দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক অশিক্ষিত বালক অপেক্ষা যে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই। শৈশবাবস্থায় যাহাকে এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়, ইহলোকে অল্প কাল অবস্থান নিবন্ধন জ্ঞান সঞ্চয়ে তাহার যে অসুবিধা ঘটে, লোকান্তরে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল বাস করিয়া হয়ত তাহার সে ক্ষতি পূরণ হইতে পারে। মৃত শিশুর পক্ষে এই পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করা সম্ভব, কিন্তু যে কিয়ৎ পরিমাণে এখানে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার এ পৃথিবীতে পুনরাগমন করা যুক্তিসঙ্গত নহে, পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি তাহার কিছুমাত্র না থাকায়, পুনরায় জ্ঞানের ক খ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং সে যে উত্তরোত্তর অধিকতর জ্ঞান লাভে সক্ষম হইবে, তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। এইরূপ কল্পনা বা চিন্তার সাহায্যে যে রূপ মীমাংসায় উপনীত হইলাম, তাহা এইস্থলে বিবৃত হইতেছে।

মনুষ্যজীবনের যতদূর আমাদের দৃষ্টিভূত ও বুদ্ধিগম্য, তাহা আলোচনা করিলে প্রথমত ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে জরায়ুতে একটী সামান্য কোষ বা বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে ঐ কোষের গুণও বৃদ্ধি হয়। এইরূপে উৎপন্ন বহুসংখ্যক পরিণত কোষ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জীব রক্ষণোপযোগী অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়, যন্ত্র, পেশী, অস্থি, মর্জ্জা, মস্তিষ্ক প্রভৃতি সংগঠিত করিয়া থাকে। পরে এই গুলি যখন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়, তখন একটী স্বতন্ত্র জীব পৃথিবীতে আসিয়া দেখা দেয়।

এই অবস্থাকে আমরা মনুষ্য জীবনের শৈশবাবস্থা বলিয়া থাকি। এখন তাহার শরীরের সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। পরে এই গুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও পরিণতি প্রাপ্ত হয়। তাহার মন এক্ষণে অঙ্কুরাবস্থায় থাকে। ক্ষুৎ পিপাসা, এই দুইটী শারীরিকী বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। জরায়ুতে শরীরের প্রথম কোষ বা বীজ দেখিতে পাই। মনের প্রথম কোষ বা বীজের আবির্ভাব এই পৃথিবীতেই হইয়া থাকে। জরায়ুতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যন্ত্রাদির ন্যায় এই পৃথিবীতে মানসিক বৃত্তি সকলের জন্ম ও বিকাশ হইয়া থাকে। ইহাদের দুই একটীর অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহলোকে প্রকৃত পরিণতি হওয়া অতীব দুর্লভ। জননীর জঠরে ভ্রূণের পক্ষে ফুল (Placenta) যেমন প্রয়োজনীয়, এ পৃথিবীতে মনের পক্ষে শরীরেরও তেমনি প্রয়োজন। শরীরের অবয়ব পূর্ণ হইলে যেমন ফুলের আর প্রয়োজন থাকে না, সেইরূপ মনের অবয়ব পূর্ণ হইলে শরীরেরও আর প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। ইহজীবনে মনুষ্যের জরায়ুতে ভ্রূণের অবস্থায় অবস্থান ও এই পৃথিবীতে তাহার নানা অবস্থান্তর প্রাপ্তি দেখিয়া ইহাই সহজে অনুমিত হয় যে, পরলোকে মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকলের যথাযোগ্য বৃদ্ধি ও পরিণতি এবং নূতন বৃত্তির জন্ম হইয়া থাকে। এই সকল বৃত্তি সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইলে পুরাতন মনের বিনাশ হয়। নূতন মন লোকান্তরে বিচরণ করিয়া আবার পুরাতনের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপ লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়া মানব মন উন্নতি হইতে আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। পরে যখন জ্ঞান ও উন্নতি সম্পূর্ণ হইবে, তখন মনুষ্য কোন লোকে বা তদতীত কোন স্থানে তাহার পরকাল অতিবাহিত করিয়া সেই মহাপুরুষের সহবাস সুখে সিদ্ধার্থ হইবে।

Theory লইয়া বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও উন্নতি। Theory হইতে কত সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, Lister এক Theory র সাহায্যে অস্ত্র-চিকিৎসায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার Theory তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাও তাঁহার Theory অনুসারে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরলোক সম্বন্ধে যদি আমরা এইরূপ কোন Theory লইয়া কার্য্য করিতে থাকি, এইরূপ Theory তে যদি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে জড়তা আসিয়া কি কখনও আমাদিগকে তাহার দাস করিয়া রাখিতে পারে?—কোনরূপ সাধুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিতে কি কখন

আমরা পশ্চাৎপদ হই? না মরণে ভয় রাখি? যাহার সম্মুখে অনন্ত উন্নতি, অনন্ত আশা,— কোটী কোটী গ্রহ উপগ্রহ যাহাকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে, সে কি কখনও আর নিদ্রিত থাকিতে পারে? যে দিন আমার হৃদয়ে পরকাল সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে, সেই দিন আমার জীবনের অতি শুভ দিন। আমার নিকট সেই ১৮৮৪ সালের ৫ই মে ধন্য।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা।*

এটোয়া পরিত্যাগ।

ক্রমে শীতাবসান হইতে লাগিল; আমিও এটোয়া পরিত্যাগের চেষ্টায় থাকিলাম। তখন আমি সেনিটারী কমিশনারের ন্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নগরের স্বাস্থ্য ও মৃত্যু সংখ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে প্রচণ্ড মারিভয় উপস্থিত হওয়ায় সেখানে রাজাজ্ঞায় যাত্রী সমাগম নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আমিও বহু যত্ন ও ব্যয়ে পুনর্লব্ধ স্বাস্থ্য, অপরিণত বয়সের ভ্রমণেচ্ছা বাসনা-মন্দিরে বলিদান দিতে উৎসুক ছিলাম না, সুতরাং আমার ভ্রমণ-লোলুপ নেত্র এক দিকে নিবারিত হইয়া অন্য দিকে সঞ্চালিত হইতে বাধ্য হইল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, প্রত্যুষের ট্রেণে আমরা এটোয়া ত্যাগ করিয়া আগ্রাভিমুখে যাত্রা করি। প্রভাতে গাড়ী "তুণ্ডুলা" পৌছিলে সে গাড়ী ছাড়িয়া আগ্রার গাড়ীতে উঠিলাম এবং ৮॥০ ঘটিকার সময় আগ্রা গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। কতক পথ যাইতে না যাইতে অর্দ্ধ-প্রকাশিত, অর্দ্ধ-লুক্কায়িত ভাবে নীলাকাশ স্পর্শ করিতে করিতে তাজমহলের ধবল প্রস্তর নির্ম্মিত অপূর্ব্ব দীপ্তিময় শিল্প-প্রভার উজ্জ্বল গৌরব আমাদিগের দৃষ্টিপথে সহসা প্রতিভাত হইল, এবং সেই স্বপ্নময় স্মৃতিশাখা তাজের গগনস্পর্শী শ্বেত চূড়া কতক দেখিয়াই কেমন যেন এক মোহ স্বপ্নে ডুবিয়া গেলাম। আমি সে অবস্থা বর্ণনার চেষ্টা করিব না। চক্ষের সম্মুখে সকলি জীবন্ত চিত্র, অথচ যেন তাহা বহু দিন দৃষ্ট অতীত স্বপ্নবৎ ভাবপূর্ণ, স্মৃতিতে জাগিবে জাগিবে করিয়া, জাগিতেছে না, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সব, কিন্তু ছুঁইতে কি ধরিতে ক্ষমতা নাই। দূর হইতে সেই মানস-মোহন তাজমহলের শিখরমালা নিরীক্ষণ করিয়া কত আশার কথা, কত নিরাশার অশ্রু হৃদয়কে সুখে দুঃখে হাসি কান্নাময় করিয়া ফেলিল,—আমি আমাকে তখন ভুলিবার জন্য অন্যমনা হইবার প্রয়াস পাইলাম, এমন সময় উদার সৌন্দর্য্য-পূর্ণ সুবিস্তৃত যমুনা সেতু দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাজমহল ভুলিয়া গেলাম এবং "যমুনা লহরী" সঙ্গীতের "নির্ম্মল সলিলে

* এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও” ভাবিতে ভাবিতে সেতু পার হইলাম।

আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া পথভ্রান্ত পথিকপ্রায়, ক্লান্তভাবে, কোথায় যাইব, কি করিব ভাবিয়া (Overland) সেতুর উপর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন একজন হিন্দুস্থানী, বর্ণে কাক্রী বিনিন্দিত, নাসিকায় চীনবাসী লজ্জা পায়, স্বশরীরে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একখান খাতা দেখাইল। তাহাতে অনেক বাঙ্গালী যাত্রীর পরিচিত নাম দেখিয়া আমরাও তাহার গৃহে বাসা লইতে স্বীকৃত হইলাম। তার গৃহে যাইবার সময় পথি মধ্যে কয়েকটী স্ত্রীলোক সহসা আসিয়া আমাদিগকে যেন ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল। তাহারা ইতর স্ত্রীলোক, বিদেশী পথিকদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আগে নিজ গৃহে লইয়া যায় ও পরে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। আমরা বড় কষ্টে সেই মায়ারূপিনী রাক্ষসীগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির গৃহে বাসা লইলাম।

আমরা সে গৃহে বাসা লইয়াছিলাম, তাহা দ্বিতল ও যমুনা নিকটস্থ রাজ পথবর্ত্তী। পথশ্রান্তির পর তাহা পরিপাটী এবং নয়ন তৃপ্তিকর বোধ হইল।

আমরা আসিবা মাত্র কিরূপে যে সেই সংবাদ আগ্রাবাসী ফেরিওয়ালাদিগের মধ্যে টেলিগ্রাফ হইল, সে রহস্যভেদ করিতে এখনও পারি না। অল্প কালের মধ্যেই তাহারা ঝাঁকে২ আসিতে লাগিল ও নানা প্রকার কারুকার্য্য বিশিষ্ট বিবিধ প্রস্তর সামগ্রী বিক্রয়ার্থে আনিয়া মন ভুলাইতে লাগিল। সেই সকল সুন্দরতর শিল্পকার্য্য দেখিয়া মন আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যায়। তবে তাহার অসম্ভব মূল্য শুনিয়া হর্ষ বিষাদে পরিণত হইয়া থাকে। ধর্ম্মভয়-বিরহিত বিক্রেতাগণ সর্ব্বত্রই সমান। সেই বিক্রেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি বুদ্ধিমান্। তাহারা বিক্রীত দ্রব্যের সহিত অনেক বড় লোকের নামও মস্তকে বহন করে এবং বাঙ্গালী দেখিলে তাহা বিজয় নিশান স্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকে। তাহাদিগের সেই পণ্য দ্রব্যের অংশ রূপ নামাবলীর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের নাম দেখিলাম। কিন্তু তাহাতে দাম করিয়া দ্রব্য ক্রয়ের কোনই সুবিধা হইল না। তখন ভাবিলাম, “স্বদেশীয় (এন্টিকোয়েরিয়ান) পণ্ডিত ব্যক্তির নামে বিদেশে সুলভ মূল্যে কিছু পাওয়া যায় না, বরং বড় লোকের রেটে গরিবরা অনেক সময় মারা যায়।” দূর প্রবাসে স্বজাতির পণ্ডিত ব্যক্তির অপরিচিত নিদর্শন হস্তাক্ষর দেখিয়া, সত্যই বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাহা দেখাইয়া যে বিক্রেতাগণ আমাদিগকে ঠকাইতে পারে নাই, সে জন্য এখনও সন্তুষ্ট আছি। আমরা আহারান্তে সেই দিনই আগ্রানগরী, তাজ এবং যমুনার শোভা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম।

অগ্রবন।

(আগ্রা)

অগ্রবন মোগল বাদসাহদিগের সময়ের মহা সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ও হিন্দুদিগের একটী তীর্থ, মথুরা বৃন্দাবনের চৌষট্টি ক্রোশের মধ্যে যে সকল স্থান আছে, সে সমুদায় তীর্থ মধ্যে পরিগণিত এবং তাহাদের অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই আগ্রার প্রাচীন

গ্রাম অগ্রবন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এখানেও বিহার করেন, তাহাতেই তীর্থযাত্রী বৈষ্ণবগণ রীতিমত পূর্ব্বে অগ্রবন পরিদর্শন ও যমুনায় স্নানাদি করিয়া শেষে মথুরা বৃন্দাবন যায়। আমরা তীর্থ-যাত্রী না হইলেও, আগে অগ্রবন দর্শন করি, তবে যমুনায় স্নান করিবার সৌভাগ্য আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

যমুনার তীরোপরি সৌষ্ঠবময়ী শ্রীসম্পন্না "সুন্দরীতরা" প্রস্ফুটিতা নগরী আগ্রা আলেখ্যবৎ বিরাজিতা। তাহার অতুলনীয় "ধবল সৌধছবি" নীল সলিলে আপনার মুখ আপনি দেখিয়া দেখিয়া যেন প্রতিবার মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সেই প্রতিবিম্বিত রূপরাশি "মরি মরি কোন বিধাতা গড়িয়াছিলরে।" দর্শকের চিত্তমুগ্ধকর সে শোভার কথা কিরূপে ভাষায় প্রকাশ করিব?

অসংখ্য জনস্রোত আগ্রার বৃহৎ প্রস্তরময় রাজপথে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বিরাম নাই, কেবলি কলরব ও মনুষ্যমস্তক শুনিবে এবং দেখিবে মাত্র। সেই কঠিন শিলাময় ধূলিরঞ্জিত রাজবর্ত্মে পদব্রজে বাহির হওয়া সুখকর ব্যাপার বোধ হয় না।

আগ্রার বিপণীগুলি পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত এবং প্রস্তরের কারুকার্য্যে দোকান সকল নয়ন-প্রীতিকর। পথিকগণ রাজপথে চলিতে চলিতে অনেক সময় অনন্যমনে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া যায় ও তাহা দেখিয়া যেন পথক্লান্তি দূর করিয়া থাকে।

তাজ।

যখন অস্তগামী অংশুমালীর কনককিরণে পশ্চিমাকাশ অনুরঞ্জিত, সেই হৈম রশ্মিকণা যমুনার নীলবক্ষে মৃদুল তরঙ্গে কখন ভাসিয়া, কখন ডুবিয়া জলক্রীড়া করিতেছিল, যমুনা-হৃদয়ে সেই কিরণমালার লুকোচুরী খেলা—শোভার মাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখিতে দেখিতে দিবাবসানে আমরাও তাজমহলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ইতিহাসে ও বন্ধু প্রমুখাৎ আশৈশব শ্রবণ করিয়া এবং কল্পনা নেত্রে নির্জ্জনে কখন কখন দেখিয়া তাজমহল যেন আমার চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছিল। সেই কল্পনা-জাত মানসচিত্র তাজমহল, এখন আবার তাহার সেই অপূর্ব্বশরীরী মাধুরীময় ছবি, সেই সর্ব্বজন-মনোমোহন মূর্ত্তি চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত হেরিয়া হৃদয় কেমন যে হইয়া গেল, সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ আমি স্তম্ভিত ও অবাক হইয়া গেলাম এবং মুহূর্ত্ত মাত্র শূন্য দৃষ্টিতে সেই অনন্ত শোভাপূর্ণ অমরাবতী সম প্রণয়-সমাধি সৌধের কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আত্মহারা হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলাম। সে স্মৃতিময় চিন্তা শৈশবের সুখসপ্নের মত অস্ফুট নহে। প্রকৃত প্রণয়ের প্রথম দৃষ্টির ন্যায় তাহা মধুময়, প্রিয়তমের প্রেম-সম্ভাষণের ন্যায় তাহা প্রাণস্পর্শকর, ললিত সঙ্গীত অনুভবে আজিও তাহা হৃদয়ে সজীবতা আনিয়া দেয়। সে স্মৃতি ভুলিবার নহে। পৃথিবীতে "সাতটী আশ্চর্য্য দ্রব্য" আছে, আমার ভাগ্যে অন্য গুলির দর্শন না ঘটিলেও, তাজমহলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে যেন ইচ্ছা করে। কঠিন প্রস্তরে ললিত সঙ্গীত, ভাবুক জনহৃদয়ে আশার হাস্য, প্রণয়ের স্বপ্নময় সুখদ সম্মিলন এবং শিল্পের চরমোৎকর্ষ অপূর্ব্ব শিল্পার একত্র সন্নিবেশিত

দেখিয়া, কে না ক্ষণকালের নিমিত্ত, এই রোগ শোক দুঃখ বিজড়িত পার্থিব জগৎ এবং মনুষ্যজীবনের গত নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইবে ?

মৃতপত্নীর প্রণয়-স্মৃতি ইহ জগতে চির-স্থায়ী করিবার জন্য এই অমূল্য, অতুলনীয় তাজ (সমাধি) নির্ম্মিত হইয়াছে। অপরিমিত অর্থ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিল্পের চরমোৎকর্ষ ইহাতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। তীর্থস্থানে কোন মহাপুরুষ কিম্বা কোন দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত পর্ব্বদিনে যেমন জনসমাগম হইয়া থাকে, তেমনি প্রতিদিন প্রদোষে এই অমর সমাধি দর্শনার্থে অগণ্য লোক একত্র দেখিতে পাওয়া যায় ও বারেক মাত্র সকলে যেন ইহার শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক জ্ঞান করে। প্রদীপ্ত চন্দ্রালোকে তাজ দেখিতে আরো মনোহর।

তাজমহলের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া জনৈক ইংরাজ মহিলা একটী কবিতায় লিখিয়াছিলেন যে, "তুমি নারী কুলে ভাগ্যবতী, তাই এই স্বর্গীয় রশ্মিমালা-বিনির্ম্মিত তাজ তোমার সমাধিমন্দির, তুমিই পতি-সোহাগিনী, তোমার ন্যায় ভাগ্য এজগতে কাহার আর ?" কিন্তু আমি তাজ দেখিয়া এত যে মোহিত হইয়াছিলাম, স্বর্গের স্বাপ্নিক মাধুরী যেন প্রস্তরে বিকশিত দেখিলাম বোধ হইল,—তথাচ আমি মনে করি, প্রকৃত অকৃত্রিম অপার্থিব পবিত্র প্রণয় এই সুন্দর মহান সমাধি-সৌধ তাজ অপেক্ষা সুন্দরতর, মহত্ত্বতর ও অনন্ত সজীব। প্রকৃত এবং অমর প্রণয়ের গৌরবে অযুত অযুত তাজ নিমগ্ন ও বিলীন হইয়া যায়। যে প্রণয়ে নাস্তিক হৃদয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও পরলোকে বিশ্বাস, ব্রাহ্মে পৌত্তলিকতা এবং ইহ জীবনেই অনন্ত অক্ষয় জীবন্ত স্বর্গ আনয়ন করে ও যে প্রেমে দুই পৃথক আত্মা একত্রীভূত হইয়া পরমাত্মাতে শেষে সম্মিলিত হয়, ও একের অস্তিত্বে অন্য জীবন ধারণ করে, সে প্রণয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোন পার্থিব সমাধির যে প্রয়োজন আছে, আমি ত তাহা বুঝিতে পারি না। এক জনের মৃত্যুতে অন্য একজন জীবিত, ইহ-লোকেই যাহার জীবন্ত সমাধি হইয়া থাকে, সেই অপার্থিব প্রেমের অবিনশ্বর সমাধির স্থান এ অনন্ত বিভব নহে। তাজমহল স্বরূপ অলৌকিক সমাধিমন্দির দেখিয়াও তাহার অভ্যন্তরে চিরনিদ্রিতা সাজাহান প্রেয়সী মহিষীকে "নারীকুলে ভাগ্যবতী" কিম্বা "পতি সোহাগিনী" বলিয়া আমি মনে করি না।

তাজ দেখিয়া অনেক ইংরাজ ভ্রমণ-কারী নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়া-ছেন, সে সকল এস্থলে উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই—কিন্তু কিছুদিন হইল একজন ইংরাজ, Statesman পত্রিকায় ঐ বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব ও সার আছে এবং আমি তাঁহার মত সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

সাজাহান আপন সুন্দরী প্রিয়তমা রমণীর সমাধিহর্ম্ম্যে অগণ্য অর্থ ঐ প্রকারে ব্যয় না করিয়া, যদি তাহার স্মরণার্থে, তাঁহার নামে কোন পতিতাশ্রম, পান্থশালা কিম্বা কোন শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া যাইতেন, তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তিময় উপকার জগতে যেমন চিরস্থায়ী ও স্মরণীয় হইত, ইহাতে সে প্রকার কিছু হয় নাই। কখন কোন

পথিক দর্শক, অথবা কোন ভ্রমণকারী একদিন মাত্র তাজ দেখিয়া যে সুখ পায়, তাহা অকিঞ্চিৎকর! তাজমহলের দ্বারা সংসারের অন্য কোনই উপকার দেখি না। ইহাকে হৃদয়বিহীন সুন্দর সজ্জিত পাষাণময়ী দেব প্রতিমার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, কারণ, বাহিরে তাহার অতুলনীয় শোভাময় হেম কিরণবৎ মাধুরী ঝরিয়া পড়িতেছে যেন দেখিয়া মনে হয়, অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিতে সাহস হয় না,বোধ হয় যেন মনুষ্যের কর স্পর্শে তাহার দেবত্ব, কমনীয় কান্তি মলিন হইয়া যাইবে, "ছুঁইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে" ভাবিয়া কোমল স্নেহের করেও স্পর্শ করিতে প্রাণে কেমন ব্যথা লাগে, কিন্তু তাহার হৃদয় মাঝারে মৃত শরীর সমাধি-শয্যায় প্রোথিত রহিয়াছে, ভাবিলে, কল্পনায়ও মন বিষণ্ণ হইয়া যায়। বাহিরের চাকচিক্যে ভিতরের মলিনতা দূর হয় না। অমিশ্রিত পবিত্রতা অতীব উপাদেয় এবং অপার্থিব।

তাজমহলের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় মুসলমানগণ জুতা পরিহার করিতে বারম্বার অনুরোধ করে এবং কখন বা দীন হীন দেখিলে কিছু কর্কশতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু শ্বেতপদের সর্ব্বত্র সমান সম্মান ও অধিকার, মানবের সমাধি-মন্দির-প্রবেশে দেবজাতি পাদুকা ত্যাগ করিবে কেন? এই পাদুকা রহস্য অবলম্বন করিয়া সেই স্থানীয় মুসলমানেরা বিষণ্ণ ভাবে যাহা বলে, তাহার অর্থ,—

"বৃটিশ সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী—
জাহাজী গৌরাঙ্গ কিবা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজি সবারে।"

তাজমহল, তাহার সম্মুখস্থ রমণীয় পুষ্পোদ্যান এবং তাহার হৃদয়ে কৃত্রিম উৎস একে একে নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিয়া পরিশেষে আমরা সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে মন্দির ইসলামদৌলা (ইহার প্রকৃত উচ্চারণ আমি জানি না, সেখানে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিলাম) গিয়া পৌঁছিলাম। এই রম্য হর্ম্ম্যের প্রস্তরময় ভিত্তি যমুনা-বক্ষে প্রোথিত। আগ্রার সৌধমালার প্রত্যেকটীর এমন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য আছে যে, তাহার কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী দেখিব, তাহা অনুমান করা যায় না। বাদসাগণ এই ইসলামদৌলার প্রশস্ত উচ্চ প্রোথিত প্রাঙ্গণে বসিয়া প্রদোষে যমুনার জলক্রীড়া দর্শন করিতেন। সেই অনৈসর্গিক রূপরাশি যমুনা, যখনি দেখা যায় তখনি মন আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া থাকে, বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যময়ী নীলবর্ণা যমুনা বর্ষাকালে যখন পূর্ণাঙ্গিনী হইয়া রূপভরে উছলিয়া পড়ে, তৎকালে তাহার সেই তরঙ্গায়িত পূর্ণ মাধুরী কল্পনাতীত শোভা ধারণ করে। অতীতের সাক্ষী-রূপিণী "লীলাময়ী যমুনার তরঙ্গ" নিচয় দর্শন করিয়া অনেক বিষাদময়ী চিন্তার আঘাত আমার হৃদয়ে লাগিয়াছিল।

উৎসব দিবাবসানে, প্রিয়জন প্রবাস-গমনে, বিজয়াদশমীর দিনে, নির্জ্জন গৃহে একক নিশীথে হৃদয় যেমন এক প্রকার অবসাদ ও পরিত্যক্ত ভাবে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যায় ও সুখময় ভূত স্মৃতি কেবল মাত্র শূন্যতা আনয়ন করে,

যমুনার তীর ছাড়িয়া আমার মনও সেই প্রকার কেমন এক অবসন্ন ভাবে বিষাদে ডুবিয়া গিয়াছিল। অশান্তির স্বপ্নময় ভাঙ্গাভাঙ্গা নিদ্রায় দীর্ঘ রজনী অতিবাহিত করিলাম। সুখ দুঃখ উভয়ই সমানে চলিয়া যায়, তাহার স্মৃতিমাত্র আমরা আজীবন অন্তরে বহন করি। এস্মৃতিও চিরদিন আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বিরহ।

ফিরে ত চায় না—যে চ'লে যায়,
আমরা করি শুধু হায় হায়!
স্মৃতির আলো ধরি
আঁধারে খুঁজে মরি,
আলোকে সে আঁধার বেড়ে যায়—
আমরা আরো কাঁদি—ডাকি তায়!

আমরা কোথা যাব ভুলে যাই,
কেবলি ভাবি ব'সে কে যে নাই।
তাহারি তরে ধরা
ছিল তো সুখ-ভরা
নিয়ত পড়ে মনে এ কথাই—
আমরা কোথা যাব ভুলে যাই!

নয়নে ঝরে বারি অবিরল,
পশিতে চাহি শুধু রসাতল।
আকাশে দেখি চেয়ে
মিশা'ল কোথা যেয়ে,
কোথা গে জুড়াইল সে অনল—
পশিতে চাহি শুধু রসাতল!

বিরহে বেড়ে উঠে ঘুম-ঘোর,
পরাণ টানে তারি মায়া-ডোর।
তবুও ঘুমে প্রাণ
হয় না অবসান,
বিরহ-নিশি করি জেগে ভোর—
পরাণ টানে তারি মায়া ডোর!

এমনি মনে হয় নিশিদিন,
সে বিনে প্রাণ যেন প্রাণহীন।
জগতে যত গান,
জগতে যত প্রাণ,
সকলি তারি কাছে করা ঋণ—
সে বিনে প্রাণ যেন প্রাণহীন!

ফুটিত ফুল-কুল বন মাঝ,
সে সব শুধু যেন তারি কাজ।
কেবলি ধরাতলে
সে যেন ছিল ব'লে
আসিত উষা পরি হেম-সাজ—
সে সব শুধু যেন তারি কাজ!

আজি সে নাই—মোর ধরা'পর
হাসে না তাই যেন রবি-কর।
ফোটে না বনে ফুল,
গাহেনা পাখীকুল,
কাতর দুখ-শোকে চরাচর—
হাসে না তাই যেন রবি-কর!

এমনি ক'রে কাল ব'য়ে যায়,
আমরা করি শুধু হায় হায়!
গভীর বিভাবরী
বিরহে জেগে মরি,

আঁধারে ঘুরে মরি ডেকে তায়—
ফিরে ত চায় না—যে চ'লে যায়!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। *

যোগ।

জীবনের আদি অন্ত কি হবে জানিয়া!
অনন্ত আকাশে প্রাণ দেও মিলাইয়া।
নীরব হৃদয়-তন্ত্রে দেওরে ঝঙ্কার,
ছুটুক আনন্দ-উৎস গরাসি আঁধার।
ভাসিয়া তরঙ্গ-স্রোতে আবর্ত্তের প্রায়
যাও চলি, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, সাগর সীমায়।
আপনি আপন তেজে হওরে উজ্জ্বল,
পদ্মপর্ণ মাঝে যথা বরিষার জল।
নিরখহ প্রতিবিম্ব সচ্ছ চিদাকাশে
অসীম ব্রহ্মাণ্ড স্ফূর্ত্তি যাঁহার বিকাশে।
সায়াহ্ন, প্রভাত, গ্রহ, নক্ষত্র—মণ্ডল,
প্রকৃতির নবলীলা নিত্য সচঞ্চল।
ভাঙ্গিয়া মায়ার গ্রন্থি অবিদ্যাসংশয়
প্রকৃতির প্রাণে প্রাণ হয়ে যাক্ লয়।
হৃদে ধৈর্য্য, মুখে শান্তি, প্রজ্ঞা অবিচল,
উপরে সচ্চিদানন্দ পরম মঙ্গল।

শ্রীরেবতী মোহন রায় মৌলিক।

মান।

কি হবে বলিয়া তায়?
সে যদি না বুঝে নয়নে নয়নে,
কি হবে বলিয়া তায়?
যা কিছু সুন্দর দেখেছি নয়নে
গহন কন্দরে গিরি বনে বনে,
তাইত দেখাতে চেয়েছি তায়।
যা কিছু মানসে ফুটেছে কুসুম
তাইত দেখাতে চেয়েছি তায়,
যা কিছু বেদনা বেজেছে মরমে
তাইত শুনাতে চেয়েছি তায়,
ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে অশনি নিপাতে—
দরিদ্র কুটীরে রাজার প্রাসাদে—
সম্পদে বিপদে প্রদোষ প্রভাতে—
আমি ত স্মরণ করিছি তায়!

সেই মুখ খানি নয়নে নয়নে,
সেই হাসি ফুটে অচলে গহনে,
সেই সুধাস্বর সতত শ্রবণে—
দেখেছি শুনেছি সদাই তায়।
পরাণ পূরিত সৌরভে তাহার,
অফুর নির্ঝর কবি কল্পনার—
সেই বীণা সেই মুরলি আমার—
সেই বন মালা সেই মতীহার—

সকলি সকলি সকলি সেই;
সে না চাহে মোরে আমিত তাহার!
আমিত পূজিব দিয়া প্রেমহার,
অমৃতের রাশি হৃদি ফুল ভার
প্রাণের দেবতা আমার সেই,
সেই সুধাসর পাষাণী আমার,
ছায়া মাথা আশা আমার সেই;
সে যদি না চাহে না চাহুক মোরে,
সে যদি না ভাবে না ভাবুক মোরে,
আমি না ভুলিব তায়।

অনেক ফুটেছি আর ফুটিবনা,—
মরমের কথা আর ফুটিব না;—
গোপনে গোপনে পূজিব তায়।
দেবতা আকাশে ঋষি বনবাসে
তামুলকান্তরে কমলিনী হাসে,

---

* গত বারে যে নবকৃষ্ণ বাবুর গদ্যটী প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি এ নবকৃষ্ণ বাবু নহেন। আমরা দেখিতেছি, দুই জন নবকৃষ্ণ বাবু সরস কবিতা লিখিতেছেন। উভয়ের মঙ্গলের জন্য, উভয়ের নামের শেষে কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত মনে করি। ন, ভা।

সতী কি ভুলিবে পতি পরবাসে
আমি কি ভুলিব তায় ?
এতেও যদি সে না চিনে আমায়,
কি হবে বলিয়া তায় ?

শ্রীপ্রেম দাস বৈরাগী।

আছি ভাল।

১

প্রাণের জ্বালায় জ্বলি ছাড়ি লোকালয়,
বিজন গহন বনে, প্রবেশিনু সঙ্গোপনে
সঙ্গে লয়ে সঙ্গী মাত্র এ দগ্ধ হৃদয়।
ভেবেছিনু মনে মনে, বন বিহঙ্গের গানে
কোমল কুসুম-স্পর্শে জুড়াব জীবন,
কিন্তু হায় শুষ্ক প্রাণে, চাহিলাম যার পানে
অমনি হইল তার মলিন বদন।

২

দৃষ্টিতে মলিন হলো প্রকৃতির কায়া,
শুকাল সরসী জল, ঝরিল মুকুল দল,
জগৎ ঢাকিল উষ্ণ-অন্ধকার ছায়া।
বিহগের কণ্ঠরব, নীরস কর্কশ সব,
শীতলতা নাহি আর মলয় বাতাসে,
শুকা'ল ফুলের মধু, শুকা'ল গোলাপ বধূ
উত্তপ্ত-পরশে মম নিরাশ-নিশ্বাসে।

৩

রস শূন্য চরাচর ; কিরণের ছলে
গগণের শশীতারা, ঢালিছে বিষেরধারা,
দেহ ভাঙে ভাজে প্রাণ অলক্ষ্য-অনলে,
চারিদিকে ভস্মরাশি, ফুটেনা একটী হাসি,
জ্বলন্ত যন্ত্রণা আসি বিঁধিছে নয়নে,
দাব দগ্ধ বনে যেন, দাহ শেষ-অগ্নি হেন
আপনি জ্বলিতেছিনু আপনার মনে।

৪

হেন কালে অকস্মাৎ একি আচম্বিতে !
মলয় পবনে উঠি, কে যেন আইল ছুটি,
হাসিল কানন ঘন-রূপের জ্যোতিতে,
কুজরিল পাখীকুল,সৌরভে পূরিল ফুল,
দগধ রসালে মরি মুকুল ধরিল,
প্রস্ফুটিল ছিন্ন কলি, গুঞ্জরিল মৃত অলি,
অভাগার মৃত প্রাণ সেও শিহরিল !

৫

অর্দ্ধ মুগ্ধ চেয়ে আছি সে মূরতি পানে,
কেগো দেবি প্রভাময়, নিশ্বাসে সৌরভ বয়
জুড়াইলে অভাগার এ দগ্ধ পরাণে ?
দেখি অভাগার দুখ, মুছাতে মলিন মুখ
দয়া করি এসেছ কি দয়াময়ী সতি ?
নতুবা বিজন বনে, অভাগা কাঁদে গোপনে
স্বর্গ ত্যজি এ নিশীথে হেথা কেন গতি ?

৬

কে তুমি পূরিলে বন স্বর্গীয় আলোকে ?
ঝলসিল আঁখি তারা, হইল পলক হারা,
চপলা চমক জিনি রূপের ঝলকে ;
এসোনা এদিকে সতি, পবিত্র তব মূরতি
হইবে মলিন, স্পর্শে অভাগার কায়,
ফুরাইবে চারু হাসি, ম্লান হবে রূপ রাশি
স্বর্গের জ্যোতিও নিবে পাপীর ছায়ায়।

৭

বলিতে বলিতে একি ! মোহ না স্বপন ?
হাসিয়া অমিয়া হাসি,ছড়ায়ে কৌমুদী রাশি
অভাগারে বক্ষে ধরি দিলে আলিঙ্গন !
কি হইল কি হইল, দগ্ধ প্রাণ জুড়াইল,
অমিয়া পরশে আহা প্রাণ শিহরিল,
একটী চুম্বন দিয়া, সব জ্বালা ঘুচাইয়া
শত ভগ্ন-হৃদয়ের গ্রন্থি বেঁধে দিল।

৮

কি মদিরা ঢেলে দিল অধরে অধরে,
শিরায় শিরায় ধায়, চপলার গতিপ্রায়,
পলকে পলকে ঘন শরীর শিহরে,
কি তীব্র মদিরা ধারা,প্রাণ হলো দিশাহারা
ভুল হলো সুখ দুখ জ্ঞান মান [illegible],

ডুবে গেল বিশ্ব সৃষ্টি, নেত্র হারাইল দৃষ্টি,
বুঝিতে নারিনু হায় কিবা রাত্র দিন।

৯

সে মদিরা সুধাময় মৃত সঞ্জীবন,
দগ্ধ অস্থি কুড়াইয়া, ভাঙ্গা প্রাণ জোড়াইয়া,
শ্মশানের ভস্ম নিয়া গড়িল জীবন!
সে জীবন সুধাময়, পার্থিব কিছুই নয়,
প্রাণ জোড়া প্রাণ সে যে কেমন গঠন,
দেখিলে সন্দেহ হয়, এ প্রাণ সে প্রাণ নয়,
এই আমি, আমি কিনা ভুলে যায় মন।

১০

লুকাইয়া মাথা তার হৃদয় মাঝারে,
ডুবিনু সে রূপ মাঝে, হৃদয়ের বীণা বাজে
সুধার তরঙ্গাঘাতে, প্রেমের সঞ্চারে,
সে রবে ভুলেছে প্রাণ,হারায়েছি অন্য জ্ঞান,
আপনারে হারায়েছি খুঁজিয়া না পাই,
যে অবধি অনুক্ষণ, সেরূপে মজেছে মন,
সে অবধি আছি ভাল সুখ দুঃখ নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

জন লক।

ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে জন লকের নাম অদ্বিতীয়। লক কেবল ইংলণ্ডে নহে, সমগ্র ইউরোপে একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। লক কেবল দর্শন শাস্ত্রে নহে, রাজনীতিতেও সাতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকানেক পণ্ডিতদিগের ন্যায় কেবল গ্রন্থকীট ছিলেন না, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া যখন যে বিষয়ে সুবিধা পাইয়াছেন, তখন সে বিষয়ে মৌলিক চিন্তা করিয়া মানবজাতির অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল চিন্তা করিয়া কিম্বা গ্রন্থাদি লিখিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া যান নাই, তিনি আবার তাঁহার সময়ের প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্য্য সমূহে যোগ দান করিয়া উদার নীতির পক্ষ সমর্থন করিতেন। শৈশব হইতেই তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্ষীণ ছিল; কিন্তু অস্বাস্থ্যকে জীবনের সহচর রূপে পাইয়াও তিনি সত্যকে ভুলিয়া থাকেন নাই। সত্যই তাঁহার নিকট এক মাত্র আদরের ধন ছিল; সত্য,—বিশেষতঃ তাহার যে অংশটুকু মনুষ্যের আশু উপকারে আসিতে পারে, তাহা তিনি তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা করেন; তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়া থাকুন না কেন, কখনও তিনি সত্যের অনুসরণে বিরত হয়েন নাই। যাহারা শুধু কথাতে নহে, কার্য্যে এরূপ করিতে পারে, যাহারা সংসারের মোহ মায়া কাটাইয়া সত্যের অনুশীলনে জীবন দান করিতে পারে, তাহাদিগকেই আমরা প্রকৃত মহৎ লোক বলি। লক যে একজন বাস্তবিক মহান্ পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। দুঃখের বিষয়,আমাদিগের বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট লকের নাম একরূপ অজ্ঞাত রহিয়াছে। আমরা এই অভাব দূরীকরণার্থে এস্থলে লকের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। জীবনী শেষ হইলে লকের দার্শনিক, নৈতিক, ও রাজনৈতিক মতগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা

করিব। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, অধ্যাপক টমাস ফাউলার মহোদয় লকের যে জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে তাহা অবলম্বন করিয়াই এই প্রবন্ধের জীবনী অংশটী রচিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সমারসেটশায়ার বিভাগের উত্তরাংশে রিংটন নামে এক পল্লীগ্রাম আছে। তথায় ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে জন লকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ব্রিষ্টল নগরের অনতিদূরে পেন্সফোর্ড নামক পল্লীতে বাস করিতেন। এই স্থানেই লকের শৈশবের প্রথম ভাগ অতিবাহিত হয়। অল্প বয়সেই লকের মাতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং লকের চরিত্র গঠন অনেকাংশে তাঁহার জনকের উপরই নির্ভর করিয়াছিল। লকের পিতার নামও জন লক ছিল; ওকালতী ইহার ব্যবসায় ছিল এবং ইঁহার পৈত্রিক সম্পত্তিও মন্দ ছিল না। লকের কথা মতে তাঁহার পিতা একজন গুণবান্ লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। লক বলেন, তাঁহার পিতা প্রথমত তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে শাসনে রাখিতেন, পরে যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এমন কি, লকের শৈশবকালে তাঁহাকে এক দিন প্রহার করিয়াছিলেন বলিয়া, পরে লক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পিতা তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান বিশিষ্ট পিতার যে এরূপ গুণধর পুত্র হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। লক যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, সে সময় ইংলণ্ডে রাজায় প্রজায় এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের অনেকগুলি সদ্‌গুণ ছিল, কিন্তু ইতিহাস লেখকদিগের কথা সত্য হইলে তাঁহার দোষও অনেক ছিল। এই সকল দোষের মধ্যে কথা ভঙ্গ করাই সর্ব্ব প্রধান দোষ। এই জন্য তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, এবং ইহার জন্য তিনি প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত সহ্য করিলেন। তিনি অদ্য যে কথা বলিতেন। কল্য আবার ঠিক তাহার বিপরীত করিতেন; সামান্য লোকে এরূপ করিলেও লোকের ক্ষতি হয়, কিন্তু রাজা এরূপ করিলে সমাজের শান্তি ভঙ্গ হয়। চার্লসের অবিচার ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ইংলণ্ডের সাধারণ অধিবাসীগণ তাঁহার বিপক্ষ হইয়া পড়িল। কেবল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ (যাঁহারা তৎকালে রাজার পারিষদের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন) রাজার পক্ষে থাকিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সাধারণ পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সাধারণ প্রজাদিগের প্রতিভূগণ পার্লেমেণ্ট মহা সভার হাউস্ অব কমন্‌স্ নামক বিভাগের সভ্য ছিলেন; ইঁহারা এক্ষণে রাজার বিপক্ষে বদ্ধপরিকর হইলেন। লকের পিতা সাধারণ লোকের পক্ষে ছিলেন; এবং সংগ্রামের সময় তজ্জন্য তাঁহার যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতার নিমিত্ত ক্ষতি স্বীকার করিয়া তিনি যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখান, তদ্দ্বারা তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে নৈতিক বলের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। লকের শৈশবকালে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে স্থূলতঃ লিখিত হইতেছে। যাঁহারা ইংরেজ জাতির ইতিহাস কিছু মাত্র

অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, যদিচ ইংরেজদিগকে পুরাকালীন কোন এক জাতি বিশেষ হইতে উদ্ভূত বলা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহাদিগের ধমনীতে সেলটিক, রোমান, সাক্সন, এঙ্গলিক, ডেনিশ, নর্ম্মাণ ইত্যাদি অনেক জাতির রক্ত প্রবাহিত আছে, তথাপি মোটামুটি এরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা প্রধানতঃ এঙ্গলো সাকসন নামক এক জর্ম্মানি দেশীয় জাতি হইতে উদ্ভূত। এই জাতির এক বিশেষ লক্ষণ স্বাধীনতাপ্রিয়তা। আমাদিগের দেশে যেরূপ একসময় গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়িত প্রথা ছিল, এই জাতিরও সেইরূপ একটী সভা থাকিত। ইহারা যেখানে বাস করিত, সেখানে একটী পঞ্চায়িত সংস্থাপন করিত; ফলতঃ আমরা এক্ষণে স্বায়ত্ত শাসন লইয়া যে একটী রব তুলিয়াছি, তাহা এই ঊনবিংশ শতাব্দির গঠিত কোন একটী নূতন শিল্পচাতুর্য্য নহে। পুরাকালে প্রায় সমুদায় আর্য্যবংশীয় জাতিদিগেরই স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীতে রাজ কার্য্য সম্পাদিত হইত;—রাজা কখনও খামখেয়ালি করিতে পারিতেন না, তিনি বাস্তবিকই রাজা ছিলেন, প্রজাগণের তিনি ভক্ষক ছিলেন না। ইংরেজ জাতির আদিপুরুষেরা নানা অবস্থায় নানা কষ্টে পড়িয়াও স্বায়ত্তশাসন প্রণালী দেশের মধ্যে রক্ষা করিয়া যান। পূর্ব্বে যে হাউস অব কমন্সের কথা বলা হইয়াছে, কালক্রমে ঐ সভা সংস্থাপিত হইল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে জন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রতি ভদ্রাভদ্র সমুদয় প্রজা বিরক্ত হইয়া এক দিন তাহাকে এক জাতীয় স্বাধীনতা সনদ স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল—সেই দিন হইতে ক্রমান্বয়ে ইংরেজজাতির স্বাধীনতার পথ উত্তরোত্তর পরিষ্কার হইতে লাগিল;—ক্রমে ক্রমে সাধারণ প্রজাদিগের মুখপাত্র হাউস অব কমন্স দেশের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িলেন। রাজা অর্থব্যতীত রাজত্ব করিতে পারেন না, অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে কর আদায়ের প্রয়োজন হয়; অথচ হাউস অব কমন্স এতই প্রবল হইয়া পড়িল যে, কর সংস্থাপনের ক্ষমতা আর রাজার হাতে থাকিলনা, হাউস অব কমন্সের সম্মতি ব্যতীত কোন কার্য্য করিলে তাহা বিধিমত হইবে না, ইংলণ্ডের এক রাজার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হইল। কয়েক শতাব্দী হাউস অব কমন্স এই তহবিলদারি পাইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন, রাজাই সেনাবিভাগের একাধীশ্বর থাকিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি সৈনিক বল দ্বারা হাউস অব কমন্সকে নত করিতে পারিতেন, কিন্তু সেরূপ করিলে দেশের লোক চটিয়া যাইবে, এই ভয়ে বিরত থাকিতেন। যাহা হউক, কাল ক্রমে প্রথম চার্লস জগতের কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার নিতান্ত দুর্ম্মতি ঘটিল এবং সেই জন্য তিনি স্বাধীন ইংলণ্ডকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে অভিলাষী হইলেন। একদিন তিনি সেনা বল সহকারে হঠাৎ হাউস অব কমন্সে উপস্থিত হইলেন;—কেন? তাঁহার বিরাগের পাত্র পাঁচজন সভ্যকে ধরিবার নিমিত্ত। এই পাঁচ জন সভ্য যদি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিও হইত, তথাপি তাহারা জাতীয় প্রতিনিধি, অতএব তাহাদিগকে ধরিবার ক্ষমতা নাই; রাজার এক হাউস অব কমন্সই কেবল তাহাদিগকে বন্দী করিতে সমর্থ। চার্লসের দুর্ভাগ্য বলতঃ তিনি

ঐরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে উদ্যত হইলেন; ইংরেজ জাতির স্বাধীনতার মন্দিরে দাসত্বের ধ্বজা আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বেই উক্ত পাঁচজন সভ্য হাউস পরিত্যাগ করিয়া যান, সুতরাং রাজা তাঁহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। যাহা হউক, যে মুহূর্ত্তে এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, সেই মুহূর্ত্তে ইংলণ্ডে এক তুমুল কাণ্ড বাধিল। ইংলণ্ডের প্রজাগণ রাজার অত্যাচারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িল; তিনি কয়েকবার বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য করিয়াছিলেন, এই শেষবার। এক্ষণ হইতেই তাঁহার জীবনের লীলা নিঃশেষ হইয়া আসিল; আর কিছুকাল পরেই প্রজাগণ তাঁহাকে বধ করিল। কিন্তু তিনি দেশ মধ্যে যে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া যান, তাহা ১৬৪২ অব্দ হইতে ১৬৬০ অব্দ পর্য্যন্ত জ্বলিতে থাকিল—ইংলণ্ডের অবস্থা যে তাহাতে অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। রাজার হস্তে সৈনিক বিভাগের আধিপত্য থাকিলে কি ভয়ানক ক্ষতি হইতে পারে, তাহা প্রথম চার্লসের ব্যবহারে লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। হাউস অব কমন্‌স্ আর তহবিলদারিতে সন্তুষ্ট থাকিলেন না, সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃত্বও অধিকার করিতে ব্যগ্র হইলেন; অথচ যখন অষ্টাদশ বৎসর সংগ্রামের পর প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস্ স্বদেশে আহুত হইয়া সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন, তখন এ বিষয়ের কোন মীমাংসা করা হইল না। রাজায় প্রজায় এই সংগ্রাম যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন, হালামের মতে উভয় পক্ষেরই এক দোষ ছিল যে, কোন সৎ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কোন পক্ষেই সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দান করিতে পারা একরূপ অসম্ভব ছিল। একদিকে, রাজা যে পার্লেমেণ্ট মহাসভার সমুদয় সত্ত্ব যে কোন উপায়ে গ্রাস করিয়া স্বয়ং সর্ব্বে সর্ব্বা হইতে অভিলাষী ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না; ইহার অন্যান্য অনেক প্রমাণ ছাড়া এক প্রমাণ এই যে, তিনি তাঁহার রাণীকে সমুদয় রাজকীয় মণি মুক্তাদির সহিত দেশের বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ বিদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অপর পক্ষে, হাউস্ অব্ কমন্‌স্‌ও এক্ষণে বিবাদোন্মত্ত হইয়া নানারূপ অন্যায় ও গর্হিত কার্য্য করিতে লাগিলেন; হালাম ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্য হইতে দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি। যদি কেহ হাউসের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু মাত্র নিন্দার ভাব প্রকাশ করিত, কিম্বা যদি কেহ ইংলণ্ডের প্রচলিত ধর্ম্মে কোন নূতন রীতি প্রবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে, এরূপ কথা উঠিত, তাহা হইলে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করা হইত, যদি কেহ পূর্ব্ব প্রচলিত রাজকীয় প্রণালীর সপক্ষে যথোচিত ভাবে আবেদন করিত, কিম্বা আবেদন লিখিয়া প্রস্তুত করিত, তাহা হইলেও তাহাকে বন্দী করা হইত। এইরূপে হাউস্ অব্ কমন্‌স্ যে সব বিষয়ে পূর্ব্বে কখনও কর্ত্তৃত্ব করেন নাই, সে সবে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের যে সব অধিকার পূর্ব্বে ছিল, সে গুলিরও অপব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের এই সময় যে ভয়ানক দশা উপস্থিত হয়,

তাহা উল্লেখ করিয়াই ১৬৬০ অব্দে লক বলেন "অতি শৈশবেই আমি এক প্রবল ঝটিকার মধ্যে পতিত হই, তাহার বাত্যা প্রায় এখনও বহিতেছে।" এই সময় হাউস অব কমন্সের যে সম্প্রদায়ের লোক নেতা ছিল, তাহাদিগকে পিউরিটান বা পবিত্রকারী বলিত। পিউরিটানদিগের বৃত্তান্ত এস্থলে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার প্রয়োজন হইতেছে, কারণ তাহা না হইলে লকের চরিত্র-গঠন বুঝা যাইবে না।

ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রি ইয়োরোপের অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; সুতরাং তখনকার সমুদয় খ্রীষ্টানদিগের প্রধান আচার্য্য রোম সহরের পোপের নিকট তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। যখন জর্ম্মনি দেশে মার্টিন লুথর পোপের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তখন উক্ত হেন্‌রি পোপের পক্ষ সমর্থন করেন এবং তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতে 'ধর্ম্মের রক্ষক' এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ক্রমে হেন্‌রির মত-পরিবর্ত্তন ঘটিল; তিনি ধর্ম্ম বিষয়ে পোপের দাসত্ব খণ্ডন করিয়া স্বয়ং প্রভু হইলেন। অর্থাৎ তিনি অন্যান্য বিষয়েও যেমন দেশের কর্ত্তা ছিলেন, ধর্ম্মবিষয়েও সেই রূপ স্বয়ং কর্ত্তা হইলেন; অথচ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি পূর্ব্বের ন্যায়ই রাখিলেন। সুতরাং তাঁহার দুই প্রকার শত্রু হইল, এক যাহারা পোপের পক্ষে (রোমান কাথলিক) আর যাহারা লুথরের পক্ষে (প্রটেষ্টাণ্ট);—কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্র (ষষ্ঠ এড্‌ওয়ার্ড্‌স্) রাজসিংহাসনে উঠিলেন। তখন ধর্ম্মবিষয়ে একটী মীমাংসা করার প্রয়োজন হইল। রাজপক্ষের ইচ্ছা, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও নিয়মাবলী পূর্ব্ববৎ থাকুক, কেবল পোপের পরিবর্ত্তে রাজা কর্ত্তা হউন; প্রটেষ্টাণ্টদিগের ইচ্ছা, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও নিয়মাবলী আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করা হউক। উভয় পক্ষই কিছু কিছু দাবি ছাড়িয়া দিলেন, অবশেষে যে ধর্ম্ম প্রণালী স্থাপিত হইল, তাহার নাম চর্চ্চ অব ইংলণ্ড রাখা হইল। এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনী মেরি রাজ্যভার পাইলেন। মেরি রাণী হইয়া রোমান কাথলিকদিগের পক্ষ সমর্থন করিলেন ও প্রটেষ্টাণ্টদিগের প্রতি উৎপাত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে স্বদেশ ছাড়িয়া ইয়োরোপের মহাভূমিতে গমন করিলেন। পরে যখন তাঁহারা মেরির মৃত্যুর পর এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে ইয়োরোপের মহাভূমিস্থ প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে চলিত নিয়মাবলী স্বদেশে স্থাপন করিতে উৎসুক হইলেন—তাঁহাদিগের স্বদেশের ধর্ম্ম প্রণালী হইতে রোমান কাথলিক মতের পদ্ধতি সমূহ উঠাইয়া দিতে ব্যগ্র হইলেন। সুতরাং পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম প্রণালী (চর্চ অব ইংলণ্ড) স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তাঁহাদিগের ঐক্য হইলনা। তাঁহারা ধর্ম্ম প্রণালী পবিত্র করিবেন বলিতেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে লোকে বিদ্রূপ করিয়া পিউরিটন এই নাম দিয়াছিল। পিউরিটনরা আচার ব্যবহার প্রভৃতিতে ইহুদিগের অনুকরণ করিলেন, ইহুদি ভাষা চর্চ্চা করিতে লগিলেন, এবং ইহুদিদিগের ন্যায় ধর্ম্ম বিষয়ক বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপপ্রিয় হইয়া

উঠিলেন। সংসারকে তাঁহারা বৈরাগ্যের চক্ষে দেখিতেন। মহম্মদ যেমন কোন প্রকার চিত্র পছন্দ করিতেন না—(কারণ তাহাতে পৌত্তলিকতার সহায়তা করিতে পারে) পিউরিটনরাও সেইরূপ সর্ব্ব প্রকার চিত্রের বিরোধী ছিলেন। এই সকল দোষ সত্ত্বেও পিউরিটনদিগের মধ্যে একটী গুণ (গুণই বল বা দোষই বল,) ছিল তাহা এই, তাহারা যাহা বিশ্বাস করিত, তাহা এক মনে বিশ্বাস করিত, সুতরাং তাহাদিগের ধর্ম্মবল ছিল। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে পিউরিটনরা রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয় বিষয়েই স্বাধীনতা পাইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইল। লক বাল্যকালে এই পিউরিটন-দিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েন এবং তাঁহার এই বাল্যকালীন শিক্ষাগুণেই বোধ হয় তিনি বরাবর উদার নীতির পক্ষ সমর্থ করেন।

আন্দাজ চৌদ্দ বৎসর বয়ক্রম কালে লক ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টর স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েন এবং তথায় একটী বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ছয় বৎসরকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া তিনি অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রাইষ্ট চর্চ্চ কলেজে প্রবেশ করেন। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর—এই অল্প বয়স হইতে বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর কাল ব্যপিয়া লক প্রথমতঃ ছাত্র, পরে শিক্ষক, তাহার পরে বৃত্তিধারী ছাত্র, এই তিন অবস্থায় উক্ত ক্রাইষ্ট চর্চ্চ কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তৃতীয় অবস্থায় তিনি মাঝে মাঝে বহুদিনের জন্য বিদেশে যাইয়া থাকিতেন, কিন্তু আবার অক্‌স্‌-ফোর্ডে ফিরিয়া আসিতেন। যতদিন অক্‌স্‌ফোর্ডের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল, ততদিন অক্‌স্‌ফোর্ড তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, অর্থাৎ তিনি কিরূপ উচ্চদরের লোক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারে নাই। সংসারে সাধারণত এইরূপই হইয়া থাকে। যাহারা সংসারের উপকার করিতে আইসে, তাহা-রাই প্রায় এখানে যন্ত্রণা পায়। তবে কিনা মহৎ লোকেরা মহৎ কষ্ট পাইয়াও মেজাজ ঠিক রাখিতে পারেন, আর ক্ষুদ্র লোকেরা সেরূপ অবস্থায় মাথাহারা হয়। আমাদি-গের একজন কবি বলিয়াছেন, হিমাদ্রিই বক্ষোপরি বজ্রাঘাত সহিতে পারে, নীল-কণ্ঠই কণ্ঠদেশে সর্পাভরণ বহন করিতে পারেন। যাহা হউক, অক্‌স্‌ফোর্ডে লক শেষে কিরূপ বিড়ম্বনা পান, তাহা আগে থাকিতে বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে তাঁহার পঠদ্দশার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাউক। ওয়েষ্টমিনষ্টর স্কুলে তিনি যে ছয় বৎসর কাল বাস করেন, সে সময় যে সেখানকার শিক্ষা প্রণালীতে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। একজন এমনও বলেন যে, এই সময় ঐরূপ স্কুল সমূহের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে যে বিদ্বেষ ভাব জন্মে, তাহা তিনি বড় হইয়াও ভুলিতে পারেন নাই। লক স্বাধীনতা ভাল বাসিতেন, আমোদ আলাপ ভাল বাসিতেন, নীরস কর্কশ বিষয় অধ্যয়ন করিতে নারাজ ছিলেন—তখনকার বিদ্যা-লয় সমূহের সহিত তাঁহার মত-মিলন হওয়া বড়ই অসম্ভব ছিল। এখন বটে লোকে দেখিতে পাইতেছে যে, অল্প বয়সে ছাত্র-দিগের মাথায় দুঃসহ পাঠের বোঝা চাপা-ইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে; প্রকৃত শিক্ষকের কর্ত্তব্য, ছাত্রদিগের মানসিক বৃত্তি-গুলিকে এমন ভাবে বিকসিত করা, যাহাতে পরে তাহারা নিজ নিজ ইচ্ছামত কাজ কর্ম্ম

করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কিন্তু সে সময়, দুঃখের বিষয় এখনও অনেকটা,—বিদ্যালয়ে অন্য প্রকার বন্দোবস্ত ছিল; ব্যাকরণ পড়, পুরাতন ভাষা পড়, তর্ক শাস্ত্র পড় ও তর্ক কর—তখনকার এই পদ্ধতি ছিল। লকের ওরকম বন্দোবস্ত ভাল লাগিত না—তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে, অক্‌স্‌ফোর্ডে যাইয়া তিনি প্রথমত বড় বেশী লেখা পড়া করেন নাই, তাহার পরিবর্ত্তে সুরসিক ও সদালাপী লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইতেন। তর্ক করার প্রতি তাঁহার যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ ছিল; লক সাদাসিদে ও কাজের লোক ছিলেন,—তর্কের জন্য তর্ক করা তাঁহার নিকট বৃথা সময় কাটানের ন্যায় বোধ হইত,এমন কি অন্যায় কাজ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু অক্‌স্‌ফোর্ডে তখন তর্ক করা একটা অনুষ্ঠান ছিল, আর লক যে তাহা হইতে একেবারে কোন উপকার পান নাই, তাহাও বোধ হয় ঠিক নহে। সত্য বটে, তর্কের নিমিত্ত তর্ক করায় অনেক সময় অপব্যয় হয় মাত্র; সত্য বটে, উহা হইতে অনেক সময় কুফল ফলিয়া থাকে, কিন্তু বাগ্‌-যুদ্ধ দ্বারা উপকারও হইয়া থাকে; যথোচিত মাত্রায় বাগ-যুদ্ধে যোগদান করিলে বুদ্ধি বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায়, এবং পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান সুমার্জ্জিত হয়। লকের রচনায় বিলক্ষণ তর্ক করিবার ক্ষমতা দেখা যায়—এই ক্ষমতা তখনকার উল্লিখিত প্রথা দ্বারা যে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন লেখা পড়ায়, সেইরূপ আবার ধর্ম্ম বিষয়ে—লক বাঁধাবাঁধি নিয়ম ভাল বাসিতেন না; তিনি সব বিষয়ে স্বাধীনতা ভাল বাসিতেন। লক যখন প্রথম ক্রাইষ্ট চর্চ্চে প্রবিষ্ট হয়েন, তখন উহা পিউরিটানদের হাতে ছিল। তাহারা ধর্ম্মের বাহিক আড়ম্বরটা কিছু অধিক মাত্রায় করিয়া তুলিয়াছিল—লকের বোধ হয় তাহা ভাল লাগিত না। লক শেষে চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের লোকদিগের সংস্পর্শে আসেন; এবং যদিচ তিনি বাল্যকালে পিউরিটন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েন, তথাপি বড় হইয়া যখন দেখিলেন যে, একদল পিউরিটান ধর্ম্ম বিষয়ে এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত, আর একদল পিউরিটান অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী, তখন তিনি পিউরিটান সম্প্রদায় ছাড়িয়া চর্চ্চ অব ইংলণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ হইবার লোক নহেন—ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি উদারচেতা ছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

কি দিবে?

(শারদ পূর্ণিমা নিশিতে)

শারদ পূর্ণিমা নিশি নির্ম্মল সুন্দর!
কি যেন আনন্দভরা
হাস্যময়ী বসুন্ধরা,
রজত জোছনা ঢালা দিক্ দিগন্তর!
নির্ম্মল সুনীলাকাশে
তারা হাসে চন্দ্র হাসে,

কাননে কুসুমে হাসে লতা মনোহর !
কি যেন কি সরলতা
পরিপূর্ণ যথাতথা,
খুলেছে প্রকৃতিরাণী পুণ্যের নির্ঝর !

১

"পবিত্র পূর্ণিমা নিশি সুন্দর কেমন,
কি আজ তোমারে দিয়া সুখী হবে মন ?"
কি যেন স্বর্গীয় তানে,
কি যেন পশিল কাণে,
কি যেন ফুটিল প্রাণে সুধা-প্রস্রবণ !
"কি আছে তোমারে দিতে
মাটীর এ পৃথিবীতে ?"—
এ মৃত জগতে আহা অমৃত স্বপন !

২

সত্যই স্বপন একি আশার ছলনা,
স্বর্গীয় সুধার নামে শুধুবিড়ম্বনা ?
কি দিবে জান না দেবি—জান নাকি হায়,
সত্যই জীবন গেল বৃথা তপস্যায় ?
সত্যই বোঝনি প্রিয়ে,
দেবের হৃদয় দিয়ে,
মর্ত্ত্যের মানুষ আহা কি পাইতে চায় ?
এমন অপূর্ণ বুকে,
এত অশ্রুপূর্ণ মুখে,
বোঝনা মানুষ কাঁদে কি যে পিপাসায় ?
বোঝনা সত্যই তবে
ছাই হবে—ভস্ম হবে—
আর যে বাঁচে না প্রাণ এত নিরাশায় !
সত্যই কি এত দিনে বুঝিলে না হায় ?

৩

কি দিবে জাননা দেবি, ভাবিয়া কাতর !
ছি ছি ছি ! শুনিয়া দেখ হাসে শশধর !
যেথানে আছগো তুমি,
হোক না সে মর্ত্ত্য ভূমি,
হোক না সে বালুময় মরু ভয়ঙ্কর !
পাহাড় পর্ব্বত রূপে
উন্নত পাষাণ স্তূপে
নির্ম্মমতা কঠিনতা থাকুক বিস্তর !
তথাপি তোমার কাছে,
সেথানে সকলি আছে,
যা কিছু সরল সত্য পবিত্র সুন্দর,
সকলি সেখানে আছে—যাহা মনোহর !

৪

যেখানে তুমি গো আছ আছে তথা সব,
তুমি ফুল, তুমি মধু, তুমিই সৌরভ !
তোমারি সুরক্ত ঠোঁটে
স্বর্ণ পারিজাত ফোটে,
তোমারি বদনে দেবি অমৃত উদ্ভব !
লাবণ্যে শশাঙ্ক হাসে
মলয়া বহিছে শ্বাসে,
নয়ন নলিন শোভা করে পরাভব !
তুমি শান্তি সরলতা,
তুমি পুণ্য পবিত্রতা,
প্রীতির কলপ লতা আনন্দ উৎসব !
তুমিই সে অমরের অতুল বিভব !

৫

কি দিবে তুমিগো দেবি প্রিয় প্রাণেশ্বরি !
কি আছে তোমার আর—হরি হরি হরি !
কিবা তুমি চাহ দিতে ;
কি নাই এ পৃথিবীতে,
ভাবিয়া তোমার কথা হেসে কেঁদে মরি !
তুমি রত্ন তুমি খনি,
তুমিই ইন্দিরা রাণী,
কি দিবে আমারে তুমি আপনা পাসরি ?

৬

পবিত্র পূর্ণিমা নিশি কেমন সুন্দর,
চকোরেরে সুধা দিয়া,
কুমুদেরে ফুটাইয়া,
কি দিবে আমারে শুনে হাসে শশধর !

তরু কোলে লতা হাসে
নীরব অফুট ভাষে,
কুসুম হাসিয়া মরে কোলে মধুকর!
কি তুমি গো চাহ দিতে,
কি নাই এ পৃথিবীতে?
তোমারি চরণে স্বর্গ সেবিছে অমর!

৭

কি দিবে আমারে দেবি ফিরে পুনরায়
আর না বলিও হেন কঠিন ভাষায়!
পাষাণ বিদীর্ণ হবে,
সাগর শুকায়ে যাবে,
অনল জ্বলিবে শত অনল শিখায়!
বিষে বিষ যাবে ছেয়ে
শোকের সন্তাপ পেয়ে,
অশনি মূরছা যাবে কুসুমের প্রায়!
আর না বলিও দেবি কি দিবে আমায়!

৮

অথবা ভাগ্যের দোষে—
নিতান্ত যদ্যপি আহা বুঝিলেনা হায়!
এস তবে এস প্রিয়ে,
দেই আজি শিখাইয়ে,
ধরার মানুষ মরে কি যে পিপাসায়!
দেও হৃদয়ের রাণি
কালকূট বিষ আনি,
জ্বলিছে হৃদয় খানি শত যাতনায়!
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি
দেও সুখে পান করি,
আদরে অমৃতসম আকুল তৃষ্ণায়!
নিকটে দাঁড়াও এসে,
দেখে যাই জন্ম শেষে

স্মরণে রাখিও;——

*   *   *

*   *   *

*   *   *   *

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

অভিনয়ে চরিত্র-শিক্ষা।

"Lives of greatmen remind us:—
We should make our lives sublime."—Longfellow.

সহস্র সহস্র উপদেশ-বাক্য অপেক্ষা একটী সামান্য সৎকার্য্যের মূল্য অধিক। উপদেশ-বাক্য বা উপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ-পাঠে যে শিক্ষা না হয়, একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেখিলে লোকে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিতে পারে। কেন না, প্রকৃত ঘটনা লোকের মনে যে ভাব অঙ্কিত করে, আড়ম্বর-পূর্ণ শূন্য বাক্য সে ভাবের নিকট দিয়াও যাইতে পারে না। পঞ্চমবর্ষীয় একটী শিশুকে সহস্রবার উপদেশ দিয়াছি যে, ক্ষুধার্ত্তকে আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাতে কোন ফল ফলে নাই। পরে যে দিবস একটী ভিক্ষুককে বাটীতে বসাইয়া আহার করাইলাম, তাহার পর দিবসেই সেই শিশুকে একটী ভিক্ষুকের হস্তে দুইটী পয়সা দিতে দেখিলাম। বালকের পক্ষে যে নিয়ম, সকলের পক্ষেই সেই নিয়ম। এই কারণে, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্র কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া বা শিক্ষকের উপদেশ শুনিয়া শিক্ষা করা যাইতে পারে না। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যে সকল কার্য্য করি, তাহার অধি-

অধিকাংশই যে দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। "Example teaches better than precept" অর্থাৎ উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত হইতে অধিক শিখিতে পারা যায়, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত।

এক গাছি কুসুমহারের সহিত এক একটী কুসুমের যে সম্বন্ধ, মনুষ্য-চরিত্রের সহিত এক একটী ঘটনারও সেইরূপ সম্বন্ধ। কেন না, ঘটনাসমষ্টি লইয়াই জীবন। সুতরাং জীবনকে উন্নত ও চরিত্রকে সুগঠিত করিতে হইলে, অন্যান্য আদর্শ জীবন-চরিত পাঠ করা কর্ত্তব্য এবং আদর্শ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া জীবন-স্রোত প্রবাহিত করা আবশ্যক। কিন্তু আদর্শ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে তাঁহার পথ অনুসরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে;—যাঁহারা তাঁহার প্রত্যেক ঘটনার সাক্ষী, তাঁহারাই কেবল সেই পথাবলম্বনে চলিতে পারেন। সুতরাং চরিত্র-গঠনের নিমিত্ত সাধারণের পক্ষে আদর্শ জীবনচরিত পাঠ করাই এক মাত্র উপায়। পরন্তু, অতীত জীবনের ইতিহাস সকলের পক্ষেই সমান সুবিধাজনক। বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল চরিত্রবান লোকের জীবনচরিত যতই পঠিত ও আলোচিত হয়, চরিত্রগঠনও লোক-শিক্ষার ততই সুযোগ বৃদ্ধি হয়। মহাজনেরা যেপথে গমন করিয়াছেন, তাহাই পথ; সুতরাং ভ্রম-সঙ্কুল জীবন-পথে চলিতে হইলে মহাজনগণের পথ অনুসরণ করিয়া চলা ভিন্ন সৎপথে চলিয়া জীবনের লক্ষ্য সংসাধন করিবার অন্য উপায় কি আছে? এই কারণে, আমরা জীবন-চরিতের পক্ষপাতী এবং মহাজনগণের জীবনবৃত্ত আলোচিত হইতে দেখিলে সুখী হই। কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশত ভারতীয় মহাত্মাগণের জীবন-চরিত কিছু দুর্ল্লভ। অনেক মহাত্মার উপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থাদি প্রাচীন কাল হইতে যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁহাদিগের জীবনচরিত সঙ্কলিত হইয়া রক্ষিত হয় নাই। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন যে, ভারতীয় পণ্ডিতেরা বোধ হয় জীবন-চরিত পাঠের উপকারিতা বুঝিতেন না। যাহা হউক, বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে জীবনচরিত বিস্তর সুলভ হইয়াছে বলিতে হইবে। লোকে এক্ষণে জীবনচরিত পাঠ করিতে শিখিয়াছে এবং তাহার উপকারিতা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। যে চরিত্র সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে, সেই চরিত্রেরই ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হইতেছে। স্বর্গীয় কেশব চন্দ্র সেনের জীবন-বৃত্ত তাঁহার পরলোক গমনের অনতিবিলম্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল;—এ প্রকার দৃষ্টান্ত আমাদিগের দেশে বিলক্ষণ সৌভাগ্য-সূচক, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

জীবন-চরিত পাঠ করা ব্যতিরেকে চরিত্র গঠন করিতে শিখিবার আর একটী সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় আছে। ইহা রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন। গীত, বাদ্য প্রভৃতি আমোদ আহ্লাদের সহিত মিশ্রিত বলিয়া ইহা সহজ এবং মনোহর। তদ্ভিন্ন ইহা আবার জীবন-চরিতেরও দৃষ্টান্ত বলিয়া চরিত্র-শিক্ষার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কাব্য-রস পানাভিলাষী সঙ্গীতপ্রিয় দর্শকের চক্ষে অভিনয় রঙ্গ যে বিশেষ তৃপ্তিকর, তাহা এক প্রকার অতর্কিত রূপে মীমাংসিত। তদুপরি ইহা যে কঠোর ধর্ম্মনীতি

শিক্ষার্থীর চক্ষেও বিশেষ তৃপ্তিকর ও শিক্ষাজনক, তাহাতে আমরা সন্দেহ করি না। বস্তুতঃ মনুষ্য-স্বভাব এমনই কাব্য-রস-পিপাসু যে, কেবল ধর্ম্মনীতি বা সমাজ-নীতির মধ্যেও কাব্য-রস অনুসন্ধান করে। সুতরাং নৃত্য গীতের সহিত মিশ্রিত হইয়া কঠোর জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা, কঠোরতা হারাইয়া, এক অনির্ব্বচ-নীয় কোমলে-কঠোর, কঠোরে-কোমল ভাব ধারণ করে এবং সহজে হৃদয়ের সহিত মিশিয়া অতি সামান্য উপায়ে মহৎ শিক্ষা প্রদান করে। যে শিক্ষা সমগ্র ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠে যুগ যুগান্তর অতিবাহিত করিলেও লাভ করা দুরূহ, রঙ্গভূমির একটী সামান্য দৃশ্যও সে শিক্ষা সম্পাদনে সক্ষম। রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কর্ত্তব্য ও সত্য পালনের অনু-রোধে সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য্য এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্র ও ভর্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনাকে চণ্ডালের দাসত্বের জন্য বিক্রীত করিতে দেখিলে যে শিক্ষা লাভ হয়, তাহা কোন্ বেদ, কোন্ পুরাণ বা তন্ত্র পাঠ করিয়া শিখিতে পারা যায়? কোন্ আচার্য্য হরিশ্চন্দ্র-বেশী সামান্য রঙ্গভূমির নটের অপেক্ষা সত্যব্রত শিখাইতে সক্ষম? যখন রঙ্গভূমিতে দেখিলাম, রাবণের সহস্র প্রলো-ভনে আদর্শ সতী সীতাদেবী অবিচলিত রহিলেন এবং উৎকট তাড়ন ও নির্য্যাতনকে অকুতোভয়ে আপন মস্তকোপরি ধারণ করিয়া অবনত মস্তকে থাকিয়া রাবণকে উপেক্ষা করত পতিপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন রঙ্গভূমির সামান্য গণি-কাকে কে না মনু প্রভৃতি সংহিতা কারক-গণের অপেক্ষা উচ্চাসনে বসাইয়া শতবার তাহার প্রশংসা করিয়াছেন? কোন্ শাস্ত্র এই দৃশ্যের অধিক সতীত্ব ধর্ম্ম শিখাইতে সক্ষম? যিনি বঙ্গ রঙ্গভূমিতে বালক প্রহ্লাদকে বুক পাতিয়া সহস্র বিপদ ধারণ করিয়াও হরিপদ চিন্তায় অটল থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনি কি কদাপি অন্য প্রকার শিক্ষাকে রঙ্গভূমির শিক্ষার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে সাহসী হইবেন? বাস্তবিকই রঙ্গ-ভূমির শিক্ষা জীবন্ত। জীবন্ত এই জন্য যে, অভিনয়ই প্রকৃত চিত্রের দর্পণস্থ প্রতি-বিম্ব স্বরূপ এবং জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী হইতে যে শিক্ষা লাভ করা যায়, অভিনয় ক্রিয়া হইতেও প্রায় সেই শিক্ষাই লাভ করা যাইতে পারে। প্রকৃত ঘটনা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল গুপ্ত ভাবকে জাগরিত করে, অভিনয় কার্য্যও সেই সকল ভাবকে উত্তে-জিত করিতে সক্ষম। বিশেষতঃ চরিত্র-চিত্র অভিনয়ে যেমন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে ও সতেজে জ্বলিতে থাকে, তেমন আর কিছু-তেই নহে। এই জন্য রঙ্গভূমির ন্যায় চরিত্র-শিক্ষার উপযুক্ত স্থল আমরা আর দেখিতে পাই না।

সাহিত্য, সঙ্গীত ও আমোদ প্রমোদের জন্য সমাজ-মধ্যে রঙ্গভূমি যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রঙ্গভূমি কেবল ক্ষণিক আমোদ প্রমোদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইলে আমরা তাহার সুফলভাগী হইতে পারি না। ইহার স্থায়ী ও মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্র-শিক্ষা দেওয়া। যে রঙ্গভূমিতে তাহা হয় না, সে রঙ্গভূমির মর্য্যাদা নাই এবং তথাকার ক্ষণস্থায়ী চিত্তোন্মাদকর আমোদ প্রমোদ, বেশ্যালয়ের আমোদ প্রমোদের ন্যায় অস্থায়ী ও অপ-বিত্র। আমরা এ প্রকার রঙ্গভূমির পক্ষ-

পাত্রী নহি। যে সমাজ মধ্যে এ প্রকার রঙ্গভূমি বিদ্যমান থাকে, সে সমাজকে আমরা দূষিত বলিতে কুণ্ঠিত নহি। রঙ্গ ভূমি পবিত্র স্থান, শিক্ষা-মন্দির ও জুড়াইবার স্থল। ইহা বিলাসিনীর হাব ভাব দেখাইবার বা একটী মধুর সুললিত চিত্তোন্মাদকর টপ্পা শুনাইয়া তরলমতি যুবক বৃন্দকে মজাইবার স্থান নহে। যদিও সদুদ্দেশ্য-সম্পন্ন রঙ্গভূমিতেও সময়ে সময়ে হাব ভাব, অর্দ্ধ-আবরিত অশ্লীল গীত ও রঙ্গ তামাসার প্রয়োজন হয়, তথাপি উদ্দেশ্য সৎ হইলে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। ধর্ম্মের কঠোর মূর্ত্তি, স্থায়ী সারত্ব এবং পরিণামে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে হইলে তাহার, পার্শ্বে পাপের মোহিনী মূর্ত্তি, পাপ প্রলোভনের অসারত্ব এবং পরিণামে তাহার বিনাশ দেখান আবশ্যক। কিন্তু যাঁহারা কেবল আপাত মধুর অংশটুকুতে বিভোর হইয়া স্থায়ী সদুদ্দেশ্য সকল উপেক্ষা করেন, তাঁহারা যে রঙ্গ ভূমির দ্বারা সমাজের অপকার করেন, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত আছি,

আমরা এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গে আলোড়িত হইতেছি। সে শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে আমরা এক্ষণে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে বিভোর ও চটকে চমকিত। পাশ্চাত্য রীতি পদ্ধতি অনুসারে যে রঙ্গ ভূমি সজ্জিত নহে ও যে রঙ্গ ভূমিতে পাশ্চাত্য প্রণালীতে অভিনয় না হয়, সে রঙ্গ ভূমি রঙ্গভূমিই নহে। সুতরাং এখনকার রঙ্গভূমিতে আমরা কেবল চটক দেখি, বাহ্যিক আড়ম্বর দেখি, সুললিত অসার গীত শুনি ও বিলাসিনীর হাবভাবে বিমোহিত হইয়া প্রকৃত বিষয় ভুলিয়া যাই। দোষটা যে কেবলই রঙ্গভূমির, আমরা তাহা বলিতেছি না; কারণ রঙ্গভূমির বাহ্যিক আড়ম্বর ও চিত্তোন্মাদকর হাবভাব বা অভিনয় বিস্তর পরিমাণে আমাদিগের রুচির উপর নির্ভর করে। আমাদিগের এমনই কদর্য্য রুচি দাঁড়াইয়াছে যে, যে রঙ্গভূমিতে বিলাসিনীর রঙ্গ তামাসা ও নৃত্য গীত নাই, আমরা সে রঙ্গভূমিতে ভ্রমেও পদার্পণ করি না। বরং বাই বা খেম্‌টার নাচ দেখিতে যাইব, তথাপি বারবণিতা-শূন্য রঙ্গালয়ে যাইব না। পক্ষান্তরে রঙ্গালয়ের অধিকারীরা ব্যবসায়ের অনুরোধে আমাদিগের রুচির সেবা করিতে বাধ্য; সুতরাং তাঁহারাও বিবাহোচিত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে যে সমাজের কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইতেছে, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। অনেক যুবক রঙ্গালয়ের মোহিন মায়ায় পড়িয়া চরিত্র হারাইয়াছে এবং যাহা শিখিবার জন্য রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়াছে, সেই নৈতিক শিক্ষার মস্তকেই পদাঘাত করিয়াছে। মদ্যপানের প্রলোভন ও সুন্দরী বার নারীর তীব্র কটাক্ষ এবং উন্মত্তকারী নৃত্য গীতের ফাঁদে পড়ে না, তরলমতি যুবকবৃন্দের মধ্যে এমন কয় জনকে দেখিতে পাওয়া যায়? বারবনিতা ব্যতিরেকে এখন আর ভাল অভিনয় হয় না এবং মদ্যপান রঙ্গভূমির একটা আনুষঙ্গিক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বনাশের পথটাও বেশ পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে, আমরা প্রথমেই রঙ্গালয় হইতে গণিকাগণকে স্থানান্তরিত করিতে দেখিলেই সুখী হই। ইহাতে আমোদের কি ক্ষতি হইবে, তাহা আমরা বুঝি না; তবে জঘন্য বিলাস বাসনার যে কতকটা দমন হইবে

সেটা অনেকটা নিশ্চিত। স্ত্রী-চরিত্র পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের দ্বারা ভাল অভিনীত হয়, তাহা স্বীকার করি। স্ত্রী-চরিত্রের স্বভাব, চাল চলন ও ভাব ভঙ্গি স্ত্রীলোকের দ্বারা যেমন সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইবে, পুরুষের দ্বারা তেমন হইবে না, তাহাও জানি। কিন্তু গণিকাগণের অভিনয়ে রঙ্গভূমির যে টুকু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক ক্ষতি হয়। সুতরাং বৃথা চাকচিক্যের জন্য আমরা গুরুতর ক্ষতি করিতে প্রস্তুত নহি। আর শিক্ষা করিলে পুরুষগণ যে, কিয়ৎ পরিমাণেও স্ত্রী-স্বভাব ও ভাব ভঙ্গির অনুকরণ করিতে পারিবে না, তাহারই বা বিশেষ কি কারণ আছে? এই সকল কারণে আমরা রঙ্গালয়ে স্ত্রী-চরিত্র গণিকাগণের দ্বারা অভিনীত হইতে দেখিতে অভিলাষী নহি। তাহারা দর্শক-বৃন্দের চরিত্র দূষিত করে এবং যে সকল সহযোগী অভিনেতার সহিত তাহাদিগের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহাদিগকে পাপের গভীরতা হইতে গভীরতর সীমায় লইয়া যায়।

অনেকে গণিকাদিগের পক্ষ ধরিয়াও তর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল মহিলা ভ্রম ক্রমে ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত হইয়া গণিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা গণিকা বৃত্তির পাপ স্রোতের তরঙ্গ দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কূলে ফিরিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু একবার পদস্খলন হইলে তাহাকে কূলে ফিরাইয়া লওয়া দূরে থাকুক, কেহ কোন প্রকারে সাহায্যও করে না। সুতরাং অনিচ্ছা স্বত্বেও তাহাদিগকে পাপ জীবন অতি-বাহিত করিতে হয়। রঙ্গভূমি তাহাদিগের উপার্জ্জনের পথ এবং রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাহারা পাপ জীবনের বিনিময়ে আপন পরিশ্রমের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে। আমরা একথা স্বীকার করি না। এ পর্য্যন্ত কয়জন গণিকা এ পথ অবলম্বন করিয়াছে? আর যদি পরিশ্রমের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্য অভিলাষী এমন কোন গণিকা থাকে, তাহাকে দূষিত নীতির রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিতে আমরা নিষেধ করি। ধর্ম্মে যাহার মতি হয়, জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাহার পক্ষে সহস্র পথ উন্মুক্ত আছে।

ভদ্র মহিলার পক্ষে রঙ্গভূমি এখন ব্যাঘ্র ভল্লুক সঙ্কুল ভয়ানক স্থান। সুতরাং তাঁহাদিগকে রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে বলাতে বা সে চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়াতেও পাপ আছে। আমরা সে কথা মুখে আনিতে বা হৃদয়ে চিন্তা করিতেও সাহস করি না। রঙ্গালয় পাপের জ্বলন্ত অগ্নিতে এখনও এত উত্তপ্ত যে, সরলা কোমলপ্রাণা বনলতা তাহা স্পর্শ মাত্র জ্বলিয়া ছাই হইবে! কলিকাতার কোন মান্য গণ্য ভদ্র পরিবারকে সাধারণের সম্মুখে অভিনয় করিতে শুনিয়াছি। যদিও নিজ বাটীতে ও বিশেষ সতর্কতার সহিত রঙ্গালয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, তথাপি আমাদিগের প্রাণ শিহরিয়া উঠে! সাত পাঁচ ভাবিয়া আমরা রঙ্গালয় হইতে মহিলাগণকে বিদায় দিতে ইচ্ছা করি। যদি কখন সময় হয়, সে বিষয়ে পুনরায় চিন্তা করা যাইবে। কিন্তু আমাদিগের জাতীয় স্বভাব পাশ্চাত্য সভ্যতানুকরণে দিন দিন এতই দূষিত হইতেছে যে, সে সময় আর ফিরিবে বলিয়া অনুমান হয় না।

ফলতঃ বারবণিতার দ্বারা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় ভাল হইলেও রুচির সহিত মিলে না। যে সীতার চরিত্র সতীর আদর্শ, এক-জন গণিকাকে তাঁহার স্থানীয় দেখিতে কাহার প্রবৃত্তি হয়? এমন কি, যে মুহূর্ত্তে সীতা অবনতমুখী হইয়া নয়নাসারে সিক্ত হইয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইবেন, হয় ত অভিনেত্রী সেই সময়ে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে কোন যুবকের মনোবিকার উৎপাদন করিতে-ছেন। যে নিতান্ত অসতী এবং ধর্ম্মপথ-বর্জ্জিতা, সীতার মনোভাব তাহার মনে এক বিন্দুও আসিবে না; সুতরাং অভি-নয় কালেও যে সে আপন জঘন্য বৃত্তির পরি-চয় প্রদান করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তাহার উপর রঙ্গভূমির বেশ ভূষাটাও সুরুচিকর নহে—যেন অস্থিরমতি যুবক ধরিবার ফাঁদ। এই বেশে রঙ্গমঞ্চের সুবিধাজনক স্থান হইতে হাব ভাব পার-দর্শিনী সুন্দরী বারনারী যে তরলমতি যুবক-বৃন্দকে শর জালে বিদ্ধ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

আমাদিগের শেষ কথা অভিনেতৃগণের মদ্যপান। এ বিষয়ে অনেকের এক্ষণে দৃষ্টি পড়িয়াছে। রঙ্গালয়ে আমরা একে-বারেই সুরাগন্ধ পাইতে ইচ্ছা করি না। পাপমগ্ন গণিকার দ্বারা সীতার অভিনয় যেমন অরুচিকর ও নিন্দনীয়, মাতাল বুদ্ধদেব বা চৈতন্য বা নারদ তেমনই অরু-চিকর ও নিন্দনীয়। যদি মহৎ চরিত্রের অভিনয় দেখাইয়া চরিত্র গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়া রঙ্গভূমির উদ্দেশ্য হয়, তবে অভিনেতাদিগের নিজের চরিত্রের দিকে অনেকটা দৃষ্টি রাখা উচিত। অন্যথা, তাঁহারা সৎ শিক্ষার পরিবর্ত্তে অসৎ শিক্ষা দিবেন ও চরিত্র গঠন করিবার সুযোগের পরিবর্ত্তে চরিত্র ভাঙ্গিবার পথ পরিষ্কার করিবেন।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

একটী সাধু-সঙ্গীত।

"ইয়ে বিধি সুরত লাগাওয়ে—
সুরত লাগাওয়ে, হর্ পাওয়ে।"

মন! তুমি অনন্ত প্রেমময়ের অনন্ত প্রেমে মজিয়া যাও, তাঁহাকে পাইবে। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, আরামে, ব্যারামে, রবিকর-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল দিবা-সমাগমে, ভাদ্র মাসের ঘন ঘটাচ্ছন্ন বিভীষিকাময়ী কাল রাত্রিতে, রোগীর রুগ্ন-শয্যায়, বিলাসীর আনন্দ-নিকেতনে—যেখানে, যেরূপ অবস্থায়, যেমন থাক—তাঁহার সহিত 'পীরিত' কর, তিনি তোমার হইবেন। সুখের সময় অন্যের প্রেমে মজিও না, দুঃখের সময় তাঁহাকে ভুলিও না, সে চরণ ছাড়িও না, সে রসে ডুবিতে ক্ষান্ত হইও না;—আনন্দের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে, বিষাদের প্রবল নৈরাশ্যে, সমভাবে তাঁহাকে জড়াইয়া থাক, তিনি তোমাকে চরণে ঠেলিবেন না, স্নেহে, যত্নে তোমাকে অভয় ক্রোড়ে স্থান দিবেন।

তুমি ঘোর সংসারী,—বলিবে, সে আবার কিরূপে হইবে?

"আমি প্রাতঃকালে উঠি,
কতই যে মা খাটি,
ছুটাছুটী করি ভূমণ্ডল!"—

আমার সময় কৈ? ভগবৎ প্রেমে মন মজাইবার অবসর কই?—সংসারে আমার কেহ নাই, গৃহিণীর গৃহকার্য্যে আনুকূল্য করে, আমি ছাড়া এমন আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহার কতক কার্য্য করিতে হইবে,—তাহার মন যোগাইয়া না চলিলে সংসার চলে কই? তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তির তিলেক বিকৃতি দর্শনে যে জগৎ আঁধার দেখি, "সংসার বিদেশে,বিদেশীর বেশে" দিশেহারা হই!—তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে, সকালে-সন্ধ্যায় তাঁহার সহস্র 'ফরমাশ' খাটিতে হইবে। ওদিকে 'পোড়া পেট' বুঝে না, পয়সার ধান্ধায় ফিরিতে হইবে। মানব-জীবনোপায়ের সার পথ চিনিয়াছি—কেরাণীগিরি; যেন-তেন-প্রকারেণ চারিটী হাতে-মুখে করিয়া দশটার মধ্যে আপিসে হাজির হইতে হইবে, সেখানে পাঁচটা পর্য্যন্ত (বেশী পারিলে ভাল হয়) ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লেখনী-চালন; শ্বেতাঙ্গ-মূর্ত্তির পদ-লেহন, বড় বাবুর চরণে তৈল-সিঞ্চন প্রভৃতি সৎ-কার্য্য সকল সাধন করিতে হইবে। আবার সায়াহ্নেও সময় নাই;—টাউন হলে যাইতে হইবে, লম্বা লম্বা স্পীচ দিবার 'মাল-মসল্লা' যোগাড় করিতে হইবে, মীটিংএর 'প্রোসীডিং' লিখিতে হইবে—কত কায! আবার রাত্রে বসিয়া মৌলিকতা-হীন যৌক্তিকতা-শূন্য প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, বাজারে উচ্চ শ্রেণীর লেখক বলিয়া নাম কিনিতে হইবে। মনে ত করি, পারি না পারি, একবার ঈশ্বরের নাম স্মরি, কিন্তু হরিহরি;—আমার সময় কই?

সাধু গাইতেছেন—

"ইয়ে বিধি সুরত লাগাওয়ে"—

ভয় কি ভাই? বিধান বলিয়া দিই শুন। প্রেম করিবার উপায় আছে। তোমার মন থাকিলে, সহস্র কার্য্য সত্ত্বেও, প্রেমের পন্থা দেখিতে পাইবে। এই রূপে প্রেম কর—

"য্যায়্সে নট্নী চড়ত বাঁশ'পর,
ঢোলিয়া ঢোল বাজাওয়ে,
আপনাভাব সাধ্‌কে নট্নী
সুরত বাঁশ'পর ল্যাওয়ে।"

ঐ দেখ, নিরক্ষর গণ্ডমূর্খ বাজিকর এক সময়ে কত কায করিতেছে। দুরারোহ বংশদণ্ডের উপর অবলীলাক্রমে উঠিয়াছে; উঠিয়াই ক্ষান্ত নহে—নাচিতেছে, দুলিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, গায়িতেছে, কত কি করিতেছে?—তাও তালে তালে—নীচে ঢোলী ঢোল বাজাইতেছে, সে দিকে তার মন আছে, বাদ্যের গগণ-ভেদী নিনাদে উন্মত্ত হইয়া ঠমকে ঠমকে নৃত্য করিতেছে, অসাধারণ ক্রীড়া-নিপুণতার পরিচয় দিতেছে। এত যে করিতেছে, কিসের জন্য?—সমাগত দর্শকবৃন্দের মনস্তুষ্টি সাধনই তাহার প্রধান লক্ষ্য, কিসে দশজনের মন ভুলাইয়া দশটা পয়সা পাইবে, এই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি সে সার বস্তু ভুলিয়াছে? ঐ যে হাতে আর একটী লম্বা বাঁশ—বামে দক্ষিণে উভয় পার্শ্বে হেলাইতেছে, দুলাইতেছে ওটী কেন বলিতে পার? ঐটীই উহার জীবন-কাটি মরণ-কাটি!—একটু এদিক ওদিক হইলেই ভূমিসাৎ! এত যে পরিশ্রম, এত যে অঙ্গ ভঙ্গিমা, সব ব্যর্থ হইবে, পয়সা পাওয়া ঘুচিয়া যাইবে, হয় ত এত আশার জীবলীলাও চির দিনের জন্য ফুরাইবে। মূর্খ

কি তাহা ভুলিয়াছে? ভ্রমেও না, তাহার মনের সমগ্র গতিই ঐ দিকে। কেমন ভাই বুঝিলে? পুনশ্চ অন্যত্র—

"য্যায়সে নারী চলে পাণিকো
পগ্ আওয়ে পগ্ যাওয়ে,
সাথ সখিনী করত কল্লোল,
সুরত গাগর পর ল্যাওয়ে।"

বুঝিলে কি, ভাই, কিরূপে ভগবানের সহিত প্রেম করিবে? কে বলে তোমায় সংসার ছাড়িতে? কে বলে তোমাকে সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইতে? এই সংসারই লীলাময়ের লীলা ক্ষেত্র, ধর্ম্ম সাধনের পুণ্যভূমি,—সংসারের জন্যই ধর্ম্মের উৎপত্তি, সংসারেই ধর্ম্মের পরিপুষ্টি। এমন সুখের সংসার ছাড়িয়া কোথা যাইবে ভাই? সংসারে বসিয়া এক মুহূর্ত্ত সময়-ক্ষেপ করিও না, দিবানিশি কর্ম্ম কর, কেহ বাধা দিবে না। কিন্তু "নটনীর বাঁশের" মত, "নাগরীর গাগরের" মত তোমার যেন সেই সচ্চিদানন্দের প্রতি 'সুরত' অনুক্ষণ বদ্ধ থাকে। সকল কার্য্য কর, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া,—লিপ্ত কেবল সেই পরম পুরুষের প্রেমে। মূর্খ বাজিকর এত বাজি করিল, কিন্তু লিপ্ত সেই বংশদণ্ডে; তুমিও সংসার ক্ষেত্রে অহোরাত্র ছায়াবাজি কর, কিন্তু লিপ্ত থাক সেই নির্লিপ্তের প্রেমে। নিরক্ষর মহিলাগণ এত বাক্‌জাল বিস্তার করিল, কিন্তু মন তাহাদিগের সেই মাথার ঘড়ায়; তুমিও সংসার হাটে প্রাণ খুলিয়া কথার কেনা-বেচা কর, কিন্তু মন রাখ সেই বাঙ্মনসাতীতের সন্ধানে।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

পাপ পুণ্য—প্রতিবাদ।

বিগত চৈত্র মাসের বেদব্যাস পত্রিকাতে বাবু বীরেশ্বর পাঁড়ে "পাপ-পুণ্য" শির্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা বীরেশ্বর বাবুর পাপপুণ্য বিষয়ক সংস্কারকে ভ্রম-সঙ্কুল না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন যে, পাপ পুণ্য উভয়েই ঈশ্বরের সৃষ্ট। আমরা এরূপ মত ও বিশ্বাসের ভয়ানক বিরোধী। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান। সংসারের যাবৎ বেদ্য ও অবেদ্য বস্তু এবং করণীয় বিষয় সকল তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনী শক্তির অন্তর্ভূত। নতুবা তাহার সর্ব্বশক্তিমানত্বের ব্যত্যয় ঘটে। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি পাপের সৃষ্টি করেন বা প্রশ্রয় দেন, একপ বলা যায় না। ঈশ্বর ক্ষুদ্র কি বৃহৎ যাহা সংসারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, (এস্থলে "সৃষ্টি" ও "মঙ্গলোদ্দেশে" কথা দুইটী স্মরণ রাখিতে হইবেক) তাহার কোনটীই বিনা মঙ্গল উদ্দেশে সৃষ্ট নহে। তবে জিজ্ঞাসা করি, যে পাপের ফল কেবল দুঃখ, দুর্গতি ও আত্মার মহান অনিষ্টকর, তাহা ঈশ্বর কিরূপে সংসারের জন্য সৃষ্টি করিবেন? ঈশ্বর আমাদিগকে সমুদয় বৃত্তি-সমন্বিত করিয়া এই সংসারে প্রেরণ করিয়া, ইহাকে (এই সংসারকে) পরীক্ষা স্থল করিয়াছেন; এবং এই সকল বৃত্তি প্রদান করিয়া তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতার অধিকারী করিয়াছেন। কেন তিনি আমাদিগকে সংসারে

প্রেরণ করিলেন, কেন স্বাধীনতা ও বিবেককে আমাদের মধ্যে নিহিত করিলেন, কেন সংসারকে আমাদের পরীক্ষাস্থল করিলেন, এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে মনুষ্য অধিকারী নহে। এক স্বাধীনতা থাকাতে মনুষ্য পরীক্ষা প্রদানে অধিকারী হইয়াছে। বিবেক বলিল, পর দ্রব্য হরণ করা ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে। আমার স্বাধীনতা থাকাতে আমি পরদ্রব্য হরণ করিতেও পারি, নাও করিতে পারি। ইহা আমার স্বাধীন ইচ্ছাধীন। আমি সাবধান পূর্ব্বক অগ্নি ব্যবহার করিয়া, তাহা হইতে প্রচুর উপকার লাভ করিতে পারি, কিন্তু যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক এবং অসাবধান হইয়া অগ্নির ব্যবহার করি, তবে তদ্দ্বারা আমার গৃহ ও সম্পত্তি নাশ হইবে, আমার শরীর দগ্ধ হইবে। এক্ষণে বীরেশ্বর বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, আমার এই অসাবধানতা বশত অগ্নি কর্ত্তৃক যে গৃহ ও সম্পত্তি নাশ হইলে, এজন্য কি ঈশ্বর দায়ী হইবেন? যদি সকলে সাবধানতার সহিত ও প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া অগ্নি ব্যবহার করে, তবে অগ্নি হইতে ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং সে বিবেচনায় অগ্নি কর্ত্তৃক গৃহনাশ, দেশ ও সম্পত্তি-নাশ সংসারের মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট বস্তু মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এস্থলে বীরেশ্বর বাবু কি বলিবেন যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া মনুষ্যের মতিভ্রম জন্মাইয়া তদ্দ্বারা অগ্নির অপ ব্যবহার করাইয়া অনিষ্ট ফল ফলাইলেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে বিবেক ও স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ঈশ্বর এই সংসারকে আমাদের পক্ষে পরীক্ষাস্থল করিয়াছেন। "সৃষ্ট বস্তু" মাত্রেই মুখ্য ও গৌণ কল্পে জীবের প্রয়োজনীয়। কিন্তু অগ্নি কর্ত্তৃক সম্পত্তিনাশ, গৃহনাশ, ও জীবন-নাশ কি জীবের প্রয়োজনীয়? কখনই নহে। অগ্নির উক্ত কার্য্য যে ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তির অন্তর্নিহিত এবং মনুষ্য এক মাত্র স্বাধীনতার সুব্যবহার বা অপব্যবহার দ্বারা যথাযথ ফললাভ করিয়া থাকে, ইহাই বলা যাইতে পারে। "সৃষ্ট" এবং "সৃষ্টি শক্তি মূলে নিহিত" এই বাক্যদ্বয়ের অর্থ এক নহে, অত্যন্ত ভিন্ন।

বীরেশ্বর বাবু লিখিয়াছেন, "এমত কোন কার্য্য নাই যাহা সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে সর্ব্বকালে পাপজনক এবং এমত কোন কার্য্যই নাই যাহা সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে পুণ্যজনক।" একথায় তিনি নিতান্ত অসংলগ্নতার পরিচয় দিয়াছেন। বিবেক গম্ভীর নিনাদে ঈশ্বরবাণীকে ঘোষণা করিয়া বলিল যে—"ব্যভিচার করিও না।" তুমি জলে যাও, স্থলেই থাক বা গগণ তলে বিচরণ কর, এ বাণীর কখনই অন্যথা শ্রবণ করিবে না। সত্য চির কালই সত্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা স্বর্ণ ছিল, অদ্য কি তাহা ব্যক্তি বিশেষের কল্পনা শক্তির পরিবর্ত্তনে লৌহ হইবেক? অসত্যের বা অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা কর, অমনি প্রাণে আঘাত লাগিবে। হৃদয়ের গভীর নিভৃত স্থানে অন্যায় কার্য্য কর, হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, অনুভব করিবে, এবং শত শত মিথ্যা যুক্তি দেখাইয়া প্রাণকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা কর, কিন্তু তোমার প্রাণ কিছুতেই অন্যায়কে ন্যায় বলিবে না। এইরূপে ন্যায় ও সত্য কিছুতেই কোন কালে পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। তবে বীরেশ্বর বাবু যে কিরূপে সোণার ভিতরে মেকি

চালাইতে চাহেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বীরেশ্বর বাবুর মতের পোষকতা করিতে হইলে, সময় ও অবস্থানুসারে চুরি, মিথ্যা ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য নহে। এরূপ মত সমাজের দৃষ্টিতে অতি ভীষণ ও পাপ মূলক। বীরেশ্বর বাবু সিংহ, ব্যাঘ্র,ইন্দুর,সর্প প্রভৃতির চৌর্য্য ও পরানিষ্টকারিতাকে মানব প্রকৃতির দৃষ্টান্তানুযায়ী করিয়াছেন। সর্পের পরানিষ্টকারিতা বৃত্তি আছে, কিন্তু সর্প আবার এই বৃত্ত্যানুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া অনেক সময় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দেখিতেছি, ঈশ্বর সর্পকে এই হিংসা বৃত্তি দিয়া তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়াছেন। আবার দেখিতেছি,এই বৃত্তির অনুসরণে সর্প জীবনও হারাইয়া থাকে। স্বাভাবিক বৃত্তির অনুসরণে সর্প কেন মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, বীরেশ্বর বাবু কি এ প্রহেলিকার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারেন? সর্পকে আমি বাল্যকাল হইতে কেবল অনিষ্টকারী বলিয়া অবগত ছিলাম, কিন্তু যখন বিজ্ঞান প্রকাশ করিল যে, সর্পবিষ মনুষ্যকে উৎকট পীড়া বিশেষ হইতে আরোগ্য করে,--সর্প নিভৃত দুর্গন্ধময় প্রদেশে বাস করিয়া তৎস্থানীয় বিষময় বায়ুকে ভক্ষণ করিয়া দূষিত বায়ু-প্রসূত মারীভয় ও পীড়ার আশঙ্কা নিবারণ করে, তখন মোহিত হইলাম। সর্প সৃষ্টির এই গূঢ় তাৎপর্য্যের ভিতরে বিধাতার জ্ঞান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিলাম, তাহাতে অবাক হইলাম। কে বলিতে পারে যে, সর্পের এই হিংসা বৃত্তির সহিত উহার দুর্গন্ধময় বায়ু-ভক্ষণ-প্রবৃত্তির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই। অর্থাৎ উহার এক বৃত্তি অন্য বৃত্তির সামঞ্জস্য স্থাপক নহে? পশু পক্ষ্যাদি জন্তুরা প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ। পশুদিগের সন্তানোৎপত্তির নিয়ম পর্য্যালোচনা কর, অনায়াসেই এই কথা বুঝিবে। কেবল মনুষ্যই স্বীয় স্বাধীনতা দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের সু কিম্বা অপব্যবহার করিতে পারেন। মৎস্য, কীট, পতঙ্গ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর সৃষ্টি প্রণালীতে যে মহান উদ্দেশ্য আছে, তাহা আমরা সম্যক অবগত নহি। উহাদের সম্বন্ধে আমরা যাহাকে চৌর্য্য, পরানিষ্টকারিতা মনে করি, জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হইলে হয়ত দেখিব যে, উহা পরানিষ্টকারী হওয়া দূরে থাকুক, পশু রাজ্যের মঙ্গল ও শান্তির নিয়ামক। স্বাধীন মনুষ্যের সহিত প্রাকৃতিক নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুদিগের তুলনা কেন? যা'ক্, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া মস্তিষ্ক-উষ্ণতা সম্পাদনের প্রয়োজন নাই। পাপ পুণ্য আধ্যাত্মিক বিষয়। এ বিষয়ে পশু রাজ্যের উদাহরণ মনুষ্যের অনুকরণীয় হইতে পারে না।

আবার বীরেশ্বর বাবু স্বীয় ভ্রান্ত মতের পোষকতা জন্য একটী কথা লিখিয়াছেন, যথা মিথ্যাও অবস্থা বিশেষে কহা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মহাভারত হইতে কয়েকটী উদাহরণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবু যদি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে মহাভারতীয় আখ্যায়িকার প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন, তবে মিথ্যার আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কিনা, এবং মিথ্যা কি নিয়মে আত্মাকে কলুষিত করে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। মিথ্যা কথনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সম্প্রতি পণ্ডিতবর বঙ্কিম বাবুর সহিত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে বিচার হইয়াছিল, বীরেশ্বর বাবুকে তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে

অনুরোধ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় শেষ করিলাম। বর্ত্তমান প্রস্তাবের মীমাংসা এই যে, পুণ্য ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং পাপ মনুষ্যের স্বাধীনতার ও বিবেকাদেশের অপব্যবহারের ফল এবং সেই জন্য মনুষ্যকৃত।

শ্রীরসিকলাল রায়।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৬ষ্ঠ) *

মানুষ, চিরকালই মানুষ। রক্ত মাংসের উত্তেজনার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে অনেক সময়েই কঠিন। ধর্ম্মের প্রবল পরক্রমও সময়ে২ এই উত্তেজনার নিকট পরাস্ত হয়। এই সময়ে মানুষকে রক্ষা করিবার উপায় কি? অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে যে দুর্নীতি ও অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইবে, তাতে আশ্চর্য্য কি? আমাদের কোন প্রবীণ শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম ভ্রাতা এই প্রশ্নটী করিয়াছেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন, এই গভীর সমস্যার মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রতিবাদকারী গাঙ্গুলী মহাশয় বলেন,—"এতদ্ব্যতীত আপনি এক প্রকারের কার্য্যকে ধর্ম্মের কার্য্য মনে করিতে পারেন, অন্যে তাহাকে সেরূপ করিতে না পারে। সুতরাং ভিন্ন লোকের ভিন্ন সংস্কার বশতঃ এই বিষয়ে মতের একতা থাকা কঠিন।" কোন্‌টী ধর্ম্মের কার্য্য, কোন্‌টী নয়, এ সম্বন্ধে যদি সকলের একরূপ বোধ না হয়, তবে কোন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে পারে কি না, বড়ই সন্দেহ। ধর্ম্মমত একরূপ না হইলে সমাজের একপ্রাণতা সংগঠিত হওয়া কঠিন। যেখানে ধর্ম্ম মতে আকাশ পাতাল প্রভেদ, সেখানে নীতিবোধেও আকাশ পাতাল প্রভেদ। ধর্ম্ম ও নীতি উভয়ই এক সূত্রে গ্রথিত, বিজড়িত। একটীকে উড়াইয়া দেও, অন্যটী অমনি ঢলিয়া পড়িবে। ধর্ম্ম ও নীতিবোধ যদি সকলের একরূপই না হওয়া সম্ভব হয়, তবে আর সমাজের দাঁড়াইবার ঠাঁই কোথায়? সমাজের মূল ভিত্তি—নীতি ও ধর্ম্মবন্ধন, এই দুটী যেখানে নাই, কিম্বা যেখানে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত, সে সমাজ পৃথিবীতে অতি অপকৃষ্ট সমাজ, স্বেচ্ছাচারিতার আধার। কেন?—সংক্ষেপে বলিতেছি।

মনে কর, মনোনয়ন-প্রথা অনুসারে বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। বর কন্যা, কোর্টসিপের অবস্থায়, পরস্পরকে চুম্বন করিতেছেন। এমন লোক আমাদের দেশে অনেক আছেন, একথা শুনিলে যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ কার্য্য করিয়াছেন বা করিতেছেন, অন্ততঃ তাহারা ইহাকে ধর্ম্মের কার্য্য মনে করিতে পারেন। যে যে কার্য্য করে, সে তাহাকে কোন না কোন রূপে ভাল কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেই করে। মনে কর, কোর্টসিপের অবস্থায়, উভয়ে

---

* বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে নূতন আন্দোলন উঠিয়াছে বলিয়া গত বারে শ্রীযুক্ত সোম মহাশয়ের কতকগুলি কথার উত্তর দিতে হইয়াছে। এইরূপ উপস্থিত নানা অবান্তরিক কথার আলোচনা করায় আমাদের প্রবন্ধটীর সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইতেছে, বুঝি। কিন্তু এ সকল না করিয়াও পারা যাইতেছে না। এই প্রবন্ধ যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে, তখন আমূল সংশোধিত করিয়া যথাযথরূপ করা যাইবে।

উভয়ের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন, পবিত্র ভাবে (?) পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছেন। অনেকে এরূপ কার্য্যকে অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু করিলে কি হইবে? ধর্ম্ম ও নীতির মত ত সকলের একরূপ নয়;—এইরূপ আলিঙ্গনের পক্ষপাতী বর কন্যার দল ইহাকেই ধর্ম্ম ও নীতির লক্ষণ মনে করেন। কি করিবে বল? আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া প্রয়োজন নাই। যৌবন-বিবাহে এরূপ ঘটনা কাল্পনিক নয়। এই সকল জঘন্য কার্য্য করিয়া লোকেরা সমাজকে অধঃপাতে দিবে, অথচ মতের বিভিন্নতা থাকিতে পারে বলিয়া, তাহা পুণ্য এবং সুনীতির নামে বিক্রীত হইবে, ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা সমাজের আর কি হইতে পারে? যে সমাজে এরূপ হয়, সে সমাজ স্বেচ্ছাচার সমাজ নয় ত কি? নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সমাজে সকলের একরূপ ধারণা নাই, সে সমাজ স্বেচ্ছাচারিতার পূতিগন্ধময় নরকে নিমজ্জিত। সেখানে বিবেকের দোহাই দিয়া, যার যা ইচ্ছা, সে তাহাই অবাধে করে। ব্যক্তিগত বিবেকের শাসকরূপে মানব সাধারণের সমবেত বিবেকশক্তি যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তবে মানুষকে দুর্নীতি হইতে কে রক্ষা করিবে? ব্যক্তিগত খেয়ালের দুষ্কার্য্যরূপ মলিনতা হইতে কে রক্ষা করিবে? বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত বিবেক-স্বাধীনতা প্রচারে যে অপকার হইতেছে, পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখাইয়াছি, ব্যক্তিগত বিবেক-স্বাধীনতার শাসনের জন্য সমাজের সমবেত বিবেকের মহাস্বর বা মহাশক্তির উত্থানের একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে, আজ যাহা নীতি, কাল তাহা দুর্নীতিতে; আজ যাহা দুর্নীতি, কাল তাহা সুনীতি রূপে প্রচারিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে যদি নীতি ও ধর্ম্মের মূলভিত্তি স্থিরীকৃত না হয়, তবে এই সমাজ যে দেশের মহা কলঙ্কের সমাজ হইবে, তাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা ব্রাহ্মসমাজকে এখনও সেরূপ স্বেচ্ছাচারী সমাজ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আমরা মনে করি, মূলধর্ম্মে বিভিন্নতা অতি অল্প; একতাই ধর্ম্মের লক্ষ্য। তবে সামান্য সামান্য বিষয়ে বিভিন্নতা থাকা সম্ভব। মানুষের আকৃতি পৃথক, মনের অবস্থা পৃথক, কিন্তু আবার দেখ, এক উপাদানে মানুষ নির্ম্মিত। পরস্পরের অস্থি মাংস প্রভৃতির সংখ্যা এবং আকৃতি প্রায় সর্ব্বস্থানেই একরূপ। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধেও অবান্তরিক স্থলে সহস্র সহস্র মতভেদ সম্ভব, কিন্তু আবার মূলে মিলনও অতি আশ্চর্য্যজনক। মূলে ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। ধর্ম্ম কার্য্য মূলে এক। মূল ভিত্তিতে সকলে এক। একের কোলে যখন, তখন সকলে এক। অনন্ত প্রকৃতি সেখানে একীভূত। পৃথিবীতে যত সম্প্রদায় আছে, যত দল আছে, সকলেরই দাঁড়াইবার, মিলিবার একটা ঠাঁই আছে। ব্রাহ্মসমাজে যদি তাহা অসম্ভব হয়, তবে এটী একটী পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইবে।

বাঁধাবাঁধি নিয়ম করায় দোষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু গুণও অনেক আছে। আমাদের বিবেচনায় সমাজ স্থাপন, একথাটী বলিলেই বাঁধাবাঁধি নিয়ম বুঝায়। কোন নিয়ম রাখিবে না, কোন এক প্রথা অন্ততঃ কতকদিনও মানিবে না, যার যা ইচ্ছা তাকে সেইরূপই করিতে দিবে, অথচ জগতের কাছে বলিবে, একটা ধর্ম্ম সমাজ গঠন করিতেছ, এ যে কিরূপ কথা, বুঝি

না। সমাজ থাকিলেই মূলে একতা থাকা চাই। সমাজের মূলবন্ধন,ধর্ম্ম ও নীতি। ধর্ম্ম ও নীতির একতা নাই, সুসমাজ আছে, ইহা অসম্ভব। যদি সে রূপ কোন সমাজ থাকে, তবে তাহা সমাজ নহে, নরক। ব্রাহ্ম সমাজকে নীতিবন্ধনে ও ধর্ম্মবন্ধনে যাঁহারা বাধিত পারিবেন না, তাঁহারা যে কেমনে ইহাকে রক্ষা করিবেন, জানি না। যদি ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশের মত গাঙ্গুলী মহাশয়ের ন্যায় হয়, তবে এ সমাজ হইতে কাজেই সময়ে দূরে পলায়ন করিতে হইবে।

এখন আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রবীণ বিজ্ঞ ব্রাহ্ম ভ্রাতার কথা কয়েকটীর একটু আলোচনা করি। যৌবন বিবাহে দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় পাওয়ার সম্ভাবনা খুব অধিক, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। কিন্তু নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যদি অন্ততঃ অধিকাংশ লোকের একটী অচল পাকা মত দাঁড় করান যায়, তবে নীতি-শিথিলতা নিবারণের যথেষ্ট উপায় আছে। সমাজ মানবমণ্ডলীর বিবেকসমষ্টির অনুমোদন দ্বারা চালিত এবং সুরক্ষিত। অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং গুরু ভিন্নও সমাজ চলিতে পারে, এবং সেটা কিছু নূতন কথা নয়। অধিকাংশ ব্যক্তির সমবেত বিবেকানুমোদিত পথে, বাধ্য হইয়া, বিপথগামী ব্যক্তিকে চলিতে হয়। না চলিলে সমবেত বিবেক শাসকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া মানুষকে শাস্তি দেয়। সমবেত বিবেকের দ্বারা যে সমাজে একটী আদর্শ মত বা প্রণালী স্থিরীকৃত না হইয়াছে, সেই সমাজের পতনের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানে সমবেত শক্তিতে একটা মত দাঁড়াইয়াছে, সেখানে সেই মতকে মান্য করিয়া সমাজের লোক চলিতে বাধ্য। মনে কর, এক সমাজে পঞ্চাশ জন লোক। ৪০ জন লোকের বিবেকের দ্বারা একটা নীতি ও ধর্ম্মমত স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাকী দশজন ব্যক্তি তাহাতে মিলে নাই। তাহারা বিপথে যাইতেছে। সে স্থলে সেই দশ জন ব্যক্তিকে, সমবেত বিবেকশক্তি, শাসকরূপে দাঁড়াইয়া, বিপথ হইতে ফিরাইবেই ফিরাইবে। বিবেকের শাসন বড় ভয়ানক শাসন। মানুষ আপন বিবেকানুসারে যখন চলে না, কিম্বা স্বেচ্ছা যখন বিবেক স্থানীয় হইয়া ভ্রমসঙ্কুল পথে মানুষকে চালায়, কুকার্য্যে যখন মানুষ মজে, তখন মানব সমাজের সমবেত বিবেকশক্তি তাহাকে ফিরাইয়া আনে। প্রকৃত বিবেকের শাসনে প্রহার নাই, নির্যাতন নাই, কর্কশ কথা নাই, রাগ নাই, বিদ্বেষ নাই, অথচ সে শাসনের নিকট সকলে পরাস্ত। বিবেক শক্তি জগতের রাজা,রাজার রাজা, সমাজের নেতা। ইহাকে উপেক্ষা করে, কার সাধ্য? রক্ত মাংসের ক্ষমতা অনেক বটে, কিন্তু মানবের সমবেত বিবেকশক্তির ক্ষমতা দুর্জ্জয়। একটার সীমা আছে, অন্যটার সীমা নাই। এই অসীম শক্তির নিকট দুর্দান্ত সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী মানুষও অবনত। এ শক্তি কি সামান্য শক্তি? বিশ্বাধার চিৎস্বরূপ এই শক্তিতে বিদ্যমান। এ শক্তি তাঁহারই শক্তি, মানুষ উপেক্ষা করিবে, সাধ্য কি? আমরা মানুষের পরাক্রমের কথা, রক্ত মাংসের দুর্দ্দম্য শক্তির কথা যখনই ভাবি,তখনই মনে হয়, যদি সমবেত বিবেকের একটা শক্তি সমাজের মধ্যে দাঁড় করান যায়, তবে বুঝি বা ভয়ের আর কোন আশঙ্কা থাকে না। সমবেত বিবেকের অনুমোদনে নীতির

মূল ভিত্তি স্থিরীকৃত হওয়া নিতান্ত সম্ভবপর বলিয়া মনে করি। এই বিবেকের দ্বারাই চিরকাল নীতির মূল স্থিরীকৃত হইয়াছে। যাহা এত কাল হইয়াছে, এখনও তাহাই হইবে। ব্রাহ্মসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের একটা অটল ভিত্তি নিরূপিত হইলে, যৌবন-বিবাহে নীতি-শিথিলতার সম্ভাবনা থাকিলেও,তাহা নিবারিত হইবে। যে বিবেকের নীরব শাসনের দ্বারা পতিতা য়িহুদী রমণীর উদ্ধার হইয়াছিল, জগাই মাধাইর ন্যায় শত সহস্র পাষণ্ড জীবন পাইয়াছিল, সেই বিবেকের শাসন সামান্য শাসন নয়। মানুষ, তুমি দুর্বৃত্ত পশুসম মানব রিপুর দুর্দ্দান্ত প্রতাপ দেখিয়া ভীত হইয়াছ? ভয় নাই। এই বিবেক-শাসনের নিকট উপস্থিত হইলে অমনি তাহার মস্তক অবনত হইবে। ব্রাহ্মসমাজে বিবেক শাসনের প্রবল প্রতাপ কিছু মন্দীভূত হইয়াছে বলিয়া আজ কাল প্রবীণ ব্যক্তিগণও ভীত হইয়াছেন। কিন্তু অটল বিশ্বাসী কেশব চন্দ্রের সময়ে সেরূপ ভয় ছিল কিনা, সন্দেহ। তখন মানুষ দুর্নীতি বা অন্যায় কার্য্য করিলে প্রশ্রয় পাইত না। এখন বিবেকশক্তি কতক শিথিল, কতক মন্দীভূত, তাই যার যা ইচ্ছা করিয়া যাইতেছে, কেহই কিছু গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। তাই পাপীও বুক ফুলাইয়া পাপ কার্য্যের পোষকতা করিয়া ফিরিতেছে। এই পৃথিবী এমন ঠাঁই, এখানে সকল কার্য্যেরই পরিপোষক পাওয়া যায়। এই নীতিশিথিলতারও পরিপোষক জুটিতেছে। দশ জনে যে কার্য্যকে ঘৃণা করিতেছে, আর দশ জন সেই কার্য্যেরই পোষকতা করিতেছে। দশ জন যে বিবাহে যোগ দিতেছে না, আর দশ জনের দ্বারা সেই বিবাহই সংসাধিত হইতেছে। এমন কি, দুষ্কার্য্য করিয়া পরে কোন নিভৃত প্রদেশে যাইয়া বিবাহ করিয়া আসিতেছে। যাহাদের সমক্ষে অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাঁহারা ত আর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে না,সুতরাং বিদেশে যাইয়া নূতন বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে বিবাহিত হইয়া বুক ফুলাইয়া ফিরিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের বিবেক-শক্তির যে গভীর হুঙ্কার কুচবিহার বিবাহের সময় ভারতবর্ষে বিষম আন্দোলন তুলিয়াছিল, সেই সমবেত বিবেকশক্তির তেজ যেন আজ মন্দীভূত। নচেৎ ব্রাহ্মসমাজে পাপকার্য্য প্রশ্রয় পায়, অথচ কেহ কথা বলে না। ছি, পাপকার্য্যও আবার ধর্ম্মের নামে বিক্রয়ের চেষ্টা! সমাজ ডুবিয়া যায়, অথচ মানুষ সচকিত হয় না! দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নাকি আজ আবার মানুষকে জাগাইতে হইবে! চখের সন্মুখে নানা বীভৎস ব্যাপার সকল ঘটিতে দেখিয়াও যাহারা দৃষ্টান্ত দেখিতে চায়, চিরনিদ্রিত তাহাদিগকে আর কে জাগাইয়া দিবে? আমরা স্থানে স্থানে যেরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে যে, বিবেকের শাসন যেন ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজে মন্দীভূত হইতেছে। রিপুর উত্তেজনায় উন্মত্ত যুবক বৃন্দের তাই এত উল্লাস, তাই এত আস্ফালন! এই আস্ফালনে যদি কোন ভয়ের কারণ থাকে, তবে সে কারণ এই যে, সমবেত বিবেক-শক্তি শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে। এই দুর্জ্জয় প্রহরী বিবেক-সিংহকে জাগাইয়া রাখিতে পারিলে আর ভয় কি,ভাবনা কি? এই দুর্জ্জয় সিংহ যদি মরণের কোলে চির-

নিদ্রিত থাকে, তবে কেবল যৌবন-বিবাহে কেন, বাল্যবিবাহেও ভয়ানক দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইবে।

আমরা বলিয়াছি, সমবেত বিবেক-শক্তির অনুমোদনে নীতির একটী ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে; এবং ব্রাহ্ম সমাজে তাহা প্রতিষ্ঠিত করার বড়ই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। নীতিবোধ, ধর্ম্মবোধ না থাকাতেই যে ব্রাহ্ম সমাজে দিনে দিনে নীতি-শিথিলতার কারণ ঘটিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নূতন সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, নূতন নূতন লোকের সমাগমে, পুরাতনের স্থানে অনেক নূতন হাব-ভাব প্রশ্রয় পাইতেছে। পুরাতন ও নূতনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, নূতন নীতি-আইন প্রণয়ন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেবল নবীন লোককে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, প্রবীণ জ্ঞানী ধার্ম্মিক লোকদিগকেও এই সময়ে খাটিতে হইবে। অনুদার সঙ্কীর্ণমনা বলিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিলে ভাল হইবে না। সমবেত শক্তি ও সমবেত কার্য্য চাই। নীতির আইন-প্রণেতা—মানব সমাজের সমবেত বিবেকশক্তি। এটা অন্যায়, কি সেটা অন্যায়, এইরূপ বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া, প্রত্যেকে স্বীয় বিবেকের ধুয়া ধরিয়া স্বেচ্ছার পথে না যাইয়া, প্রত্যেকে রাজত্ব করিতে প্রয়াসী না হইয়া, সকলে মিলিয়া একটা রাজা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করুন। এইরূপে একটা নীতির ভিত্তিমূল গঠিত হউক। পরস্পরের মতকে উপেক্ষা করা সহজ; কার্য্য। পরস্পরকে ঘৃণা করা আরো সহজ, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিধাতার যে লীলা-মাহাত্ম্য দেদীপ্যমান, তাহার মাহাত্ম্যে একটী সমবেত বিবেকভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন বটে। কিন্তু কঠিন হইলে কি হইবে, ইহা করিতে না পারিলে উশৃঙ্খল সমাজ যে কেমনে রক্ষা পাইবে, কে যে রাজ্যকে পালন ও সংরক্ষণ করিবে, বুঝিনা। একটা কিছুকে authority র ন্যায় মান্য করিতেই হইবে। সে authority এই সমবেত বিবেকশক্তি। ব্রাহ্মসমাজে অন্য কোন authority প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই ঝগড়া বিবাদ, কলহ বিদ্বেষের দিনে যে সকল ধার্ম্মিক প্রবীণ ব্যক্তি এই পবিত্র কার্য্যে সিদ্ধ-মনোরথ হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা এই সমাজের অনেক উপকার হইবে। এইরূপ নিয়মের পক্ষপাতী হইয়াই, মহাত্মা কেশব চন্দ্র নবসংহিতা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজের সমবেত বিবেক-শক্তির দ্বারা তাহা গঠিত নয় বলিয়া, তাহা উপাদেয় হইলেও, গুরুবাদের আশঙ্কায়, অনেকে সে পুস্তককে আদর্শ করিয়া চলিতে পারিতেছেন না। পরন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক সে পুস্তককে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। সে যাহা হউক, সমাজ রাখিতে গেলেই এরূপ নিয়ম প্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে। না করিলে মঙ্গল নাই। ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচারিতার অবস্থায়, সেরূপ নিয়ম প্রস্তুত হইতে পারিবে কি না, সে বিষয়ে কিন্তু আমরা বড়ই সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পাইয়াছে, এবং পাইতেছে, ব্রাহ্ম সমাজে আর বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থাপন করা সম্ভব কি না, বড়ই সন্দেহের বিষয়। অন্য সমাজের লোকেরা বা "শত্রুরা" ব্রাহ্ম সমাজকে প্রসংশা করিলেই স্বর্গলাভ হয় না। আমরা যাহা জানি, সে সম্বন্ধে অন্যের অন্যায় প্রশংসা আমাদের প্রাণে আরো বাজে। অন্যের প্রশংসার ভিখারী না হইয়া, বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তায় সকলেরই মনোনিবেশ করা উচিত।

অন্যান্য কথা ক্রমে ক্রমে লিখিব।

কবির পথ প্রশস্ত, দিগন্ত প্রসারিত। প্রতিভাবলে তিনি ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে, নীচ হইতে উচ্চে, সান্ত হইতে অনন্তে উঠিতে পারেন। "জগতের সার সুখ প্রতিভা; প্রতিভাই ঈশ্বরকে দেখায়।" যে প্রতিভাবলে কুন্দ-সূর্য্যমুখীর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, যার তেজে ভ্রমরা-মৃণ্ময়ী জন্মিয়াছিল, সেই প্রতিভাই প্রফুল্লমুখীকে গড়িয়াছে, আজি সেই প্রতিভাগুণেই বঙ্গসাহিত্য জয়ন্তীর ভস্মাবৃত অনিন্দ্য রূপমাধুরী, সংসারাসক্তি-বিবর্জিত, ভগবৎ-প্রেমে চিত্ত-সমর্পিত, নির্ম্মল-নিষ্কাম-ধর্ম্ম-নিয়োজিত ভৈরবীবেশ দেখিতে পাইতেছে। প্রতিভার স্রোত ফিরিয়াছে, মহান্ হইতে মহত্তর পথে প্রধাবিত হইতেছে। প্রবল স্বদেশানুরাগ ও বিশুদ্ধ শান্তিরসাম্পদ নিষ্কাম ধর্ম্ম সমসূত্রে জড়িত হইয়া কবির প্রতিভা নিত্য নব মোহন চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। 'আনন্দমঠে' এ স্রোতের উৎপত্তি, 'দেবী চৌধুরাণী'তে তার বিবৃতি, 'সীতারামে' উহার পরিণতি। 'দেবী চৌধুরাণী'র উপসংহারে কবি প্রফুল্লমুখীর মুখ দিয়া 'গীতা' শাস্ত্রোক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কথিত এই কথা বলাইয়াছিলেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

আমরা কবির প্রসাদে বর্ষে বর্ষে দুষ্টের দমন, সাধুর পালন, ধর্ম্ম সংরক্ষণের অবলম্বন ভগবানের অবতার স্বরূপিনী শান্তিরূপিণী দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিতেছি! গৃহিণী সাজে সাজাইয়া, কবি প্রফুল্লমুখীর দ্বারা প্রজা বিদ্রোহের শান্তি সংরক্ষণে, নিষ্কাম কর্ম্মের জলন্ত শিক্ষাদানে যত্ন করিয়াছিলেন; আজি আবার শ্রীকে অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর দ্বারা মুসলমানের অরাজকতা নিবারণে ও ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য সংস্থাপনে, সেই পবিত্র কর্ম্মযোগের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইয়াছেন। 'আনন্দমঠ,' 'দেবী চৌধুরাণী' 'সীতারাম' তিন খানিতেই কবি একটু ইতিহাসের ছায়া ফেলিয়াছেন। কেলা কেন?—ঐতিহাসিক অস্ফুট একটু ছায়ার উপর কবি ঐ তিন খানি অদ্ভুত ভাবুকতাময় মহাকাব্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন খানিকেই ঐতিহাসিক চক্ষে দেখিতে বলেন নাই। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক দুই একটী নাম ও ঘটনার ঈষৎ অস্ফুট আভা ভিন্ন ঐতিহাসিকতা উহাতে কিছুই নাই। "অন্তর্ব্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান" হওয়াই কবির কার্য্য—ইতিবৃত্তের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

'গীতা'শাস্ত্রোক্ত কয়েকটী শ্লোকের দ্বারা কবি 'সীতারাম' কাব্যের মুখবন্ধ করিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম কাণ্ডের ইতর-বিশেষত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যখন সন্দিহান চিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্ম যোগের উপযোগীতা ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করেন, তখন অনন্ত-তত্ত্বজ্ঞ জগদীশ্বরের অংশ স্বরূপ লোকপাবন শ্রীকৃষ্ণ সংক্ষেপে কর্ম্মযোগের মূলসূত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য যেরূপ বিবৃত করিয়াছিলেন, কবি প্রথমে তাহাই

উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীকে কর্ম্ম-যোগাভ্যাস শিক্ষা দেওয়াই 'সীতারাম' কাব্যে জ্ঞানময়ী জয়ন্তীর একমাত্র কার্য্য। কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই তিন মহান্ যোগসূত্রে সমগ্র 'গীতা' শাস্ত্র গ্রথিত। কবির কল্পনা কৌশলে এই তিনই সমভাবে প্রধান বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এতিনের ক্রম-বৈষম্য অনুভব করা যাইতে পারে। কর্ম্মই সাধনার প্রথম সোপান, ধ্যানে তাহার অবস্থান, জ্ঞানে উহার পরিণাম। ঐহিক সুখদুঃখানুভূতি বিসর্জ্জন দিয়া, নিকৃষ্টবৃত্তি সমূহকে বশীভূত করিয়া আসক্তি শূন্য হইয়া, ফলাফলে লক্ষ্য না রাখিয়া, ভগবানে আত্মা-মনঃ-প্রাণ সমর্পন করিয়া, নিষ্পাপ নির্ম্মল কার্য্যানুষ্ঠান করাই সাধনার মূল উপকরণ। ক্রমে ধ্যানবলে সেই নির্ব্বিকার পরমপুরুষে চিত্ত প্রতিনিয়ত যুক্ত রাখিলে, সাংসারিক বাহ্য লালসা তিরোহিত হয়, কর্ম্মকাণ্ড শিথিল হইয়া পড়ে, চিত্তের সমগ্রগতি ভগবৎ-প্রেমে সংযুক্ত হয়। তখন প্রকৃতির বিনাশ ঘটে, ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হয়, আত্মার সত্তা পরমাত্মায় বিলীন হয়। এই অবস্থাই জ্ঞানযোগ। একার্য্য একদিনে সিদ্ধ হয় না; কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি ঘটে না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে সিদ্ধি বা জ্ঞান লাভ হয় না। জয়ন্তী কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তসংযত করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানের সীমায় পৌঁছিয়াছেন; তাঁহার শিক্ষায় শ্রী এখন কর্ম্ম অভ্যাস করিতেছেন, নিষ্কাম হইতে শিখিতেছেন, ভক্তিরসে ডুবিয়াছেন। সাধনার এই মহদুপকরণ দেশে দেশে বিঘোষিত হউক, জয়ন্তীর নিকট সকলে নিষ্কাম কর্ম্ম শিক্ষা করুক।

'সীতারাম' কাব্যের দ্বিতীয় শিক্ষা 'গীতার' দ্বিতীয় অধ্যায়স্থ কয়েকটী শ্লোকে নিহিত।—বিষয়-চিন্তাশীল পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধি বিপর্য্যয় এবং বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে বিনাশ সংঘটিত হয়। রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত বশীকৃত-চিত্ত পুরুষেরা আত্মসংযত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা বিষয় সম্ভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।—কবি সীতারামের চরিত্রে এই মহত্তত্ত্ব জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত করিয়াছেন। যে সীতারাম এক সময়ে আপন জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া পরের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন,—হিন্দুকে হিন্দু রাখা অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বলিয়া যাঁহার তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল,—বিজাতীয়ের অত্যাচার নিবারণের উপকরণ স্থির করিবার জন্য যাঁহার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ক্ষণেকের জন্য অন্তরাকাশে সত্যের বিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছিল,—"অনন্ত, অব্যয়, নিখিল জগতের মূলীভূত, সর্ব্বজীবের প্রাণ স্বরূপ, সর্ব্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা, সর্ব্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা, তাঁহার শুদ্ধি, জ্যোতি, অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিতে" যাঁহার চিত্ত সমর্থ হইয়াছিল,—

"ধর্ম্মই ধর্ম্ম সাম্রাজ্য সংস্থাপনের উপায়" বলিয়া যাঁর অন্তরে প্রবল প্রতীতি

জন্মিয়াছিল, শ্যামপুরের (ওরফে মহম্মদপুরের) সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা হইয়া, বাহুবলে বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধি-

পত্য স্থাপন পূর্ব্বক মহারাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া, সেই উদারচিত্ত, সুকর্ম্মঠ, সত্যনিষ্ঠ সীতারাম রায়ের চিত্তবিকৃত হইল,—ভোগলালসা প্রবল হইল,—এই সুখের রাজ্যে শ্রীর সুখ সমাগম দেখিতে, নন্দা-রমার উপর তাঁহাকে পট্টমহিষী করিতে, সেই পরিত্যক্তা প্রেয়সীর সহিত প্রাণ ভরিয়া একবার প্রেমসংবাস করিতে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িল। তাঁহার আর "হিন্দু সাম্রাজ্য সংস্থাপন করা হইল না।" বহুকাল পরে অবস্থা পরম্পরায় শ্রীকে নিকটে পাইয়াও, তিনি সে লালসা চরিতার্থ করিতে পারিলেন না ;—তাঁহার রাজ্যের রাজ মহিষী, গৃহের গৃহিণী, সেই সেকালের শ্রী, না দেখিয়া 'মহামহিমময়ী দেবী প্রতিমা' দেখিলেন,—তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, রূপ-রশ্মি-তেজে নয়ন ঝলসিয়া উঠিল, কি এক অব্যক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিটিল না ; কত অনুনয়-বিনয়ে, কত কল-কৌশলে, কত যুক্তি-তর্কে তিনি শ্রীকে আপন মন্তব্য পথে আনিতে চেষ্টা করিলেন,—ডাকিনী শ্রীর (সীতা-রামের চক্ষে এখন ডাকিনী ভিন্ন আর কি ?) মন কিছুতেই টলিল না, তিনি সুখের সংসারে সংযুক্ত হইতে কিছুতেই স্বীকৃতা হইলেন না। অগত্যা 'চিত্তবিশ্রাম' প্রমোদ-ভবনে তাঁহার বাসস্থান নির্ণীত হইল। সীতারাম, বিষয়-বৈভব ভুলিয়া, রাজ-কার্য্য-পরিচালন-কর্ত্তব্যতা বিস্মৃত হইয়া, প্রতিনিয়ত শ্রীর নিকট বসিয়া থাকিতেন ; শ্রী সর্ব্বসুখে নিস্পৃহ হইয়া অবিরাম ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতেন, মধুর হরিনামের তরঙ্গ তুলিতেন,—রূপজ মোহে মুগ্ধ সীতারাম বুদ্ধি-বিপর্য্যয় বশতঃ তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না, সে রস-তরঙ্গে ডুবিতেন না, কেবল অনিমিষ লোচনে বরবর্ণিনী শ্রীর রূপমাধুরী দেখিতেন, তাঁহার কোকিল-নিন্দিত কলকণ্ঠের মধুরতায় বিভোর থাকিতেন, ভোগাকাঙ্ক্ষা ততই বলবতী হইত। চন্দ্রচূড় ঠাকুর দেখিলেন, রাজ্য ধ্বংস হয় ; সীতারামকে কত বুঝাইলেন, মতি ফিরাইতে কত চেষ্টা করিলেন, কোন ফল ফলিল না। সুবর্ণ পিঞ্জরাবদ্ধা শ্রীও প্রজ্ঞাচক্ষু বলে রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা, রাজার আত্ম-বিস্মৃতির ফল বুঝিতে লাগিলেন ;—তিনিও সীতারামের মোহান্ধকার ঘুচাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। এমন সময় দৈবগতিকে জয়ন্তী আসিয়া জুটিলেন ; শ্রীর অপূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণতা হইল, মন্ত্রণার মন্ত্রী মিলিল। উভয়ে পরামর্শ করিয়া শ্রীর পক্ষে এই পাপ সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ-বলিয়া স্থির করিলেন। কৌশলে শ্রীকে তাড়াইয়া জয়ন্তী চিত্ত বিশ্রামের অবরোধস্থ হইলেন,—অবাধ-বিচরণ-শীলা বিহঙ্গনী স্বসাধে শৃঙ্খলাবদ্ধা হইলেন। ভোগলোলুপ সীতারামের ভোগবাসনা পূরিল না, তাঁহার ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি ভৈরবীকে শ্রী-নির্ব্বাসন-ষড়যন্ত্রের যন্ত্রী স্থির করিয়া, তাঁহাকে রাজ্যের প্রকাশ্য স্থলে বিবস্ত্রা করিয়া, চণ্ডাল মুসলমান কর্ত্তৃক বেত্রাঘাত করাইতে কৃতযত্ন হইলেন। ক্রোধ, মোহ, আত্ম-বিস্মৃতি, বুদ্ধি-বিপর্য্যয় একে একে সমস্তই পূর্ণমাত্রায় দেখা দিল ; ক্রমে ধ্বংস ;—এত আয়াস-লব্ধ, এত সুখের, এত সাধের রাজধন বিনষ্ট হইল, পতি-প্রাণা সহধর্ম্মিণী রমার অকাল-বিয়োগ ঘটিল, নিজেও শোকে, তাপে, মুমূর্ষু ভাবে সপরিবারে দেশত্যাগী হইলেন। চিত্ত

সংযম করিতে না শিখিলে, অন্যবিধ সহস্র গুণ সত্ত্বেও, পুরুষের এইরূপ দুর্গতি ঘটে।

'সীতারাম' কাব্যে প্রধানত চারিটী স্ত্রী-চরিত্রের সমাবেশ—রমা, নন্দা, শ্রী ও জয়ন্তী। দুইটী গৃহিণী—একটী কভু গৃহিণী, কভু ভৈরবী, কভু (মূঢ়ের ভ্রান্ত দৃষ্টিতে) ডাকিনী,—চতুর্থটী (আমাদিগের সমক্ষে) চির-সন্ন্যাসিনী। ইহাঁদিগের কাব্যগত চরিত্রের সম্যক বিশ্লেষণ করা আমাদিগের সাধ্যাতীত। পাঠকের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, ইঁহাদিগের পূর্ণাবয়ব, সমগ্র সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন; যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা দেখিতে অনুরোধ করি; এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে, আমাদিগের ভাঙা-গড়ায়, তাঁহারা যেন প্রতারিত না হয়েন। রমা ও নন্দা সীতারামের গৃহিণী, রাজার রাণী, সংসারের সঙ্গিনী। শ্রী তাঁহার পরিণীতা পত্নী হইয়াও, বিধির-লিপি খণ্ডাইবার অনুরোধে, পরিণয়াবধি তাঁহার সংসার হইতে বিচ্যুতা। জয়ন্তী সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়া, ভগবৎ-প্রেমানুরাগিনী সন্ন্যাসিনী। সংক্ষেপে ইঁহাদিগের প্রত্যেককে একবার দেখিতে চেষ্টা করা যাউক।

রমা, মহারাজ সীতারাম রায়ের কনিষ্ঠা মহিষী। তিনি পতি-প্রেম ও পুত্র বাৎসল্যের একসূত্র আকর্ষণে আকৃষ্টা মূর্ত্তিমতী সরলতা। সংসারের ভাল-মন্দ বুঝেন না, পরের সুখ-দুঃখ ভাবেন না, রাজ্যের সম্পদ বিপদ্ দেখেন না, মানুষের সারল্য-শঠতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না,—চাহেন কেবল স্বামী পুত্রের মঙ্গল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যাউক, চরাচর বিনষ্ট হউক, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই;—তাঁহার মনের সমগ্র চিন্তা কেবল পতি-পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে। এ প্রেম, এ বাৎসল্য, অবশ্য সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ। ভগ্ন-হৃদয়া বঙ্গ-পুর-মহিলা মহলে অনেকেরই এইরূপ সংকীর্ণ হৃদয়; সমগ্র সংসারকে ভাল বাসিবার, আত্ম-পর সমভাবে দেখিবার, চিত্ত-প্রশস্ততা অতি অল্প ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা রমার স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার প্রথম নিদর্শন দেখিয়াছি, সীতারামের গঙ্গাস্নান-যাত্রার অঙ্কে। এই গঙ্গাস্নানের অন্তরে যে গূঢ় রহস্য নিহিত ছিল, রমা তাহা বুঝিয়াছিলেন, তিনি ছলে, বলে, কৌশলে, বাক্-জালে, চক্ষুর জলে, সে রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন। যখন জানিলেন, শ্রীর ভাইকে রক্ষা করিবার জন্য সীতারামকে সম্ভবত কাজি সাহেবের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে হইবে, তখন সমস্ত বিপদাশঙ্কা করিয়া তিনি সীতারামকে সে পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, (শ্রীর ভাই বাঁচুক মরুক, তাঁহার আসে যায় কি?) তিনি, "বিনা অস্ত্রে" যতদূর সম্ভব তদতিরিক্ত কিছু করিবেন না বলিয়া, সীতারামকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তবে স্থির হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয় অভিনয় সীতারাম ও তোরাব খাঁর বিবাদ বৈরিতা পর্ব্বে। দুরন্ত মুসলমানের সহিত বিবাদ বাধাইলে সীতারাম বিনষ্ট হইবেন, এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল; দিবা নিশি ঐ ভাবনায় তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইল। রাজ্য-ধন বিনষ্ট হউক, সুখ সম্পদ দূরে যাউক, মান-মর্য্যাদা অতল জলে নিমগ্ন হউক, সীতারাম "ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়ুন" তাঁহার কিছুই

ক্ষমা প্রার্থনা করেন, রমার ইহাই ঐকান্তিক ইচ্ছা;—আহার-বিহারে রুচি নাই, পূজাহ্নিকে মতি নাই, কেবল "হে ঠাকুর! মহম্মদপুর ছারে খারে যাক্—আমরা আবার মুসলমানের অনুগত হইয়া দিনপাত করি;—এ মহাভয় হইতে আমাদের উদ্ধার কর"—ইষ্টদেবের নিকট অনুক্ষণ এই প্রার্থনা। স্বাধীনতা প্রয়াসী, অসমসাহসী, সমর-কুশলী, অতুল-পরাক্রমশালী সীতারামের চক্ষে এ ভাব সম্পূর্ণ বিরক্তিকর হইল, এত ভালবাসার "রমা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল।" তখন তাঁহার শ্রীর কথা মনে পড়িল; তাঁহার সহধর্ম্মিনী, "উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী" শ্রীর চিন্তা অন্তরে জাগিয়া উঠিল; সহর প্রান্তে গঙ্গারামের বধ ভূমিতে "মহামহীরুহের শ্যামল পল্লব-রাশি-মণ্ডিতা" শ্রীর সেই "চণ্ডীমূর্ত্তি" সেই বায়ুভরে উড্ডীয়মান "অনাবৃত আলুলায়িত কেশদাম", সেই "মধুরিমাময় দেহ", সেই রণরঙ্গ বিভোর সিংহবাহিনী বেশ, সেই অঞ্চল-ঘূর্ণিত দিগন্ত "নিনাদিত মার—মার! শত্রু মার! দেশের শত্রু,—হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু, মার!" শব্দ একে একে সীতারামের মনে উদয় হইল। এ পাপ সংসারে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল; লঘুচেতা সংকীর্ণ-হৃদয়া রমার সহবাস তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি চন্দ্রচূড়-প্রমুখ কর্ম্মচারীগণের হস্তে রাজ্যভার এবং নন্দার উপর অন্তঃপুরের ভার দিয়া, সম্রাটের সনন্দ-প্রাপ্তি-ব্যপদেশে শ্রীর অনুসন্ধানোদ্দেশে দেশত্যাগী হইলেন। রমার আশায় সীতারাম দেশ ছাড়িলেন, রমা অবশ্য অপরাধিনী—কিন্তু "স্বামী পুত্রের প্রতি আন্তরিক স্নেহই সে অপরাধের মূল। মুসলমানের সহিত বিবাদ করিয়া, "পাছে তাহাদের কোন বিপদ ঘটে, এই চিন্তাতেই তিনি এত ব্যাকুল।"

রমার শেষ অভিনয় তোরাব খাঁ কর্তৃক মহম্মদপুর লুণ্ঠন অধ্যায়ে। সসৈন্যে সহর লুণ্ঠনোদ্দেশে তোরাব খাঁর আগমন বার্ত্তা কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হইয়া রাজ অন্তঃপুরে পৌঁছিল। সম্বাদ রমার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন; মুসলমান সহর লুঠ করিয়া, সকলকে "খুন করিয়া" সহর পোড়াইয়া চলিয়া যাইবে, তাঁহার ছেলের দশা কি হইবে,—এই চিন্তায় তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ভয় বিহ্বলতায় জ্ঞানশূন্যা হইয়া হিন্দুকুল রমণীর রাজপুর-বধূর অকরণীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন;—দুর্বিনীত গঙ্গারামের কুহক গ্রস্তপ্রায় হইলেন। এই মহাপরাধের মূলেও সেই একমাত্র অকৃত্রিম পুত্র-বাৎসল্যই প্রবল ভাবে প্রোথিত। পাপিষ্ঠ গঙ্গারামের দুরভিসন্ধির অস্ফুট ছায়া যখন মুরলার ইঙ্গিতে তাঁহার অন্তরাকাশে প্রতিবিম্বিত হইল, তাহার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া যখন স্বকৃত অপরাধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, "মরি, রাজসংসারে মরিব, তথাপি গঙ্গারামের সহায়তায় বাপের বাড়ী গিয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় করিব না"—বলিয়া যখন স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, তখনও সরলার অন্তরে পুত্রবাৎসল্য সমভাবে দেদীপ্যমান, তখনও "ছেলেকে রক্ষা করিতে তিনি (গঙ্গারামে) স্বীকৃত আছেন, সময়ে

আসিয়া যেন রক্ষা করেন"—মুরলার দ্বারা সেই পাপিষ্ঠের নিকট এ সম্বাদ পাঠাইতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। সেই পুত্রস্নেহের অকপট একাগ্রতায় তিনি এই কলঙ্ক-পঙ্ক হইতে উদ্ধার পাইলেন। যখন "আম দরবারে" গঙ্গারামের বিচারস্থলে লোকারণ্য মধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূকে সাহসে ভর করিয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বলিতে হইল, তখন ভীরুস্বভাবা রমণীর সাহসের অন্য কোন অবলম্বন ছিল না, কেবল অঞ্চলের নিধি পুত্ররত্নের মুখ দর্শনই সমস্ত সাহসের মূল। তিনি দরবারে যাইবার পূর্ব্বে নন্দাকে বলিয়া গেলেন, "কেবল এক কাজ করিও, যখন আমার কথা কহিবার সময় হইবে তখন যেন আমার ছেলেকে কেহ লইয়া গিয়া আমার নিকট দাঁড়ায়। তাহার মুখ দেখিলে আমার সাহস হইবে।" বাস্তবিক সভাস্থলে রমা "যখন একবার একবার (পুত্রের) সেই চাঁদমুখ দেখিতে লাগিলেন, আর অশ্রুপরিপ্লুত হইয়া, মাতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসের উপর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিতে লাগিলেন—তখন পরিষ্কার স্বরে স্বর্গীয় অপ্সরা-বিনিন্দিত তিনগ্রাম সংমিলিত মনোমুগ্ধকর সংগীতের মত শ্রোতৃবর্গের কর্ণে (তাঁহার) সেই মুগ্ধকর বাক্য বাজিতে লাগিল। "পরিশেষে" রমা ধাত্রীর ক্রোড় হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইয়া, সীতারামের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া, যুক্তকরে বলিলেন, "মহারাজ! * * * আপনার রাজ্য আছে—আমার রাজ্য এই শিশু। আপনার ধর্ম্ম আছে, কর্ম্ম আছে, স্বর্গ আছে—আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, আমার ধর্ম্ম এই, কর্ম এই, স্বর্গ এই।"

পবিত্র হিন্দুকুল-রমণী ভিন্ন এই নির্ম্মল দেবভাবময় পুত্রানুরাগ অন্যত্র দেখা যায় না। এমন মুক্তকণ্ঠ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনাতেও যখন মন্দলোকের সন্দেহ ঘুচিল না, তখন পতিপ্রাণার কলঙ্ক মুচাইবার অন্য উপকরণ নাই, তখনও সেই স্বামী-পুত্রের প্রতি অনুরাগের উপরেই আত্মনির্ভর, তখনও সরলার মুখে সেই একই কথা—"যে পুত্রের জন্য আমি এই কলঙ্ক রটাইয়াছি—যাহার তুলনায় জগতে আমার আর কিছুই নাই—যদি আমি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকি, তবে আমি যেন সেই পুত্রমুখ দর্শনে চির বঞ্চিত হই, * * * যেন জন্মে জন্মে নারীজন্ম গ্রহণ করিয়া, জন্মে জন্মে স্বামিপুত্রের মুখদর্শনে চিরবঞ্চিত হই।" বলিতে বলিতে মর্ম্মপীড়ার প্রবল পেষণে পতিপ্রাণা মূর্চ্ছিতা হইলেন, "সখীরা ধরাধরি করিয়া আনিয়া শুয়াইল. রমা আর উঠিলেন না। প্রাণপণ করিয়া আপনার সতীনাম রক্ষা করিলেন; নাম রক্ষা হইল, কিন্তু প্রাণ আর রহিল না।" চিকিৎসার সহস্র বন্দোবস্ত স্বত্বেও এই রুগ্নদশায় রমাকে সীতারাম একবার দেখিতে আসেন না—এই দুঃখে তিনি বিনা ঔষধ সেবনে রোগকে প্রশ্রয় দিয়া জীবন শেষ করিলেন। তিনি এক দিন নন্দার বিশেষ "জোর জবর দস্তী"তে তাঁহাকে প্রকাশ্যে বলিলেন—"ওষুধ খাই নাই—খাব, যবে রাজা আমাকে দেখিতে আসিবেন।" রাজাকে তখন ডাকিনীতে পাইয়াছিল, তিনি সহজে আসিলেন না; যখন আসিলেন, তখন চরমাবস্থা। পতি প্রেমানুরাগিণী সাধ্বী অন্তিমে স্বামীপদ দর্শন করিয়া, স্বামী সমক্ষে একবার অন্তিম হাসি হাসিয়া,

পুত্ররত্নকে স্বামীকরে সমর্পন করিয়া, জন্মের মত বিদায় হইলেন। সেই অন্তি-মেও পতি-প্রেম ও পুত্র-বাৎসল্যের পূর্ব্ব-রাগ সমভাবে প্রদীপ্ত; তখনও স্বামী সমক্ষে শেষ ভিক্ষা যেন "মার দোষে ছেলেকে ত্যাগ করিওনা। আশীর্ব্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই।

রমার জীবলীলা ফুরাইল। আসুন, আমরা এখন নন্দাকে দেখি। নন্দা সীতা-রামের মধ্যমা মহিষী, তবে শ্রী সংসার মধ্যবর্ত্তিনী না থাকা বিধায়, তিনি মধ্যমা হইয়াও জ্যেষ্ঠা, রাজসংসারের প্রধানা কর্ত্রী। বাস্তবিক তিনি হিন্দুর অন্তঃপুরের কর্ত্তৃত্ব ভার লইবার যোগ্য গৃহিণী। তাঁহার প্রকৃতি ধীর, স্থির, গম্ভীর, তিনি রমার ন্যায় বালিকাবুদ্ধি নহেন, বিপদের ঈষত্তরঙ্গাঘাতে তাঁহার চিত্ত 'হাবু ডুবু' খায় না। স্বামী পুত্রে অনুরাগ তাঁহারও অন্তরে সমভাবে অক্ষুণ্ণ,—তিনি স্বামীকে "মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি, দাসীর মত সেবা" করেন, কিন্তু তিনি প্রেমান্ধ বা স্নেহান্ধ নহেন। পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত, তাঁহার স্বজাতি বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে তিনি অনুক্ষণ ব্যাপৃতা, কিন্তু (আজি কালিকার ভগিনী-গণের ন্যায়) পুরুষের কোন কার্য্যের সমা-লোচনায় প্রস্তুত নহেন। রাজকার্য্য পরি-চালন,—শত্রু-মুখ হইতে পুরী সংরক্ষণ,—রাজ্য, সংসার, প্রজা ও পরিজনের সুখ-শান্তি অন্বেষণ প্রভৃতি কার্য্য পুরুষের কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, সে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে তিনি উদ্যত নহেন। গঙ্গাস্নান অধ্যায়ে ভিতরের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত রমার ন্যায় [illegible] কৌতূহল জন্মিয়াছিল। রমার নিকট সীতা-রামকে 'হার' মানিয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতে হইয়াছিল; কিন্তু নন্দার নিকট হয় নাই। সীতারাম কথা গোপন রাখিলেন, নন্দার একটু অভিমান হইল, একটু অশ্রু নিঃসরণ হইল, কিন্তু সীতারাম একবার নন্দার চিবুক ধরিয়া দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া, একটু মধুর আদর করিয়া তাহা হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাইলেন। বিপদে ধৈর্য্য-চ্যুত হওয়া নন্দার স্বভাব নহে; মুসলমান-দিগের আগমন ও সীতারামের দিল্লী গমন বার্ত্তায় কাতর হইয়া রমা যখন, "রাজা এখন কেন দিল্লী গেলেন?—এখন যদি মুসলমান আসে ত, কে পুরী রক্ষা করিবে? (মুসলমানেরা) ছেলে পিলের উপর দয়া করিবে না কি?" প্রভৃতি কথা নন্দার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন, তখন নন্দা অবিচলিত ভাবে, তাঁহাকে আশ্বাস ও অভয় প্রদান করিলেন, শেষে কোন গতিকে "অন্যমনা করিবার জন্য পাশা পাড়িলেন।" এরূপ স্থিরবুদ্ধি রমণী ব্যতি-রেকে সংসার চলা অসাধ্য।

একটী বিষয়ে আমরা তাঁহার চিত্তের অপ্রশস্ততা দেখিতে পাই;—সেটী সপত্নী দ্বেষ। রমা নন্দা—উভয়েরই মনে সপত্নী দ্বেষ সমভাবে প্রবল। মুসলমানের হস্তে মৃত্যু ভয়ে রমা যখন হতাশ্বাস, তাঁহার মৃত্যু হইলে "ছেলেকে কে মানুষ করিবে?" ভাবিয়া যখন ব্যাকুল, তখন তাঁহার মনে এইরূপ যুক্তিতর্ক উদয় হইয়াছিল—"সতী-নের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না, সংসার কি সতীন পোকে যত্ন করে? ভাল কথা আমাকেই যদি মুসলমানে মারিয়া ফেলে, তা আমার সতীনকেই কি

রাখিবে? সেওত পীর (!) নয়। তা আমিও মরিব, আমার সতীনও মরিবে।" শত্রু হস্তে নিজে মরিব, সতীন বাঁচিবে, একথা মনে স্থান দিতেও রমার কষ্ট হইয়াছিল। সতীনের মৃত্যুকামনা নন্দার অন্তরেও তাদৃশ প্রবল। তোরাব খাঁর আগমন বার্ত্তায় রমা যখন "ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যাইতে লাগিলেন," তখন নন্দার মনের ভাব,—"সতীন মরিয়া গেলেই বাঁচি।" পুত্রবাৎসল্যের দারুণ চিন্তায় রমা নন্দার নিকট আত্মীয়তা করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে গিয়াছিলেন; স্বামীর আজ্ঞা পালন অনুরোধে নন্দা "আপনার প্রাণ দিয়াও সতীনকে বাঁচাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।" এক দিকে পুত্রস্নেহ, অপর দিকে পতিভক্তি; নচেৎ উভয়েই উভয়ের বিনাশকামী। সপত্নী-দ্বেষের এই কলুষিত ভাব ত্রেতা হইতে এই কলি পর্য্যন্ত সমভাবে সজীব রহিয়াছে। শ্রীর সহিত একত্রে বাস করিতে হয় নাই, শ্রী কখন তাঁহার সুখের স্বামী সোহাগের অংশভাগিনী হয়েন নাই, তথাপি সপত্নীভাবের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, শ্রীর প্রতিও নন্দার সেই একটু হিংসার অস্ফুট ছায়া, একটু শ্লেষময় ব্যঙ্গব্যঞ্জক মর্ম্মভেদী টিট্কারী। প্রকাশ্য রাজদরবারে রমাকে "কুলটার ন্যায় খাড়া করিয়া দিতে" সীতারাম যখন কুণ্ঠিত, তখন নন্দা বিলক্ষণ একটু ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, "মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সাম্‌নে, শ্রী গাছের ডালে চড়িয়া নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?" অপর সর্ব্বত্রই আমরা নন্দার সেই গম্ভীরতাপূর্ণ অবিচলিত গৃহিণীপণা দেখিতে পাই।

তৃতীয় চিত্র শ্রীর। শ্রী গ্রন্থের নায়িকা; সংসার ত্যাগিণী হইলেও সীতারামের জ্যেষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠা মহিষী, প্রতিভাময়ী অসামান্য রূপসী, তাঁহার হৃদয়-সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী সম্রাজ্ঞী। বস্তুতঃ শ্রীই সীতারাম কাব্যের অস্থি, মজ্জা, প্রাণ। তিনিই সীতারামের সহিত মুসলমানের বিবাদ বাধাইবার মূল হেতু, তিনিই মুসলমানের অত্যাচার নিবারণের—হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের মন্ত্রণা বিষয়ে সীতারামের দীক্ষা গুরু; জ্ঞানময়ী জয়ন্তীর শিক্ষকতা কার্য্যের তিনিই উপযুক্ত ক্ষেত্র। কার্য্যের প্রথম হইতে শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার সুদৃঢ় চরিত্র-সূত্রে গ্রথিত. 'দেবী চৌধুরাণী' গত প্রফুল্লমুখী, আর 'সীতারাম' গত শ্রীর চরিত্রে আমরা অনেক স্থলে ঘটনার সমবায় দেখিতে পাই। সামাজিক কলঙ্ক ভয়ে প্রফুল্ল শ্বশুর কর্ত্তৃক বিতাড়িতা; প্রিয়-প্রাণ-হননের কারণ-আশঙ্কায় শ্রী আপনা হইতে নির্ব্বাসিতা। উভয়েই অতুলনীয়া প্রতিভা সম্পন্না। প্রফুল্ল ভবানী পাঠকের দীক্ষাগুণে কর্ম্মযোগে যোগিনী, শ্রী জয়ন্তীর শিক্ষা প্রসাদাৎ কর্ম্মকাণ্ড শেষ করিয়া জ্ঞানপথানুসারিণী। প্রফুল্লের একাদশীতে মাছ খাওয়া পাঠকজী ছাড়াইতে পারেন নাই, ভৈরবী সাজাইবার নিমিত্ত জয়ন্তী শ্রীর মাথা মুড়াইতে পারেন নাই। সধবার সমাজ-ধর্ম্মে দুই জনেরই অটুট অনুরাগ। তবে প্রফুল্লমুখী অন্তিমে সংসারে থাকিয়া অন্তরে নিষ্কাম কর্ম্মে ব্যাপৃতা; শ্রী সর্ব্ব কর্ম্ম শেষ করিয়া সংসার হইতে নির্লিপ্তা, নৈশ অন্ধকারে মনুষ্য চক্ষুর অজ্ঞাত স্থানে লুক্কায়িতা।

প্রতিভা কখন লুকাইয়া থাকে না।

অগ্নিকে কখন ভস্মাচ্ছাদিত রাখা যায় না। কৈশোরে যে প্রতিভা অঙ্কুরিত হয়, যৌবনে তাহার শাখা প্রশাখা জন্মে, বার্দ্ধক্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি, পরিপক্ক কাণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গুণের ক্রমোন্নতি সহকারে প্রতিভারও ক্রমবিকাশ সংঘটিত হয়। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বার্দ্ধক্যে,—তমঃ-রজঃ-সত্ত্ব-ত্রিগুণের ক্রমিক পরিবর্ত্তন ঘটে; অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন শিশুর যৌবনে জ্ঞানোন্মেষ হয়, কিন্তু শিক্ষা ও সঙ্গ দোষে এবং যৌবনসুলভ মদিরতায় রাজসিক বৃত্তি সমূহ বিকশিত হইয়া উঠে, ঘোর পাপিষ্ঠ ভণ্ডকেও আবার পরিণামে স্বকৃত পাপের জন্য পরিতাপে প্রপীড়িত, ভগবৎপ্রেমানুরক্ত হইতে দেখা যায়,—সাত্ত্বিক ভাবের আভা তখন অলক্ষ্যে চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে। প্রতিভাও তাদৃশ পরিবর্ত্তনশীল; প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের প্রতিভার আভা শিশুর ক্রীড়াতেই প্রথম দেখা যায়, যৌবনে তাহার স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, পরিণতাবস্থায় তাহার সমুজ্জ্বল জ্যোতি, অন্তর্নিবদ্ধ থাকিয়াও, চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। ইতিহাস ইহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে; ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধ, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ, জীবন্ত সাক্ষী। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না শ্রীর প্রতিভারও আমরা তাদৃশ ক্রমবিকাশ দেখিয়াছি। প্রথম হইতেই শ্রীর স্বজাতি এবং স্বাধীনতাপ্রিয়তা বিমিশ্র ধর্ম্মানুভূতি; গঙ্গারামের উদ্ধারের জন্য সীতারামকে উত্তেজিত করিবার প্রথম মন্ত্রই—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?" তার পরেই গঙ্গারামের কবর ভূমে [illegible] শ্রীর দিগন্তস্পর্শী "মার্! মার্! শত্রু মার্!" শব্দ রণরঙ্গে ঘোর উৎসাহ দান। সে উৎসাহোত্তেজক "হিন্দুর জয় হইল। চণ্ডীর বলে (শ্রীর প্রবল প্রতিভাবলে) বলবান হিন্দুর বেগ মুসলমানেরা সহ্য করিতে পারিল না।" সেই প্রতিভা তেজে সীতারামের মনশ্চক্ষুঃ ফুটিয়া উঠিল, তিনি চতুর্দ্দিকে মুসলমানের অত্যাচার দেখিতে লাগিলেন সেই দুর্দ্দমনীয় মানসিক স্রোতের প্রতিপ্রবাহ পাইলেন—"দেব অর্থাৎ ধর্ম্ম," তিনি বুঝিলেন, সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরই বল, "তিনিই বাহুবল, তিনিই ধর্ম্ম।" তার পর চন্দ্রচূড় ঠাকুর যখন কালীমন্দিরে বৃদ্ধা বাক্ষীর নিকট, যতদিন মুসলমানের ভয় প্রশমিত না হয়, ততদিন শ্রীকে থাকিতে আদেশ করিলেন, হিন্দুর শরীরে বল না থাকাতে মুসলমানের এইরূপ দৌরাত্ম্য বলিয়া আভাস দিলেন, তখন শ্রী "দৃপ্তা সিংহীর মত" গর্জ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "হিন্দুর গায়ে বলের কি অভাব? এই ত এখনই দেখিলেন"? তখন "তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্রচূড়" সীতারামের কথা পাড়িয়া বলিলেন, "সীতারাম * * * অকারণ রাজদ্রোহী হইবেন না, * * * যতদিন মুসলমানের দ্বারা অত্যাচার প্রাপ্ত না হয়েন, বোধ হয় ততদিন তিনি রাজদ্রোহ পাপে সম্মত হইবেন না।" প্রতিভাময়ী শ্রীর অন্তরে মুসলমানের অত্যাচারের কথা প্রবলভাবে জাগিতেছিল, বিধর্ম্মীর দর্প চূর্ণ করিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষণ করা সারধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার জ্ঞান বদ্ধমূল হইয়াছিল। এখন চন্দ্রচূড় ঠাকুরের কথামত মুসলমানের দ্বারা সীতারাম যাহাতে অত্যাচারিত হয়েন, রাজদ্রোহী হইয়া [illegible]

করেন, ক্ষণকাল শ্রী তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে বুদ্ধিমতীর বুদ্ধি-স্ফুরণ হইল, তিনি অনন্যোপায় ভাবিয়া কৌশলে স্বয়ং মুসলমানের অত্যাচার জালে জড়িতা হইলেন, আর অস্ফুট মধুর হাসি হাসিয়া চন্দ্রচূড়কে বলিলেন,—"ঠাকুর! যদি আমার স্বামীকে চিনেন, তবে বলিবেন, আমার উদ্ধার তাঁহার কাজ।" বাস্তবিক তিনি স্বামীর সহায়তায় মুসলমানের কারাবরোধ হইতে উদ্ধার পাইলেন।

এইরূপে তাঁহার জীবনের 'দিবা'ভাগ অবসান হইল, তাঁহার সাংসারিক "গৃহিণী" অবস্থা কাটিল। অতঃপর তিনি "ভৈরবী।" নদী-সৈকতে স্বামী-মুখে নিজ বিধি-লিপির অখণ্ডনীয় ফল শ্রুত হইয়া, জন্মগ্রহের অবস্থা দোষে 'প্রিয়-প্রাণ-হন্ত্রী' হইবেন শুনিয়া, তিনি সিহরিয়া উঠিলেন। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে, সহবাসে থাকুক, বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর (সর্ব্বাপেক্ষা) প্রিয়," সীতারাম তাঁহার "চিরপ্রিয়"—এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার 'শত-যোজন' দূরে থাকিবেন, স্থির করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই তিনি সীতারামের অভিজ্ঞান স্বরূপ "সুবর্ণার্দ্ধ নদীসৈকতে নিক্ষিপ্ত করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন, (নৈশ) অন্ধকারে কোথায় মিশাইলেন, সীতারাম আর দেখিতে পাইলেন না।" তার পরেই পুরুষোত্তমের পথে জয়ন্তীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। এই খানেই প্রতিভা উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে উত্থিত হইল, মধুরে মধুর মিলিল, মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইল। এইস্থান হইতেই শ্রীর শিক্ষা আরম্ভ হইল, নবজীবন লাভ হইল, নিষ্কাম ধর্ম্মের পবিত্র সত্যে পর্য্যবসিত হইল। শ্রী যখন সাংসারিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া জ্বালা জুড়াইবার জন্য বৈতরণীর এপারেই পাপের বোঝাটার শীঘ্র শীঘ্র "বিলি করিয়া বেলায় বেলায় পার হইয়া চলিয়া" যাইতে ব্যগ্র, তখন জয়ন্তী দুই চারি পাক! কথায় তাঁহার মন টলাইয়া আপন পথের সঙ্গিনী করিলেন, গৃহিণী বেশ ছাড়াইয়া রুদ্রাক্ষ, বিভূতি, রক্তচন্দন পরাইয়া এক অপূর্ব্ব রূপসী ভৈরবী সাজাইলেন। ক্রমে জয়ন্তীর সংঘর্ষে শ্রীর প্রতিভা সমধিক তেজস্বিনী হইয়া উঠিল, তিনি ক্রমে নির্দ্বন্দ্ব হইলেন, শুভাশুভ ভগবানে সমর্পণ করিতে শিখিলেন, স্বামী ভুলিয়া "স্বামীর স্বামী"কে চিনিলেন, জ্ঞানের সুন্দর পথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিনে এ কার্য্য হয় নাই, এক কথায় সন্দেহ ঘুচে নাই, এক মুহূর্ত্তে মনের ময়লা কাটে নাই, এবং ভৈরবী সাজেই সন্ন্যাস সাধন হয় নাই। কত আবর্ত্তন বিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, কত পাক-চক্রে পড়িতে হইয়াছিল, কত শিক্ষা দীক্ষা ঝাড়ফট করা গিয়াছিল, তবে "খাটি" দাঁড়াইয়াছিল, চিত্তবৃত্তি অন্ধকার হইতে আলোকে পরিণত হইয়াছিল।

জয়ন্তী শ্রীর দীক্ষাগুরু হইলেও এক বিষয়ে তাঁহাকে শ্রীর নিকট ঠকিতে হইয়াছিল। শ্রীর আত্মবৃত্তান্ত শুনিয়া ঈষৎ ছল ছল নেত্রে জয়ন্তী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়—এত ভাল বাসিলে কিসে?" শ্রী তখন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কয় দিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হই-

যাছে?" প্রত্যুত্তরে জয়ন্তী কহিলেন, "আমি ঈশ্বরকে রাত্রি দিন মনে মনে ভাবি।" পতিগত প্রাণা শ্রী তখন অকপটে কহিলেন, "যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সে দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রি দিন ভাবিয়াছিলাম। * * * কেবল মনে মনে দেবতা ভাবিয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি। চন্দন ঘষিয়া দিয়ালে মাখাইয়া লেপন করিয়া মনে করিয়াছি, তাঁর অঙ্গে মাখাইলাম। বাগানে বাগানে ফুল চুরি করিয়া তুলিয়া দিন ভোর কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া অনেক পরিশ্রমে মনের মত মালা গাঁথিয়া, ফুলময় গাছের ডালে ঝুলাইয়া মনে করিয়াছি, তাঁর গলায় দিলাম। অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, ভাল খাবার সামগ্রী কিনিয়া পরিপাটী করিয়া রন্ধন করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া মনে করিয়াছি, তাঁকে খাইতে দিলাম। ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখন মনে হয় নাই যে, ঠাকুর প্রণাম করিতেছি—মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি।"—এই বিশ্বাসেই হিন্দুর প্রতিমা পূজা, তেত্রিশ কোটী দেবতা,—ভূচর-খেচর-জলচর, তরু-গুল্ম-লতা-পত্র-পুষ্প-ফল, নদ-নদী-সমুদ্র, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র, জল-বায়ু-আকাশ সমস্তই তাঁহার আরাধ্য। তিনি মৃণ্ময় শিবলিঙ্গে জলসেক করেন না, শালগ্রাম শিলাকে 'ভোগ' দেন না, জলপূর্ণ কলসে মালা চড়ান না; তিনি সর্ব্বত্র সকল সময়ে সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনাদি, অনন্ত পরম পুরুষের—সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দের আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া স্নেহ-বাৎসল্যের আবেগে, প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাসে জনায়, কখন ছানা-ননি খাওয়ান, কখন ফুল-বিল্বপত্র দেন, কখন জল-চন্দন ছড়ান। পরম জ্ঞানী জয়ন্তীকে একবার এ যুক্তিতে, এই বিশ্বাসে নির্ব্বাক্ হইতে হইয়াছিল। হিন্দুর এই বিশ্বাস, এই বিশ্বাসের দেবভাব যে ঘুচাইতে চায়, তাহার ন্যায় পরম শত্রু আর নাই।

কাব্যের শেষ ও সর্ব্বোচ্চ চিত্র—জয়ন্তী। আমরা যে চিত্র সীতারামের সৌধ শিখরে গৃহের সুষমা বৃদ্ধি করিতে দেখি নাই,—বনে বনে, পথে পথে, গিরি-গুহায় দেশ বিদেশে সে চিত্রের সমুজ্জ্বল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়াছি। প্রত্যেক লোকের হৃদয়-ফলকে সে চিত্র অঙ্কিত হউক, হৃদয়ের শোভা হইবে, চিত্রের জ্যোতি ছটায় চিত্রাধার আলোকিত হইবে। বৈতরণী তীরে ভৈরবীবেশে জয়ন্তীর সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ। তৎপূর্ব্বে সুবর্ণরেখা তীরে তাঁহার সহিত শ্রীর আর এক দিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু সে আমাদিগের অজ্ঞাতে। ভৈরবী এখনও ভাদ্রমাসের ভরা 'গাঙ্', এখনও তাঁর "তুফানের বেলা হয় নাই।" ভৈরবী অতুলনীয়া সুন্দরী; নন্দা অপেক্ষা রমা সুন্দরী। রমা অপেক্ষা শ্রী সুন্দরী, ভৈরবী শ্রীর অপেক্ষাও সুন্দরী। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ, "মানুষের" অভ্যন্তরস্থ আলোকবৎ, সে সৌন্দর্য্যের জ্যোতি উছলিয়া উঠিতেছিল, ভৈরবীর ফুল্লাধরে মধুর হাসি যেন মেঘাবৃত আকাশে অনুক্ষণ বিজলী খেলিতেছিল। কিন্তু কেবল রূপজ সৌন্দর্য্য নহে,—আত্মজ্ঞরীণ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। জ্ঞান-প্রদীপ্ত চিত্রের

সেই ভাস্কর-প্রভান্বিতা দীপ্তিময়ী মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে, সেই চিনিয়াছে,—তিনি কৈলাসচারিণী জয়ন্তী, বৈকুণ্ঠ বিহারিণী লীলাময়ী মূর্ত্তিমতি দেবী। (শ্রী ও) জয়ন্তীর অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী (ভুবন) ভৈরবী মূর্ত্তি দর্শনে বিধর্ম্মী মুসলমানের ভীষণ সৈন্য-সাগরও স্তব্ধ হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষাগুণে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ 'প্রচার' হইল, শ্রীর সঙ্গে সমগ্র হিন্দুর 'নবজীবন' লাভ হইল।

'সীতারাম'এর কবি জয়ন্তীকে বেশী কায করান নাই, তাঁহার দ্বারা বেশী কথা বলান নাই। অথচ তাঁহার কথায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সমগ্র সীতারামে তাহা নাই—নন্দা, রমা, শ্রী—কাহাতেও তাহা নাই। ক্ষুদ্রকীটের জীব লীলায় সর্ব্বশক্তি বিধাতা ভগবানের বিশ্বসৃষ্টিকাণ্ড লক্ষিত হয়; কাব্যের এক ছত্রে কবির প্রতিভাগুণে, দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিবৃত্ত পুরাবৃত্ত মনস্তত্ত্ব সমস্ত প্রকাশ পায়।

১। "তোমার শুভাশুভ উদ্দিষ্ট হইলে ঠাকুর তোমাকে কোন আদেশ করিবেন না—আপনার স্বার্থ খুঁজিতে তিনি কাহাকেও আদেশ করেন না।"

২। "যে অনন্ত সুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মে মনস্থির করিবার, তাহা ছাড়া আর কিছুই চিত্তে যেন স্থান না পায়।"

৩। "মনোবৃত্তি সকলের আত্মবশ্যতাই যোগ। তাহা কি তুমি লাভ করিতে পার নাই?"

৪। "আর এগার জন (শত্রু) আপনার শরীরে? ভাবিতে সন্ন্যাস করিয়াছ, দেখিতেছি। যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ, দেখিতেছি। আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ, দেখিতেছি! একে কি বলে সন্ন্যাস?"

৫। "রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?"

৬। "তুমি ঈশ্বরে কর্ম্ম সংন্যাস করিয়া যাহাতে সংযম চিত্ত হইতে পার, তাই কর।

৭। অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, আসক্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্ব্বক তাহার নিরত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না। স্বামী সেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?"

৮। "যদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামী সেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ ঘটে না।"

৯। "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে ও মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।"

১০। "যদি শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

'সীতারাম' কাব্যে জয়ন্তী কথিত এই দশ শিক্ষা (Ten commandments); এই শিক্ষার উপর কাব্যের ভিত্তি স্থাপিত, ইহাতেই উহার অস্তিত্ব। 'গীতা' শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড মথিত এই দশ আজ্ঞা দেশে দেশে গীত হউক।

স্ত্রীলোক সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু লজ্জা পরিহার করিতে পারে না। জয়ন্তী "পৃথিবীর সকল সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি" দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্নিবার লজ্জা তাঁহার দর্পচূর্ণ করিয়াছিল। "সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে

লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায় না।” তাই যখন সীতারাম তাঁহাকে লোক সমক্ষে যবন কর্ত্তৃক বিবস্ত্রা করাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি একবার কাতর হইয়াছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য জগন্নাথকে প্রাণভরিয়া ডাকিয়াছিলেন। লজ্জা নিবারকের কৃপায় নন্দা কর্ত্তৃক তাঁহার লজ্জা রক্ষা হইয়াছিল। সরল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি এই রূপেই লজ্জা রক্ষা করেন, নিপীড়িতের শান্তি বিধান করেন। আমরা নিপীড়িত, পর-পদ-বিদলিত, পাপ তাপে অনুতপ্ত; আমরা সংকীর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত—অনন্ত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না। “হরিনামে অনন্ত মিলে, এস (একবার) বুক বাঁধিয়া (মধুর) হরিনাম করি”—এস একবার “প্রাণ মন খুলে, সেই প্রাণেশ্বরে, ভাই বন্ধু মিলে, ডাকি”—এস একবার “সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে” চিত্ত সমাধান করিয়া ভগ্ন কণ্ঠে মহাগীতি গাই।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

জন্ লক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অকস্‌ফোর্ডে ছাত্র অবস্থায়, শিক্ষকের অনুরোধে, লক, অলিবর ক্রমওয়েলের প্রশংসা করিয়া লাটিন ভাষায় একটী কবিতা লিখেন; অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রও লিখে, এবং এই সকল কবিতা সংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, ছাত্র অবস্থাতেই লক কতকটা প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লক বি এ এবং ১৬৫৮ অব্দে এম এ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, এবং ১৬৬০ অব্দের ২৪শে ডিসেম্বর মাসে তিনি তাঁহার কলেজে গ্রীক ভাষার শিক্ষকতা কার্য্যে মনোনীত হন। ইহার কিছু দিন পরেই তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়, এবং পিতার মৃত্যুর অল্প পরেই আবার তাঁহার একমাত্র সহোদরের মৃত্যু হয়—এই সহোদর তাঁহার অনুজ ছিলেন। এইরূপে লক যখন সংসারে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয় আর কেহই রহিলনা—বিশালসংসার ক্ষেত্রে তাঁহার একাকী পর্য্যটন করিতে হইল। কিন্তু তাঁহার যেরূপ অমায়িক ভাব ছিল, তাহাতে তিনি সহজেই বন্ধুবান্ধব প্রাপ্ত হইলেন। এই সকল বন্ধুদিগের মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান লোক ছিলেন, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। এক্ষণে লকের কলেজে শিক্ষকতার কথা বলা যাইতেছে। ১৬৬১ অব্দে লক উক্ত কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন তাহার বয়স উনত্রিশ বৎসর। এই সময় হইতে ১৬৬৫ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত লক নানা বিষয়ে শিক্ষকতা করেন, কিন্তু তিনি ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ভাল জানা নাই। শিক্ষকতা কার্য্য হইতে অবসর পাওয়ার পর লক ধর্ম্মযাজক ব্যবসায়ের একটী শিক্ষানবিশি বৃত্তি প্রাপ্ত হন। লক উক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, এক সময়ে ভাবিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে মত পরিবর্ত্তন করিয়া চিকিৎসা ব্যবসা মনোনীত করেন। ইহাতেও তিনি উক্ত বৃত্তি হারাইলেন না—

যাহাতে তিনি বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্ত আরও সময় পাইতে পারেন, এই উদ্দেশে রাজ দরবার হইতে তাঁহাকে ঐ বৃত্তি উপভোগ করিবার জন্য এক বিশেষ আদেশ দেওয়া হইল।

এইরূপ বৃত্তিদ্বারা যে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে, সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিতে হইবে না। সাধারণ ছাত্র অবস্থাতে সামান্য লেখা পড়াতেই সময় কাটিয়া যায়, উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা অভ্যাস হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কলেজের লেখা পড়া শেষ হইলেও ছাত্রগণ দুই চারি পাঁচ কিম্বা তাহারও অধিক বৎসর ধরিয়া কালেজে থাকিয়া স্ব স্ব ইচ্ছামত এক একটী বিষয় লইয়া তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন করিয়া থাকে। পরে কালক্রমে তাহারা তাহাদিগের অধীত বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া জগতে স্ব স্ব অস্তিত্বের চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়। আমাদিগের দেশে এখন এরূপ প্রায় দেখা যায় না, আর ইয়োরোপে দেখা যায়, ইহার কারণ, আমাদিগের দেশে উল্লিখিত উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগের নিমিত্ত কোন বৃত্তি নাই। ইয়োরোপে এই উদ্দেশে অসংখ্য বৃত্তি সংস্থাপিত আছে। ১৬৬৬ অব্দের ১৪ই নবেম্বর লক বৃত্তি পাইবার উক্ত আদেশ প্রাপ্ত হন। লক ইতিমধ্যে একবার ইয়োরোপের মহাভূমিতে ভ্রমণ করিয়া আইসেন। ১৬৬৫ অব্দের নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে তিনি সারওয়ালটারভেনের সহিত জার্ম্মণি দেশে ব্রাণ্ডেনবুর্গ নামক প্রদেশের রাজধানী ক্লীভ সহর যাত্রা করেন। এই সময়ে হলাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। ইংরেজরাজ ব্রাণ্ডেনবুর্গাধিপতির নিকট হইতে সাহায্য পাইবার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত ভেনকে তৎসমীপে প্রেরণ করেন। লক এই সহরে দুই মাস বাস করেন। তিনি এই সময়ে তাঁহার বন্ধু ষ্ট্রাচি এবং রবর্ট বয়িলকে যে সব পত্র লেখেন, তাহাতে ঐ স্থলের সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে অবস্থিতি কালে তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত আলাপ করেন; মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার পত্রে ইহাঁদিগের রীতি নীতি লইয়া উপহাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু মোটের উপর তাঁহারা সদালাপী ও শিষ্টাচারী লোক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

এখানকার লোকদিগের সম্বন্ধে লক আর এই এক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন যেন, এখানকার লোক ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ লইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদ করে না, 'They quietly permit one another to choose their way to heaven' অর্থাৎ তাহারা পরস্পরকে স্বর্গে যাইবার পথ স্বেচ্ছামত পছন্দ করিয়া লইতে দেয়—তাহা লইয়া কোন গোলযোগ বাধায় না। লক এইরূপ নির্ব্বিবাদ হইয়া চলিবার দুই কারণ দেখান—এক কারণ গভর্ণমেণ্টের শাসন, অপর কারণ প্রজাদিগের বুদ্ধিমত্তা ও সুশীলতা। এইরূপ শান্তির ভাব দেখিয়া লকের আশ্চর্য্য হইবারই কথা, কারণ ইংলণ্ডে সে সময়ে ধর্ম্মমত লইয়া নানারূপ গোলমাল বাইতেছিল। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তর্ক করা সম্বন্ধে লক যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, এ সময়ে তর্ক করায় 'বাতিক' বড়ই প্রবল

ছিল। লক বলেন যে, তিনি যে মুহূর্ত্তে ক্লীভ সহরে উপস্থিত হইলেন, তখনই তিনি তর্কে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অক্স্ফোর্ড হইতে তফাতে আসিয়া কিছুকাল তর্ক হইতে অব্যাহতি পাইবেন, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না, বরং এখানে তর্ক-প্রিয়তাটা অক্স্ফোর্ড অপেক্ষা অধিক দেখিতে পাইলেন। অল্প বয়স্ক সন্ন্যাসীগণ, যাহাদিগকে দেখিলে নিতান্ত নিরীহ বলিয়া মনে হইত—তাহারা পর্য্যন্ত আসিয়া লককে তর্ক জালে আবদ্ধ করিত। লক উদাহরণ স্বরূপ বলেন যে, তাহারা 'নির্গুণ জড়' লইয়া এমন ভাবে তর্ক করিত যেন তাহারা তাহা ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। ১৬৬৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষভাগে লক ইংলণ্ড প্রত্যাগমন করেন; আসিবামাত্র রাজদূত আর্ল অব সাণ্ডউইচের সেক্রেটরি হইয়া স্পেন দেশ যাইবার নিমিত্ত আহূত হইলেন, কিন্তু তিনি কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে স্পেন যাইতে অস্বীকার করিলেন। পুনরায় অক্স্ফোর্ড যাইয়া বাস করিবার পূর্ব্বে কয়েক সপ্তাহ স্বকীয় অঞ্চল সমার্সেটশায়ারে অবস্থিতি করেন, এবং এই সময় বোধ হয় একবার তাঁহার বন্ধু ষ্ট্রাচির সহিত দেখা করিতে যান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি লকের বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং এই বিষয়ে বিশেষতঃ জলবায়ু বিজ্ঞানে তিনি অনেকগুলি পরীক্ষা করেন। সমার্সেটশায়ারে অবস্থিতিকালে মেণ্ডিপ পাহাড়ের সীসক খনিতে পরীক্ষা করার নিমিত্ত বয়িল লককে একটী বায়ুর চাপমান যন্ত্র পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তখন ইংলণ্ডের ইতর শ্রেণীর লোকের মধ্যে এতদূর অজ্ঞতা বিদ্যমান ছিল যে, ঐ খনির শ্রমজীবীরা কিছু মন্দ ঘটিতে পারে, এই কুবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া লককে কোন মতেই ঐ পরীক্ষা করিতে দিল না। মে মাসের প্রারম্ভে লক অক্স্ফোর্ডে পুনরায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং যাহাতে চিকিৎসক হইতে পারেন, তজ্জন্য বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি বয়িলকে লিখেন যে, তিনি অনেক রাসায়নিক পরীক্ষা ও অনেক উদ্ভিদ সংগ্রহ করিতেছেন। ৩রা নবেম্বর (১৬৬৬) তারিখে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চান্সেলর লর্ড ক্লারেডন লকের অনুকূলে এক বিশেষ অনুজ্ঞাপত্র দিলেন, তদ্দ্বারা তিনি নির্দ্ধারিত সময় অপেক্ষা অল্প সময়ে ব্যাচিলর ও ডাক্তার অব মেডিসিন, এই দুই উপাধি পাইবার অধিকারী হয়েন। যাহা হউক, লক এই অনুগ্রহের ফল গ্রহণ করেন নাই, ইহা তাঁহার নিজের অনিচ্ছাতেই হউক কিম্বা কোন ব্যক্তির বিপক্ষতাচরণেই হউক, কোন কারণে ঘটিয়াছিল, কিন্তু ঠিক কারণটী জানা যায় নাই।

১৬৬৬ অব্দের গ্রীষ্মকালে লকের লর্ড আশলির সহিত আলাপ হয়; ইনি তৎকালের একজন প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন এবং পরে আর্ল অব শাফ্‌ট্‌সবেরি এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। লর্ড আশলি স্বাস্থ্যের জন্য অক্সফোর্ডে আইসেন এবং তিনি তথাকার আষ্ট্রপ নামক একটী পল্লী (বলকারক) জল সেবন করিতেন। এই জল সরবরাহ করার ভার লকের উপর পড়ে, কিন্তু এক দিন কোন কারণে জল না আসায় লক উক্ত লর্ডের নিকট তাহা বলিতে যান।

লর্ড আশলি তখন লকের সহিত অমায়িক ভাবে আলাপ করেন এবং তাঁহাকে রাত্রে আহার পর্য্যন্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। উভয়ে উভয়ের আলাপে প্রীত হয়েন। এই সময় হইতেই তিনি ধর্ম্মবিষয়ে উদার নীতির পক্ষ ছিলেন এবং কি ধর্ম্মে কি রাজশাসনে, তিনি কাহাকে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদানের বিপক্ষ ছিলেন; সুতরাং তাঁহার সহিত লকের বন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হইবারই কথা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি লকের বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং সে সম্বন্ধে তিনি অনেক পরীক্ষা করেন। ১৬৬৬ অব্দের ২৪এ জুন হইতে ১৬৮৩ অব্দের ৩০এ জুন পর্য্যন্ত লক অক্সফোর্ড ও লণ্ডনে জল বায়ু ও উত্তাপ এই তিন বিষয়ে মাঝে মাঝে যে সকল তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া দেখেন, একখানি রেজিষ্টরিতে তাহা সব লিপিবদ্ধ করা আছে। এই রেজিষ্টরি বহি হইতে লক কখন কোথায় ছিলেন ইত্যাদি অনেক খবর পাওয়া যায়। ১৬৬৭ অব্দে গ্রীষ্ম প্রারম্ভে লক লণ্ডনে লর্ড আশলির গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং এই সময় হইতে অনেক বৎসর ধরিয়া সেখানে চিকিৎসক, বন্ধু, শিক্ষক (আশলি পুত্রের) এবং সাধারণ কার্য্যকারক, এইরূপ সাতপাঁচ কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার স্বভাব গুণে তিনি তথায় সকলেরই সমান প্রীতি ভাজন হয়েন। যদিও লকের এক্ষণে সাধারণ কাজ অনেক ছিল, তথাপি তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অভ্যাসে বিরত হয়েন নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, সিডেনহাম নামক বিখ্যাত চিকিৎসকের সহিত লকের আলাপ হয়—লক তাঁহার সহিত রোগী দেখিয়া বেড়াইতেন বলিয়া বোধ হয়—এবং তিনি লকের প্রতি এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, তিনি মেপ্‌লটফ্‌ট নামক আর একজন চিকিৎসককে ১৬৭৬ অব্দে একবার পত্র লিখিবার সময় বলেন "আপনি জানেন (আর চিকিৎসার) আমি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি, তাহা আমাদিগের উভয়েরই একজন বিশেষ বন্ধু উপযোগী বলিয়া মনে করেন, ইনি এ বিষয়টী সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন;—আমি মিঃ জন্ লকের কথা বলিতেছি; বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বিবেচনা শক্তির স্থিরতা, এবং ব্যবহারের সরলতা অর্থাৎ উৎকৃষ্টতায় আমাদিগের এ সময়ে তাঁহার সমকক্ষ অতি অল্প লোকই আছে এবং তাঁহা হইতে উচ্চতর ব্যক্তি কেহই নাই, আমি এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি।" ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রশংসা কি হইতে পারে। বিদ্যাভ্যাস, চিকিৎসা, শিক্ষকতা ও ম্যানেজারি, এই কয়টী কার্য্য হয়ত একজন লোকের পক্ষে অতি অধিক কিন্তু লকের ইহা ছাড়া আরও এক কাজ ছিল। ইহার ন্যায় 'ভেজালে কাজ বোধ হয় আর কিছুই নাই; এই কাজটী রাজকার্য্য। লকের প্রভু রাজপুরুষ ছিলেন, সুতরাং তিনি যে রাজকার্য্যে লকের ন্যায় বুদ্ধিমান্ লোকের সাহায্য গ্রহণ করিবেন, ইহা একটী ধরাবাঁধা কথা। ১৬৭০ অব্দের ১লা মার্চ্চ তারিখে কারোলাইনা নামক উপনিবেশের প্রধান প্রধান বিধি সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং লকের ইহাতে কতকটা হাত ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিশেষত ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ে যাহা কিছু উদার নীতি ছিল, তাহা যে লকের বুদ্ধি-প্রসূত, ইহা সম্ভবপর। ১৬৬৮ অব্দে লক রয়াল সোসাইটীর

সভ্য মনোনীত হয়েন; এই সভা ১৬৬০ কিম্বা ১৬৬১ অব্দে কতকগুলি বিজ্ঞানোৎসাহী ব্যক্তিদিগের দ্বারা সংস্থাপিত হয়; নিউটন, বয়িল, রে, উডওয়ার্ড প্রভৃতি অনেকানেক পণ্ডিত ইহাতে যোগদান করেন। সুতরাং ইহার সভ্য হওয়া বিশেষ সম্মানের কথা, কিন্তু লক এই সভার কার্য্যে তত যোগ দেন নাই। লক আর একটী সভাতে অধিক যাইতেন বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহা প্রকৃত পক্ষে সভা নয়, কতকগুলি বন্ধু মিলিত হইয়া গল্পচ্ছলে নানা বিষয় আলোচনা করার আড্ডা মাত্র ছিল। এইরূপ এক আলোচনার উপলক্ষেই লকের প্রসিদ্ধ পুস্তক "মানবীয় বুদ্ধিবিষয়ক প্রবন্ধ" রচিত হয়। কোন্ সময়ে কি বিষয় আলোচিত হওয়ায় উহা লিখিত হয়, তাহা ঠিক জানা নাই। সময় সম্বন্ধে এক জন বলেন, ১৬৭০ কিম্বা ৭১ অব্দ, আর এক জন বলেন, ১৬৭৩ অব্দ। বিষয় সম্বন্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তি "নীতি ও ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ইহাদিগের মূল নিয়ম সমূহ" এই প্রস্তাবটী আলোচিত হয়। আলোচনাতে লকের মনে হয় যে, এ সকল বিষয় লইয়া তর্ক করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের ইহা স্থির করা কর্ত্তব্য, জ্ঞান উপার্জ্জনের কি কি পথ আছে এবং আমরা কি কি বিষয় জানিতে সমর্থ। এই সময় হইতে উক্ত পুস্তক রচনার আরম্ভ হয়, কিন্তু উহা প্রকাশিত করিতে আরো প্রায় ১৭।২০ বৎসর (১৬৯০ অব্দ) লাগে। শারীরিক অসুস্থতা বশত লকের চির জীবন কষ্ট পাইতে হয়। ১৬৭০-৭২ অব্দে তিনি কাশীরোগে আক্রান্ত হন; এই নিমিত্ত জল বায়ু পরিবর্ত্তনের দরকার হয় এবং ১৬৭২ অব্দে গ্রীষ্মাবশেষে তিনি কাউণ্টেস অব নর্দম্বরলণ্ডের সহিত একবার ফ্রান্স যাত্রা করেন। বোধ হয়, এই সময় ফ্রান্সে অবস্থিতিকালে অথবা তথা হইতে প্রত্যাগমনের অবিলম্বে তিনি পাস্কাল ও আর্নোলডের বন্ধু প্রসিদ্ধ পিয়ের নিকোল রচিত 'নীতি বিষয়ক প্রবন্ধমালা' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ফ্রান্সে অল্প কিছুকাল থাকিয়া লক ইংলণ্ডে ফিরিয়া আইসেন এবং তাহার অত্যল্প দিন পরেই লর্ড শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি (লর্ড আশলি ইতিপূর্ব্বে ঐ উপাধি পান) ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান রাজ কর্ম্মচারী (লর্ড হাই চান্‌সেলর) নিযুক্ত হয়েন। লকেরও তৎসঙ্গে উন্নতি হইল, তিনি ৩০০ পাউণ্ড বার্ষিক বেতনে একটী সেক্রেটরি পদে নিযুক্ত হইলেন। যে সব লোক ধর্ম্মযাজকতার ব্যবসায়ে কর্ম্ম পাইতেন, তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়া উপস্থিত করা এই পদের কার্য্য ছিল। যাহা হউক, ১৬৭৩ অব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়েন, তখন লকেরও উক্ত কর্ম্ম ছাড়িতে হইল। কিন্তু তাঁহার আর একটী কর্ম্ম থাকিল; বাণিজ্য ও উপনিবেশ এই দুই বিষয় তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ইংলণ্ডে এই সময় যে একটী কাউন্সিল ছিল, লক ১৬৭৩ অব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে ইহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন এবং ১৬৭৫ অব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত কাউন্সিল ভঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত লক উহার সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু কখনও যে বেতন পাইয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। ১৬৭৫ অব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ব্যাচিলর অব মেডিসিন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন এবং ইহার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার কলেজ হইতে

একটী উচ্চ বৃত্তি পাইবেন, স্থির হয়। ১৬৭৬ অব্দে এই বৃত্তি তিনি প্রথম প্রাপ্ত হন। এক্ষণে তাঁহার বৃত্তি ও পৈত্রিক সম্পত্তি এবং শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি প্রদত্ত বার্ষিক এক শত পাউণ্ড, এই কয় উপায় হইতে যে আয় হইল, তাহাতেই তাঁহার একরূপ চলিয়া যাওয়ার সংস্থান হইল; সুতরাং তাঁহাকে আর ব্যবসাকারী চিকিৎসক হইতে হইল না। রাজ কার্য্যেও তাঁহার আর এখন সময় দিতে হইল না; শরীরের অবস্থাও তাঁহার এরূপ ছিল না যে, তিনি কোন হাঙ্গামে কার্য্যে যোগ দিতে পারেন। এইরূপ অনেকগুলি কারণে এক্ষণে তাঁহার বিস্তর অবসর হইল, সুতরাং তাঁহার চিন্তা করিবার সুবিধাও প্রচুর হইল।

শাফ্‌ট্‌স্‌বেরির পদচ্যুতির সময় লক রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ লোকে ওরূপ অবস্থায় অন্য একজন মনিব খুঁজিয়া লইয়া থাকে, লক শাফ্‌ট্‌স্‌বেরিকে বন্ধুভাবে দেখিতেন, অতএব তিনি সেরূপ করেন নাই। এ বিষয়ে শাফ্‌ট্‌স্‌বেরির প্রপৌত্র (তৃতীয় আর্ল অব শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি) এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—"আমার পিতামহ যখন রাজদরবার পরিত্যাগ করিলেন এবং সেখান হইতে বিপদ গণনা করিলেন, তখন মিঃ লক তাঁহার সহিত পূর্ব্বে যেমন সম্মান ও লাভের ভাগী ছিলেন, এখন আবার সেইরূপ বিপদের ভাগী হইলেন। তিনি তাঁহাকে (লককে) অতি গুপ্ত কার্য্য সমূহের ভার দিয়া পাঠাইতেন, এবং রাজসম্পর্কীয় গুরুতর বিষয় সমূহের মধ্যে যে গুলি সাধারণে জ্ঞাপন করার মত হইত, সেগুলি লিখিয়া প্রকাশ করিবার সময় তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন।" এক জন উচ্চ বংশীয় লোক আর এক জন মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক, এই রূপ দুজনের মধ্যে ইহা অপেক্ষা কি আর অধিক বন্ধুত্ব হইতে পারে। ফলতঃ লক যেমন উচ্চ দরের ভাবুক ও লেখক ছিলেন, তাহার জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি সেই রূপ আবার উচ্চদরের মানুষও ছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি।

সকল রাজ্যেই রাজার বল ও প্রজার বল, দুইটী পৃথক শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অতি সামান্য চিন্তা করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, রাজার নিজের কোন বল নাই; একমাত্র প্রজার বলই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া শাসন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। সুতরাং রাজা, প্রজার অংশ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে এবং প্রজাও অন্যের দ্বারা শাসিত না হইয়া আপনিই আপনাকে বিধিমতে শাসন করে। যখন প্রজারাই আপনাদিগকে শাসন করে, তখন এমন তর্ক উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে যে, তবে আর রাজার আবশ্যকতা কি? তাহার উত্তরে আমরা বলি

যে, যদি সকলের কর্ত্তব্য-জ্ঞান সমান হইত, এবং পরস্পরের বর্ণে বর্ণে মিল থাকিত, তাহা হইলে রাজার আবশ্যকতা থাকিত না, কিন্তু সকল প্রজার কর্ত্তব্য জ্ঞান সমান নহে এবং সকলেই সাধারণের অভাব বুঝিতে পারে না বলিয়া, আপন আপন শক্তির অংশ স্বরূপ একটী সমষ্টি পৃথক শক্তি সৃজন করিয়াছে। ইহাই রাজশক্তি। এই রাজশক্তি একটী ভিন্ন আকার ধারণ করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় কাণ্ডই না সমাধা করিতেছে! অতি বিস্তীর্ণ জনপদের অসংখ্য অধিবাসীর সুখ দুঃখ এই শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। এমন কি, এই শক্তির সুচারু পরিচালনা না হইলে অসংখ্য লোকের জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় এবং অতি সমৃদ্ধিশালী জনপদও অচিরাৎ মরুদেশে পরিণত হইয়া যায়।

রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি উভয়ে একই আদি স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে এমন পৃথক পৃথক রূপ ধারণ করে যে, পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া দাঁড়ায় এবং একে অন্যকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য নিয়ত সুযোগ অনুসন্ধান করে। কিন্তু কি রাজা, কি প্রজা, কেহই এমন বিবেচনা করে না যে, একের উন্নতির উপর অন্যের উন্নতি ও একের অবনতির উপর অন্যের অবনতি সম্পূর্ণ রূপেই নির্ভর করিতেছে। পরিণাম না ভাবিয়া, রাজা ও প্রজা প্রত্যেকেই অন্যের বল হরণ করিয়া আপনাকে সবল করিবার জন্য নিয়ত যত্নশীল। রাজার সর্ব্বদা বাসনা যে, প্রজা যেন কদাপি মস্তকোত্তোলন করিয়া রাজশক্তির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে না পারে। পক্ষান্তরে প্রজারও সর্ব্বদা কামনা যে, রাজা যেন অপরিমিত বলশালী হইয়া প্রজার প্রজাশক্তি-তে বল প্রয়োগ দ্বারা কোন কার্য্য করাইয়া লইতে না পারেন। যদিও পরস্পর ঈদৃশভাবে কোন পক্ষেরই মঙ্গল নাই, তথাপি উভয় পক্ষেরই অন্তরে এ প্রকার একটী ভাব যে সমুদিত হয়, ইতিহাস তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছে। রাজার প্রজাপীড়ন ও প্রজার রাজদ্রোহিতা, এই প্রকার ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল এবং এই ফল ইতিহাসে বিরল নহে। ইহাতে কত রাজা সিংহাসনচ্যুত ও প্রজাকুল নির্ম্মূল হইয়াছে, তাহা কে গণিয়া শেষ করিতে পারে? কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি পরস্পর বিরোধী ভাবের বিরাম নাই। যে রাজ্যে এই প্রকার বিরোধীভাব নাই কিম্বা থাকিলেও যৎসামান্য আছে, সেই রাজ্যই সুখের; অন্যত্র, কি প্রজার কুটীরে, কি রাজছত্রতলে, কোথাও শান্তি নাই। ফ্রান্স প্রজাশক্তিতে রাজশক্তি অপেক্ষা বলবান হইবার জন্য যখন মস্তক উত্তোলন করিল, তখন যে ফরাসী বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল, তাহা সহজে নিবিল না। রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই সমূহ অনিষ্ট ব্যতিরেকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইল না। অন্যথা, আমাদিগের দেশে রাজা প্রভূত বলশালী হইয়া প্রজার সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন, আমরা স্বয়ং রাজার অপরাধের দণ্ড করিতে পারিলাম না সত্য, কিন্তু অন্য বলবান জাতিকে ডাকিয়া আমাদিগের রাজ সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া নিজের নাসিকা ছেদন করিয়া অন্যের যাত্রাভঙ্গ করিলাম। ফলতঃ উভয় শক্তির কোন এক শক্তির অন্যথা পরিচালনা হইলেই

সমগ্র দেশের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। যদি তদ্রূপও না হয়, তাহা হইলে, যে শক্তির অযথা বলাধিক্য হয়, তাহা যে একেবারে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস অতি স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতেছে। সিরাজদ্দৌলা যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন; আমরা তাঁহার যথেচ্ছাচারের প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না, সুতরাং ক্লাইবকে ডাকিতে হইল। ক্লাইব আসিয়া কোন প্রকারে নবাবের দর্প চূর্ণ করিয়া আমাদিগকে দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন।

রাজা যথেচ্ছাচারী, অর্থাৎ অপরিসীম বলশালী হইলে যেমন দেশের অনিষ্ট ঘটে, রাজাও অমিত বলশালী হইলে দেশের তেমনই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। রাজা আদেশ করিলেন যে, রাজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য কয়েকটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে; কিন্তু রাজকোষে অধিক অর্থ না থাকাতে প্রজাকে একটী নূতন কর দিতে হইবে। অমিত বিক্রমশালী প্রজা মস্তক সঞ্চালন করিয়া তাহা প্রদান করিতে অসম্মত হইল। রাজা তৎকালে প্রজা শক্তির বিরুদ্ধে বাক্যব্যয় করিতে পারিলেন না সত্য; কিন্তু যখন শত্রু আসিয়া দেশ আক্রমণ করিল, রাজা তখন কোন মতেই প্রজাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

যদি রাজা বল প্রয়োগ দ্বারা কোন কার্য্যোদ্ধার করিতে প্রয়াস পান, অর্থাৎ প্রজা যাহা করিতে সম্মত নহে, তাহা যদি তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বে করাইয়া লন, তাহা হইলে রাজাকে যথেচ্ছাচারী বলা যাইতে পারে। যথেচ্ছাচারী রাজার রাজ্যে চির দিনই রাজায় প্রজায় বিরোধ চলিয়া থাকে এবং একের নিধন ব্যতিরেকে সে বিরোধ প্রশমিত হয় না। এস্থলে প্রায় সর্ব্বত্রই রাজাকে নিধন প্রাপ্ত হইতে দেখা যায় সত্য; কিন্তু প্রজাকুলও সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যথেচ্ছাচারের সীমা যখন বর্দ্ধিত হইয়া প্রজার অসহ্য হইয়া উঠে, তখন হয় প্রজাকুল পীড়নের জ্বালায় রাজবিদ্রোহী হইয়া আপনারাই রাজার বিনাশ সাধন করে; না হয় অন্য কোন রাজা রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলে প্রজাকুল আনন্দে তাহার বশ্যতা স্বীকার করে। সুতরাং রাজাকেও বশ্যতা স্বীকার করিয়া অন্যের পদানত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়, অথবা সমরক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া যথেচ্ছাচারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যৎকালে রাজা স্বেচ্ছাচারী হন এবং রাজায় প্রজায় সর্ব্বদা সর্ব্বদা বিরোধ ও মনান্তর থাকে, সেই সময়ই অন্যের পক্ষে সে রাজ্য আক্রমণ করিবার সুসময়। রাজায় প্রজায় সদ্ভাব থাকিলে অন্যের রাজ্য আক্রমণ করা বড় সুবিধাজনক হয় না। রাজা স্বেচ্ছাচারী হইলে অপর রাজা সহজেই প্রজাকে হস্তগত করিতে পারে এবং প্রজা হস্তগত হইলেই রাজ্য নূতন রাজার করতলস্থ হইল। ভারতে ইহার বিস্তার দৃষ্টান্ত আছে; দৃষ্টান্তের জন্য ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হয় না। ফল কথা এই যে, রাজা যেমন প্রজার মুখাপেক্ষা করিবার স্থল এবং প্রজার কেন্দ্রীভূত বল, প্রজাও তেমনই রাজার একমাত্র সহায় ও বলের উৎস। অন্যকে অতিক্রম করিয়া কোন একটী বল সজীব থাকিতে পারে না—উভয় বলের সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে কোন রাজ্যই স্থায়ী হইতে বা আদৌ তিষ্টিতে পারে না।

কি স্বাধীন, কি অধীন সকল রাজ্যের পক্ষেই পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সর্ব্বথা প্রযোজ্য। এবং স্বাধীন দেশের পক্ষে যে নিয়ম, অধীন রাজ্যও সেই নিয়মে শাসিত হয় বলিয়া, অধীন রাজ্যের কার্য্য অধিক গুরু ভার বিশিষ্ট প্রজার অবস্থা, সুখ, দুঃখ ও অভাবাদির বিষয় স্বাধীন রাজ্যের রাজার যত অবগত হইবার সম্ভাবনা, বিজিত রাজার তত সম্ভাবনা নাই। বিজয়ী রাজার আচার, ব্যবহার, স্বভাব, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রায়ই বিজিত প্রজার সহিত মিলে না; সুতরাং রাজার পক্ষে প্রজার সম্যক অবস্থা ও অভাব পরিজ্ঞাত হওয়া বিলক্ষণ কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু প্রজার অবস্থা ও অভাব সম্যক অবগত হইতে না পারিয়া শাসন কার্য্যে লিপ্ত হওয়া, রাজা ও প্রজা উভয়ের পক্ষেই বিড়ম্বনা মাত্র। এই সকল কারণে সুযোগ্য আক্‌বর সাহ এতদ্দেশীয় লোকের হস্তেই অধিকাংশ রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া বিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়া, অন্যের পক্ষে শিক্ষা ও দৃষ্টান্তস্থল হইয়া গিয়াছেন। যদি বিজিত রাজ্য সুদৃঢ় ও সুশাসনে রাখিতে হয়, তাহা হইলে বিজিত প্রজাকে অবিশ্বাস না করিয়া তাহাদিগের হস্তে যতই রাজকার্য্যের ভারার্পণ করা যাইবে, রাজা ও প্রজা উভয়ের ততই মঙ্গল হইবে। ইহার কারণ এই যে, বিজিত দেশের প্রজার বল রাজার বল অপেক্ষা অল্প, তাহাতে কোন সংশয় নাই; কেন না, প্রজাশক্তি রাজশক্তি অপেক্ষা হীন না হইলে কোন দেশই বিজিত হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি কোন এক পক্ষ নির্জ্জীব ও অপর পক্ষ অপরিমিত বলশালী হয়, তাহা হইলে সে রাজ্যের মঙ্গল হয় না। সুতরাং সকল প্রকার সুবিধার জন্য প্রজার বলও আবশ্যক। বিজিত রাজ্যের নির্জ্জীব প্রজার শরীরে যদি অধিক পরিমাণে রাজ কার্য্যের ক্ষমতা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রজা-শরীরে যে বলের প্রয়োজন, তাহা থাকে না; সুতরাং প্রজা পক্ষহীন ও রাজ পক্ষ বলবান হইয়া এক বিকট অনুপাতে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া অতি শীঘ্রই উভয় শরীরই লয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি নির্জ্জীব প্রজা-শরীরে রাজবল হইতে কিঞ্চিৎ বল সঞ্চালন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রজাবল অনায়াসে সবল থাকিতে পারে এবং রাজাও অপরিমিত বলশালী হইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং বলাধিক্য বশতঃ যে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, রাজাকে তাহা আক্রমণ করিতে পারে না এবং প্রজাও বলহীনতার আনুষঙ্গিক অনিষ্ট হইতে রক্ষিত হয়। রাজা যথেষ্ট পরিমাণে প্রজার সহিত সহানুভূতি না করিলে, এমন কি, প্রজার অবস্থাই সম্যক প্রকারে অবগত হইতে না পারিলে, কখনই সুচারুরূপে রাজ্য শাসন ও পালন করা যায় না। কিন্তু যদি প্রজার হস্তে অধিক পরিমাণে শাসন ও পালন ভার দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাজাকে প্রজার অবস্থার বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতে হয় না এবং প্রজাও রাজার সহিত সম্যক প্রকারে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারে।

বর্ত্তমান কালে সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত প্রজার বল বৃদ্ধি করা যে একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা কি স্বাধীন, কি অধীন, সকল রাজ্যের রাজারই বোধগম্য হইয়াছে। রাজ্যের সুশাসনের জন্য প্রজা-

শক্তি বৃদ্ধি করা ও অপরিমিত রাজশক্তি হ্রাস করিয়া উভয় শক্তির সামঞ্জস্য করা যে নিতান্ত আবশ্যক এবং প্রজানীতি ও রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য, অতীত ও বর্ত্তমান কালের ইতিহাস তাহা অতি স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত করিতেছে। ফলতঃ উভয় পক্ষেরই বলবৃদ্ধির একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাজ্যশাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সংশয় নাই। প্রজার হস্তে কি পরিমাণ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক এবং রাজারই বা কি পরিমাণ ক্ষমতার অধিকার, আর অতিরিক্ত ক্ষমতার পরিচালনা করায় প্রজার পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে কিনা, তাহা প্রজার ও রাজার অবস্থা এবং অভাব অনুসারে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। এক সীমা সকল রাজ্যের পক্ষে নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে না, কেন না, সকল দেশেরই রাজার ও প্রজার অবস্থা এবং অভাব একরূপ নহে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজার ও প্রজার ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন সীমা বিশিষ্ট, এবং এক রাজ্যে যে নিয়মে শাসন কার্য্য চলিয়া থাকে, অপর রাজ্যে সে নিয়মে চলিতে পারে না। ইংলণ্ড যে নিয়মে শাসিত হয়, ভারতবর্ষ সে নিয়মে শাসিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের নিয়মে ভারত শাসন করিতে গিয়া অতীত কালের শাসনকর্ত্তারা বিস্তর ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং প্রজার অপ্রিয় ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার জেতা ও বিজিত জাতির আচার ব্যবহার ভিন্ন হইলে, জেতার পক্ষে যে বিধি, বিজিতের পক্ষে সে বিধি প্রচলিত হইতে পারে না। যদি উভয়ের শাসনের জন্য, প্রত্যেকের আচার ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, সকল বিষয়েই এক প্রকার বিধি নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে রাজাকে এক পক্ষের অপ্রিয় ভাজন হইতে হইবে এবং কোন বিধি যদি কোন পক্ষের গুরুতর পীড়ার কারণ হয়, তাহা হইলে সে বিধি অবিলম্বে রহিত করিতে হইবে। নচেৎ প্রজা কর্ত্তৃক রাজ্যত্যাগ বা বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়া সম্ভব। যাহাতে এই সকল গুরুতর অনিষ্টপাত না হইতে পারে, রাজার ও প্রজার সর্ব্বতোভাবে সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রাজা ও প্রজার সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে কখনই রাজ্য সুশাসিত হইতে পারে না। উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য, উভয় পক্ষ হইতে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিয়া একটী মিশ্রিত সমিতি গঠিত করিয়া, তাহার মতামত লইয়া শাসন কার্য্য সমাধা করিলে যেমন সুচারুরূপে রাজ্য শাসন করা যায়, এমন আর কিছুতেই যাইতে পারে না।

বিজিত ও জেতৃত্ব সম্বন্ধ না থাকিলেও রাজা ও প্রজায় মিলিত হইয়া রাজ্য শাসন করা যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গলকর, তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। কি প্রকারে উভয় পক্ষ মিলিত হইতে পারে এবং কোন্ পক্ষের কি পরিমাণ ক্ষমতা থাকিলে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সামঞ্জস্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব। অপরাপর কার্য্য ব্যতিরেকে, শত্রু-হস্ত হইতে রাজ্য রক্ষা, প্রজার স্বত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং রাজ্যের আয় ব্যয় নিয়ন্তৃত করা, এই তিনটী রাজার প্রধান কার্য্য। এসকল বিষয় কেবল এক পক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া অপর পক্ষের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত

নহে। যদিও সকল বিষয়েই অল্প বিস্তর উভয় পক্ষের মিলিত কার্য্য প্রণালীই রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর, তথাপি বিশেষ রূপে এই কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষের মিলিত হইয়া কার্য্য করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা আর এক্ষণে কাহাকেও বড় একটা বুঝাইয়া দিতে হয় না। কেবল মাত্র প্রজার মতে রাজ্য শাসন কার্য্য চলিতে পারে না, এবং রাজাও একাকী রাজ্যশাসন করিয়া প্রজা পালন করিতে পারেন না, সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত প্রায় সকল দেশের লোকেই তাহা জানিতে পারিয়াছে। এই কারণে রাজ্য শাসন কার্য্যের নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ করিবার জন্য প্রজাপুঞ্জকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করা, রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সমগ্র দেশের প্রজাপুঞ্জকে আহ্বান করা কদাপি সম্ভবপর নহে। অতএব প্রজাপুঞ্জের কয়েক জন যোগ্য প্রতিনিধি লইয়া নিয়ম সকল বিধিবদ্ধ করাই সুযুক্তি। ইংলণ্ডের শাসন বিধি প্রায় এই প্রণালীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশেও ব্যবস্থাপক সভা আছে; কিন্তু তাহার সদস্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং প্রজার প্রতিনিধি অতি বিরল। সুতরাং তাহা হইতে রীতিমত উপকার হয় না এবং এ প্রকার সভা হইতে কোন রাজ্যই উপকারের প্রত্যাশা করিতে পারে না। রাজপক্ষ হইতে বেতনভোগী বা অবৈতনিক সদস্য থাকে, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু প্রজার পক্ষ হইতে প্রচুর প্রতিনিধি সংখ্যা সদস্য মধ্যে পরিগণিত না হইলে, ব্যবস্থাপক সভা সংগঠিত করা, কেবল প্রজাকে প্রলোভিত করা মাত্র। এবম্প্রকার সভা প্রজায় অর্থনাশক ব্যতীত কখনই হিতকারক হইতে পারে না। রাজা ও প্রজা মিলিত হইয়া শাসন বিধি প্রণয়ন না করিলে, সে বিধি পক্ষপাত দোষযুক্ত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব; এরূপ বিধি পালন করিতে সকলে ধর্ম্মত বাধ্য নয়। যাহাতে রাজা পক্ষপাত দোষে দোষী না হন, সেই জন্য প্রজাকে ব্যবস্থাপক সভায় আহ্বান করা আবশ্যক। প্রজা বা প্রজাকূলের প্রতিনিধিগণ যে, কেবল বিধি করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন, এমন নহে। শাসন কার্য্যে অর্থাৎ সেই বিধি সকল যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাতেও তাঁহাদিগের লিপ্ত থাকা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে আত্মশাসন এই প্রণালীর বীজ—শুভক্ষণে ইহা ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে; কিন্তু বীজ কখন অঙ্কুরিত হইবে কি না, তাহা কেবল বিধাতাই জানেন!

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

"—পত্র লিখিও।"

১

প্রিয়দেবি! কি লিখিব? দুইটী কথায়
প্রাণের এ দুঃখ রাশি বুঝানো কি যায়?
তুমি ত অসূর্য্যম্পশ্যা,—
গৃহকোণে অন্তরস্থা।
দেখিলে দেখেছ রবি আপনার পায়!
দর্পণে চাহিয়া যদি
দেখে থাক সুধানিধি
আপনার সুধাময় আনন ছায়ায়!

চাহিয়া গগণ বক্ষে
দেখ নাই লক্ষে লক্ষে
জ্বলে কত উল্কাপিণ্ড হায় হায় হায়!
কি লিখিব প্রিয়তমে দুইটী কথায়?

২

প্রাণের এ দুঃখরাশি কি লিখিব হায়,
দেখনি পর্ব্বত রূপ
প্রকাণ্ড পাষাণ স্তূপ
বিরাট বিশালবপু—গগণ মাথায়!
তবে এই দুঃখ ভার
কি দিয়ে বুঝাব আর
কি লিখিব প্রিয় দেবি, দুইটী কথায়
প্রাণের যন্ত্রণা এত বুঝান কি যায়?

৩

বলনা কেমনে দেবি লিখিব তোমায়,
যে অপার দুঃখ রাশি
জীবন ফেলেছে গ্রাসি,
যে গভীর শোক-সিন্ধু উছলে হিয়ায়!
দেখনি সরলা যদি
সীমাশূন্য সে জলধি
কেমনে সে মহাশূন্যে মিশিয়াছে হায়;
ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গে
কেমনে সে মহারঙ্গে
গগণের চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসিবারে চায়!
না দেখিলে প্রিয়তমে তাকি লিখা যায়?

৪

বলনা কেমনে দেবি লিখিব তোমায়,
না দেখিলে মরুভূমি
কেমনে বুঝিবে তুমি
কেমন জ্বলিছে ধূধূ চিত্ত নিরাশায়!
কেমন সে মরীচিকা
বিষমাখা বহ্নি-শিখা
বিনোদ বাসন্তী বেশে মোহে বঞ্চনায়,
না দেখিলে মরুভূমি তাকি লিখা যায়?

৫

বলনা কেমনে দেবি লিখিব তোমায়?
দেখনি আগ্নেয় গিরি
পাষাণের বক্ষ চিরি
কেমন অনল স্রোত উছলিয়া যায়!
প্রাণের সে ভস্মছাই
বাহিরিতে দেখ নাই
আবরিয়া রবি শশী গগণের গায়!
যে গম্ভীর পরিতাপে
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে
আহা সে পাষাণভেদী বিলাপ তোমায়
বলনা কেমনে লিখি, তাকি লেখা যায়?

৬

বলনা কেমনে দেবি লিখিব তোমায়?
এ দূর পর্ব্বত-দেশে
এ বিজন বন-বাসে
এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়,
নিমগ্ন তোমার ধ্যানে,
জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে
আকুল হৃদয়ে দেখি শশী অস্ত যায়!
বাগানের চারি পাশে
দৌড়িয়া আঁধার আসে
ভীষণ রাক্ষস যেন গ্রাসিতে আমায়!
এ আকাঙ্ক্ষা এই ধ্যান
এদগ্ধ জ্বলন্ত প্রাণ
অস্তমান শশীকরে মাখা হায় হায়
এই নিশি অবসানে—লিখা নাকি যায়?

৭

এই নিশি অবসানে প্রিয়সি তোমায়,
ছাড়িয়া এসেছি কবে
লেখা দেখি নীল নভে
অস্তমান শশীকরে শুভ্র তারকায়!
প্রভাতের এ বাতাসে
সে দীর্ঘ নিশ্বাস আসে
উদাস করিয়া আহা চিত্ত নিরাশায়!

দেখি সেই অশ্রুজলে
মাখা এই দুর্ব্বাদলে
জনমের মত এই অন্তিম বিদায়,
এই যেন সেই নিশি—যায় যায় যায়!

৮

অন্তিম বিদায় সেই, নিশি যায় যায়,
প্রতিদিন নিশি শেষে
দেখি সে মোহিনী বেশে
অপূর্ব্ব অমর জ্যোতি আনন্দ-উষায়!
অন্য মনে অকস্মাৎ
অমনি বাড়াই হাত
আদরে লইতে দেবি হৃদয়ে তোমায়!
কিন্তু ও আকাশ ধরি
বৃথা আলিঙ্গন করি
হৃদয় ভরিয়া যায় মহাশূন্যতায়!
জানিনা এমন ভাষা
এ বিফল শূন্য আশা
বুক ভরা এ পিপাসা কিসে লিখা যায়,
বলনা কেমনে দেবি লিখিব তোমায়?

৯

বলনা কেমনে দেবি লিখিব তোমায়?
দুইজন দুই পারে
কেহ নাহি দেখি কারে,
ভীষণ বারিধি রাখে দূরে দু'জনায়!
যায়না পাখীটী উ'ড়ে
তোমার ও দেবপুরে,
ভগবান্ বাম হ'লে কি করি উপায়?
শুধু স্বপনের মত
জীবন করিব গত
তোমারি, তোমারি ধ্যানে, তোমারি পূজায়!
বিসর্জ্জন নাহি আর,
হোক্ মৃত্যু শতবার,
এ অপূর্ণ মহা পূজা অমর আত্মায়—
এ অনন্ত মহাব্রত—লিখা নাকি যায়?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ মহিলা।

দুর্গ।

পরদিন অরুণোদয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমরা আগ্রাদুর্গ প্রবেশার্থে "পাস" (Pass) সংগ্রহে ব্যস্ত হইলাম। বিশ্রাম বারে (রবিবার) ইংরাজের আফিস ইত্যাদি বন্ধ, সুতরাং পাস পাইতে সে দিন একটু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইল। শুনিলাম, সেখানকার Brigade General লোক ভাল, ভদ্রলোকের সম্মান রাখিয়া থাকেন। আমরা তাঁর কর্ম্মচারীগণের নিকট পাস পাইলাম। আমরা দুর্গ ইত্যাদি দেখিবার জন্য বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় বাসা পরিত্যাগ করিলাম। প্রথমে দুর্গদ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র জনৈক সজ্জিত শিক সৈনিক আমাদিগের পাস দেখিতে চাহিল। আমাদের গাড়ীর বাহিরে General সাহেবের চাপরাশি ছিল, সে মুখে পাস আছে কহিয়া অন্যদ্বারে গাড়ী লইয়া গেল। আমরাও সেই স্থানে গাড়ী হইতে নামিলাম। দিবা দ্বিপ্রহরে পশ্চিমের আতপ তাপে দগ্ধ হওয়া বড় সুখকর নহে।

প্রস্তরময় ভূমি,—তপ্ত অগ্নিকণাবৎ পদতল তাহাতে নিষ্ঠুর ভাবে দগ্ধ করিয়া এবং প্রচণ্ড সূর্য্যকর মস্তকে ধরিয়া পুড়িতে পুড়িতে তখন দুর্গের মধ্যে যাইবার নিমিত্ত দ্বিতীয় দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে একজন গোরা সৈনিক পাহারায় বসিয়াছিল, সে আবার পাস "তলপ" করিল। এবার ত আর মুখের কথায় চলেনা, এবার তা দেখাইতে হইল। সে তাহা সম্রাট সম প্রভুত্বের সহিত মঞ্জুর করিলে আমরা দুর্গ মধ্যে যাইতে পারিলাম।

আগ্রা-দুর্গ হৃদয়ে আর একটী চিত্রিতা সুন্দরী নারী যেন শোভা পাইতেছে। তাহার মনোমোহন সৌন্দর্য্য, তখন তৃপ্তিকর চাকতা দেখিয়া কতক্ষণ চাহিয়া থাকিতে হয়। অচেতন সৌন্দর্য্য, সচেতন জীবের প্রাণে কত আনন্দ দেয়। ইংরাজ সৈনিক পুরুষদিগের বাসগৃহগুলি এই দুর্গের ভিতর এবং তাহা অতি পরিপাটী ও পরিষ্কার। প্রাঙ্গণে সুস্থকায় প্রফুল্ল স্বাধীন প্রকৃতি ইংরাজ বালক বালিকাগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে—যেন শকুন্তলা-সুত সিংহ-শিশুর কেশর ধরিয়া বিক্রমে খেলিতেছে—এমনি স্বাধীন ও জীবন্ত ভাব। ভারতের অতীত দিনে বীরপুত্রগণ যেরূপ করিয়া ক্রীড়া করিত, তাহা কেবল পুরাণ এবং ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই বালকের স্বাধীনতাময় খেলায় ও নির্ভীকতায় সেই ভূত কালের চিহ্ন কিছু রহিয়াছে মনে হয়। দাসপুত্রগণ জন্মিয়াই মাতৃদুগ্ধের সহিত ভীরুতাই যেন পান করিয়া থাকে, এবং বালকের খেলাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জন্মিয়া যে অধীনতার আঁধারে পরিবর্দ্ধিত হয়, বয়সে জ্ঞান সহকারে তাহা পরিহার করিতে পারে না। শাস্ত্রে আছে, "স্ত্রীজাতি বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি, এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইবেন। নারী কখনই স্বাধীন নহেন।" কিন্তু আমার বোধ হয়, বাঙ্গালী পুরুষ সম্বন্ধে রূপান্তর করিলে এ শ্লোক কতক খাটে, যেমন বাঙ্গালী পুরুষ শৈশবে দিদিমার নিকট রহিয়া, কৈশোরে পাঠারম্ভে জননীর অন্তরালে থাকিয়া এবং যৌবন সমাগমে হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পত্নীর নিকট মন্ত্রপূত হইয়া বীরত্ব প্রকাশের যাহা কিছু অবসর (অনেকের পক্ষে) আশ্রিতা অনাথিনী বিধবা ভগিনী কিম্বা ভ্রাতৃজায়া অথবা বৃদ্ধা পিসী মাসী প্রভৃতির উপর, নতুবা বীর (?) বাঙ্গালী চিরকালই অন্যের দ্বারা রক্ষিত। আফিসে প্রভুর অপমানের বিনিময়ে কিরূপে হাত তুলিতে সাহসী হইবেন? সে ত আর তাঁহাদের কোন দোষ নহে, কলির শাস্ত্রই তাঁহারা সকল বিষয়ে মানিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে যেখানে বাদসাহদিগের বিলাসভূমি ও আরাম নিকেতন ছিল, আজি সেখানে বিদেশীয় সামান্য সৈনিকগণের বাস,—ইহা দেখিলে ভবিষ্যৎ সে চির অজ্ঞাত ও ধন,সম্পদ, মান, সম্ভ্রম যে কেবলমাত্র কথার কথা, ইহাই মনে হয়। যে জীবনের শেষ চিহ্ন শ্মশান-মৃত্তিকায় কিম্বা সমাধিতলে, তাহার জন্য এত হিংসা দ্বেষ বা পরনিন্দা কেন?

"মতি মস্‌জিদ" ও অন্যান্য প্রাসাদ গুলিও এই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। "মতি মস্‌জিদ" মোগল বাদসাহগণের পারিবা-

রিক ভজনালয়, ইহাও মর্ম্মর বিনির্ম্মিত, এবং দেখিতে যেমন মনোহর, তেমনি মূল্যবান্ প্রস্তরে পূর্ব্বে ভূষিত ছিল। এখনও তাহার সেই রাজকীয় গৌরবের কতক কতক নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু সে স্বজনতা আর নাই। সমাধিমন্দির অমরাবতীসদৃশ নিরুপম শোভান্বিত হইলেও, তাহার জীবনশূন্য পরিত্যক্ত ভাবে দর্শকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারে না। যখন বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া উপাসনালয়ে বাদসাহগণ "নমাজ" করিতেন, সে এক দিন, আর আজ এ এক দিন। সময়ের সর্ব্বসংহারক মূর্ত্তি কি ভয়ানক! যাহা যায়, তা আর ত ফিরিয়া আইসে না। থাকে কেবল—শোকের হাহাকার দৃশ্য!

বাদসাহদিগের সায়াহ্ণ সমীরণ-সেবন-স্থান কেমন পূর্ব্ব আরাম স্মরণ করাইয়া দেয়। এই খানে বসিলে যমুনার লীলাময়ী শোভা মুক্তভাবে নয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে যেই এই খানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কে যেন "যাদুকর দণ্ডসম পরশি হৃদয়,

স্বজিয়া নূতন ভব

শত দৃশ্য অভিনব

নয়ন সমীপে আজি ধরিল আমার"

কিম্বা সবার।

প্রদোষের সূর্য্যাকরে যেন জগৎ নূতন এক পরিচ্ছদে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। আমরা তখন কি ছাড়িয়া কি দেখিব, বুঝিতে পারিলাম না। সম্রাট আকবর সকল ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শুনিলাম, তিনি নাকি এই প্রাসাদের উপর দাঁড়াইয়া অস্তগামী রবিকরে মথুরার দেব মন্দিরের চূড়া দর্শন করিতেন। একথা কতদূর সত্য, তাহা জানিনা; তবে এখান হইতে অপরাহ্ণে নিমীলিত দিবাকরে মথুরার দেবালয়ের চূড়া বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে যমুনা-হৃদয়-স্পর্শকারী শীতলবায়ু সেবন করিতে করিতে সম্রাটগণ এইখানে বসিয়া নর্ত্তকীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন।

এখানে দুইখানি "তক্ত" প্রস্তরাসন আছে। কৃষ্ণবর্ণ শিলাসনে স্বয়ং বাদসাহ ও শ্বেতাসনে বীরবল (মন্ত্রী) বসিয়া কখন কখন নিশীথে গুপ্ত দরবার করিতেন। সেই দুইখানি আসন বহুদিন রৌদ্রতাপে দগ্ধ হওয়াতে, কিম্বা যে কারণে হউক, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং সম্রাটের কৃষ্ণাসনের মধ্যে একটা দাগ পড়িয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই। তবে প্রবাদ এই যে, ইংরাজ কোম্পানী পলাসির যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যখন আগ্রায় আসিয়াছিলেন, তখন নাকি দুর্গের মধ্যে এদিক সেদিক বেড়াইয়া শেষ এই আসন দেখিতে আসিয়া, সম্রাটের প্রভুত্বের পরিচয় স্বরূপ এই তক্তে একলম্ফে আরোহন করেন। তাই ইংরাজের (লম্ফ লাগিয়া) পদস্পর্শে অভিমানে কৃষ্ণাসন ফাটিয়া যায়। তাহার মধ্যে যে রক্ত বর্ণ দাগ পড়িয়াছে, তাহা অভিমানীদিগের বিদীর্ণ হৃদয়ের শোণিত চিহ্ন; প্রস্তরের লাল বর্ণ নহে। এই ভ্রমময় প্রবাদের প্রতিবাদ করিলে আগ্রাবাসী সামান্য মুসলমানগণ বড় দুঃখিত হয়। দিল্লীর দরবার ইত্যাদির কথা তুলিয়া নানা প্রকারে অত্যাচার প্রমাণ করিতে শেষে প্রয়াসী হইয়া থাকে।

"শীশমহল" (আয়নার প্রাসাদ) বেগমদিগের চারু নিকেতন। ইহার বাহি-

য়ের ভিত্তি চুণী "পান্না" দ্বারা বিভূষিত এবং ভিতরের সমুদায় প্রাচীর খণ্ড খণ্ড আয়নাতে বিমণ্ডিত। প্রতি প্রকোষ্ঠ এমন মনোহর, দেখিলে যেন কল্পনায় ইন্দ্রালয়ের চিত্র মানসে সমুদিত হয়। এই গৃহে একজনের প্রণয়াভিলাষিণী শত মহিলা পৃথক পৃথক ভাবে বাস করিতেন। এমন উপাদেয় রম্য প্রাসাদে, শত সহস্র পরিচারিকা সেবিতা ও পরিবেষ্টিতা মহিষীগণ যে নিরুপম সুখে কালাতিপাত করিতেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। চিররুদ্ধ ভাবে, সুবর্ণ শৃঙ্খল পরিয়া পরাধীন জীবনে নিশীথ-কল্পনায় মাত্র প্রণয়-সুখ অনুভব করিয়া তাঁহারা কখনও যে সরল প্রাণে হাসিয়াছেন, তাহা কে বলিবে? একজনমাত্র সপত্নী-শঙ্কা নারী জীবনের দারুণ যন্ত্রণা ও বিষম কণ্টক, আর সঙ্গী-বিতা শত প্রতিযোগিনী সপত্নীসহ একত্র বাস, কি ভয়ানক ব্যাপার!!! সে কলহময় ঈর্ষান্বিত সহবাসে স্বর্গও নরক স্বরূপ পূতিগন্ধময় অসহনীয় হইয়া উঠে। তবে যদি "দেবী চৌধুরাণী"র শিক্ষা সদৃশী শিক্ষা গুণে তাহাদিগের সপত্নীর বিষময়ত্ব দূরীকৃত হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না।

বেগমগণের প্রাসাদের নিম্নতলে তাঁহাদিগের "বাঁদী"রা থাকিত। সে স্থান অতি শোচনীয়। সূর্য্যকর দিবা দ্বিপ্রহরেও ভুলিয়াও সেখানে যাইত কি না, সে বিষয়ে সমূহ সন্দেহ আছে। রৌদ্র বায়ু পরিবর্জ্জিত সেই গৃহে বাস এবং কখন কখন বেগম-সাহেবদিগের সেবার অনুমাত্র ত্রুটি হইলে আবার তাহার পার্শ্বস্থ অন্ধকূপে দণ্ডস্বরূপ কয়েদ থাকিয়া তাহারা যে মনুষ্য জীবনের প্রতি অনুরাগিনী ছিল, তাহা ত সহজে অনুভব করা যায় না। তবে তাহাদের মনে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, তাহারা কেহ সুন্দরী হইলে যৌবন-বসন্তে দাসীর অবস্থা হইতে রাজ্ঞীর পদে "প্রমোশন" (Promotion) পাইবে। সেই এক আশায় ক্রীত দাসীরা বাল্যকাল হইতে এইগৃহে সুখের স্বপ্ন দেখিলেও অন্ধ কূপের দৃশ্য তাহারা কখনই বিস্মৃত হয় নাই। ইতিহাসবেত্তা এলিসন বলেন যে, "সারকেসিয়ার কুমারী-গণ শৈশব হইতেই প্রাচীন ধনী বৃন্দের অবরোধবাসিনী হইবার জন্য শিক্ষিতা হইত এবং ভাবী সুখের আশা তাহা-দিগের পিত্রালয় পরিত্যাগের দুঃখ মন্দী-ভূত করিত।" তিনি আরো বলেন,—"পশ্চিম ইউরোপের সুন্দরী যুবতীগণের পক্ষে নাট্যশালা যেমন প্রীতিকর, বাদ-সাহ কিম্বা ধনীগণের অবরোধও (harem) নাকি অবরোধবাসিনীগণের নিকট সেই-রূপ সুখ নিকেতন বলিয়া প্রতীত হইত।" বলিতে পারিনা,—"পরচিত্ত অন্ধকার"—সত্যই ক্রীত দাসীগণ কল্পনাজাত সুখের আশায় প্রকৃত জীবনে কখনও সুখানুভব করিয়াছে কিনা। পূর্ব্বে এই দুর্গের প্রাঙ্গণে অতি রমণীয় পুষ্পোদ্যান ছিল। কাশ্মীর, ইস্পাহান, পারস্য প্রভৃতি দেশজাত ও বহু ব্যয়ে আনীত বিবিধ উপা-দেয় স্বর্গীয় গোলাপ ও নানাবিধ মনো-হর কুসুমে তাহা নন্দনকানন শোভায় বিরাজিত ছিল। যেমন অন্তঃপুরে অলৌ-কিক লাবণ্যময়ী মহিষীগণ, তেমনি এ উদ্যানে দুর্লভ ফুল্ল কুসুমরাজি। যমুনা শীকরবাহী সমীরণ, তাহার প্রাণভরা মুক্ত সৌরভ অনিবার বহন করিয়া আগ্রার দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিত। আজি সেই

নন্দনকানন অন্ধকার, গুটিকত বিলাতী ফুলে,—“ফিঁকে ভায়লেট গন্ধ নাহি তাহাতে”—তাহাকে পুষ্পোদ্যানে অবিহিত করিতেছে। শত শত কৃত্রিম উৎস, সুবাসিত বারিপূর্ণ প্রাণে, উথলিত হৃদয়ে, যেখানে ক্রীড়া করিত, এখন সেখানে জলকণার চিহ্নমাত্র নাই। বিশুষ্কভাবে সকলি পূর্ব্ব সৌভাগ্যের সহিত বিলীন হইয়া গিয়াছে!

বেগমদিগের স্নান-হর্ম্ম্য অতীব রমণীয়। তাহার প্রাচীর রজতনিভ দর্পণখণ্ডে পরিশোভিত। স্নানের নিমিত্ত ইহার ভিতর একটী বৃহৎ কৃত্রিম সরিৎ এমন কৌশলের সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, আপনা হইতে যমুনার সুশীতল পূত বারি তাহাতে অনায়াসে আইসে এবং একজন ব্যক্তি সুখে ভাসমান হইয়া সেই তরঙ্গবিহীন সরিৎসাগরে অবগাহন করিতে পারে। সেই হর্ম্ম্যস্থ সরিৎ লাবণ্য ছটায় আলোকিত করিয়া, নিদাঘ মধ্যাহ্নে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা ভুবনজ্যোতি নুরজাহান কিম্বা রূপসীপ্রধানা যোধবাই যখন আপন আপন সৌন্দর্য্যকিরণে ফুটিয়া উঠিতেন, তখন মেঘমালা শূন্য সরিৎ-হৃদয়ে “যেন জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ জ্যোতি” শত শত হেমনলিনী বিনা প্রভাকরে প্রস্ফুটিত হইত। তাঁহারা রূপের সাগরে রমনীয় দেহলতা ভাসাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দর্পণে আপনার প্রতিবিম্বিত মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া কতবার বিমুগ্ধ হইতেন, তাহা কে বলিবে?

“দেওয়ানী আম” (অর্থাৎ সাধারণের সহ দরবার স্থান) এবং “দেওয়ানী খাস” (কেবল আত্মীয়ের সহিত দরবার করিবার স্থান) ক্রমে দেখিয়া যখন আবার আমরা অন্যদিকের প্রাঙ্গণে আসিলাম, তখন উক্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর “কলভিন” সাহেবের যত্ন-প্রোথিত সমাধি আমাদিগের নয়ন-পথে পতিত হইল। সিপাই বিপ্লবে (১৮৫৭ সালে) ইঁহার মৃত্যু হয়। সমাধি প্রস্তরে জীবন মৃত্যু এবং গুণাবলী সুবর্ণ অক্ষরে খোদিত করিয়া ইংরাজ-রাজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢোলপুর মহারাজাকে পরাজয় করিয়া ইংরাজ কর্ত্তৃক আনীত তাঁহার কামান দ্বয়ও এই স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, দেখিলাম। আমাদিগের জাতি ছুরিকা গৃহে রাখিতেও এখন স্বাধীন নহেন, তখন এত বড় কামানের মর্য্যাদা তাঁহারা বুঝিতে অবশ্যই অপারক কি অনভিজ্ঞ ছিলেন না। শুনিলাম, ঐরূপ সুন্দর কামান আপাতত নাকি পাওয়া যায় না।

দুর্গের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দর্শনীয় মনোহারিতা পরিদর্শন করিয়া সেই সমুদায় দৃশ্য পরিত্যাগ করিবার সময় আমরা সোমনাথে মন্দিরের শ্বেতচন্দন বিনির্ম্মিত বৃহৎ ভগ্নদ্বার দেখিতে গেলাম। এই জীর্ণ স্মৃতি একটী ভগ্নপ্রায় মলিন গৃহে ধূলি ধূসরিত ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য এখনও সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয় নাই। এই পবিত্র দ্বার সোমনাথের গৌরবের সাক্ষীরূপে জীর্ণতায়ও অদ্যাপি আপনার মহিমা প্রকাশ করিতেছে এবং যবনরাজ কর্ত্তৃক সোমনাথের ধ্বংশ ও অসংখ্য মণি মুক্তাদি আহরণের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দিবাবসানের পূর্ব্বেই আমাদিগের অশ্বযান সেকেন্দ্রাভিমুখে প্রধাবিত হইল এবং অনতিবিলম্বে আমরা সেই

সমাধিক্ষেত্রে গিয়া নামিলাম। সেকেন্দ্রা আগ্রা নগরীর বাহিরে, তবে অতি সামান্য দূর মাত্র। এখানে গাড়ী দেখিলেই মুসলমানগণ আপ্যায়িত করিতে দলে দলে আইসে কিন্তু সেই আত্মীয়তার বিনিময়ে অযাচিত অনুগ্রহের প্রতিদানে পয়সা দিতে হয়। সেকেন্দ্রাতে আকবর বাদসাহের ও তাঁহার অন্যান্য পারিজনবর্গের সমাধি রহিয়াছে। সেই সকল সমাধির অবস্থা এখন অতীব শোচনীয়। কাহারো মন্দির ভগ্ন, কাহারও প্রস্তর খণ্ডের স্বর্ণাক্ষর বিলুপ্ত, কাহারও বা সমাধিশয্যা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শ্মশানের হাহাকার এবং জনশূন্যতার নিস্তব্ধ রোদন, কি দেখিব, কি শুনিব, বুঝিতে পারিলাম না, কেবল দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত শ্মশানের সেই ভগ্ন চিত্র স্মৃতিতে মিশাইয়া গেল।

বাদসাহদিগের সমাধির একটু দূরে আর একটী সমাধি-সৌধ দেখিলাম, কিন্তু তাহার ভিতরে আমরা যাই নাই। সেই স্থানের লোকের মুখে শুনিলাম যে, এই "শীশমহল" মহারাজ মানসিংহের ভগ্নীর স্মরণার্থ সংস্থাপিত এবং তাঁহার ভগ্নাবশেষ উক্ত মন্দির-হৃদয়ে যত্নে সমাধিতলে প্রোথিত করা হইয়াছে। এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। কোন ইতিহাসে কিম্বা "হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে" এবিষয়ে কোন উল্লেখ আছে কি না, তাহাও এখন আমার স্মরণ হয় না। আগ্রা সম্বন্ধে দুই একটী নামের উচ্চারণ ও স্থানের বিষয় ভোলানাথ চন্দ্রের সহিত আমার মিল নাই। আমার ভুল, কি তাঁহার ভুল, সে মীমাংসা পাঠকগণ করিবেন। তবে আমার নিজের বোধ হয় যে, ভোলানাথ চন্দ্ররই ঠিক। তাঁহার ও আমার অবস্থাগত বিভিন্নতায়, তিনি প্রবাসে যাইয়া যে সকল সুবিধা পাইয়াছেন, আমি গিয়া তাহা পাই নাই এবং তাহাতেই আমার সম্ভবতঃ প্রমাদ ঘটিতে পারে। সে যাহা হউক, "হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে" সময় সময় আমাকে স্থানাদির বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ আছি।

আকবর বাদসাহের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার ধাত্রী-পুত্রের সমাধি রহিয়াছে। ধনী মুসলমানগণ ধাত্রীর স্তন্যদুগ্ধে নাকি প্রতিপালিত হন। সেই জন্য তাঁহারা ধাত্রীকে মাতৃ সম জ্ঞান করিয়া তাহার পুত্রকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ ভক্তি করিয়া থাকেন। সম্রাট আকবর পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সকল কাজই প্রীতিকর এবং উল্লেখযোগ্য বলিয়া বোধ হয়।

আমরা এই সমাধির অট্টালিকার উপর হইতে ফতেপুর শিকড়ির দৃশ্য কতক কতক দেখিলাম। কিন্তু চর্ম্ম চক্ষে তত রূপ দেখা গেল না, "দূরবীক্ষণের চক্ষে" দেখিলে হয়ত আরও সুন্দরতর দেখাইত। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিকট দূরবীক্ষণ ছিল না। সুতরাং "যন্ত্রহীন বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানবনয়নে" যাহা দেখা সম্ভব, তাহাই দেখিয়া, পরিতৃপ্ত মনে, সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিবা-ক্লান্তি দূর করিলাম।

শ্রীমতী নীহারিকা-রচয়িত্রী।

চৈতন্য-চরিত ও চৈতন্য-ধর্ম্ম। (১৬শ)

ভক্ত দল।

যেদিন অদ্বৈতাচার্য্য বিশ্বম্ভরকে কৃষ্ণের অবতার জ্ঞানে পূজা করিলেন, সেই দিন হইতে বৈষ্ণবগণ তাহাকে অন্য চক্ষে দেখিতে শিখিলেন। ইহার উপরে আবার বিশ্বম্ভরের নবজীবনের নূতন ভক্তির বিকাশ তাহাদের ঐভাবকে দগ্ধেন্ধনে ঘৃতাহুতির ন্যায় উত্তেরোত্তর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ফলতঃ এই সময় হইতেই গৌরের ভবিষ্যৎ ভক্তদল গঠিত হইতে চলিল। ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে এই ঘটনা অতি স্বাভাবিক দেখা যায়; তাহারা যত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নত হইয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে থাকেন, ততই চারি দিক্ হইতে পরিত্রাণের জন্য লালায়িত নরনারী সকল আসিয়া তাঁহাদের দল পুষ্টি করিতে থাকে। দেবনন্দনের প্রেরিত দল, শাক্যসিংহের শিষ্যদল ও মহম্মদের চিহ্নিত দল এই প্রকারে সংগঠিত হইয়াছিল। ধর্ম্মরাজ্যে দলবাঁধা একটী স্বাভাবিক নিয়ম। যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন জীবন লইয়া সংসারের কুটিল পথে ইতস্ততঃ পদবিক্ষেপ করিতেছিল, যখন কোন মহাপুরুষের জীবনের অসামান্য আলোকে সে আপনার জীবনের জঘন্যতা দেখিতে পায়, তখন সেই আলোকে সমাকৃষ্ট হইয়া সেই আত্মা যে তাহার পরিচররূপে পরিণত হইবে, ইহা অতি সহজে বুঝা যাইতে পারে। এই রূপে একটী একটী করিয়া যখন অনেক গুলি মানবাত্মা সেই মহাপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে বেষ্টিত হইয়া পড়ে, তখনই একটী দল গঠিত হয়। ধর্ম্ম জগতে যত কিছু মহান্ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, সকলই দল হইতে, দলেই বল একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে সেই দল যখন উহার সার্ব্বভৌমিক পথ পরিত্যাগ করিয়া অহঙ্কার ও স্বার্থের সংকীর্ণ রাস্তা আশ্রয় করে, তখনই তাহা হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা। কিন্তু মহাপুরুষদিগের জীবনে এরূপ সংকীর্ণতার ভাব কখনও দেখা যায় নাই। জগতে যত কিছু বিপদ্ আসিয়াছে, সে সমুদায়ই মহাপুরুষদিগের অনুবর্ত্তীগণ হইতে। অনুবর্ত্তীগণ, অনেক স্থলে মহাপুরুষের জীবনের লক্ষ্য, ভাব ও ভাষা বুঝিতে না পারিয়া, বিকৃত অর্থ করিয়া ও তাঁহার সঙ্গে আপনাদের কর্তৃত্ব মিশাইতে গিয়া এই রূপ বিপদ আনয়ন করিয়াছে।

গৌরের ভক্ত দল দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ধ্যা না হইতে ভক্তগণ বিশ্বম্ভরের বহির্বাটীতে আসিয়া জুটিয়া মহা প্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, কোন্ দিক্ দিয়া রজনী প্রভাত হইয়া যাইত, কেহ টের পাইতেন না। গৌরের অপূর্ব্ব ভাব বিকাশে এক এক রাত্রি মুহূর্ত্তের ন্যায় কাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহার অলোকিকত্বে আর কাহারও সন্দেহ থাকিল না।

"অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে,
নরজ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে।
কেহ বলে এ পুরুষ অংশ অবতার,
কেহ বলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার।
কেহ বলে শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ;
কেহ বলে হেন বুঝি খণ্ডিলা আপদ।"

এই সময় হইতে কোন কোন মহিলা-গণও গৌরকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

"যত সব ভাগবতবর্গের গৃহিণী;
তাহারা বলয়ে কৃষ্ণ জন্মিলা আপনি।
কেহ বলে হেন বুঝি প্রভু অবতার;
এই মত মনে সব করেন বিচার।"

চৈঃ ভাঃ

গৌরের ধর্ম্ম জীবনের আমূল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দুইটী প্রধান অবস্থা লক্ষিত হয়, প্রথম বিরহ বা ব্যাকুলতা, দ্বিতীয় সম্ভোগ অবস্থা। বিরহ অবস্থার প্রথম ভাগে আপনাকে মহা কৃপাপাত্র দীন মনে করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে নিবিষ্ট চিত্ত হইতেন। এই অবস্থায় মানব স্বভাব ও দুর্ব্বলতা সর্ব্বদা চিত্তপটে অঙ্কিত থাকিত। এই বিরহ ও ব্যাকুল ভাব আবার দুই সময়ে দেখা যাইত। প্রথমতঃ সম্ভোগের পূর্ব্বে ও পরে। প্রথমটীকে পূর্ব্বরাগ ও দ্বিতীয়টীকে বিচ্ছেদ বলা যাইতে পারে। এবস্থাদ্বয়ে ব্যাকুলতা, হা হুতাস, অসহ্য যন্ত্রণানুভূতি, অনুতাপ, বিষম ক্রন্দন, মূর্চ্ছা, স্বেদ, স্তম্ভ, মৌনভাব প্রভৃতি সকল লক্ষিত হইত। সম্ভোগের অবস্থায় ইহার কোন কোন ভাব লক্ষিত হইলেও তাহা বিভিন্ন রূপ কারণাবলম্বনে উত্থিত হইত। গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে ঈশ্বর সম্ভোগের লক্ষণ নানা অবস্থায় নানা রূপে দেখা যাইত; এই অবস্থায় প্রায় তিনি গভীর যোগে যুক্ত ও ভগবানে অভিন্ন ভাব হইয়া আপনার মানুষ স্বভাব ভুলিয়া যাইতেন। এই আধ্যাত্মিক ভাব হইতেও "আমি সেই, আমি সেই" প্রভৃতি ভাষা প্রয়োগ হইত। এবং তাহা হইতেই তাহার অবতারত্বের প্রধাণ কারণ, তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, কৃষ্ণ সম্ভোগকালে গৌরের নৃত্য, হাস্য, আনন্দময় প্রলাপ বাক্য, উচ্চকীর্ত্তন, অশ্রু, পুলক, স্বেদ স্তম্ভ, ও মৌনভাব প্রভৃতি বৈচিত্র্য সকল পর্য্যায়ক্রমে দেখা যাইত। এ অবস্থাতেও তিনি উচ্চ ক্রন্দন করিতেন। কিন্তু সে অনুতাপের ক্রন্দন নহে, প্রিয় সহবাস জনিত আহ্লাদের ও প্রেমের ক্রন্দন।

এক দিন পূর্ব্বরাগের অবস্থায় গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগের গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া আপনার হৃদয়-যাতনার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন;—

"বাহুহেলে ঠাকুর সবার গলা ধরি,
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি,
কোথা গেলে পাইব সে মুরলীবদন,
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে রোদন।
স্থির হই প্রভু সব আপ্তগণ স্থানে
প্রভু বলে মোর দুঃখ করি নিবেদনে।
প্রভু বলে আমার দুঃখের অন্ত নাই,
পাইয়াও হারাইনু জীবন কানাই।"

পূর্ব্বে তিনি একদিন স্বীয় মনদুঃখ বলিবেন বলিয়া ভাবাবেশে উচ্ছ্বাসিত হইয়া বলিতে পারেন নাই, আবার আজ মনের রহস্য কথা প্রকাশ করিবেন শুনিয়া বন্ধুগণ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শুনিতে

লাগিলেন। গৌরচন্দ্র বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

"প্রভু বলে কানাইর নাটশালা গ্রাম
গয়া হইতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান।
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর।
নীলস্তম্ভ জিনিভুজ রত্ন অলঙ্কার
শ্রীবৎস কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার।
কি কহিব সে পীতপট্ট পরিধান,
মকর কুণ্ডল শোভে কমল নয়ান।
আমার সমীপে আইল হাসিতে হাসিতে
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে।"

ইহা সকল ভক্ত জীবনেই সংঘটিত হইয়া থাকে। দেবনন্দন ঈশা অভিষেকের পর স্বর্গীয় কপোত দর্শন করিয়াছিলেন। মহম্মদ গিরিগহ্বরে ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং শাক্যসিংহ কঠোর তপস্যার পর দিব্যদৃষ্টি ও অভীষ্ট দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কানাইর নাটশালায় গৌরচন্দ্রও সেইরূপ দিব্য দর্শন পাইয়াছিলেন, তদীয় জীবনের তাহাই স্তম্ভ স্বরূপ। সে মূর্ত্তি তিনি আর যেন ভুলিতে পারেন নাই। তাহাই তাঁহার সর্ব্বে সর্ব্বা, ইহাতেই তিনি সঞ্জীবিত এবং ইহার দর্শন বিরহেই তাঁহার জীবনমৃত্যু। এত দিন পরে গয়ার রহস্য কথা অবগত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত হইলেন। তাহারা তখন বুঝিলেন যে, বিশ্বম্ভর কিসের জন্য পাগল হইয়াছেন। তদবধি তাঁহারা গৌরকে নায়কত্বে বরণ করিয়া আপনারা তাঁহার আনুপাল্য হইয়া নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

"পরম সন্তোষ চিত্ত হইল সবার:
শুনিলা প্রভুর ভক্তি কথার প্রচার।
সবে বলে আমরা সবার বড় পুণ্য,
তুমি হেন সঙ্গে সবে হইলাম ধন্য।
তুমি সঙ্গ যার তার বৈকুণ্ঠে কি করে?
তিলেক তোমার সঙ্গে ভক্তি ফল ধরে।
আনুপাল্য তোমার আমরা সব জন;
সবার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন।"

বিরহে কাতর হইয়া গৌরসুন্দর স্বীয় ভবনে উপবিষ্ট; তাঁহার প্রিয় সঙ্গী গদাধর পণ্ডিত তাঁহার জন্য তাম্বুল আনিয়া খাইতে অনুরোধ করিতেছেন, গৌরের বাহ্যজ্ঞান নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, হরি কোথায়? গদাধর উত্তর করিলেন, হরি নিরবধি তোমার হৃদয়ে বিরাজিত। হরি হৃদয়ে আছেন শুনিয়া মুগ্ধ গৌরাঙ্গ নখ দিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। গদাধর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহার দুই হস্ত ধরিয়া [illegible] বলিতে লাগিলেন, স্থির হও, একটু অপেক্ষা কর, এখনি হরি আসিবেন। গদাধরকে গৌর অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাঁর আশ্বাস বাক্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। শচীমাতা এই ঘটনা দেখিয়া গদাধরের বহু প্রশংসা করিলেন ও নিয়ত বিশ্বম্ভরের নিকটে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

সঙ্গীদিগের মধ্যে মুকুন্দদত্ত অতি সুগায়ক ছিলেন। ইহার আদিবাস চট্টগ্রামে। গঙ্গাবাস উপলক্ষে নবদ্বীপে স্থিতি। ইনি গৌরচন্দ্রের একজন সহাধ্যায়ী। মুকুন্দের মধুর কণ্ঠ স্বর যোগে ভাগবতের শ্লোকাবলী উচ্চারিত হইলে গৌরের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিত, তখন তিনি উৎসাহে "বোল বোল" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া

উঠিতেন, চারিদিকে হরিধ্বনি হইত। প্রেমের তরঙ্গে নৈশগগণ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত।

এইরূপে নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রেমরঙ্গে গৌরচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

"সর্ব্ব নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক প্রায়
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায়।
এইমত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন;
নিরবধি নিশিদিশি করেন কীর্ত্তন।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ;
সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখি নাশ।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বহির্ম্মুখ লোকদিগের বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তাহারা কীর্ত্তনের ধ্বনিতে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারেনা; বিশেষতঃ প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতকগুলি লোক ভক্তি সাধন করিতেছে, ইহা তাহাদের প্রাণে সহ্য হইল না। সুতরাং যাহার যাহা মনে আইসে, সে তাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা রাজদ্বারে পর্য্যন্ত অভিযোগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। আবার ভক্তদলের মধ্যে শ্রীবাস পণ্ডিতই বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহাকে জব্দ করিতে পারিলে দলটা ভাঙ্গিয়া যাইবে, মনে করিয়া তাঁহার নামে কত মিথ্যা সম্বাদ রটনা করিতে লাগিল। দেওয়ান হইতে দুইখান নৌকা আসিতেছে; শ্রীবাস পণ্ডিতকে সপরিবারে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, এই জনরব অল্প দিন মধ্যে নগরী মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শ্রীবাসের অপরাধ কি? জিজ্ঞাসা করিলে কেহই কিছু বলিতে পারে না। এই সকল কথা শুনিয়া বৈষ্ণবদলের মধ্যে কেহ কেহ ভয় পাইয়া গেল; কিন্তু যাহাদের বিশ্বাস ফাঁকা নহে, তাঁহারা অটল ভাবে ঈশ্বরেচ্ছার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকিলেন। গৌরচন্দ্র এই সকল টোট্‌কা ধমকে ভীত হইবার লোক নহেন; তাই পুরুষ-সিংহের ন্যায় অটল ভাবে প্রকাশ্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরীর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মতলব—লোক দেখুক, তিনি তাহাদের ভয়ে ভীত নহেন। সে সময়ের পাষণ্ডীদিগের মনের ভাব নিম্নলিখিত পয়ারে শ্রীবৃন্দাবন দাস সুন্দর চিত্রিত করিয়াছেন:—

"কেহ বলে এ গুলার হইল কি বাই?
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই।
কেহ বলে গোঁসাই রুষিবে এই ডাকে;
এ গুলার সর্ব্বনাশ হইবে এই পাকে।
কেহ বলে জ্ঞান যোগ এড়িয়া বিচার,
পরম ঔদ্ধত্যপনা কোন্ ব্যবহার?
কেহ বলে কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে?
কত পাক করে এই শ্রীবাসা বামনে।
মাগিয়া খাইয়া বুলে এরা চারি ভাই;
হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা বাই।
মনে মনে বলিলে কি পুণ্যনাহি হয়?
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়?
কেহ বলে আরে ভাই! পড়িল প্রমাদ;
শ্রীবাসের জন্য হৈল দেশের উচ্ছেদ।
আজি মুক্তি দেওয়ানে শুনিল যার কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে হেথা।
শুনিলেন নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ;
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ।
যে সে দিকে পলাইল শ্রীবাস পণ্ডিত
আমা সবা লঞা সর্ব্বনাশ উপস্থিত।
তখন বলিনু মুই হইয়া মুখর;
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর।
তখন না কৈলে ইহা পরিহাস জ্ঞানে;

সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে।
কেহ বলে আমরা সবার কিবা দায়;
শ্রীবাসে বাঁধিয়া দিব যে আসিয়া চায়॥"

ধর্ম্মবীর যাঁহারা, তাঁহারা কি সংসারের লোকের ধমকানীতে ভীত হন? গৌর-সিংহকে নির্ভয়ে নগর ভ্রমণ করিতে দেখিয়া এক দিকে ভক্তদলের যেমন সাহস ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অপর দিকে তেমনি পাষণ্ডীদের মনে ভয় সঞ্চার হইল। তাহারা পরস্পর বলা-বলি করিতে লাগিল;

"এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায়;
রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায়।
আর জন বলে ভাই বুঝিলাম থাক;
যত দেখ হের সব পলাবার পাক।"

শ্রীবাসের গৃহে।

তটশালিনী ভাগিরথীর সুন্দর পুলিনে বিশ্বম্ভর একাকী লীলা ভ্রমণ করিতেছেন; সম্মুখে প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া মৃদুমন্দ গতিতে দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সাগর সঙ্গমে চলিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, মেঘের লেশ মাত্র নাই; তরুণ সূর্য্যের শুভ্র আলোকে দিঙ্মণ্ডল বিধৌত, ভাগীরথী সলিল গর্ভে আকাশের ছবি খানি প্রতি-বিম্বিত, কেবল মাঝে মাঝে দুই একটী ক্ষুদ্র-উর্ম্মিতে, তাহার ক্রম ভঙ্গ হইতেছে। মাথার উপর আকাশবিহারী কলকণ্ঠ পাখীগুলি নূতন উদ্যমে গাইয়া চলিয়াছে, কূলে নর-নারী স্নানাবগাহনান্তে দেবার্চ্চনাদি করি-তেছে। অদূরে একদল গাভী গঙ্গা-পুলিনে চরিতেছে, কোন কোন গাভী পিপাসার্ত্ত হইয়া গঙ্গাজল পান করিতে আসিতেছে। দুই একটী উর্দ্ধপুচ্ছ করিয়া হাম্বারব করিতেছে; কেহ কেহ পরস্পর ক্রীড়া যুদ্ধ করিতেছে; কেহ বা শুইয়া রোমন্থ করিতেছে। প্রকৃতির এই হাসিমাখা ছবি দেখিয়া গৌরচন্দ্রের হৃদয়ের ভাবের কপাট খুলিয়া গেল; অনন্তের দিকে মন ছুটিল। চারিদিক হইতেই যেন জীবন্ত ঈশ্বর তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগি-লেন। প্রেমসমুদ্র উথলিয়া উঠিল। সম্মুখে গাভী মুখ দর্শন, আর রক্ষা নাই, যুগপৎ বৃন্দাবন লীলাস্মৃতি, মহাভাবের উদয় ও মহা সমাধিতে প্রাণ নিমগ্ন। বাহ্যজ্ঞান নাই। ভগবানে অভিন্নাত্মক হইয়া গৌরসিংহ গর্জ্জন করিয়া "আমি সেই, আমি সেই" বলিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন ও যে প্রকোষ্টৈদ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত নৃসিংহ দেবের অর্চ্চনা করিতেছিলেন, তাঁহার বহির্ভাগে আসিয়া সজোরে পদাঘাৎ করিতে লাগিলেন,—

"মুই সেই মুই সেই বলে বার বার।
এইমত ধাঞা আইলা শ্রীবাসের ঘরে।
কি করিস শ্রীবাসিয়া বলে অহঙ্কারে।
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস সেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ নাথি মারে তাহার দুয়ারে।"

শ্রীবাসের ধ্যান ভঙ্গ হইলে দ্বার খুলিয়া দেখিলেন যে অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইয়া বিশ্বম্ভর সমাধিযোগে বীরাসনে উপবিষ্ট। শ্রীবাস গৌরের ব্যাকুলতা বা পূর্ব্ব রাগের অবস্থা ইত্যগ্রে দুই একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সমাধিতে সম্ভোগের ভাব আর কখন দেখেন নাই। সুতরাং যাহা দেখিলেন, তাহাতে অবাক হইয়া গেলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বিশ্বম্ভর আবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগি-লেন:—

"ডাকিয়া বলয়ে প্রভু আরেরে শ্রীবাস,

এতদিন না জানিস আমার প্রকাশ।
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে;
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সব পরিকরে।
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া;
শান্তিপুর গেল-নাড়া আমারে এড়িয়া।
সাধু উদ্ধারিনু দুষ্ট বিনাশিমু সব;
তোর কিছু চিন্তা নাহি পড় মোর স্তব।"

কথিত আছে যে, শ্রীবাস বিশ্বম্ভরের ঈদৃশভাব দেখিয়া বিস্ময়ে, প্রেমে, বিশ্বাসে, ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া তৎকালে বিশ্বম্ভরকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং ভাগবতের ব্রহ্মমোহনের স্তোত্র পড়িয়া ঈশ্বর জ্ঞানে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। পরে সপরিবারে দাস দাসী সমেত বিষ্ণু পূজার জন্য আনীত উপকরণ দিয়া গৌরের পূজা করিয়াছিলেন। গৌরচন্দ্র তখন প্রেমে পূর্ণ মাতোয়ারা; সুতরাং এসব পূজার আপত্তি করা দূরে থাকুক, পুনঃ পুনঃ উৎসাহ সহকারে শ্রীবাসকে কত অমানুষী কথা কহিতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন, শ্রীবাস! লোকে বলিতেছে, তোমাকে সপরিবারে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য বাদসাহ নৌকা পাঠাইয়াছেন, ইহাতে কি তোমার ভয় হইয়াছে? বিশ্বাসিন! তুমি বিশ্বাস কর, তাহা কখন হইবে না। নৌকা যদি আইসে, তবে আগে আমি তাহাতে পদার্পণ করিব। দেখি দেখি, কে তোমাকে ধরিতে পারে? তাহাতেও যদি ক্ষান্ত না হয়; আমি তবে এই ভাবে রাজার নিকট যাইয়া তাহার সব কাজী মোল্লা আনিয়া ভগবৎ প্রেমে সকলকে কাঁদিতে বলিব; যখন তাহারা পারিবে না; তখন হরি সংকীর্ত্তন করিয়া আমি সেই রাজা ও সভা সদস্যগণকে কাঁদাইয়া দিব। ইহাতেও কি রাজার বিশ্বাস হইবে না?" শ্রীবাসের মুখে সন্দেহের ছায়া দেখিয়া গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, 'শ্রীবাস! আমার এ কথায় কি তোমার প্রত্যয় হইতেছে না, দেখিবে সাক্ষাতে এই ছোট বালিকাকে কৃষ্ণ প্রেমে কাঁদাইতে পারি কি না? এই বলিয়া শ্রীবাসের ভ্রাতৃ সুতা চৈতন্য-ভাগবত প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবন দাসের জননী চারি বছরের মেয়ে নারায়ণীকে বলিলেন;—

"নারায়ণি! কৃষ্ণ প্রেমে কাঁদ দেখি"? নারায়ণী অমনি হা কৃষ্ণ! বলিয়া প্রেমাবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিল;—

"সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ সুতা নাম নারায়ণী।
সর্ব্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ।
আজ্ঞা কৈল নারায়ণী কৃষ্ণ বলি কাঁদ।
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত চরিত;
হা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে নাহিক সম্বিত।
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে;
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে।"

তখন গৌরচন্দ্র বলিলেন, কেমন শ্রীবাস; এখন তোমার সন্দেহ দূর হ'ল তো?

শ্রীবাস তখন দুই বাহু তুলিয়া উৎসাহ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবানে যদি আমার বিশ্বাস থাকে; তবে কিসের ভয়; বিশেষত এখন তো তুমি আমার গৃহে বিরাজমান। এখন আর ভয় কেমন করিয়া থাকিবে।" বলিতে বলিতে বিশ্বাসী নয়ন যুগল দিয়া দরদরিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

গৌরের মহাভাব সামান্য লোকের আর দুই এক মুহূর্ত্তের জন্যমাত্র; যখন সে

ভাব হইত, যখন শ্রীকৃষ্ণে মন মগ্ন হইত, ও হৃদয় মাঝে হৃদয়নাথকে পাইয়া আত্মায় আত্মায় মিশিয়া এক হইয়া যাইতেন, তখনকার ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইয়া যাইত না। সে সময়ে গৌরের স্বাভাবিক বিনয় ও দৈন্য আর থাকিত না। মহাধন লাভ হইলে কেই বা দীন থাকে? তাই আস্ফালন সহকারে কত কথাই বলিয়া ফেলিতেন। পাঠক! বিস্মিত হইও না; এ অবস্থা অসামান্য হইলেও অসম্ভব মনে করিও না। সাধারণ লোকের ভাব দেখিয়া মহানুভবদিগের বিচার করা সুবুদ্ধির কার্য্য নয়। তোমার আমার মহাভাব ও অভিন্ন ভাব হয় না বলিয়া তাহা কি অসম্ভব মনে করিতে আছে? বৃন্দাবন দাস শ্রীবাসের ভ্রাতৃ দৌহিত্রও পরম ধার্ম্মিক; সম্ভবতঃ তিনি আপনার মাতা ও মাতামোহের নিকট শুনিয়া ই লিখিয়াছেন; তাহাতে মূল সত্যে অবিশ্বাস করিবার কি আছে? তবে পরম্পরা শ্রবণাদিতে ও কবিতা বর্ণনায় এবং চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস হেতু তাঁহার কথায় যত টুকু মাত্রা বাদ দেওয়া যাইতে পারে, ততটুকু বাদ দিলে হানি নাই। এই দেখুন, মত্ততা ছুটিয়া গেলে গৌরচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কি বর্ণনা আছে;—

"শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈল প্রভু বিশ্বম্ভর?
না কহ এসব কথা কাহার গোচর।
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত অন্তর;
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ ঘর।"

সেই অবধি শ্রীবাসের বাটী গৌরের নিত্য বিহার স্থান হইল।

বরাহ ভাব ও মুরারী গুপ্ত।

গৌর জীবনের বর্ত্তমান অবস্থার নিত্য নূতন ভাবাবেশ হইতে লাগিল; এবং এক একটী বিশেষ ভাব দেখিয়া এক একজন ভক্ত চির দিনের মত আত্ম সমর্পণ করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি এক এক করিয়া এই সকল ভাব দেখিয়াও তাহার অন্য রূপ ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন; ও চির দিনের মত তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। মুরারী প্রভৃতি বাকী আছেন; তাঁহাদেরও সময় হইয়া আসিয়াছে। গৌরের এই সময়ের ভাব পশ্চাদুদ্ধৃত পয়ারে বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন:—

"হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ ভক্তি ময়;
যখন যেরূপে দেখে সেই ভাব হয়।
দাস্য ভাবে যবে প্রভু করয়ে রোদন;
নয়নে হইল দুই গঙ্গা আগমন।
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে;
মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে!
ক্ষণে হয় স্বানুভব দন্ত করি বৈসে;
মুই সেই; মুই সেই; বলি বলি হাসে।
সেইক্ষণে কৃষ্ণরে বাপরে বলি কাঁদে;
আপনার কেশ আপনার পায় বাঁধে!
হইলেন মহা প্রভু যে হেন অক্রুর;
সেই মত কথা কন; বাহ্য গেল দূর।
এই মত নানা ভাবে নানা কথা কয়;
দেখিয়া বৈষ্ণব সব আনন্দে ভাসয়।"

এক দিন বরাহাবতারের শ্লোকাবলি ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়া গৌরাঙ্গের বরাহাবেশ হইল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারী গুপ্তের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মুরারীর প্রীত গৌরের বড় ভালবাসা ছিল; সহসা বিশ্বম্ভরকে আসিতে দেখিয়া মুরারী সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া

বন্দনা করিলেন! গৌরচন্দ্র শূকর! শূকর! বলিয়া বিষ্ণু মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং সম্মুখে জল পূর্ণ পাত্র দেখিয়া বরাহভাবে তাহা দন্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়া শূকরের ন্যায় চারি পায়ে চলিতে লাগিলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে মুরারী গুপ্ত নাকি প্রকৃত রূপে বিশ্বম্ভরকে বরাহ আকার দেখিয়া বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌরের নর দেহ অন্তর্ধান হইয়া শূকর দেহ প্রাপ্তি হইয়াছিল; কি ঈশার শিষ্যেরা যে ভাবে তাঁহাদের নেতাকে শূন্যপদে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে ও দুইখানি রুটী দ্বারা দুই সহস্র লোককে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইতে দেখিয়াছিলেন,মুরারী গুপ্ত সেইরূপ যোগের ও বিশ্বাসের চক্ষে গৌরের বরাহরূপ দেখিয়াছিলেন, বিবেচক পাঠক তাহা বিবেচনা করিবেন। মুরারী গুপ্ত অপূর্ব্ব দর্শনে স্তব্ধ ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলে গৌরচন্দ্র পূর্ণ ভাবাবেশে বলিলেন যে, 'মুরারি! তুমি কি এখনও জানিতে পার নাই যে, আমি এখানে আসিয়াছি।'

"এক দিন বরাহ ভাবের শ্লোক শুনি,
গর্জ্জিয়া মুরারি ঘরে চলিলা আপনি।
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচী নন্দন,
সম্ভ্রমে করিল গুপ্ত চরণ বন্দন।
'শূকর' 'শূকর' বলি প্রভু ঘরে যায়;
স্তম্ভিত মুরারি গুপ্ত চারি দিকে চায়।
বিষ্ণু গৃহে প্রবিষ্ট হইল বিশ্বম্ভর;
সম্মুখে দেখেন জল ভাজন সুন্দর।
বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে;
স্বানুভবে মহাপ্রভু তুলিলা দশনে।
গর্জ্জেন যজ্ঞ বরাহ প্রকাশি খুরকারি;
প্রভু বলে মোর স্তুতি বলহ মুরারি।"

তৎপরে মুরারি গুপ্তকে বরাহ ভাবে নানারূপ উপদেশ দিয়া গৌরচন্দ্র বাহ্যজ্ঞান লাভ করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন যে;—

"এই মত সর্ব্ব লোকের ঘরে ঘরে;
কৃপার ঠাকুর জানায়েন আপনারে।
চিনিয়া সকল ভৃত্য প্রভু আপনার;
পরমানন্দময় চিত্ত হইল সবার।"

আসল কথা, গৌরের ভাবময় জীবনে এই সকল আধ্যাত্মিক দর্শনের মূলীভূত কারণ। সুদক্ষ বাজীকরের বাজিতে দর্শকবৃন্দ যখন নানারূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া থাকেন, তখন একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন প্রেরিত মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক জীবনের আশ্চর্য্য প্রতিভা দর্শনে যে বিশ্বাসী ও নিষ্ঠা সম্পন্ন অনুচরবর্গ অলৌকিক দর্শন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

নিত্যানন্দ মিলন।

নিত্যানন্দের জন্ম কথা ও তীর্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যখন গৌরচন্দ্রের ধর্ম্ম জীবন শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি হইতে চলিল, তখন নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

"এই মত বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ;
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।"

পরম্পরা গৌরের অপূর্ব্ব ভক্তি বিকাশের কথা শুনিয়া তাঁর সহিত সাক্ষাৎ মানসে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আগমন করত নন্দনাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবধূত বেশ, প্রকাণ্ড শরীর, মদমত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় গতি, নিয়ত কৃষ্ণ নাম রসনা দিয়া উচ্চারিত হইতেছে; হরি প্রেম মদিরা পানে মাতোয়ারা. পদে পদে গতি স্খলিত

হইতেছে; দেখিলে হঠাৎ মাতাল বলিয়া ভ্রম জন্মে, অথচ মুখশ্রী পবিত্র ও গম্ভীর, তাহার সহিত আবার বালকের সরলভাব ব্যঞ্জিত। পরম ভাগবত নন্দনাচার্য্য এই তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষকে পাইয়া পরম যত্নের সহিত আতিথ্য সৎকার করিতে লাগিলেনঃ—

"নন্দন আচার্য্য মহা ভাগবতোত্তম;
দেখি মহা তেজো রাশি যেন সূর্য্য সম।
মহা অবধূত বেশ প্রকাণ্ড শরীর;
নিরবধি গতিস্খলে দেখি মহাধীর।
অহর্নিশি বদনে বলয়ে কৃষ্ণ নাম;
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম।
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার;
মহা মত্ত যেন বলরাম অবতার।
পরম কৃপায় করে সবারে সম্ভাষ;
শুনিতে শ্রীমুখ বাক্য কর্ম্ম বন্ধ নাশ।
আইলা নদীয়া পুরে নিত্যানন্দ রায়;
সকল ভুবনে জয় জয় ধ্বনি গায়।"

বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্য যেমন কৃষ্ণাবতার, শ্রীনিত্যানন্দও তেমনি বলরাম, সঙ্কর্ষণ ও অনন্তের অবতার বলিয়া পূজিত। এই অবতার তত্ত্ব কি? স্বভাবত তাহা জানিতে কৌতুহল জন্মিতে পারে। অবতার তত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ এই প্রস্তাবের উত্তর ভাগে বর্ণিত হইবে; সংপ্রতি তাহার সংক্ষিপ্ত অবতারণা করা যাইতেছে। স্বত্ত্বরজস্তম ত্রিগুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি থাকে না; সৃষ্টির আদিকারণে ঐ গুণত্রয় নিষ্ক্রিতাবস্থায় অবস্থিতি করে। ভগবদিচ্ছার সংযোগে যখন গুণত্রয় বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টি রূপে পরিণত হয়, তখন সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেক পদার্থে ঐ ত্রিবিধ গুণ অল্লাধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই জন্য ভাগবতে সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তুকেই ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছে;—

"আদ্যোঽবতারঃ পুরুষ পরস্য' ইত্যাদি।
ভা। ২স্ক। ৬ষ্ঠঅ। ৪০-৪৫ শ্লোক।

এই রূপে ভগবদ্‌গুণাংশের আধারগুলি সমস্তই গুণাবতার বলিয়া কথিত হইলেও সৃষ্টিকার্য্যের মৌলিক গুণ কতকগুলি ঈশ্বরের আদ্যাবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য মতে ইহারাই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, বেদান্ত মতে ইহাদিগকেই পুরুষাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এগুলি গুণ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন সঙ্কর্ষণ বা অহঙ্কার তত্ত্ব একটী গুণ, যাহা সৃষ্টি বিষয়ে এক মৌলিক উপাদান, বলরামে ঐ তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়া তিনিই সঙ্কর্ষণ; আবার নিত্যানন্দে সেই গুণ দেখা গিয়াছিল সুতরাং তিনি বলরামের বা কঙ্কর্ষণের অবতার। কাল ক্রমে আবার কোন অসাধারণ ব্যক্তিতে কোন অসাধারণ গুণ লক্ষিত হইলে, সেইটীকে অদর্শ গুণ বা সৃষ্টি রাজ্যের একটী উপদান বলিয়া গ্রহণ করা হইত। উত্তর কালে সমুৎপন্ন কোন ব্যক্তি বিশেষে সেই গুণ লক্ষিত হইলে সেই ব্যক্তিকে পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শ গুণশালী পুরুষের অবতার বলা যাইত। হনুমান রামচন্দ্রের দাসত্বে ও সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন; চৈতন্য ভক্তের মধ্যে মুরারী গুপ্ত রামচন্দ্রে দীক্ষিত ছিলেন ও চৈতন্য সেবক ছিলেন, সুতরাং তিনি হনুমানের অবতার। সচরাচর কোন ব্যক্তি বিশেষের ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মাবতার বলা যায়, এখানেও উপরোক্ত নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে বলিতে হইবে।

কথিত আছে যে, নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনের পূর্ব্বেই বিশ্বম্ভর মনোবলে তাহা জানিতে পারিয়া সঙ্গীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ২।৩ দিন মধ্যে কোন মহাপুরুষ এখানে আসিবেন।

"আরে ভাই, দিন দুই তিনের ভিতরে,
কোন মহা পুরুষ আসিবেন এথারে।"

তখন সে কথার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পর যে দিন নিত্যানন্দ নন্দনাচার্য্যের বাটীতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর দিন গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবদলের সহিত একত্রিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "গত রাত্রিতে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছি।" তালধ্বজ রথোপরে প্রকাণ্ড শরীর হলধর মূর্ত্তি এক মহাপুরুষ আসিয়া যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিতাই পণ্ডিতের কি এই বাড়ী? মহাপুরুষের নীলবস্ত্র পরিধান, অবধূত বেশ, বাম শ্রুতিতে এক বিচিত্র কুণ্ডল, মহাহুর্দ্দান্ত প্রেমিক ও স্খলিত গতি। আমি অত্যন্ত সংভ্রম সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কোন্ মহাপুরুষ? তিনি উত্তর করিলেন, "বুঝিয়াছি, তুমি আমার ভাই, আচ্ছা কাল তোমার সঙ্গে পরিচয় হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতে গৌরচন্দ্র হলধর আবেশে বিভোর হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "বন্ধুগণ! আমার বোধ হইতেছে, কোন মহাপুরুষ নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন"; শ্রীবাসকে কহিলেন "পণ্ডিত; তুমি যাইয়া তাঁহার অনুসন্ধান কর।" বর্ণিত আছে যে, শ্রীবাসপণ্ডিত তিন প্রহর কাল অনুসন্ধান করিয়া নিত্যানন্দের উদ্দেশ না পাইয়া গৌরাঙ্গকে জানাইলে, গৌর তখন সদলে নন্দনের গৃহে যাইয়া নিত্যানন্দের দর্শন লাভ করিলেন। অবধূতের মুখশ্রীতে তপস্যার অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিয়া গৌরচন্দ্রগণ সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলেন;—

"সবা লঞা প্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘর;
যাইয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন;
সবে দেখিলেন যেন কোটি সূর্য্যোদয়।
অলক্ষিত আবেশ বুঝন নাহি যায়;
ধ্যান সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়।
মহাভক্তি যোগ প্রভু দেখিয়া তাহার।
গণ সহ বিশ্বম্ভর কৈল নমস্কার।
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্ব গণ দাণ্ডাইয়া:
কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া।"

সাধুগণের হৃদয়ে এক প্রকার বৈদ্যুতিক যোগ আছে যে, চারি চক্ষু একত্রিত হইলেই চিনিতে বাকী থাকে না। নিত্যানন্দও গৌরচন্দ্রের পরস্পর সন্দর্শনে তাহাই হইল, নিতাই এক দৃষ্টিতেই গৌরকে চিনিয়া লইলেন;—

"নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর;
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর।"

গৌর নিতাইকে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিলেও, তাঁহার মহিমা সমবেত বৈষ্ণব মণ্ডলীতে প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীবাসকে ভাগবতের শ্লোকাবৃত্তি করিতে বলিলেন। শ্রীবাস শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান বিষয়ক একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলে নিতাই প্রেমে বিভোর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া গৌরচন্দ্র শ্রীবাসকে 'পড় পড়' বলিয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে বলিতে লাগিলেন।

"শুনিমাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক উচ্চারণ;
পড়িল মূর্চ্ছিত হঞা নাহিক চেতন।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়;
'পড়! পড়!' শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়।"

তৎপরে নিতাই নানা প্রকার ভাবাবেশে কখন হাসিতে, কখন কাঁদিতে, কখন উদ্দন্ত নৃত্য করিতে ও লম্ফ দিতে লাগিলেন দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে ধরিয়া কোলে করিয়া বসিলেন ও তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়া অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন :—

"বিশ্বম্ভর বলে শুভ দিবস আমার;
দেখিলাম ভক্তিযোগ চারি বেদ সার।
এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার;
এত কি ঈশ্বর বই শক্তি হয় কার?
সকৃত এ ভক্তি যোগ নয়নে দেখিলে;
তাহারেও কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে কোন কালে।
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি;
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি।
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র;
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র।
তোমা লিখিবেক হেন আছে কোন জন;
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি ধন।
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়;
কোটি পাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়।
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোরে করিবেন উদ্ধারে;
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমারে।
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ;
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ ধন।"

রতনেই রতন চেনে, প্রেমিক না হইলে প্রেমিকের মর্ম্ম বুঝা যায় না। তাই গৌর সুন্দর আবিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দের এত স্তুতি করিলেন। নিতাই সংজ্ঞা লাভ করিলেন, গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কোন্ দিক্ হইতে মহাশয়ের আগমন হইল।" নিতাই বালকের ন্যায় চঞ্চল; বিশেষতঃ আপনার স্তুতি শুনিয়া লজ্জিত হইয়া প্রকারান্তরে গৌরের স্তুতিবাদ করতঃ উত্তর করিলেন; "আমি কৃষ্ণের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি; কিন্তু কোন খানে কৃষ্ণ না দেখিয়া দুঃখিত হইয়া ভাল ভাল লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কৃষ্ণের স্থান সব শূন্য দেখিতেছি কেন? কৃষ্ণ কোথায়? তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, কৃষ্ণ সংপ্রতি গৌড় দেশে গিয়াছেন। তাঁহার পর শুনিলাম যে, নবদ্বীপে বড় নাকি সঙ্কীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে; ও কত পতিত নরাধম পরিত্রাণ পাইতেছে; কেহ কেহ এরূপও বলিল যে, এখানে নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়া এখানে দৌড়িয়া আসিলাম, দেখি পরিত্রাণ পাই কি না।

বিশ্বম্ভর প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে, আমরা মহা ভাগ্যবান্ যে তোমার ন্যায় সাধুর সহিত আমাদের মিলন হইল। দুইজনের মিলন দেখিয়া ও কথোপকথন শুনিয়া বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে কত কি বলাবলি করিতে লাগিলেন;—

শ্রীবাস বলয়ে উহা আমরা কি বুঝি;
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে; দোঁহা পুজি।
গদাধর বলে ভাল বলিলা পণ্ডিত;
সেই বুঝি যেই রাম লক্ষণ চরিত।
কেহ বলে দুইজন যেন দুই কাম;
কেহ বলে দুইজন যেন কৃষ্ণ রাম।
কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি;
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি।

"কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন;
সেই মত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ।
কেহ বলে দুইজনে বড় পরিচয়;
কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠোরে কয়।"

নিতাই গৌরের পর জীবনের ঘটনার রংঙ্গে যে এই ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর গৌর নিতাই ও সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া শ্রীবাস মন্দিরে আগমন করিলেন। তখন মহানন্দে বিহ্বল হইয়া বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন; বাহিরের দরজা বন্ধ হইল; মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে দিগন্ত কাঁপিতে লাগিল; হরি সঙ্কীর্ত্তনের রোলে গগণ মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল ও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া সকলে মহানৃত্য আরম্ভ করিলেন। বিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীপাদ গোঁসাই; তোমার ব্যাস পূজা কোথায় হইবে? নিতাই শ্রীবাসকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন "এই বামনার বাটীতে"। তখন বিশ্বম্ভর শ্রীবাসকে কহিলেন "তোমার উপর বড় কার্য্যের ভার হইল"। শ্রীবাস উত্তর করিলেন, কিছু ভয় নাই; পূজার আয়োজন সামগ্রী সকলই ঘরে আছে; কেবল এক পদ্ধতি পুস্তক নাই; তাহা চাহিয়া আনিলেই হইবে। বিশ্বম্ভর বলিলেন, তবে আর কি? এস সকলে মিলে ব্যাস পূজার অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন করি।

তখন দ্বিগুণ মাত্রা চড়াইয়া প্রমত্তের সহিত নৃত্য কীর্ত্তন হইতে লাগিল। নিতাই ও গৌর কখন দুইজনে বাহু ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি করিয়া নাচিতে লাগিলেন; বৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন ও নৃত্যে মত্ত হইলেন। গৌর নিতাই পরস্পর পরস্পরের চরণধূলি লইতে চেষ্টা করিলেন; উভয়েই পরম চতুর, কেহই ধরিতে ছুঁইতে দিলেন না। কখন প্রেমানন্দে শ্রীবাসের আঙ্গিনার মধ্যে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। নিতাই ও গৌরের নৃত্য প্রেমোন্মাদ জন্য হইলেও, উভয়ের নৃত্যে কিছু কিছু বিশেষ ভাব দেখা গেল। বিশ্বম্ভর প্রেমে টলিয়া টলিয়া ও ঢুলিয়া ঢুলিয়া নাচাতে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁর মস্তক গিয়া চরণ স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু নিতাইর উদ্দণ্ড নৃত্যে পৃথিবী টলটলায়মান।

"বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর;
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ উপর;
টল টল ভুমি নিত্যানন্দ পদ তলে;
ভুমি কম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে।"

এই সকল ভাব দেখিয়া শুনিয়া কোন ভাবুকভক্ত গাইয়াছিলেন;—

"শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে আমার
গৌরনাচে;
আমার নিতাই নাচে রঙ্গ ভঙ্গে;
গৌর নাচে প্রেম তরঙ্গে;
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল বলে"।

নাচিতে ২ ও গাইতে গাইতে গৌরচন্দ্রের সেদিন বলরামাবেশ হইল। হইবারই তো কথা; কারণ পূর্ব্ব হইতে বলদেবকে স্বপ্নে দেখা ও নিতাইর সহিত তাঁহার অভিন্নভাব অনুভব করা হইয়াছিল। বলরামাবেশে গৌরচন্দ্র শ্রীবাসের খট্টার উপর উঠিয়া বসিয়া "মদ আন মদ আন" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন ও নিত্যানন্দকে বলিলেন, আমায় হল মুষল দাও। নিতাই গৌরের করে কর দিয়া বলিলেন, এই লও। সকলে উভয়ের করে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু

কথিত আছে, কেহবা প্রত্যক্ষে হল মূষল দেখিয়াছিল।

"নিত্যানন্দ প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর ;
ঝাঁট মোরে দেহ হল মূষল সত্বর।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ ;
করে দিলা কর পাতি নিলা গৌরচন্দ্র।
করে দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে ;
কেহ বা দেখিল হল মূষল প্রত্যেকে।
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুর সে জানে :
দেখিতেও শক্তি নাহি কহিতে কখনে।"

এই সকল ভাবময় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারায়, ধর্ম্ম জগতে অলৌকিক ও অদ্ভুত কার্য্যের কতই বর্ণনা হইয়াছে। শুধু বর্ণনা নয়, এই সকল অদ্ভুত কার্য্য (Miracles) কত নর নারীর বিশ্বাসস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ উপরোক্ত বর্ণনা পাঠে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

বিশ্বম্ভর তখন"বারুণি ! বারুণি" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন ; নিত্যানন্দ মর্ম্ম বুঝিয়া গঙ্গাজল পূর্ণ পাত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। গৌরচন্দ্র তাহা পান করিলে সকল ভক্তগণ সেই জল অল্প অল্প চাখিলেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা ঐ জলে সত্য সত্য কাদম্বরীর আস্বাদ পাইয়াছিলেন। গৌর তখন নাড়া ! নাড়া ! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু কাহাকে নাড়া বলিতেছেন। গৌর উত্তর করিলেন ;—

"সবেই বলেন প্রভু নাড়া বল কারে ?
প্রভু বলে আইলাম যাহার হুঙ্কারে।
অদ্বৈত আচার্য্য বলি কথা কহি যার ;
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার।
মোহরে আনিয়া নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া ;
নিশ্চিন্তে থাকিল গিয়া হরিদাসে লঞা।"

কিছুকাল পরে গৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি চাঞ্চল্য করিলাম প্রভু জিজ্ঞাসয়,
শিষ্যগণ উত্তর করিলেন ;—
"ভক্তগণ বলে কিছু অত্যাধিক্য নয়।
সবারে করেন প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ;
অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বজন।"

এদিকে নিতাই চাঁদের আবেশ আর ছাড়ে না ; কিন্তু স্বয়ং বিশ্বম্ভর নানা প্রকার উপায়ে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। শ্রীবাসের বাড়ীতে নিতাইর বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল ও শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীকে তিনি মাতৃ সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ভালবাসা ও ভক্তি।

ভালবাসা এই দাবদগ্ধ সংসারের একটা উৎকৃষ্ট সৃষ্টি ;—বিষের সাগরের সুমিষ্ট ঢেউ, কণ্টকাকীর্ণ মৃণালে অতি কোমল, অতি মনোহর, অতি আশ্চর্য্য প্রস্ফুটিত পদ্ম। পঙ্কিল মানব হৃদয়ে ইহার উৎপত্তি বটে, কিন্তু ইহার সহিত তুলনা হয়, জগতে এমন জিনিস আর নাই। এই জিনিসটা যে কি, কোন্ কবি, কোন দার্শনিক তাহা

আজ পর্য্যন্ত সম্যক রূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। পৃথিবীতে এই অত্যুত্তম জিনিসের যে সকল ব্যাখ্যা আছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে এই জিনিসের কিছুই সৌন্দর্য্য বাড়াইতে পারে নাই; বরং ইহাকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। ইহার প্রকৃতরূপ ব্যাখ্যা হয় না—ইহা চিন্তার অতীত, ভাবের অতীত, ভাষার অতীত এক স্বর্গীয় মন্দাকিনী। এই পৃথিবীতে যে কিছুর ব্যাখ্যা হয়, তাহা পার্থিব; যাহা স্বর্গীয়, তাহার ব্যাখ্যা হয় না। ভালবাসা সংসারের একটা আশ্চর্য্য সৃষ্টি।

স্বর্গের জিনিস হইলেও পৃথিবীতে কিন্তু এই ভালবাসার একটা অপবাদ আছে। অপবাদই বল বা বিকৃতিই বল। ভালবাসার নামে এখানে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা চলিতেছে। এই ব্যবসারে অবাধে ভালবাসা পণে স্বার্থ বিনিময় হইতেছে। ভালবাসা এখানে বিনিময়ের মূলধন; আদন প্রদান হইতেছে—স্বার্থ। এই অমূল্য ধন এখানে খুব সস্তা। একটু হাসিয়া, একটু প্রাণ কাড়িয়া, একটু দাঁড়াইয়া মানুষ এখানে কেনা বেচা করিয়া আবার কোথায় নিমেষের মধ্যে সরিয়া পড়ে! এ বাজারে ভালবাসাটা যেন স্বেচ্ছার একটা খেয়াল বিশেষ; নিমেষে আকর্ষণ, নিমেষে বিসর্জ্জন। নিমেষে মিলন, নিমেষে বিচ্ছেদ। নিমেষে আসা, নিমেষে যাওয়া। আজ তোমার ঘরে একটু সৌন্দর্য্য আছে, একটু সৎগুণ আছে, একটু লোকের দাঁড়াইবার ঠাঁই আছে, আজ তোমার ঘর লোকে লোকারণ্য, দলে দলে বান্ধব দল আসিতেছে, দলে দলে আসিয়া তোমাকে স্বর্গে তুলিতেছে, প্রশং-[illegible]বাদে আকাশ ফাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু হায়, বান্ধবদলের স্বার্থের পথে একটা বাধা দেও, হায়, নিমেষে পৃথিবীর ধূলি বালির খেলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর কেহ তোমার কাছে নাই, তুমি যে একাকী, সেই একাকী। বন্ধুত্বের যে একটা কোন স্থায়ী বন্ধনের শক্তি আছে, দিন দিন একথাটীও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হইতেছে। বন্ধুত্বটা এ সংসার বাজারে একটা বিনিময়ের ফন্দি বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। স্থায়ী রূপে নিঃস্বার্থভাবে অতি অল্প লোকই অল্প লোককে ভালবাসে। দিন দিন ভালবাসাটা বড়ই চঞ্চল প্রকৃতির হইয়া উঠিতেছে—যেন পদ্ম পত্রের জল, যেন সৌদামিনীর কোলে ক্ষণবিদ্যুৎ, যেন উত্তপ্ত প্রস্তরে বারিবিন্দু। এই আছে, এই নাই। এই ছিল, এই তার চিহ্নও নাই। এই চঞ্চলতার ভিতরে থাকিয়াও, এত স্বার্থের ঝনঝনানি শুনিয়াও, মানুষ কিন্তু এই অমিয়া পিপাসায় কাতর। বার বার প্রতারিত হইয়াও মানুষ এই বাজারে পুনঃ পা ফেলে। স্বর্গের জিনিসের প্রতি কি মধুর আকর্ষণ! সুধা ভ্রমে গরল, স্বর্ণ ভ্রমে কাচ পাইয়াও, মানুষ এই স্বর্গের অমিয়ার আশা ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না, বাঁচিতে চায় না। কোন কবি বলিয়াছেন—"ভালবাসার জন্য যে পাগল নয়, সে মানুষ নয়, সে পশু।" ভালবাসার প্রতি মানুষের কি সুন্দর টান!

আর একটী ছবি আছে। এই মর্ত্ত্যভবনে প্রকৃত ভালবাসার আকর্ষণ একটা সঞ্জীবনী শক্তি। ভালবাসা বিহনে কাহারও জীবন ধারণে ইচ্ছা থাকে না। ইচ্ছা থাকে না, তা নয়; মানুষ ভালবাসায় বঞ্চিত হইলে বাঁচিতে পারে না। দেখিয়াছি, কত স্ত্রী, স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া, শির

দিন জীর্ণশীর্ণ হইতেছেন, অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে দিন দিন রক্ত মাংস ও তেজোহীন হইতেছেন! হায়, তারপর এই সংসারের সুখকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া চির-কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিতেছেন! বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা মানুষের পক্ষে বড়ই অসহ্য। এরূপ অবস্থায় তাহারা ইচ্ছা-বর্জ্জিত জড়-প্রকৃতিক। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, এ বোধ তাহাদের থাকে না। ঐ একের জন্যই যেন তাহাদের জীবন, ঐ একের অভাবেই মরণ। এইরূপ কত সতী যে পতির দুর্লভ ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া, অকালে পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করিয়াছেন, এই ভারতবর্ষে তাহার সংখ্যা হয় না। নিরাশ-প্রণয়ে স্ত্রীকুলের যে দুর্দ্দশা ঘটে, পুরুষ-কুলের সেরূপ না ঘটিলেও, দেখা গিয়াছে, রমণীর সুস্নিগ্ধ মধুর প্রণয়ে হতাশ্বাস হইয়া কতজন আত্মঘাতী হইয়াছেন। যাহাকে যে ভালবাসে, তার অদর্শন, তার মলিন বদন, তার অসুখ সে সহিতে পারে না। সেখানে নিমগ্ন ভাব। সেখানে আত্মবোধ-হীনতা। সেখানে অহং বলিতে কিছু নাই, সেখানে কেবল "সে"। সে আছে, তাই আছি। সে হাসে, তাই হাসি। তার মুখ খানি, পৃথিবীর আর সকলে কুৎসিৎ বলে, কিন্তু প্রণয়ীর নিকট এমন সুন্দর আর কিছুই নাই। সে মুখ অতি সুন্দর, অতি সুন্দর। তার তুলনা নাই। এমন সুন্দর আর জগতে কিছুই নাই। জগৎই বা কোথায়? সেখানে জগৎ নাই, সেখানে কেবল 'সে'। এক ভিন্ন দুই নাই। সেখানে আত্ম নাই, সেখানে জগৎ নাই, সেখানে কেবল 'সে'। তার অভাবে প্রণয়ী বাঁচে না। ভালবাসা এই জগতে একটা সঞ্জীবনী শক্তি।

কেবল শক্তি? না, তা নয়। ভালবাসায় মুক্তি। বিল্বমঙ্গল চিন্তামনির প্রণয়ে বিমুগ্ধ। সেই প্রণয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য একত্রিত। একদা দারুণ ঝটিকা বহিতেছে, সন্ধ্যাকাল নিদা-রুণ বিদ্যুৎ চমকিতেছে। এমন সময়ে উত্তাল তরঙ্গময়ী নদী শবাশ্রয়ে উত্তীর্ণ হইয়া, ভীষণ বিষধরের লেজ ধরিয়া প্রাচীর পার হইয়া চিন্তামণির নিকট যখন বিল্বমঙ্গল উপস্থিত হইলেন, তখন চিন্তামণি অবাক। চিন্তামণিকে না দেখিলে তার দিন বৃথা যায়। বিল্বমঙ্গল অনিমেষ নয়নে চিন্তামনির মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন! সে দৃষ্টিতে পলক নাই। সেই রূপ অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি অমন করিয়া কি দেখিতেছ? চিন্তামণি বার-রমণী, বিল্বমঙ্গলের স্বর্গীয় গভীর প্রেমের মর্ম্ম বুঝে নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিল, অমন করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কি দেখিতেছ? বিল্বমঙ্গল উত্তর করিলেন, "তুমি কি বুঝিবে? জানি না, তুমি দেবী না রাক্ষসী, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর।" যে স্বরে, যে ভাবে, যে উন্মত্ততায় বিল্বমঙ্গল এই কথা কয়টী বলিলেন, তাহাতে চিন্তামণির চৈতন্য হইল, সে এতদিন পর বিল্বমঙ্গলের প্রণয়ের গভীরতা বুঝিতে পারিয়া বলিল,—"তুমি আমাকে যে রূপ ভালবাসিয়াছ, এই রূপ যদি হরিকে ভাল-বাসিতে, তোমার ইহকাল এবং পর-কালের মঙ্গল হইত।" ইহার পর প্রেম-বিহ্বল বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে পরিত্যাগ করিয়া উন্মাদের ন্যায় হরির অন্বেষণে বহির্গত হন, এবং শেষজীবনে রাখালরূপী হরিকে পাইয়া বিল্বমঙ্গল কৃতার্থ হন।

সংসারের আসক্তিময় প্রণয় কিরূপ সুন্দর ভাবে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিল! প্রেম কেবল শক্তি নয়, প্রেমই মুক্তির পথ।

এই আখ্যায়িকায় প্রণয়ের যে কি গম্ভীর ভাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শত লেখনীরও তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। চিন্তামণিকে না দেখিলেই নয়— তাকে দেখিতে হইলে সাঁতার দিয়া একটা নদী পার হইতে হয়, খেয়া নৌকা নাই, সন্ধ্যা হইয়াছে;— ভীষণ সন্ধ্যা। আকাশে দারুণ মেঘ। মেঘে দারুণ বজ্রনিনাদ, শিলাবৃষ্টি, প্রবল বায়ু—গম্ভীর গর্জ্জন, এ সকল গণনা তোমার আমার নিকট। আমি তুমি মনে করিতে পারি বটে যে, চিন্তামণি বয়স্কা বেশ্যা, তেমন রূপ নাই, তেমন যৌবন নাই, মন মজাইতে পারে তাতে তেমন কিছুই নাই। কলঙ্কের উপর কলঙ্ক, তার উপর আরো কলঙ্ক। ঘৃণার উপর ঘৃণা, তার উপর আরো ঘৃণা। এসকল তোমার আমার গণনা। কিন্তু বিল্বমঙ্গল তন্ময়—তাঁর নিকট সংসারের ঝড়, বৃষ্টি, শিলা, তরঙ্গ-গর্জ্জন, বজ্রনিনাদ, এ সকলে ভয়ের কিছুই নাই। যে আপন-বর্জ্জিত, তার আবার ভয় কিসের? যাহার আপনার জ্ঞান নাই, এ পৃথিবীতে তার আর কিসের জ্ঞান আছে? বিল্বমঙ্গলের প্রাণ চিন্তামণিময়। ঐ প্রণয়ে, ঐ রূপে, ঐ কলঙ্কে, ঐ ঘৃণায় তিনি নিমগ্ন। তাঁর মরণের ভয় নাই। তাঁর জীবনধারণেরও চিন্তা নাই। এক চিন্তা—চিন্তামণি! এই চিন্তামণিকে ভালবাসিয়া শেষে বিল্বমঙ্গল হরিভক্তিতে মাতোয়ারা হইতে পারিলেন। ধন্য প্রেম, ধন্য বিল্বমঙ্গল!

কিন্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এরূপ ভালবাসা মিলে না। পরন্তু আজ কাল এই ভালবাসা বড়ই দুর্লভ। ভালবাসিত জনকে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে,—তার কথা শুনিতে শুনিতে সংসার ভুলিয়া যাইতে, আজ কাল বড় দেখা যায় না। আজ কাল ভালবাসা একটা ব্যবসার ন্যায়। একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। লোকেরা বলে, একজনকে ভালবাসিলে প্রাণের সকল অভাব পূর্ণ হয় না। দশটা বন্ধু বা দশটা স্ত্রী বা দশটা দেবতা চাই! কি ঘৃণার কথা! একজনকেও যে ভালবাসিতে পারে নাই, সে দশ জনকে কখনও ভালবাসিতে পারিবে না। এক জনকে ভালবাসিলে হয় না, একথা যে বলে, সে ভালবাসার মর্ম্ম আজও বুঝে নাই; প্রেম-রাজ্যে সে অতি বালক। অভাব পূর্ণ হবে?—এ গণনা ব্যবসাদারের; প্রকৃত প্রেমিকের কাছে এরূপ গণনা নাই। কি লাভ হইবে, কি পাইব, এসকল গণনা প্রকৃত প্রণয়ীর নাই। যার মধ্যে এ গণনা আছে, সে ধনীকে ধনের জন্য ভালবাসিতে পারে, রিপুচরিতার্থ করিবার জন্য যুবতীকে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু প্রেমের আস্বাদনে সে চিরবঞ্চিত। প্রেম কি কিছু চায়? না, প্রেমের স্বভাবই তা নয়। কি পাইলাম, কি উপার্জ্জন হইল?—এ সকল ব্যবসাদারের গণনা। প্রেমিকের গণনা, "কি দিলাম—? দিতে কি পেরেছি, সর্ব্বস্ব কি বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে?—তার জন্য ধন জন, মান অভিমান, লজ্জা শরম, ভয় ভাবনা, সব কি ডুবাইতে পারিয়াছি।"—প্রকৃত প্রেমিকের কেবল এই গণনা সার। কেন তাঁকে দেখি, কেন তাঁর ধারে বসি, কেন তাঁর কথা শুনি—জানি না। সুখ পাই, আনন্দ পাই? না, তাও জানি না। তাঁকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তাঁর ধারে না

বসিয়া পারি না, তাঁর স্বর না শুনিলে প্রাণ অস্থির হয়, তাই তাঁকে দেখি, তাই তাঁর ধারে বসি, তাই তাঁর কথা শুনি। এখানে আসক্তি আছে, কিন্তু স্বার্থ নাই। "কেন"—এই কথার উত্তর দিতে প্রেমক জানে না। তাঁকে দেখিয়া আশ মিটেনা, তাঁর কথা শুনিয়া বাসনা পূরে না। সে আশ,— সে বাসনা অনন্ত। হাজার বৎসর, কোটী বৎসর তুচ্ছ কথা,— চিরকাল দেখিলে, চিরকাল তাঁর কথা শুনিলেও এ আশ মিটিবার নয়। কেন? তিনি কি দেন?—আমি তা জানিনা। শান্তি দেন, আরাম দেন, তিনি নিষ্পাপ করেন! না, আমি তা কিছুই জানিনা। আমি তাঁকে না দেখিয়া পারি না, আমি তাঁকে প্রাণ না সঁপিয়া থাকিতে পারি না। না—তা আমার দ্বারা হবে না। আমি দরিদ্র? তাঁর জন্য আরো দরিদ্র হতে চাই। আমি মূর্খ? তাঁর জন্য আরো মূর্খ হইব। আমি বিপন্ন? তাঁর জন্য আরো বিপদ মস্তকে করিব। আমি দুঃখী? আমি তাঁকে পাইবার জন্য সর্ব্ব দুঃখকে সার করিব: গৈরিক আন, ভেক আন, আমি তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িব। আমি তাঁর জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ভিখারী হইব। আমি কেবল তাঁকে চাই। তোমার সুখ দুঃখ, আনন্দ বা নিরানন্দ, পাপ বা পুণ্য, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম—আমি ও সকল কিছুই জানিনা, কিছুই বুঝি না, আমি কেবল চাই তাঁহাকে। আমার প্রাণ যিনি, আমার জীবন যিনি, তাঁহার বিনিময়ে কিছু কিনিব? ছি, এমন কথা মুখেও আনিও না। তিনি যে আমাকে ভালবাসেন, তার ভিতরে তাঁর কোন স্বার্থ নাই। তিনি স্বামী, তিনি দেবতা। যিনি আমার লজ্জা রাখেন, তিনি কদাপি মানুষ নন্। তিনি আমাপেক্ষা অনেক উপরে। আমি কত নিম্নে, কিন্তু তবুও তিনি আমাকে ভালবাসেন। কি মহত্ত্ব কি দেবত্ব! আমি পাপী, নরাধম, ঘৃণিত, তাঁর মলিন ভিখারী জীব, আমার কাছে কোন্ আশায় তিনি? কাঙ্গালের গৃহে স্বর্গের দেবতা! পাপীর সহিত তাঁর মিত্রতা কেন? "কেন" শব্দের উত্তর নাই। তাঁর স্বভাবই এই। তাঁর এই প্রকৃতি, তিনি পাপীর সহিত ক্রীড়া করিতেই ভালবাসেন। আমারও এই প্রকৃতি কেন হবে না যে, আমি কেবল তাঁর চরণে মাথা রাখিব। তিনি আমার, তাঁরই এ প্রাণ, এ হৃদয়, এ দেহ, এ মন, সকলই। তিনি আমাকে কিছু দিবেন বলিয়া ভালবাসিব? আমি কে? আমার স্বাধীনতা কোথায়? আমি যে তাঁরই দাসানুদাস, পদানত ভৃত্য। আমি যে তাঁরই গোলাম। এ কেবল গোলাম-গিরি। আমার স্বাধীনতা নাই। আমি পৃথক নই। আমার পৃথক ইচ্ছা নাই। এই রূপ তন্ময় হইয়া যে স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তিনিই সতী এবং এইরূপ তিনিময় হইয়া যে জন বিধাতাকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, তিনিই যোগী, তিনিই ঋষী। আর সতী বা যোগীর অস্তিত্ব মানি না। এইরূপ যে জন নির্লিপ্ত, অনাসক্ত ও নিষ্কাম হইয়া, তাঁরই জন্য তাঁর হইয়া, তাঁতে নিমগ্ন হইতে পারিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই মুক্ত জীব, তিনিই প্রকৃত ভক্ত। আর আমি তুমি যে ভালবাসার ব্যবসা চালাইতেছি, এটা সেটা পাইবার আশায় এঁকে তাঁকে বারবার ডাকিতেছি, আমরা প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত প্রণয়ের একটুও

আস্বাদন আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। যে প্রকৃত আস্বাদন পাইয়াছে, সে নরকবাসী হইয়াও বৈকুণ্ঠের মুক্ত জীব। •

ভালবাসার পণ আত্মত্যাগ,—আপনাকে ভুলা, আপনাকে বিসর্জ্জন দেওয়া। আপনাকে বাঁচাইয়া ভালবাসা পাওয়া যায় না। "দিয়াছি, দিয়াছি, দিয়াছি, সব দিয়াছি;— দেহবস্ত্র, লজ্জা মান, ধন জন, বিদ্যা গৌরব, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, আসক্তি এবং বৈরাগ্য, ধর্ম্ম কর্ম্ম—সব তাঁকে দিয়াছি।" শ্রীরাধিকার এদেশে এত আদর কেন? কুলত্যজিয়াও এত গৌরব তিনি পাইলেন কেন?— কেবল এইরূপ আত্মত্যাগে। চৈতন্যের নামে আজ বঙ্গে সহস্র সহস্র নরনারী ভক্তির অশ্রু ফেলে কেন? কেবল এই আত্মত্যাগে। মহাত্মা শাক্যসিংহ এবং খ্রীষ্টের জন্য কোটী কোটী নরনারী উন্মত্ত কেন?—সেও এই আত্মত্যাগে। আর বিল্বমঙ্গল? বেশ্যার প্রণয়ে কলঙ্কিত হইয়াও আজ এত আদরের কেন? সেও এই আত্মত্যাগে। "দিয়াছি ত সব দিয়াছি। স্বামি, তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই কর্ম্ম, তুমিই জ্ঞান, তুমিই গরিমা, তুমিই ভূষণ, তুমিই দেবতা, তুমিই স্বর্গ"—এই রূপ ভাবিয়া সে স্বাধ্বী স্বামীময় হইয়া স্বামী পদ সেবা করে, সে এই প্রেমের মর্ম্ম কিছু বুঝিয়াছে। আর যে ভক্ত জগজ্জননীকে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া কেবল তাঁতে ডুবিয়া সুখী হইতে পারিয়াছে, সেই এই গভীর নিষ্কাম ভালবাসার মর্ম্ম কিছু বুঝিয়াছে। কিন্তু এই ভালবাসার ব্যবসার দিনে, এই চাটুকারিতার দিনে, এই গভীর ভালবাসার মর্ম্ম লোকে কি বুঝিবে! স্বামী বিয়োগে আবার স্বামী খোঁজে, স্ত্রী বিয়োগে আবার পত্নী অন্বেষণ করে, বন্ধু বিয়োগে আবার বন্ধুর তল্লাসে বেড়ায় যে হতভাগ্য দেশের লোক, সে দেশের লোক নিঃস্বার্থ প্রেম, স্বর্গের ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবে, আশা করা যায় না। ভালবাসা লইয়া তাই কত তর্ক বিতর্ক। আজিকালিকার দিনে তর্ক যুক্তি করিয়া আবার ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। হা ধর্ম্ম, হা প্রেম, হা স্বর্গ!!

আমরা বলিয়াছি, ভালবাসার পণ আত্মত্যাগ। আমরা ইঙ্গিতে বলিয়াছি, ভালবাসা মলিন হয়, কেবল স্বার্থে। স্বার্থ কি?— না আমিত্ব। আমিত্ব যেখানে, সেই খানেই স্বার্থ। পাইব, নিব, উপকৃত হইব,— এখানকার কথা এই। এই রূপ স্বার্থের দূষিত বায়ু-সংস্পর্শে স্বর্গের এই প্রেম অপবিত্র হয়, মলিন হয়। তাকে ভালবাসি, সে কেন আমার এই কাজ করিবে না?—তাকে ভালবাসি, সে কেন আমার অভাব পূরাইবে না?—এ সকল স্বার্থপূর্ণকথা প্রকৃত প্রেমিকের নয়;— স্বার্থপর প্রেম-ব্যবসায়ীর। প্রেমিকের কথা এই—"আশা পূরাও বা না পূরাও, আমি ভালবাসিবই বাসিব। আমি ভালবাসিয়াই সুখী। দেখা দেও বা না দেও, আমি তোমার পানে চাহিয়া থাকিবই থাকিব। তুমি যে পথে, আমার নয়ন মন সেই পথে। পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু মন ত বাঁধিতে পার না। তুমি কিছু দেও বা না দেও, আমি তোমাকে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিব। ধন, মান, গৌরব— সব দিব। লোকে ঘৃণা করিবে, লোকে তিরস্কার করিবে? প্রেম-ভিখারিণী রাধিকা তাহা গণিবেনা। যে যা বলে, বলুক, আমি চিরদিনই তোমার।"

কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী রাধিকা আরো কি বলেন, শুন;—

"মণি নও মাণিক নও, হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ,
নারী না করিত বিধি, তুঁয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।"

আবার স্থানান্তরে –

"আমার মত তোমার শতেক গোপিনী,
তোমার মত বঁধু তুমিই গুণমণি,
দিনমণির আছে শত কমলিনী,
কমলিনীর একা দিনমণি ওই।"

এ সব কথা স্বর্গের কথা, প্রকৃত প্রেমিকার কথা। তোমার আমার সহস্র জন, কিন্তু রাধার ঐ একজন ভালবাসার পাত্র। তাই রাধিকার নাম প্রেমময়ী। যে জন ডুবিতে জানে না, মজিতে পারে না, সে প্রেমের মর্ম্ম কি বুঝিবে!

এখন প্রশ্ন এই, প্রেমে মান অভিমান থাকে কি না? আমাদের মতে, মান অভিমান স্বার্থমূলক। রাধাকৃষ্ণের মান অভিমানের কথা যখন পাঠ করি, তখন যেন এই প্রেমে স্বার্থের পূতিগন্ধময় চিত্র দেখিতে পাই। তখন যেন এ প্রেমকেও আদর্শ মনে করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃত স্বার্থহীন নিষ্কাম প্রেম-ব্রতে মান অভিমান কিছুই থাকে না। মান? "আমি তাঁকে ভালবাসি বলিয়া তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ করাইব? ছি, এ যে মহা কলঙ্কের কথা। আমি এই চাই, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তাঁর কথাই থাকুক। তাঁর জেদ্ই রক্ষা পাউক।" প্রকৃত প্রেমিক এই রূপ বলেন। এই হিসাবে রাধিকার প্রেমেও আমরা কিছু কলঙ্ক দেখিতে পাই। আদর্শ প্রেম, খ্রীষ্টের, চৈতন্যের, বিল্বমঙ্গলের, ম্যাট্‌সিনির।

পৃথিবীতে ভালবাসার নামে অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। সকলেরই মনে রাখা উচিত, সে কিন্তু প্রকৃত প্রেম নয়। "তুমি তাঁকে ভালবাস, তুমি তাঁর জন্য কি করিয়া থাক?" এইরূপ প্রশ্ন অনেকের মুখে শুনা যায়। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা প্রেমের মর্ম্ম বুঝেন নাই। কর্ত্তব্য পৃথক, ভালবাসা পৃথক। এই কার্য্য করা উচিত, এটা জ্ঞানের বা বিবেকের কথা; কাহাকে ভালবাসা,—হৃদয়ের স্বভাব। একটা কর্কশ, নীরস, শুষ্ক, কঠোর; আর একটা সরস, কোমল, মধুর। একটা পুরুষ, একটা প্রকৃতি, দুয়ে কোন মতেই তুলনা হয় না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষ যে কাজ করে, ভালবাসার অনুরোধে তেমন কাজ করিতে পারে না। আবার ভালবাসার অনুরোধে যাহা পারে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষ তাহা পারে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষ পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারে,—তোমার আমার অনেক উপকার করিতে পারে,—ধন ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু প্রাণ দিতে পারে না। প্রাণ দিতে পারে লোক—কেবল প্রেমের মায়ায়। প্রেমের স্বভাবই—আত্মবিসর্জ্জন। প্রেম উপকার, অনুপকার, এ সকল তর্কযুক্তির কথা জানে না। সে জানে, কেবল প্রাণ দিতে। কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি পূজ্য কি প্রেমিক পূজ্য? আমরা তাহার মীমাংসা করিতে পারি না। তবে প্রেমিক ম্যাট্‌সিনি প্রেমের টানে ইটালীতে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন বা আর কোন ব্যক্তি তাহা পারেন নাই, ইহা জানি। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ খ্রীষ্ট, চৈতন্য পৃথিবীর যে কার্য্য করি-

য়াছেন, তাহা পৃথিবীর অতি অল্প লোকেই পারিয়াছেন। দেশের জন্য বা মানবসমাজের জন্য প্রাণ দিতে পারেন, প্রকৃত প্রেমিক; উন্নতি বা উপকার করিতে পারেন, জ্ঞানী বা কর্ত্তব্যপরায়ণব্যক্তি। একের সহিত অপরের আকাশ পাতাল প্রভেদ।

জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা কর, একার্য্য কর কেন? সে বলিবে, ইহাতে জগতের উপকার, মানবের উপকার হইবে, ইত্যাদি। প্রেমিককে জিজ্ঞাসা কর— সে বলিবে, না করিয়া পারি না তাই করি। অথবা বলিবে, এই কার্য্য করিতেই জন্ম, করিয়াই মরিব। মাতৃপ্রেম দেখ—কত মধুর, কত আত্মত্যাগমূলক, কত স্বার্থ বিবর্জ্জিত। পিতৃ-কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখ—কত কঠোর, কত স্বার্থ জড়িত, কত উচ্চ, কত মহৎ। মা প্রকৃতি, মা প্রেমময়ী। পিতা পুরুষ, পিতা কর্ত্তব্যপরায়ণ। এক স্বার্থ বিবর্জ্জিতা, অন্য স্বার্থজড়িত। কিন্তু জ্ঞান এবং প্রেম, পুরুষ এবং প্রকৃতি,—পিতা এবং মাতা উভয়ই আদরের। কোনটীকে ছাড়িলে চলে না। অতএব জ্ঞান ও প্রেম, এ দুই ই চাই। কিন্তু পিতা শ্রেষ্ঠ, কি মাতা শ্রেষ্ঠ, জানি না। তবে মা যে মধুর, মা যে অতি মিষ্ট—কে না তাহা স্বীকার করিবে? মাতার স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে কে না মাতোয়ারা? কোন আশা নাই, কোন কামনা নাই—মা ছেলেকে দেখিয়াই সুখী। সৃষ্টির কি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! কি এক সঞ্জীবনী শক্তি! মা ভিন্ন জগতের মুখ দেখিতেও পারিতাম না। মাতাই সঞ্জীবনী মন্ত্র। মায়ের ন্যায় জগতে আর কিছুই আপন নয়। প্রেমময়ী মাকে কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি লইয়া কেহই চিনিতে পারে নাই, কেহ পারিবে না। প্রেমের গভীর সাধনা ভিন্ন মাতৃদর্শন অসম্ভব। কারণ, প্রেম ভিন্ন প্রেমময়ীকে কে চিনাইতে পারে? পুরুষ প্রকৃতি জ্ঞান-মূলক, এই জ্ঞান জমিয়া জমিয়া, আরো জমিয়া আরো জমিয়া যখন প্রেমরূপ ধরে, অথবা প্রেম যখন জ্ঞানের বিকাশে পরিণতি পায়, তখনই হর-গৌরীর যুগলমিলন হয়, তখনই জগন্মাতার প্রকৃত স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়। জ্ঞান-পুরুষ যখন প্রেম-স্ত্রীতে মিলিয়া একাত্মক হয়, তখন সেই একাত্মক ভাবের ভিতর দিয়া জগন্মাতার আরাধনার স্তব উঠে। সংসার-মহাশ্মশানে মহাবৈরাগ্য-রূপী হর, মহামায়া রূপিনী গৌরীর সহিত একাত্মক হইয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করেন। হর গৌরির ন্যায় যুগলভক্ত সৃষ্টিতে আর নাই।

মা ডাক যেমন সরল, যেমন মিষ্ট, এমন আর কোন ডাক নয়। এই ডাকের ভিতরেই প্রেম জীবন্ত-রূপিনী। মা, মা, মা, বলিয়া তিনবার ডাকিয়া দেখ, তারপরও কঠোর হৃদয়ের কঠোরতা আছে কিনা? যদি থাকে, বুঝিবে, ঐ ডাকে-সিদ্ধিলাভ এখনও তোমার ঘটে নাই। কি নূতন কথা? পৃথিবীতে যার মা নাই, এমন লোক কে আছে? মা বলিয়া ডাকিয়া যার কণ্ঠ শীতল হয় নাই, এমন লোক পৃথিবীতে নাই। সুতরাং মা নাম ডাকায় সিদ্ধিলাভ অসিদ্ধিলাভ আবার কি? অনেকেই এই কথা বলিতে পারেন বটে। আমরা যে কথা বলিতেছি, তাহা এই; মা সকলেরই আছে বটে, কিন্তু তবুও মা নাম উচ্চারণে অনেকের অসিদ্ধি আছে। মা পবিত্রতার মূর্ত্তি। কার নিকট? কেবল পুত্রকন্যার নিকট। মা আর সকলের নিকট অপরাধিনী থাকিতে পারেন

ভয়ানক দুষ্কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু মা সন্তানের নিকট পবিত্র-রূপিনী। মা যখন সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়াছেন, তখন পাপ প্রলোভন, ত্রিতাপ জ্বালা যন্ত্রণা মায়ের নিকট হইতে অন্তর্হিত। রিপুর উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া অনেক স্বামী স্ত্রীর বক্ষে ছুরিকার আঘাত করিয়াছেন, শুনা গিয়াছে। হিংসার ভীষণ পরাক্রমে সতিনের মুখে কালি দিবার জন্য অনেক স্ত্রী স্বামীর রক্ত শোষণ করিয়াছেন, ইহাও শুনিয়াছি, কিন্তু উন্মত্ত অবস্থায়, বা আর কোন অবস্থায় মা সন্তানকে ক্রোড়ে পাইয়া বধ করিয়াছেন, এমন কথা শুনি নাই। ভ্রূণ হত্যা এদেশে হয় বটে, কিন্তু তাহা মাতৃ ইচ্ছায় নয়। গর্ভপাতের দৃষ্টান্ত এদেশে আছে বটে, কিন্তু তাহা সন্তান প্রাপ্তির পূর্ব্বে। সন্তান প্রাপ্তির পর---সন্তান ক্রোড়ে মা -- জগন্মাতার রূপ ধরিয়াছেন, তিনি তখন অন্নপূর্ণা, তিনি তখন নিষ্পাপ। স্ত্রী-লোকের যৌবন-মূর্ত্তি দেখিয়া মানুষ রিপুর উত্তেজনায় মত্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই স্ত্রীলোক যখন সন্তান ক্রোড়ে পাইয়া গণেষ-জননী, তখন তাঁর পানে কলুষিত নেত্রে কেহ চাহিতে পারে না। এ সকল সোজা কথা---খুব সরল কথা। মা যেমন সন্তান ক্রোড়ে পাইয়া নিষ্পাপ হন, মাতার কোলে যতদিন সন্তান, ততদিন সন্তানও তেমনি নিষ্পাপ। মা ও ছেলে,উভয়ে একত্রে যখন, তখন উভয়েই নিষ্পাপ। কৃষ্ণ যখন দেবকীর ক্রোড়ে, তখন তিনি স্বর্গের শিশু। কিন্তু কংশের ভয়ে যখন যশোদার গৃহে তিনি প্রতিপালিত, তখন তাহাতে সংসারের মলিনতা ছিল। সংসার-কংশের তাড়নায় দুর্ভাগ্য ক্রমে এই পৃথিবীতে অনেক সন্তান মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত। ইহা বিধাতার লীলা কিনা, জানি না। পৃথিবীতে পাপ-সংগ্রামে জয় লাভে অসমর্থ হইয়া আমরা অনেকেই মলিন, নিস্তেজ, নির্বীর্য্য। মা অনেক দূরে। ক্রমে ক্রমে আরো দূরে, আরো দূরে, আরো দূরে। সংসারের পর সংসার, পাপের পর পাপ, রিপুর পর রিপু, স্বার্থের পর স্বার্থ,— সব যেন মহা পারাবার, সব যেন অনন্ত। অকূল পারাবারের পরপারে মা। তাই আমাদের হৃদয় কত মলিন, কত নিস্তেজ! এই নিস্তেজ কণ্ঠে মাতৃ নাম ফুটিয়াও ফুটে না। কত ডাকি, কিন্তু সে ডাক কিছুতেই পবিত্র হয় না। কি যেন একটা কল্পনা-আঁধার, কি যেন একটা ভয়মাখা কর্কশ স্বর ডাকের সহিত ফুটিয়া উঠে। এই মা নাম শিশুর কণ্ঠে যেমন মিষ্ট, বয়স্ক ব্যক্তির কণ্ঠে তেমন মিষ্ট লাগে না। শিশুর মাতা যেন শিশুর বুকের ভিতর। যুবকের মা, সংসার পারা-বারের পর পারে। যুবকের বন্ধুবান্ধব, স্ত্রীপুত্র কত আসক্তি আছে; তার ভালবাসা শতধা; কিন্তু শিশুর সম্বল কেবল মা। যুবকের ডাক কত উচ্চ, কত গগনস্পর্শী—সপ্তম ছাড়িয়াও উপরে উঠিয়াছে; কিন্তু শিশুর ডাক পঞ্চমেরও নিম্নে। যুবকের ঐ উচ্চ ডাকও জননী শুনেন কি না, সন্দেহ; আর শিশুর ঐ মৃদু ডাকে, যাহা পৃথিবীর আর কোন লোক শুনিতে পায় কি না, সন্দেহ, মা অস্থিরা! শিশুর ডাক অনন্তগতি-ব্যঞ্জক, যুবকের ডাক অন্তগতি-ব্যঞ্জক। সে যেন আর মায়ের নয়। সে যেন আর কার হইয়া গিয়াছে। সে যেন আর কার নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়াছে। তাই যুবকের ডাকে মা

অস্থিরা নহেন—অনেকবার শুনেন না, অনেকবার শুনিলেও তার প্রতি কর্ণপাত করেন না। আর অনন্যগতি শিশুর মধুর ডাক,—হায়, উঁহার নিকট জননী আত্ম-বিক্রীত ;—ঐ ডাক কাণে গিয়াছে কি তিনি অস্থিরা। শিশুর ডাকের পরেই মা যেন বিকল অঙ্গ প্রাপ্ত, তিনি যেন আর তিনি নন্, কি যেন হইয়া গিয়াছেন। কেন বলত? শিশুর আর যে কেহ নাই। মা জানেন, শিশুর মুখের দিকে তাকাইতে তিনি ভিন্ন আর যে কেহ নাই। শিশু আর কাকেও যে চিনে না। সে অনন্যগতি, সে কেবল মাকে জানে, কেবল মাকে ডাকে। সে নিষ্পাপ, তাই সে ডাকে কেবল মা, কেবল মা। এইরূপ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ না হইলে, মা ডাকে সিদ্ধিলাভ হয় না। নিষ্পাপ এবং অনন্যগতি হইয়া যখন মানুষ মা মা বলিয়া ডাকে, তখন স্বর্গ সেখানে অবতীর্ণ হয়। তখন মাতার মাতা বিশ্বমাতা সন্তানের সমক্ষে প্রকাশিত হন। এইরূপ মাতৃডাকে সিদ্ধিলাভ করিয়াই মানুষ দেখে, এই পৃথিবীতে পর কেহই নাই, শত্রু কেহই নাই, সকলই মায়ের ছায়া; মায়ের সন্তান। সকলই মায়ের রূপ। সকলই মায়ের মায়া। মা স্ত্রীরূপে, মা স্বামীরূপে, মা সন্তান রূপে, মা পিতা মাতা রূপে, মা বন্ধুরূপে, মা আত্মীয় রূপে। মা শাসক রূপে, মা শাসন রূপে। মা অনন্ত-রূপিণী, মায়ের অনন্ত রূপ। কিন্তু এও প্রেমের জমাট নয়। প্রেমের জমাটরূপ ভক্তি। প্রেমে মজিতে মজিতে ভিন্নত্ব ঘুচিয়া যখন একরূপ জগন্ময় হয়, তখনই প্রেম জমাট বাঁধে। তুমি ভাই, তুমি ভগিনী, তুমি বন্ধু—তখন আর এবোধ নাই। তখন কেবল মা-বোধ। 'মাই তখন সর্ব্বস্ব। শিশু ত মা ভিন্ন আর কিছু জানে না। সংসারে কোটী কোটী পৃথক বস্তু আছে, কিন্তু শিশু জানে কেবল—মা। মাতৃ নামে সিদ্ধি লাভ করিলে নিষ্পাপ যুবকও সেইরূপ মা ভিন্ন আর সবই ভুলিয়া যায়। সে স্ত্রীকেও মা বলে, ভাইকেও মা ডাকে, সে বন্ধুকেও মা ডাকে, শত্রুকেও মা ডাকে। সে উন্মত্ত। সে সংসারের গণনা—সংসারের সম্বন্ধের ইতর বিশেষ জানে না। সে জিতেন্দ্রিয়, সে ত আর রিপুর অধীন নয়, সুতরাং তাঁর নিকট সকলই সমান—সকলই একরূপ—সর্ব্বত্রই কেবল মা। এই মা-গত একপ্রাণতাকেই ভক্তি কহে। এই গভীর প্রেমের সাধনা যে সহজ মনে করে, সে আজও প্রেমের আস্বাদন কিছুই পায় নাই। যাহারা স্বার্থ বা রিপুর উত্তেজনায় ভালবাসার কেনাবেচা করিয়া বাজারে বেড়াইতেছে, তাহারা প্রতারক ভিন্ন আর কিছুই নয়। গভীর প্রেমের সাধক পৃথিবীতে অতি বিরল। যে গভীর প্রেমের মর্ম্ম বুঝে নাই—ভক্তির মর্ম্ম সে কোন রূপেই বুঝিতে পারে না। তাই প্রকৃত ভক্ত পৃথিবীতে এত দুষ্প্রাপ্য।

প্রকৃত ভালবাসায় মান অভিমান নাই, লজ্জা ভয় নাই, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু জোর জবরদস্তি বা আদর আব্‌দার ভক্তির জগতে কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। "তুমি দেখা দিবে না?—দেখি, কেমনে না দিয়া পার। তুমি একাজ করিবে না? দেখি, কেমনে না করিয়া থাকিতে পার?" এ সকল জোর জবরদস্তির কথা প্রকৃত ভক্ত কোন কোন সময়ে বলিতে পারেন। ছেলে মায়ের নিকট আব্‌দার করিতে অধিকারী। "আমি

কি আটাসে ছেলে, আমি ভয় করি কি চোক্ রাঙ্গালে—" প্রভৃতির ন্যায় কথা রাম প্রসাদের ন্যায় ভক্তের উক্তিতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। ভক্ত যখন বলেন—"দীনসখা, কাছে এস, তখন ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু দূরে থাকেন্ না।"—একথা অনেকেই বলেন। ইহা কেন? সে কি আসক্তিতে? ভগবান কি খোসামুদির বশ? না, তা নয়। ভক্তকে তিনি কি কিছু ভয় করেন? না, তাও নয়। তিনি জানেন, ভক্তের তিনি ভিন্ন ত আর কেহই নাই। মা জানে, শিশুর কেবল মা, তাই মা শিশুর জন্য অধীরা। ভগবান জানেন, ভক্তের আর কেহই নাই, তাই তিনি তার জন্য ব্যাকুল। যে অনন্যগতি না হইয়াছে, সে প্রেমিক নয়। একে যে প্রাণ সমর্পণ না করিয়াছে, সে প্রেমের মর্ম্ম বুঝে নাই। এবং সকলের ভিতরে একের মূর্ত্তি যে দেখিতে না শিখিয়াছে, সে ভক্ত নয়। ভক্ত প্রহ্লাদ স্তম্ভে হরিকে দেখেন, জলে আগুনে হরিকে দেখেন। যে দশ জনের নিকট বিকাইল, সে ভক্ত নয়। খ্রীষ্ট, এক জনের জন্যই পাগল ছিলেন। তাই সংসারের জন্যও ফেরেন নাই;—পিতা মাতাকেও পিতা মাতা বলিয়া ডাকেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, একজনকে যখন পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি, তখন আর অন্যকে পিতা বলিব কেন? যে ব্যক্তি দশ জনের মন রাখিয়া চলে, সে ভক্তির মর্ম্ম বুঝে নাই। সে ব্যবসাদারী শিখিয়াছে মাত্র। সে কত জনকে ভালবাসে, আবার ছাড়ে! সে নূতন ভালবাসার জন্য কেবল নূতন লোক ডাকে। ভক্ত কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"লোকেরা ভাল কাজ করিতে বলিলেও তাহা করিব না, কিন্তু ভগবানের কথায় করিব। * * * এক জনের দাসত্ব করিতেছি বলিয়াই অন্যের দাসত্ব করিতে পারিতেছি না।" ইহাই ঠিক কথা। ভগবদ্ভক্ত মানুষ আর কাহারও কথা শুনিয়া চলিতে পারেন না,—আর কাহারও দাসত্ব করিতে পারেন না। ভক্ত সর্ব্বদা, সর্ব্বঠাঁই কেবল তাঁহাকেই দেখেন, তাঁহাতেই মজেন। ব্রত উপবাস, উপাসনা অর্চ্চনা, নিয়ম প্রণালী—এ সকলও ভক্তের নিকট তুচ্ছ কথা। ভক্ত তোষামোদ জানেন না, মায়া করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে পারেন না,? তিনি কেবল জানেন—মা। মাই তাঁর পূজা, মাই তাঁর অর্চ্চনা। মাই তাঁর সর্ব্বস্ব। ভক্ত মাকে যখন ডাকেন, মা তখন অস্থিরা। মা তখন তাঁর প্রাণে। শিশু ভক্তের আব্দার শুনিয়া মা কখনও দূরে থাকিতে পারেন না। তিনি নানা যুগে নানা বেশে ভক্তের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণই হউন, আর তিনি রাধিকাই হউন, তিনি নারায়ণই হউক, আর তিনি ভগবতীই হউন, তাঁর নাম নাই, কিন্তু রূপ আছে। ভক্ত যেরূপ দেখিতে যখন পিপাসিত হন, অথবা ভক্তকে যেরূপে দেখা দিতে তিনি ইচ্ছা করেন, ভক্তবৎসলা মা তখন সেইরূপ ধরিয়া ভক্তের নিকট হাজির। ভক্তের নিজের ইচ্ছা উঠিয়া গিয়াছে, মায়ের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। অথবা দুইয়ের ইচ্ছায় মিলন হইয়াছে—মা ও ছেলের সেখানে পৃথক অস্তিত্ব নাই। কখন সখাতে, কখন স্ত্রীতে, কখনও বা ভাই ভগ্নীতে, সেই জগজ্জননীর অনন্ত রূপ দেখিতে দেখিতে, আনন্দময়ীর অনন্ত প্রসারিত বিশ্বক্রোড়ে শয়িত থাকিয়া, ভক্ত হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যান। ভক্তের পদস্পর্শে

পৃথিবী স্বর্গ হয়। প্রেমিকের প্রেমালিঙ্গনে পৃথিবী কৃতার্থ হয়। মায়ের ভক্ত হইতে না পারিলে, মানবের কিছুতেই নিস্তার নাই।

ভালবাসা হইতে আরম্ভ না করিলে কেহই সেইরূপ ভক্ত হইতে পারে না। ক খ হইতে শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। এই সংসার-বিদ্যালয়ে, ভালবাসারূপ মহা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কবে সকল ঘটে একের বিশ্বব্যাপী রূপ দেখিয়া, স্বেচ্ছাকে ডুবাইয়া, সকলে প্রকৃত ভক্ত হইতে পারিবে! কে জানে, কবে!

পেট্রিক্ ক্যাসে (PATRICK CASEY)

বা

দিলিপ সিংহ।

"পেট্রিক ক্যাসে" কে? তাহার জন্যই বা বিলাতে এত হুলস্থূল পড়িয়া গেল কেন? শত শত লোক শত শত মুখে অতশত কথা বলিতেছে কেন? রাজদূত ও গুপ্তচর হইতে পত্রিকার সংবাদদাতারা পর্য্যন্ত পালে পালে ফেরুপালের ন্যায় উক্ত মহাত্মার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে কেন? শাদা কাগজে কাল অক্ষরে নিত্য নিত্য নূতন কথা, নূতন লেখা, নূতন সংবাদ লিখিয়া ও দান করিয়া ইউরোপে এত গণ্ডগোল করিবার আবশ্যক কি? মহারাণী হইতে সামান্য ইংরাজ মহিলা পর্য্যন্ত সকলেই প্রকৃত সংবাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত। ধনী হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত আপামর সাধারণে কুতূহলে পেট্রিক ক্যাসের বিষয়ে নিত্যই পাঠ করিতেছেন। বিলাতে মহাগোলযোগ। ভারতে তাহার কথা মাত্র আসিয়া ভারতবাসীর হৃদয় শোক তাপে দগ্ধীভূত করিতেছে। পরিণামে উক্ত মহাত্মার অদৃষ্টে যে কি নিহিত আছে, তাহা কে বলিতে পারে?

পেট্রিক ক্যাসে কে?-- দিলিপ সিংহ ইংরাজ হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় "পেট্রিক ক্যাসে" নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়া একবার গরীয়সী জন্মভূমি সন্দর্শনে চক্ষু পরিতৃপ্ত করিবেন, ইচ্ছা ছিল; সে ইচ্ছা প্রাণেই রহিল— কার্য্যে পরিণত হইল না। প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। বিলাতে আর ফিরিবেন না, স্থির করিলেন। এডেন হইতে ফ্রান্সে যাইলেন, ফ্রান্সে পেট্রিক ক্যাসে হইলেন, ইংরাজ নির্ব্বাক হইলেন। ভারত আশ্চর্য্যান্বিত হইল;—দিলিপ সিংহ পলাইয়াছেন।

দিলিপ সিংহ পলাইয়াছেন। তিনি আর ইংরেজের অর্থ লইবেন না; ইংরেজের নিকট কোন সাহায্য আর প্রত্যাশা করেন না। তাঁহার হৃদয়ে এক্ষণে অনুতাপের উদ্রেক হইয়াছে। দিলিপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। চির মনোসাধ পুরাইবেন। তাঁহার পিতা দুর্জ্জয় সিংহ-বিক্রম মহাবীর

ছিলেন। তাঁহার পিতা "রণজিৎ সিংহ যথার্থ সিংহের মত ছিলেন, এবং সিংহের মত ইহলীলা পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন।" দিলিপ এরূপ পিতার সন্তান হইয়া কাপুরুষের মত কিরূপে বিলাতে বাস করিবেন? গাত্রে কলঙ্ক লেপিয়া আর কত কাল জীবন যাপন করিবেন? জীবন কতটুকু? তাঁহার পিতা নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জগতের মধ্যে মহৎ লোকের বহুসম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়া বিজয়-কিরীট মস্তকে ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন; শিখ-মন্ত্র-পূত শোণিতে অকলঙ্কিত রাখিয়াছিলেন ও ভারত-ইতিহাস চিরকালের জন্য উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আর দিলিপ সিংহ-তনয় ও রাজ-কুমার হইয়া, বীরোচিত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া ও গুরুমন্ত্র-পূত শোণিত কলঙ্কিত করিয়া, কলঙ্ক-পশরা মাথায় লইয়া শ্বেতাঙ্গিনী অর্দ্ধাঙ্গিনীর সহিত কাল যাপন করিতেছিলেন। একটীর পর আর একটী, এইরূপে অনেকগুলি অসন্তোষের কারণ একত্রীভূত হইল। তাঁহার জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইল। তিনি মাহাপাপে কলুষিত। পাপের প্রায়শ্চিত্তে কৃতসংকল্প ও কলঙ্ক প্রক্ষালনে যত্নবান্ হইলেন। তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন।

মহারাজা দিলিপ সিংহ পেরিস্ হইতে যাত্রাকালীন পথিমধ্যে কতই কষ্ট পাইলেন ও অবশেষে ২২সে মার্চ্চ বর্লিনের সেণ্ট্রাল্ ষ্টেসনে তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি ব্যাগটী চুরী যাইল। ব্যাগের মধ্যে পেট্রিক ক্যাসে অর্থ্যাৎ তাঁহা কল্পিত নামে একখানি দেশ ভ্রমণের জন্য আজ্ঞাপত্র (Pass port) ও ২২০০০ বাইশ সহস্র মুদ্রা ছিল। তিনি এক্ষণে নিঃসম্বল হইলেন। তাঁহার আর অধিক দূর যাইবার উপায় রহিল না। এম্ ক্যাট্‌কফের সহিত পত্রে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিত। এক্ষণে তিনি উপায়-বিহীন হইয়া এম্ ক্যাট কফ্‌কে তাঁহার বিপদের বিষয় তার যোগে জানাইলেন। ক্যাট্‌কফ্ তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন ও প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে আর একটু অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। দিলিপ ক্যাট্‌কফের কথানুসারে আর একটু কায়-ক্লেশে অগ্রসর হইলেন ও রুষ সীমায় আসিবা মাত্রই পুলিসের অনুমতি পত্র পাইলেন। প্রথমে সেণ্টপিটার্স বর্গ ও অতঃপর কিছুদিন মধ্যেই মস্কাউ উপস্থিত হইলেন।

সেণ্ট পিটার্সবর্গে আসিয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই। এখান হইতেও ইংরাজ তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে, কিম্বা এডেনে যেরূপ তাঁহার গতি-রোধ করিয়াছিল, এখানেও সেই রূপ করিতে পারে। তিনি এখানে আয়ার্লণ্ড নিবাসী পেট্রিক্ ক্যাসে। এবার তিনি মস্কাউ যাইবেন, ধার্য্য করিলেন। মস্কাউ রুষের প্রধান রাজধানী। সেখানে যাইলে আর ইংরাজ তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিবে না, স্থির করিলেন। তিনি পুনরায় মস্কাউয়ের জন্য বহির্গত হইলেন।

ইংরাজের নিকট আজ মহারাজা দিলিপ সিংহ পলাতক। দিলিপ আজ রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক; তাঁহাকে ধরিবার জন্য শত শত লোক অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইউরোপের চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল। বিলাতি "টাইমস্" সংবাদদাতাও তাঁহার অনুসরণ

করিল। তাঁহার অনুসরণের ফল শীঘ্রই মস্‌কাউ হইতে উক্ত পত্রিকায় প্রেরিত হইল। পত্রিকা খানি নিম্নলিখিত ভাবে লিখিত;—

"পূর্ব্ব দক্ষিণাঞ্চলে গমন করিব মনন করিয়া আমি মস্কাউয়ের ভিতর দিয়া আসিতেছিলাম। আসিতে আসিতে রাত্রি হইয়া পড়িল। আর বড় অধিক যাইতে পারিলাম না। রাত্রে আর কোথায় যাইব? ডুসো (Dassaux) হোটেলে একটা রাত্রির জন্য রহিলাম। এই হোটেলে ছদ্মবেশ-ধারী মহারাজা ও তাঁহার আইরিস্ সাথী আপাততঃ বাস করিতেছেন। হোটেলে প্রবেশ মাত্রেই একজন বলিষ্ঠকায় শ্মশ্রুধারী শ্যামবর্ণ লোককে সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। আকাশের দিকে উদ্দেশ্যবিহীন নেত্রে অলস ভাবে চাহিয়া আছে; ইংরেজ ভ্রমণকারীর ন্যায় পরিধেয় ও মাথায় একটী বড় রকমের পাগ্‌ড়ী। আমি তাঁহাকে ভারতরাজ বলিয়া চিনিয়া লইলাম। ইনিই ক্যাট্‌ কফ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ৪০০০০ চল্লিশ সহস্র শিখ সৈন্য ভারতসীমান্তে সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু আমি ভুল ঠাওরাইয়া ছিলাম। এ লোকটী—মহারাজা নহেন, তাঁহার একজন এডিকং মাত্র। নাম আরোয়া সিংহ। আর যে আইরিস সাথীর কথা বলিয়াছিলাম,—যিনি আয়ার্লণ্ড নিবাসী পেট্রিক ক্যাসে নামে খ্যাত, তিনিই প্রকৃত মহারাজা। মিছামিছি একটা আইরিস নাম ধরিয়া রুষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এরূপ নাম ধরিবার কারণ, পাছে এডেনের মত এখানেও ইংরেজ তাঁহার গতিরোধ করে। সেণ্টপিটার্স বর্গে যে তিনি ইংরাজ অনুসরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি বোধ করেন না। মস্‌কাউয়ে যখন আসিতে পারিয়াছেন, তখন তাঁহার আর অন্য নাম ধারণের প্রয়োজন করে না। এখানে তিনি স্বাধীন বায়ু সুখে সেবন করিতেছেন, এইরূপ বোধ করেন।

আয়ার্লণ্ড নিবাসী পেট্রিক্ ক্যাসে তখন ফ্রান্সে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত মহারাজের সেখানে বিশেষ আলাপ ছিল। তাঁহার নামে সহজেই আজ্ঞালিপি বাহির হইতে পারে—তাহা সহজেই পাইতে পারেন বলিয়াই বোধ হয়, মহারাজ অন্য নাম গ্রহণ না করিয়া পেট্রিক ক্যাসে বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আমি মহারাজের ওরূপ নাম গ্রহণ করিবার আর কোন বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। এরূপ না করিলে বোধ হয় তিনি ভ্রমণ "আজ্ঞালিপি" (Passport) পাইতেন না। নগদ টাকা ও পাস্‌পোর্ট খানি চুরি যাওয়াতে তাঁহাকে অতিশয় বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহা তাঁহাকে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত দিয়া আসিতেছিল, সেইরূপ অর্থ নিশ্চয়ই কোথাও হইতে তিনি পাইতেছেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার ত এইরূপ বিশ্বাস। *** ***

এম ক্যাট্‌ কফ মহারাজা দিলিপ সিংহের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মস্‌কাউ গেজেট আফিস্ হইতে প্রত্যহই এখানেএকজন ভদ্রলোক আসিয়া থাকেন। রাজা যখন বাহিরে যান,তখন ক্যাট্‌ কফের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বা তাঁহার সহিত

একত্রে ভোজন করিতে যান। বাহির হইবার সময় বহুমূল্য সুন্দর চাক্‌চিক্যময় স্বদেশীয় ভূষণে ভূষিত হইয়া বাহির হন। মহারাজা দিলিপ সিংহের মস্‌কাউ আগমন, রুষ-ভারত-স্বপ্নের সত্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিখ্যাত মস্‌কাউ সম্পাদকের ভাগ্যে এরূপ খ্যাতনামা মিত্র কখন জুটে নাই। শুনিলাম, ক্যাট্‌কফের প্রতিনিধিরা মহারাজকে আমার সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছে। তাহাদিগের এই নিষেধ-বাণী কতদূর কার্য্যকরী হয়, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। আমি আমার নাম (কার্ড) পাঠাইলাম। মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি লিখিতে ব্যস্ত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। শুনিয়াছিলাম, কিছু দিন হইল ব্রিটিস ভাইস কন্‌সাল মস্‌কাউয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। যদি তিনি তাঁহার গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি মহারাজের সাক্ষাৎ পাইবেন না—এইরূপ মহারাজের আজ্ঞা, তিনি শুনিলেন। আমার সহিত যে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন না, তাহাতে আমি অধিক আশ্চর্য্য হই নাই। যাহাই হউক, আমি হোটেল পরিত্যাগ করিবার সময় "এডিকং" আরোয়া সিংহ আমাকে একখানি চিঠি দিয়া গেল, চিঠির মর্ম্ম, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না;—চিঠি খানি মহারাজের নাম সহিত সিল মোহর করা।"

"দিলিপ সিংহ ইংলণ্ডের যে একজন প্রকাশ্য শত্রু হইয়া রুশিয়ায় বাস করিতেছেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি আর এখন তাহার মনোভাব গোপন করেন না এবং এইরূপ জনরব যে, তিনি রুশিয়ার অধীনে থাকিবেন। রুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি শীঘ্রই পৈত্রিক আফগানিস্থান পাইবার জন্য প্রার্থনা করিবেন। আফগানিস্থান তাঁহার। আফগানিস্থান সীমার বিষয়ে তিনি তারযোগে মস্‌কাউ হইতে রুশিয়ায় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। * * * * *

মহারাজা দিলিপ সিংহ "টাইমস্" পত্রিকার সংবাদ দাতার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ভাল করিয়াছেন কিনা, তা তিনিই জানেন। "টাইমস" তাহার সংবাদ দাতার নিকট হইতে যাহা সঞ্চয় করিলেন, তাহা দিলিপের ধ্বংশের জন্য। বিলাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে মহারাজের রুষ যাত্রা বিষয় প্রচারিত হইল। বিলাতে আবার হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

আফগানিস্থানের ও ভারতের সীমা লইয়া রুষের সহিত ইংরাজের এক প্রকার বিবাদ চলিতেছিল বলিলেই হয়; এখনও তাহার কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই। রুষ ইংলণ্ডের শত্রু। মস্কাউ গেজেটের সম্পাদক এম ক্যাট্‌ কফ্‌ ইংরাজের পরম শত্রু। মহারাজ দিলিপ সিংহ সেই পরম শত্রু ক্যাট কফের সহিত মিলিত হইয়াছেন। দিলিপ ইংরাজের ভয় ও ক্ষোভের কারণ হইলেন। তিনি এক্ষণে ইংরাজের পরম শত্রু। বিলাতে এ বিষয় লইয়াও মহাগোলযোগ হইতেছে।

"টাইমস্" সম্পাদক মহা বিদপে পড়িলেন। মহারাজ দিলিপ সিংহের মনস্কামনা সিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া ঈর্ষানলে প্রজ্জলিত হইতে লাগিলেন। ইংরাজ তাঁহার রুষ অব-

স্থান শুনিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছে, দিলিপ যদি জানিতে পারিলেন, তাহা হইলে "টাইমস্" পত্রিকার সৃষ্টি কি জন্য? তিনি আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—তিনি লিখিলেন;—

"মহারাজ নিজ দোষেই মজিলেন। বাৎসরিক চারি লক্ষের অধিক (৪০০০০ পা) মুদ্রায় তিনি তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। রুষেরা কিছু তাঁহাকে এত টাকা দিবে না। তিনি রুষের নিকট হইতে যৎসামান্যই পাইবেন। যাহা পাইবেন, তাহা তাহাদিগের স্বার্থের জন্য, তাহার ইংলণ্ডের আয় তাঁহার নিজস্ব বলিলেই চলিত, তিনি যাহাতে ইচ্ছা তাহা খরচ করিতে পারিতেন, তাহার জন্য তাঁহাকে কোনরূপ প্রত্যুপকার করিতে হইত না। তিনি সৌজন্যতার অভাব বলিয়া ইংরাজ সমাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারেন না। স্বয়ং ইংরাজ যে সকল সত্ত্বের অধিকারী, তাঁহাকেও সাদরে সেই সকল সত্ব দান করা হইয়াছিল, অপিচ তাঁহার পূর্ব্ব দুঃখে দুঃখিত হইয়া আরো কিছু অধিক দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সাধ করিয়া রুষ-লিসে (কুকুরের গলার বগ্‌লেস্) মাথা গলাইলেন। এখন তাঁহাকে রুষের কথায় উঠিতে বসিতে হইবে—আপন ইচ্ছায় কার্য্য করিতে পারিবেন না *। রুষ যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও তত্ত্বাবধারক হইয়া কর্ত্তব্য-কার্য্য রূপ বোঝা লইবেন, তাহাই আশ্চর্য্য। এম ক্যাট্‌কফের অবস্থা কিরূপ তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। রুষ ও গ্রেট বৃটনের যাহাতে পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষ ভাবের উদ্রেক হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্যই তাঁহার ও তাঁহার পত্রিকার সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার মত, দুটী রাজ্য কখন সদ্ভাবে থাকিয়া পরস্পর মঙ্গল কামনা করিতে পারে না। অন্ততঃ তাঁহার স্বদেশবাসীর হৃদয়ে এইরূপ ভাবের উদ্রেক হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রিটিশের সহিত শত্রুতা সংসাধন পক্ষে দিলিপ কিছুই নহে, তাহা তিনি নিজে বেশ জানেন; কিন্তু দেশের লোকের মনে দিলিপের সম্মিলনে রুষ আশা-লতা মুকুলিত হইতে পারে, এইরূপ ভাবের উদ্রেক হইতে পারে।

এম্ ক্যাট্‌কফের ইচ্ছা নয় যে, রুষেরা কেবল আপন কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিবে ও তাহাদিগের আপন দেশের জন্যই কেবল চিন্তা করিবে। তাঁহার অভিলাষ যে, পূর্ব্বদিকে ও দক্ষিণ দিকে তাঁহার আদেশ মত কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিতে থাকিবে এবং তিনিও ইত্যবসরে সন্তোষ পূর্ব্বক যাহাতে মিটিয়া যায়, এরূপ পরামর্শের প্রতিবন্ধক স্বরূপ থাকিবেন। অন্য উৎকৃষ্ট যষ্টির ন্যায়, মহারাজও, ক্যাট্‌কফের কুকুর প্রহারের উৎকৃষ্ট যষ্টি। ক্যাট্‌কফের যষ্টি স্বরূপ হইয়া যদি মহারাজের কিঞ্চিৎ আমোদ হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। এরূপ কার্য্যে রুষ গবর্ণমেণ্ট যে যোগদান করিয়াছেন, তাহা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে ও আমরা ইহার জন্য যে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এখন আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই, সেদিন ফুরাইয়া

* "He has preferred to put his neck in a lease, to be held back or let go as may suit the inclination and convenience of his new hosts, not his own."

The Times—June 20,1887.

গিয়াছে। মহারাজ প্রকৃত নামে বা পেট্রিক ক্যাসের নাম ধারণ পূর্ব্বক রুষে বাস করিলেও সন্ধি কিম্বা সমগ্র জাতির সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ হইবে না সত্য বটে, কিন্তু 'জারের' মন্ত্রী সম্ভবপর গোলযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য ক্যাট্‌কফের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। রাজমন্ত্রীরা রুষ রাজের আতিথ্য গ্রহণের জন্য মহারাজকে অনুরোধ করিতেন ও তাঁহাকে একখানি বড় কাগজের 'হুজুগ্' হইতে দিতেন না। মুদ্রাযন্ত্রের উপর রুষ শাসনের সম্প্রতি পরিবর্ত্তন হইয়াছে;—সমস্ত পত্রিকার না হউক্, অন্ততঃ সর্ব্বসাধারণের মুখ পত্র স্বরূপ এক খানি পত্রিকার। এম্ ক্যাট্‌কফ যেরূপ স্বাধীনতা পাইয়াছেন, এম্ জিয়ার্সের পূর্ব্ববর্ত্তীরা কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি ইহার কারণ নহে। কিন্তু যথেচ্ছাচারী রাজা এরূপ ভাবে মুদ্রাযন্ত্র শাসন করেন যে, মন্ত্রীরা তাঁহাদিগের ক্ষমতার সীমা কতদূর, তাহা সহজেই যেন জানিতে পারেন। মহারাজের রুষ আগমন, রুষ 'ফরেন অফিসের' সভ্যবৃন্দের যে বিরক্তির কারণ,তাহা নিঃসন্দেহ। তাহাদিগের বিষয় ভাবিলে কিছু আর বলিতে ইচ্ছা করেনা বরং দুঃখ হয়। ক্যাট্‌কফ্ দিলিপ্ আগমনে লোকের মনে 'ভারত-আশালতা মুকুলিত প্রায়' এরূপ একটা বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিশ্বাস তাঁহাদিগের মন হইতে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। তাহারা ক্যাট্‌কফের ন্যায় শীঘ্রই জানিতে পারিবে যে, দিলিপ তাহাদিগের ঘাড়ের বোঝা মাত্র, আর কিছুই নহে। তখন ক্যাট্‌কফ্ আর একটা খেলনা লইয়া লোক ভুলাইতে চেষ্টা করিবে। তখন নির্ব্বোধ দিলিপও বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা দুইজনে পরস্পরের ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। দিলিপের রাজ্য পুনরুদ্ধারের, তাঁহার কষ্ট ও তাঁহার দেশ ভ্রমণের বিষয়ে, গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইবার জন্য যতই কিছু যে যাহা বলুক্ না, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অটুট ও অক্ষুব্ধ হৃদয়ে, 'হাঁ—না' কিছুই বলিবেন না।"—

"টাইমস্" ২০ সে জুন ১৮৮৭।

ঈশান কোণে একখণ্ড মেঘ উঠিয়াছে। ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময়, আরোহি-পরিপূর্ণ একখানি তরণী বাঙ্গালার স্বচ্ছ সরোবরে তরতর ভাবে বহিয়া যাইতেছে। মেঘখানি ঘোরতর হইতে ঘোরতম হইয়া আসিতে লাগিল। আরোহি-গণ তাহা দেখিল;—তাহারা কি আর স্থির থাকিতে পারে? মাঝি বলিতেছে ভয় নাই; তাহা শুনিয়া আরোহীরা কি আর স্থির থাকিতে পারে? এরূপ অবস্থায়, মাঝির এ প্রবোধ বাক্য কি আরোহীরা বিশ্বাস করিতে পারে? "টাইমস"সম্পাদক বলিতেছেন, ভয় নাই—দিলিপের দ্বারা আমাদিগের কি হানি হইতে পারে? ভারতবাসী ত বিশ্বাস করিতে পারে না;—ইংরাজ কি বিশ্বাস করিতে পারে? ঐ যে কে একজন ইংরাজী সম্পাদক * এক পার্শ্বদেশ হইতে সভয়ে কি বলিতেছেন। "রাজনীতি-নিপুণ মহাত্মাদিগের অল্পদূরদর্শিতা ও তাহাদের রাজনীতি দর্শন করিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি; দিলিপ যাহাই হউক্ না কেন—দিলিপ যাহাই কিছু অযথা চাহুক্ না কেন—

তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে আমাদিগের ক্ষতি কি? আমাদের অগণ্য শত্রু মধ্যে আর একটী শত্রু বাড়াইবার প্রয়োজন কি? যতই শত্রু কম থাকিবে, ততই ত ভাল * * * * দিলিপ সিংহ ত অনেক বৎসর পরেও একটী প্রাণ সংহারক কণ্টক হইতে পারিবেন, তাহা ত আশ্চর্য্যের কথা নহে। তাহার ঐশ্বর্য্য যে আমাদিগের একটী ভয়ানক শত্রুতা সংসাধনে নিয়োজিত হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি?" ক্রমশঃ——

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।

আদর্শনীতি এবং প্রকৃত জীবন।

নিজ নিজ আদর্শের অনুযায়ী জীবন না হইলে মনুষ্য কখন সুখী হইতে পারেনা। যাহাদের স্থির নির্দ্দিষ্ট পরিষ্কার কোন আদর্শ নাই, বায়ু-নিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায় যথেচ্ছা ভ্রমণ করে, ইচ্ছামত জীবন অতিবাহিত করাই যাহাদের অভ্যাস, তাহারা সদানন্দ। প্রবৃত্তিই তাহাদের গুরু এবং প্রবৃত্তি চরিতার্থই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা উন্নত আদর্শে অনুরূপ জীবন অতিবাহিত করেন, বিশুদ্ধ সত্যের পথে যাঁহাদের স্বাভাবিক গতি, তাঁহারাও সদানন্দ। কেন না, নৈতিক আদর্শের স্থূল এবং মূল সত্য সকল তাঁহাদের জীবনে পরিণত হইয়া গিয়াছে, মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব, আদর্শ এবং জীবন সমসূত্রপাতে চলিতেছে; ঊর্দ্ধদিকে যাইবার জন্য সংগ্রামের নিবৃত্তি হয় নাই, কিন্তু অধঃপতনের আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ পবিত্র জীবন যে সাধারণের অনুকরণীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে আবার ইহার বিপরীত সামঞ্জস্যও দৃষ্টিগোচর হয়। আদর্শ খর্ব্ব হইয়া জীবন স্রোতের সমতলে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং সেখানে কোন সংগ্রাম নাই, মন বদ্ধ জলের ন্যায় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আদর্শের সঙ্গে প্রকৃত জীবনের যে গভীর প্রভেদ, সম্পূর্ণ রূপে তাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না। কারণ, আদর্শ চিরকালই জীবনের উপরি ভাগে অবস্থিতি করে, সে চির উন্নতিশীল হইয়া অনন্তের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ আকার ধারণ করিতে চায়। আপনার বুদ্ধি বিদ্যা এবং ভাব ভক্তি ও ধারণা অনুসারে মনুষ্য যে পরিমাণে পূর্ণ পুরুষের নিকটবর্ত্তী হয়, সেই পরিমাণে তাহার জীবনাদর্শ উচ্চ হইতে থাকে। এইরূপে সোপানের উপর সোপানে উঠিয়া অন্তে সেই আদর্শ মহাস্বর্গে মিলাইয়া যায়। তখন জীব দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধপূর্ণ, অধঃপূর্ণ, মধ্যপূর্ণ, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ এক মহা সত্তায় বিলীন হয়। প্রকৃত জীবনের অবস্থানুসারেই আদর্শ ক্রমে উচ্চ হয়, কিন্তু তথাপি জীবন বহু পরিমাণে দেশ কাল অবস্থার দাস, প্রাচীন অভ্যাসের বশীভূত, সুতরাং তাহার দৈনিক কার্য্যকলাপ সকল সময় আদর্শানুযায়ী হয় না। অপূর্ণতর ত্রুটি ত থাকিবেই, তদ্ব্যতীত দোষ অপরাধ জন্য জীবন অনেক সময় পিছাইয়াও পড়ে। যাহারা এজন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম

করিতেছে, তাহারাই জীবিত মনুষ্য এবং তাহারাই পাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া অপরকে পুণ্যানুষ্ঠানে উপদেশ দিবার অধিকারী। কপটের মুখ হইতে বাক্যস্রোত সহজে থামিতে চায় না, কিন্তু সময়ে সময়ে চরিত্র আসিয়া তাহাকেও বাধা দেয়।

প্রকৃত জীবন আদর্শ নীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া চলিতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রত্যেক মনুষ্যই কোন না কোন বিষয়ে অল্পাধিক দুর্ব্বল। কিন্তু তাহা বলিয়া কি অধিকার-ভেদ নাই? অবশ্যই আছে। উচ্চাধিকারী ব্যক্তি দুর্ব্বলাধিকারীকে ভাল হইবার জন্য উপদেশ দিবে, পাপের সম্ভবনীয়তা তাহাতে থাকিলেও সে পাপাচারীর পাঠানুষ্ঠান সকলের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবে। এক সময় যে ব্যক্তি পাপী ব্যভিচারী ধর্ম্মহীন ছিল, পরে সাধন দ্বারা সচ্চরিত্র সাধু হইয়াছে, সে যে নীতিভ্রষ্ট পাপান্ধ ব্যক্তিদিগকে দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা সংশোধিত করিবে, ইহা তাহার পক্ষে অধিকার চর্চ্চা নহে। পৃথিবীতে গুরু শিষ্য, শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে এই রূপেই কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। যে শিষ্য হয়, সেই গুরু হইতে পারে; যে উপদিষ্ট হয়, তাহারই উপদেশ দিবার অধিকার আছে। নিজের পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ করত বিনয়ের অনুরোধে যে আদর্শ সত্য প্রচারে কুণ্ঠিত হয়, সে বিশ্বাসের অবমাননা করিয়া কালক্রমে নিরাশ হইয়া পড়ে। আদর্শ বিশুদ্ধ এবং উন্নত থাকিলে, অর্থাৎ বিশ্বাসের ভূমি অবিকৃত থাকিলে, মনুষ্যের উদ্ধারের উপায় হয়। এমন লোকও আছে, যাহারা বড় বড় উচ্চ কথা বলে, কিন্তু জীবন তাহার ঠিক বিপরীত; উভয়ের প্রভেদ দূর করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টাও নাই; কেবল বাজার সম্ভ্রম, ব্যবসায়ের পসার রাখিবার জন্য চির অভ্যস্থ শাস্ত্রীয় বচন প্রচার করিয়া বেড়ায়। সেরূপ আদার্থ লোক কেবল আপনার এবং সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ কৃপাপাত্র। কিন্তু যাহারা আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে; তাহাদের দুইটা কথা বলিবার অধিকার আছে।

এক্ষণে বক্তব্য এই, উন্নত বিশুদ্ধ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া নানা শ্রেণীর বিচিত্র প্রকৃতির লোকদিগের সঙ্গে কিরূপে মিশিয়া থাকা যায়! এক জনের বক্তৃতার জ্বালায় লোকে অস্থির, অথচ সে কপটের শিরোমণি, অতিশয় ভণ্ড; কিন্তু তাহাকে ধরা ছোঁয়ার কোন উপায় নাই; এরূপ স্থলে বক্তৃতা-বান সহ্য করিবে কিরূপে? একজন আপনার দুর্ব্বলতার জন্য অধর্ম্ম করিতেছে, অথচ তাহা সমর্থনের জন্য কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইবে না। কেহ দুষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে দুর্নীতি মিথ্যা পোষণ করিয়া জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে। যে দোষ সে নিজে সহস্রবার করে, অন্যকে তাহার জন্য মন্দ বলে। এই সকল লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা বড়ই কঠিন। ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা রাখা যায় না। কেবল যদি তুমি তোমার আদর্শ দর্শন কর, তাহা হইলে মনুষ্য প্রকৃতির উপর একবারে তোমার অবিশ্বাস জন্মিয়া যাইবে, কাহার সহিত আর সংশ্রব রাখিতে পারিবে না। আবার যদি কেবল প্রকৃত জীবন দর্শন কর, আদর্শের পানে ফিরিয়া না চাও, তবে

নীতিহীন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। পৃথিবীর সাধারণ নরনারীর পাপ দেখিয়া যদি চটিয়া যাও, তাহা হইলে এখানে আর তোমার থাকাই হয় না। অন্য দিকে আবার যদি মহা উদার পরম সহিষ্ণু হও, তাহাতে আপনি শুদ্ধ শেষ নরকে ডুবিয়া মরিবে! আপনাকেও নির্লিপ্ত পবিত্র রাখিতে হইবে,অথচ সকল প্রকার লোকের সহিত গতিবিধি রাখা চাই। নতুবা ভগবানের সেবা, জনসাধারণের উপকার তোমা হইতে হইল না। সুবিজ্ঞ শিক্ষক যদি চঞ্চলমতি অবোধ বালকদিগের চাঞ্চল্য দর্শনে বিরক্ত হন, তাহা হইলে কি আর কেহ লেখা পড়া শিখিতে পারে? মনুষ্যের ভাবী মহত্ত্বের প্রতি চাহিয়া তাঁহাকে ধৈর্য্য সহকারে সকলই সহ্য করিতে হইবে। ছাত্রদিগকে কখন নিন্দা, তিরস্কার, তাড়না; কখন প্রশংসা গৌরব সুখ্যাতি; পর্য্যায়-ক্রমে এই দ্বিবিধ পথ অবলম্বন করিতে হয়; তদ্ভিন্ন কেহ মানুষ হইতে পারে না। ফলতঃ আদর্শের দিকে দৃষ্টি না থাকিলে, এক দিনও চলেনা। মানবের পশুত্বের আবরণের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে, এবং তাহার ভিতরে দেবত্ব আছে, শিক্ষকগণ সদ্দৃষ্টান্ত এবং সৎশিক্ষা দ্বারা তাহার বিকাশ সাধনের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছেন; রাতারাতি একদিনে আর সে কার্য্য ত হয় না; কাজেই অনন্ত সহিষ্ণুতা চাই। মানব প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট নিয়তির পানে চাহিয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। দুই পাঁচ জন ব্যক্তি উচ্চ জীবনাদর্শ দেখিতে পায়, দেখিয়া আপনাদের জীবনকে তদনুরূপ সংগঠন করে, অবশেষে জন সাধারণ তাহাদের পথে চলে; এইরূপে চিরকাল জন সমাজে নীতি ধর্ম্ম রক্ষা পাইতেছে। লোকের পাপ দুর্ব্বৃত্ততা দর্শনে যতই কেন ক্রোধের উদয় হউক না, নিরাশ হওয়া উচিত নহে; আবার প্রকৃতি যতই কেন অপরিপক্ক দুর্ব্বল হউক না, আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেই হইবে। মানব সমাজের নেতা সংস্কর্ত্তাদিগের এই উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সাধারণ জীবন-স্রোতে তিনি ভাসিয়া যাইতেও পারেন না, অধর্ম্ম পাপপ্রবাহের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে উহার গতি রোধ করিতেই হইবে; পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ-রেখা সকলকে দেখাইয়া দিতেই হইবে। অথচ পবিত্রচরিত্র যিশু যেমন অধম চণ্ডাল, অস্পৃশ্য ব্যভিচারী নরনারীর সঙ্গে মিশিয়া পথে পথে গ্রামে গ্রামে ফিরিতেন, তেমনি স্নেহ-পরবশ হইয়া প্রত্যেকের অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য ভিন্ন কেহ এ পৃথিবীতে কার্য্য করিতে পারে না। ইহার অভাবে, হয়, তাহাকে সংসার ছাড়িয়া অহঙ্কারী, বিরক্তচিত্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে হইবে; না হয়, একবারে সাধারণের সঙ্গে মিশিয়া আত্মহারা হইতে হইবে। লোক-হিতৈষী মহাজনদিগের জীবনে একদিকে অগাধ দয়া সহিষ্ণুতা, অপর দিকে অক্ষুণ্ণ পুণ্যানুরাগ সমান ভাবে স্থিতি করে। স্বয়ং ভগবান্ এই ভাবে নিত্যকাল জীব রাজ্য শাসন করিতেছেন, সাধু ভক্তেরা এ বিষয়ে তাঁহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

জীবন প্রবাহ।

কোথা হতে আসিলাম! কোথা ভাসি চলিলাম!
কোথা পুনঃ হবে অবসান!
লুপ্ত জ্ঞান, রুদ্ধ দ্বার, চারিদিকে অন্ধকার,
পরকাল কে জানে কেমন!
যার পানে ফিরে চাই, এই আছে এই নাই,
সুধু স্মৃতি, আশার ঝঙ্কার,
বুঝিনা কিসের খেলা, আঁধারে দেখায় আলা,
নিত্যানিত্য একই আকার!
প্রভাতে তপন উঠে, কাননে কুসুম ফুটে,
ছুটে পাখী ক্ষুধার হুতাসে,
শীতল প্রভাত-বায়, স্বপন আবেশ প্রায়,
জাগে নর কর্ম্ম সূত্র পাশে।
অন্ধদৃষ্টি বাসনায়, ক্ষুণ্ণচিত্ত লালসায়,
ভ্রান্ত সুখে নীরস জীবন,
কৃত্রিম ভবের নীতি, ঝেপেছে স্বরূপ-জ্যোতি
প্রহেলিকাময় ত্রিভুবন।
চাহি পর সুখপানে সুখতৃষা জাগে মনে,
ভ্রমে সদা মোহের বিকারে;
মিলেনা কপালে যার, সব তার অন্ধকার,
লুপ্ত শান্তি তাইরে সংসারে।
নরের রসনা সনে, ধায় চিত্ত সযতনে
গড়িবারে যশের মন্দির,
ঘৃণা নিন্দা প্রশংসায়, আপনা ভুলিয়া যায়
জনস্রোতে মিশায় শরীর।
কে জানে ভবের গতি, কোথা স্থিতি, পরিণতি;
পলে পলে হয় রূপান্তর,
কে দিবে বলিয়া মোরে, জনম কিসের তরে,
শ্রান্ত মন হয়েছে কাতর।

শ্রীরেবতী মোহন রায় মৌলিক।

কুন্দকলি।

১

নিভেছে প্রভাত তারা,
পূরবে উষার হাসি
প্রভাতের সাড়া পেয়ে
অমনি এসেছে ধেয়ে
রবির কিরণ নিয়ে
ছড়ায়েছে রাশি রাশি।
ফুটায়ে সেফালি ফুলে
জাগায়ে ভ্রমরা কুলে
নিকুঞ্জে বাজায়ে বাঁশী
হেসে হেসে গেছে মিশি।
এখনো ছায়াটী তার
আধ আধ হেসে হেসে
এগিয়ে পেছিয়ে যায়
সুমুখে বেড়ায় ভেসে।

২

প্রভাতের এই পলকের মাঝে
কি বিপ্লবে ঘটিয়াছে কে বুঝিবে তার?
প্লাবনে প্লাবিয়া গেছে হৃদয় আমার।
ওঠ সখি ওঠ ওঠ একি হীনবেশ,
নয়নে সহেনা কুন্দ! তোমার এলানো কেশ!
সোণার-প্রতিমা খানি জীবন আমার,
মুখে কেন পড়েছে কালিমা,
ছিন্ন বৃন্ত কেনলো সুষমা!

৩

প্রকৃতি গো! সাক্ষী প্রকৃতি তোর,
অকালে কেনলো তুই
অস্ফুটিতা কুন্দকলি
ফুলের সমাধি দিয়ে
চিরতরে ঢেকে দিলি।

আমি কবি দীন হীন,
বিজনে আঁধারে বসি,
ফুলেরে শুনাই গান,
নিশি দিন, দিবানিশি।
তাও যদি নিবিরে কাড়িয়ে,
ফুল গুলি পড়িবে ঝরিয়ে,
কাহারে শুনা'ব গান,
কে আমার ভাঙাতান
শুনিবেগো আকুল পরাণ নিয়ে ?

৪

দেবতাগো! এই বুঝি এই মোর শেষগান,
ভেঙ্গেছে গানের সুর নিভে গেছে তান।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়।

সে মুখ খানি।

চাচর এলান কেশ
চারিধারে পড়েছে লতিয়া,
উড়িয়া মৃদুল বায়
কভু ঢাকে, কভু দেয় খুলিয়া॥
মেঘ যেন করে খেলা
শরতের শশী ল'য়ে ;
পাতা যেন ফাঁক হয়
কুসুমের রাশি বয়ে।
ফুটি ফুটি করি হাসি
আর যেন ফোটেনা।
ঝরি ঝরি করি আঁখি
আর যেন ঝরে না।
পাথরের ছবি খানি
নড়েনাকো টলে না।
শান্তি মাখা সুধাভরা
হেন আর দেখি না!

শ্রীবিষ্ণু চরণ চট্টোপাধ্যায়।

মরীচিকা।

জল ব'লে মরীচিকা পান কেন করি,
ছায়া ব'লে অবসাদে জুড়াইতে যাই,
শান্তি বলি রোগের চরণ কেন ধরি,
হায় হায় সুখ দুখ বোধ কেন নাই ?
সুখ বলে কারে তাহা নাহি বুঝিলাম,
আকাশ কুসুম খুঁজে কাটালাম দিন ;
ক্ষীণ কণ্ঠে মৃত্যু কাছে প্রাণ যাচিলাম,
অনন্তের প্রাণ হ'ল ক্ষুদ্রত্বে বিলীন!
চির আলোময় সখা আঁধার কুটীরে
একবার এসে দাও তোমার দর্শন,
স্নেহ দিয়ে তোমায় রাখিব সদা ঘিরে,
তুমি এলে হবে মন নন্দন কানন।
আপনি আপন কাছে হয়েছি দুর্ব্বল,
কুকার্য্যে মাতঙ্গ শক্তি সুকাজে অচল।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। (দ্বিতীয়)

উৎসবে।

লোকে বলে সবারি হাসির দিন এল;
আমরাই ত হাসা হল না,
জগতের ভেদাভেদ সবি ঘুচে গেল,
দুখ মোর তবু গেল না।

যতবার হাসিতে মিলাতে যাই হাসি,
চোখে শুধু লেখা শোকচিন্
সুখে দুখে আমোদে ত বিভোর সবাই,
আমারি কেন বা ভাব ভিন্।

সযতনে হৃদয়ে শিখাই কতবার,
প্রাণভোরে হাসিতে বারেক,
হায় হায় বদনদর্পণে ফুটে তবু,
হৃদয়ের বেদনা যতেক।

প্রাণভোরে যতবার চাই হাসিবারে
তত বার চোখে আসে জল,
একি মায়া! বারিসিক্ত কমলের মত
কেবলই করে ছল ছল।

একটু আঘাত যদি পায়,
জলকণা ভূমে পড়ে যায়!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা। (৫ম)

ধর্ম্ম

বেদ পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্র এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবিম্বিতাবস্থার বিস্তারিত রূপে না হউক সংক্ষেপতঃ সারাংশ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়াছি। অধিকন্তু এই প্রাচীন ভিত্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ মত ও ভাবের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে এবং সেই সকল বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যতা পরিপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেও যে সকলের একটী সাধারণ ভূমি আছে,—যে ভূমির উপরে সকলের বিশেষত্ব একত্বের বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, যে ভূমির উপরে পুরাণকার তন্ত্রকার প্রভৃতি সকল শাস্ত্রকার ঋষিবৃন্দের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, যে ভূমির উপরে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া আপন আপন বিবাদবাদ ও বিদ্বেষকোলাহল অবসিত ও মীমাংসিত করিয়া অবশেষে এক মহা সামঞ্জস্য ও শান্তির বিজয় পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া মহোল্লাসে একমেবাদ্বিতীয়ং এর নাম ঘন ঘন উচ্চারণ করিতেছে, আমরা একে একে সে সকলের সাধ্যমত সমুজ্জ্বল চিত্র পাঠকগণের নয়নগোচর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের পরিস্ফুট ও প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা সেই সকলের সম্মিলন ক্ষেত্রেই একরূপ মীমাংসিত ও নির্দ্দেশিত হইয়া গিয়াছে। তবে যাঁহারা সত্যপ্রিয়তা এবং সত্যাবধারণলিপ্সাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া অসার কল্পনাকোলাহলে চিত্তকে বিনিবিষ্ট রাখিয়া বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রনিবহের সেই পরিস্ফুট ও গম্ভীর সমন্বয়-ধ্বনির প্রতি বধির হইয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রকৃত ও গূঢ় তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া অযথা ও বিকৃত ব্যাখ্যাবলীর দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের নিত্য নূতন বিভিন্নরূপ প্রদর্শন বা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাঁহাদিগেরই দুই একটী কথার অলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নানা প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কূটার্থ-বোধক ব্যাখ্যাজাল বিস্তার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাণ হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা অথবা অবতারবাদের আবরণে প্রচ্ছন্ন করিয়া লোকলোচন সমক্ষে উপস্থিত করা, আর সত্যকে সম্পূর্ণরূপে অপলাপ করা উভয়েই সমান ব্যাপার। একান্ত এবং জাগ্রত ইচ্ছা না থাকিলে খনক যেমন খনির তমিস্রাপূর্ণ সুদূর গর্ভে অবতরণ পূর্ব্বক রাশি রাশি মৃৎ-প্রস্তর ভেদ করিয়া তন্মধ্য হইতে

মহামূল্য সমুজ্জল রত্নমালা আহরণ করিতে সমর্থ হয় না, অবিমিশ্র সত্যের নিমিত্তও সেইরূপ যথার্থ ও গভীর লালসার সঞ্চার না হইলে মানবচিত্ত কখনও অসত্যের মধ্য হইতে সত্যনিশ্চয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সত্যনিরূপণে শিথিলযত্ন অমার্জ্জিতবুদ্ধি তরলচিত্ত ব্যক্তিদিগেরই নিকট অনেক সময় অসত্য সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু মার্জ্জিতমনা লোকদিগের নিকট অক্লেশে সত্য হইতে অসত্যের ব্যবধান ও পার্থক্য নিরূপিত হইয়া পড়ে।

এক্ষণে আমাদিগের প্রথম বিচার্য্য বিষয় এই যে, পৌত্তলিকতা হিন্দুধর্ম্ম কি না? যদিও নানাশ্রেণীর লোকে বিশেষতঃ কুতার্কিকেরা ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা দ্বারা পৌত্তলিকতার বহুবিধ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইলেও কাষ্ঠ প্রস্তরাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকা বা কোন জড় মূর্ত্তিকে ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনাই পৌত্তলিকতা শব্দের সরল ও প্রকৃতার্থ। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পৌত্তলিকতা শব্দের এক প্রকার ইদানিন্তনকাল-প্রচলিত অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থ শুনিতে পাই। তাঁহারা পৌত্তলিকতাকে অরূপ অমূর্ত্ত পরব্রহ্মের উপাসনা বলিয়া অক্লেশে জনসাধারণসমক্ষে প্রচার করিয়া থাকেন। পুত্তলিকারাধনা তাঁহাদিগের নিকট সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদিগের শব্দাভিধানে পৌত্তলিকতা শব্দ বুঝি নিরাকার অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরাধনার নামান্তরমাত্র। তাঁহারা পুত্তলিকা বা অন্য কোন উপাস্য জড় মূর্ত্তিকে অনন্ত ব্রহ্মোপাসনার আশ্রয় বা অবলম্বনরূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা পুত্তলিকারূপ সান্ত পরিমিত ভেলক দ্বারা অপার অনধিগম্য ব্রহ্মের তলস্পর্শনে অবতরণ করেন। সুতরাং পৌত্তলিকতা তাহাদিগের নিকট পৌত্ত-নয়;—কিন্তু চিন্ময় ব্রহ্মধ্যানের নামান্তর মাত্র, তাঁহারা সাকারবাদী হইয়াও সাকারবাদী নন,—কারণ তাঁহাদিগের সাকারবাদ সাকারোপাসনাতেই পর্য্যবসিত নয়,—কিন্তু সাকারে নিরাকার। এরূপ ব্যাখ্যাতাদিগের কূট ব্যাখা দ্বারা কেবল যে লোকচিত্ত ভ্রান্তিপথে নীয়মান হয়, তা নয়, কিন্তু এতদ্দারা পৌত্তলিকপদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হিন্দুধর্ম্ম এক প্রকার কল্পনাপ্রসূত অমূলক আকারে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিকৃত ব্যাখ্যাতে কর্ণপাত না করাই হিন্দু সাধারণের গৌরব ও মহত্ত্বের পরিচয় বলিতে হইবে।

ধাতু প্রস্তরাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকাকে যে পুত্তলিকা জ্ঞানে অথবা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বনজ্ঞানে পূজা করা হয় না, প্রত্যুত তাহাকে পরাৎপর ঈশ্বরবোধে পূজা করাই যে পৌত্তলিকতার একমাত্র স্থির তাৎপর্য্য, তাহার প্রধান প্রমাণ সাকারবাদীদিগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক্রিয়া। মৃত্তিকা প্রস্তর বা কাষ্ঠ বা অন্য কোন জড় পদার্থে একটী মূর্ত্তি গঠিত হইল, তৎপরে তাহার যাহা কিছু অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদন বা বেশবিন্যাস করিতে হয়, তাহা সম্পন্ন হইল। তখন তাহা একটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পূর্ণমূর্ত্তি ধারণ করিল বটে; কিন্তু তাহা

দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল না। তখন ও সে মূর্ত্তিকে ব্রাহ্মণেতর শূদ্র প্রভৃতি জাতিরা অনায়াসে স্পর্শ করিতে পারে; তখনও সে দেবতা নয়, সে জড়,—মৃৎপ্রস্তরের সমাবেশ মাত্র। কিন্তু তৎপরে যখন পুরোহিত আসিয়া "ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সেই জড় প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন তাহা দেবত্বে বা ঈশ্বরত্বে পরিণত হইল। এতদ্দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, জড়মূর্ত্তির দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক্রিয়ার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। পুত্তলিকাকে পুত্তলিকাজ্ঞানে পূজা করাই যদি পৌত্তলিকতার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার দেবত্ব স্থাপনের জন্য আবার চেষ্টা কেন? কিম্বা যদি তাহা কেবল অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বরের আরাধনার অবলম্বনস্বরূপ হয়, তবে তাহাতে ঈশ্বরত্বের আরোপ না করিলেত অনায়াসে চলিতে পারে। ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবার জন্য বিধিবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা একবার যাহাকে ঈশ্বরত্বে বরণ করিতেছ, তাহাকেই পুনরায় ঈশ্বর না বলিয়া ঈশ্বরোপাসনার অবলম্বন স্বরূপ বলাতে কি আত্ম-প্রতিবাদ এবং যুক্তিবিপর্য্যয়ের পরিচয় দান করা হয় না?

তৎপরে সাকারোপাসনার নিকৃষ্টতা প্রদর্শন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকার ঋষিগণ যে বচনাবলী প্রকটিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অল্প বুদ্ধি মানবেরাই জড় পদার্থাদিকে ঈশ্বর জ্ঞানে ভজনা করিয়া থাকে! যথা—

অপ্সু দেবামনুষ্যাণাং দিবি দেবামনীষিণাং
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা।

শাতাতপ।

অর্থাৎ জলেতে ঈশ্বরজ্ঞান ইতর মনুষ্যদিগের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর জ্ঞানজ্ঞানীরা করেন, কাষ্ঠ লোষ্ট্র দিতে, ঈশ্বরজ্ঞান মূর্খেরা করে এবং পরমাত্মাতে ঈশ্বরজ্ঞান পণ্ডিতেরা করেন।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপানি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তনামল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণ।

অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত এইরূপ গুণানুসারে ব্রহ্মের নানা রূপ কল্পিত হইয়াছে। এইরূপ বহুতর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, স্থূলবুদ্ধি ধারণাবিহীন লোকেরা ভৌতিক পদার্থ বিনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে ব্রহ্মসত্বা কল্পনা করিয়া তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। এখন যে দিক দিয়া এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেই দিক দিয়াই এই একমাত্র সিদ্ধান্তক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয় যে, পৌত্তলিকতা পুত্তলিকাকে ঈশ্বর বোধে আরাধনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মারাধনাকে সারধর্ম্ম এবং মুক্তিরূপ পরমপদের অনন্যসোপানস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, সে ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত করা অপেক্ষা আর গুরুতর অপবাদ কি আছে? এ স্থলে কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, তবে পৌত্তলিকতার উৎপত্তি হইল কিরূপে? পূর্ব্বোদ্ধৃত দুই শ্লোক এবং এই বিষয় সংক্রান্ত অন্যান্য শ্লোক সকল পাঠ করিলে পৌত্তলিকতার আবশ্যকতা কি, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়। নিরাকার অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন ধারণে অসমর্থ স্থূলবুদ্ধি লোকদিগের নিমি

স্তই যে জড়মূর্ত্তিকে ঈশ্বরভাবে পূজার বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহাত্মা শাক্যসিংহের প্রচারিত মহামন্ত্রের প্রবল প্রতাপে পরাহত ও নির্জ্জিত ব্রাহ্মণকুল একান্ত জিগীষাপরবশ হইয়া যখন বৌদ্ধধর্ম্মকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য চিন্তার পর চিন্তা এবং কৌশলের পর কৌশল উদ্ভাবন করিতেছিল, যখন শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিলের সুতীক্ষ্ণ যুদ্ধাস্ত্রে ভারত-ভূমির উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত সুদূর-পরিব্যাপ্ত বৌদ্ধরাজ্য ক্রমে ক্রমে পরাজিত ও অধিকৃত হইতে লাগিল এবং বৌদ্ধসমাজের পরাজিত অবস্থার উপরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়িন্তী পুনরায় ভারতাকাশে সগর্ব্বে উত্থিত হইল, তখন হইতেই পৌত্তলিকতার বীজ ভারতক্ষেত্রে রোপিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই বিবিধ দেবদেবীর আখ্যায়িকাপূর্ণ পুরাণের পর পুরাণ এবং তন্ত্রের পর তন্ত্র সকল রচিত হইয়া সাধারণ জনগণের চিত্ততুষ্টিকর এক প্রকার সহজ-সাধ্য অভিনব ধর্ম্মপ্রণালী এদেশ মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল;—ভারতের ধর্ম্ম ইতিহাসে যাহা পৌরাণিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে শূদ্র প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দুরা আসিয়া যোগদান করিয়াছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভুত্ব যখন একেবারে এদেশে বিনষ্ট হইল, তখন ব্রাহ্মণকুল এক দিকে যেমন বৌদ্ধসমাজনিবিষ্ট সেই সকল শূদ্রাদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর বর্ণ সমূহের উপযুক্ত এক প্রকার সহজসেব্য ধর্ম্মবিধান প্রণয়নের জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; অপর দিকে সেইরূপ সেই ধর্ম্মবিধানাশ্রিত লোকমণ্ডলীর কলেবর বিস্তৃতির নিমিত্ত তাহার মধ্যে ভারতের আদিম অধিবাসী অসভ্যদিগকেও আহ্বান করিতে লাগিলেন। সুতরাং তখন তাঁহারা এমন এক অভিনব ধর্ম্মপ্রণালী প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইলেন, যাহার কোন কোন অংশ ভারতের পূর্ব্বতন আদিমনিবাসীদিগের অজ্ঞানতা বিমিশ্রিত ধর্ম্মের উপাদানে গঠিত এবং যাহা সর্ব্বতোভাবে অমার্জ্জিতবুদ্ধি স্থূলদর্শী সাধারণ শ্রেণীর লোকবর্গের উপযুক্ত। এইরূপ উদ্দেশ্যদ্বয়ের মধ্য হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে ভারতের আদিম অধিবাসী অসভ্যদিগের ধর্ম্মের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, এই কারণে অনুমান করা যায় যে, পৌত্তলিক পদ্ধতির ভিতরে এমন সকল দেব দেবীর উপাসনা নিবদ্ধ হইয়াছে, যাহারা ভারতের পূর্ব্বতন সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি অসভ্যজাতিদিগের দ্বারা আরাধিত হইত। কেন না, বর্ত্তমান কালেও সেই সকল অসভ্যনিবাস, সেই সকল দেব দেবীর পূজারাধনার সময়ে সময়ে কোলাহলময় হইয়া উঠে। সুতরাং সে সকল যে তাহাদের ধর্ম্মের চিরন্তন প্রথা, তাহা আর কে অস্বীকার করিতে পারে? শীতলা, মঙ্গলা প্রভৃতি দেবীর আরাধনা অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীর অসভ্য লোকদিগের গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদিগের মাহাত্ম্যকর স্তুতি সকলও সচরাচর ইতরদিগের কণ্ঠেই শুনিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের পল্লীগ্রাম সকল পর্য্যটন করিলে এমন অনেক দেবমূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইবে, যাহাদিগকে

হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিকৃষ্ট সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ পুরোহিত স্বরূপ হইয়া পূজার্চ্চনা করিয়া থাকে। হিন্দুর দেবতা হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নতর শ্রেণীর পৌরহিত্যে পূজিত হইয়া থাকে, ইহা শুনিতে আপাততঃ নিতান্ত শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পৌত্তলিকতার প্রভুত্বে তাহাও সমঞ্জসীভূত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল নিম্নশ্রেণীর পুরোহিতেরা কোন স্থানে পণ্ডিত, কোন স্থানে বা মশাই ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত ও হিন্দুসমাজের উচ্চতর শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দ্বারা সম্মানিতও হইয়া থাকে। এই সকল অসভ্যজাতি-পরিসেবিত দেব দেবীর প্রভুত্ব যদিও এখন হিন্দুসমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই—নিম্নতর সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, তথাচ এ সকল যে বিশালগর্ভ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া সম্যকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইরূপ এক দিকে যেমন প্রতিপাদিত হইল যে, পৌত্তলিকধর্ম্ম অনেকাংশে ভারতের প্রাচীন অসভ্যজাতিদিগের ধর্ম্মনিয়মের উপদানে গঠিত, অপর দিকে সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অজ্ঞানান্ধ সাধারণ লোকদিগের নিমিত্তই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ধীর ভাবে সূক্ষ্মতার সহিত অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, পূর্ব্বোক্ত দুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই পৌত্তলিকপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে।

যে জাতির ব্যবস্থাশাস্ত্র একদিন শূদ্র সম্প্রদায়ের নিতান্ত নিকৃষ্টতা ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে অত্যাবশ্যকীয় ধর্ম্মের সেবা হইতে বহুদূরে তাড়িত করিয়াছিল, কালচক্রের পরিবর্ত্তনে দেখিতে পাই যে, সেই জাতিই আবার শূদ্র হইতে শূদ্রেতর জাতিকে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের অধিকার দান করিয়াছে। আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, ভারতক্ষেত্রে পৌত্তলিক ধর্ম্মের দ্বার উদ্‌ঘাটিত না হইলে হিন্দুধর্ম্ম কখন এতদূর সুবিশাল ক্ষেত্রের উপরে পরিব্যাপ্ত হইতে পারিত না। পৌত্তলিকতার বিশাল ও প্রমুক্ত প্রাঙ্গণকে এতই উদারতার সীমার দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ইহার মধ্যে শূদ্র, ম্লেচ্ছ, দস্যু প্রভৃতি অতীব নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগকেও আহ্বান করা হইয়াছে। দুর্গাপূজার উপলক্ষে মুণ্ডমালা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে;—

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ॥

অর্থাৎ এই প্রকার ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, ও অন্যান্য লোক দস্যু ম্লেচ্ছগণ পর্য্যন্ত সকলে দুর্গার পূজা করেন। এখানে আর প্রায় কেহই অবশিষ্ট রহিল না। পৌত্তলিকতার প্রসাদে হিন্দুসমাজ সকলকেই কোন না কোন আকারে ধর্ম্মের অধিকার দান করিয়াছে। কি কি কারণে, কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কোন্ সময় হইতে পৌত্তলিকতার প্রচলন হইয়াছে, এখন বোধ হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

বিগত ফাল্গুন মাস হইতে নব্যভারতে "যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ ভগ্নাংশাকারে প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় একটী গুরুতর বিষয়ের চর্চ্চা করিতেছেন। শুধু ব্রাহ্ম নয়, সকলেরই ইহাতে স্বার্থ আছে। এই বিষয়টীতে সর্ব্বসাধারণের মনযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। অতএব এ আলোচনা যাহাতে দেশ ব্যাপিনী হয়, তাহাই প্রার্থনীয়। প্রবন্ধটী এখনও অসম্পূর্ণ বিধায় আমরা মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নব্যভারত সম্পাদকের প্রতি তিনি যে সকল ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, তাহাতে আমাদের কোন স্বার্থও নাই। যে সকল কথায় সাধারণের স্বার্থ আছে, তাহাই আলোচ্য।

নব্যভারত সম্পাদক "আজ যিনি দাদা কাল তিনি স্বামী" হওয়া নীতি বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। ইহা যে নীতি সঙ্গত। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস সুদৃঢ় যুক্তির উপর স্থাপিত নয়। তিনি কোন যুক্তিই দিতে পারেন নাই, কেবল এইমাত্র দেখাইয়াছেন যে, যাহাদের সঙ্গে রক্তের সংশ্রব আছে, অপরাপর সমাজে তাহাদের সঙ্গেও বিবাহ হয়। একি যুক্তি, না প্রমাণ? অপরাপর সমাজে যে সকল কুপ্রথা আছে, তাহা কি আমাদের আদর্শ? মুসলমানেরা বলে, "চাচা আপন, চাচীপর, চাচীর মেয়ে বিয়ে কর।" এজন্য কি আমরাও মুসলমানদিগের অনুসরণ করিব? তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "ইয়ুরোপীয় সমাজে, যাহাদের সঙ্গে রক্ত মাংসের সংশ্রব আছে, তাহাদের সঙ্গে বিবাহ হয়, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের আইনে সেরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ।" একথা ঠিক কিন্তু তা বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ কোন প্রশংসার কাজ করেন নাই। কারণ অপরের দোষ অনুকরণ না করায় প্রশংসা নাই, গুণের ভাগ অনুকরণ করাতেই প্রশংসা। তিনি আবার বলেন, "রক্ত সামীপ্য নিবন্ধন সন্তানাদি দুর্ব্বল হইয়া থাকে, একথা বিজ্ঞান বলে; ইহা কেবল "বিজ্ঞান সম্মত" দোষ বলিয়াই এরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।" আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিনা। কেবল বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বিবাহ সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি। ধর্ম্ম নীতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। আমরা একথাও বিশ্বাস করিনা যে, কেবল শারীরিক অনিষ্ট বলিয়াই আর্য্য ঋষিগণ ও রূপ বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন; ওটী ধর্ম্মনীতিরও বিরুদ্ধ। মানব ও পশুতে ঐ খানেই প্রভেদ। ওরূপ বিবাহে শারীরিক অনিষ্ট অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অনিষ্টের ভাগই অধিক। শারীরিক অনিষ্টের ভাগ বেশী হইলে, পশু পক্ষী এত

দিনে নির্ম্মূল হইত; কারণ তাহাদের মধ্যে যোনি বিচার নাই। যে পাশ্চত্য সমাজের মুখে আমরা ঝাল খাই, সে সমাজে বিজ্ঞান ছাড়া কথা নাই। যাঁহারা বিজ্ঞানের অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ করিতে চাহেন না, তাঁহারা যদি এমন প্রমাণ পাইয়া থাকেন যে, যে বিবাহে রক্তের সংশ্রব আছে, সে বিবাহোৎপন্ন সন্তান অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তবে তাহারা এ প্রকার সমাজধ্বংশ-কারিণী প্রথার প্রশ্রয় কেন দিয়া আসিতেছেন? আমরা তাই বলি, আধ্যাত্মিক অবনতিই ওরূপ বিবাহের ফল। পাশ্চাত্য সমাজ এখনও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে এত উন্নত হইতে পারেন নাই যে, এ গূঢ় ভাব বুঝিবেন। রক্তের সংশ্রবই যদি এক মাত্র অন্তরায় হয়, তবে এক ব্যক্তি একটী দত্তক পুত্র রাখিয়া কি তার কাছে আপন ঔরষজাত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন? একথার উত্তর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দিবেন। হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ বিবাহের ব্যবস্থা নাই। "ব্রাহ্ম সমাজে আছে কি না, তাহা জানি না। ছি, অমন পাপ কথাও কি মুখে আনিতে আছে! হা বিজ্ঞান, তুমি কি অবশেষে মানুষকে পশু করিয়া তুলিবে?

পাহাড়ী প্রভৃতি অসভ্য জাতির মধ্যে যাহারা ফল, মূল ও মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে, গাছের ছাল ও পাতার সাহায্যে শীত নিবারণ করে, যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের ধার ধারে না, লেখা পড়া যাহারা স্বপ্নেও জানে না, সমাজ সংস্কার যাহাদের মধ্যে স্থান পায় না, যাহাদের চৌদ্দ পুরুষেও বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, তাহারাও ত ভগিনীকে বিবাহ করে না। যদি বিজ্ঞানই কেবল অন্তরায় হইত, তবে ঐ সমস্ত জাতির মধ্যেও ওরূপ বিবাহের প্রচলন থাকিত। কিন্তু তাহা নাই। তাই বলি, স্বভাবসিদ্ধ নিবৃত্তি ধর্ম্মের বশীভূত হইয়াই মানুষের ওরূপ বিবাহের প্রবৃত্তি জন্মে না। তবে যাহারা বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান যখন উন্নতিশীল, তখন সর্ব্বদাই এর পরিবর্ত্তন সম্ভব। দুই বৎসর পরে যদি এক জন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলেন যে, রক্ত মাংসের সংশ্রব থাকিলেও বিবাহে বৈজ্ঞানিক দোষ ঘটে না, তবে কি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সহোদর সহোদরায় বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইবেন? বিজ্ঞানের অনুসরণ করিলে ত ওরূপ বিবাহ অপরিহার্য্য। কিন্তু কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি যে ঈদৃশ বিবাহ ব্যবস্থা দিতে পারেন, তাহা আমরা জানি না। যে বিজ্ঞান ভাই ভগিনীর বিবাহ ব্যবস্থা দেয়, সে বিজ্ঞান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কর্ম্মনাশার প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া দাও। ভাসিয়া ইয়ুরোপ এবং আমেরিকায় যাউক, ভারত সে বিজ্ঞান চায় না।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "হিন্দু সমাজে মিথিলায় মাতুল কন্যাকে বিবাহ করিবার রীতি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে।" একথা সম্পূর্ণ অলীক। এরূপ বিবাহ মিথিলায় কোন কালে ছিলও না, এখনও নাই। দীর্ঘকাল মিথিলায় বাস করিয়া আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে এই মাত্র বলিতে পারি যে, মিথিলা সমাজে ওরূপ বিবাহের প্রচলন থাকা দূরে থাকুক, নাম শুনিলেও মৈথিলগণ বিষ্ণু স্মরণ করিয়া কাণে হাত দেন।

তিনি "পাতান" সম্পর্ককে উপেক্ষা

করিয়া বিবাহ দিতে প্রয়াসী। এইক্ষণে আমরা দেখাইব যে, 'পাতান" সম্পর্কও উপেক্ষার জিনিস নয় এবং উহা উপেক্ষা করিয়া বিবাহ দিলেও নীতির মূলে দোষ পড়ে। যে স্থলে রক্ত মাংসের সংশ্রব নাই, অথচ পরস্পর একত্র বাস অথবা একত্র পাঠ কিম্বা একত্র কর্ম্ম করা বিধায় ঘনিষ্টত্ব জন্মিবাতে পরস্পরকে কোন সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া সম্বোধন করা হয়, সেই সম্পর্কই "পাতান'' সম্পর্ক নামে অভিহিত। পবিত্র ভালবাসার অনুরোধে রক্ত মাংসের সংশ্রব না থাকিলেও লোকে লোককে, দাদা, দিদি, খুড়া, খুড়ী, পিসা, পিসী, মামা, মামী, কাকা, কাকী প্রভৃতি সুমধুর সম্ভাষণে সম্ভাষণ করিয়া মনের পরিতৃপ্ত সাধন করেন। এই রূপ সম্ভাষণ আছে বলিয়াই সংসার এত মধুর। গুরু শিষ্যের, শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীর সম্পর্কও "পাতান''। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককেও "পাতান' বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কারণ এ সম্পর্কও ইচ্ছা করিয়া পাতান হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা ছাড়িয়া দিলে আমরা এই দেখিতে পাই যে, হিন্দু শিক্ষকগণ ছাত্র ও ছাত্রীকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন; ছাত্র এবং ছাত্রীও শিক্ষক মহাশয়কে পিতৃতুল্য জ্ঞান করেন। শিক্ষক এবং ছাত্রীর মধ্যে বিবাহ হইবার রীতি থাকিলে যে, নৈতিক দোষ হয়, তাহা পরে বলিব, ইহাতে যে সামাজিক ক্ষতি তাহাই অগ্রে দেখাইতেছি। এই স্থলে একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের একটী পরিচিত লোক কোন পাঠশালার শিক্ষকতা কর্ম্ম লইয়া স্থানান্তরে যান। গ্রামস্থ জনৈক ভদ্রলোক পণ্ডিত মহাশয়কে খুব পূর্ব্বক আপন আবাসে স্থান দিয়া অকাতরে তাহার আহার বিহারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গৃহ স্বামীর একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা ছিল। দেশাচারের বাধ্য হইয়া তিনি অপেক্ষাকৃত বয়স্থা বালিকাকে পাঠশালায় পাঠাইতে সাহসী হইলেন না। অবকাশ মতে পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ঘরে পড়াইতেন। বালিকাটী পণ্ডিত মহাশয়ের আবাস গৃহে গিয়া পাঠ লইয়া আসিত, ইহাতে তার পিতার কোন রূপ সন্দেহ বা আপত্তি ছিল না। গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারে পাঠ ক্রমশ গুরুতর হইয়া উঠিল। পণ্ডিত মহাশয়, বালিকাকে কুশিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তলে তলে তাহাদের মধ্যে অবৈধ ব্যবহার চলিতে লাগিল। পরে ঐ কথা গৃহস্বামীর কর্ণগোচর হইলে, পণ্ডিত মহাশয় বালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা পরোক্ষে প্রকাশ করিলেন। তখনও পণ্ডিত মহাশয়ের একটী স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন। গৃহস্বামী দেখিলেন, যখন এরূপ অবৈধ কার্য্য হইয়াছে, তখন ঐ কন্যার পাত্রান্তরে বিবাহ দেওয়া আরো গর্হিত, সুতরাং তিনি অগত্যা কন্যাটী পণ্ডিত মহাশয়কে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ গৃহস্বামী কি আর কোন পণ্ডিতকে আশ্রয় দিবেন? এক জনার অপরাধে পণ্ডিত সাধারণের প্রতি তাঁর ঘৃণা জন্মিল। এ অবস্থায় এক জন সচ্চরিত্র লোকের প্রতিও সহসা বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। এ কি সামাজিক অনিষ্ট নয়? পণ্ডিতের মনে যদি ছাত্রীকে বিবাহ করা দোষের হইত, তাহা হইলে আর এ পৈশাচিক ঘটনা ঘটিত না।

আজি কালি স্ত্রীশিক্ষার খুব বিস্তার

হইতেছে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযোগী বিদ্যালয় কলিকাতা ভিন্ন মফঃস্বলে নাই। উচ্চ শিক্ষা লাভের ইচ্ছা থাকিলে স্ত্রীলোকদিগের কলিকাতাবাস অপরিহার্য্য। যাঁহারা ব্যয় ভার বহন করিতে সমর্থ, তাঁহারাও উপযুক্ত অভিভাবক কিম্বা সুনীতিপরায়ণ তত্ত্বাবধায়কের অভাবে আপন বালিকাদিগকে মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় পাঠাইতে পারিতেছেন না। তবে যাঁহারা উন্নতিশীল, তাঁহারা পরিচিত বন্ধু লোকের তত্ত্বাবধানে বালিকা এবং যুবতীদিগকে রাখিতেছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, "যিনি রক্ষক তিনি ভক্ষক" হইয়াছেন বিধায়, সকলে ওরূপ ভাবে রাখিতে সাহসী হন না। একজন ভদ্রলোক, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস করিয়া, আপন কন্যা, ভগিনী কিম্বা অপর কোন সম্পর্কীয় বালিকাকে তার তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। যখন তিনি ঐ বালিকার ভার গ্রহণ করিলেন, তখনই তিনি তার পিতৃ কিম্বা ভ্রাতৃ স্থানীয় হইলেন। বালিকাও তাহাকে কাকা কিম্বা দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল এবং তার শাসনে থাকিয়া বিদ্যা লাভে যত্নবতী হইল। কাকা কিম্বা দাদা মহাশয় ক্রমে বালিকাকে অথবা যুবতীকে ছলে, বলে, কৌশলে ও প্রলোভনে ফুস্‌লাইয়া এমন করিয়া তুলিলেন যে, তার সঙ্গে ঐ যুবতীর বিবাহ দাওয়া পিতামাতার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কি পশু ভাব!! এরূপ ইচ্ছা ভদ্রলোকের মনে কি রূপে জন্মে, আমরা বুঝিতে পারি না। সম্পর্কের মূলে নীতি-শৈথিল্য কি এর কারণ নয়? এর অপেক্ষা আর কি অনিষ্ট হইতে পারে? এই সমস্ত কারণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহারা ঐ প্রথার সমর্থন করেন, তাঁহারা কেমন লোক, আমরা জানি না। "পাতান" সম্পর্ক উপেক্ষা করিলে নির্ব্বাচন ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় বটে, আজ যিনি কাকা কিম্বা দাদা, কাল তিনি পতি হইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, কিন্তু ইহাতে সমাজের নিতান্ত অকল্যাণ।

"নীতিবিরুদ্ধ নয়" "নীতি বিরুদ্ধ নয়" বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করেন, তাঁহারা নীতি অর্থে কি বুঝেন, তা তাঁহারাই জানেন। আমরা স্থূল বুদ্ধিতে যতদূর বুঝি, তাহা এই যে, যে সকল কাজ দ্বারা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অথবা সামাজিক অনিষ্ট হয়, সেই সকল কাজই নীতি বিরুদ্ধ, পক্ষান্তরে যে সমস্ত কাজ দ্বারা শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কল্যাণ হয়, তাহাই নীতি সঙ্গত। অতএব "পাতান" সম্পর্ক উপেক্ষা করিলে যখন ঐ সকল অনিষ্ট হয়, তখন উহা অবশ্য নীতি বিরুদ্ধ।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নব্যভারত সম্পাদককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "এই ভাবটী (বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব) অন্য কোন ঘনিষ্ট ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়া যদি দোষ হয়, তাহা হইলে আপনি সাধনাতৎপর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার যে বিবাহ দেখিতে চান, তাহা সম্ভব হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের সন্তান জ্ঞানে অন্য নারীকে ভগিনীর ন্যায় শ্রদ্ধা, সম্মান ও পবিত্রতার চক্ষে দর্শন করেন না, কেবল তাঁহারাই কি বিবাহের অধিকারী হইবেন? এক পবিত্র ভাবে অন্য পবিত্র ভাব নিমগ্ন হইলে তাহা অপবিত্র হয় না।" এ কথার গুরুত্ব আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নব্যভারত

সম্পাদকের অভিসন্ধি বুঝিতে ভুল করিয়াই গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঐ কথাগুলি লিখিয়াছেন। সত্য বটে, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব রক্ষা করা মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের সঙ্গে সহোদর ভ্রাতার এবং খুড়ী, জেঠী, মাসী, পিসী প্রভৃতি গর্ভসম্ভূত ভ্রাতার কিম্বা দীর্ঘকাল একত্র থাকা বশতঃ কোন ভিন্ন পরিবারস্থ লোকের সঙ্গে যদি ভাই ভগিনী সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া যায়, তবে তাদের সঙ্গের ভ্রাতৃ ভাবে বিশেষ বিভিন্নতা আছে। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অর্থ এ নয় যে, যাকে তাকে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হইবে। উহার অর্থ এই যে, কাহারও অনিষ্ট না করিয়া, কায়মনোবাক্যে যথাসাধ্য সকলেরই হিত সাধনে রত থাকিবে। অন্যথা জগতে ধনী দরিদ্র থাকিত না, ধরিত্রীর সমস্ত ধন সকলে মিলিয়া সমভাবে বিভাগ করিয়া লইত। কিন্তু এভাব জগতে কোন যুগে, কোন কালে, কোন দেশে, কোন সমাজে প্রচলিত ছিলও না, নাইও, হইবেও না। আপন ভাইকে দেখিলে যে ভাবের সঞ্চার হয়, মনে যে ভ্রাতৃবৎসলতা উথলিয়া উঠে, অপর একজন লোক দেখিলে কি তাহা সম্ভবে? অনেক ক্ষেত্রে "পাতান" ভাই ভগিনীর মধ্যেও প্রকৃত ভ্রাতৃবৎসলতার সঞ্চার হয়। সহোদর সহোদরাকে দেখিলে মন যেমন হয়, ইহাদিগকে দেখিলেও সেইরূপই হয়। এ কল্পনার কথা নয়, পরীক্ষিত সত্য। বাহিরে যেমন আমাদের নানাপ্রকার সম্পর্কীয় লোক আছেন; জগদীশ্বর আমাদের অন্তরেও সেই রূপ নানা ভাবের স্নেহ ও ভালবাসা দিয়াছেন। মাতাকে দেখিলে একরূপ ভাব হয়, পিতাকে দেখিলে আর এক রূপ ভাব হয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিলে এক ভাবের উদ্রেক হয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিলে অন্য রূপ ভাব হয়, জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে দেখিলে যে ভাব হয়, কনিষ্ঠা ভগিনীকে দেখিলে তদপেক্ষা বিভিন্ন ভাবের সঞ্চার হয়; পুত্রকে দেখিলে যে ভাবের সঞ্চার হয়, কন্যাকে দেখিলে ঠিক সে ভাব হয় না, স্ত্রীকে দেখিলে আবার অন্য ভাবের উদয় হয়। এই সকল ভাবেই প্রেম, অনুরাগ ও পবিত্রতা আছে, অথচ সকল গুলিই পৃথক পৃথক;—একের সঙ্গে অন্য মিলিতে পারে না। তাই বলি, ভ্রাতৃবৎসলতাকে দাম্পত্য প্রেমে পরিণত করা অস্বাভাবিক। ভগিনীকেও ভালবাসি, পবিত্রতার চক্ষে দেখি, স্ত্রীকেও ভালবাসি, পবিত্রতার চক্ষে দেখি, অতএব স্ত্রীও যে ভগিনীও সে, এ কথা প্রলাপ বই আর কিছুই নহে। "যে যে বস্তুর প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান"—ইউক্লিডের এ স্বতঃসিদ্ধ এখানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। যাহাকে দেখিলে ভ্রাতৃবৎসলতায় মন আপ্লুত হয়, তাহাকে দেখিয়া দাম্পত্য প্রেমের উদ্রেক করান নিতান্ত অস্বাভাবিক, জবরদস্তি বই আর কিছুই নহে। পিতৃবৎসলতাও পবিত্র, ভ্রাতৃবৎসলতাও পবিত্র, তা বলিয়া এককে অপরে ডুবাইয়া দিতে পারা যায় না; সুতরাং "আজ যিনি দাদা কাল তিনি স্বামী হওয়া" নীতি সঙ্গত নহে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন "এক পবিত্র ভাব অন্য পবিত্র ভাবে নিমগ্ন হইলে তাহা অপবিত্র হয় না।" তাই আমরা এতগুলি কথা বলিলাম।

তিনি আর এক আশঙ্কা করিয়াছেন যে,

নব্যভারত সম্পাদকের মতে চলিতে গেলে "সাধনা তৎপর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার বিবাহ সম্ভবপর হয় না"। আমরা এরূপ আশ-ঙ্কার কোন কারণ দেখি না। একজন সাধনশীল ব্রাহ্ম একজন সাধনশীলা ব্রাহ্মিকাকে দেখিলে কি ঠিক তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনীকে দেখিলে যে ভাবের সঞ্চার হয়, সেই ভাবের আবির্ভাব হয়? ঐরূপ স্ত্রীলোককে দেখিলে সাধু ব্রাহ্মের হৃদয়ে সাধারণ ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে, স্রষ্টাকে স্মরণ পড়িতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিবাহ হইতে কোন বাধা নাই। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের আমরা যে ব্যাখ্যা করিলাম, "ব্রাহ্মকোডে" তার অর্থান্তর থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্ম জীবনে তার ভাবান্তর সম্ভবে না; কারণ আমরাও যে উপাদানে গঠিত, ব্রাহ্মেরাও সেই উপাদানে গঠিত। বিবা-হের পূর্ব্বে বরকন্যার একত্রে বাস, একত্রে পরিভ্রমণাদি সম্বন্ধে নব্যভারত-সম্পাদক যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ সমনুমোদন করি।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "বিবাহ প্রস্তাব অবধারিত হওয়ার পর বর কন্যা একত্রে অনেক দিন বাস করিয়াছেন, এ সংবাদ আমি অবগত নহি।" তিনি অবগত নন বলিয়াই যে সেটা দোষের হইবে না, এ কোন কাজের কথাই নয়। আমরা বিশেষ অবগত আছি যে, বিবাহ প্রস্তাবের পর অথচ বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা একত্রে-বাস করিয়াছেন, এমন কি, এক শয্যায় শয়নও করিয়াছেন। অভিভাবকগণ তাহাতে বাধা দেন নাই। এইরূপ প্রথা আছে বলিয়াই অনেক যুবক অভিলষিতা যুবতীগণের প্রেমাকাঙ্ক্ষায় পৈতা ছিঁড়িয়া ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান হইয়াছে। হিন্দু সমাজে বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যা মিলনের রীতি নাই, হিন্দুরা ভাবী জামাতাকে পোষ্য পুত্র স্বরূপে আপন গৃহে প্রতিপালন করেন না বিধায়, হিন্দু সমাজে ওরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের গণ্ডী যখন দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে, তখন তার মধ্যে যে কোন গলদ থাকিবে না, ইহা অসম্ভব। তবে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাহা সরল ভাবে স্বীকার করেন নাই বলিয়াই আমরা এত কথা বলিলাম। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যাকে একত্র বাস করিতে না দিলে, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার ব্যাঘাত জন্মে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রেম শিক্ষার একটী প্রকৃষ্ট উপায়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে আমরা কেবল রক্ত-মাংসের সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদিগকে দেখিতে চাই না; অন্য পরিবারের সাধু লোকেরাও ইহাতে মিলিতে পারেন। কিন্তু বর কন্যা নির্ব্বাচন ভিন্ন পরিবার হইতে করাই বিধেয়। উপসংহারে আমাদের এই বক্তব্য যে, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ওরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই একটী প্রকাণ্ড ভুল করিয়া বসিয়াছেন। যাহা করিয়াছেন, তাহাত করিয়াছেনই; এইক্ষণে তাঁহার নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, তিনি যেন প্রণিধানপূর্ব্বক আমাদের কথা গুলির আলোচনা করিয়া বিচার করেন এবং এই সকল প্রথা যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরীভূত হয়, তার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের অনেক লোকের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে; এবং ব্রাহ্ম সমাজের দোষ দেখিলে আমরা দুঃখিত হই বলিয়াই এই সব কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বসু।

যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৭ম)

"Alas for a Church without righteousness and a State without right."
Theodore Parker.

ক্রমে আমরা একটী বিষম সমস্যাপূর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বামাজিক অধিকার, এ দুয়ের মধ্যে সীমা-রেখা নির্দ্ধারণ করা বড় সোজা কথা নয়। যাঁহারা বিবেকের কথা পালন করিয়া চলিতে চান, তাঁহাদিগের মতের সহিত সমাজের প্রচলিত মতের অনৈক্য হইলে, সমাজ তাহাতে বাধা দিতে অধিকারী কি না?—এই প্রশ্নটী আপনা আপনিই মনে উদয় হয়। সমাজ যদি এরূপ স্থলে বাধা দিতে অধিকারী না হয়, তবে ব্যক্তিগত খেয়াল বা স্বেচ্ছাচারিতার আদেশ বা বিবেকের ভ্রম প্রমাদপূর্ণ কথার অপকারিতা নিবারণের উপায় কি? এ সকল বিষয় একবার ধীর ভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

একথা একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত যে, ব্যক্তির সমষ্টিতে যে সমাজ গঠিত, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সমবেত শক্তি লইয়া যে সমাজ অবয়র পাইয়াছে, সে সমাজ মানবের পক্ষে কল্যাণকর। সমাজ ভিন্ন মানবের উন্নতি অসম্ভব। আদর্শ নীতি বা আদর্শ ধর্ম্মমত প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিপালন করিতে না পারিলে, নীতি বা ধর্ম্মের অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকাতেই কিন্তু মানবের উপকার হয় না। সমাজ এই নীতি এবং ধর্ম্মমত পালন করিবার পক্ষে ব্যক্তিকে এরূপ সহায়তা করে যে, সে সাহায্য আর কোন রূপে পাওয়া যায় না। এই জন্যই পৃথিবীতে সমাজের সৃষ্টি। যে সমাজ যে পরিমাণে ব্যক্তিগত জীবনে নীতি এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার সহায়তা করিতে সক্ষম, সেই সমাজ সেই পরিমাণে আদর্শ। যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন একটা সমাজের আকার ধারণ করিতেছে। কি পরিমাণে এই সমাজ আদর্শ নীতি পালনে সমর্থ হইতেছে, পঞ্চাশৎ বৎসর পরে ইহার আলোচনা কোন ক্রমেই অযৌক্তিক নয়। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, আদর্শ নীতিই এ পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে ঠিক হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ঠিক হওয়া সম্ভবপরও নয়, কারণ পৃথিবীতে নর নারীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ;—মানুষে মানুষে কত বিভিন্নতা, কত পার্থক্য। এসম্বন্ধে আমরা বলি, পার্থক্য অনেক আছে বটে, কিন্তু মিলও যথেষ্ট আছে। সকলেরই আহারের প্রয়োজন, সকলেরই শারীরিক পরিশ্রম প্রয়োজন, শরীরে আঘাত লাগিলে সকলের দেহই ক্ষত হয়, ইত্যাদি। না—কেবল এরূপ মিল নয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, রিপু এবং মানসিক ও শারীরিক শক্তিতেও যথেষ্ট মিল আছে। এতদ্ভিন্ন চিন্তা জগতেও মিল আছে। চিন্তাজগতে যদি মিলন সম্ভব, তবে, মানবতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, তাঁহাদের উন্নতির জন্য নীতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করা কেন অসম্ভব হইবে? অর্থাৎ তাহাতে মানব সাধারণের অমিল হইবে কেন? এ সম্বন্ধে মিল, স্পেনসার, কোমত্ত প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণ সকলেই এক বাক্যে বলিয়া

ছেন, সমাজ পরিচালনার জন্য নিয়মাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব; এবং তাহা না হইলে সমাজ চলা দুষ্কর।১ কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেকে বলেন, "বিবেকের স্বাধীনতার উপর সমাজকে ছাড়িয়া দেও, যাহা হইবার হইবে। সমাজ ডুবিতে হয় ডুবিবে, জাগিতে হয় জাগিবে। যে সকল নেতা বা অভিনেতা এইরূপ কথা বলেন, কার্য্যকালে দেখিয়াছি, তাঁহারাও কিন্তু এই স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারেন না; অর্থাৎ তাঁহারাও, কেহ তাঁহাদের মত বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, বাধা দিতে ছাড়েন না। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথাটা একটা মুখের ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, কোন সমাজ এইরূপ স্বাধীনতা লইয়া জীবিত থাকিতে পারে নাই। সকল সমাজেই আদর্শ নীতি প্রতিষ্ঠিত রাখা ও তদনুসারে কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।২ ব্রাহ্মসমাজে আদর্শনীতি স্থিরীকৃত হওয়া উচিত, এবং সমাজের পক্ষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া, যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনে সেই নীতি প্রতিপালিত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ব্রাহ্মসমাজে আদর্শ নীতি ঠিক না হইলে, তাহা পালনে কিরূপে সক্ষম হইবে? আদর্শ নীতি পালনে অক্ষম হইলে, সে সমাজই বা কিরূপে মানব সমাজের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হইবে? অথবা আদর্শ নীতি পালনে অক্ষম হইয়া কেমনেই বা তাহা জীবিত থাকিবে?

প্রথমত দেখা উচিত, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা বিবেকের কথা সর্ব্ব স্থানে ঠিক হয় কি না? ঠিক না হইলে, সে ভুলের জন্য দায়ী কে?—ঠিক করিবার উপায়ই বা কি?

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে কতকগুলি কার্য্য কেবল নিজকে লইয়া, আর কতকগুলি কার্য্যের সহিত অপরের যোগ আছে; অর্থাৎ কতকগুলি কার্য্যের ফলভোগ কেবল নিজকে করিতে হয়, কতকগুলির ফলভোগ অপরকেও সহিতে হয়। যে কার্য্যের ফলভোগ নিজের, সে কার্য্যে বয়স্ক ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে থাকুক। তাহাতে কাহারও বাধা না দিলেও চলে। তবে এরূপ স্থানেও পরামর্শ প্রভৃতি প্রদানের অবশ্য প্রয়োজন আছে। আমি এমন একটা জিনিস আহার করিতেছি, যাহাতে আমার ভয়ানক পীড়া হইতে পারে। ইহাতে আমার স্বাধীনতা আছে; কিন্তু এরূপ স্থলে বন্ধুদের পরামর্শ চলে; শাসন চলে না। কারণ, ইহার ফলভোগী কেবল আমি। বালকের পক্ষে এরূপ স্থলেও শাসন চলে। কিন্তু আমি যদি একজনের বাড়ীতে যাইয়া একজনের দ্রব্য বিনষ্ট করিয়া ফেলি, তাহার ফলভোগী আমি নই, অপরে, সুতরাং ইহাতে আমার স্বাধীনতা নাই। রাজ আইন বা সমাজবিধি এস্থলে আমাকে দণ্ড দিতে, আমার অধি-

1 "Though it may be impossible to say that a given law will produce a foreseen effect on a particular person, yet no doubt is felt that it will produce a foreseen effect on the mass of persons. * * Whoever expresses political opinions,—whoever asserts that such or such public arrangements will be detrimental or beneficial, tacitly expresses belief in a Social Science; for he asserts, by implication, that there is a natural sequence among social actions, and that as the sequence is natural, results may be foreseen." *Herbert Spencer.*

2 "Until there be such a body of truths; universally acknowledged and respected, society must remain in a state of profound disorder, whatever unanimity may exist upon matters of minor importance." Social Science.

কারকে খর্ব্ব করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী।৩ আমার বিবেক বলিলেই যে আমি অন্যের অনিষ্ট করিতে অধিকারী,তা নয়। চিন্তাতে, লেখাতে, বক্তৃতাতে, এবং নিজ শরীর প্রভৃতি সংরক্ষণে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; কিন্তু যেখানে অন্যের সহিত যোগ, সেখানে মানুষ, সমাজ বা রাজার কথা পালন করিতে নিতান্ত বাধ্য। বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। এককে অপরের মুখ চাহিয়া চলিতেই হইবে। এই রূপ মানব সমাজের সমুদায় কার্য্য, মানব সাধারণের সমবেত শক্তিতে, পরস্পরের সাহার্য্যে নিয়মিত হইতেছে, এবং হওয়া একান্ত আবশ্যক।৪

সমাজে যে সকল মনুষ্য বাস করে, তাঁহারা অন্যের অনিষ্ট করিবেন না, ইহাই কিন্তু নীতি নয়; তাঁহাদিগকে অন্যের উপকার করিতে হইবে। দোষ করিব না, অন্যের অনিষ্ট করিব না, মিথ্যা বলিব না, এগুলি কেবল নীতি নয়। পুণ্য সঞ্চয় করিব, অন্যের উপকার করিব,সত্য আচরণ করিব, ইহাই প্রকৃত নীতি। এইরূপ উভয়বিধ কাজে মানুষকে নিয়মিত করিতে সমাজ অধিকারী।৫ কারণ সমাজের নিকট এবং মনুষের নিকট মানুষ যে সাহায্য পায়, তাহার প্রতিদান না করিলে মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। এজন্যও মানুষকে সকলের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে। সেবা করা, অন্যের উপকার করা মানুষের জীবনের মহা ব্রত। এই মহাব্রত পালন করিতে, ন্যায়ত, ধর্ম্মত, মানুষ সমাজের নিকট বাধ্য, না করিতে মানুষের স্বাধীনতা নাই। পিতা মাতা যদি সন্তানকে প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে যেমন তাহারা সমাজ ও ধর্ম্মের নিকট অপরাধী, রোগীর শুশ্রূষা, দরিদ্রের সাহায্য ইত্যাদি না করিলে মানুষ তেমনই অপরাধী হয়। বিধাতার সৃষ্টিতে এ বাধ্যবাধকতা থাকিবেই থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজে বিবেক স্বাধীনতাটা খুব প্রচারিত হইয়াছে, একথা আমরা পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি। গুরুবাদ, এবং

3 "Man needs a social code to prevent him from annoying and offending his neighbours." * *

"The action of society is extremely valuable in protecting by ceremonial observances those who are undefended by law, or by nature,or by both."

Hints on Bacon's Essays.

"In the conduct of human beings towards one another it is necessary that general rules should for the most part be observed. * *

"The only part of the conduct of any one, for which he is amenable to society, is that which concerns others. In the part which concerns himself, his independence is, of right, absolute." * * It is, perhaps, hardly necessary to say that this doctrine is meant to apply only to human beings in the maturity of their faculties. * * Those who are still in a state to require being taken care of by others, must be protected against their own actions as well as against external injury." *John Stuart Mill.*

4 "And the total actions of mankind, considered as a whole, are left to be regulated by the total knowledge of which mankind is possessed."

Buckle's History of Civilisation.

5 "And to perform certain acts of individual beneficence, such as saving a fellow creature's life, or interposing to protect the defenceless against ill-usage, things which whenever it is obviously a man's duty to do, he may rightfully be made responsible to society for not doing. A person may cause evil to others not only by his actions but by his inaction, and in either case he is justly accountable to them for the injury." John Stuart Mill.

"It is not enough not to do harm to your brethren ; you are bound to do good to them. You are bound to act according to the Law." *Joseph Mazzini.*

শাস্ত্রের অভ্রান্তবাদ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য এই বিবেক-স্বাধীনতার ঘোষণার কতকটা প্রয়োজন ছিল, স্বীকার করি। কিন্তু ইহার অপকারিতাও যথেষ্ট আছে, তাহাও ভাবা উচিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজ সেই অপকারিকা যথেষ্ট ভোগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই বিবেক-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আজ আর একটু আলোচনা করার প্রয়োজন হইতেছে। কারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রূপে এই কথাটার উপর নির্ভর করিতেছে।

বিবেকের কথা যে সব সময় ঠিক হয় না, তাহার প্রধান যুক্তি এই যে, তাহা হইলে পরস্পরের ধর্ম্ম মতে এত পার্থক্য থাকিত না। একজন যাহাকে পুণ্য বলে, অপর তাহাকেই পাপ বলে। পৃথিবীতে চিরকাল এইরূপ বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। নিজের বিবেকের কথার সহিত অপরের কথায় অমিল হইতেছে, যখন দেখা যায়, তখন দুই জনের মধ্যে একজনের ভুল আছেই। কাহার ভুল, কে ঠিক করিবে? এ ভুল ঠিক করিতে একমাত্র মানব সম্প্রদায়ের সমবেত বিবেক সমর্থ।

বিবেকের কথায় ভুল থাকিতে পারে, থাকা সম্ভব,—এই জন্য, কেহ কেহ বলেন, অভ্রান্ত শাস্ত্র বা অভ্রান্ত গুরুর কথা পালন করা উচিত। একথার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, এমন শাস্ত্র পৃথিবীতে নাই, যাহা চিরকাল মানবের কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছে, বা যাহা চিরকাল মানব পালন করিয়া আসিয়াছে। শাস্ত্রের অভ্রান্ততা সকলের পক্ষে সমান প্রতিপাল্য হইলে পৃথিবীতে শাস্ত্রের পর শাস্ত্রের অভ্যুদয় হইত না। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা এই, নানা মুনির নানা মত। বাস্তবিক, বিশাল-বিস্তৃত হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিলে দেখা যায়, এমন বিধি অতি অল্পই আছে, যাহার বিরোধী বিধি নাই। এক সময়ের শাস্ত্রের কথা অন্য সময়ে খণ্ডিত হইয়া নূতন বিধি প্রচলিত হইয়াছে। সময়ের আবর্ত্তনে, অল্পে অল্পে পূর্ব্ব শাস্ত্রের কথা অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ নূতন শাস্ত্রের কথা প্রতিপালন করিয়াছে। পৃথিবী এসম্বন্ধে বিবর্ত্তবাদের (law of evolution) নিয়মানুসারে ক্রমাগত অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইতেছে।[6] এমনই হইয়াছে, দেখা যায়, মনুসংহিতার ন্যায় মহা মূল্যবান গ্রন্থের নিয়ম সকলও দিন দিন উপেক্ষিত হইতেছে। শিক্ষার অবস্থা এবং সময়ের ফেরে এরূপ না হইয়াও পারে না। ইহুদী সমাজের পানে যখন দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন কি দেখা যায়?—প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা রক্ষার জন্য ব্যক্তিগত বিবেক-স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা হইল—খ্রীষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধ করিয়া হত করা হইল! সেই রক্তপাত হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রের বীজ রোপিত হইল। তারপর আবার কত মহাত্মার অভ্যুদয়, কত রক্তপাত, কত পরিবর্ত্তন—কত মত-যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, কে না জানেন? এক বাইবেলকে আশ্রয় করিয়া আছেন যে খ্রীষ্টসম্প্রদায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কত দল, কত মতের বিভিন্নতা! এ সকল দেখিয়া আর কেমন করিয়া বলিব, শাস্ত্র অভ্রান্ত! শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলে যুগে যুগে তাহার এত পরিবর্ত্তন হইত না। আবহ-

6 "Is there not in nature a perpetual competition of law against law, force against force, producing the most endless and unexpected variety of results."
Canon Kingsly.

মানকাল মানুষ অবনত মস্তকে তাহা প্রতিপালন করিয়া আসিত। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া নব খ্রীষ্ট সমাজের ইতিহাসের গূঢ় তত্ত্ব সকল আলোচনা করিলে ইহাই দেখা যায়—শাস্ত্রের অভ্রান্ততা মানব সমাজে রক্ষা পায় নাই—তার নানা রূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে—মানুষ তার নানা রূপ বিকৃতি করিয়াছে। কোন শাস্ত্রের অভ্রান্ততা জগতে চিরকাল রক্ষা পায় নাই, পাইবেও না।৬(a)

তার পর কেহ কেহ বলেন,পূর্ব্ব পুরুষের কথা বা আচার প্রণালী বা মানব সমাজের সমবেত সমষ্টির মত প্রতিপালন করিলেই নীতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পায়। ইহাও সত্য নয়। কারণ, মানব চির উন্নতিশীল। উন্নতি ভুলিয়া কেবল পুরাতন লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। প্রকৃতি ক্রম-উন্নতিশীল, একভাবে চিরকাল থাকিতে পারে না।৭ থাকিলে সময়ে সময়ে যে সকল মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব মতের আমূল সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অভ্যুত্থানে তাহা হইলে বিধাতার ইচ্ছা থাকিত না।

অতএব দেখা যাইতেছে,অভ্রান্ত শাস্ত্রের কথাও সব সময়ে ঠিক নয়, সমবেত মানব সমষ্টির মতেও ভুল থাকিতে পারে; আবার ব্যক্তিগত বিবেকেও মহাভুল থাকা সম্ভব।৮ তবে মীমাংসা কোথায়? আমরা বলি, তিনই পবিত্র, এই তিনের মিলনেই উন্নতি। কেবল শাস্ত্র নয়, কেবল ব্যক্তিগত বিবেক নয়, কেবল মানব সমাজের মত নয়। তিনের মিলনে যাহা উৎপন্ন, তাহাই প্রতিপাল্য। পৃথক ভাবে তিনের কার্য্য হওয়াতেই জগতে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে।৯ সমাজের বিরুদ্ধে সমাজ, মানবের বিরুদ্ধে মানব, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে শাস্ত্র মহা যুদ্ধ করিয়াছে। সেই যুদ্ধের আজও বিরাম হইল না। শাস্ত্র, বিবেক এবং মানবের সমবেত মত, এই তিনের মিলনে যাহা উৎপন্ন, তাহাই সত্য, তাহাই নীতি, তাহাই ধর্ম্ম।১০ যে স্থলে তিনের মিল নাই, সেখানে আছে কেবল ঝগড়া বিবাদ কলহ! প্রাচীন হিন্দু সমাজ প্রাচীন শাস্ত্রের অভ্রান্ততা বজায় রাখিতে যাইয়া হতবল হইয়াছে—দুর্দ্দশার একশেষ হই-

6 (a) "There is no single code of morals which Humanity has not abandoned, after an acceptance and belief of some centuries, in order to seek after diffuse another more advanced than it." *Joseph Mazzini.*

7 "Mankind, always progressive, revolutionizes constitutions, changes and changes, seeking to come close to the ideal justice, the divine and immutable law of the world,to which we all owe fealty, swear how we will." Theodore Parker.

8 "Evidently the voice of individual conscience does not suffice at all times, without any other guide, to make known to us the law." *Mazzini.*

"Conscience may be cultivated in an exclusive manner to the neglect of the affections. Then conscience is despotic; the man always becomes hard and severe &c. *Theodore Parker.*

9 "The common hitherto, has been the endeavour to reach truth by the help of one of these tests alone, an error fatal and decisive in its consequences, because it is impossibe to elevate individual conscience as the sole judge of truth, without falling into anarchy; and it is impossible to appeal, at a given moment, to the general consent of Humanity, without crushing human liberty, and producing tyranny." *Joseph Mazzini.*

10 "*Whensoever thy agree*, whensoever the cry of your conscience is ratified by the consent of Humanity, God is there. Then are you certain of having found the truth, for the one is the verification of the other." * * *Joseph Mazzini.*

য়াছে—শাস্ত্রের অনন্ত বিরোধী প্রতিপাল্য বিধান সকল পালনে অসমর্থ হইয়া মানুষ হাবুডুবু খাইয়া অবশেষে কদাচার এবং দুর্নীতির সেবা করিয়া কলঙ্কিত হইতেছে। আর নবীন ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত বিবেকের স্বাধীনতার উপর অধিক ঝোঁক দিয়া দিন দিন ঘোরতর মতের বৈষম্য, ঝগড়া, কলহ বিবাদের সৃষ্টি করিয়া দলের পর দল বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃজন করিতেছে। কেবল কি তাহাই? না—তা নয়। পাপের পর পাপ, কলঙ্কের পর কলঙ্ক—সৃজন করিয়া সমাজকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছে! এখানে আজকাল আর নাকি একজনের নীতি আর একজনের সহিত মিলেনা!! কি শোচনীয় অবস্থা! কেবল নিজের মঙ্গল সাধন যদি মানবের লক্ষ্য হইত, নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতাই যদি মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য হইত, তবে বিবেকের কথা মতে চলিয়া যাইলেও অপরের কোন প্রত্যক্ষ (direct) ক্ষতি ছিল না। এরূপ স্থলেও পরোক্ষ (Indirect) ক্ষতি অপরিহার্য্য। কিন্তু যখন পরস্পরের উন্নতি বা মঙ্গল সাধন করা পরস্পরের লক্ষ্য, তখন মানব সমাজের নীতি, সত্য বা ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। যে কার্য্যে অপরের সহিত যোগ, যে কার্য্যে অপরের ক্ষতি, বিবেকের আদেশ পাইলেও, আমাকে তাহা হইতে বিরত থাকিতে হইবে। অন্যকে বধ করিতে আমার খেয়াল বা ইচ্ছা, বিবেক স্থানীয় হইয়া, আমাকে উত্তেজিত করিতে পারে, কিন্তু অন্যের অনিষ্ট স্মরণ করিয়া, মানব সমাজের নিয়ম স্মরণ করিয়া, আমাকে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেই হইবে। নচেৎ সমাজের মঙ্গল অসম্ভব। ১১

যে স্থলে সমবেত মানবের সহিত ব্যক্তিগত বিবেকের অমিল হয়, সেখানে বাধ্য হইয়া মানুষকে সমষ্টিগত বিবেকের কথা মতে চলিতে হইবে, না চলিলে তাহাকে পৃথক থাকিতে হইবে। পৃথক থাকাতে মানব শক্তির বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় আছে, সে ক্ষতি মানব সকল সময়ে সহিতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই সমবেত বিবেকের আদেশে চলিতে হইবে। বাধ্য হইয়াই সমাজে থাকিতে হইবে। বাধ্যবাধকতা না মানিলে সমাজ চলেনা। সমাজ ভিন্ন মানবের উন্নতি অসম্ভব; সুতরাং মানবও বাঁচে না। বাধ্যবাধকতাই জীবনের লক্ষ্য। ইহাকে ঘৃণা করিলে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই অপকার। তবে এমন কতকগুলি স্থান আছে, যাহার সহিত সমাজের কোন সংশ্রব নাই। সেস্থানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে রক্ষা করিয়া বলিতে দেওয়া একান্ত উচিত। আত্ম-সংযমে, চিন্তা শক্তির পরিচালনায়, লেখায় ও বক্তৃতায় মানবের স্বাধীনতা থাকা সম্পূর্ণ উচিত।১২ আর অন্য স্থানে মানবের সমবেত শক্তির অধীন হইয়া

11 "You are born with a tendency towards good, and every time you act directly contrary to the moral law, every time you commit what mankind has agreed to name sin, there is something that condemns you."

"Yet this is the primary aim of morals and no individual can reach that aim by the light of conscience alone." *Mazzini.*

12 "Such is the spiritual freedom which Christ came to give. It consists in moral force, in self-control, in the enlargement of thought and affection, and in the unrestrained action of our best powers." *Channing.*

চলাই মানুষের ধর্ম্ম। জগতে রাজাই এই সমবেত শক্তির বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। নানা কারণে শক্তির অপব্যবহারে, রাজশক্তি আমাদের দেশে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বিদেশী রাজা নিজের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত, কখনও সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। কাজেই আমাদের দেশে এখন ঈশ্বরের প্রতিনিধি একমাত্র সমাজ। এদেশে সমাজই নীতি ও ধর্ম্মরক্ষার একমাত্র সহায়।১৩ সমাজ বন্ধন না থাকিলে ধর্ম্ম ও নীতি বিশৃঙ্খল হয়, মানব সমাজ স্বেচ্ছাচারের অত্যাচারে ছারখার দশা প্রাপ্ত হয়। ১৪

আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সমাজের অধিকারের সীমা নির্দ্ধারণে বোধ করি কতকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি। যাহাতে নিজের ক্ষতি বৃদ্ধি, তাহাতে নিজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। চিন্তায়, লেখায়, বক্তৃতায় ও আত্মসংযম প্রভৃতিতে স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। যাহাতে অপরের সম্বন্ধ, ইষ্টই হউক বা অনিষ্টই হউক, তাহাতে সমাজের অধীন হইয়া চলিতে হইবে। এরূপ স্থানে নিজের বিবেক মানিলে চলে না, অধর্ম্ম হয়। এরূপ স্থলে সমাজের নিয়ম প্রণালী মানা উচিত। সমাজের নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারণ কিরূপে হইবে? তাহাতে প্রাচীন এবং আধুনিক সমবেত বিবেকের স্বর থাকা প্রয়োজন।১৫ যেখানে তাহা না থাকে, সেখানে ঘোর অবিচার এবং অত্যাচার হয়।

রাজশক্তি এক সময়ে পৃথিবীতে সমাজশক্তির কাজ করিত। কিন্তু কালক্রমে, ঘটনা পরম্পরায় রাজশক্তি হইতে সমবেত মানববিবেক শক্তি পৃথক হওয়ায়, সে শক্তি ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া মানব সমাজের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। এখনও যে সকল দেশে মানব সাধারণের স্বীকৃতিতে রাজশক্তি উত্থিত হইতেছে, সে সকল দেশে সমাজের কাজ রাজার দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে বিদেশী রাজা আপনি উত্থিত—স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম্মলক্ষ্যভ্রষ্ট,—প্রেমহীন, কঠোর অত্যাচারী, কাজেই আমরা তাহার সমস্ত কথা প্রতিপালন করিয়া চলিতে ধর্ম্মত বাধ্য নই। রাজারও তেমন শক্তি নাই যে, আমাদিগকে বাধ্য করিতে পারে।১৬ এখন তেমন শক্তি আছে—কেবল সমাজের সমবেত বিবেকশক্তির। এই

---

13 "The truth is that the moral and social reformation of India, as of any other country, if it is to be effective, must result from the action of internal forces. * * And this is why civilisation through a foreign Government, the popularisation of Western ideas through official insistence, a system of education through officials employed under the Department of Public Instruction, must always fail."

H. J. S. Cotton.

14 "I say, then, that society is throughout a moral institution * * Society is of earlier and higher origin. It is God's ordinance, and answers to what is most godlike in our nature." *Channing.*

"Every highly organised person knows the value of the social barriers, since the best Society has often been spoiled to him by the intrusion of bad companions." *Emerson.*

15 "Its tendencies must be moulded by the accumulated influences of the past and by the direct action of the present.

H. J. S. Cotton

16 "There has been a foolish neglect of moral culture throughout all Christendom. * * The thrones of Christian Europe tremble, a little touch and they fall." *Theodore Parker.*

সমাজের বিবেকশক্তির শাসন ভিন্ন মানবের দুর্নীতি-পরায়ণতা নিবারণের আর উপায় নাই। কেহই ইহার উপকারিতা অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সমবেত বিবেকশক্তি আধুনিক হিন্দুসমাজের মধ্যে কার্য্য করিতে পারিতেছে না বলিয়া, পতনের পথ ক্রমেই উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছে। ক্রমেই সে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইতেছে। দিন দিন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের স্বেচ্ছা ও খেয়ালের সামগ্রী হইয়া হিন্দুসমাজ ধর্ম্ম, নীতি এবং আচার প্রভৃতি ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে।১৭ তর্কের খাতিরে যিনিই যাহা বলুন না কেন, একথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এদেশের একমাত্র আশা ছিল। আশা ছিল, এক সময়ে এই সমাজ সমবেত বিবেক শক্তির লীলাক্ষেত্র হইয়া, এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশকে ভয়ানক দুর্নীতি-পরায়ণতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, সে সমাজ ব্যক্তিগত বিবেক-প্রাধান্য ঘোষণায় দিন দিন অহঙ্কার ও স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি হইয়া উঠিতেছে! আমি বড়, আমি বড়,—আমায় দেখ, আমার কথা শুন, এই রূপ অহঙ্কারের কথা চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতেছে। কেবল স্বাধীনতায় যে চলে না, একথা এখনও সকলে বুঝিতেছেন না। সমাজকে আদর্শ নীতিসম্ভূত আচার প্রণালী ও অনুষ্ঠানাদিতে ভূষিত করিয়া দাঁড় করাইতে না পারিলে দেশের আর মঙ্গল নাই।১৮—সমবেত বিবেক-শক্তি-সিংহকে জাগাইতে না পারিলে—এ সমাজও অচিরে অশিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজ বা কর্ত্তাভজা সমাজের ন্যায় ঘৃণিত হইয়া উঠিবে।

আমরা সমবেত বিবেকশক্তির দ্বারা নিয়ম গঠনের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, একথা ব্যক্ত করিতে আমরা সঙ্কুচিত হই নাই। ইহা করা নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত।১৯ কিন্তু সে নিয়ম যত অল্প হয়, ততই ভাল। নিয়ম বাহুল্যে সমাজের ভয়ানক অপকার হয়।২০ পরন্তু এই নিয়ম গঠনের সময় প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। কিসে লোক শাস্তি পাইবে, সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কিসে লোক ভাল হইবে, এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শাস্তির বিধান যে রাখিতেই হইবে, এখনও কোন কথা নাই। কি প্রণালীতে চলিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিলেই যথেষ্ট হইল। সমাজের পক্ষে কি প্রতিপাল্য, ইহা নির্দ্ধারণ করিলেই যথেষ্ট হয়। যাহারা তাহা প্রতিপালন না করিবে, তাহাদিগকে সমবেত বিবেক-শক্তি নীরবে শাসন করিবে। সে শাসনের দুর্জ্জয় শক্তি। প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানবসমাজ যে বিধি প্রণয়ন করে, তাহা প্রতিপালনে লোকের যেমন ইচ্ছা হয়, শাস্তির ভয়ে সেরূপ হয় না। শাস্তির ভয় দেশে যথেষ্ট আছে, তবু মানুষ

17 "They justify the popular sins in the name of God." *Theodore Parker.*

18 "Virtue and wisdom without forms are like foreign tongues which are not understanded of the people. *Bacon.*

"It is meritorious to insist on forms. Religion and all else naturally clothes itself in forms." *Carlyle.*

19 "The wisdom of legislation seen in grafting laws on conscience." *Channing.*

20 "For this end, laws should be as few and simple as may be; for an extensive and obscure code multiplies occasions of offence." *Channing.*

কিন্তু পাপকার্য্য করিতে ছাড়ে না।২১ প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানবসমাজ যে নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারণ করেন, তাহা পালন করিতে মানুষের স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। তার ভিতরে কি যেন একটা স্বর্গের বাণী লুক্কায়িত থাকে। তার ভিতরে কি যেন একটা মহৎ ভাব থাকে, যাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষ কোন মতেই চলিতে পারে না।২২ এই নিয়ম প্রণালী প্রণয়নে সমবেত বিবেকের অধিকাংশের মত থাকা চাই। সমবেত বিবেক যেখানে, সেইখানে বিধাতা স্বয়ং বর্ত্তমান। বিধাতার কার্য্য, বিধাতার নীতি, এইরূপে মানব সমাজের দ্বারাই নির্দ্ধারিত এবং রক্ষিত হয়।২৩ কেবল তাহা নয়, যতদূর সম্ভব, মানবের অতীত সমবেত-বিবেক-শাস্ত্রের সম্মতির সহিত মিলিতে চেষ্টা করা উচিত। এসম্বন্ধে মনুসংহিতা খুব সহায়তা করিবে। এরূপ গ্রন্থ অতি অল্প আছে। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে এ পর্য্যন্ত তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই বলিয়া, আমরা যে কেবল দুঃখিত, তাহা নয়, এই জন্যই সমাজে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, এখন বিনীত অনুরোধ, যত শীঘ্র হয়, একটা কিছু ঠিক হউক।

ব্রাহ্মসমাজের গত ৫০বৎসরের ইতিহাসে ইহাই দেখা যায়, এই সমাজ হিন্দুসমাজের সামাজিক আচার প্রণালীর প্রতিবাদেই অধিক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে যে সামাজিক আচার প্রণালী প্রবর্ত্ত করার প্রয়োজন হইবে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে এ বোধ তত জন্মে নাই। তখন সামাজিক প্রশ্নের অতি অল্পই আলোচনা হইত। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সময়ে এসম্বন্ধে প্রথম আলোচনা উঠে এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত হয়। কিন্তু তাঁহার কন্যার বিবাহের পর অল্পে অল্পে তাঁহার মনে একটু সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, এই আশঙ্কায় তিনি পশ্চাৎপদ হন।২৪ মহাত্মা কেশবচন্দ্র দলবল লইয়া কাজেই আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হন। সুতরাং মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানের রীতিমত সূত্রপাত হয়। এবং সেই সময় হইতে এ সম্বন্ধে অনেক কার্য্য আরম্ভ হয়। আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, হিন্দু সমাজের কুপ্রথা সকল ভাঙ্গিবার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ প্রথমে খুব ব্যস্ত ছিলেন।২৫ কিন্তু সুপ্রথাগুলি সুপ্রণালীতে যাহাতে সংস্থাপিত হয়, তৎপক্ষে তত ব্যস্ত ছিলেন না। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা দিতে হইবে, বিধবা বিবাহ দিতে হইবে, বাল্য বিবাহও জাতিভেদ ভাঙ্গিতে হইবে, যৌবন বিবাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে;—তখনকার প্রধান চেষ্টা এই রূপ ছিল। এই সকল প্রচলিত না হইলে দেশের, সমাজের

21 "Arbitrary and oppressive laws invite offence, and take from disobedience the consciousness of guilt." *Channing.*

22 "But disinterested benevolence can find other instruments to persuade people to their good, than whips and scourges, either of the literal or the metaphorical sort." *John Stuart Mill.*

23 But in human affairs the Justice of God must work by human means." Theodore Parker.

24 "Faith and Progress of the Brahmo Samaj. Page 289, 290 and 291.

25 "The Brahmo Somaj has absorbed the spirit of the ancient Hindu religion and left to those outside its dead, dry, and meaningless forms only." *P. C. Mozoomdar.*

এবং মানবের যে অপকার হয়, সেই আলোচনাই অধিক হইত, কিন্তু এ সকল প্রবর্ত্তিত করিলে কোন অপকারের সম্ভাবনা আছে কিনা, এ সকল কি প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত করিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা, বাস্তবিক এ সকল প্রথায় কোন অপকার আছে কিনা, এই সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা বা মীমাংসা তত হইত না। স্ত্রীশিক্ষা দিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, কি উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার কুফল নিবারিত হয়, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করার জন্য কি কি করা উচিত;—বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে ও বাল্য বিবাহ তুলিয়া দিলে সমাজের কোন অপকারের সম্ভাবনা আছে কিনা, এ সকল বিষয়ের বিশেষ কোন আলোচনা হইত না। বাস্তবিক পৃথিবীতে সচরাচর এই রূপই ঘটিয়া থাকে। নূতন কিছু প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় সেই নূতনে কিন্তু ভুল ভ্রান্তি আছে কিনা, সকল সময়ে মানুষ তাহা দেখিতে পায় না। প্রাচীন প্রথার মধ্যে কোন কিছু ভাল আছে কি না, নূতন প্রথায় কোন ভুল আছে কি না, ইহা না ভাবার দরুণ সমাজের ভয়ানক অনিষ্ঠ হয়। বাস্তবিক উভয় দিকই দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।২৬ প্রাচীন কুপ্রথা সকল ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ কর, তখনকার প্রধান কথা এইরূপ ছিল। নূতন প্রথার দোষ আলোচনার তখন অবসরও হয় নাই। কারণ ব্রাহ্মসমাজ তখন একটা সমাজের আকার ধারণ করে নাই। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজে নূতন অনুষ্ঠান সকল হইতে চলিল। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করা উচিত, আদর্শ সমাজ গঠন না করিতে পারিলে, আদর্শ নীতি সকল জীবনে পালন করিতে না পারিলে এই সকল নব প্রথা টিকিবে না,—তখন অনেকের মধ্যে এই চিন্তা উঠিল! কাজেই নূতন নূতন অনুষ্ঠান ক্রমাগত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে থাকিয়াই সকলে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিত, ক্রমে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নামে একটা কথা উঠিল। চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উপস্থিত হইল;—ঘোরতর আন্দোলন। বিবাহ বিষয়ে তখন নূতন আইন পর্যান্ত বিধিবদ্ধ হইল। এই সময়েও আচার ব্যবহার প্রণালী প্রভৃতি কিন্তু স্থিরীকৃত হইল না। গোলে হরিবলেই অল্পে অল্পে বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। যৌবন বিবাহ, বিজাতীয় বিবাহ, বিধবা বিবাহ—সমস্তই প্রচলিত হইল। ক্রমেই সমাজ জাঁকিয়া উঠিল। এই সময়ে দুই একটা কলঙ্ক রেখাও দেখা যাইতে লাগিল। ভারতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া একান্তবর্ত্তী পরিবার গঠনেরও খুব চেষ্টা হইল, কিন্তু কি কুক্ষণে কে জানে, সকল দিকেই একটু একটু কি যেন বিষম কাল মেঘ দেখা যাইল! ব্রাহ্মসমাজের তদনীন্তনের অভিনেতা একটু ভীত হইলেন। তিনি কোন রূপ একটা শক্তি দাঁড় করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা সফল হইল না। বিবেক-স্বাধীনতা তখন এত প্রচারিত হই-

26 "On the part of men eager to rectify wrongs and expel errors, there is still, as there even has been, so absorbing a consciousness of the evils caused by old forms and old ideas, as to permit no consciousness of the benefits these old forms and old ideas have yielded." * * But while this one-sidedness has to be tolerated; as in great measure unavoidable, it is in some respects to be regretted."

Herbert Spencer.

হইয়াছে যে, ক্যাথলিক খ্রীষ্ট সমাজের ন্যায় কোন শক্তিকে মান্য করিয়া চলা উচিত, এই সরূপ প্রবন্ধ লিখিত হইলেও, অনেকে তাহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিল। কোন শক্তিই প্রতিষ্ঠিত হইল না, কোন নিয়ম প্রণালীই স্থিরীকৃত হইল না। এই সময় ব্রাহ্মসমাজে আবার নূতন প্রতিবাদ উঠিল—কুচবেহার বিবাহের আন্দোলন চলিল। পূর্ব্বে প্রতিবাদ ছিল, বাহিরের সমাজের সহিত, এবার ঘরে ঘরে। সমাজ বিচ্ছিন্ন হইল, নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইল। তাহা হইলও। কিন্তু হায়, সামাজিক বিষয়ে যে উদাসীনতা, সেই উদাসীনতাই থাকিয়া যাইল। যে সকল নিয়ম হইল, সে সকলই বাহিরের ব্যাপার—নিগূঢ় সমাজ তত্ত্বের কিছুই মীমাংসা তাতে হইল না। নববিধান সমাজের নেতা তখন বুঝিলেন, এ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ চলিলে, অচিরাৎ এ সমাজ বিলয় প্রাপ্ত হইবে। আদর্শ নীতি বা কর্ত্তব্য সকল যদি স্থিরীকৃত না হয়, এবং তাহা যদি সমাজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিলালিত না হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা মানব সমাজের কিছুই মঙ্গল হইবে না। পুরাতন প্রথা তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে, নূতন প্রথা সংস্থাপনের সুশৃঙ্খল নিয়ম প্রণালী প্রতিষ্ঠিত না করিলে যে দুর্দ্দশা ঘটে, ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই হইল।[২৭] বাল্যবিবাহ রহিত হইয়াছে, কিন্তু সকল যৌবনবিবাহ ধর্ম্মনীতিকে রক্ষা করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হইতে পারিল না, নানা ত্রুটী দেখা যাইতে লাগিল। ইহা বুঝিয়া তিনি খুব চিন্তিত হইলেন। ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সমাজের লোকের এ সকল বিষয়ে কিছুই দৃষ্টি নাই, তিনি আরো চিন্তিত হইলেন। কত আক্ষেপ করিয়া, কত দুঃখ করিয়া বন্ধুদিগকে এই সময়ে বলিতে লাগিলেন, "আমি যাহা করিতে চাহিয়াছিলাম, সেরূপ তোমরা কিছুতেই হইলে না।" সাময়িক প্রার্থনা উপাসনাতেই বা কত আক্ষেপ ব্যক্ত করিলেন। সম্প্রতি তাহার একটী সুন্দর প্রার্থনা নববিধান পত্রিকা হইতে প্রতাপবাবু-বিরচিত কেশবচন্দ্রের জীবনীর ৪৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক চিন্তার পর, অনেক মর্ম্মবেদনার পর অবশেষে এই সকল অরাজকতা হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নবসংহিতা প্রণয়ন করিলেন, এবং দরবার প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। নবসংহিতা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি লিখিলেন;— "The New Samhita will be shortly ready, and a day ought to be appointed for its formal promulgation among our people,—a day that will close the epoch of anarchy, self-will, and lawlessnes, and usher in the kingdom of law, and discipline, and harmony." ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি সমাজের সেই সময়ের অবস্থা কি সুন্দর রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দারুণ চিন্তার পর তাঁহার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল, হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। নবসংহিতা তিনি

27 "Just as injurious as it would be to an amphibian to cut off its branchiæ before its lungs were well developed, so injurious must it be to a society to destroy its old institutions before the new have become organized enough to take their places." Herbert Spencer.

সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর দরবার নববিধান-সমাজে নবসংহিতা অনুসারে কার্য্যাদি চালাইতেছেন। এইত গেল ব্রাহ্মসমাজের এক বিভাগের ইতিহাস। অন্য বিভাগ যথেষ্ট আইন কানুন করিতে তৎপর হইলেন বটে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারাদি সম্বন্ধে কিছুই নিয়ম হইল না। নিয়ম হইল না বটে, কিন্তু অপরাধীর বিচারের জন্য একটী বিচারক কমিটী নিয়োগ হইল। কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সমাজের কোন আদেশ নাই, কিন্তু বিচারের খুব ঘটা। এরূপ খামখেয়ালি বিচারের ভয় করিয়া কে চলিবে? সুতরাং নিরাশার পর আরো নিরাশা—কালিমার পর আরো কালিমা দেখা যাইতে লাগিল। অল্পবয়স্ক লোকের সংখ্যা অধিক প্রযুক্তই হউক, বা ধর্ম্মহীনতা প্রযুক্তই হউক, বা অধিক সংখ্যক লোকের সমাবেশ বলিয়াই হউক, ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে কালিমার রেখা কিছু বেশী জমাট বাঁধিল! আর আর সমাজ ক্রমে ক্রমে একটু নিয়মাদির সঙ্কীর্ণতারূপ (?) গণ্ডির দিকে ঝুঁকিল,—সাধারণ বিভাগ সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী হইয়া প্রতিবাদের মূল নিশান হস্তে লইয়া, দীর্ঘ বক্তৃতাকণ্ঠী হইয়া, সমর ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। এ সমাজে কোন নেতা নাই। কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে যদি কোন নেতার কল্পনা করিয়া লওয়া যায়, তবে সেই নেতা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বিবেকের স্বাধীনতা ঘোষণা কর।" ইহার ফল যাহা হইবার, তাহা অবাধে ফলিতে লাগিল। বিবেকে বিবেকে তুমুল সংগ্রাম চলিল। যেমন কেহ বলেন, চুম্বন—আলিঙ্গন বিবেকের আদেশ; কেহ বলেন, সম্বন্ধ-পাতানে ভগ্নী ইত্যাদির সহিত বিবাহ নীতি বিরুদ্ধ হয় না, আর কেহ কেহ ইহার বিরুদ্ধেও বলেন। সামাজিক কোন বিষয় মীমাংসার জন্য কখনও কোন সভা হয় নাই, তাহা নয়; অনেকবার হইয়াছে। কিন্তু যখনই হইয়াছে, দুই দলে বিষম সংগ্রাম হইয়াছে, কোন্‌টা নীতি, কোন্‌টা নয়, ইহা স্থিরীকৃত হয় নাই। গানে বা বক্তৃতায় আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ পায় নাই, তা নয়, কিন্তু জীবনে হায়, জীবনে অতি অল্প। এই রূপ ভাবে ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান সময়ে এক কঠিন সমস্যার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সে সমস্যা এই, এখন কি করা উচিত? আধ্যাত্মিক হীনতার হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা পাওয়া যায়, এজন্য অগ্রণীগণ খুব চিন্তিত হইলেন, এবং চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। আমাদের প্রতিবাদকারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, গত কয়েক মাস হইতে সামাজিক বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। সে সকল আলোচনা, যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্ম সমাজ নামক প্রবন্ধ প্রকাশের পর উঠিয়াছে। যাহা হউক, সে সকল সভাতেও যদি কিছু একটা নির্দ্ধারিত হইত, সুখের সীমা থাকিত না। কিন্তু তাহা হইবার নয়। সব দল প্রবল। সব মত প্রবল। সকলের বিবেক স্বাধীন—সব লোক স্বাধীন। শিশুও স্বাধীন, বৃদ্ধও স্বাধীন! শিক্ষকও স্বাধীন, ছাত্রও স্বাধীন; উপদেষ্টাও স্বাধীন, উপদিষ্টও স্বাধীন। ইহা ছাড়া আবার ভয় ভাবনা আছে। অমুক লোক্‌টাকে কিছু বলিলে, সে চটিবে। বড় আশঙ্কা! এইরূপ ভয় ভাবনায় এবংএই স্বাধীনতার ধাক্কায়, আমরা

দেখিলাম, ক্রমে ক্রমে প্রবীণ প্রবীণ ব্যক্তিরাও নীরব-প্রকৃতির হইতে লাগিলেন। দেখিলাম, তাঁহারাও দুর্নীতি প্রচার পাইতেছে দেখিলে আর কথা বলেন না। এইরূপে বর্ত্তমান বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবের অবতারণার আবশ্যকতা আমরা বুঝিলাম। আমাদের আলোচনা আরম্ভ হইবার পর চতুর্দ্দিকে প্রাচীন বিবাহ প্রথার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—নূতন প্রথা এবং পুরাতন প্রথা উভয়েরই দোষ গুণ আলোচনা হইতেছে। বাস্তবিক উভয় প্রথাকে তলাইয়া না দেখিলে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কঠোর রূপ পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, কিছু মঙ্গলের আশা থাকে না। এই জন্য, উভয় পক্ষের অগ্রণী ব্যক্তিগণেরই,উভয় দিকের সত্যাসত্য ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। ২৮ কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, প্রাচীন আচার প্রণালীর পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ নূতন প্রথায় কোন সত্য আছে কিনা, তাহা দেখিতে প্রস্তুত নন্; আবার নূতন প্রথা-প্রতিষ্ঠাকারী সম্প্রদায়ও প্রাচীন প্রথার সত্য এবং নূতন প্রথার ভুলভ্রান্তি আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে চাহেন না। ইহাতে প্রাচীন হিন্দু এবং নবীন ব্রাহ্মসমাজ উভয়েরই ঘোর অনিষ্ট হইতেছে। ইহা বুঝিয়া আমরা নীরব থাকিতে পারিলাম না। বুঝিলাম, ব্রাহ্ম সমাজকে কেবল একটা প্রাচীন সমাজের প্রতিবাদ স্বরূপ দাঁড় না করিয়া, ইহাকে ধর্ম্ম এবং নীতিতে ভূষিত করিয়া দাঁড় করান উচিত। ব্রাহ্ম এখন সমস্ত দেশময়। আশা ছিল, এই গুরুতর বিষয়টী তাঁহাদের সমক্ষে ফেলিয়া দিলে একটা কিছু মীমাংসা হইবে। কালে যে মীমাংসা হইবে, তাহা আমরা নিশ্চয় জানি, কিন্তু এখনও তার কোন বিশেষ নিদর্শন পাইতেছি না। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ, যাঁহারা অগ্রণী, যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহারা আজও এ সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁহারা আজও রোষ-কষায়িত চক্ষে আমাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিতে, বা ঠাট্টা বিদ্রূপ-রূপ হিংসার ভ্রূকুটী দেখাইতে কুণ্ঠিত নন। তবে দেখিতেছি, নববিধান ব্রাহ্মসমাজের এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের এ সম্বন্ধে খুব সহানুভূতি। আমাদের এই পরীক্ষার সময় তাঁহারা প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিয়া এবং গোপনে পত্র দ্বারা আমাদিগের প্রস্তাবে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। তাঁহাদের সহৃদয়তা, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং একাগ্রতার কি বলিয়া প্রশংসা করিব, জানি না। তাঁহাদের এঋণ কিরূপে জীবনে পরিশোধ করিব, জানি না। বিধাতা তাঁহাদিগের মঙ্গল করুন। কিন্তু যাঁহারা আমাদের প্রতি বিরক্ত, তাঁহাদিগেরও চরণ ধরিয়া মিনতি করি, তাঁহারা আমাদিগকে আঘাত করিবার সময়ও, আমরা কি বলিতেছি, তাহা যেন একবার ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। আমাদের অপরাধ থাকে, আঘাত কর, ভাল কথা থাকে, শুন। যে সমাজের এবং যে দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন প্রাণ সমস্ত উৎসর্গ করিয়াছি, সেই সমাজ ও সেই দেশের হীনাবস্থা আর দেখিতে পারি না। তাই সকলের চরণ ধরিয়া এই অনুরোধ করি, সকলে যেন আমাদের কথায় একবার কর্ণপাত করেন।

অদ্য প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল, অন্যান্য কথা ক্রমে ক্রমে লিখিব।

28 "Hence the need for an active defence of that which exists, carried on by men convinced of its entire worth: so that those who attack may not destroy the good along with the bad."

Herbert Spencer.

গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।

(ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ও মৃত্যু।)

গুণাকর এই সময়ে আর এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম রসমঞ্জরী। ইহা সংস্কৃতের অনুবাদ। নায়ক ও নায়িকা-দিগের প্রকার ভেদ ইহাতে বিলক্ষণরূপে বুঝান হইয়াছে এবং ইহা ছাড়া জয়দেবের রতীমঞ্জরীতে পদ্মিনী প্রভৃতি চারিজাতীয়া স্ত্রী ও শশকাদি প্রভৃতি চারিজাতীয় পুরু-ষের যে যে চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এ গ্রন্থ অবশ্য খুব অশ্লীল। ভারতচন্দ্র ইহা অনুবাদিত না করিয়া যদি সংস্কৃত অন্য কোন গ্রন্থ অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে অতি উত্তম হইত। ইহা তৎকালের রুচির অবশ্যম্ভাবী ফল। তবে ইহাতেও সুললিত ছন্দোবন্দের অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী স্থান উদ্ধৃত হইল।

"নয়ন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু, অন্য জনে চায়না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুত ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয় সখা বিনা কভু অন্যকাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হইলে মৌন ভাব কেহ টের পায়না॥"

কেহ কেহ চোর পঞ্চাশৎকেও ভারত-চন্দ্র রচিত বলিয়া কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নহে। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত বিদ্যা-সুন্দরের চোর পঞ্চাসৎ হইতে কয়েকটী শ্লোক অনুবাদ করিয়া তাহা সুন্দরের মুখে প্রকাশিত করিয়াছিলেন মাত্র। তাহাতেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের চোর পঞ্চাসৎকে যে প্রকার দুই অর্থে প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ এক অর্থে বিদ্যাকে লক্ষ্য করিতেছে ও অন্য অর্থে কালীকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা খুব চমৎকার। এত আশ্চর্য্য গুণ ছিল বলিয়াই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়া-ছিলেন।

ভারতচন্দ্র এক্ষণে গঙ্গাতীরে মুলাযোড়ে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহার পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের নিকট পঁহুছিল। নরেন্দ্র নারায়ণ ইহা শুনিয়া পুত্রগণকে কহিলেন যে, "ভারত গঙ্গাতীরে মুলাযোড়ে বাড়ী করি-য়াছে। আমি বৃদ্ধ, এই বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাহীন দেশে বাস করা আমার পক্ষে উচিত নহে, সুতরাং আমি ভারতচন্দ্রের বাটীতেই বাস করিব।" নরেন্দ্র নারায়ণ পুত্রগণকে এই কথা কহিয়া মুলাযোড়ে গমন করত ভারতচন্দ্রের নিকটে রহি-লেন। তথায় কিছুকাল পরে নরেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হয়। পিতৃ সমাগমে ভারতচন্দ্র বড় সুখী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে ততোধিক কষ্ট পাইলেন। তৎপরে বিধিমত পিতার আদ্যশ্রদ্ধ সমা-পন করিয়া ভারতচন্দ্র কিছু কাল কৃষ্ণনগরে বাস করেন।

গুণাকর কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে বসন্ত ও বর্ষা বর্ণনা করিয়া দুইটী খণ্ড কবিতা রচনা করেন। তৎপরে কৃষ্ণ ও রাধিকার প্রণয়ঘটিত ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে রাজ সভাসদ কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করিয়া আরও দুইটী কবিতা রচনা করেন। এই সকল কবিতা চৌপদী ছন্দে লিখিত হইয়াছিল। তারপর হাওয়া ও বাসনা বর্ণনা করিয়া আরও ২টী কবিতা লিখেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটা ধেড়ে পুষিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহা দেখিয়া রাজার সাক্ষাতেই ধেড়ে ভেড়ের সমান রূপবর্ণনা করেন। ইহা ছাড়া ভারতচন্দ্র রচিত আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে, তন্মধ্যে কর্‌দ্রাফ্‌থ বর্ণন অর্থাৎ এ কর্ম্ম কে করিল এবং কে একর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেল, এই ভাবে একটী কবিতা লেখেন। আরও হিন্দি ভাষায় একটী কবিতা লিখিয়াছিলেন। এ সকল কবিতাতে শুধু ভারতচন্দ্রের লিপি-কৌশল দৃষ্ট হয় মাত্র। এই কবিতা সম-সাময়িক লোকদিগের মন সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌দিগের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই প্রকার কবিতার সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তবে তাঁহারা ভারত-চন্দ্রের মত ক্ষমতাশালী ছিলেন না বলিয়া তাঁহাদের কবিতা লুপ্ত হইয়াছে। ভারত-চন্দ্রও যদি অন্যান্য গ্রন্থ না লিখিয়া শুধু এই সকল বর্ণনা করিতেন, তবে তাঁহার রচিত কবিতার কথা আমরা শুনিতেও পাইতাম না।

পূর্ব্বকালে পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানা প্রকার কৌতুক দ্বারা সমবেত লোক সন্তুষ্টির মন সন্তুষ্ট করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল; এক্ষণে সে সমস্ত লুপ্ত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস ও বররুচি সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে পদ পূরণ একটী। এ রূপ গল্প অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই পদ পূরণ দ্বারা তাঁহাদের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা হইত। অনেকে এই সমস্ত উপস্থিত ব্যাপারে খুব পারদর্শী ছিলেন। ভারত-চন্দ্রেরও এই গুণ ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতের এই গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমবার "পায় পায় পায় না" দ্বারা পদ পূরণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, ভারতচন্দ্রও বলিরাজার উক্তি ছলে পূরণ করিলেন ;—

"চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎস্বামী,
মাগিল ত্রিপদ ভূমি, আর কিছু চায় না।
সর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে একি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ, তাহে মন ধায় না॥
গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ,
বাঁকী আছে এক পদ, ঋণ শোধ যায় না।
হাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে, বৃন্দাদেবী দেখসিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না॥"

রাজা দ্বিতীয় বার "পায় পায় পায়" দ্বারা পদ পূরণ করিতে আদেশ করিলে ভারত বৃন্দাবলীর উক্তি ছলে পূরণ করিলেন ;—

"কেঁদে কহে বৃন্দাবলী, বলীরাজ শুন বলি,
ছলিবারে বনমালা হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, বলি জয় জয়॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহ মাথায়।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইল বামনের, পায় পায় পায়॥"

এই সকলে তাঁহার উপস্থিত কবিত্ব

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ভারতচন্দ্র সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি, এই কয়েক ভাষা মিশ্রিত করিয়া কবিতা লিখিতে পারিতেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকম্পায় এখন আর ভারতচন্দ্রের সাংসারিক অভাব নাই, তাই এক্ষণে তিনি পারিবারিক সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি কিছুকাল কৃষ্ণনগরে অবস্থান করেন, কখনও বাটীতে থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে ফরাসডাঙ্গায় গমন করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নানাবিধ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া তথায় মনোসুখে দুই চারি দিন বাস করেন। এই ভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেল। নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়া নানা স্থানে নানা ভাবে বিচরণ করিয়া ভারত প্রথমে এই নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে মহারাষ্ট্র গোলযোগের বিষয় লিখিয়াছি, তাহা বর্গির অত্যাচার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভারত যখন এই প্রকার সুখে কাল কর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন রাঢ় দেশে বর্গির অত্যাচার ভয়ানক প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এই অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বর্দ্ধমানের রাণী তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের মাতা আপন পুত্রকে লইয়া মুলাযোড়ের দক্ষিণ পূর্ব্ব কাউগাছি নামক গ্রামে গড়বেষ্টিত এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। সে বাড়ী এখন আর নাই। দুই একটা স্তম্ভ ও পুরাতন ইষ্টক সকল তাহার কথা এক্ষণে লোকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এখন তাহা বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তথায় বন্যপশুরা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে।

এই কাউগাছির রাজ ভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের বিবাহোৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই বিবাহের অধ্যক্ষতা করেন এবং তাঁহার অনুমতি ক্রমে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ সৈনিক পুরুষ আসিয়া বিবাহোৎসব সমাপ্তি পর্য্যন্ত উক্ত রাজ ভবন রক্ষা করিয়াছিল।

কাউগাছি গ্রাম মুলাযোড়ের খুব নিকটে থাকায় মহারাণীর হাতি ঘোড়া প্রভৃতি পশুদ্বারা ভারতচন্দ্রের ইজারা মহালের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণের বস্তু নষ্ট করা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। তাই মহারাণী যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পালিত পশু সকল মুলাযোড়ে গিয়া অনেক বস্তু নষ্ট করিতেছে, এবং তাহাতে তাঁহার ব্রহ্মস্ব হরণ রূপ পাপ হইতেছে, তখন তিনি এই পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাই মহারাণী মুলাযোড় পত্তনি লইবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র লিখিলেন এবং মহারাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলে মহারাণী আপন কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে উক্ত গ্রাম পত্তনি লইলেন।

ভারতচন্দ্র এই ব্যাপার অবগত হইয়া পত্তনি সম্বন্ধে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আপত্তি উত্থাপন করিলেন। রাজা, ভারতচন্দ্রের এইপ্রকার আপত্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সুমিষ্ট বচনে প্রবোধ দিতে লাগিলেন এবং বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহার অধিকারে বাস করিলে তাঁহার কত গৌরব

বৃদ্ধি হইবে, তাহা ভারতচন্দ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন। রাজা আরও বলিলেন যে, যখন মহারাণী স্বয়ং এই পত্তনির জন্য চিঠি লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার সম্মান ও অনুরোধ রক্ষা করা সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যদিও এইপ্রকারে মুলাযোড় পত্তনি দিয়া ভারতচন্দ্রের আয় কমাইয়া দিলেন কিন্তু অন্যপ্রকারে তাহা পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, এই প্রকার পত্তনি দেওয়াতে ভারতচন্দ্র মুলাযোড়ে অবস্থান করিতে রাজি নহেন, তখন তিনি ভারতকে আনরপুরের অন্তঃপাতী গুস্তে নামক গ্রামে বাস করিতে বলিলেন এবং উক্ত গুস্তে গ্রামবাসী মুখোপাধ্যায়দিগের বাটীর নিকট ১০৫/ বিঘা এবং মুলাযোড়ে ১৬/ বিঘা ভূমি স্বত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্তররূপে ভারতচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। রাজার এইরূপ ব্যবহারে ভারতচন্দ্রও খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ভারতচন্দ্র নিজ অমায়িক স্বভাবগুণে সকলকে আপনার করিতে জানিতেন। তাই ভারতচন্দ্র মুলাযোড়ে অবস্থান করিয়া মুলাযোড়ের সমস্ত লোকদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গুণাকর এই নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হইয়া গুস্তেগ্রামে বাস করণাভিলাষে মুলাযোড় পরিত্যাগ করিতে চাহিলে সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া ভারতচন্দ্রকে কহিল "মহাশয় কোন মতেই আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবেন না, আপনি গমন করিলে মুলাযোড় অন্ধকার হইবে।" এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্র আর মুলাযোড় পরিত্যাগ করেন নাই।

প্রতাপশালী পত্তনিদারগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া খাজনা আদায় করিত, রামদেব নাগও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিল। ইহাতে মুলাযোড় গ্রামবাসী সকল লোকেরই কষ্টের সীমা ছিল না। ভারতচন্দ্রও নাগের দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, তাই তিনি নিজের ও গ্রামিক লোকের কষ্ট দূর করিবার জন্য নাগের অত্যাচারের কথা বিবৃত করিয়া সংস্কৃতে আটটী শ্লোক রচনা করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র উক্ত পত্র ও কবিতা পাঠ করিয়া ভারতচন্দ্রের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার নাগাষ্টক হইতে চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতাবৃদ্ধঃপুত্র শিশুরহহ নারী বিরহিনী,
হতাশা দাসাদ্যাশ্চকিতমনসা বান্ধবগণা।
যশঃ শাস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং বিরচিতং
সমস্তং যে নাগো গ্রসতি সবিরাগো।
হরি হরি ॥ (৩)

সমানীতা দেশাদিহ দশভূজা ধাতুরচিতা,
শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূ মূর্ত্তিরতুলা।
দ্বিজাস্তং সেবার্থং নিয়ম বিনিযুক্তা অতিথয়ঃ
সমস্তং যে নাগো গ্রসতি সবিরাগো
হরি হরি ॥৪॥

মহারাজ ক্ষৌণী তিলকমলার্ক ক্ষিতিমণে
দয়ালো ভূপালো দ্বিজ কুমুদজাল দ্বিজপতে।
কৃপা পারাবার প্রচার গুণ সার শ্রুতিধর,
সমস্তং যে নাগো গ্রসতি সবিরাগো
হরি হরি ॥৫॥

অরে কৃষ্ণস্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং,
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তংত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং যে নাগো গ্রসতি সবিরাগো
হরি হরি ॥৬॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই পত্র পাইয়া বর্দ্ধমানের রাণীকে কহিয়া নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দিলেন এবং ভারতচন্দ্রও সুখে কালকর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ভারতচন্দ্র এইরূপে কয়েক বৎসর মূলাযোড়ে বাস করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের তিন পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিত রায়, মধ্যম রাম তনু রায় ও কনিষ্ঠ ভগবান রায়। ভারতচন্দ্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১৬৮২ শকে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি জীবনের প্রথম ভাগে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে কয়েক বৎসর তেমনি সুখী হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি বহুমূত্র রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়েন। বঙ্গদেশে খ্যাত নামা অনেক ব্যক্তিই এইরোগে মারা পড়িয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার প্রথম বহুমূত্র রোগ জন্মিয়াছিল কিন্তু তৎপরে ভগন্দর রোগে মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের ছন্দানুসারে মহিষাসুরের যুদ্ধ বর্ণনা উপলক্ষে সংস্কৃত ও হিন্দি মিশ্রিত বঙ্গভাষায় "চণ্ডীনাটক" নামে একগ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার ভূমিকাও যুদ্ধের আড়ম্বর মাত্র রচনা করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এই গ্রন্থ শেষ করিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু দারুণ পীড়ার কষ্টে তিনি তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলেন না। এই দুঃখ লইয়া তিনি এই পৃথিবী হইতে চিরকালের মত বিদায় লইয়াছেন।

তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ ভগবান রায়ের পুত্র তারকনাথ রায় মূলাযোড়েই বাস করিতেন। এবং তাঁহার বংশধরেরা আজিও উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা তত উন্নত নহে।

শ্রীরজনীকান্ত রায়।

দয়াময়ী।

আমি জানি, তুমি দয়াময়ী। তুমিই আমার প্রাণে প্রথম ঊষার আলোক জ্বালাইয়াছ,—তুমিই আমার দগ্ধ হৃদয়ে স্নেহবারি সিঞ্চন করিয়া প্রেমের ফুল ফুটাইয়াছ—অসার নীরস মরুতে রস সঞ্চার করিয়াছ, দয়াময়ি, এখন তুমি কোথায়? সংসারের বিষার্চ্চিদহনে জীবন যখন কেবল যন্ত্রণার আধার—স্নেহ করিবার কেহ নাই, যত্ন করিবার কেহ নাই,—ভাল কথা কহিবার কেহ নাই, চন্দ্রসূর্য্য যখন স্তিমিতালোক হইয়াছে, অন্ধকারে জনশূন্য সংসারে যখন আমি বিজনবাসী, তখন তুমি আসিয়া আমায় বুকে তুলিয়া লইয়াছ, সযতনে অশ্রু মুছাইয়া দিয়াছ, আর আজ নিদাঘ শুষ্ক পুষ্পগুচ্ছ বারিনিষিক্ত করিয়া—দাবদগ্ধ মাধবীলতায় কুঁড়ি ধরাইয়া দিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গেলে! দারুণ তৃষায়, অতৃপ্ত আশায় তোমার সেই শরদিন্দুবিনিন্দিত নিত্যনবভাবময় মুখখানি দেখিতে চাই—পাই না কেন? কেন তুমি আমাকে
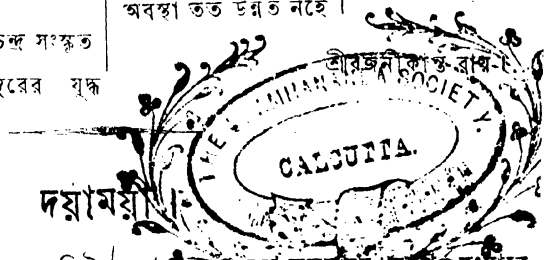
ত্যাগ করিয়া গেলে? প্রথম উষাভাসের স্বপ্নময়ী মধুরতা, সন্ধ্যার শান্তিময়ী পবিত্রতা আমার নাই, আছে—নির্ঝর-নির্গত শৈশব-তরঙ্গিনীর ন্যায়,তরঙ্গভঙ্গোন্মাদ রবিকরের ন্যায় চপলতা। দয়াময়ি, চপলের চপলতা কি আর ভাল লাগে না? আমি ত ছিলাম—আপনার দুঃখের কাহিনী বুকে করিয়া, ভাঙ্গাপ্রাণের হতাশ-কাহিনী হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকাইয়া আপনার অভিমানে আপনি ধীর গম্ভীর আমি ত ছিলাম, কিন্তু দয়াময়ি,কে আমাকে চন্দ্রকর-সুপ্ত-পৃথিবীতে আনিয়া মলয়পবন স্পৃষ্ট করিয়া, মালতীর সুগন্ধ আমার প্রাণে মিশাইয়া, আমার সম্মুখে অতুলজ্যোতিঃ রূপের পশরা খুলিয়া কে আমার হৃদয়ে সুধাসিঞ্চন করিয়া আমাকে গণ্ডূষজলে সফরীবৎ চপল করিয়া তুলিল?

তবু তুমি দয়াময়ী। সংসারের লোক যখন আমায় তুচ্ছতাচ্ছল্য করিত, আমার সহিত কথা কহিতে যখন তাহাদের ঘৃণা জন্মিত, আমার প্রতি নেত্রপাত পর্য্যন্ত যখন তাহাদের লজ্জাস্কর বলিয়া বোধ হইত, তখন তুমি সকলের নিন্দা তুচ্ছ করিয়া, সকলের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করিয়া আমাকে কোলে লইয়াছ। আমাকে বুকে লও, সে কথা আমি বলি না—দয়াময়ি, আমাকে চরণ তলেই ফেলিয়া রাখ, আমার তাহাতেই অতুল সুখ!

তবু ত তোমাকে দেখিতে পাইব! সেই দেবভাবময় স্বর্গীয় জ্যোতিঃক্ষরমাণ চক্ষুদ্বয়, সেই আলুলায়িত কেশভার সংবেষ্টিত মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব শ্রী যে দেখিয়াছে, সে কি আর ভুলিতে পারে? তবুত ভাল করিয়া দেখা হয় নাই। সমষ্টি আমি দেখি নাই, দেখিতে পারি নাই! ব্যষ্টিভাবে যাহা দেখিতাম, তাহাতেই হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত, কত ভাব, কত হর্ষ, কত সুখ, কত দুঃখ, অতীতের কাহিনী,ভবিষ্যতের আশা, বর্ত্তমানের মধুরতা, কত কান্না, কত হাসি, কত ভাব উঠিত, কে বলিবে? আমি আপনিই বুঝিতে পারিতাম না! মনের সে তীব্র গতির সহিত সবার সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে আমি মুহূর্ত্তেই কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইতাম! তাই ভাবিতেছি, আমার ভাল করিয়া দেখা হয় নাই—আমি কি শুধু ছায়া দেখিতেছি? সূর্য্যকর, মেঘস্তর—বায়ুস্তর ভেদ করিতে পৃথিবীতে আসে, আমরা পাই—ছায়া; সূর্য্যের তেজ সম্পূর্ণ রূপে পৃথিবীতে আসিলে পৃথিবী পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত! তাই ভাবিতেছি, দয়াময়ি,তোমার ছায়াতে যদি তুমি এত রূপ, এত গুণের আধার, তোমার কায়াতে কি দেখিব! কিন্তু কৃপাময়ি, তুমি এমন হইলে কেন?

তুমি যাহাই হও—আমার পক্ষে সেই কৃপাময়ীই আছ—জানিনা কোন্ কারণে দেখা দাওনা—

"উত্তমে উত্তমে মিলে অধম অধমে
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে"

তাই কি দেখা দাও না? দেখিব—শুধু চোখে দেখিব, তাহাতেও তুমি কৃপণ কেন? আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে, যে আমাকে দয়ার সাগরে ডুবাইয়া—স্নেহবারি ধৌত করিয়া সৌন্দর্য্যপূত করিয়া লইয়াছে, সেকি

"ধ্বনি খুজে প্রতিধ্বনি প্রাণ খুজে মরে
প্রতিপ্রাণ
জগৎ আপনা দিয়ে খুজিছে তাহার প্রতিদান" এর

মত কেবল প্রতিদান চাহিয়াই বেড়ায়? সে কি স্নেহের ব্যবসায় করে? এ পাপ চিন্তা, দয়াময়ি, ক্ষমা করিও, আমি জানি, আমার হৃদয় জানে, একার্য্য তোমার নয়।

এ কার্য্য তোমার নয়, কেন না, তোমাতে অসীমত্বের চিহ্ন দেখিয়াছিলাম। যাহা জানিয়া ফেলিয়াছি—দেখিয়া যাহার শেষ করিতে পারিয়াছি, সেত স-সীম, তাহাতে আর নূতনত্ব কই? তোমার সেই নিত্যনবভাবময়—নিত্য নব সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট রূপ, আজও তাহা হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত রহিয়াছে; সেই নিত্য নবশোভা দেখিয়াই ত মজিয়াছিলাম! দেখিতাম—দেখিয়া আশা মিটিত না—তৃষ্ণা পূরিত না, তাইত আবার দুঃখময় সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলাম—তাই ত আরার এই শতছিদ্রময় হৃদয়বাঁশী বাজিয়া উঠিল! তোমার সেই নিত্যনবভাব দেখিয়া বুঝিলাম, সৌন্দর্য্য অসীম, আর তুমি অসীমত্বে গঠিত।

তার পর ভাবিলাম—

"বাসনায় মনের জনম
মন সৃষ্টি করে এ শরীর"

এত রূপ যাঁহার শরীরে—লাবণ্য যাঁহার অঙ্গে উছলিয়া পড়িতেছে, তাঁহার মন, দয়াময়ি, তাঁহার মন উচ্চভাবে গঠিত, সে মন কখন নীচভাবে তিষ্ঠিতে পারে না। এ সব জানি, তবু ডাকি,—

"কে তুমি গো উষাময়ি, আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন।
রূপের সাগর মাঝে, কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষীর মতন।
ধীরে ধীরে ওঠ দেখি, একবার চেয়ে দেখি,
স্বর্ণজ্যোতি কমল আসন।
সুনীল সলিল হতে ধীরে ধীরে উঠে যথা
প্রভাতের বিমল কিরণ।"

জানি, রূপের শোভায় দিক্ আলো করে—জানি সে জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়।

"কিন্তু পরদুঃখে যার আঁখি ভাসে জলে
তার সম শোভা আর কি আছে ভূতলে।"

তুমি এই দীনহীন পামর অভাগার জন্যও যখন অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছ, তখন দিবানিশি জ্বলিলেও—কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু অন্ধ হইলেও ডাকিব—দয়াময়ি! দয়াময়ি!!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

বাঁশী।

বাঁশি বাজরে, প্রাণ যে বড়ই অধীর হয়ে উঠ্‌লো, এত করে চেপে চেপে তবু ত তাকে দমন করতে পারিলাম না। যেন সহস্রগুণে আজ উথ্‌লে উঠ্‌ছে। বুকটা ফুলে উঠ্‌ছে, চোখ দুটা জল্‌ছে। যদি চোখ দিয়া দুফোঁটা তপ্ত জল বাহির হ'ত, তাহলে প্রাণের উষ্ণতা কমিত। বাঁশি, তুই একবার বাজ, একবার উদ্দাস্বরে কাঁদ, মনটা একটু খালি হবে, উথলান একটু থাম্‌বে, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হবে। "একবার রাধে রাধে ডাক বাঁশি মন সাধে।" সেই নামটী যতই ডাকি, ততই মিষ্ট,—অমৃ-

তের প্রস্রবণ অজস্র ধারে আসিয়া বর্ষণ করে। যতই খাই ততই চাই, যতই চাই ততই পাই। আমার সব গিয়াছে, কেবল সে নামটী ঘুচে নাই। সে আমাকে চাহেনা, চোখে চোখে দেখা হইলে ভ্রুকুটী ভরে নয়ন তারা কুঞ্চিত হয়, ঠোঁট দুটীর উপর বিদ্রুপের হাসি চপলার মত চমকিয়া যায়, যদি চোখের আগুণে পুড়িয়া মরা সম্ভব হইত, তবে এ যাতনা আর পাইতে হইত না। তবুও তাকে স্মরণ হইলে নয়নে কেন জল আসে, শরীর কেন রোমাঞ্চিত হয়, প্রাণটা কেন শিহরিয়া উঠে? "এখন এখনও প্রাণ সে নামে শিহরে কেন, এখন হেরিতে তারে কেনরে উথলে মন।"

সে দিন গিয়াছে, সে সুখের দিন আর কি মিলিবে না? এখন সে বিদ্রুপের হাসি, ঘৃণার কটাক্ষ, রোষের আরক্ত লোচন আর ভাগ্যে দর্শন হইবে না। এখন সকলি বাতাসে পরিণত হইয়াছে—সব শূন্য, সব শূন্য। প্রাণটা কেন শূন্য হইল না? সেই নামটী, আহা সেই নামটী কেন ভুলিতে পারিলাম না? এক নামের ভিতর তাহার সর্ব্বস্ব কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সেই অলৌকিক রূপ লাবণ্য, সেই অনুপম গুণরাশী, সেই ছটা, সেই মাধুরী, সেই সেই, সেই সব সেই ঐ নামটীর ভিতর সমবেত হইয়াছে। তাই বুঝি কেবল নাম সাধনেই মুক্তি হয়। ঋষিগণ বলিয়াছিলেন, "কলৌ নামৈব কেবলং"। তাই বুঝি যত দিন লোকে নামটী না ভুলিবে, তত দিন তার ভয় নাই, পরিত্রাণের ভরসা আছে, সাধুগণ বলিয়াছেন। সকল সময় সব কথার অর্থ বুঝা যায় না। নিত্য যাহা দেখি, এক সময় তাহারই ভিতর অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়; নিত্য যাহা শুনি, এক সময় তাহার ভিতর অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর মাধুরী প্রতীয়মান হয়; নিত্য যাহা বুঝি, এক সময়ে তাহারই ভিতর অপরূপ ভাবরাশি লহরে লহরে খেলিয়ে উঠে। মানুষের মন সহস্রকাক্ষী নহে, তাই তাহাতে অনেক কথা, অনেক রূপ, অনেক ভাব প্রতিফলিত হয় না। সেই মুখে দর্পণ না ধরিলে সে আলোকটী প্রতিবিম্বিত হয় না; এখন দায়ে পড়িয়া শাস্ত্র কথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম। কিন্তু একটা কথা এখনও বুঝিলাম না। নামে মুক্তি, না নামে প্রাণ লইয়া টানাটানি? মুক্তির নাম কি মৃত্যু? এ যে যাতনা, যেন নামটী ভুলিতে পারিলেই মুক্তি পাই। সে নামে যাতনা বাড়ে, সে নামে প্রাণ কাঁপে। লোকে বায়ুরোগ বলে, বাতুল বলে, সংজ্ঞা-হারা হই, ভদ্রসমাজে অন্যমনস্কতার পরিচয় দিয়া অভদ্র বলিয়া পরিচিত হই। অভদ্র নামে নাকি বড় কলঙ্ক, সাধুরা এ শব্দটা শুনিয়াছিলেন কিনা, জানি না। কিন্তু কলির সাধু অসাধু বলিয়া পরিচিত হইতে সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু অভদ্র বলিয়া পরিচিত হওয়া বড়ই শঙ্কার বিষয়। আমি এই দোষে অভদ্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, ভদ্রসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, গভীর উপত্যকার শালতমালের সাহায্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। যখন মথুরায় রাজা ছিলাম, রাখাল বালকের গোপাল নামে ভয় হইত। এখন রাখালের সুমিষ্ট সংসর্গ আমার ভরসা। নামে আমাকে এমনি

করিল। বনবাস, ভদ্রসমাজ হইতে নির্ব্বাসন, আর প্রাণের এই অব্যক্ত কত যাতনা, এই কি মুক্তির সোপান ? তৃণাদপি নীচতর আমি, কোথায় আমি আর কোথায় তিনি ? আমাদের কি মিলন হইবে ? হইতে পারে ? প্রাণ যে বিশ্বাস করতে চাহেনা। তাই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

বিষের ঔষধ বিষ। সেই নামেই যাতনা, সেই যাতনার নিবৃত্তি সেই নামেই। তাই বলি, বাঁশি ডাক, গলাটা ফাটাইয়া, বুকটা ফুটাইয়া একবার ডাক, রাধে রাধে রাধে। আবার ডাক, রাধে রাধে রাধে। আবার ডাক, আবার ডাক। ডাক্‌তে ডাক্‌তে বুকের রক্ত মুখ দিয়া বাহির হউক, সেই পথে প্রাণবায়ু বহিয়া যাউক, তবেই মুক্তি হইবে, তবেই মৃত্যু হইবে। মৃত্যুটা আংশিক মুক্তি, কলিকালে মৃত্যু না হইলে মুক্তি হয় না। আর নাম না হইলে মুক্তির উপায় নাই। সেই নাম ডাকাতে প্রেমের সাধনা, প্রেমেই মুক্তি ! সেই নামের হুঙ্কারে আর সব চিন্তা,—সংসার চিন্তা, পাপ চিন্তা, অসার চিন্তা, সব চিন্তা দূর হইবে। সেই নাম ডাকিতে ডাকিতে, তেমনি রূপ তেমনি শীল, তেমনি মাধুরী হৃদয়ে উদ্ভূত হইবে। সেই সাধনা করিতে করিতে সময়ে কাল হইলে আমিও তেমনিটী হইয়া যাইব—সিন্ধুজলে বুদ্‌বুদের ন্যায় ফুটিয়া জলের সহিত মিশিয়া যাইব। তাঁহাতে লয় পাইব ! তাই বাঁশি, বার বার বলি, রাধা রাধা বলিয়া প্রাণপণে ডাক।

স্মৃতি পাপ না স্মৃতি পুণ্য ? স্মৃতিতেও বড় যাতনা। যাতনা নামে, যাতনা স্মৃতিতে। তবে কি যাতনা না হইলে মুক্তি হয় না ? তবে লোক পূর্ব্ব জন্মের কথা বিস্মৃত হয় কেন ? কিছুইত বুঝি না। কেবল বুঝি যে, বড় যাতনা পাইতেছি। সেই দিন, সেই দিন, আর সেই দিন, সেই সব সুখের দিনের কথা যত স্মরণ হয়, ততই কষ্ট হয়। সেই সুখের দিন ভুলিলে সুখ ভুলিয়া দুঃখকেই সুখ বলিয়া ভ্রম করি, নরককে স্বর্গ বলি, দেবত্ব বিস্মৃত হই, তাই বুঝি স্মৃতি দেবদূত আমাকে ছাড়ে না। স্মৃতিই দেবতা, স্মৃতিই ঈশ্বর, স্মৃতিই বিশ্বরূপ। কে বলে ঈশ্বর নিরাকার ?

"ওহে সনাতন, সত্যনিরঞ্জন কোন্ জন
তোমায় বলে নিরাকার,
ওহে বিশ্বরূপ, তুমি রসকূপ তব ভিন্নরূপ
রূপ আছে কার ?
মীনরূপে হরি কভু ভাস জলে, ক্ষীণরূপে
তুমি বেড়াও ভূমণ্ডলে,
দিনমণিরূপে গগণ মণ্ডলে, নিশাকররূপে
হর অন্ধকার।"

আমার স্মৃতিও বিশ্বরূপ। সেই চন্দ্রমা, সেই নক্ষত্র, সেই পর্ব্বত, সেই উপত্যকা, সেই নির্ঝরিণী, সেই লতাবল্লী, আর ঘোর মায়া স্বরূপ সে কুয়াসা, বিচ্ছেদ সময়ে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া চির দিনের জন্য তাঁহাকে দুর্লক্ষ্য করিল—সে সকলি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। যাতনায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। সুরূপ কুরূপ যার মুখ দেখি, সেই মুখখানি মনে পড়ে; যার স্বভাব দেখি, সেই প্রকৃতি মনে পড়ে ; ফুল ফল যা দেখি তাঁকেই মনে পড়ে। ফুল ফোটা বৃন্দাবনেই শোভা যায়, মথুরায় কেন ফুল ফুটিবে ? মথুরায় কেন যমুনা বহিবে ? রাস রসিকা রাধিকা যেথানে নাই, সেথানে মল্লিকা মালতী,

কুহুস্বর ও ভ্রমর গুঞ্জন অনর্থক। যেখানে বনমালা পরাইবার কেহ নাই, সেখানে বনফুল ফুটিবে কেন? সরসী-সোভিত কমল দল, নীল মেঘের নীচে, নীল পাতার মাঝে, নীল জলে ঢল ঢল ঢল ঢল করে, এ শোভা কার জন্য? পৃথিবী জনশূন্য হউক, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র নিবিয়া যাউক, সমীরণের গতি বন্ধ হউক, স্বর্গ নরক হউক, ঈশ্বর নির্ব্বাণ লাভ করুন, প্রেতের ন্যায় এই মহা শ্মশানে আমি একাকী বিচরণ করিব, অতীত শূন্য, ইতিহাসশূন্য, স্মৃতি শূন্য, ভবিষ্যৎশূন্য, আশাশূন্য, প্রাণশূন্য কঙ্কালময় এ জীবনের এখন একান্ত প্রার্থনা। নাম প্রেম সাধনা সকলের পরিণাম, আমার জীবন এখানে। অভিসম্পাৎ ভিন্ন মুখে কিছু নাই, দুর্ব্বাসা তুমিই ঋষিপুঙ্গব।

নরকের কীট নরক ভালবাসে। আঁধারের পেচক অন্ধকার চায়। আমি নিরবন্ধু, তাই জগৎ প্রাণী শূন্য চাহিতেছি। নিরীশ্বর তাই চাই, কেহ যেন তাঁহাকে পায়না। যখন হৃদয়ে প্রীতি ছিল, তখন ফুল ফলে দেবপূজা করিয়া সার্থক হইতাম, পৃথিবীতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতাম, অধিকতর সৌন্দর্য্যের প্রয়াস করিতাম। আবার যদি দিন পাই, তেমনি পূর্ণিমা, তেমনি ফুল, তেমনি যমুনা, তেমনি বনমালা অনুসন্ধান করিব। শ্মশানে শস্য সম্ভব, আশা করিব।

আমার নাহি কি? বামে কুব্জা সুন্দরী, মথুরার রাজ্যপাট, পুত্রসম প্রজাগণ, ধন গৌরব সকলি ত আছে। তবে এত অভাব কিসের? আমার প্রকৃতির অভাব। রাসেশ্বরী রাধিকা আমার প্রাণসর্ব্বস্ব, রাধা শূন্য হইয়া আমি সর্ব্বস্ব-হারা হইয়াছি। আমি শক্তি-উপাসক, রাধিকা আমার আদ্যাশক্তি। রাস রসিকা রাধিকা ভিন্ন আমার মুরলীর কে আদর করিবে? কোন্ রন্ধ্রে কোন্ ধ্বনি বাজে, আর কে জানে? কোন্ ধ্বনির কোন্ অর্থ, আর কে বুঝে? সে রাধিকা নাই, তবে মুরলী বাজাইয়া কি হইবে? আমার প্রাণ শীতল হইবে, উষ্ণতা কমিবে, তুফান থামিবে। তাই বলি, মুরলি, বাজ বাজ, রাধে রাধে বলিয়া মন সাধে ডাক।

কিন্তু মুরলী বাজিল কই? বাঁশরী বাজাতে চাহি, কিন্তু বাঁশরী বাজিল কই? বধিরের জন্য সঙ্গীত নহে, রাধিকা ভিন্ন আর কাহার জন্য মুরলী নহে। সভ্য ভব্য বৈজ্ঞানিক নায়িকার জন্য মুরলী নহে। রসাল শ্যামল বৃন্দাবনে মুরলীর জন্ম, রাধিকার জন্য তাহার বাদ্য। সেই রাধিকা যখন নাই, তখন মুরলী বাজিবে কেন? তাহার দোষ-গুণ আর কে বুঝিবে? তাই মুরলী বাজিল না। যে পথে রাধা গিয়েছে, সেই পথে আমার মুরলী গিয়াছে। আমিই বাজাতে চাই, আর তোমরাই বাজাইতে বল, আমার মুরলী আর বাজিবে না। এজন্মের মত সে বিদায় লইয়াছে। শ্যাম নন্দনবনে রাধিকার পার্শ্বে বসিয়া আর একদিন বাজাইব, সেদিন দেব নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর সকলে মুগ্ধ হইবে। চল বাঁশরি, ভব লীলা সাঙ্গ হইল, তুমি আর আমি এখন দুজনে একা, সেই যমুনাতীরে চির দিবসের জন্য সর্ব্ব ছাড়া হাকি। আর কথা কহিব না, এখন ফিরিয়া চল।

বুকের বেদনা নিবিও না, যত শীঘ্র পার বুকটা থাক কর। চক্ষু ফুটিও না, কেন দুফোঁটা অপব্যয় করিব? মুছাইবার কে আছে? চির দিন তুষানলে জ্বলিতে থাক। প্রমিথিউসের বন্ধন কর্ম্মফল—ঘুচিবার নহে, দিনে নিশীথে শয্যায় গিরি-পথে, নগরে বা বনবাসে, নির্জ্জনে বা স্বজনে "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ"।

"বল্‌তে হরি নাম গাইতে গুণগ্রাম, অবিরাম নেত্রে বহে অশ্রুধার—কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার"—আমি এ প্রেম চাহিনা, ইহাও নিম্নশ্রেণী।

সে রসে রসিক হইবে রসনা
জাগিতে ঘুমাতে ঘোষিবে ঘোষণা
কবে হবে যুগল মন্ত্রে উপাসনা
বিষয় বাসনা ঘুচিবে আমার?
পরশমণি কবে করিব পরশন
লৌহ দেহ মম হইবে কাঞ্চন
কতদিনে হবে কষ্ট বিমোচন
জ্ঞানাঞ্জনে হবে লোচন আঁধার?

নিম্নশ্রেণীর সাধক এম্‌নি প্রেমকে আদর্শ করে। আমার প্রেমের চূড়ান্ত—স্তম্ভন ও কম্পন। চোখে চাহিয়া থাকিব, পলক পড়িবে না, বুক ফুলিবে, নিশ্বাস বহিবেনা। দেখিতে চাহিব না, ছুঁইতে চাহিব না, অকাতরে যাতনা সহিব, মুখে নামটীও ফুটিবে না। যদি কেহ অকস্মাৎ কর্ণগোচর করে, প্রাণ সংজ্ঞা হারাইবে। কে যাবে? এই পথে চলিয়া আইস।

শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা (৬ষ্ঠ প্রস্তাব)

(বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার)

বঙ্গদেশে যে সকল গ্রন্থকার প্রাদুর্ভূত হইয়া, বঙ্গদেশকে স্ব স্ব বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের প্রভাবে গৌরবান্বিত করিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যের সবিশেষ অঙ্গপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবত্রয়ে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবের অনুবৃত্তি ক্রমে বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাসাধ্য সঙ্কলন পূর্ব্বক নব্যভারতের পাঠক ও পাঠিকাবর্গকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গ্রন্থকারগণের রচিত গ্রন্থ বিবরণ প্রদান করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। বহু আয়াসে এবং পরিশ্রমেও আমরা বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকারগণের যথোচিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। তাঁহাদের মধ্যে কে কোথায় কোন্ সময়ে অভ্যুদিত হইয়া স্ব স্ব বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে সমস্ত বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থ ভিন্ন জানিবার অন্য উপায় নাই। সেই অতিসংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ পরিচয়ে অনেক সময়ই সন্তুষ্টি লাভ করা যায় না। অনেকে আবার এতদূর নম্র ও বিনয়ী ছিলেন যে, স্বরচিত গ্রন্থের প্রারম্ভে কি শেষভাগে অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা দূরে থাকুক, স্বকীয় নাম পর্য্যন্ত লিখি-

তেও লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতেন। আমরা বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন হইয়াও অনেক সময়ে ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের নিকট স্ব স্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান মানসে অনধিকার চর্চ্চা করিয়া থাকি, যে ভাষা না জানি বা যে গ্রন্থ চক্ষে দর্শন না করিয়া থাকি—টীকা টিপ্পনীতে সেই অজ্ঞাত ভাষার অদৃষ্ট ও অপরিচিত গ্রন্থের নাম লিখিয়া আমাদের পাণ্ডিত্যের অপরিমেয়তা প্রদর্শন করি এবং অবসর পাইলেই অপরের গ্রন্থ সমালোচনা কালে গুরুগম্ভীর স্বরে আমাদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া সেই পরিবাদ হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করি, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে অন্যের লিখিত ভাব ও ভাষা চুরি করিয়া মাননীয় লেখকের প্রতিও বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি প্রদর্শন করিতে ছাড়ি না। ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, কথায় কথায় সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে কার্লাইল, মিল, স্পেন্সর, মেকলে, প্রেসকট, লায়েল প্রভৃতি স্বনামখ্যাত গ্রন্থকারগণের প্রণীত ইতিহাস, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক দুরূহ গ্রন্থাবলী প্রমাণস্থলে উপস্থাপিত করিয়া অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি, সংস্কৃত না জানিয়াও দুরূহ এবং দুর্ব্বোধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদের সহিত প্রচার করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইতেছি, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির লিখিত মত পাঠ করিয়া তাঁহারই সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিতেছি। মহাভারত ও রামায়ণের সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে বাল্মীকি ও ব্যাসের অন্যতরকে দণ্ডার্হ চোর সাব্যস্ত করিতেছি। সময় সময় আমরা শ্রদ্ধাস্পদ লেখক চূড়ামণিদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিতে যাইয়া তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে তিরস্কারপূর্ব্বক যশোলিপ্সার অসঙ্গত কণ্ডূয়নে আত্মহারা হইতেছি। কিন্তু বহুসম্মানেই পূর্ব্বতন গ্রন্থকারগণ প্রকৃত পাণ্ডিত্যের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া ও সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া, আত্মাভিমান প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, আত্মগোপন পুরঃসর স্ব স্ব চরিত্রের উদারতা ও মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। সময়ের কি পরিবর্ত্তনশীলতা! বর্ত্তমান সুসভ্যতার কেমন অদ্ভুত মাহাত্ম্য!

আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি ও পারিব, তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে যে সকল অসম্পূর্ণতা ও ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইবে, অনিচ্ছাসম্ভূত বলিয়া পাঠকবর্গ তাহা মার্জ্জনা করিবেন। পণ্ডিতকুলতিলক মাননীয় ডক্তার শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় বহু আয়াসে ও পরিশ্রমে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, বৎসর বৎসর খণ্ডশঃ সংস্কৃত হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণ (Notices of Sanskrit Mss.) নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন, প্রবন্ধ সঙ্কলন বিষয়ে তাহাই আমাদের প্রধানতম অবলম্বন। স্থানে স্থানে আমরা সংস্কৃত শ্লোক আমাদের লিখিত কথার প্রমাণস্থলে উপস্থিত করিয়া প্রদর্শন করিব। সময়ক্রম অবলম্বন পূর্ব্বক গ্রন্থকার ও তদ্‌রচিত গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ সম্ভবপর নহে বিধায়, আমরা সেই দুরাশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। তবে যতদূর জানিতে পারি, গ্রন্থকারদিগের সময় অবধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

উমাপতিধর উপাধ্যায়, মৈথিলাক্ষ সংস্থা-

পয়িতা রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সভাসদ ও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেন ১১০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় হন। জয়দেব স্বপ্রণীত গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে লক্ষ্মণসেন দেবের সভাসদ যে পঞ্চ কবিরত্নের উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়াছেন, * উমাপতি সেই পঞ্চরত্নের অন্যতম কবি। ইঁহার রচিত একখানি শাসনলিপি বিদ্যমান আছে। উপাধ্যায় উপাধি দৃষ্টে ইঁহাকে মিথিলাবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। মহাভারতের পারিজাতহরণ প্রসঙ্গ গ্রহণ করিয়া উমাপতি পারিজাত-হরণ নামক নাটক রচনা করিয়াছেন।

রত্নপতি মিশ্রের পুত্র উমাপতি মিশ্র উপাধ্যায় গৃহস্থদিগের অবশ্যানুষ্ঠেয় আচার বিষয়ে আচার-বারিধি নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে ৮৬৮টী শ্লোক আছে। পদার্থীয়-দিব্যচক্ষু নামক ন্যায়-গ্রন্থও এই উমাপতি মিশ্র কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। এই পূর্ব্বোক্ত মিথিলাবাসী উমাপতিদ্বয় এক ব্যক্তি কি না, বলিতে পারি না।

গোবর্দ্ধন আচার্য্য সেনবংশীয় রাজা পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্মনসেন দেবের সভাস্থিত পঞ্চরত্নের অন্যতম। ইনি আর্য্যাছন্দে স্তুতি নীতি ও শৃঙ্গাররসাদি নানা বিষয়ে সপ্তশতী কাব্য রচনা করেন। গোবর্দ্ধন সৎ কবি ছিলেন। তাঁহার রচনা সরল ও মধুর। জয়দেব গোবর্দ্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। গ্রন্থের নামানুসারে বোধ হয় যে গোবর্দ্ধন সাতশত শ্লোকে সপ্তশতী প্রণয়ন করেন। কিন্তু কোন কোন হস্তলিখিত পুস্তকে ৭৩৯ ও ৭৪৩টী, এমন কি ১০৪২টী শ্লোক পর্য্যন্ত দেখা যায়। ঢাকা কালেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা অক্ষরে এই কাব্য মুদ্রিত করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বপ্রকাশিত কাব্যসংগ্রহে সংস্কৃত অক্ষরে ইহা পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্যের উদয়ন ও বলভদ্র নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। গোবর্দ্ধন এই উভয় ভ্রাতার প্রতিই স্বরচিত সপ্তশতী কাব্য সংশোধনের ভার প্রদান করেন।

উদয়নবলভদ্রাভ্যাংসপ্তশতীশিষ্যসোদরাভ্যাংনঃ
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাংপ্রকাশিতানির্ম্মলীকৃতা।
বিরচন্ বামনশীলাং বামন ইবকবিপদং লিপ্সুঃ
অকৃতার্য্যাসপ্তশতীমেতাংগোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ।৭৩১

গোবর্দ্ধন পাঠক—১৩৯৬ (আচন্দ্রার্কক্ষ-কাস্তাদ্, রস-নব-হুতভুক্-চন্দ্রসংখ্যা শকাব্দে) শকাব্দে উত্তরবঙ্গের সত্যখাঁ নামক জনৈক ক্ষুদ্র হিন্দু জমীদারের আদেশক্রমে প্রায় নয় হাজার শ্লোকে পুরাণ-সর্ব্বস্ব নামক বিস্তীর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। পুরুষোত্তম প্রণীত আর একখানি সুবৃহৎ পুরাণ-সর্ব্বস্ব নামধেয় পুস্তক বিদ্যমান আছে। তাহাতে ৮৩০০ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য খাঁর পিতার নাম শুভরাজ খাঁন বলিয়া অনুমিত হয়।(?)

শ্রীমদ্ গৌড়মহীপতি-পতি-প্রাপ্ত প্রসাদোদয়ঃ
পুণ্যাঃ প্রাক্তনকর্ম্মণোঽতিপদ*শ্রীখানাঙ্কিতা।**
পশ্চাৎ শ্রীশুভরাজখান-পদবী লব্ধা ধরামণ্ডলে
জীয়াদ্ ধর্ম্মধুরন্ধরঃ কুলধরো ধীরো গভীরো গুণৈঃ॥

* গীতগোবিন্দ—প্রথমখণ্ড, ৪১ পৃষ্ঠা।

পুরাণ-সর্ব্বসমিদং প্রযত্নাদকারি গোবর্দ্ধন-
পাঠকেন।
মনোরমং পুণ্যবতাং জনানাং শ্রীসত্যথানস্য
যশঃপ্রধানং ॥*

গোবর্দ্ধন নামা জনৈক বঙ্গবাসী গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ মিথিলাবাসী নৈয়ায়িক কেশবমিশ্রের কৃত তর্কভাষা নামক ন্যায়-গ্রন্থের 'তর্কানুভাষা' নাম্নী টীকা রচনা করেন। আমরা মৈথিল গ্রন্থকারগণের বিবরণ প্রদান কালে কেশবমিশ্র প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের নাম ও বিষয় নির্দ্দেশ করিব। এই গোবর্দ্ধনের পিতার নাম বলভদ্র। বিশ্বনাথ ও পদ্মনাভ নামে তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিল। গোবর্দ্ধন তাঁহার ভ্রাতা পদ্মনাভের নিকট তর্কশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন।

শ্রীবিশ্বনাথানুজ-পদ্মনাভা—
নুজো গরীয়ান্ বলভদ্রজন্মা।
তনোতি তর্কান্ অধিগত্য সর্ব্বান্
শ্রীপদ্মনাভাদ বিদুষো বিনোদান্ ॥

গোবর্দ্ধন দাস বৈদ্য কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি গোপাল দাসের পুত্র বৈদ্যকুলোৎপন্ন কবি গঙ্গাদাসের বিরচিত ছন্দো-মঞ্জরীর টীকা রচনা করেন। গোপাল দাস ও গঙ্গাদাস উভয়েই নানা কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী সংস্কৃত ছন্দঃ বিষয়ে অতি

---

*গোবর্দ্ধন ভট্ট নামক মৌলিকুলোদ্ভব জনৈক গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন গিরি উত্তোলন বিষয়ক প্রস্তাব অবলম্বন পূর্ব্বক অষ্টাদশ শ্লোকে গোবর্দ্ধন ভট্টাষ্টক নামে স্তোত্র কাব্য রচনা করেন। ইঁহার পুত্র রঘুনাথ ভট্টের ঔরসে ও জানকী দেবীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ নামে দুই জন গ্রন্থকার জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভট্ট (১) শুদ্ধি[illegible]কা নামক স্মৃত বৃত্তদীপিকা, কারকবাদ ও স্ফোটচটক নামে বাদার্থ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তিনি এইরূপে পরিচয় দিয়াছেন।

তর্ক-ব্যাকৃতি-মীমাংসা পরিশীলনশালিনা।
মৌলি শ্রীকৃষ্ণ-ভট্টেন বিভক্ত্যর্থো বিরচ্যতে।
(কারকবাদ)

পিত্রোঃ পাদযুগং নত্বা জানকী রঘুনাথয়োঃ।
মৌলি শ্রীকৃষ্ণ ভট্টেন তন্যতে স্ফোটচটক ॥
(স্ফোটচটক)

(২) রঘুনাথ সূরির তনয় অপর এক কৃষ্ণভট্ট কর্তৃক নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক চূড়ামণি গদাধর ভট্টাচার্য্যের কৃত শক্তিবাদ নামক বাদার্থ গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রণীত হয়। এই 'শক্তিবাদ বিবরণ'-প্রণেতা কৃষ্ণ ভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নারায়ণ সূরি ভট্ট।

(৩) অপর এক কৃষ্ণশর্ম্মা যজ্বা প্রণীত পদমঞ্জরী নামক ভক্তিরসাত্মক কাব্য নবদ্বীপের সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত স্বর্গীয় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে বিদ্যমান আছে। ইহা হরির স্তুতি বিষয়ে পূর্ণ। ইহাতে ২৪১টী শ্লোক আছে।

জয়কৃষ্ণ ভট্ট পূর্ব্বোক্ত গোবর্দ্ধন ভট্টের পৌত্র। তিনি ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত কৌমুদী ব্যাকরণের সুবোধিনী নাম্নী টীকা রচনা করেন। ইঁহার পুত্র আত্মারাম ভট্ট কাত্যায়নীয় কল্পসূত্রের কর্ক উপাধ্যায় প্রণীত ভাষ্যের টীকা রচনা করেন। ইহা ভিন্ন আরও কয়েক জয়কৃষ্ণ সংস্কৃত সাহিত্যের অঙ্গ বিস্তার সাধন করিয়া গিয়াছেন। জয়কৃষ্ণ শর্ম্মা শব্দার্থসারমঞ্জরী নামে বাদার্থগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত এই নামে আরো এক খানি বাদার্থগ্রন্থ আছে।

আলোক্য বিবিধগ্রন্থং বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
কৃতেয়ং জয়কৃষ্ণেন শব্দার্থসারমঞ্জরী।

জয়কৃষ্ণ দাস কায়স্থ ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি "পরিচারক-সৎকুল-প্রসূত" বলিয়া বিরচিত গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকের শেষভাগে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রণীত অজামিলোপাখ্যান, বামনচন্দ্র-চরিত্র, গোবর্দ্ধনধৃত কৃষ্ণচরিত্র, প্রব-

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কেদার ভট্ট প্রণীত বৃত্ত-রত্নাকর নামক ছন্দোগ্রন্থের স্বপ্রণীত টীকার সহিত গঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জরী পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকাশিত ও মুদ্রিত করেন। বৈদিক ছন্দ বিষয়ে একখানি স্বল্পায়তন ছন্দোমঞ্জরী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে পরিরক্ষিত হইতেছে।

গঙ্গাদাসকবেঃ কবের্মধুরলিহঃ সংকল্পকল্পক্রমান্
নির্ম্মাতা সুমনোবিলাসজননী যা ছন্দসাং মঞ্জরী।
সাস্মাকং বশগা কথং ভবতি ভো, শিষ্যাস্মুরোধাদিত
শ্রীগোবর্দ্ধনদাসনাম ভিষজৈঃ প্রারম্ভি তৎপঞ্জিকা॥

চরিত ও প্রহ্লাদচরিতামৃত নামক পদ্যময় স্তোত্রগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রাগুক্ত পঞ্চগ্রন্থে যথাক্রমে ১৮০, ২০০, ১০০, ১৮০ ও ১৮০টী শ্লোক আছে। তৎপ্রণীত বামনচরিত্রের শেষে জয়কৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

পরিচারকবংশজন্মনা জয়কৃষ্ণেন কৃতা স্তবাত্মিকা।
বটুবেশপটাইরেমুর্দে রচনা স্বীক্রিয়তাং মহাত্মভিঃ॥

জয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য গদ্যপদ্যময় দায়দীপ নামক দায়াধিকার সম্বন্ধে স্মৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জয়কৃষ্ণ তর্কবাগীশ কর্ত্তৃক বিরচিত শ্রাদ্ধদর্পণ নামে স্মৃতিগ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। শেষোক্ত চারি জয়কৃষ্ণই বঙ্গদেশবাসী ছিলেন।

গোবর্দ্ধন দীক্ষিত ত্রিপাঠী নামক জনৈক গ্রন্থকার অগ্নিষ্টোমযাগের অনুষ্ঠান বিষয়ে "সপ্তসোমসংস্থাপদ্ধতি" রচনা করেন। ভট্ট ও ত্রিপাঠী গোবর্দ্ধন বঙ্গদেশীয় নহেন বলিয়া অনুমিত হয়।

জয়দেব গোস্বামী সেনবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলজাত প্রথম লক্ষ্মণসেন দেবের পঞ্চরত্নের অন্যতম। ইহা জয়দেব স্বরচিত গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রারম্ভেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জয়দেব সম্বন্ধে নবজীবন পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অভিমত নানা স্থান হইতে এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। চিন্তাশীল, সহৃদয় ও ভাবুক অক্ষয় বাবু এ সম্বন্ধে যে অভিমত অতি দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকদিগকে জয়দেবের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য তাহা আদ্যোপান্ত অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।* "জয়দেব গোস্বামী কৃত গীতগোবিন্দে বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের রাগমার্গের কাব্যময় পরম ও চরম স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। ভক্তিমার্গের পূর্ণ অবতার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এই রাগমার্গ অবলম্বন করিয়া বঙ্গে পূর্ণভক্তির অবতারণা করেন। ইহাতে (গীতগোবিন্দে) রাধাকৃষ্ণের রহস্যকেলি নির্দ্দিষ্ট বস্তু; তাহাতে হলাদিনীময়ী মহাপ্রকৃতিতে মহাপুরুষের নিত্য অনন্ত অবিরামলীলা উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যমুনা যমভগিনী, কাল-সহচরী। এই বিশ্ব ব্রজভূমির পাদস্পর্শ করিয়া করাল স্রোত লইয়া কাল-সহচরী নিত্য প্রবাহিতা। তাহাতে পুরুষ প্রকৃতির লীলা রহস্যময় বৃন্দাবনের মাধুর্য্যই উদ্ভাসিত হইতেছে। ভগবানের মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যলীলা বর্ণনই গীতগোবিন্দ। সেই সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের মহা প্রেমরসের বিচারে গীতগোবিন্দ পূর্ণ। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—

---

* নবজীবন, [illegible]

ধর্ম্মের এই তিন প্রসিদ্ধ পন্থা। যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের পন্থা মুখ্যরূপে অনুসরণ না করিয়া, কেবল ভক্তি পন্থারই অনুসরণ করেন, এবং রহস্যময় এই বিশ্বব্রজলীলার অনুধ্যানরূপ উপাসনা করিতে অনুরাগী, তিনিই গীতগোবিন্দ গ্রন্থের অধিকারী। একান্ত মনে সাত্ত্বিকভাবে ভগবানের মাধুর্য্যময়ী লীলার চিন্তা করাই অনুরাগ-পন্থাচারী ভক্তের উপযুক্ত উপাসনা—জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের এই উপদেশ।"

"সেনরাজগণের সময় হইতে বর্ত্তমান বঙ্গদেশ। আধুনিক বঙ্গ আট শত বৎসরের। আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতিকাব্যের প্রভূত আধিপত্য। ইহার সাহিত্য সঙ্গীতময়; ইহার কাব্য সঙ্গীতময়, ইহার আমোদ আহ্লাদ, বিলাস কৌতুক সকলেই সঙ্গীত; ধ্যান, ধারণা, কীর্ত্তন, ভজন,—সঙ্গীতে; ক্রন্দন কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। স্বভাবের সৌন্দর্য্যবোধের উচ্ছ্বাস, আর সেই সৌন্দর্য্য উপভোগের উল্লাস, দুঃখের হৃদয়দ্রাবী ক্রন্দন, আর ক্রন্দনের পর নিবেদন, আর সুখ দুঃখ সকল সময়েতেই ভক্তিভরে ভগবানের ভজন—এই পঞ্চোপকরণে বাঙ্গালীর গীতিকাব্য। এই গীতিকাব্যই বাঙ্গালীর নিত্য জীবন এবং ধারাবাহিক ইতিহাস। এই অনন্তচারিণী, সুখ দুঃখ ভক্তিবাহিনী সুরধনী গীতিকবিতার অমৃত ধারার হরিদ্বার ক্ষেত্র,—জয়দেব গোস্বামী। গীতিগোবিন্দ বাঙ্গালীর গীতিকাব্যের অপূর্ব্ব পুণ্যতীর্থ।"

"জয়দেব প্রভৃতি বঙ্গে যেরূপ ভক্তিক্ষেত্র স্থাপনা করেন, সেইরূপ এক অভিনব সাহিত্য ও সঙ্গীত ক্ষেত্রও সংস্থাপন করেন। জয়দেবের ভাষা, জয়দেবের ছন্দ, জয়দেবের পদবিন্যাস পদ্ধতি এবং সঙ্গীতরীতি আর পাঁচটা জিনিসের সংঘর্ষণ পাইয়া ক্রমে ক্রমে এই ছন্দবন্ধময়ী, পদ-লালিত্য সমন্বিত, সঙ্গীত-জীবন বঙ্গভাষা সৃষ্টি করিয়াছে। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা। বাঙ্গালা পদ্যের ছন্দ প্রধানত দুইটী, পয়ার ও ত্রিপদী। জয়দেবের গীতগোবিন্দে ঐ দুই ছন্দের পূর্ব্বাভাস সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।"

"বাঙ্গালার কীর্ত্তনাঙ্গ সঙ্গীতনায়কগণের নিকট বড় আদরের জিনিস, অথচ সাধারণের হৃদয়গ্রাহী। এরূপ হৃদয়দ্রাবিনী করুণা-গীতি জগতে আর আছে কি না, জানিনা। এই কীর্ত্তনের পরিচিত আদিগুরু—জয়দেব গোস্বামী। কোরাণের ভাষার মত, জয়দেবের কীর্ত্তন চির দিনই অনুকরণীয় এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় রহিয়াছে। জয়দেবের পদাবলী আজি আটশত বৎসর ধরিয়া, সমানে একই ভাবে গীত হইতেছে। আর কোন সঙ্গীতকারের এমন শুভাদৃষ্ট হইয়াছে কিনা, জানিনা। বেদের সামগীতি ও David's psalms সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া গীত হইতেছে বটে, কিন্তু সে সকল মানবজাতির অত্যাদ্ভুত স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক বিকাশ এবং মানবহৃদয়ের আশ্চর্য্য উচ্ছ্বাস হইলেও, সঙ্গীত নহে। তালের খেলা, তানের লীলা, যন্ত্রযোগে সুর-সঙ্গতি, দ্রুত-বিলম্বিত গতি—এ সকল তাহাতে নাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কিন্তু রাগে, তালে, সুরে, লয়ে ভোরপুর।"

"জয়দেব হইতে যে কেবল বঙ্গের কীর্ত্তনাঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে, এমন নহে, পাঁচালি প্রভৃতিও জয়দেবের অনু-

করণে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাঙ্গলার আদি পাঁচালি বলিলেও চলে। ইহাতে ছড়া (শ্লোক), গান, ধূয়া (ধ্রুপদ), অন্তরা ঠিক পাঁচালির মতনই আছে। ঐরূপ ছড়া, গান, ও ধূয়া মিশ্রিত কোনরূপ ধরণ যে জয়দেবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।"

"গীতগোবিন্দের বার আনা ভাগ সখী-সংবাদ। জয়দেবের সখীসংবাদের প্রায় অর্দ্ধেক বসন্ত ও বিরহ বর্ণন। সুতরাং এদিকেও দেখা যায়, জয়দেব হইতেই সখীসংবাদের ভাব ভঙ্গী এবং বিরহের উপকরণ অনুকৃত, আকৃষ্ট ও সংগৃহীত হইতেছে।"

"বাঙ্গালার কি কীর্ত্তন, কি পাঁচালি, কি যাত্রা, কি কবি,—অল্প বিস্তরে কোন না কোন বিষয়ে, জয়দেব গোস্বামীর কাছে সকলেই ঋণী। এখনও বঙ্গের গীতি-সাহিত্য সেই মহাজনের দ্বারস্থ, তাঁহার নিকট পদানত।"

"জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশাল সংস্কৃত-সাহিত্যের সহজলভ্য সুন্দর নমুনা ও নিকটস্থ পন্থা। জয়দেবের ললিত কোমল কান্ত পদবিন্যাসের গুণে চির-প্রসিদ্ধ উপমাসকলও নব কলেবর ও নব রস ধারণ করে। জয়দেবের কবিত্বগুণে কাব্যের চিরপ্রসিদ্ধ, চিরপরিচিত, চির-ব্যবহৃত, পুরাতন সাধন সকল, বসন্তে পুরাতন-প্রায় শীতশুষ্ক জগতের ন্যায়, নবজীবন্ত হইয়া উঠে।"

"জয়দেবের রাগমার্গ অবলম্বনে বঙ্গে ভক্তিমার্গের অবতারণা হয়। বঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্মের আদিগুরু জয়দেব গোস্বামী। বঙ্গের সাহিত্য জগতে জয়দেব আদিগুরু। তিনি গীতিকাব্যের কল্পতরু। তাঁহা হইতেই গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আমরা জয়দেবের নিকট চির ঋণগ্রস্ত, তিনি আমাদের মহাজন। বঙ্গের ধর্ম্ম জগতে জয়দেব কোমলকর চন্দ্রমা, চৈতন্যদেব প্রদীপ্ত সূর্য্য।"

জয়দেব গোস্বামীর মাতার নাম বামা-দেবী, পিতার নাম ভোজদেব। গীত-গোবিন্দের শেষে তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামদেব্যাত্মজ-শ্রীজয়-দেবকস্য।
পরাশরাদি-প্রিয়বন্ধুকণ্ঠে, শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু ॥
(দ্বাদশসর্গ. ২৮ শ্লোক)

ইনি পদ্মাবতী নাম্নী পরমা সুন্দরী ও পতিব্রতা রমণীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন। ভোজদেব আদিশূরানীত কান্য-কুব্জবাসী পঞ্চ-ব্রাহ্মণের একতমের সন্তান ও অপেক্ষাকৃত কুলমান সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত স্বরচিত জয়দেবচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন। রজনী বাবু জয়দেব-চরিতে জয়দেবের সময় নির্ণয় করিতে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে জয়দেবের প্রাদুর্ভাব সময় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (১) ইতিহাসবেত্তা মহামতি এলফিনষ্টোন্ স্বপ্রণীত ভারত-ইতিহাসে, জয়দেবকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [illegible] জয়দেব ও বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের [illegible] [illegible]ক। সুতরাং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ, কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর [illegible]

তাঁহার উৎপত্তিকাল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। ইহা রজনী বাবুর নিজের মত। (৩) অধ্যাপক লাসেনের মতে জয়দেব খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধৈকাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (৪) চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন, জয়দেব বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক। এই শেষোক্ত মতই সুসঙ্গত ও বিশ্বাস্য। জয়দেব-জীবনী সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক উপন্যাস ভক্তমাল ও ভক্তিবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। গীতগোবিন্দ সার উইলিয়ম জোন্স ও কবিবর আর্ণল্ড কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায়, লাসেন্ কর্ত্তৃক ল্যাটিন ভাষায়, রুকার্ট কর্ত্তৃক জার্ম্মেন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ইহা হিন্দী ভাষায়ও কোন অজ্ঞাতনামা অনুবাদক কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি রসময় দাস ইহা বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিদ্যাভূষণ টীকা, বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ, জয়দেবের জীবনী ও সমালোচনা সমেত একখানি উৎকৃষ্ট গীতগোবিন্দ কলিকাতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

কাব্যকলাপ সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ বোম্বাই নগরে, শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও ভুবন চন্দ্র বসাথ কলিকাতায় সটীক গীতগোবিন্দ সংস্কৃত অক্ষরে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করেন।

কলিঙ্গদেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিতে কর্ণাটদেশীয় গায়কগণ কর্ত্তৃক ও বল্লভাচার্য্যের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক কার্ত্তিক মাসের একাদশ দিবসে জয়দেবের গীতগোবিন্দ তানলয়সুর সংযোগে গীত হইত। কাশ্মীর রাজ শ্রীহর্ষের ক্রম সরোবর ভ্রমণ সময়ে গীতগোবিন্দ গীত হইত বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে।

গীতগোবিন্দগীতানি মত্তঃ শ্রুতবতঃ প্রভোঃ।
গোবিন্দভক্তিসংসিক্তো রসঃ কোঽপ্যুদভূত্তদা॥
(শ্রীধর পণ্ডিত কৃত তৃতীয়-রাজ তরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের ৪৮৬ শ্লোক)

পণ্ডিতকুলতিলক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বপ্রণীত "সংস্কৃত-সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের" ৪১ পৃষ্ঠায় জয়দেব গীতগোবিন্দের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। জয়দেব বৈষ্ণব ছিলেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধা কৃষ্ণের লীলা গীতগোবিন্দে বর্ণন করিয়াছেন। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল, ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিতপদ বিন্যাস, শ্রবণ মনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায় কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃত

কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনিই তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।”

পাঠকগণ দেখিলেন, গীতগোবিন্দ কীদৃশ রসময় ও চিত্তাকর্ষক কাব্য। এক্ষণে আমরা গীতগোবিন্দের যে কয়েক খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব। রূপ গোস্বামীর পরবর্ত্তী চৈতন্য দাস নামক জনৈক বৈষ্ণব গ্রন্থকার ইহার বালবোধিনী নাম্নী টীকা রচনা করেন। অপরিজ্ঞাত নামা লেখক রচিত অপার এক খানি বাল বোধিনী-টীকা আছে। নারয়ণ পণ্ডিতের পদ-দ্যোতনিকা, শ্রীকান্ত মিশ্রের পদভাবার্থ-চন্দ্রিকা, রামতারণ চূড়ামনির গীতগোবিন্দ মাধুরী, এবং গোপাল চক্রবর্ত্তীর অর্থ রত্না-বলী নাম্নী টীকা পাওয়া গিয়াছে।* শেষোক্ত টীকাকার মাত্র স্বপ্রণীত গ্রন্থে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোপাল চক্রবর্ত্তীর পিতার নাম দুর্গাদাস, মাতার নাম রূপবতী। ইঁহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। হিরণ্য, শিব, জ্ঞান ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে টীকাকারের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ। তিনি ১৫০৯ (?) শকের মাঘমাসের রবিবারে এই টীকা সমাপ্ত করেন।

আসীদ্ বন্দ্যকুলোজ্জ্বলো গয়ঘড়ী ধীমান্-
হিরণ্যাভিধ
স্তৎসূনুঃ শিব ইত্যভূৎ, শিবসুতো জ্ঞানা-
হ্বায়োঽভূত্ততঃ।
দুর্গাদাস ইতি প্রমোদবসতি, স্তস্যাঙ্গজো
যঃ কৃতী
গোপালঃ কিল, তেন নির্ম্মলধিয়া টীকা
কৃতেয়ং মুদা॥

নবাঙ্কবাণেন্দুমিতে শকাব্দে
মাঘে মাসৌ চণ্ডকরস্য বারে।
টীকামিমাং রূপবতী-তনূজো
গোপালশর্ম্মা ব্যতনোৎ সমগ্রাং॥

গীতগোবিন্দের টীকা প্রণয়নে যেমন অনেকে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহার অনু-করণে তেমন আবার অনেকে কাব্য ও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বম্ভর পাণি * চন্দ্রদত্ত নামে মিথিলাবাসী কবি এবং কালিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত গ্রন্থাবলীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। চন্দ্রদত্ত মিথিলা দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সটীক বীরবিরুধ ও শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী, এবং কাশী-গীত নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র পরি-পূর্ণ। শেষোক্ত গ্রন্থে শিবলীলা ও কাশী মাহাত্ম্য ৩৫৪ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। বীরবিরুদে ১৩২টী শ্লোক আছে। শ্রীকৃষ্ণ বিরুদাবলীর গদ্যপদ্যময়, ইহার আদি দৃষ্টে ইহাকে বীরবিরুদ হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলীর শেষে—

এষা মৈথিল-চন্দ্ররচিতা কৃষ্ণস্তুতি র্যদ্যপি
কাব্যলঙ্কৃতি-বর্জ্জিতাপি সুধিয়াংসৎকার
মেবাইতি।
যদ্ভক্ত্যা জগদীশ্বরস্য চরিতং শ্রুত্বাপ্যসদ
ভাবয়া
হর্ষাশ্রু প্রতিরুদ্ধ গদ্গদগির স্তামেব সৎ
কুর্ব্বতে॥

কাশীগীতের তৃতীয় শ্লোকটী এই—

যদি হরস্মরণে সরসং মনো

---

* রাজা মানাঙ্ক গীতগোবিন্দের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইনি কোন্ দেশীয় বলিতে পারিনা।

কবীনাং মত্মালোক্য সতাঞ্চ সুখবৃদ্ধয়ে।
কৃতা টিপ্পনিকা সুখ্যা মানাঙ্কেন মহীভুজা।

যদি বিবেককলাসু কুতূহলং।
সদুপদেশ মহেশ কথাপথং
শৃণু তদা কিল মৈথিল ভারতীং।

ইহা গীতগোবিন্দের তৃতীয় শ্লোকের ছত্রে ছত্রে আক্ষরিক অনুকরণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

অবসান।

প্রকৃতি, স্থির যৌবনে, সদা সুধাময়ি,
মনে কি পড়েলো তোর,
জীবন প্রভাত মোর ?—
অভগ্ন আনন্দ সেই ত্রিভুবন জয়ী ?
নয়নে কপোলে আসি,
যে রাগ খেলিত ভাসি,
তরুণ অরুণ শোভা ছিল কি গো তত ?
মধুপেতো মধুরতা,
—সেই ছুটো আধ কথা,
বিহগ কাকলি কভু ললিত কি অত ?
যাময় ব্রহ্মাণ্ড বুকে,
খেলিতাম কত সুখে ;
স্নেহের পুতলী যবে ছিনু সবাকার !
চুম্বন, আদর, হাসি,
—যত কোমলতা রাশি—
পাইতাম যবে শুধু তারি উপহার !

মনে আছে ? সে উচ্ছ্বাস,
যৌবনের অট্টহাস,
সেই চারু প্রফুল্লতা সদা বুক ভরা ?
সমুদ্র তরঙ্গ মত,
উছলিত অবিরত,
সে উদ্যম, সে উৎসাহ, জিনিবারে ধরা ?
সতত সন্দেহ শূন্য,
অশ্রান্ত, প্রবাহপূর্ণ,
বিশ্বময় অনুরাগ ; পড়ে কি তা মনে ?

অনন্ত জ্ঞান পিপাসা,
অক্ষয় অচল আশা,
এত ছিল, কোথা গেল—জান কি ললনে ?
আজিও অরুণ ফোটে,
আজিও সমীর ছোটে,
আজিও বিহগ কণ্ঠ, জগৎ মাতায় ;
শৈশব-সারল্য ভরা
আজিও প্রভাতে ধরা,
স্মরিয়া কাঁদে গো কবি জীবন সন্ধ্যায় !

আজো জোছনায় আলা,
তটিনী তরঙ্গ মালা,
উছলিয়া ঝিকি মিকি নাচিয়া বেড়ায় !
যুবতীর চারু অঙ্গ
ছেয়ে ছেয়ে যে তরঙ্গ,
অনঙ্গ প্রেমের খেল দেখাত আমায় ;
সে রূপ বিকাশ কই ?
আমি যেন আমি নই !
আহা রে আকাঙ্ক্ষা তোরা পালালি কোথায় ?
উর্ম্মির আঘাতে ঘন,
করি ভীম গরজন,
অইরে সাগর বক্ষ, উথলে অকূলে ;
নির্জ্জীব অসাড় প্রাণে,
আমি আজি এইখানে !
প্রকৃতি, বলগো শুনি, গিয়াছি কি ভুলে

আমার সে নবোদ্যম ?
তেজভরা সে বিক্রম ?
সংসার সেবার তরে সে দীক্ষা অটল ?
সে অসীম ভালবাসা,
সে প্রমত্ত লুব্ধ আশা,
সেই পরদুঃখে ক্লিষ্ট নয়নের জল ?

তোমার বাসন্ত প্রাণে,
প্রকৃতি, অযুত তানে
ফুটুক অযুত গীতি, কিছু দুঃখ নাই।
নবীন জলদ মালা,
কোলেতে লোয়ে চপলা,
ধরিয়ে মল্লার তান, ছুটুক সদাই ;
শিখি পুচ্ছে অনুপম,
রাখাল গোপাল সম,
যক্ষের নয়নানন্দ রূপে মনোহর,
অথবা ফুটুক শোভা,
তাহে মোর ক্ষোভ কিবা ?
ফোটরে শরত চন্দ্র, উজলি অম্বর।
আমার গিয়াছে যাহা,
প্রকৃতি, পাবনা তাহা ;
অবশেষ—মর্ম্ম দাহ, অনন্ত ক্রন্দন :—
এই শেষ ভিক্ষা আছে,
প্রকৃতি, তোমার কাছে,
দয়া কোরে দিও তাই এই নিবেদন !—
যুবক যুবতী যারা,
মোহমগ্ন, সংজ্ঞাহারা,
প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনার,
তারা যেন দেখে চেয়ে,
সুধা বোলে বিষ খেয়ে,
কেমনে শুকায়ে গেল জীবন আমার।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

চৈতন্য-চরিত ও চৈতন্য-ধর্ম্ম। (১৭শ)

(নিত্যানন্দের ব্যাস পূজা)

ব্যাসপূজার অধিবাস রজনীতে নিত্যানন্দ শ্রীবাস গৃহে শয়ন কক্ষে শয়ান। গভীর রজনীতে হঠাৎ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া কি মনে করিয়া হুঙ্কার শব্দ করতঃ পার্শ্বস্থিত নিজ দণ্ড কমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং কাহাকে কিছু না বলিয়া পূর্ব্ববৎ শুইয়া থাকিলেন :—

"কতরাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া ;
নিজদণ্ড কমুণ্ডল ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।"

কি কারণে তিনি আপন সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্ন বিনাশ করিয়া ফেলিলেন; তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নিতাই কি ভাবিলেন যে, প্রেম ভক্তি না থাকিলে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা ভণ্ডামি মাত্র ? অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ ভগবদিচ্ছার অনুগত নহে ?— তাহা কে বলিবে ?

বৃন্দাবন দাস মহাশয় তাঁহার একজন বিশ্বাসী শিষ্য ও তদ্গত প্রাণ, তিনিই ইহার তথ্য নির্ণয়ে যখন অসমর্থ, তখন আর কে তাহা বলিতে পারিবে ?

"কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র অগম্য !
কেন ভাঙ্গিলেন নিজ কমুণ্ডল দণ্ড।"

প্রত্যুষে উঠিয়া শ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর রামাই পণ্ডিত নিতাইয়ের শয়ন কক্ষের প্রকোষ্ঠের দ্বারে ভাঙ্গা দণ্ড কমুণ্ডল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া স্বীয় অগ্রজকে তদ্বিষয় অবগত

করিলেন। পণ্ডিত আবার ঐ কথা গৌরের কাণে তুলিলেন। গৌরের কাণে তুলিলে গৌর আসিয়া ভাঙ্গা কমুণ্ডল ও দণ্ড খণ্ড লইয়া, নিতাইকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ! একি?" নিত্যানন্দ ভাবাবেশে মগ্ন; গৌরের কথায় কোন উত্তর না দিয়া কেবল খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বম্ভর ভক্তগণ সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন এবং স্বহস্তে সেই দণ্ড কমুণ্ডল গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিলেন।

"শ্রীবাসাদি সবাই চলিলা গঙ্গাস্নানে;
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে।"

সদলে গৌরচন্দ্র গঙ্গা স্নান করিতেছেন; নিতাই বাল্যভাবে বিভোর; খুব সাঁতার দিতেছেন। মাঝ গঙ্গায় সাঁতার দিয়া কুম্ভীর ধরিতে অগ্রসর এবং জলক্রীড়ায় কত মত চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছেন। সঙ্গীগণ নিষেধ করিলে একগুণের স্থানে দশগুণ দুষ্টামি করিতে লাগিলেন। কেবল গৌরের তাড়নায় কিছু কাল স্থির হইতেছিলেন। অবশেষে গৌরচন্দ্র কহিলেন, "শ্রীপাদ গোঁসাই! তোমার যে আজ ব্যাস পূজার দিন; কখন পূজা হইবে? ব্যাস পূজার কথা মনে হওয়ায় নিতাই জল হইতে উঠিয়া এক দৌড়ে শ্রীবাসালয়ে আসিয়া হাজির। এ দিকে গৌরচন্দ্র ও আর আর ভাগবত জন ও একে একে আসিয়া জুটিলেন। ব্যাস পূজার সামগ্রী সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইলে ভক্তদল মৃদু মধুর সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত পূজার আচার্য্য হইয়া সুন্দর এক ছড়া বনফুলের মালায় গন্ধ লেপন করত, নিতাইর হাতে দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, নিতাই, এই মালা স্বহস্তে লইয়া আমি যে বচন বলি তাহা উচ্চারণ করত বেদব্যাসের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া নমস্কার কর। স্বহস্তে মালা দিবার বিধি আছে; নইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না।

"সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত
করিলা সকল কার্য্য বিধি যে বিহিত।
দিব্যগন্ধ সহিত সুন্দর বনমালা;
নিত্যানন্দ হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা।
শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর!
বচন পড়িয়া বেদব্যাসে নমস্কার।
শাস্ত্র বিধি আছে মালা আপনে সে দিবা;
ব্যাস তুষ্ট হইলে সর্ব্ব অভীষ্ট পাইবা।"

নিত্যানন্দ ভাবাবেশে ভোর হইয়া কি ভাবিতেছেন, পণ্ডিতের কথায় তত মনোযোগ নাই, বচন পড়া দূরে থাকুক, মালা গাছটী হাতে করিয়া কেবল 'হয়' 'হয়' বলিতে ও চারিদিকে শূন্য চক্ষে চাইতে লাগিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শাদা শিদে উদার রকমের লোক; ভিতরকার গূঢ় ভাব না বুঝিতে পারিয়া গৌরচন্দ্রকে বলিলেন; তোমার শ্রীপাদ গোঁসাই মন্ত্র পড়িয়া ব্যাস পূজা করিতেছেন না।—

"প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।
না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার॥"

শ্রীবাসের কথায় বিশ্বম্ভর, নিত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "শ্রীপাদ! পণ্ডিতের কথা শুনিতেছ না কেন? মালা দিয়া বেদব্যাসকে প্রণাম কর। নিতাই সম্মুখে বিশ্বম্ভরকে দেখিয়া একবার এ দিক ওদিক তাকাইলেন এবং তাঁহার কথার উত্তর না করিয়া মালা গাছটী একবারে তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিলেন।

"দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর,
মালা তুলি দিল তাঁর মস্তক উপর।
চাঁচর চিকুর মালা শোভে অতি ভাল;
ছয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল!
শঙ্খচক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মূষল;
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা নিতাই বিহ্বল।"

মালা অর্পণ করিলে বিশ্বম্ভর নিতাইকে ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। কথাটা অতি অদ্ভুত। অন্য দর্শকবৃন্দ ঐ রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন পরিষ্কার বর্ণনা দেখা যায় না। তবে গ্রন্থকার নিজেই কথাটীর অলৌকিকত্ব অনুভব করিতে পারিয়া দোষ ক্ষালনার্থে প্রস্তাবান্তরের অবতারণা করিয়াছেন। নিত্যানন্দের মূর্চ্ছা দেখিয়া গৌরচন্দ্র স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া মূর্চ্ছাপনোদন করিতে লাগিলেন:—

"মূর্চ্ছা গেলে নিত্যানন্দ ষড়ভুজ দেখিয়া
আপনি চৈতন্য তোলে গায়ে হাত দিয়া।
উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত;
সংকীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত।"

তখন নিত্যানন্দ চেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া মহানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই ব্যাপারের এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন যে, নিত্যানন্দ হৃদয়ে অনন্তের ভাবে ভগবদ্ভক্তি আরূঢ়, তাঁহার পক্ষে ষড়ভুজ দর্শন কোন্ আশ্চর্য্য কথা?

"ছয়ভুজ দৃষ্টি তানে সে কোন্ অদ্ভুত;
অবতার অনুরূপ এ সব কৌতুক।
রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈল;
প্রত্যক্ষ হইয়া আসি দশরথ নিল।
সে যদি অদ্ভুত হয় এ তবে অদ্ভুত!
নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক।"

একথার সূক্ষ্ম মীমাংসার ভার পাঠক মহাশয়ের উপর দেওয়া গেল। যে হৃদয়ে অন্তর্যামী যে রূপে আবির্ভূত হইবেন, বস্তু তত্ত্ব নির্ণয় তাঁহার নিকট তদনুরূপ হইবে। আমাদের ইহাতে কোন কথা বলা উচিত নয়।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

ব্যাস পূজা সাঙ্গ হইলে গৌরচন্দ্রের আদেশে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল; মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল; গৌর নিতাই দুই ভাই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গলা ধরাধরি করিয়া নাচিতে লাগিলেন; শচীমাতা শ্রীবাসের অন্দর প্রকোষ্ঠে থাকিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া মহা আনন্দিতা হইলেন এবং মনে মনে উভয়কেই তাঁহার আত্মজ জ্ঞানে স্নেহ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ভক্তগণ কেহ নাচিতে, কেহ গাইতে, কেহ বাজাইতে উন্মত্ত, কেহ কেহ অচৈতন্যাবস্থায় ভূমি শায়িত,আর কোন কোন ভাগ্যবান বা ভক্ত দলের পদরজতে গড়াগড়ি পাড়িতে লাগিলেন।

"সবা প্রতি মহা প্রভু বলিয়া বচন;
পূর্ণ হৈল ব্যাস পূজা করহ কীর্ত্তন।
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত।
চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ ধ্বনি আচম্বিত।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঁই;
মহামত্ত দুই জন কারও বাহ্য নাই।
সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল;
ব্যাসপূজা মহোৎসব মহা কুতূহল।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়;
সবেই চরণ ধরে যে যাহার পায়।"

নৃত্যকীর্ত্তনে দিবা অবসান হইল দেখিয়া

বিশ্বম্ভর কীর্ত্তন ভঙ্গ করিতে আদেশ দিলেন। সকলে সুস্থির হইয়া বসিলে গৌরচন্দ্র শ্রীবাস পণ্ডিতকে ব্যাসোদ্দেশে আহরিত নৈবেদ্যাদি আনিতে বলিলেন এবং ঐ সকল দ্রব্য আনীত হইলে স্বহস্তে উপস্থিত ভক্ত দলকে বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন। এই রূপে সেদিনকার কৌতুক নিবৃত্ত হইল।

"ঠাকুর পণ্ডিত প্রতি বলে বিশ্বম্ভর;
ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর।
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব উপহার;
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার।
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ;
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ।
যতেক আছিল যেই বাড়ীর ভিতরে;
সবারে ডাকিয়া প্রভু দিল নিজ করে।
এইমত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে
নবদ্বীপে হয়; নাহি জানে সর্ব্ব লোকে।"

অদ্বৈত আগমন।

গৌরের ভক্তদল দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও সংকীর্ত্তনের জমাটে নবদ্বীপ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু এই আনন্দ বাজারে অদ্বৈতকে না দেখিয়া বিশ্বম্ভর দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, যেদিন বিশ্বম্ভরের মহা ভাবের অচৈতন্যাবস্থায় অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার পাদ পূজা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য গদাধর কর্ত্তৃক তিরস্কৃতও হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে গৌরকে তিনি অন্যচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ণরূপে তাঁহার অবতারত্বে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিবার জন্য হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শান্তিপুরের বাটীতে চলিয়া যান। তদবধি আর নবদ্বীপে আইসেন নাই।

একদিন গৌরচন্দ্র মহা সমাধিতে ভগবানের সহিত অভিন্নযোগে যুক্ত হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই রমাইকে শান্তিপুরে যাইয়া নিত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা বলিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে সস্ত্রীক নবদ্বীপে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন যে, রামাইয়ের প্রতি আদেশ ছিল যে, পূজার আয়োজন লইয়া অদ্বৈত আসিয়া যেন তাঁহাকে পূজা করেন। রামাই শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে আচার্য্য প্রথমতঃ তাঁহার কথায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'হাঁ! ভগবানের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই যে, তিনি নবদ্বীপে কতকগুলা লোকের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন? বল দেখি কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে যে,নবদ্বীপে ভগবান্ অবতীর্ণ হবেন?

"কোথা বা গোঁসাই আইলা মানুষ ভিতরে?
কোন্ শাস্ত্রে বলে নদীয়ার অবতারে?"

বড় উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া অদ্বৈত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; রামাই তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কথায় উত্তর দিলেন না। ক্ষণকাল পরে আচার্য্য প্রকৃতিস্থ হইলে রামাই বলিলেন যে—"এখন ওরূপ বলিলে হইবে কেন? ভক্তিশূন্য জগতে ভক্তি প্রচার করিবার জন্য যে তখন কত সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন, তাকি মনে নাই? আজ সেই ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়া ঘরে ঘরে ভক্তি বিলাইতেছেন, এখন উদাসীন হইয়া থাকিলে চলিবে কেন?" অদ্বৈতাচার্য্য কিছু সন্দিগ্ধ ব্যঞ্জক দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলেন "দেখ রামাই! আমাকে তিনি যাইতে বলিয়াছেন; আমি যাইব

কিন্তু সত্য সত্যই তিনি যদি সেই হন, যাঁহার জন্য কঠোর সাধ্য সাধনা করিয়াছি, তবে তিনি যে ঐশ্বর্য্য আমাকে দেখাইবেন, যাহা আমার মনে জাগিতেছে। এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ মহা উত্তেজিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"আর সত্য সত্য আমার এই পলিত-কেশ মস্তকে স্বীয় পাদ পদ্ম উঠাইয়া দিবেন। ইহা যদি পারেন তবে তাঁহাকে আমি আপন প্রাণনাথ বলিয়া প্রতীতি করিতে পারি, নচেৎ নহে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আচার্য্যের অধর, ওষ্ঠ, ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। অদ্বৈত আবার বলিতে লাগিলেন—"রামাই, তুমি অগ্রসর হও, আমি সস্ত্রীক তোমার অনুগমন করিব ও গোপনে যাইয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকিব। সাবধান, তুমি একথা বিশ্বম্ভরকে বলিবে না; তাঁহাকে বলিও যে অদ্বৈত আসিলেন না। দেখি, আমাকে তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন কিনা?"

"গুপ্তে থাকোঁ মুই নন্দন আচার্য্যের ঘরে
না আইল বলি তুমি কহিবা গোচরে।"

রামাই তথাস্তু বলিয়া চলিয়া গেলেন; অদ্বৈতও নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী হইয়া সস্ত্রীক নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন এবং নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কথাটা একটু প্রাণে আঘাত দিতেছে। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক; আমাদের আদর্শ অনুসারে সাধুজীবনের সাধুতা দেখিতে ইচ্ছা হয়। অদ্বৈতাচার্য্য একজন মহা সাধু; তবে তিনি কেমন করিয়া রামাই পণ্ডিতকে অসত্য কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন? আর রামাইও একজন ভক্ত, তিনিই বা অদ্বৈত আসিবেন না, এই মিছা কথা বলিয়া গৌরকে ভুলাইতে কেন স্বীকৃত হইলেন? তবে কি অদ্বৈতের নবদ্বীপ আগমনের বৃত্তান্ত মধ্যে যে সকল অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী সময়ে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব স্থাপনে অভিলাষী ভক্তগণের মনের বিশ্বাস ও আবেগ, প্রেম-ভক্তির রঙ্গে প্রতিফলিত করিয়া ছবিখানিকে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে? হইলেও হইতে পারে।

শ্রীবাসালয়ে প্রমত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, গৌরচন্দ্র পূর্ণ মাত্রায় ভাবে বিভোর হইয়া মৌনাবস্থানে বসিয়া আছেন, ভক্তদল তাঁহার আবেশ চিত্ত বুঝিয়া চারিদিকে চুপ করিয়া আছেন, এমন সময় গৌরসিংহ হুঙ্কার করিয়া এক বারে পণ্ডিতের বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিলেন, নিত্যানন্দ নিকটে ছিলেন, তিনি অমনি তাড়াতাড়ি একটী ছত্র লইয়া গৌরের মস্তকে ধরিলেন, আর গদাধর কর্পূর ও তাম্বূল দিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র স্বানুভবানন্দে মাথা ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

"নাঢ়া আইসে, নাঢ়া আইসে বলে বারবার।
নাড়া চাহে মোর ঠাকুরালি দেখিবার॥"

এই সময়ে রামাই পণ্ডিত শান্তিপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিশ্বম্ভরকে প্রণাম করিলেন। পণ্ডিত কিছু না বলিতেই আবিষ্ট গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন,—"কি রামাই, নাঢ়া বুঝি আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়াছে ও আপনি নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া আছে? আর

পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, এখন তুমি যাও, তাঁহাকে ডাকিয়া আনো গে।” রামাই নন্দন আচার্য্যের গৃহে যাইয়া সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে অদ্বৈত সস্ত্রীক আসিয়া গৌরের সভায় উপনীত হইলেন এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার বোধ হইল, বিশ্বম্ভর মহা জ্যোতির্ম্ময় ভূষণে ভূষিত হইয়া বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, চারিদিকে মহা জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ যেন তাঁহার স্তুতি বন্দনা করিতেছে। অনন্ত আপনি ছত্র ধারণ করিয়াছেন ও চারিদিকে যেন দেবোৎসব হইতেছে। অদ্বৈতের স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া গৌরচন্দ্র প্রসন্নচিত্তে বলিতে লাগিলেন,—“আচার্য্য! কি দেখিতেছ? তোমারই কঠোর আরাধনায় আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, জীবের দুঃখ আর থাকিবে না। আর চারিদিকে এই যে ভক্তদল দেখিতেছ, ইহারা সকলেই দেবাংশে আবির্ভূত হইয়াছেন।” কথিত আছে যে, অদ্বৈতের তখন আর অবিশ্বাসের কারণ থাকিল না; তখন প্রেমে, আনন্দে ও আশ্চর্য্যে বিহ্বল হইয়া “নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায়চ; জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ” শ্লোক আবৃত্তি করত বৃদ্ধ আচার্য্য গৌরের চরণতলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত হইয়া পড়িলেন, আর বিশ্বম্ভর কি করিলেন? এত দিন যাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, ঈশ্বর ভাবে মগ্ন হইয়া একেবারে তাঁহার মাথায় পা দুখানি তুলিয়া দিলেন, আর ভক্তদল একেবারে জয় জয় ধ্বনি করিয়া একটা তুমুল আন্দোলন করিয়া তুলিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্রখানি অতিরঞ্জিত, পাঠক মহাশয়! অতি সাবধানে ইহার তত্ত্ব নির্ণয় করিবেন।

বিশ্বম্ভর আদেশে কীর্ত্তন আরম্ভ হইলে গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলেন, বৃদ্ধ আচার্য্য তখন প্রেমে ভোর পূরা, সুতরাং নানারূপ অঙ্গভঙ্গীতে নাচিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তদল হাসিয়া অস্থির হইলেন। গৌর তখনও বিভোর, অদ্বৈতকে বলিলেন—“আচার্য্য? কিছু বর লও!”

আচার্য্য উত্তর করিলেন, “আর কি বর চাহিব? যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহাপেক্ষা অনেক বেশি পাইলাম।”

বিশ্বম্ভর। “তবু আর কোন অভিলাষ কি নাই?”

অদ্বৈত। আছে! একটী নিবেদন আছে। প্রেমভক্তি বিলাইতে বসিয়াছ, আমার প্রার্থনা এই যে, স্ত্রী, শূদ্র, মূর্খ, চণ্ডাল প্রভৃতি লোকদিগকে, জাতি বিদ্যা ও ধন মদে মত্ত লোকগুলা সর্ব্বদাই ঘৃণা করে ও পীড়া দেয়, প্রেমভক্তি দিতে হলে আগে তাহাদেরই দিও। পাপিষ্ঠগুলা দেখুক যে, ভগবানের নিকট ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই।

বিশ্বম্ভর। এই ত কথা! আচ্ছা তাহাই হইবে।

এই মতে নানা রূপ রঙ্গ ভঙ্গীর পর গৌরচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন, সকল গোল চুকিয়া গেল, নিত্যানন্দের সঙ্গে অদ্বৈতের পরিচয় হইল এবং তদবধি অদ্বৈতাচার্য্য সস্ত্রীক নবদ্বীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বিদ্যানিধি বা প্রেমনিধি।

এক দিন সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া

বিশ্বম্ভর 'বাপরে পুণ্ডরীক, বন্ধুরে! তোমাকে কবে দেখিব ?' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্ডরীক নাম ধরিয়া বুঝি প্রভু কাঁদিতেছেন। ক্ষণকাল পরে গৌরের ভাবাবেগ উপশমিত হইলে কোন কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আজ আমাদের মনে এক সন্দেহ হইয়াছে, কৃপা করিয়া তাহা ভঞ্জন করুন।"

বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসা করিলেন,কি সন্দেহ ?

প্রশ্নকর্ত্তা কহিলেন, আজ আবেশ সময়ে একটী নূতন নাম শুনিয়াছি, পুণ্ডরীক বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। পুণ্ডরীক কে তা'হা কি আমরা জানিতে পারি না ?

বিশ্বম্ভর।—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম ধন্য করিবার জন্য ঈশ্বর ইচ্ছায় বিপ্র কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি মহা প্রেমিক ও বিশ্বাসী। গঙ্গার মাহাত্ম্যে তাঁর এত দূর বিশ্বাস যে, পাদস্পর্শ হইলে অপরাধ হইবে ভয়ে তিনি গঙ্গাজলে স্নান করেন না, আর লোকে পরম নির্ম্মল গঙ্গা জলে কুল্য, দন্তধাবন প্রভৃতি অনাচার করে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এতই ব্যথা হয় যে, ঐ সকল মলিন কার্য্য দর্শনের ভয়ে দিবা ভাগে গঙ্গা দর্শন করেন না। এখন তিনি চাটিগ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। শীঘ্রই এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁহার পরিচ্ছদ ব্যবহারাদি ঘোর বিষয়ীর ন্যায়, দেখিলে হঠাৎ ভক্ত বলিয়া চেনা যায় না। তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তোমরা সকলে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আন দেখি ? এই বলিয়া গৌরচন্দ্র উপসংহার করিলেন।

"প্রাচ্যভূমি চট্টগ্রাম ধন্য করিবারে ;
তথা তাঁর অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে।
কৃষ্ণভক্তি সিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর ;
অশ্রু কম্প পুলকে বেষ্টিত কলেবর।"

এদিকে বিদ্যানিধি মহাশয় ভক্ত প্রার্থনায় ও দেবাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নবদ্বীপে গঙ্গাস্নানে আসিবার জন্য সমুৎসুক হইলেন এবং বহুবিধ দাসদাসী দ্রব্য সামগ্রী লইয়া একজন মহা ধনাঢ্য ভোগীর ন্যায় যাত্রা করিয়া যথা সময়ে নবদ্বীপে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা গৌরের ভক্তদল কেহই জানিতে পারিলেন না। কেবল মাত্র মুকুন্দ সে সম্বাদ জানিয়া অপ্রকাশিত রাখিলেন। বিদ্যানিধি ও মুকুন্দ দত্ত এক গ্রামে জন্মিয়াছেন ও উভয়ে বাল্যবন্ধু। সে কারণে মুকুন্দের কাছে ঐ সংবাদ অপ্রচারিত থাকিল না। গদাধর পণ্ডিত মুকুন্দের হৃদয় বন্ধু, পরস্পরের নিকট পরস্পরের কোন কথা লুকান থাকিত না, কাজেই মুকুন্দ গদাধরকে ঐ সংবাদ না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মুকুন্দ বলিলেন, "গদাধর! আজ তোমাকে এক শুভ সংবাদ দি ; কয়েক দিন হইল নবদ্বীপে এক জন অদ্ভুত বৈষ্ণব আসিয়াছেন। যদি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল, দেখিয়া কৃতার্থ হইবে।"

গদাধর পণ্ডিত বাল্য কাল হইতে সংসারে বিরক্ত মহা ভক্তি-পিপাসু। বৈষ্ণব দর্শনের কথা শুনিয়া মহা আনন্দ সহকারে "চল তবে যাই" বলিয়া গমনে উদ্যত হইলেন। দুই বন্ধুতে তখন শুভ যাত্রা করিয়া বিদ্যানিধির প্রবাস বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধর বৈষ্ণব

দর্শনের কথা শুনিয়া প্রত্যাশা করিয়া ছিলেন যে, একজন উদাসীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইবেন; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যখন দেখিলেন যে, বহু দাস দাসী দ্রব্য সামগ্রীতে প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ ও বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত বৈঠকখানা উজ্জ্বল করিয়া একজন রাজপুত্রের ন্যায় পরম যুবা পুরুষ বসিয়া আছেন, তখন তাঁহার আশ্চর্য্যের পারসীমা থাকিল না। একবার মনে করিলেন যে, "এ ব্যক্তি সে বৈষ্ণব না হইতে পারে।" পরে যখন মুকুন্দদত্ত এই "পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়" বলিয়া পরিচয় করিয়া দিলেন, তখন আর ব্যক্তিত্বের প্রতি সন্দেহ থাকিল না, কিন্তু মনে করিলেন, তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, সে জন্য মুকুন্দ বুঝি তাঁহার সঙ্গে রহস্য করিয়াছেন। গদাধর বিদ্যানিধির সজ্জা আসবারের এইরূপে পারিপাট্য দেখিতেছেন ঃ—

"বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়।
দিব্য খট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে;
দিব্য তিন চন্দ্রাতপ তাহার উপরে।
তাহে দিব্যশয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে,
পট্টনেতে বালিশ শোভয়ে চারিপাশে।
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটা পাঁচ সাত;
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান তাত।
দিব্য আল বাটী দুই শোভে দুই পাশে;
পান খান; গদাধর দেখি দেখি হাসে।
দিব্য ময়ূরের পাখা সেই দুই জনে;
বাতাস করিতে আছে দেখি সর্ব্বক্ষণে।
কি কহিব মোরা কেশ ভারের সংস্কার;
দিব্য গন্ধ আমলকী বহি নাই আর।
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা;
বিজয়ীর প্রায় যেন সকল শোভনা।"

বিদ্যানিধি মহাশয় গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইনি কে?'

মুকুন্দ উত্তর করিলেন, "এই গ্রামবাসী মাধব মিশ্র মহাশয়ের পুত্র, নাম শ্রীগদাধর; ইনি বালক কাল হইতে সংসারে বিরক্ত ও ভক্তি পথের পথিক। তোমার নাম শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।"

গদাধর নীরবে প্রণাম করিয়া বসিলেন, ও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "ভালত বৈষ্ণব দেখিতে আসিয়াছি; এ যে দেখছি একজন ঘোর বিষয়ী; শুনিয়া ছিলাম বটে যে, ইনি একজন পরমভক্ত, কিন্তু দেখছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

মুকুন্দ দত্ত গদাধরের মনের ভাব কতক বুঝিতে পারিয়া তাঁহার ভ্রম দূর করিবার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। মুকুন্দ বড় সুগায়ক; ভাগবতের পুতনা বধাধ্যায়ে ছলনা-রূপিনী রাজসী পুতনা কালকূট দিয়া কৃষ্ণের প্রাণ সংহার করিতে চাহিয়াও ভগবানের অপার করুণাগুণে মাতৃপদ লাভ করিয়া মুক্তা হইয়াছিল, ইত্যাদি যে শ্লোক বর্ণিত আছে, তাহা সুমধুর স্বর সংযোগে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধি ভক্তি যোগের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন; নয়ন যুগল দিয়া সানন্দ-ধারা বহিয়া যাইতে লাগিল; ক্রমে কম্প, স্বেদ, পুলক, হুঙ্কার ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি মহা-ভাবের লক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল; এবং 'বোল বোল' করিতে করিতে বিদ্যানিধি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন; ও হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন; কোথাকার দ্রব্য

সামগ্রী কোথায় গেল ; লাথি ও আছারের চোটে সব দ্রব্য ভাঙ্গিয়া খান চুর হইয়া গেল। সে সুন্দর কেশ দাম ধুলায় লুটাইতে লাগিল ; পরিধেয় বহুমূল্য বস্ত্র দুই হাতে করিয়া ছিঁড়িতে লাগিলেন এবং ব্যাকুল চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,

"শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ
মোরে সে করিলে কাষ্ঠ পাষাণ সমান !
অনুতাপ করিয়া কাঁদেন উচ্চৈঃস্বরে ;
মুঞি সে বঞ্চিত হৈনু হেন অবতারে।"

কাঁদিতে কাঁদিতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া বিদ্যানিধি আনন্দ সাগরে ডুবিয়া গেলেন :—

"এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া ;
আনন্দে মূৰ্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া।
তিলমাত্র ধাতু নাই সকল শরীরে ;
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ সাগরে।"

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া গদাধর পণ্ডিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন ও বিদ্যানিধির প্রতি মনে মনে যে অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার জন্য কাতর ও অনুতপ্ত হৃদয়ে মুকুন্দকে বলিতে লাগিলেন :—

"হেন মহাশয়ে মুঞি অবজ্ঞা করিনু ;
কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইনু।
মুকুন্দ তুমি আমার কৈলে বন্ধুকার্য্য ;
দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য।
এমত বৈষ্ণব কি আছেন ত্রিভুবনে ;
ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি দরশনে।
আজি আমি এড়াইনু পরম সঙ্কট ;
সেহ যে কারণ তুমি আছিলা নিকট।
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান ;
বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান।
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয় ;
প্রকাশিলা পুণ্ডরীক ভক্তির উদয়।"

এই বলিয়া গদাধর মুকুন্দকে জানাইলেন যে, "আমি উহার সম্বন্ধে যত খানি অপরাধ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করিলে আমার এ পাপ যাইবে না, আমি এখনও দীক্ষিত হই নাই, বিদ্যানিধি কৃপা করিয়া যদি আমাকে দীক্ষিত করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন, তাহা হইলে আমি এ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। কারণ শিষ্য হইলে তিনি অবশ্যই আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

মুকুন্দ 'ভাল ভাল' বলিয়া ঐ কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন। এ দিকে প্রায় দুই প্রহর কাল পরে বিদ্যানিধি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন মুকুন্দ দত্ত গদাধর সম্বন্ধীয় কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া গদাধরের মনাভিলাস বিজ্ঞাপন করিলেন। গদাধর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পদতলে পড়িয়া গেলেন। বিদ্যানিধি হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন যে, "আমার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে, এমন ভগবদ্‌ভক্ত আমার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেন।"

তখন গদাধর ও মুকুন্দ মহাহৃষ্ট চিত্তে বিদায় গ্রহণ করত গৌরের সভায় আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন ও বিদ্যানিধির আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গৌরচন্দ্র মহাআনন্দ লাভ করিলেন। এ দিকে বিদ্যানিধি মহাশয়ও রজনী যোগে একাকী অলক্ষিত রূপে শ্রীবাস মন্দিরে গৌরাঙ্গ সভায় আসিয়া উপনীত হইলেন ; গৌরের ভাবাবেশে নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন শ্রবণ করিয়া মহা প্রেমোন্মত্তে আপনাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন :—

"কৃষ্ণরে জীবন! কৃষ্ণরে মোর বাপ!
মুই অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ।
সর্ব্বজগতের বাপ!' উদ্ধার করিলে;
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে।"

ভক্তগণ আগন্তুকের ঈদৃশ বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া চিনিতে না পারিয়া কিছু বিস্মিত হইতেছিলেন, এমন সময় গৌরচন্দ্র বুঝিতে পারিয়া সম্ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও "পুণ্ডরীক বাপ! আজ তোমাকে দেখিয়া নয়ন সার্থক হইল" বলিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকিলেন। তখন ভক্তগণ বুঝিলেন যে, ইনিই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। গৌরের মত ভক্তের প্রশংসা করিতে কেহ জানে না; তাই তিনি সর্ব্ব সমক্ষে দশ মুখে বিদ্যানিধির গুণ বলিতে লাগিলেন:—

"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছাসিদ্ধি করিলেন আমার;
আজি মহা মঙ্গল সে বাসি আপনার।
ইহার পদবী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি;
প্রেমভক্তি বিলাইতে গাড়িলেন বিধি।
নিদ্রা হইতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে;
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে।"

বিদ্যানিধি উপাধিটী গৌরচন্দ্রের কাণে ভাল শুনায় নাই। যেন একটু পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব মাখান; তাই ঐ উপাধি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রেমনিধি বলিয়া সম্বোধন করিলেন। সেই অবধি বিদ্যানিধি প্রেমনিধি বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত হইয়া গেলেন। প্রেমনিধি মহাশয় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রণাম করিবার অবসর পান নাই। এখন সমবেত বৈষ্ণবগণের সঙ্গে পরিচয় করিয়া সকলকে প্রণাম করিলেন। সর্ব্বাগ্রে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের পাদবন্দনা করিয়া ক্রমে সকলের যথাযোগ্য সম্ভাষা করিলেন। গদাধর এই অবসরে বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা পাওয়ার প্রস্তাব করিয়া গৌরের অনুমতি চাহিলেন। গৌরচন্দ্র 'শীঘ্র শীঘ্র কর' বলিয়া মহা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। যথা সময়ে গদাধর পণ্ডিত শ্রীপ্রেমনিধির স্থানে মন্ত্র দীক্ষা লইয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা। (৬ষ্ঠ)

ধর্ম্ম।

পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে যেমন ব্রাহ্মণ হইতে ইতরেতর জাতি পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর লোকে ধর্ম্মরূপ দুর্লভপদের অধিকারী হইতে লাগিল, সেই রূপ দিন দিন উপাস্য দেবদেবীর সংখ্যাও এক হইতে বহুতরে পরিণত হইয়া উঠিল। বেদবর্ণিত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা এখন ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটিতে পরিণত হইলেন এবং পুরাণ-প্রণেতা ঋষিগণের কল্পনাপ্রসূত অসাধ্য-সাধিনী শক্তির সংঘাতে অখণ্ড পরিপূর্ণ পরমেশ্বর অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হইতে লাগিলেন। উপনিষদের সুরম্য ধর্ম্ম-বেদির উপরে যে ব্রহ্ম একদিন অখণ্ড এবং অদ্বয় জ্ঞানে পূজিত হইতেন, এখন—এই

পৌরাণিক যুগে তিনি অসংখ্য অংশে বিভাজিত হইয়া গেলেন। পুরাণকারগণ তখন সেই খণ্ডবিখণ্ড ব্রহ্মের এক এক অংশ গ্রহণ করিয়া এক একটী দেব দেবীর উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপরে পরমেশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ অথবা স্বরূপ আরোপণ পূর্ব্বক প্রচার করাতে অনতিকালমধ্যেই তাহারা মানবমনের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইতে লাগিল। এইরূপে জড়পদার্থ-নির্ম্মিত কাল্পনিক মূর্ত্তি সকল অবিলম্বে ভারতক্ষেত্রে ঈশ্বর-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য যে, পুরাণকার এবং তন্ত্রকার পণ্ডিতগণ এই নবপ্রতিষ্ঠিত দেব দেবীর আরাধনারূপ কাল্পনিক ধর্ম্মপ্রণালীর স্থায়িত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সাধন উদ্দেশেই চিন্ময় পরব্রহ্মকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক খণ্ড অথবা এক এক স্বরূপ উহাদিগের উপরে সমারোপণ পূর্ব্বক ঈশ্বরত্বে বরণ করিয়াছেন, কিম্বা বেদোল্লিখিত দেবসংখ্যার পরিবর্দ্ধন সাধন করত তাহাদিগকে কোটিগুণে গুণিত করিয়াছেন।

কেহ কেহ পৌত্তলিকতাকে পৌরাণিক কবিগণের কবিত্বশক্তির সমুজ্জ্বল বিকাশ বলিয়া বর্ণনা করেন, অর্থাৎ তাঁহারা অসংখ্যস্বরূপ পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরূপকে ব্যক্তিত্বে পরিণত করিয়া (personified) এক এক দেবতার কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং দেব দেবী সকল ঈশ্বরের স্বরূপাবলীর জীবন্তবৎ প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা কিন্তু এমতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছি যে, ব্রহ্মস্বরূপকে কল্পনার সুকোমল তুলিকায় চিত্রিত করিবার জন্য মূর্ত্তিপূজার উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু কল্পনাকেই স্বরূপবৎ প্রতীয়মান করিবার জন্য ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। সত্য পদার্থকে কবিকল্পনার চিত্রে চিত্রিত করা পৌত্তলিকতার তাৎপর্য্য নয়, কিন্তু কল্পনাকে সত্যভাবে সজ্জিত করাই ইহার একমাত্র তাৎপর্য্য। সুতরাং অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি যে, কল্পনাপ্রিয় পৌরাণিক কবিগণ ঈশ্বরের স্বরূপ সকলকে ব্যক্তিত্বে পরিণত করিবার জন্য বিশ্বকারণ পরমেশ্বরকে অংশে অংশে বিভক্ত করেন নাই, কিন্তু কল্পনা-সমুদ্ভূত বহুতর জড় মূর্ত্তির ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বহুল অংশে অংশিত করিয়াছেন। এক দিকে যেমন পৌরাণিক ও তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া প্রবল কল্পনাবলে দিন দিন নব নব দেবারাধনার প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; অপর দিকে সেইরূপ তাঁহারা তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য ও গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্যও যার পর নাই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এই স্থানেই ভারতের অশেষ-দোষাকর ধর্ম্মসাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হইল, এই সময় হইতেই ভারতবক্ষে দিন দিন অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে লাগিল; এবং এই জন্যই পুরাণ ও তন্ত্রের বহুতর স্থল বিবাদ ও বিদ্বেষ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া উঠিল। পুরাণকর্ত্তাদিগের মধ্যে যিনি শক্তিপ্রধান, তিনি বলিলেন,—ভগবতীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; যিনি বিষ্ণুপ্রিয়,তিনি বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণব্রহ্ম; আবার যিনি শিবপ্রধান,তিনি বলিলেন,—পার্ব্বতীপতি মহাদেবই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপে প্রত্যেকেই নিজ নিজ

অবলম্বিত দেবতার প্রাধান্য সংস্থাপন উদ্দেশে অতিবর্ণনায় অনুরঞ্জিত করিয়া বহুতর স্তুতিকর পদাবলী প্রকটন করিতে লাগিলেন। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কেবল নিজপক্ষের সমর্থন করিলেই চলে না, সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া তাহার অপকৃষ্টতাও প্রদর্শন করিতে হয়। সুতরাং এই চিরাগত রীতির পরতন্ত্র হইয়া পুরাণকর্ত্তা পণ্ডিতগণও নিজ দেবতার প্রাধান্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষপক্ষীয় দেবগণের প্রতি প্রভূত নিন্দাবাদও লিপিবদ্ধ করিলেন। কেবল কি প্রতিপক্ষীয় দেবগণের প্রতি নিন্দাবাদ করিয়া নিরস্ত হইলেন? না, তা নয়; তৎসঙ্গে সেই সকল দেব দেবীর উপাসকদিগের উপরেও যৎপরোনাস্তি কটুক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। যথা:—

সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদের্ভূরি মানিনঃ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবোবারি হস্তেহন্নং পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তদীনাস্তু বৈষ্ণবঃ।
ন কার্য্যা প্রার্থনাতেভ্যস্তেষাংদ্রব্যমমেধ্যবৎ॥
পদ্মপুরাণ। উত্তরখণ্ড।

অর্থাৎ— সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্তাদির হস্ত হইতে বিষ্ণুর উপাসক অন্ন জল গ্রহণ করিবে না। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্তাদির সঙ্গ করিবে না, তাহাদিগের নিকট কোন প্রার্থনা করিবে না; তাঁহাদিগের দ্রব্য পুরীষ তুল্য।

তথান্যদেবতাভক্তির্ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতা।
বিদূরমতিবিপ্রাণাং চাণ্ডালত্বং প্রয়চ্ছতি।
তস্য সর্ব্বানি নশ্যন্তি পিতরং নরকং নয়েৎ।
পদ্মপুরাণ। উত্তর খণ্ড। ১০৩ অধ্যায়

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি করা নিন্দিত হয়। তাহাতে ব্রাহ্মণের চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা সকলে নষ্ট হয় ও তাহার পিতা নরকে গমন করে।

বিদ্বেষ-বহ্নির এমনি উত্তাপ যে পুত্র হইতে পিতা পর্য্যন্ত গিয়া স্পর্শ করে। কুলার্ণব তন্ত্রকার বলিয়াছেন:—

হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং।
শালগ্রামাঞ্চ নার্চ্চয়েৎ॥

অর্থাৎ হরিনাম গ্রহণ করিবে না, তুলসীপত্র স্পর্শ করিবে না এবং শালগ্রামের অর্চ্চনা করিবে না।

এই সকল উক্তি পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাদের মূলে কি পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িকতা এবং বিদ্বেষবিষ নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা প্রচারের নামই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে জানিনা ধর্ম্মের নামান্তর কি আছে? এবং এংরূপ বিদ্বেষ-বিমিশ্রিত পদাবলীপূর্ণ গ্রন্থের নামই যদি ধর্ম্মশাস্ত্র হয় এবং তাহাদিগকে যদি অভ্রান্তবোধে গ্রহণ করিতে হয়, তবে কি জানি, তাহা অপেক্ষা প্রমাদকর ব্যাপার আর কি আছে? যাহা হউক, এখন আমরা প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছি।

পাঠকগণ! বোধহয় সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, কিরূপে ভারতে বহুতর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রচারে যেমন এদেশে বহুল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ বিসম্বাদের বহ্নিও বহুদিন হইতে এদেশে জ্বলিতেছে। প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে গেলে, এই সকল সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক ধর্ম্মগ্রন্থ গুলিই জাতিগত বৈষম্য ও অনৈক্যের

প্রধান কারণ। যদিও আমরা জানি যে, পৌত্তলিকতার প্রচার দ্বারা এতদ্ব্যতীত এদেশে আরও বহুতর অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে, এবং যদি ইহাও জানি যে, ইহা দ্বারা কোন কোন অংশে এদেশের মঙ্গলও সম্পাদিত হইয়াছে, তথাচ এস্থল সে সকলের সমালোচনযোগ্য নয় বিবেচনায় তৎসংক্রান্ত কথা পরিত্যাগ করিলাম। ঠিক কোন্ সময় হইতে ভারতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা একরূপ অসাধ্য। যদিও আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভারতে অভ্যুদিত হইয়াছে, তথাচ এমন কিছু বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতে পারি না যে, অমুক শতাব্দী বা অমুক সময় হইতে ইহার স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয়ের পর হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা উত্তরোত্তর প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। পুরাবৃত্ত মুখে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-প্রতাপ সমগ্র ভারতে অক্ষুণ্ণভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল। চীনদেশীয় সুবিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের বহুতর ঋদ্ধিসম্পন্ন পরাক্রান্ত নগর সকল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করেন। এই পরমোৎসাহী বিদেশীয় পুরুষ মথুরা, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা, কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তি, কপিলবস্তু, নালান্দা, রাজগৃহ, উৎকল, কলিঙ্গ, অন্ধ্র প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় বহুতর সমৃদ্ধিশালী সুবিখ্যাত জনপদ ও অন্যান্য নানা স্থান পর্য্যটন পুরঃসর শত শত পরম সুন্দর বৌদ্ধকীর্ত্তি ও বৌদ্ধবিহার এবং ভারতে সকল স্থানেই অক্ষুণ্ণ ও অপরাজিতভাবে বৌদ্ধপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। ভারতে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের এতাদৃশ সতেজ দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল। তৎপরে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাতেজা শঙ্করাচার্য্য অভ্যুদিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উন্মূলনে বদ্ধপরিকর হয়েন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও এক জন প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু বৌদ্ধদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম কুমারিল ভট্ট। শঙ্করাচার্য্যের জন্মের প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইনি মলয়বর দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া বৌদ্ধদিগকে নৃশংসভাবে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করেন। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, অষ্টম শতাব্দীর প্রথম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনের নিমিত্ত তদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে তাহা অবসিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে অথবা তাহার কিছু পরবর্ত্তী কালের মধ্যে বৌদ্ধ বিক্রম একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া ভারতাকাশে অস্তমিত হইয়া পড়ে। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মধ্যবর্ত্তী কালের মধ্যে অনেক শত্রু অভ্যুদিত হইয়া বৌদ্ধদিগকে নিপীড়িত করিতে চেষ্টা করে। ভারতভূমি এই চারিশত বৎসর কালব্যাপী বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরস্পর সংঘর্ষণ ও সংগ্রামে অস্থির হইয়া উঠে। যাহা হউক,

এই চারি শতাব্দীর মধ্যেই কোন না কোন সময়ে পৌত্তলিকপ্রণালীর উৎপত্তি ও পরে পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন মহাত্মা চৈতন্যদেব নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েন, এদেশের তৎকালীন ধর্ম্মপ্রণালীর বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, সে সময়ে এদেশ পৌত্তলিকতার ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন ছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, পৌত্তলিক ধর্ম্ম সে সময়ে দৃঢ়মূল বিটপীর ন্যায় ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছিল। যদিও পূর্ব্বোক্ত কালের মধ্যে পৌত্তলিক পদ্ধতির উৎপত্তি এবং পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বেও এদেশ মধ্যে একেবারে যে মূর্ত্তি-পূজা প্রচলিত ছিল না, ইহা কোন রূপেই বলিতে পারা যায় না। কারণ অনুসন্ধান দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি দেবতা-বোধে পূজিত হইত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের আচার ব্যবহার।

ইহাঁদিগের ব্রাহ্মণগণ কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রাহ্মণদিগের কথা দূরে থাকুক, অপর জাতীয় মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রায় সকলই শিখা ও উষ্ণীষধারী। ইহাঁরা এরূপ রক্ষণশীল যে, যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারাও উল্লিখিত দেশাচারের কচিত ব্যভিচার করিয়া থাকেন। যখন কলিকাতায় লর্ড রিপণের সুবিখ্যাত শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হয়, তখন আমরা আমাদিগের অন্যতম দেশ-গৌরব শ্রদ্ধেয় বারিষ্টার কাশী নাথ তৃম্বক তেলাং মহোদয়কে দেখিয়াছিলাম। ইহাঁর পরিচ্ছদাদি সব ইংরাজী ধরণের, কিন্তু শিরস্ত্রাণ ও কেশ বিন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালী বারিষ্টারের সহিত কি সুন্দর বৈপরিত্য! ইহাঁদিগের অনেকে কুণ্ডল ব্যবহার করিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও অযোধ্যা প্রদেশের লোকদিগের মত ইহাঁরাও অষ্ট প্রহর গৈরিক রঞ্জিত ধুতি ও চাপকান পরিধান করেন। প্রভেদের মধ্যে এই, ইহাঁরা প্রায় কোঁচা করিয়া বস্ত্র পরিধান থাকেন; তাঁহারা কোঁচার কাপড় কোমরে বান্ধিয়া থাকেন। জুতা সম্বন্ধে ইহাঁরা তাঁহাদিগকেও পরাজিত করিয়াছেন। তাঁহারা জুতা বাহিরে রাখিয়া ঘরে প্রবেশ করেন, ইহাঁরা আরও দূরে উহা রাখিয়া থাকেন। আমরা বাঙ্গালী, আমাদিগের এবম্বিধ অভ্যাস বড় কম। একদা প্রবন্ধলেখক কলিকাতায় কোন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি সিঁড়ির নিকট জুতা খুলিয়া রাখিয়া যাইবার রীতি জানিতেন না, সুতরাং বরাবর জুতা পায়ে উপরে উঠিলেন, উঠিয়া মাদুরের পার্শ্বে উহা খুলিয়া উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ মহাশয় অজ্ঞাতসারে স্বীয় ভৃত্যের দ্বারা উহা স্থানান্তরিত করাইয়া সিঁড়ির নীচে রাখান। তদনন্তর, আসিবার সময় উহা অন্বে-

বণ করিলে, উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে একজন বলিলেন যে "আপনার জুতা সিঁড়ির নীচে আছে।" তখন অপ্রতিভ হইয়া বুঝিলেন যে, উহাঁদের আচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইয়াছে। সেই অবধি যত দিন তিনি ব্রাহ্মণ মহাশয়ের বাটীতে গমন করিতেন, সোপানের অধোদেশে উহা ত্যাগ করিয়া যাইতেন। একটী বিষয়ে ইহাঁরা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল। আমরা যেখানে সেখানে নিষ্ঠীবনাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকি। ইহাঁরা কখনও সেরূপ করেন না। বাটীর মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, যেখানে সকলে গিয়া ঐ সমস্ত পরিত্যাগ কবিয়া আসেন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

বঙ্গভাষার সহিত মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রচলিত শব্দগুলির অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। দেব নাগর অক্ষরের সহিত মহারাষ্ট্রীয় অক্ষরের অনেক, এমন কি, প্রায় সব মিল আছে। শুধু ন প্রভৃতি ২।১ বর্ণের রূপান্তর দেখা যায়। ইহার পূর্ণচ্ছেদ দাঁড়ি নয়, ইংরাজী fullstop এর ন্যায় একটী শূন্য (·); ন এর সহিত যুক্ত বর্ণের ব্যবহার ইহাতে দৃষ্ট হয় না। এই ন একটী (·) রূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণের মস্তকে বসে। যথা আমরা লিখি 'অনন্ত' 'আনন্দ';—মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এই কথা দুটী লিখিতে হইবে 'অনংত' 'আনংদ' এইরূপ লিখিতে হইবে। যে ব্যক্তির দেবনাগর অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, সে মহারাষ্ট্রীয় ভাষা পড়িয়া ভাবার্থ বুঝিতে পারে। বঙ্গদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উচ্চারণ শুদ্ধ নয়। উৎকল ও পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি কতিপয় স্থানের পণ্ডিতগণের উচ্চারণ ইহাঁদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল। মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতগণের উচ্চারণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাঁদিগের সংস্কৃত পাঠ শ্রবণ করিলে চিত্ত বিমোহিত হয়। বাস্তব, উচ্চারণ দোষ একটী প্রধান দোষ। বাল্যাবস্থা হইতে আমরা যদ্যপি শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে কখনও বর্ণাশুদ্ধি দোষ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। সাধারণতঃ আমরা ন, ণ, শ, ও স এর ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করি না। এই হেতু একটী বাঙ্গালীর তৎসম্বন্ধে যে প্রকার ভুল হইয়া থাকে, সেরূপ আর কাহারও হয় না, হইবার সম্ভাবনাও নাই।

এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বিবৃত হইতেছে। বঙ্গনারী ভিন্ন, অন্যান্য ভারত মহিলাগণের মত ইহাঁদিগের কি যৌবনবতী কি যৌবনহীন, সকলেই কাঁচলি ব্যবহার করিয়া থাকেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভগিনীগণের ন্যায় ইহাঁরা 'নেঙ্গা' অর্থাৎ ঘাগরা পরিধান করেন না। দেখা গিয়াছে, এই ঘাগরা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নূতনাবস্থায় পরিধান করিতে আরম্ভ করেন ও পুরাতনাবস্থায় একেবারে জীর্ণ ও ছিন্ন হইয়া অব্যবহার্য্য হইলে পরিত্যাগ করেন। নিতান্ত বিপাকে পড়িলেই তাহা জলের মুখ দেখে, নচেৎ নয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের ব্যবহার সেরূপ নয়। ইহাঁরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। ইহারা ন্যূনাধিক ২০ হাত পরিমাণে শাঠি কাছা দিয়া ও পার্শীনারীর মত অঞ্চল হাতের নাচু দিয়া কোমরে জড়াইয়া রাখেন। অবগুণ্ঠন যে কি পদার্থ, তাহা ইহাঁরা আদৌ জানেন না। পায়ে বড়

মোটা মোটা মল ও আঙ্গট্ ও নাকে নত পরিয়া থাকেন। ইহাঁরা কুত্রাপি অবরোধে আবদ্ধ থাকেন না। পুরুষের ন্যায় স্বাধীনভাবে, কি ঘরে কি বাহিরে, অবাধে বিচরণ করিয়া থাকেন। পুরুষেরা গৃহে থাকুন বা না থাকুন, প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের মত আগন্তুক কিম্বা অতিথির সহিত কথাবার্ত্তায় এবং তাঁহার সেবায় রত হন। গৃহস্বামীর কোন বন্ধু তাঁহার ভবনে আগমন করিলে গৃহস্বামিনী অন্য ঘর হইতে তাহার সহিত কথা বলেন। ইহাঁরা স্বহস্তে প্রত্যহ রন্ধন করিয়া, কি পরিজন কি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, কি অতিথি, সকলকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া পরিতুষ্ট আহার করাইয়া পরিশেষে আপনারা ভোজন করেন। প্রাতঃকালে যাহা রন্ধন হইয়াছে, তাহা সন্ধ্যাকালে আহার করিবার প্রথা মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত নাই; সুতরাং ইহাঁদিগকে দুইবেলা সমস্ত প্রস্তুত করিতে হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ একদিনে দুইবার আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আহার করেন, অথবা অষ্টপ্রহর যে বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা পরিয়া কখনও আহার করেন না। ইঁহারা নিরামিষ ভোজী—মৎস্যমাংসের নামে কর্ণে হস্ত নিক্ষেপ করেন। বাল্য বিবাহ ইহাঁদিগের মধ্যে অতিশয় প্রচলিত। এমন দেখা গিয়াছে যে, শিশু পুত্র ও শিশু পুত্রবধূ উভয়ে একত্রে ভাই ভগিনী নির্ব্বিশেষে ক্রীড়া করিতেছে। কন্যার পিত্রালয়ে যে নাম থাকে, শ্বশুরালয়ে তিনি সে নামে সম্ভাষিত হন না। মনে কর, কোনও বালিকার নাম রমা বাই। গোপালজীদাদাজী পাটবর্দ্ধনের সহিত ইহাঁর বিবাহ হইল। শ্বশুরালয়ে ইহাঁর নাম উমা হইল। আর স্বামীর পদবী 'পাটবর্দ্ধন' ইহাঁর নূতন নামে শেষে সংযুক্ত হইল। সুতরাং তিনি এখন উমা বাই পাটবর্দ্ধন নামে পরিচিত হইতে লাগিলেন। এই বৈবাহিক নামের উৎপত্তিতে যে পূর্ব্বের আদি নাম 'রমা' একবারে বিলুপ্ত হইল, এমত নহে। উমাবাই পাটবর্দ্ধন যখন পিত্রালয়ে গমন করিলেন, এবং যতদিন তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন ও তত দিন তিনি পুনর্ব্বার রমাবাই হইলেন। এই ঘটনাটীর দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয় রমণীর একটী কৌমারিক ও একটী বৈবাহিক, দুটী নাম অবশ্য অবশ্য থাকিবেই থাকিবে। আবার পাঠক দেখুন, ইহাঁর স্বামীর নাম গোপালজী দাদাজী পাটবর্দ্ধন। ইহাঁর প্রকৃত নাম গোপালজী, দাদাজী ইহাঁর পিতার নাম, আর পাটবর্দ্ধন আমাদিগের ঘোষ রায় প্রভৃতির বংশ-নাম অর্থাৎ পদবী। মহারাষ্ট্রীয়দিগের নামের সহিত স্ব স্ব পিতার নাম সংশ্লিষ্ট থাকিবেই থাকিবে। এবং পিতার নাম, পদবী ও ব্যক্তিগত যথার্থ নামের যে মধ্যবর্ত্তী থাকে, তাহা আর বেশি স্পষ্ট করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু উক্ত দৃষ্টান্তেই উহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের নাম সম্বন্ধে আর দুই একটী বিষয় না বলিলে এই প্রবন্ধ নিশ্চয় অসম্পূর্ণ রহিবে, এই বিবেচনায় সে গুলির উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। অস্মদ্দেশে যেরূপ, কি সধবা কি বিধবা

সকল স্ত্রীলোকের নামের পূর্ব্বে শ্রীমতী কথাটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণের সেরূপ নয়। ইহঁাদিগের সধবাদিগের নামের পূর্ব্বে "সৌভাগ্যবতী" আর বিধবাদিগের নামের পূর্ব্বে "গঙ্গা ভাগীরথী" এই বাক্যদ্বয় প্রযুক্ত হয়। এবং আমাদিগের পুরুষদিগের নামের পূর্ব্বে যেরূপ 'শ্রী' "শ্রীযুক্ত বাবু" প্রভৃতি কথা প্রয়োগ করিতে হয়, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নামের পূর্ব্বে সেইরূপ "রাজমান্য রাজশ্রী" এই কথা গুলি ব্যবহার করিতে হয়। যথা, সধবা হইলে সৌভাগ্যবতী (সংক্ষেপে সৌং) পার্ব্বতী যোগী এবং বিধবা হইলে গঙ্গা-ভাগীরথী (সংক্ষেপে গংভাং) পার্ব্বতী যোগী; আর পুরুষের হইলে পূর্ব্বে রাজমান্য রাজশ্রী (সংক্ষেপে রাং রাং) গোপালজী দাদাজী পাটবর্দ্ধন হয়।

বঙ্গের প্রধান উৎসব, শারদীয় মহোৎসব—দুর্গাপূজা। পশ্চিমের মহোৎসব হোলী অর্থাৎ দোলযাত্রা ও দেওয়ালী, অর্থাৎ কালী পূজা। মহরাষ্ট্রীয়দিগের মহোৎসব গণেশ পূজা। এই উৎসব ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় বোধ হয় চতুর্থী তিথিতে আরম্ভ হয়। যাহার যেরূপ অভিরুচি ও শক্তি, কেহ একদিন কেহ সাতদিন পর্য্যন্ত পূজার অনুষ্ঠান করিয়া অষ্টমদিনে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেন। সাতদিনের অধিক কেহ কখনও পূজাও করেন না, প্রতিমাও রাখেন না।

আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ইহঁারা যে প্রকার রক্ষণশীল, রাজনীতি সম্বন্ধে অবিকল তাহার বিপরীত। ইংরাজ অত্যাচারে প্রপীড়িত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের লোকেরা অনেক সহ্য করিয়া থাকেন। ইহঁারা অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে চেষ্টিত হন। আমরা এক জন ইংরাজ-প্রপীড়িত, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে জানি; ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ইংরাজী কোনও দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। এবং আজ পর্য্যন্ত সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেছেন। বোম্বাইএর কলের বস্ত্র ইহঁার পরিধেয় গাত্রাভরণ ও উষ্ণীষ। ইনি বলেন, দৈনিক বিষয় কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, রাজ দরবারে বা রাজ রাজ চক্রবর্ত্তীর নিকট গমনকালীনও ইনি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, করিবেনও না। শিবজীর শোণিত শুধু তাঁহার শরীরে নয়, তাঁহার ন্যায় অনেকের ধমনীতে প্রবাহিত। যাঁহারা মাংসাহারের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নিরামিষভোজী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ভূতলে শায়িত হন। অতএব এস্থলে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মৎস্য মাংসাদি আহারে কেবল বলাধান হয় না, দেশের জল বায়ু, আচার ব্যবহার ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বভাব সংসর্গ ইহার মূলে নিহিত। যদিও মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে অনেকে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম, এমন কি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছেন ও বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ করিতেছেন, তথাপি আমরা বলিতে সাহস করি যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহঁারা সাধারণত স্থিতিশীল। স্বভাব অসরল। স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাঁহাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাণিজ্য ব্যবসায় তাঁহাদিগের প্রায় অনেকের প্রধান অবলম্বন। তাঁহারা বাঙ্গালীর মত দাসত্ব ও হিন্দুস্থানী ভায়াদিগের মত চাটুকারিতা-

প্রিয় এবং দুরবস্থ আত্মীয়বর্গকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিতে কাতর নহে।

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে কুকুর অস্পৃশ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়ের বিবেচনায় সেরূপ নয়। ইহা তাঁহাদের শয়নাগারে, ভোজনাগারে, এমন কি পারিবারিক উপাসনা গৃহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, কোন আপত্তি নাই। আমরা একজন ভাল ব্রাহ্মণকে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ইহার গাত্রস্পর্শ করিয়া আদর করিতে দেখিয়াছিলাম। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিল, সুতরাং এস্থলে ইহার উপসংহার করিলাম। ভবিষ্যতে যদি পারি, এ বিষয়ে পুনর্ব্বার হস্তক্ষেপ করিব।

শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী।

ঋগ্বেদসংহিতা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতে দুই জাতীয় লোক বাস করিত। এক আর্য্য, দ্বিতীয় দস্যু বা দাস। আর্য্যগণ গৌরবর্ণ, দাসেরা কৃষ্ণবর্ণ। যাঁহারা বেদ রচনা করিয়াছেন, সংস্কৃত যাঁহাদের মাতৃ ভাষা, যাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পূজা করিতেন, সেই প্রাচীন কালে যাঁহারা প্রতিভা বলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আর্য্য। আর দেব-বিরোধী—আর্য্যদিগের শত্রুগণ দাস বা দস্যু।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আর্য্য শব্দ "ঋ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ঋ ধাতুর অর্থ চাষ করা। সেই স্মরণাতীত কালে যখন অন্যান্য জাতীয় মানবগণ কেবল মৃগয়া ও কন্দমূল ফলাদি দ্বারা কথঞ্চিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, সেই সময় যাহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহারা অন্যান্য জাতি হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য আর্য্য অর্থাৎ "চাষা" এই গৌরবাত্মক আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। ঋ ধাতুর এই রূপ চাষা অর্থ নিতান্ত টানিয়া বুনিয়া করা হইয়াছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রানুসারে ঋ ধাতুর অর্থ গমন, প্রাপন ইত্যাদি। সুতরাং সেই প্রাচীন কালে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম উন্নতির দিকে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে আর্য্য আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। ধাতুর অর্থ পরিত্যাগ করিয়া শব্দার্থ অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হইবে যে, আর্য্য অর্থ শ্রেষ্ঠ, পূজ্য ও সৎকুলোদ্ভব ইত্যাদি। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের তৃতীয় পাদে সর্ব্ব প্রথম আর্য্য বা অর্য্য শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে আর্য্য অর্থ, আর্য্যদিগের সর্ব্বপ্রধান উপাস্য দেবতা ইন্দ্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আর্য্যগণ প্রথমত আপনাদের প্রধান উপাস্য দেবতাকে আর্য্য আখ্যা প্রধান করিয়াছিলেন। এমত স্থলে আমরা কোন রূপেই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদানুসরণ করিতে পারি না।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যখন আর্য্যগণ বেদ রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা ভূমণ্ডলে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমানের সাহার্য্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "সেই আর্য্যগণ সর্ব্ব প্রথম হিন্দুকোষ পর্ব্বতের অপর প্রান্তে মধ্য আসিয়ার বিস্তীর্ণ মালভূমিতে বাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ ভূমিকর্ষণ, কেহ পশু পালন, অন্যেরা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মৃগয়াজীবি ও পশুপালকগণ দীর্ঘকাল একস্থানে বাস করিতে পারিতেন না, যে স্থানে মৃগয়ার সুবিধা দেখিতেন কিম্বা পশুদিগের ভাল চারণ ভূমি পাইতেন, তাঁহারা সেই সেই স্থানে যাইয়া বাস করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে এই আর্য্য বংশ হইতে হিন্দু, পার্সি, স্লাবোনিক, কেলটিক, হেলিনিক, ইটালিক, টিউটনিক প্রভৃতি মূল জাতি সমূহও তাহার শাখা প্রশাখা সমুৎপন্ন হইয়াছে।"

কতকগুলি মানব-খর্পর পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার প্রিচার্ড সর্ব্বপ্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তৎপর ভাষাতত্ত্ববিৎ কয়েকজন পণ্ডিত যুক্তি ও কল্পনা মূলক সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহা বিশেষ রূপে সমর্থন করিয়াছেন। জগদীশ্বর পৃথিবীর স্থানে স্থানে দলে দলে মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া ছিলেন, কিম্বা এক পিতামাতা হইতে জগতের সমস্ত মনুষ্যজাতি সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কে স্থির করিয়া বলিতে পারে? কবির কল্পনা যে স্থানে পঁহুছিতে পারে না, বিজ্ঞান যাহার চতুর্দ্দিকে অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যে সময়ের কাহিনী বলিবার জন্য ইতিহাসের মাতামহী ভাষাও জন্মগ্রহণ করে নাই, সেই স্মরণাতীত কালের ঘটনা কে স্থির করিয়া বলিতে পারে? পাশ্চত্য পণ্ডিতদিগের প্রচারিত মত সম্বন্ধে কোন রূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমাদের পিতৃপুরুষ আর্য্যগণ কাশ্মীর হইতে হিন্দ্‌ কোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বাস করিতেছিলেন।* ইহারা সকলেই অসুর ও সুরোপাসক

* পৌরাণিক মতে মহর্ষি কশ্যপ দেব-দানব ও মানব প্রভৃতির পিতৃপুরুষ। কাশ্মীরের বিখ্যাত ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীর প্রথমতরঙ্গে লিখিত আছে যে, বর্ত্তমান কল্পারম্ভে ব্রহ্মার পৌত্র মরীচির পুত্র প্রজাশ্রেষ্ঠ কশ্যপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহাদেব প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যে সতীসরের অভ্যন্তরস্থিত ভূভাগের উদ্ধারসাধন পূর্ব্বক কাশ্মীর প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করেন। ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীর পর্ব্বত মধ্যস্থিত একটী সরোবর ছিল।

ইহাদ্বারা অনুমিত হয় যে, কাশ্মীর উপত্যকায় পরিণত হইলে আদিপিতা মহর্ষি কশ্যপ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অবরোহণ করিয়া এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং আর্য্যঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়া আমরা কাশ্মীর প্রদেশকে আর্য্যজাতির সূতিকাগৃহ বলিতে পারি। কাশ্মীরের ন্যায় প্রকৃতির উদ্যান সদৃশ একটী মনোহর স্থানে আর্য্যজাতির শৈশবকাল অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা কোনমতে অসঙ্গত বোধ হইতেছে না। মোগলেরা কাশ্মীর প্রদেশকে "ভূস্বর্গ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবাসীর চক্ষে কাশ্মীর চিরকালই "ভূস্বর্গ"। বৈদেশিক ভ্রমণকারীগণও

কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন! ফরাসী ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বারম্বার তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই! তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "আমি যথার্থই কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি! কল্পনায় এরাজ্যটীকে আমি যত সুন্দর বিবেচনা করিয়াছিলাম, প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীর তদপেক্ষা অধিক সুন্দর; এ সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।"

তৎপরে ফ্রোষ্টার সাহেব, যিনি স্থলপথে কলিকাতা হইতে সেণ্টপিটার্সবর্গে গমন করিয়াছিলেন, আসিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ স্থান যাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল, সেই ফ্রোষ্টারও কাশ্মীরের অতুল সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

মেজর রেনেল বলেন "কাশ্মীর প্রদেশে অলৌকিক সৌন্দর্য্য ভূমির উর্ব্বরতা ও বায়ুমণ্ডলের তাপের সাম্যভাবের জন্য আসিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত, উল্লিখিত বিষয় সমূহের কারণ বিবেচনা দ্বারা এরূপ অনুমিত হয় যে, ইহা একটী সুবিস্তীর্ণ উচ্চ উপত্যকা, তাহার চতুর্দ্দিকে অভ্রংলিহ পর্ব্বতমালানীহার মণ্ডিত প্রদেশ সীমা ভেদ করিয়া ঋজুভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একটী বৃহৎ নদীর সঞ্চিত কর্দ্দমরাশিতে এই উপত্যকা গঠিত হইয়াছে। সেই নদী সর্ব্ব উপত্যকাব্যাপীহ্রদ হইতে উদ্ভূত হইয়া স্বীয়বলে পর্ব্বতবিদারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইয়াছে। তাহাতেই উর্ব্বর উপত্যকা অল্প পরিশ্রমে অপর্য্যাপ্ত ফলপ্রসূ এবং বহুকাল প্রসিদ্ধ কাশ্মীরের প্রাচীন অধিবাসাদিগের সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ উপযোগী হইয়া রহিয়াছে।

যে কাশ্মীর, এই প্রকার প্রকৃতির রমণীয় উদ্যান, যেস্থানে মানবের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে উপযোগী ধনভাণ্ডার হস্তে লইয়া প্রকৃতি দেবী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য কি দেশী কি বিদেশী শতকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে, যে স্থানে গেলে সংসার আসক্ত ঘোর নাস্তিকের হৃদয়ও পরমার্থ ভাবে গলিয়া যায়, যেই স্থল যে সরলহৃদয় ধর্ম্ম প্রবল আর্য্য শিশুর বাল্য বিহারের স্থান এবং সেই স্থানের অমানুষিক ভাবে বিগলিত হইয়া আদি পিতা মহর্ষি কশ্যপ যে তথায় বাস করিয়া স্বীয় সন্তান লালন পালন করিয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

ছিলেন। ক্রমে অসুর ও সুর উপাসকগণের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক কলহ উপস্থিত হইলে ইহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। একশাখা আমাদের প্রাচীন পিতৃপুরুষ হিন্দু আর্য্যগণ, অন্য শাখা পার্সিজাতির পিতৃগণ। ঋগ্বেদে ইহার আভাস পাওয়া যায়। পুরাণে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। আদি পিতা কশ্যপের কতকগুলি সন্তান দেবোপাসক ও কতকগুলি দেবদ্বেষী "অসুর" উপাসক ছিলেন। ইঁহারা পরস্পর কলহ করিয়া দুই শাখা দুই দিকে গমন করিলেন। যে শাখা স্বরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদেরই সন্তান সন্ততি। হিন্দু ও ইউরোপ নিবাসী জাতি সমূহ এক মূল হইতে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলেও, একমাত্র পারসীক ভিন্ন অন্য কোন জাতি আমাদিগের পৈত্রিক আর্য্য আখ্যার অংশভাগী হইতে পারে না, কারণ আর্য্যগণ আর্য্য-আখ্যা ধারণ করিবার বহু পূর্ব্বে এই সকল জাতি তাহাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইউরোপ নিবাসী প্রাচীন সভ্য গ্রীক কিম্বা রোমকগণ ভ্রম ক্রমেও আপনাদিগকে আর্য্যবংশজ বলিয়া পরিচয় দিয়া যান নাই। বরং তদ্বিপরিতে

তাঁহারা পারশিকদিগকে আর্য্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় অনার্য্য দস্যুগণ প্রায় সমস্ত ভারত অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। পরে যখন তাঁহাদের পরিবার-বর্গ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা আর একপদ অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মর্ষি দেশ অধিকার করিলেন।* ক্রমে ব্রহ্মর্ষি দেশেও স্থান সঙ্কুলন হইল না, সুতরাং তাঁহারা দ্বিতীয় বার পাদক্ষেপ করিয়া প্রয়াগ পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন, ইহাকে মধ্যদেশ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল।† ক্রমে আর্য্যদিগের প্রবল উন্নতির সহিত বংশবৃদ্ধি হইয়াছে, এক্ষণে মধ্য দেশেও তাঁহাদের স্থান হয় না। সুতরাং তৃতীয়বার পাদক্ষেপে তাঁহারা উত্তর ভারতের সমস্ত সমতল ক্ষেত্র আপনাদিগের বাসোপযোগী বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। এবং এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকে তাঁহাদের গৌরবাত্মক আখ্যা প্রদান পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্ত নামে পরিচিত করিলেন।‡

আর্য্যগণ যখন ক্রমে ক্রমে ভারতের সমতল ক্ষেত্র অধিকার করিতেছিলেন, সেই সময় অনার্য্য দস্যুদিগের সহিত সর্ব্বদাই তাহাদের কলহ চলিত। দস্যুগণ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া কেহ কেহ তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দাসত্বে নিযুক্ত হইত। অন্যেরা দূর দূরান্তরে যাইয়া আপনাদের নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিত।

আর্য্যদিগের বাঙ্গালায় আগমনের পূর্ব্বে অনার্য্য দস্যুগণ এই দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালার প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশসমূহে যে সকল অনার্য্যজাতি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের আকৃতি ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। যথা, দ্রাবীর বংশ, কোল বংশ ও লৌহিত্য বংশ। ইহাদিগের আবার অনেকগুলি শাখা প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে কোন্ কোন্ শাখা আর্য্যদিগের আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সমতল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহা স্থির রূপে লিপিবদ্ধ করা সুকঠিন। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় উপনীত হইলে অধিকাংশ অনার্য্য প্রান্তবর্ত্তী বন্যভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অন্যেরা আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সমতল ক্ষেত্রে বাস করিতে লাগিল। আর্য্যগণ যে ক্রমে কেবল সমতল ক্ষেত্র নিবাসী অনার্য্যদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন, এমত নহে, তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী বন্যভূমিতে প্রবেশ করিয়া অনার্য্যদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে ত্রুটী করেন নাই। এক্ষণ যাহারা বাঙ্গালী নামে পরিচিত, বাঙ্গালাভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের মধ্যে কে আর্য্য কে অনার্য্য এবং কেই বা মিশ্র বংশজ, তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ আর্য্যদিগের সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। প্রথমাবস্থায় আর্য্যদিগের মধ্যে কোন প্রকার শ্রেণী কিম্বা বর্ণ বিভাগ ছিল না, সকলেই এক বর্ণ

* মনু, দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯ শ্লোক।
† মনু, দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ শ্লোক।
‡ মনু, দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ শ্লোক।

ছিলেন।* পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ বিভাগ হইল।†

আর্য্যগণ প্রথমতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তপোযপ নিরত ব্রহ্মতত্বজ্ঞগণ ব্রাহ্মণ, যাঁহারা বাহুবলে বিজাতীয় শত্রুদলকে নির্যাতন করিয়া সর্ব্বদা আত্ম রক্ষা করিতে সক্ষম, তাঁহারা রাজন্য; এবং বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য নিরত ব্যক্তিগণ বৈশ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। পরে অনার্য্য দস্যুদিগের সংশ্রবে আর একটী শ্রেণী বৃদ্ধি হইল, ইহারাই শূদ্র। কিন্তু কেবল যে অনার্য্যদিগকে শূদ্র শ্রেণীতে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এমত নহে। অনেকানেক শৌচাচার-বিহীন আর্য্য সন্তানকেও শূদ্র শ্রেণীতে স্থান দান করা হইয়াছিল। ঋগবেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সকল আর্য্য সন্তান ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেই সকল আর্য্য সন্তানদিগকে হিংসা-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ শূদ্রশ্রেণীতে স্থান দান করেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় এই সকল শ্রেণী বিভাগ নিতান্ত শিথিল ছিল। গণ্ডমূর্খ ব্রাহ্মণতনয়কে ব্রাহ্মণ ও গুণবান শূদ্রতনয়কে শূদ্র শ্রেণীতে রাখা হইত না। শূদ্র সন্তানগণও ঋগ্বেদের কোন কোন সূক্ত রচনা করিয়াছেন।

ভগবান মনু বলিয়াছেন ঃ—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতা মেতি ব্রাহ্মণ শ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্তু বিদ্যাত্ বৈশ্যাত্তথৈবচ॥

প্রাচীন ঋষি আপস্তম্ভ বর্ণ সমূহের পরিবর্ত্তনশীলতা স্বীকার করিয়াছেন। বশিষ্ঠ, কানদ, ব্যাস, মন্দপাল, শুক, প্রভৃতি বিখ্যাত ঋষিগণের জন্মবৃত্তান্ত যাহা পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দারাও এই সকল শ্রেণীবিভাগের শিথিলতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ কর্ম্মজনিত শ্রেণী বিভাগের ও শ্রেণীবিভাগের শিথিলতা যদিচ আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে বিশেষরূপে গ্রথিত রহিয়াছে, তথাপি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে এইরূপশ্রেণী বিভাগের অন্য অন্য মতও প্রকটিত হইয়াছে। প্রধানতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অঙ্গ বিশেষ হইতে শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে ঋগ্‌বেদ সংহিতায় দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত এ সম্বন্ধে প্রাচীন প্রমাণ বলিয়া পৌরাণিক ঋষিগণ উল্লেখ করিয়াছেন। (এই সূক্তটী আমরা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।) * "তদনুসারে যাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র চরণ,

---

* ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪।১১।

† ন বিশেষে হস্তি বর্ণানাং সর্ব্ব ব্রহ্মমিদংজগৎ। ব্রহ্মনা পূর্ব্ব সৃষ্টিং হি কর্ম্মাণা বর্ণতা গতম্॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ও পদ্মপুরাণস্বর্গখণ্ড,

---

* সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ॥ ১
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্য।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি ॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতংদিবি॥৩
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ
ততোবিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎসাশনানশনে অভি ॥ ৪
তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্‌ভূমিমথো পুনঃ॥৫
যৎপুরুষেন হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ
তেন দেবা অয়জন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭
তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতম পৃষদাজ্যং।
পশূনতাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্‌গ্রাম্যাশ্চ যে॥৮

যিনি সর্ব্বব্যাপী, যিনি সকলের অগ্রে জন্মগ্রহণ করেন, দেবগণ সেই আদিপুরুষকে পশুর ন্যায় বন্ধন করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইলে তাহার মুখ ব্রাহ্মণ, দুই বাহু রাজন্য, উরু বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র হইল।"

বৈদিক ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদের ভাষা সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশের ন্যায় এই সূক্ত তত প্রাচীন নহে। বিশেষতঃ এই সূক্তের নবম ঋকপাঠে প্রতীয়মান হয় যে, ঋক, যজু, সাম বেদের মন্ত্র সমূহ বিভক্ত হইবার পর পুরুষ সূক্ত রচিত হইয়া ঋগ্বেদ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সূক্তে গ্রীষ্ম, শরৎ, ও বসন্ত ঋতুর উল্লেখ দ্বারাও ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক, পুরুষ সূক্ত সম্বন্ধে পাঠকদিগের যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তিনি তাহাই হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন। আমরা কাহারও বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু তদানীন্তন অবস্থার প্রতি লক্ষ করিয়া পুরুষসূক্ত-কার নারায়ণ ঋষি সমাজরূপ পুরুষের মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য ও শূদ্র চরণ বলিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সমযোচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥১০
যৎপুরুষংব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখংকিমস্য কৌ বাহূ কা উরূপাদা উচ্যেতে॥১১
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩
নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষংশীর্ষ্ণো দ্যৌঃসমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাংভূমির্দিশঃশ্রোত্রাত্তথালোকাঁ অকল্পয়ন্॥১৪
সপ্তাস্যাসন্পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুং ॥ ১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি
প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে
সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬

কড়ি ও কোমল।*

পুস্তক অনেকেই লেখে, এবং যে যা লেখে, তাই তাঁহার নিকট ভাল লাগে। ভাল না লাগিলে তাহা প্রকাশ করে কেন? কিন্তু অতি পুস্তকই জগতে আদর পায়, সাহিত্যে স্থায়ী হয়। বাঙ্গালার সাহিত্য-জগতে এখনও লেখকের সংখ্যা অল্প, যাঁহারা সাধারণের নিকট আদর পাইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা আরো অল্প। জলবিম্বের ন্যায় কত পুস্তক নিমেষের মধ্যে ক্ষণদেখা দিয়াই যেন কোথায় লুকাইয়া যায়,—আর খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। তবু কিন্তু অনেক লেখক অহঙ্কার করিতে ছাড়েন না। কেহ বা দুই একখানি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, কেহ বা দুই একখানি সঙ্কলিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া—অহঙ্কারে আর কিছুই দেখেন না।

---

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ১, পদ্যময় গ্রন্থ, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

এই অহঙ্কারে আর কাহারও কিছু অনিষ্ট হউক বা না হউক, সমালোচকগণের হাড় জ্বালাতন! পুস্তক দিয়া সমালোচনা না পাইলে কিছুতেই তাঁহারা ছাড়েন না। সমালোচনা মন্দ হইলেও যে দশা, না হইলেও সেই দশা,—গ্রন্থকারদিগের অহঙ্কার তাঁহাদিগকে নিন্দুকের পদে বরণ করে। সমালোচকগণের কিছুতেই নিস্তার নাই। যেমন পুস্তকই হউক না কেন, একবার পড়িতেই হইবে, দুকথা লিখিতেই হইবে। এ দুর্ভোগ যেন কাহাকেও ভুগিতে না হয়!

এই দুর্ভোগের অবস্থায় কিন্তু একটা সুখের আশা আছে। হঠাৎ যদি কোন ভাল পুস্তক হাতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না। যে পুস্তক একবার ছাড়িয়া দশবার পড়িতে ইচ্ছা হয়, এমন পুস্তক হাতে পাইলে আর আনন্দের সীমা কোথায়? এই এক আশাতেই সমালোচক-পদ লোকে গ্রহণ করে। আর যে আশা আছে, তাহা বলিয়া কাজ কি?

অনেক ছাই পাশ ঘাটিয়া আমরা এক খানি প্রকৃত কবির প্রকৃত হৃদয়ের ছাব পাইয়াছি। আমরা যে আনন্দিত হইয়াছি, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। কড়ি ও কোমল যে জীবনের ছবি—তাহাতে প্রতিভা আছে, সহৃদয়তা আছে, প্রেম আছে, জ্ঞান আছে। আর তার সঙ্গে একটু বাল-চঞ্চলতাও আছে।

রবীন্দ্র বাবু যে এক জন প্রথম শ্রেণীর কবি, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার বড়াল ও শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস, ইঁহারাও আমাদের বিবেচনায় এক শ্রেণীর কবি, কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর নীচে। ভাষার কমনীয়তায়, ভাবের উচ্ছ্বাসে, চিন্তার গভীরতায় ইনি সকলের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু গিরীন্দ্রমোহিনী এবং গোবিন্দ চন্দ্রের বিশেষত্ব এই, ইঁহারা উভয়েই ইংরাজি কবিদিগের গ্রন্থের সহিত অপরিচিত, সুতরাং ইঁহাদের কবিতায় অনুকরণ ভাগ কিছু অল্প। ইঁহারা উভয়েই স্বদেশের কবি, স্বদেশের ভাবুক। রবীন্দ্র বাবু এবং অক্ষয় বাবু যেন কিছু কিছু বিদেশের হইয়া গিয়াছেন। স্বভাবের বর্ণনায় গোবিন্দ চন্দ্র, বোধ করি, ইঁহাদের সকলের উপরে আসন পাইবার যোগ্য। কিন্তু সে কথার বিচারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

রবীন্দ্র বাবু এ পর্য্যন্ত গীতিকবিতাই লিখিতেছেন, অন্য দিকে তাঁহার শক্তি খেলিবে কি না, জানিনা। সুতরাং আমাদের দেশের খ্যাতনামা কবিদিগের সহিত ইঁহার তুলনা চলে না। কিন্তু এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া এ যুগের অধিনায়ক হইয়া বসিয়াছেন। এখনও তাঁহার অল্প বয়স, এখনও অনেক বাকী আছে। কিন্তু এখনই তিনি কবিত্ব জগতে যে আসন পাইয়াছেন, তাহা যার তার ভাগ্যে ঘটে না। ইঁহার আবির্ভাবের পর, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতার প্রতি যে লোকের আদর কমিয়াছে, এ কথায় আর সন্দেহ নাই। এই উভয় কবিই, খণ্ড কবিতা সম্বন্ধে অন্তত, রবীন্দ্র নাথের উজ্জ্বল প্রতিভার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছেন।

কড়ি ও কোমল—অতি উচ্চদরের পুস্তক। কয়েকটী পদ্য বিশ্ব, [illegible] পড়া যায়

সেইটীই চমৎকার,—কি ভাবের জমাট, কি চিন্তার ছটা, কি বর্ণনার গরিমা, সকলই আশ্চর্য্য। বাস্তবিকই আমরা কড়ি ও কোমল পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ইচ্ছা হয়, দুই একটী কবিতা তুলিয়া দেখাই, কিন্তু আবার মনে হয়, কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী তুলিব? অধিকাংশই যখন ভাল, তখন পাঠক পুস্তক না পড়িলে কেমনে যে এ পুস্তকের সৌন্দর্য্য বুঝিবেন, জানিনা। এই জন্য একান্ত অনুরোধ, সকলেই এ পুস্তক খানি একবার পড়েন।

আমরা নমুনা স্বরূপ দুই চারিটী কবিতা মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

১। পূর্ণমিলন।

নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন!
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে,
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে,
অনন্তকালের মোর জীবন মরণ!
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণ,
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্ খানে!

২। স্তন।

পবিত্র সুমেরু বটে এই সে হেথায়,
দেবতা বিহার ভূমি কনক-অচল।
উন্নত সতীর স্তন স্বরগ-প্রভায়
মানবের মর্ত্ত্যভূমি করেছে উজ্জ্বল।
শিশু-রবি হোথা হতে ওঠে সুপ্রভাতে,
শ্রান্তরবি সন্ধ্যাবেলা হোথা অস্ত যায়।
দেবতার আঁখিতারা জেগে থাকে রাতে
বিমল পবিত্র দুটী বিজন শিখরে।
চির স্নেহ উৎস-ধারে অমৃত নির্ঝরে
সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
জাগে সদা সুখ-সুপ্ত ধরণীর পরে,
অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি
দেব-শিশু মানবের ঐ মাতৃভূমি॥

চিন্তা কত গভীর, ভাব কত মহান। কিন্তু ইহাপেক্ষা মধুর কবিতা আরো আছে। তারও দুই একটী নমুনা দি।

১। মথুরায়—

বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ,
কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন
কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?

২। নদী এল বাণ—

দিনের আলো নিবে এল,
সূর্য্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা
বাজ্‌ল ঠং ঠং।

৩। অস্তমান রবি—

থাম ওই সমুদ্রের প্রান্ত-রেখা পরে,
মুখে মোর রাখ তব একমাত্র আঁখি।

দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
তুমি চেয়ে থাক আর আমি চেয়ে থাকি!
দুজনের আঁখিপরে সায়াহ্ন আঁধার
আঁখির পাতার মত আসুক মুদিয়া,
গভীর তিমির-স্নিগ্ধ শান্তির পাথার
নিবায়ে ফেলুক আজি দুটি দীপ্ত হিয়া!
শেষ গান সাঙ্গ করে থেমে গেছে পাখী,
আমার এ গানখানি ছিল শুধু বাকী!

প্রতিভা ও চিন্তার পরিচয় দিয়াছি, ভাবের পরিচয় দিয়াছি, সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিয়াছি! রবীন্দ্র নাথের হৃদয়ের পরিচয় এখনো বাকী। তাঁহার হৃদয়ের পরিচয়, বঙ্গভূমির প্রতি, এবং বঙ্গবাসীর প্রতি আহ্বান গীতির প্রতি ছত্রে অমৃত অক্ষরে লেখা আছে। দুঃখিনী মাতৃভূমির ঋণ এইরূপে যদি পরিশোধ করিয়া যাইতে পারেন, তবেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

কবি বলেন—

"হাসি মুখে নিও ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।"

এ ফুলও যদি শুকায়, তবে এ দেশে স্থায়ী হইবে কি, জানি না।

কড়ি ও কোমলে আমরা রবীন্দ্র নাথের কিছু চঞ্চলতা, কিছু বালকত্বও দেখিয়াছি। কবির লেখা কবির নিকট আদরের হইতে পারে, কিন্তু দামু বসু ও চামু বসুর পত্র আমাদের নিকট আদরের হয় নাই, বরং ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। স্থায়ী সাহিত্যে এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি বা অহঙ্কার পূর্ণ ছড়া কাটাকাটি স্থান না পাইলেই ভাল হয়। হিংসা বিদ্বেষে যে দেশ ছারখারে চলিল, সে দেশে আবার এরূপ লেখাকেও কি স্থায়ী করিতে আছে? আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।

এ পুস্তকে আরো কিছু কিছু সামান্য দোষ আছে। স্থানে স্থানে লেখকের মনের বিকার-কালিমার কিছু কিছু অস্ফুট ছায়া ফুটিয়াছে। সেগুলি এ পুস্তকে না থাকিলেই ভাল হইত।

শ্রীমতী ইন্দিরার নিকট কবি যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অনেক স্থানেই বেশ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানে স্থানে অসার কথায় পূর্ণ,—এ সকল পত্রগুলি অন্য পুস্তকে ছাপাইলেই ভাল হইত।

"মাগো আমার লক্ষ্মী,
মনিষ্যি না পক্ষী!
এই ছিলেম তরীতে,
কোথায় এনু ত্বরিতে!
কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে ত আর ভুল নাই,
কল্‌কাতায় এসিছি সদ্য,
বসে বসে লিখ্‌ছি পদ্য।"

এইগুলি কি না ছাপাইলেই চলিত না? এগুলি সন্নিবেশিত করা সম্পাদকের নিতান্তই ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর রবীন্দ্র বাবু যদি ছাপাইতে বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কি আমরা এতই অহঙ্কারী মনে করিব যে, তাঁর সব লেখাই তিনি ছাপানের উপযুক্ত মনে করেন? মোট কথা, আমাদের বিবেচনায় কাজটা ভাল হয় নাই।

রবীন্দ্র বাবুর দোষ গুণের কথা অনেক বলিয়াছি, আর সংক্ষেপে বলা সম্ভব পর নয়। আমাদের আশা আছে, রবীন্দ্র বাবুর কবিতা এদেশে অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পদ্মফুল।

কি খেনে দেখিনু তোরে পদ্ম মনোহর,
পরাণ পাগল করা
কি আছে ও মুখে ভরা
কি মধু মাখানো তোর কোমল অধর ?
বল্ নারে কি যে দিয়া
পাগল করিলি হিয়া
এত 'গুণ' গায় তোর কেন মধুকর ?
কি দিয়ে করিলি পদ্ম পাগল অন্তর ?
পদ্ম !
কি সুধা মা'খানো তোর হাসি মনোহর !
অমরা করিয়া খালি
এতো সুধা কোথা পা'লি,
কলঙ্ক লজ্জায় দেখ্ ম্লান সুধাকর !
দেখিলেরে তোর হাসি
অস্তাচলে যায় শশী,
পারেনা দেখা'তে মুখ দিনে শশধর !
এত সুধা পালি কোথা কুসুম সুন্দর ?
এমন রূপের রাশি পা'লি কোথা ফুল ?
আরো কত ফুল আছে,
ফুটে থাকে গাছে গাছে
কেহ ত করেনা প্রাণ এমন আকুল !
এমন মধুর বাস
এমন মধুর হাস
দেখিনি এমন কোন মঞ্জরী মুকুল ?
এমন রূপের রাশি পা'লি কোথা ফুল ?
কেনরে দেখিনু তোরে পদ্ম মনোহর,
ঘেঁসিতে পারিনা কাছে
গায় তোর কাঁটা আছে
বেড়িয়া রয়েছে তোরে কাল বিষধর,
যদিও সাহস করি
তবু ভয় ডুবে মরি,
হায় কি বিপদে আজি ফেলিল ঈশ্বর !
কি খেনে দেখিনু তোরে পদ্ম মনোহর ?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

অচেনা প্রেম।

আপনি আপন প্রেমে
জগৎ বেড়ায় মাতি,
সাগর তরঙ্গে হাসে
আপনি রবির ভাতি,
ডাকিয়া ডাকিয়া তারে
সাগরে আনেনা কেউ,
আপনি বাতাস বহে
তুলিয়া ভাবের ঢেউ।
বল্ তবে তুই কেন
যাস্ রে ছুটিয়া সেথা,
বুঝিতে পারিস্ কি সে
অচেনা-প্রেমের কথা !
বৃথা আশা বালকের
অসার প্রলাপ হেন,
হৃদয়ের কথা তারে
ডাকিয়া সুধাস্ কেন ?
এ জগৎ স্বার্থপর
আপনার ভাবে ভোর,
এ মলিন মুখ পানে
কে ফিরে চাহিবে তোর ?
তোর লাগি বহে নারে
মলয় পবন ধীরে,
তোর লাগি উঠে নারে
লহরী সাগর নীরে !
তোর লাগি দোলে নারে
শ্যামল গাছের পাতা,
তোর মুখ পানে চেয়ে
কুসুমে হাসেনা লতা।
নাইবা হাসুক তারা
তায় কিবা আসে যায়,
তা বলে কি ভাল বেসে
পরাণ দিবিনে তায় !

আপনার আশা রেখে
কে কোথায় কোন দিন,
পরাণে পরাণ বাঁধি,
প্রেমেতে হয়েছে লীন!

শ্রীরেবতী মোহন রায় মৌলিক।

মৃত আশা।

হৃদয় শ্মশান মোর!
কত আশা পুড়ি পুড়ি
এখনে হয়েছে ছাই,
কত আশা দেখা দিল
নিমিষেতে আর নাই!
কত আশা গেয়ে ছিল
মধুর মঙ্গল গান,
পরাণ প্রান্তরে বসি
বাঁশীতে পূরিয়া তান!
গান না ফুরাতে তারা
গিয়েছেরে মরিয়া!
তাদেরে রেখেছে কাল
এখানেই পোড়াইয়া!
ছোট বড় কত আশা
আশে পাশে আছে মরি,
এক দিন হবে ছাই
এ শ্মশানে পুড়ি পুড়ি!

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রভাত।

জগৎ ছাড়িয়া কোথা গিয়াছে বিষাদ,
আনন্দের শিশু শোভে ধরণীর কোলে,
রবির কিরণ হতে ক্ষরিছে প্রসাদ,
তরুপরে গান-মাখা পাতাগুলি দোলে।
জগতের শিব কল্পে আঁধার স্থজিয়া
প্রকৃতি বসিয়াছিল চিন্ময়ের ধ্যানে,
মনোরথ সিদ্ধ বুঝি হয়েছে বলিয়া
প্রভাতের হাসি আজ প্রসন্ন বয়ানে?
কে যেন কহিছে ধীরে হতে কার্য্যশীল,
কে যেন স্থজিছে মনে মধুর কল্পনা,
অলসে জীবন দিয়া ছুটিছে অনিল,
পলাইছে বিশ্ব হতে নরের যাতনা।
প্রাণনাথ এত হর্ষ গঠেছ যা দিয়া
তাই দিয়া পূর্ণ করে রাখ এই হিয়া।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (দ্বিতীয়)

আকাঙ্ক্ষা।

আও মেরে সখী চমেলিয়া,
আও মেরে প্রিয় বিহগীয়া,
আও মেরে ছোটী ননদীয়া,
সবে মিলি চলো যাঁহা পিয়া।
গোলাব চম্পোকি কনিয়া কনিয়া, *
মালা গুঁথি লওরি মালিনীয়া,
যব্ যাওঙ্গি দরশনকো আশে,
সব ডারোঙ্গি ¶ পিয়াগর † পাশে।
আও নীলাম্বর সুখগীত গাতে,
আও চন্দ্রমা সুখে মেরে সাথে,
যাঁহা সুখে পিয়া বিরাজ করত,
চল মেরে সাথ ঢুলত ঢুলত।
তারে তারে বিজলী চমকে,
চলো সবে মিলি ঠমকে ঠমকে,
গিয়া দরশন সুখ গভীর,
দূর দেগা ‡ মোর প্রাণ-তিমির।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

---

* কনিয়া—ফুলের কুঁড়ি।
¶ ডারেঙ্গে—অর্পণ করিব।
† পিয়াগর—প্রিয় জনের গলায়;
‡ দূর দেগা—দূর করিয়া দিবে।

উৎসব।
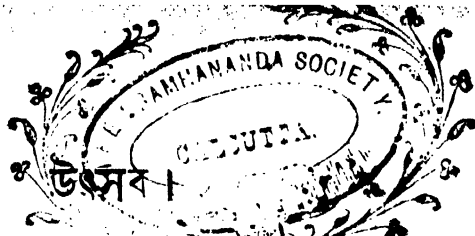
মানুষ কিছু আনন্দ-প্রিয়, কিছু সুখ-প্রিয়। কিন্তু প্রকৃতি, কি জানি কেন, মনুষকে কেবল সুখ, কেবল আনন্দ দিতে চায় না। শিশুর কোমল মুখের মধুর হাসিতে কিছু আনন্দ খেলে, সে শিশু সকলের ঘরে জুটে না। যার ঘরে জুটে,—তার ঘরেও শিশু চিরকাল থাকে না। কখন রোগ, কখনও মরণ সে হাসির বাদ সাধে। তা না হইলেও শিশু ত আর চিরকাল শিশু থাকেনা, বয়স তাহাকে মানুষ করে। সুতরাং মানুষ চিরকাল আনন্দের অধিকারী হয় না। বসন্তের স্নিগ্ধ মলয় বড়ই সুখপ্রদ, কিন্তু তাহা কাদনের জন্য? আজ আছে, কাল নাই। এইরূপ একটী, একটী, একটী করিয়া পৃথিবীর সুখ বা আনন্দের যে বস্তুটীকে ধরা যায়, তাতেই কি-যেন-বিষাদ-রেখা, কি-যেন-যায়-যায়-লেখা,—কিছুতেই চির আনন্দ, চির সুখ মিলে না। মিলে না, কিন্তু মানুষও সুখ ছাড়া, আনন্দ ছাড়া থাকিতে রাজি নয়। কি বিভ্রাট!

মানুষ চায় কেবল হাসিতে, কেবল খেলিতে, কেবল নাচিতে!—প্রকৃতি চায় তাহাকে কাঁদাইতে, কর্ম্মে মাতাইতে,—কেবল জাগাইতে! সেই জন্যই বুঝি মানুষ কাঁদে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে পরাজিত হওয়াতেই মানুষের চক্ষে বুঝি জল দেখা যায়। তাই বুঝি, মানুষ হাসে, আবার কাঁদে। কাঁদে বলিয়াই কি হাসি, আরো মিষ্ট লাগে? মানুষ তাহা কিন্তু বুঝেনা। প্রকৃতি মানুষকে কাঁদাইয়া ছাড়িবেই ছাড়িবে। বসন্তের সুস্নিগ্ধ মলয়ের পর গ্রীষ্মের, উষ্ণ বায়ু, সুখের পর দুঃখ, সম্পদের পর বিপদ, জীবনের পর মরণ,—আসক্তির ধারে বৈরাগ্য,—মিলনের ধারে বিচ্ছেদ—তাই প্রকৃতির নিয়ম!! জন্মিলেই মরিতে হইবে,—আসিলেই যাইতে হইবে,—হাসিলেই কাঁদিতে হইবে, প্রকৃতির এ কি নিদারুণ নিয়ম-বাণী!! ইহার ভয়ে মানুষ জড়সড়, অস্থির, কম্পিত-কলেবর।

বসন্তের পর গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণ কষাঘাত বড়ই মর্ম্মপীড়ক, ইহা জানিয়াও মানুষ বসন্তের মলয়ের মধুর আবাহনে চিরকাল উন্মত্ত,—সে মন-মুগ্ধকর হাসিতে বিভোর। আজ ঘরে নব শিশুর জন্ম,—সে শিশু চিরকাল গৃহে থাকিয়া হাসিবে না, জানিয়াও পিতা মাতা আনন্দে মাতোয়ারা। মিলনের পর বিচ্ছেদ আসিতেছে, ইহা ভাবিয়া মিলনের সুখকে কে উপেক্ষা করিতে পারে? মরণ করাল মুখ ব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে জানিয়াও, কে জীবনের মায়া মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া আজই বিষাদ ও নিরানন্দের বেশ ধারণ করিতে পারে। কেহই পারে না। পারিলে—এ সংসারে হাসি, আনন্দ কাহারও ভাগ্যে ঘটিত না। সংসারের কোলে দিবারাত্রি শত চিতা হুহু ধু ধু করিয়া বিকট হাস্যে জ্বলিতেছে—কত সুখ, কত আসক্তিকে নিমিষে ভস্ম করিতেছে, কিন্তু তবুও সংসার আনন্দের! শ্মশানের ভিতর

হইতেই যেন কি এক আনন্দের উচ্চ রোল,—বিকটহাসি উঠিতেছে! মানুষ, সংসার-শ্মশানে বসিয়াই আনন্দের করতালি দিতেছে! এক পা পরকালে দিয়াও আবার আশার ঘর বাঁধিতেছে, সুখের রস ভঙ্গ করিতেছেনা। মানুষ নিতান্তই সুখ-প্রিয় জীব।

সংসারের এই সুখ, এই আনন্দ—নানা কথায় নানা রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শত শত উৎসবে এই আনন্দের নামকরণ হইয়াছে। পারিবারিক উৎসব, সামাজিক উৎসব, পারত্রিক উৎসব, যাহার নাম কর, এসকলই আনন্দের স্ফুট হাসি, স্ফুট কেলি বিশেষ। জন্মতিথি, নামকরণ, চূড়াকরণ, বিবাহ—এ সকলই আনন্দের অনুষ্ঠান। দাম্পত্য প্রেম, পিতৃ মাতৃস্নেহ—এ সকলই সুখের লীলা। আবার অন্য দিকে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক,—সঙ্গীত, বাদ্য, তামাসা, অভিনয়—এ সকলই আনন্দের নানা অঙ্গ। মানুষ হাসে, গায়, খেলে যায়—জীবনে আমোদের খেলা খেলিয়া ঐ দেখ সে যেন কোথায় যায়! রঙ্গালয়ে বেশ্যা নাচে, মানুষ হাসিয়াই অস্থির। মদ খাইয়া মানুষ জ্ঞানহারা, মানুষ তাহা দেখিয়া হাসিয়াই অস্থির! দ্বারে অনাহারী ভিক্ষুক উচ্চরবে ক্রন্দন করিতেছে, দেখিয়া মানুষ হাসিয়াই অস্থির। গৃহের পার্শ্বে পুত্র-হারা জননী ক্রন্দন করিতেছেন,—মানুষ তাহা শুনিয়াও বিবাহোৎসবে মত্ত হইতেছে! কোথায় বা পরদুঃখকাতরতা, কোথা বা সহানুভূতি! সারাদিন সংসারে এইরূপ কত বিচিত্র আনন্দের অভিনয় হইতেছে! মানুষ অভিনয় করে, অন্য মানুষ তাহা দেখে আর হাসে। তার হাসি দেখিয়া অন্য আবার হাসে। সকলের কাজেই সকলে হাসে। ভাবের ঢেউ—হাসির ঢেউ, অবিরত এই সংসারে উঠিতেছে। মানুষ হাসিয়া, খেলিয়া, কোথায় যেন উঁকি মারিতেছে! উঁকি মারিতেছে, নিমেষের মধ্যে শেষ হাসি দপ্ করিয়া নিবিয়া যাইল—মরণের কোলে সকল হাসি চির-নির্ব্বাণ পাইল! যত দিন মানুষ সংসারে, ততদিন ছিন্নমতি মানুষ কেবল আনন্দ, কেবল হাসিই চায়। হা ঈশ্বর, তুমি কিছুতেই মানুষকে কাঁদাইয়া সজাগ করিতে পারিলে না! কিছুতেই স্থির গম্ভীর বা প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলে না! কিছুতেই উভয় বস্তুতে মানুষকে দীক্ষিত করিতে পারিলে না!

এই ভবের বাজারে মানুষ যেন কেবল ছেলে খেলাতেই মত্ত। সে যাহা করে, সকল তাতেই যেন বাল-চাপল্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। কেবল হুজুগ—কেবল আন্দোলন—কেবল আনন্দের উচ্চ হাসি। কেন কে জানে, মানুষ পরকালের জন্য ভয়ে ভয়ে যাহা কিছু করে, তাতেও যেন এই চপলতা প্রকাশ পায়। মানুষ কর্ত্তব্যের আদেশে দান করে, তাহাও সংবাদপত্রে উঠে; মানুষ প্রাণের টানে আত্মসংযম করে, তারও একটা কোলাহল তুলে। ধর্ম্ম—যাহা মোটেই বাহিরের জিনিস নয়,—যাহা সংসারের জিনিস মোটেই নয়, কঠোর অগ্নি পরীক্ষা যাহার পরিণাম,—আত্মত্যাগ বা মহা বৈরাগ্য যাহার লক্ষ্য—তাহাতেও মানুষ এই বাল-চাঞ্চল্যের পরিচয় দেয়। তাতেও মানুষ হুজুগের খেলা, বৃথা হই-চই ঢোল ঢাক না পিটাইয়া পারে না। ধর্ম্ম, যাহা প্রাণের উপভোগের জিনিস;—ঈশ্বর, যিনি

দেশ কালের অতীত প্রাণের একমাত্র সম্বল;এ সকল লইয়াও মানুষ হাসি তামাসা —বৃথা উৎসব করে! মানুষের কি চঞ্চল প্রকৃতি!

কেহ প্রতিমা গড়াইয়া চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্প দূর্ব্বাদলে দেব পূজা করে, তার নামও ধর্ম্ম; কেহ বা সুরাপানে বিভোর হইয়া আদ্যাশক্তির পূজা করে, তবে নামও ধর্ম্ম। আর কেহ বা অনাহারে শরীর পাত করিয়া বৈরাগ্য দেখায়, তাহার নামও ধর্ম্ম। কেহবা উচ্চ কথায় উপাসনা করিয়া গগণ ফাটায়, তাহার নামও ধর্ম্ম, কেহবা নরবলি দিয়া মনের সাধ মিটায়, তাহার নামও ধর্ম্ম। খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হইয়া বা ভাবে ভোর হইয়া মানুষ যত কিছু করে, সে সকলই নাকি ধর্ম্ম! দস্যু অন্যের বক্ষে ছুরিকার আঘাত করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে যাইবে—তার পূর্ব্বে মহামায়ার আরাধনা করে;—আর শত্রু নিপাতের জন্য কেহ বা মহাযজ্ঞের সূত্রপাত করিয়া মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা দেখায়! এ সকলই ধর্ম্ম! মানুষের খামখেয়ালির হট্টহাসি, বিধাত, কিছুতেই থামাইতে পারিলে না!

মানুষের হাসি তামাসা গান বাদ্য, এ সকল পৃথিবীতে ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া ধর্ম্ম নামে অভিহিত। অথবা মানুষের আনন্দময় প্রকৃতি, সুতরাং ধর্ম্মেও জাঁকজমক, হাসিতামাসা না করিয়া পারে না। ধর্ম্মজগতে কত আনন্দ—একবার দেখ। শত্রু বিনাশের জন্য অকালে রামচন্দ্র ভগবতীর আরাধনা করিতেছেন—আজ বঙ্গে দুর্গোৎসব,—মদ্য পান ও ব্যভিচারের মহা নৃত্য—মহা আনন্দ। খ্রীষ্টের মৃত্যু-দিবস স্মৃতির অমূল্য দিন—মহা আনন্দের পার্ব্বণ। মহরম মহাশোকের পার্ব্বণ, তাহাও আনন্দের লীলায় আজ পরিসমাপ্ত। এইরূপ একে একে যত উৎসব আছে, খুব গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, বুঝিবে, এ সকল ধর্ম্মের বাহ্য প্রকাশ মানুষের বাল-চাঞ্চল্যের এক মাত্র পরিচয় মাত্র। অথবা মানুষের হাসিময় স্বভাবের বাহ্য বিকাশ মাত্র। ইহার সহিত ধর্ম্মের—পরকালের যে কি যোগ, কিছুই বুঝি না। তবে যদি বল, সাধারণের জন্য ধর্ম্মের বাহ্য প্রকাশ, বা বাহ্য প্রণালী চাই। কিন্তু জীবন-শূন্য, কায়া-শূন্য বাহ্য প্রণালী বা বাহ্য ছায়ার কথনই আদর করা উচিত নয়। কিন্তু সে কথা কে শুনিবে? ধর্ম্মের নামেও দেখ, পৃথিবীতে কত কায়া শূন্য উৎসব হইতেছে! একটু মাতামাতি, একটু হাসাহাসি, একটু নাচানাচি মানুষ না করিয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্যই যে ধর্ম্ম দেশ কালের অতীত, প্রাণের উপভোগের জিনিস, সেই ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে এত উৎসব। উৎসব কি?—ভগবান সম্ভোগ?—আত্মায় পরমাত্মায় যোগ? তাহা ত সর্ব্বকালে, সর্ব্বমুহূর্ত্তের ব্যাপার। অমুক মাসে, অমুক দিনে ভগবান আসিবেন, তাঁহাকে লইয়া সেই দিন নৃত্য করিব, আজ উপবাসে থাকিব? ছি, মন, এ বালকের খেলা কেন? তিনি তখন, তিনি এখন। তিনি সেই দিন, তিনি এই দিন। ছমাস পর তাঁকে সম্ভোগ করির?—প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত প্রেমিক ইহা সহ্য করিতে পারেন না। তিনি চান, এখনই। সব বর্ত্তমানের জন্য। যদি বল,অতীত বিশেষ দিনের স্মৃতি মধুময়। সে স্মৃতি, এখন, তখন, সর্ব্বসময়। যে সময় যায়, সে সময় কি আর ফিরে? যে দিন

গিয়াছে, সে দিন গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না? তবে কেন বৃথা ছায়া-মায়ার পূজা করিব? অতীত মরণের দেবতাকে কেন ডাকিব?—কেন হাসিব, কেন মাতিব? নূতন দেবতা নূতন ঘটনায় প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতেছেন! তাঁকে দেখিব না? প্রাচীন লোকেরা যে ঘটনায় যেরূপে বিধাতাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তুমি আমি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি পাইয়াও কেবল সেইরূপ ঘটনায় তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিব? বিধাতা প্রতি মুহূর্ত্তে অনন্ত ঘটনার মধ্য দিয়া নব নব ভাবে মানুষের নিকট প্রকাশিত হইতেছেন। মানুষ তাহা দেখিবে না, কিন্তু অতীতের স্মৃতি ধরিয়া বৃথা আমোদ, বৃথা মাতামাতির জন্য, হুজুগের জন্য—বসিয়া থাকিবে! কি অসার প্রকৃতি!

প্রকৃত প্রেমিক যে,—ভাবুক যে, সে ক্ষণস্থায়ী হাসি, কান্না, আনন্দ বা নিরানন্দ, মিলন বা বিচ্ছেদ, এসকলে বড় একটা আত্ম-সমর্পণ করেন না। যে সাগরে ঢেউ আছে, সে সাগর অকূল নয়। যে প্রেমে উচ্ছ্বাস আছে, সে প্রেম গভীর নয়। অকূল প্রেম-সাগরে ঢেউ নাই—উচ্ছ্বাস নাই,—মাতামাতি নাই, আনন্দ বা নিরানন্দ নাই। আছি ত আছি, নাই ত নাই। সুখ বল, সেও ভাল; দুঃখ, সেও ভাল। জীবন আছে, থাকুক,—মরণ আসে আসুক। হাসি কান্না, সুখদুঃখ, এ সকল প্রকৃত প্রেমিকের জীবনে নামা-উঠা ভাব নাই, বৃথা তরঙ্গ-গর্জ্জন নাই। আছে কি?—কেবল বিশ্বপতি! প্রেমিক, তিনিময় হইয়া বসিয়া থাকেন। তাঁর নিজের আনন্দ বা উল্লাস উড়িয়া গিয়াছে। চিন্ময়ের হাসিতে তিনি চির-প্রফুল্ল;—তাঁর হৃদয় ঘরে নিত্যানন্দ,—নিত্য উৎসব। বিচ্ছেদও নাই, আবাহনও নাই। সেই আনন্দ অনন্ত ধারে, অনন্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া, প্রাণে নীরবে অবতীর্ণ হইতেছে। প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয় অতলস্পর্শ;—হাসি নৃত্যের বাহ্য প্রকাশ সেখানে অন্তর্হিত।

যাহারা সেরূপ প্রেমিক নয়, তাহারা উৎসব করিবে কি না, এখন প্রশ্ন এই। তাহারা অবশ্য উৎসব করিবে, কারণ মানুষের প্রকৃতিই এই। মানুষ আনন্দ ছাড়া থাকিতে পারে না। এতে ধর্ম্ম লাভ না হইলেও যে সুখ লাভ হয়, তাতে আর সন্দেহ নাই। উৎসব বাদ্যাদি প্রকৃতধর্ম্মের ব্যাপার না হইলেও আনন্দের ব্যাপার ত বটে। ইহাতে ঈশ্বর লাভ না হইলেও সুখ-স্পৃহা যে চরিতার্থ হয়, তাতে ত আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কাছে থাকিতেও যে জন তাঁকে না দেখিয়া আবাহন করে,—প্রাণের মধ্যে তাঁর প্রকাশ অনুভব না করিয়া যে জন অন্যের জীবনের ঘটনায় তাঁর প্রকাশ দেখিতে উৎকণ্ঠিত, সে অপ্রেমিক অবিশ্বাসী কোটী বৎসর উৎসব করিলেও তাঁকে দেখিতে পাইবে কি না, সন্দেহ। প্রতিমা নির্ম্মাণ করা, প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দেওয়া,—মানুষের কাজ। দেবতার প্রকাশ, হরির লীলা—হরির কৃপার ফল। তাঁর কৃপা ভিন্ন মানুষের শত শত চেষ্টা পরাস্ত। তাঁর কৃপা প্রতি ঘটনায়, প্রতি অণু পরমাণুতে—অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত ভাবে। যে জন তাহা দেখে না, সে কেমনে তাঁহাকে পাইবে বল ত?—তাঁর কৃপা ভিন্ন মানুষ কেমনে তাঁহাকে দেখিবে? বুঝি না। বৃথা আমোদ, বৃথা উল্লাস, বৃথা নৃত্য—

বালকের ক্রীড়া মাত্র। কিছু ক্ষণ পরেই অবসাদ, কিছুক্ষণ পরেই আবার ক্রন্দন। যাঁর আবাহনও নাই, বিসর্জ্জনও নাই—যিনি নিত্য পাপীর সহচর,তাঁকে লইয়া এক দিন বা দশ দিন উৎসব করা মহা ভুল। অনন্ত দেবতার অনন্ত উৎসব—অনন্তকাল স্থায়ী, তার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। সে নীরব নিত্যানন্দময় মধুর উৎসবে যে যাইবে, হুজুক ছাড়িয়া চ'লে এস।

জাতীয় মহাসমিতি।

এবার মান্দ্রাজের পালা,—মান্দ্রাজ সহরে খুব ধুম ধামের সহিত জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। যাহা জাতীয়, তাহাই আদরের। কাজেই মহাসমিতি অল্পে অল্পে এদেশে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। প্রতিপত্তি লাভের কথাও বটে। এক বৎসর, দুবৎসর, তিন বৎসর চলিয়া যাইলেও যাহার অস্তিত্ব লোপ পাইল না, বরং এক গুণ উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইতে চলিল,সে সভা যে এই হুজুগ-প্রিয়তার দিনে সর্ব্ব সাধারণের আদর পাইবে, তাহা বিচিত্র নয়। বিশেষত কে কবে মনে করিতে পারিয়াছিল যে, এক-প্রাণতার স্বর্গীয় মনোমোহন ছবি ভারতে এত শীঘ্র দেখা যাইবে? আজ হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খৃষ্টান,—দেশ কাল, জাতি সম্প্রদায় ভুলিয়া এক মহা যজ্ঞে আহূত,—এক মহাব্রতে ব্রতী। ইতিহাসের উজ্জ্বল ঘটনা,—স্বপ্নের অতীত চিত্র। ভারতে আজ স্বর্গের বিজয়ভেরী বাজিতেছে। আজ ভাই ভাই এক প্রাণ, এক হৃদয়—আজ ভারতে একতার স্বর্গীয় ছবি প্রস্ফুটিত। এই আনন্দের দিনে গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল—দেশে দেশে আনন্দের শুভ বার্ত্তা। ধন্য ভারতভূমি, ধন্য ইংরাজি শিক্ষা!

মান্দ্রাজ সহর মহাযজ্ঞের আয়োজনে আজকাল খুব ব্যস্ত। অতিথি-সেবা ভারতের এক প্রাচীন কীর্ত্তি। মান্দ্রাজ অতিথি সেবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয়ের বন্দোবস্ত করিতেছেন। চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিনিধিগণ মান্দ্রাজাভিমুখী হইতেছেন। চতুর্দ্দিকে মহা আয়োজন চলিতেছে। শিক্ষিত সমাজ আজ জাগরিত। বেশ ভূষায় সজ্জিত ভারত আজ পৃথিবীকে আহ্বান করিয়া যেন ডাকিয়া বলিতেছেন—দেখ আবার আমার একতার দিন, আবার সত্য যুগ আসিতেছে। পৃথিবী চকিত হইয়া ঐদিকে উকি ঝুকি মারিতেছেন। সাহেব-মহলে একটু ফিস্ ফাস চলিতেছে—ইংলণ্ডের যেন একটু মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডও একটু সচকিত হইয়া উঠিতেছেন। আর পৃথিবী?—পৃথিবী কেবল আশার কাহিনী শুনিবার জন্য কর্ণ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন।

শিক্ষিত সমাজ জাগরিত—আর অশিক্ষিত সমাজ?—ভারত যে তিমিরে সেই তিমিরে। হাসে, নাচে, গায়, মাতে—সকলই শিক্ষিত শ্রেণী, কিন্তু অশিক্ষিত সমাজ?—যে নিদ্রিত, সেই নিদ্রিত। দলে দলে শিক্ষিত শ্রেণী আজ চলিয়াছেন,—

কিন্তু নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধি, একটী মোড়ল বা একটী সর্দ্দারও যাইতেছেন না। গ্রাম্য সমিতির কথাই বল বা প্রজা সভার আন্দোলনের কথাই পাড়,—এদেশের নিম্ন শ্রেণীর গতি মুক্তি নাই। এক দিন, দুদিন তিন দিন বল, তাদের জন্য একটু খাটিতে পারি, কিন্তু চিরকাল তাদের জন্য কে উঠিয়া পরিয়া লাগিয়া থাকিবে বলত?—সুতরাং তাহাদের আর জাগরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা না জাগিলে ভারতই বা কেমনে জাগিবে? তাই দেখ, ভারত জাগিয়াও আজ জাগে না। তাই দেখ, ভারত হাসিয়াও হাসে না। কি যেন বিষাদ-রেখা এই শুভ দিনেও দেখা যাইতেছে। মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন—"এদেশের নিম্ন শ্রেণীর গতি না ফিরিলে দেশের গতি ফিরিবে না। নিম্নশ্রেণীর গতিও ফিরিবে না, সুতরাং দেশের মঙ্গলও হইবে না।" বাস্তবিক যে দেশের পনের আনা লোক অশিক্ষিত, যে দেশের পনের আনা লোক মহা কাল-নিদ্রায় নিদ্রিত, সেই দেশের পরিণাম ভাল হইবে কিরূপে?—আমরা কিছুই জানি না। পৃথিবী এই নিম্নশ্রেণীর গতি ফিরে কি না দেখিবার জন্য চাহিয়া আছেন। ভারত কি উত্তর দিবে?

মহাসমিতি কি ইহার একটা উপায় করিবেন না?—আমরা এখনও কিন্তু তাহার বড়কিছু পরিচয় পাইতেছি না। লাট সভায় দেশের প্রতিনিধি পাঠানের কথা, স্বায়ত্ত শাসনের কথা, সিবিল সর্ব্বিসের কথা, স্বেচ্ছাসৈনিকের কথা—ইত্যাদি যে কথার আলোচনা কর, এ সমস্তই শিক্ষিতদের সুবিধার কথা মাত্র। অশিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য কোন কথা নয়। যদি বল, কেন, এ সকলে তাহারা প্রতিনিধি দিক্ না কেন? প্রতিনিধি দিবে বা কে? তাদের ডাকে বা কে? তাহারা যে মহা নিদ্রায়, না জাগাইলে তাহারা কখনও উঠিবে না। এখন কথা এই, ডাকে কে, তাদের জন্য খাটে কে? শিক্ষিত ব্যক্তিরা জোট বাঁধিয়া শিক্ষিতদের সুবিধা করিবার জন্যই ব্যতিব্যস্ত। কাজেই বলি, এমহাসভাকে জাতীয় মহাসমিতি নাম না দিয়া, শিক্ষিত মহাসমিতি নাম দিলেই ভাল হয়।

এস্থলে আমাদের মনে একটী কথা জাগিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা কোন এক বিরাট প্রজা-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে সভায় অনেক প্রজা উপস্থিত ছিল। প্রায় ১৫০০০ হইবে। বড় বড় ব্যক্তিরা অনেক বড় বড় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কেহ ইংরাজিতে, কেহ বা বাঙ্গালায়। যাহারা তাহা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা অনেকেই তাহা বুঝে নাই। আর অনেকে কিছুই শুনিতে পায় নাই। সভা ভঙ্গ হইলে প্রজারা পরস্পরের নিকট বলাবলি করিতে লাগিল যে, কি হইল? নানা জনে নানা রূপ উত্তর করিল। তন্মধ্যে এক জন বলিল, "ইংরাজের রাজ্য এখন বাবুরা হাতে নিতে চান।" এই কথাটী শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। বাস্তবিক, এই সভা সমিতিগুলি যেরূপ ভাবে আহূত বা গঠিত হইতেছে, যেরূপ ভাবে ইহাদের কার্য্যাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে, ইহাতে মনে হয়, বাবুরা যেন কি একটা পদ-লাভের জন্যই ব্যস্ত। নচেৎ নিম্নশ্রেণীর মঙ্গলের কথা এরূপে উপেক্ষিত হয় কেন? যশ বা পদলাভের প্রস্তাব

লইয়াই সকল সভা ব্যস্ত। কি বিভ্রাট!

নিরাশার কথা বলিলাম ত আরো একটু বলি। এটী একটী জাতীয় সভা বটে, কিন্তু আলোচনা হইবে—সকলই বিজাতীয় রকমের। বিজাতীয় ভাষায় কথা চলিবে, বিজাতীয় সাজে সাজিয়া যাইতে হইবে, বিজাতীয় রাজার নিকট অধিকার লাভ করিবার বন্দোবস্ত হইবে। কিন্তু নাম "জাতীয় মহাসমিতি।—"কি অদ্ভুত সৃষ্টি!

কেহ কেহ বলিতে পারেন, জাতীয় আলোচনা আবার কিরূপ? একটা কি জাতীয় ভাষা আছে? আমরা বলি, আছে। আর যদি না থাকে তবে একটা ভাষা সৃষ্টি কর, চিরকাল পরমুখে কথা বলিবে? আমরা বলি, যাহাতে জাতির অভ্যুত্থান হইতে পারে, তাহাই জাতীয় বিষয়। জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের কথা হউক, জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রস্তাব হউক, জাতীয় শিক্ষার বন্দোবস্ত হউক, জাতীয় শিল্পের উন্নতির সূত্রপাত হউক, জাতীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের আলোচনা হউক, জাতীয় সাধারণ লোকের উন্নতির চেষ্টা হউক। একবারে সমস্ত না হয়, ইহার যে কোন একটা হউক। সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য জাতীয় মহাসমিতি দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্থাপন করুন। জাতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য কুড়ি লক্ষ টাকা তুলিয়া বোম্বে, মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় অন্ততঃ তিনটা বড় শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করুন। তবে ত বুঝিব, জাতীয় সভার নামের সার্থকতা! সাহেবকে ভয় প্রদর্শন করিবার জন্য, বা সম্মান পাইবার জন্য, বা শিক্ষিত সমাজের অধিকার বিস্তারের জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মিলনের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সেটা বড় প্রশংসার কাজ নয়। সেটা জাতীয় কাজ মোটেই নয়। এত গুলি প্রবীণ মহা মহা ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তি মিলিত হইয়া, একহৃদয় একপ্রাণ হইয়া খাটিলে ২০।৩০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা বড় একটা কঠিন কথা নয়। যদি তাহা অসম্ভব হয়, তবে জাতীয় অভ্যুত্থানও অসম্ভব। তবে কেন বৃথা আশার ছলনা, মায়ার খেলা দেখাইয়া ভুলাইতে চাও? হিতৈষিগণ, তোমাদের পায়ে ধরি, আমাদিগকে একটু বিশ্রাম, একটু নিদ্রা যাইতে দাও।

কর্ত্তব্যের টানে, প্রাণের বেদনায় এই সকল নিরাশার কথা বলিতেছি। হৈ-চৈপূর্ণ হুজুগ বা বক্তৃতার ছড়াছড়ি প্রচুর হইয়াছে। এখন একটু কাজের প্রয়োজন। কথায় চিরকাল কে ভুলিবে?—জীবন চাই। নিম্নশ্রেণীর পরিত্রাণের জন্য, উদ্ধারের জন্য যদি কেহ প্রাণ দিতে চাও, এস। নিম্নশ্রেণীর মঙ্গলের জন্য যদি কোন আলোচনা করিতে চাও, এস, বুক পাতিয়া আলিঙ্গন করিব, মাথায় তুলিয়া নাচিব। নচেৎ তোমার আমার স্বার্থপূর্ণ নাচানাচির কথা, যশ উপাধির কথা, ঐ রাজা-তাড়ানে বা প্রজা-পীড়নের কথা,—ঐ জীবন-শূন্য বক্তৃতা রূপ মহা কলঙ্কের বোঝা, ঐ কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও।

"জাতীয়" শব্দ শুনিতে মিষ্ট, বলিতে মিষ্ট, কিন্তু জাতীয় কার্য্যরূপ মহা ব্রত পালন বড় সোজা কথা নয়। আত্মত্যাগ—স্বার্থত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত না হইতে পারিলে এ ব্রত পালনে কেহই সক্ষম হইতে পারে না। জীবন, প্রাণ, ধন ঐশ্বর্য্য—সব দেশের নামে উৎসর্গ করিতে না পারিলে এ ব্রতে দীক্ষা

হয় না। আর সর্ব্ব কামনা পরিহার করিতে না পারিলে, এ কামনায় সিদ্ধি লাভ অসম্ভব। কিন্তু এদেশের ব্যবস্থা কিছু স্বতন্ত্র। যে ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধির উপায় আবিষ্কারে মজবুত্, তার নামই হিতৈষী; এ দেশে যে ব্যক্তি মূর্খ অজ্ঞানকে ঘৃণা করিতে পারে, তার নামই মহাপুরুষ। এদেশে জাতীয় ধর্ম্ম বা জাতীয় ভাষার প্রতি যে উপেক্ষা বা ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারে, তার নামই সংস্কারক! এদেশের পরিণাম কি, বিধাতাই জানেন।

আশায় নৈরাশ হইলে যে কথা বলা সম্ভব, আমরা তাহাই বলিতেছি। এ সকল কথা, উন্মাদের প্রলাপের ন্যায়, আজকালকার দিনে উপেক্ষিত হইবে, তা জানি। কিন্তু আজ হউক, কাল হউক, এমন দিন আসিবে, যে দিন এই হুজুগপ্রিয়তার পরিবর্ত্তে প্রকৃত জীবনের অভ্যুদয় হইবে। তখনই ভারতের শুভদিন আসিবে। তখনই ভারত মুখ তুলিয়া হাসিবে। সে হাসিতে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র,—দেশ বিদেশ আনন্দে পরিপ্লুত হইবে।

আর আজ?—আজ কাঁদিবার দিন, কাঁদিতেই থাকিব। তোমরা আনন্দই কর, আর যাহাই কর—ঐ দেখ ভারতমাতা কোটী কোটী অশিক্ষিত মলিন জীর্ণ শীর্ণ সন্তান ক্রোড়ে করিয়া নয়ন জলে ভাসিতেছেন। যদি মায়ের ভক্ত সন্তান কেহ থাক,—একবার নিম্নশ্রেণীর দুঃখ স্মরণ কর—আর একবার এক ফোঁটা অন্তত চক্ষের জল ফেল। তারপর—ইচ্ছা হয়, জাতীয় মহাসভায় হ্যাট কোট পরিয়া মহানৃত্যে, মহা আস্ফালনে যোগ দিও।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। মহাত্মা জন হাউয়ার্ড;— শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। জন হাউয়ার্ড পৃথিবীর একজন প্রকৃত বড় লোক। ইনি সহৃদয়তার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কারাগার সংস্কার-ব্রত গ্রহণ করেন। এই মহাত্মার জীবন-চরিত যে অমূল্য জিনিষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীচরণ বাবু সরল ভাষায় সুন্দর প্রণালীতে এই জীবনী বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার জীবন চরিত লেখার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম। এই পুস্তকখানি স্কুলের পাঠ্য হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

২। পশ্চাত্য শিল্প বিজ্ঞান;— শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক প্রণীত।—মূল্য ১৲ টাকা, এই পুস্তকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সোজা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার কালী প্রস্তুত প্রণালী;—সর্ব্বপ্রকার দাগ তুলিবার উপায়, সর্ব্বপ্রকার ধাতুতে গিল্টি করণ প্রথা, লিথোগ্রাফ করার প্রথা ইত্যাদি নানা বিষয় লিখিত হইয়াছে। আমাদের দেশে এরূপ পুস্তকের খুব অভাব। এ জন্য আমরা রামচন্দ্র বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এ পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি কতদূর সত্য, সকলেরই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কারণ, সত্য হইলে, ইহার দ্বারা অনেক উপকার হইবে।

অন্যান্য পুস্তক আগামী বারে সমালোচিত হইবে।

পেট্রিক ক্যাসে বা দলীপ সিংহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিলাতে এ বিষয় লইয়া খুব গোলো-যোগ চলিতে লাগিল। "টাইমস্" সম্পাদক নানা কথা পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন, দলীপও বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। তিনি জুলাই মাসের শেষে এক খানি চিঠি মস্কাউ হইতে "ডেলি টেলিগ্রাফে" প্রেরণ করিলেন; চিঠিখানি কিছু বড়—কেবল তাঁহার আত্মসমর্থনের জন্য লিখিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ "ডেলি টেলিগ্রাফ" পত্রিকা খানি ছাপাইতে অস্বীকার করিল, দলীপ আর কি করেন—ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সম্পাদকগণকে সেই খানি পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার রাজ্য ইংরাজ অধিকার-ভুক্ত হইল কেন? তিনি এ বিষয়ে গুটি-কতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তিনি আরো বলেন, বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিবার তিন দিন পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়া অফিস" হইতে সার্ ওয়েন্ বার্ণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, ও তাঁহাকে পাঁচ লক্ষের অধিক মুদ্রা দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা হইলে ভারতবর্ষে আর যাইতে পারিবেন না। এ কথায় একবার দলীপ একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র, অধিক আর কিছুই বলেন নাই। "এডেনে" তাঁহাকে ধৃত করিবার বিষয়ে তিনি বলেন যে, সেই দিনেই ইংরাজ-জাতির উপর তাঁহার বিশেষ ঘৃণার উদ্রেক হয়—সেই দিন হইতেই তিনি তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানিলেন;—সেই দিন—কেবল সেই দিন হইতেই জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইল;—তিনি জানিলেন যে, যতই কেন ইংরাজদিগকে রাজপূজা করি না, পরিণামে তাহার পুরস্কার,—অপমান—লাঞ্ছনা—কারাগার;—ন্যায় বিচারের আশা নাই। এডেন হইতে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার অনেক দিন ধরিয়া লেখালেখি চলিল এবং অবশেষে মহারাণীকে প্রকাশ্য বিচারের জন্য টেলিগ্রাফ্ করিলেন। ভাইস্‌রয়কেও জিজ্ঞাসা করিলেন, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কৌন্সলিদিগকে তাঁহার নিকট যাইবার খরচা দিবেন কিনা? উভয়দিক হইতেই অশুভ প্রত্যুত্তর পাইলেন। তিনি টেলিগ্রাফ্ করিলেন। পঞ্জাব রাজ্যভুক্ত কালীন যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা তিনি ভঙ্গ করিলেন, কারণ উহা বিড়াল-তপস্বী ক্রিশ্চান্ তত্ত্বাবধারকের দ্বারাই ঘটিয়াছিল। তখন তিনি ১১ বৎসরের বালক মাত্র। অতঃপর তিনি প্যারিসে যাইলেন। প্যারিসে তিনি একজন স্বাধীন রাজা হইলেন ও আপন গরীয়সী জন্মভূমিকে যথেচ্ছাচার তত্ত্বাবধারকের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দলীপসিংহ বলেন যে, প্যারিসে তিনি তাঁহার বিষয় এবং তাঁহার দেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় অনেক ভাবিয়াছিলেন এবং ভারতীয় ইংরাজ প্রপীড়িত অনেক লোকের নিকট হইতে

পত্রাদি পাইয়া তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন যে, ইংরাজদিগের অসহনীয় অত্যাচার ও ব্রিটিশ হস্ত হইতে গরীয়সী জন্মভূমিকে উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের পরিশিষ্ট সার্থক করিবেন। তিনি সঙ্কেতে বলিয়াছেন যে, "তিনি রুষরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন—তিনি প্রাণপণে রুষরাজের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হইবেন, ইহার জন্য তিনি অর্থ কিম্বা কোনরূপ পুরস্কার প্রার্থনা করেন না, কারণ তাঁহার স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে তাঁহার আবশ্যক মত অর্থ দান করিয়াছেন। মহারাণী হইতে তাঁহার কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেরই নিকট ৩২ বৎসর কাল যথেষ্ট সদ্ব্যবহার পাইয়াছেন, তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু ইহাও বলিয়াছেন যে, যে শঠ বঞ্চকের করকবলে নিপতিত হইয়া তাঁহার যে রাজ্য ও প্রভূত সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণ কেবলমাত্র এইরূপ সভ্যতানুরুদ্ধ সদ্ব্যবহার হইতে পারে না। অনেক অর্থ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, এ কথাও তিনি বলেন। পরিশেষে তিনি শাসন নীতি সম্বন্ধে রুষ ও ইংরাজের তুলনা করিয়া ইংরাজদিগকে সন্ধিচুক্তি-ভঙ্গকারী বিশ্বাসঘাতক প্রতারক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।" ষ্টেটস্‌ম্যান ৮ই অক্টোবর, ১৮৮৭।

মহারাজা দলীপসিংহ কতদূর পর্য্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি বিলাতে থাকিতেই বলিয়াছেন। ইহার সত্যাসত্যের বিষয় আমরা কিছুই বলিব না। সুচতুর পাঠক, আমরা যে খানকয়েক পত্র ও সম্বাদপত্র উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারিবেন।

সম্বাদপত্রের কার্য্য সম্বাদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করা। দলীপের কথা এ কাণ সে কাণ হইতে হইতে ক্রমে যথানিয়মে সম্বাদ পত্রে স্থান পাইল। সম্পাদক লিখিলেন "দলীপ বলেন—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক তাঁহাকে (৫০,০০০ পাঃ) পঞ্চ লক্ষ্য মুদ্রার অধিক দিবেন এইরূপ কথা; কিন্তু তিনি (২৫,০০০ পাউণ্ড) দুই লক্ষ্য পঞ্চাশ হাজার টাকার কিছু বেশি পাইয়াছেন। বক্রী টাকা সুদ সমেত প্রায় তিন ক্রোর টাকা হইবে এবং ইহাই তাঁহার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রাপ্য। তিনি এই টাকা প্রথমে মিঃ গ্লাডষ্টোনের নিকট চাহিয়াছিলেন, মিঃ গ্লাডষ্টোন তাঁহাকে ইণ্ডিয়া অফিসে চাহিতে বলিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস্ আবার তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিতে বলিলেন। তিনি আর কি করিবেন, পরিশেষে আদালতে যাইবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু আদালত হইতে তিনি শুনিলেন যে, আদালত বিলাতের সমস্ত ব্যক্তিরই জন্য, তাঁহার জন্য নহে। এইরূপে নানা স্থানে তাড়িত বিতাড়িত হইয়া অন্য কিছু উপায় না দেখিতে পাইয়া এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, যদি তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করা হইত, তবে তিনি ইংরাজ অধীনে থাকিতেন, থাকিতে ভালও বাসিতেন।" ব্রিষ্টল মার্কারী, ৩০ মে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

৪ঠা জুনের ব্রিষ্টল ডেলিনিউস্ উল্লিখিত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিষয় একরূপই, অনুবাদ আর করিলাম না। "* * * * and has suddenly discoverd that there are arrears of

allowances due to him which, with interest, amount to over two millions sterling. In pressing his claim he first had recourse to Mr. Gladstone, who referred him to the India Office. The India Office pointed out that the question of his allowances was a matter for the Government of India; and when he proposed to have the matter tried in a court of law he found that was impossible. * * *"

এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বাৎসরিক কত প্রাপ্য। দলীপ বলেন, পাঁচ লক্ষের অধিক, অর্থাৎ ৫০,০০০ পাউণ্ড; কিন্তু "টাইমস" তাহা বলেন না। "টাইম্‌স" বলেন, চারিলক্ষের অধিক অর্থাৎ ৪০,০০০ পাউণ্ড, আর বলেন যে, তাঁহাকে তাহা সমস্তই দেওয়া হইত। কিন্তু দলীপ তাহা বলেন না, দলীপ ২,৫০,০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ ২৫,০০০ পাউণ্ড ভিন্ন আর অধিক পাইতেন না। এখন কাহার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? ইংরাজ দলীপের কথা বিশ্বাস করিবেন না, কারণ দলীপ ভারতবাসী, তাঁহারা টাইম্‌সের কথাই বিশ্বাস করিবেন। এ অবস্থায় আমরা কাহার কথা মানিয়া লইব? আমরা যাহা কিছু জানি শুনি, তাহা ইংরাজ মহাত্মাদিগের নিকট হইতে, তাহা রঞ্জিত হউক বা অতিরঞ্জিত হউক, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে; কারণ, আমাদিগের দেশে শিক্ষিত লোক অনেক আছেন, কিন্তু ইতিহাসলেখক নাই, কোন বিষয়ের গবেষণাও নাই, তাহার জন্য যত্নও দেখি না। খুঁজিয়া লইয়া অল্প পরিশ্রম করিয়া কোন বিষয়ের সত্যাসত্যের বিষয় প্রমাণে সদাই পরাঙ্মুখ। আমরা বাঙ্গালী, অত গোলোযোগ বুঝি না বা গোলোযোগের ভিতর যাইতেও চাহি না।

আমি বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখককে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;—"পঞ্জাব গ্রহণের অঙ্গীকার পত্রে দলীপসিংহ ও তাঁহার পোষ্যবর্গের জন্য বার্ষিক বৃত্তি অন্যূন ৪ লক্ষ ও অনধিক ৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজ্যচ্যুতির পরে দলীপ সিংহ প্রথমে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাইতেছিলেন। সাত বৎসর পরে উহা বাড়াইয়া বার্ষিক দেড় লক্ষ টাকা করা হয়। ১৮৫৮ অব্দ হইতে দলীপসিংহকে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়।" আর্য্যকীর্ত্তি পৃঃ ৯৫। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দলীপ আড়াই লক্ষ টাকা বই আর অধিক কিছু পাইতেন না। কিন্তু বাঙ্গালী ইতিহাসলেখকের বা দলীপের কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু একজন হিন্দু-বিরোধী ইংরাজ সম্পাদক বলিতেছেন "তিনি বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা পেনসান্ পাইতেন।" তাঁহার আর দুই এক ছত্র তুলিয়া দিলে তিনি কি প্রকৃতির লোক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন ও সহজেই তাঁহার কথা বিশ্বাস হইবে। তাহার পর লিখিতেছেন;—

"and if it is proved that he is trying to stir up sedition in the Punjab or to excite hostility against England in Russia or elsewhere, the first and proper thing to do is to stop his supplies entirely and order him off.

But Englishmen very wisely laugh at the idiotic vagaries of bragging Irishmen and fanatical Sikhs. Let them go and bluster where some one cares two straws about them, say Belfast and Cabul. There would be some credit in that."

An English Paper, June, 3. 1887.

বিলাতে চিরকাল অবস্থিতি করিতে দলীপের ইচ্ছা ছিল না। তিনি বিলাত পছন্দ করিতেন না। কেন করিতেন না, তাহার অনেক কারণ আছে। এস্থলে তাহা আমার বলিবার অধিকার নাই। তবে একটু না বলিয়াও থাকিতে পারি না, বিলাত তাঁহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছিল, হাড় ভাজা করিয়াছিল, বিলাত তাঁহার সহিত একীকরণ হইয়া গিয়াছিল, তাই তিনি পছন্দ করিতেন না।

যখন সিপাহি বিদ্রোহানলে ভারত প্রজ্জলিত হয়, তখন দলীপের বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তিনি তাহা এখানে আসিয়া নিবাইয়া দেন। ইংরাজ তাঁহাকে সে সময়ে আসিতে দিলেন না, তখন তিনি বেশ জানিলেন, তিনি বন্দী। ইংরাজও তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য কিছু টাকা বাড়াইয়া দিলেন। অগ্নি নিবাইতে আসিতে দিলেন না।

আবার তাঁহার স্বদেশ আসিবার ইচ্ছা হইল। ইংরাজ বুঝিলেন, স্বদেশ আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই আবার বুঝি পেন্‌সনের টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইবে, দলীপ এইরূপ মনে করেন; কিন্তু এবার তাহা করা হইবে না, এখন ত ভারতে কোন গোলোযোগ নাই। তবে এখন তাঁহাকে আর যাইতে দিবার বাধা কি? বিলাতে মিছামিছি টাকা লইয়া গোলোযোগ করিতে না দিয়া বরং তাঁহাকে এখন ভারতে যাইতে দেওয়াই শ্রেয়। এই ভাবিয়া ইংরাজ তাঁহাকে স্বদেশে আসিবার অনুমতি দিলেন, তাঁহারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। বিলাতে যাহা কিছু তাঁহার ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিলেন। তিনি এখানে আসিবার পূর্ব্বে বিলাত হইতে তাঁহার গরীয়সী জন্মভূমি পঞ্জাবের অধিবাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন;—

"প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ! ভারতবর্ষে যাইয়া বাস করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সত্যগুরু সকলের বিধাতা। তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাশীল। আমি তাঁহার ভ্রান্ত জীব। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাঁহার ইচ্ছায় ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, ভারতে যাইয়া, সামান্য ভাবে বাস করিব। আমি সত্যগুরুর ইচ্ছার নিকটে মস্তক অবনত করিতেছি; যাহা ভাল তাহাই হইবে।"

"খালসাগণ! আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, আপনাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু যখন আমি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, তখন আমার বয়স বড় অল্প ছিল।"

"আমি বোম্বাই উপস্থিত হইয়া শিখ ধর্ম্ম গ্রহণ করিব। * * * * বাবা নানকের অনুশাসন অনুসারে চলিব এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের আদেশ পালন করিব।"

"আমার বিশেষ ইচ্ছা থাকিলেও আমি পঞ্জাবে যাইয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; এই জন্য আপনা-

দিগকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।"

"ভারত সম্রাজ্যের অধীশ্বরীর প্রতি আমার যে প্রগাঢ় ভক্তি আছে, তাহার সমুচিত পুরস্কার পাইয়াছি। সত্যগুরুর ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" ওয়া গুরুজীকি-ফতে, প্রিয়তম স্বদেশীয়গণ, আমি আপনাদের নিজের মাংস ও রক্ত—দলীপ সিংহ।"*

ইহার সুফল কি ফলিল, তাহা পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ করিয়াছি। ইহার ফল এডেনে তাঁহার গতিরোধ।

মহারাজ দলীপ সিংহের এতদিন পরে হৃদয়ে এ ভাব উদ্রেক হইল কেন? এতদিন ত বেশ আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন করিতেছিলেন, তবে এ ভাবে কেন?

ইহার গুটিকতক কারণ আছে—১। মহারাজ দলীপসিংহ মহারাজোচিত কার্য্য কলাপ ও উচ্চ মনের পরিচয় প্রায়ই জনসাধারণকে দিতেন। তাঁহার অর্থব্যয় বিস্তর ছিল। এই সকলের জন্য অনেকে তাঁহাকে "Lives in England in the most aristocratic set." বলিয়া বৃথা দোষারোপ করিত ও ঈর্ষান্বিত চক্ষে দেখিত। তিনি ইংরাজ বণিক নহেন। এই মহাত্মারা আবার ইহুদিদিগকে "সাইলক্ দি জু" বলিয়া গালি দেন। তিনি বিলাতি জমীদার নহেন বা ধনী নহেন, তিনি বিলাতি লর্ড নহেন। তাঁহার বিলাতে জন্ম নহে বা ইংরাজ রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত হয় না যে, তিনিও অর্থ-পিশাচ হইবেন, অর্থের জন্য তিনি সকলি করিবেন। অর্থই ধর্ম্ম, অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলেই মোক্ষফল লাভ হইল, এরূপ তিনি মনে করেন না। তিনি মহারাজা, শুদ্ধ মহারাজা নহেন, মহাবীর মহারাজ রণজিৎসিংহ-তনয়। তাঁহার যে অধিক অর্থ ব্যয় হইবে, ইহার বিচিত্র কি? তাঁহার যে দুই লক্ষ আড়াই লক্ষ টাকায় চলিত না, ইহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাঁহার যাহা পাইবার কথা, তাহা তিনি পাইতেছেন না, তাঁহার যাহা প্রাপ্য তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা আর ক্ষোভের বিষয় কি হইতে পারে?

একটী হইতে অন্য আর একটী, আর একটী হইতে অপর একটী ভাবের, এইরূপ ক্রমে ক্রমে অনেক ভাব হৃদয়ে উদয় হয়। ইহা স্বভাব-সিদ্ধ। দলীপ তাঁহার রাজ্যের আয়ের সহিত আর যাহা তিনি ইংরাজের নিকট হইতে পাইতেছিলেন, তাহা মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, "তাঁহার খাস সম্পত্তির একটী হইতে বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা আয় হইত। লবণের খণি হইতে বৎসরে প্রায় ৪০ চল্লিশ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইত। এতদ্ব্যতীত শাল, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্যজাত ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তির অছি স্বরূপ ছিলেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট অসঙ্কুচিত চিত্তে উহা বিক্রয় করেন। সিপাহি যুদ্ধের সময়ে দলীপ সিংহের ফতেগড়ের আবাস বাটীতে অন্যূন আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। গবর্ণমেণ্ট উহার জন্য ৩০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।"—৯৪ পৃঃ আর্য্যকীর্ত্তি।

২। কহিনুর।—এক দিন তিনি কোন কারণবশতঃ মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। মহারাণী নাকি তাঁহার

* পত্র খানি রজনী বাবুর অনুবাদ।

পিতৃধন কহিনুর বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি মহারাণীর বক্ষে কহিনুর দেখিয়া রাগ ও ক্ষোভে অধীর হইয়া সর্ব্বসমক্ষে মহারাণীকে বলিয়াছিলেন "রত্নখানি পিতার নিকট হইতে চুরি করিয়া তাঁহার অবমাননার জন্য তাঁহার সাক্ষাৎ কালীন বক্ষে ধারণ করা হইয়াছে।"

আর একজন উদারচেতা কহিনুর সম্পর্কে কি বলিতেছেন, শুনুন।—"All sorts of stories are told and credited of Dhuliph singh, one of them being that his envy of the Koh-i-noor, and wrath at its being in the Queen's possession, embitters his existence. It is to him a talisman that was his father's, and ought to be his, and the annuity granted to him by England was only an insult when the Koh-i-noor was withheld. *True or false, the Moharajah's feeling would not be unnatural were we similarly situated.*"

"* * * * "সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, মহারাজের হৃদয়ে এরূপ ভাবের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা যদি ওরূপ অবস্থায় নিপতিত হইতাম, তাহা হইলে আমাদিগেরও হৃদয়ে ওরূপ ভাবের উদ্রেক হইত।"

The "East Anglian Daily Times."
June 17, 1887.

৩। বাল্যকাল—তাঁহার বাল্যকালের কথা এতদিনে মনে পড়িল। তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট হেনেরি লরেন্স কিরূপে লাহোর হইতে শেখপুরের নির্জ্জন স্থানে বিনাপরাধে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। বরোদাধিপতি গাইকুমারকে প্রকাশ্য বিচারালয়ে একরূপ বিচার করিয়া শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারের ত সাধারণ বিচারালয়ে বিচার করিয়া ফাঁসি দেওয়াসাব্যস্ত হয়। কিন্তু তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে কিরূপ করিয়া সামান্য একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট শেখপুর কারাগারে প্রেরণ করিলেন, তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। তার তখন তাঁহার রাজ্য স্বাধীন ছিল। তাহার পর "রেসিডেন্ট" সার্ ফ্রেডরিক্ ক্যারি কিরূপ করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া তাঁহার মাতাঠাকুরাণী ঝিন্দনের নিষ্কাসনলিপি তাঁহার সহি করাইয়া লন, তাহা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল, আর অনুতাপে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। প্রথমে মহারাণী ঝিন্দনকে ফিরোজপুর, তৎপরে বেনারস বা কাশীতে প্রেরণ করা হয়। ঝিন্দন রাজমহিষী ও দলীপের জননী হইয়া মেজর জর্জ্জ ম্যাক্গ্রেসর নামক একজন সামান্য সৈনিক পুরুষের তত্ত্বাবধানে রহিলেন। ইহা দলীপের দুঃখের বিষয় নহে? ইহা অপেক্ষা আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে যে, তনয়বৎসলা মহারাণী ঝিন্দন, অনেক কষ্ট ও অপরিয্যাপ্ত দুঃখ সম্ভোগ করিয়া, পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থায় হীনচক্ষে সপ্ত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, প্রাণাধিক তনয়ের পার্শ্বে ১৮৬৩ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অপরিচিত অজ্ঞাত স্থানে সামান্যা রমণীর ন্যায় আপনার জন-

"* * * Denounced the Queen in the presence of several persons, for insulting him by wearing on her breast, at an interview with him, a jewel which she had "stolen" from his father."
The Society, June 4, 1887.

নীকে ইহলীলা পরিত্যাগ করিতে দেখিলে কাহার না হৃদয় ফাটিয়া যায়? তাঁহার মনে হইল, এ সকলের কারণ কে?

৪। রাজ্য।—ইংরাজ তাঁহার পিতার পরম বন্ধু। অনেক সময় অনেক বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেক উপকার করিয়াছেন। বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার রাজ্যকে ইংরাজের তত্ত্বাবধারণে রাখিলেন, তাহার ফল কি শেষ এই হইল, উপকারী পরম বন্ধুর তনয়ের রাজ্যচ্যুতি? এগার বৎসরের শিশু এমন কি গুরুতর অপরাধ করিলেন, যাহাতে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হইতে পারে? প্রতিবাসীর জন্য, ভৃত্যের জন্য বা মাতার জন্য এক জনের বিষয় কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী কে? তত্ত্বাবধারক কি নহে? কিন্তু ইংরাজ রাজনীতি অন্যরূপ। সাধারণ নীতি হইতে ইহা বিভিন্ন। দলীপ বুঝিলেন "যেই রক্ষক সেই ভক্ষক"—ইহাই ইংরাজ রাজনীতি।

৫। ধর্ম্ম।—প্রথম বয়সে প্রায়ই মানুষের ধর্ম্মের দিকে ততটা মতি থাকে না। ক্রমে ক্রমে যতই বয়স বড়িতে থাকে, ততই ধর্ম্মের দিকে মতি হইতে থাকে। ইহাই মানব ধর্ম্ম। দলীপ এগার বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয়ান হন। ১৮৫৩ খৃঃ ফতেগড়ের একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়ান করিয়া ইংরাজ ও খ্রীষ্টীয়ান মহলে বড়ই "বাহবা" লন ও পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দেন। এত অল্প বয়সে দলীপকে কোন্ আইনানুসারে খ্রীষ্টীয়ান করা হইল, তাহা দলীপ এখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন না যে, তিনি ও তাঁহার রাজ্য পঞ্জাব পৃথিবীর সাধারণ আইন্‌কানুন্ ছাড়া; স্বর্গেরও তাহাই, বাইবেলে সয়তান ও হিন্দুর নরক রাজ্যের আইনে ঐ সকল পাইবেন।

দলীপের ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখের বা অধিক ক্ষোভের কারণ কি হইতে পারে? সমস্ত যৌবনই রঙ্গরসে কাটাইয়াছেন। যৌবনের পরসীমা আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছেন, ধর্ম্মের দিকে তখনও লক্ষ্য পড়ে নাই। প্রৌঢ়াবস্থার অন্তিমে, বার্দ্ধক্যাবস্থার প্রারম্ভে ধর্ম্মের দিকে মতি যাইল। হৃদয় অনুতাপানলে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। তিনি ভারতে আসিতে চেষ্টা করিলেন;—কিন্তু তাহা বিফল হইল।

আর দু একটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ শেষ করিব। দলীপ রুশে গিয়া ভাল করিয়াছেন কি না? আমার মতে তিনি ভাল করেন নাই। তাঁহার বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। এ বয়সে তাঁহার এ কাজ সাজে না। এখন তাঁহার ধর্ম্ম চর্চ্চা করাই শ্রেয় ছিল। কারণ;—

"বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন,
দাসত্বের পরিবর্ত্তে দাসত্ব স্থাপন।"
"নাহি কাজ অদৃষ্টের সিন্ধু সাঁতারিয়া,
ভাসি স্রোতোদ্দীন, দেখি বিধি বিধাতার।
কেন মিছে খাল কেটে আনিবে কুমীরে?
প্রদানিবে স্বীয় হস্তে স্বগৃহে অনল?
* * * * * *
* * * * * *
ঘুচিবে কি অত্যাচার বল নৃপবর!
অধীনতা, অত্যাচার নিত্য সহচর।"

পলাশির যুদ্ধ ৩০।৩২।৩৩পৃঃ

প্রথমাংশ সমাপ্ত।

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।

গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়—উপসংহার।

আমরা ভারতচন্দ্রের জীবন তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তিনি ১৬৩৪ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ১৬৮২ শকে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। সেই তিন অংশের মধ্যে প্রথম অংশ ২০ বৎসর, ১৬৩৪ হইতে ১৬৫৩ শক পর্য্যন্ত। আমরা এই অংশকে "বাল্য-জীবন" আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই বাল্যজীবনে তিনি বিদ্যা শিক্ষা ও বিবাহ করেন। দ্বিতীয় অংশ ২০ বৎসর ১৬৫৪ হইতে ১৬৭৩ শক পর্য্যন্ত। আমরা এই অংশকে "মধ্যজীবন" আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই মধ্যজীবনে তিনি বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে ২।৩ বৎসর বৰ্দ্ধমানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৬।১৭ বৎসর উদাসীনের বেশে লীলাচলে দেবদর্শন ও শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত হয়। উড়িষ্যায় শঙ্করাচার্য্যের মঠে অবস্থান কালে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম অবলম্বন করেন, এক বৎসর কাল শ্যালীপতি ভ্রাতার বাটীতে, শ্বশুরালয়ে এবং ফরাসডাঙ্গায় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট অবস্থান করেন। তৃতীয় অংশ ৮ বৎসর, ১৬৭৪ হইতে ১৬৮২ শক পর্য্যন্ত। আমরা এই অংশকে "অন্ত্যজীবন' আখ্যা প্রদান করিয়াছি। এই অন্ত্যজীবনই তাঁহার জীবনের প্রধান অংশ। এই অন্ত্যজীবনে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ নিযুক্ত হয়েন এবং মূলাযোড়ে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে সপরিবারে বাস করেন। এই অন্ত্যজীবনের ৮ বৎসর মধ্যে মাত্র এক কি দুই বৎসর কাল কবিতা রচনাতে অতি-বাহিত হয়। অন্ত্যজীবনের প্রথম বৎসরে রাজ সভাসদ্ নিযুক্ত হইয়াই তিনি অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র যে জন্য বঙ্গদেশে পরিচিত, অর্থাৎ যে সমস্ত রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত, তাহার জন্য তিনি শুধু এক কি দুই বৎসর মাত্র পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যখন তিনি সাংসারিক সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট জীবন পুস্তক রচনাতে ব্যয় করিবেন, মনে করিয়াছিলেন, এবং সেই অভিপ্রায়ে চণ্ডীনাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখনই তিনি মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়েন। তাই নিশ্চিন্ত মনে গভীর গবেষণা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ জগতে প্রচার করিতে পারি-তেন, তাহা তাঁহার মনেই রহিয়া গেল। সুতরাং তাহার সৌন্দর্য্য আর কেহ দেখিতেও পাইল না।

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিতেই ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা বলেন, গুণাকর সুন্দর সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দবিন্যাস করিয়া মনোহর ছন্দোবন্দ করিতে অদ্বিতীয় ছিলেন মাত্র কিন্তু কবি হইতে যাহা আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিলনা। অন্য পক্ষে কেহ কেহ তাঁহাকে সাহিত্য-জগতে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতে কিছুই দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাদের কাহারও সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। আমরা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই পাঠকদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

এইখানে বর্ত্তমান সময়ের পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে একশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গের সামাজিক অবস্থা কি প্রকার ছিল, তাহা বর্ণন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। আজিকালি শিক্ষা গুণে সমাজ যতদূর উন্নত হইয়াছে, পূর্ব্বে এই প্রকার ছিল না, তখন জনসমাজে ভালরকম শিক্ষা অল্প লোকেরই হইত। আজ কাল যেমন সংবাদ পত্র ইত্যাদি দ্বারায় বঙ্গদেশের নানাস্থানের নানা কথা জনসমাজে প্রচারিত হয়, ইতিপূর্ব্বে তাহার নাম গন্ধও ছিল না। তবে ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ কি প্রকারে সমস্ত বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছিল ? এই কথা বুঝাইতে হইলে তখনকার সমাজের গঠন বুঝান আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

গান আবহমানকাল হইতে লোকের চিত্তরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বঙ্গবাসী যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে অথবা পাঁচালীওয়ালাদিগের মুখে গান শুনিত। আজকাল সেই সমস্ত গান ভিন্ন সমাজের অনুকরণে বিভিন্ন ভাবে থিয়েটারওয়ালাদিগের মুখে গীত হইয়া থাকে। তাই আজকাল পাঁচালী অথবা যাত্রাওয়ালাদের তত আদর নাই। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন থিয়েটারের নাম মাত্রও ছিল না। তখন সকলেই আগ্রহাতিশয় সহকারে যাত্রা গান অথবা পাঁচালী শুনিত। সেই সমস্ত যাত্রা অথবা পাঁচালীর বিষয় সকল রামায়ণ, মহাভারত হইতে সংগৃহীত হইত, কোন কোন স্থলে খ্যাতনামা কবিদিগের রচিত বিষয় সকল যাত্রা রূপে পরিণত হইয়া গীত হইত। রামের বনবাস, রাবণ বধ, ভরত মিলন, মানভঞ্জন, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, খ্যাতনামা পুরুষদিগের কথা তখনকার সমাজে পাঁচালী ও যাত্রাওয়ালার মুখে প্রচারিত হইত। বিদ্যাসুন্দরের কথাও যাত্রাওয়ালারা প্রথমে প্রচার করিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নীলমণি সমাদ্দার নামক একজন গায়ককে পালা বাঁধিয়া অন্নদামঙ্গল গান করিতে আদেশ করেন। নীলমণি সমাদ্দার সেই সকলে তাল লয় সংযুক্ত করিয়া তাহা রাজসভায় গান করিয়া সকলকে শুনাইতে লাগিলেন। সেই গান লোকসমাজে অন্য আকার ধারণ করিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। যাঁহারা যাত্রাগান প্রস্তুত করিতেন, তাঁহারা সেই সকল গান লোকসমাজে যাহাতে বিশেষ আদৃত হয়, সেই রকম করিয়াই প্রস্তুত করিতেন, কিন্তু নায়ক নায়িকার চরিত্র গঠনের উৎকর্ষতা সম্পাদন করিতে ততদূর চেষ্টিত হইতেন না। অনেকের ঈশ্বরদত্ত গান বাঁধিবার ক্ষমতা খুব ছিল, কিন্তু ভাল রকম শিক্ষা না হওয়াতে বর্ণিত নায়ক নায়িকার চরিত্র ভাল রূপ বুঝিতে সক্ষম হইতেন না, সুতরাং তাঁহাদের মনোমত তখনকার রুচি অনুসারেই সেই সমস্ত গান রচনা করিতেন। সেই সমস্ত গানই যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে লোকসমাজে প্রচারিত হইত।

মুসলমান রাজত্বের অবসান সময়ে বাঙ্গালার সমাজ যে খুব হীন ছিল এবং তখনকার লোক সমাজের রুচি যে তদনুসারেই গঠিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয় অনেক

গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যে বিকৃতভাবে সমাজে প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। যাঁহারা বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যাসুন্দরের চরিত্রগত গুণ উপেক্ষা করিয়া সমাজের উপযোগী গান রচনা করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বিদ্যাসুন্দর আজ কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট হেয়। অনেকেই হয়ত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়েন নাই. তাঁহাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়তঃ যাত্রাগান-লব্ধ, তাই তাঁহারা ভারতের উপর খড়্গ-হস্ত। তবে ভারতচন্দ্রের একটী দোষ ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই অংশ না থাকিলেই ভাল হইত।

যাঁহারা জগতে কবি নামে পরিচিত, তাঁহারা নানাজনে নানা পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ বা পুষ্পের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া পুষ্প-নির্ম্মাতার অনন্ত কৌশল হৃদয়ে অনুভব করিয়া সেই অনন্ত ভাব জগতে প্রচার করিয়াছেন। জগতবাসী তাঁহার প্রচারিত অনন্তের মহিমায় সেই ভাবে বিভোর হইয়াছেন। কেহ বা স্বভাবে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছেন। কেহবা শিশুর সুকুমার ভাব দেখিয়া নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময়ের অনন্ত ভালবাসার উৎস হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা জলন্তভাবে জগৎকে দেখাইয়া জগৎবাসীকে মাতাইয়াছেন। আবার কেহ বা সূর্য্যের উত্তাপে, চন্দ্রের কীরণে, পৃথিবীর গঠনে, মানবজাতির অভ্যুদয়ে ও যেখানে সেখানে করুণাময়ের করুণা দেখিয়া তাহাই জগতের সম্মুখে ধরিয়াছেন; কেহ বা গগণভ্রষ্ট নক্ষত্রের পতনে তাঁহার দুঃখরাশি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আবার কেহবা দুই স্রোতস্বিনীর সম্মিলনে প্রেমের গভীরতা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এ সমস্ত এক শ্রেণীর কবি। ভারতচন্দ্র এ দলে আসন পাইবার উপযুক্ত নহেন।

অনেকে নন্দনকাননস্থিত পারিজাতের সৌন্দর্য্য রোগীর শিয়রে, গৃহস্থের গৃহে এবং মানবের প্রফুল্ল বদনে অনুভব করিতে পারেন। অনেকে অবিচ্ছিন্ন বিমল আনন্দ রাজার গৃহে অন্বেষণ না করিয়া, যাহারা নিত্য ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা জীবন রক্ষা করে, তাহাদের সেই শান্তি পূর্ণ বদনে প্রতিভাত হইতে দেখেন। অনেকে আবার সরল, সংসার-জ্ঞানশূন্য, অমায়িক তাপসে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া সেই সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল আভা উজ্জ্বল রূপে চিত্রিত করিয়া সমস্ত জগতকে সে সৌন্দর্য্যে ডুবাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এদলেও আসন পাইবার উপযুক্ত নহেন। তাঁহার যাহাতে অধিকার, তাহা অন্য রকম।

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। রাজার যাহা আছে এবং রাজার যাহা আবশ্যকীয়, ভারতচন্দ্র তাহাই সুন্দর ও মধুর করিয়া জগত সমক্ষে ধরিয়াছেন। যাঁহারা নন্দনকাননের পারিজাত প্রভৃতি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পরাশির মধ্যে বহুমূল্য রত্নাসন স্থাপন করিয়া তদুপরি মোহন বেশভূষাযুক্ত শচী ও শচীপতিকে উপবেশন করাইয়া, নানালঙ্কার বিভূষিতা অনিন্দ্য কান্তি অপ্সরাগণের মুখে শ্রুতিমধুর ভাবময় সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ভালবাসেন; যাঁহারা অপূর্ব্ব সৌধ সকলের সুনিপুণ কারুকার্য্য দেখিয়া মোহিত হয়েন, যাঁহারা সুশোভিত চন্দ্রাতপের নীচে উপবিষ্ট বিবিধ রাজসজ্জায় ভূষিত নৃপতির চক্ষু-

র্দ্দিকে নানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর দ্রব্যাদিতে মোহিত হইয়া ঐ সকলকেই আপন বর্ণনার বিষয় করেন, যাঁহারা রাজসভার আড়ম্বর এবং জাঁকজমক বর্ণনা করেন, ভারতচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্র রাজ-রাণীর মনোভাব বর্ণনে, রাজার খেয়াল প্রদর্শনে, রাজপারিষদ ও সভাসদগনের প্রকৃতি প্রচারে, জাঁকজমক বিশিষ্ট সৈন্য-গণের সমাবেশ ও যুদ্ধযাত্রায়, রাজপ্রাসাদ সকলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে অদ্বিতীয় ছিলেন। এবিষয় আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইব।

কেহ কেহ আপন নায়িকাকে সংসার-জ্ঞান-শূন্য সরলা করিয়াছেন, সংসারের সংস্পর্শে তাহার যে কুটিলতা শিক্ষা হইত, সে তাহার কিছুই জানে না, সে একটী ফুল পাইলেই সন্তুষ্ট। আদর করিয়া যদি কেহ তাহাকে নিকটে উপবেশন করাইয়া দুটী মধুর কথা কহে, তাহা হইলে সে তাহাতেই মোহিত হইয়া যায়। সংসারের জাঁকজমক কিছুই সে অবগত নহে। ভারতচন্দ্র এ সকল কিছুই বর্ণনা করিতে চেষ্টিত হইতেন না। তিনি তাঁহার নায়িকা বিদ্যাকে রাজকুমারীর মতনই গঠন করিয়াছেন। বিদ্যা রাজার মেয়ে, রাজসভায় যাহা যাহা হয়, তৎসমস্তই অবগত আছেন, সুতরাং তাহাতে উৎকর্ষতা লাভ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিতা। বিদ্যা রাজকুমারীর ন্যায় উজ্জ্বল বেশভূষায় ভূষিতা হইতে ভালবাসেন। রাজকুমারী অবস্থা হইতে রাজরাণী হইতে হইলে যে যে গুণের আবশ্যক, সমস্তই বিদ্যা অবগত আছেন। বিদ্যা অনুমাত্রও কষ্ট সহ্য করিতে ইচ্ছুক নহেন। কোন ক্রমে সে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে তৎসংসাধনে সচেষ্টিতা হইতেন। বাস্তবিক ভারতচন্দ্র এ সকল উত্তমরূপে বর্ণনা করিতে পারিতেন।

ভারতচন্দ্র সংসারের দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্য প্রভৃতি বর্ণনা করিতে পারিতেন না। কেহ কেহ আপন নায়ককে সন্ন্যাসী করিয়াছেন। সে সন্ন্যাসী—সংসারের সমস্ত কার্য্য ও গতি-বিধির পর্য্যালোচনায় এবং তাহা হইতে সমস্তকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া শুধু ঈশ্বর প্রেমে স্থায়ী নির্ম্মল সুখ অনুভব করিয়া সন্ন্যাসী। ভারতচন্দ্রও সুন্দরকে সন্ন্যাসী করিয়াছেন, কিন্তু সে সন্ন্যাসী শুধু নিজচিত্ত প্রসাদনের জন্য সন্ন্যাসী, সে আপন খেয়াল মিটাইবার জন্য সন্ন্যাসী। এ সন্ন্যাসী প্রকৃত সন্ন্যাসী নহে,—সন্ন্যাসী বেশে রাজ-কুমার। বিদ্যাকেও তিনি সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন, কিন্তু এ সন্ন্যাসিনী সুন্দরের মনো-রঞ্জনার্থ সন্ন্যাসিনীর বেশধারিণী মাত্র।

দুঃখ দারিদ্র্যগ্রস্ত ভিখারিণীর মনোভাব ভারতচন্দ্রের বর্ণনার বিষয় ছিল না। ভিখারিণী মুষ্টি ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য সামগ্রীতে কত কষ্টে দুঃখের ও কষ্টের জীবন অতি-বাহিত করে, ভারতচন্দ্র তাহা বর্ণনা করিতে সচেষ্ট হইতেন না। তিনি যে ভিখারিণীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অন্য প্রকার। ভারতচন্দ্র অন্নদাকে ভিখারিণীর বেশ-ধারিণী করিয়াছেন, রুক্ষকেশা ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা করিয়াছেন, তাহা ব্যাসকে ছলনা করিবার নিমিত্ত। তাহা ক্ষণিক। অন্নদা নিজ উদ্দেশ্য সংসাধন মানসে ভিকারিণীর বেশধারিণী মাত্র, দুঃখে কষ্টে পড়িয়া ভিকারিণী নহেন।

প্রকৃতিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু রমণীয় সুতরাং মনোমুগ্ধকর, যাহা কিছু মহান, যাহা কিছু ভাবময় এবং যাহা দ্বারা

মানব মনের সহৃদয়তা আকর্ষণ করা যায়, তাহা ভারতচন্দ্রের বর্ণনার বিষয় ছিল না। এসমস্ত বর্ণনা করিয়া মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি, সেক্‌স্‌পিয়ার ও বাইরণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রও অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকারে। তাঁহার যাহাতে অধিকার, তাঁহার যাহা বর্ণনার বিষয়, তাহা বর্ণনা করিতে কেহই চেষ্টিত হন নাই। ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি হইয়া তদুপযোগী সমস্ত বিষয় চিত্রফলক সদৃশ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি আপন ক্ষমতায় বর্ণিত বিষয়ে এমন উজ্জ্বল রঙ্গ ফলাইয়াছেন যে, অধ্যয়ন করিলে রাজসভার প্রতিবিম্ব সকল আপনি মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। তিনি তাঁহার রাজ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। মানব প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ অবস্থা বর্ণন তাঁহার বর্ণনার বিষয় ছিলনা, সুতরাং তিনি তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টিতও হন নাই।

ভারতচন্দ্র যে কি প্রকৃতির কবি ছিলেন, বোধ হয় তাহা এক্ষণে সম্যক প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাঁহার দোষ সকল আলোচনার সময়ে তৎকালিক সমাজের অবস্থা মনে রাখা সকলের উচিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছিল, সুতরাং স্বাধীনভাবে লিখিলে যে যে কল্পনা মনে উদয় হওয়া সম্ভব ছিল, তাহা হইতে পারে নাই, একথাও মনে রাখা উচিত। আমরা এই সমস্ত আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, রাজার মন সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে অশ্লীল হইতে হইয়াছিল, সুতরাং কেহ কেহ যে ভারতচন্দ্রকে "কুপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া অশ্লীল" কহিয়াছেন, তাহার কোন মূল নাই।

যাঁহারা ভারতচন্দ্রকে বঙ্গদেশে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করেন, এক্ষণে তাঁহাদের সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন। তিনি বলেন—"কিন্তু বলিতেও দুঃখ হয়—হাসিও পায় যে সম্প্রতি ইংরাজী বিদ্যা-সম্পন্ন একদল নব্য সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষার এরূপ মর্ম্মজ্ঞ হইয়াছেন যে, তাঁহারা মিল্‌টনের অনুকারক অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দেখিয়া এ [illegible] ভারতচন্দ্রকেও সিংহাসন হইতে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন! ধন্য অনুকৃতি! তোমার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এক সময়ে মাথায় টীকি রাখিয়া ও গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া তারস্বরে বেদ পাঠ করিয়াছি—এক সময়ে মোগলাই পাগড়ী মাথায় দিয়া ঢিলাইজের চাপ্‌কান পরিয়া এবং লক্কাজুতা পায় দিয়া পারসীর জোবান দোরস্ত করিয়াছি এবং আজি আবার টুপি মাথায় বুট জুতা পায় ও কোট, পেণ্টুলন পরিধানে মাতৃভাষায় কথোপকথনের মধ্যেও ইংরাজীর বার আনা দখলীস্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছি—ইংরেজী ভূত পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছি—এবং ইংরাজী মিল্‌টনের অনুকারক অমিত্রাক্ষর ছন্দোবদ্ধ মেঘনাদবধকে বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিতেছি, তদ্রচয়িতা মাইকেলকে ভারতের সিংহাসন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি!! ভারত! তুমি স্থির থাক। তুমি ওসকল লোকের কথায় ক্ষুব্ধ হইও না। তোমার সিংহাসনের নিকট ঘেঁসিতে পারে, এরূপ লোক এ

পর্য্যন্ত জন্মে নাই—পরেও জন্মিবে কি না, সন্দেহ স্থল।"

আমরা এ দলের সঙ্গেও একমত হইতে পারি না। ভারতচন্দ্রের যাহাতে অধিকার এবং যাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। অধুনা বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের নানাপ্রকার ভাব সাহিত্য সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। অনেকে আপনাদের কবিতা সকল ইংরাজি আবরণে আবৃত করিয়া নূতন রকমে জগতে প্রচার করিয়াছেন। যাহা বঙ্গবাসী কখনও জানিত না, সুতরাং যাহার কথা একবারও ভাবিত না, সেই সমস্ত বিষয় জানিবার, ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। সে সকল অনেক ভাল জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভাল জিনিস সকল সাহিত্যে স্থান দিয়া সাহিত্যের উন্নতি সম্পাদনে যত্নবান হওয়াতে কিছুই দোষ নাই বরং গুণ আছে। আজ কাল যাঁহারা কবিতা লেখেন, তাঁহাদের বিচরণ ক্ষেত্র ও ভারতচন্দ্রের বিচরণ ক্ষেত্র ভিন্ন প্রকার। সুতরাং উভয়ের প্রভেদও গুরুতর। আজকালের কবিগণ নিজ নিজ বিষয়ে উৎকৃষ্ট, ভারতচন্দ্রও নিজ রাজ্যে রাজা। ভারতচন্দ্র ইংরাজীর গন্ধমাত্রও জানিতেন না, সুতরাং তাৎকালিক বাঙ্গালা ভাষার বিবরণ তাঁহার গ্রন্থ দৃষ্টেই জানা যায়। এই কারণেও তাঁহার কাব্য বঙ্গদেশে গৌরব লাভ করিতে সক্ষম হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ যে অমর, ইহা যে কোন সময়ে লুপ্ত হইবে না, তাহার একটী কারণ এই যে, ইহা সমস্ত বঙ্গবাসীর প্রিয়। আজিও অনেকে আগ্রহাতিশয় সহকারে গুণাকরের গ্রন্থ ক্রয় করিয়া থাকেন। সমস্ত লোকেই তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে। বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বণিতা, যাহাদের অক্ষর বোধ আছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কিছু কিছু ভারতের কবিতা কণ্ঠস্থ আছে। যদিও মাঝে মাঝে কেহ কেহ ভারতের গ্রন্থ অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার গুণরাশি যখন সম্যকরূপে দেশে প্রচারিত হইবে, তখন আবার তিনি উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বসমক্ষে বিরাজিত হইবেন। যাঁহারা কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল বর্ণনা জন্য ভারতচন্দ্রকে উপেক্ষা করেন, তাঁহারা সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাহা ভাল, যাহা সুন্দর এবং যাহা মোহকরী ও ভাবময়, সেই অংশ পাঠ করিলে কিছুই ক্ষতি হইবে না। অশ্লীল অংশ সমুদয়ে ভারতের কবিত্বের নিদর্শন বড় নাই, কেবল ভাষার আড়ম্বর আছে মাত্র। সেই অংশ পরিত্যাগে বরং তাঁহার গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইবে।

যিনি আপন গুণে আবালবৃদ্ধ বনিতার হৃদয় এইরূপ অধিকার করিয়াছেন, যিনি নিতান্ত দুঃখ কষ্টের জীবন হইতে আপন নাম স্বীয় ক্ষমতাবলে এত প্রচারিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার আসন টলিবার নহে। চিরকাল সমভাবে বঙ্গবাসী তাঁহাকে আদর করিবে। কখন কখনও তাঁহার যশরাশি মলিন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। আবার তিনি সকলের নিকট সেই আদর লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

সমাপ্ত।

শ্রীরজনীকান্ত রায়।

কালিদাস মুখোপাধ্যায় রাম গোবিন্দের ঔরসে সত্যভামা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কামদেব নামে ইহাঁর এক ভ্রাতা ছিলেন। ইনি রামেশ্বরের প্রপৌত্র ও কালীচরণের পৌত্র। ইনি রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের বংশানুক্রমিক উপাধি মুখোপাধ্যায়। ইনি ২৫ শ্লোকে গঙ্গাষ্টক, ২৯ শ্লোকে মঙ্গলাষ্টক, ২০ শ্লোকে রাক্ষস কাব্য, ৪৫ শ্লোকে রত্নকোষ নামক অভিধান, ও ৮২৭ শ্লোকে ত্রিপুরা সুন্দরী স্তুতিকাব্য রচনা করেন।

১৬৭৩ শকে তিনি দ্বাদশসর্গে এই শেষোক্ত গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া গ্রন্থশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাষ্টক ভিন্ন আরও দুই খানি গঙ্গাষ্টক* পাওয়া গিয়াছে।

শাকোঽগ্নি-মুনি-ষ্ট-চন্দ্রমানিতেঽব্দেকৃতংময়া।
মাতাপিতৃপদধ্যান-কালিদাসেন ধীমতা ॥
উদ্যচ্ছ্রীভুবনেশ্বরীপদপরঃ শ্রীযুক্ত-রামেশ্বর,

*   *   *   *

শ্রীকালি চরণাহ্বয়ো গুরুরতঃ, শ্রীসত্যভামা-সুতঃ-
স্তৎপ্রীত্যা পরয়া শিবার্চ্চনমনাঃ শ্রীরাম-গোবিন্দজঃ।
শ্রীলশ্রীহরিনন্দনঃ সুবিদিতঃ শ্রীকামদেবো মহান্
রাঢ়ীয়-দ্বিজনায়কো মুখবর স্তস্যাম্বয়ে সম্ভবঃ।

রতিমঞ্জরী নামক কামশাস্ত্রবিষয়ক জুগুপ্সিত-বর্ণনাপূর্ণ এক খানি গ্রন্থ জয়দেব প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

নত্বা সদাশিবং দেবং নাগরাণাং মনোহরং।
রচিতা জয়দেবেন সুবোধা রতিমঞ্জরী ॥

ইহা অপর এক জয়দেব বিরচিত। গীতগোবিন্দ যে রসময়ী লেখনী হইতে বিনির্গত হইয়াছে, সেই সুকবির লেখনী ঈদৃশ অশ্রদ্ধেয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছে বলিয়া কথনই বিশ্বাস হয় না।

চন্দ্রালোক নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ অপর এক জয়দেব প্রণীত। ইহাতে দশটী ময়ূখ (অধ্যায়) আছে। এই জয়দেব গীতগোবিন্দ-প্রণেতা হইতে নিঃসংশয় পৃথক্ ব্যক্তি। পণ্ডিতবর ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এই উভয়কে এক ব্যক্তি নির্ণয় করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। স্বরচিত গ্রন্থের শেষে তিনি এই রূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

মহাদেবঃ সত্রপ্রমুখমখবিদ্যৈক চতুরঃ
সুমিত্রা তদ্ভক্তিপ্রণিহিতমতি র্যস্য পিতরৌ।
প্রণীত স্তেনাসৌ সুকবি-জয়দেবেন দশভিশ্চিরং চন্দ্রালোকঃ সুখয়তু ময়ূখৈ র্দশ দিশঃ।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রকাশিত কাব্য প্রকাশের ভূমিকায় চন্দ্রালোক পীযূষ-বর্ষ-প্রণীত বলিয়া উল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পীযূষবর্ষ সুকবি জয়দেবের উপাধি বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থশেষে জয়দেব লিখিয়াছেন।—

চন্দ্রালোকময়ং স্বয়ং বিতনুতে পীযষবর্ষঃকৃতী॥

* Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Nos. 455 and 458.—

জয়ন্তি যাজক-শ্রীমন্-মহাদিবাঙ্গজন্মনঃ ॥
সূক্তপীযষবর্ষস্য জয়দেবকবের্গিরঃ'

প্রসন্নরাঘব-নাটকের প্রস্তাবনা দৃষ্টে বোধ হয়, চন্দ্রালোক-প্রণেতাই প্রসন্নরাঘব নাটক রচনা করিয়াছেন। তিনি বিদর্ভ নগরবাসী (কৌণ্ডিন্য) ও মহাদেব তনয় বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন।

বিলাশে যদ্ বাচামসমরস-নিষ্যন্দ-মধুরঃ
কুরঙ্গাক্ষী-বিম্বাধর-মধুর-ভাবং গময়তি।
কবীন্দ্র কৌণ্ডিন্যঃ স তব জয়দেবঃ শ্রবণয়ো-
রয়াসীদাতিথ্যং ন কিমিহ মহাদেব-তনয়ঃ ॥

ঢাকার প্যারীমোহন প্রভুর নিকট যে চন্দ্রালোকের হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহাতে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত টীকা আছে। কথিত আছে, এই সংক্ষিপ্ত টীকা গ্রন্থকারের নিজের রচিত। প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিত বন্দোলা (বুন্দেলা) বংশীয় রাজা বীরসিংহের পৌত্র ও রাজা রামচন্দ্রের পুত্র যুবরাজ বীরভদ্রের আদেশানুসারে চন্দ্রালোক-প্রকাশ নামক ইহার এক খানি টীকা প্রণয়ন করেন। এই প্রদ্যোতন বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের তনয় বলিয়া স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য্য প্রণীত প্রায়শ্চিত্ত প্রকাশ নামে এক খানি স্মৃতি-গ্রন্থও বিদ্যমান আছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে, জয়ধর উপাধ্যায় তর্কালঙ্কার খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মিথিলা প্রদেশে প্রাদুর্ভূত হন। ইনিই তার্কিক চূড়ামণি পক্ষধর মিশ্রনামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইনি যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের ছাত্র। ইহাঁরই অপর নাম জয়দেব মিশ্র। ইনি হরিমিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া স্বরচিত গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি গঙ্গেশ (গঙ্গেশ্বর) উপাধ্যায় প্রণীত নব্যন্যায় বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বচিন্তামণির আলোক (মণ্যালোক বা চিন্তামণি-প্রকাশ) নামক প্রাচীনতম সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন।* এই আলোক নামক ভাষ্যের চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। এই চারি টীকাকারের দুই জন মিথিলা নিবাসী, ও অপর দুই জন বঙ্গদেশীয়। (১) আলোকের "কণ্টকোদ্ধার" নামক টীকা ৪৩১ লক্ষণাব্দে (১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে) মধুসূদন ঠক্কুর কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। প্রত্যক্ষ-চিন্তামণ্যালোকের যে এক খানি হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার শেষে ৪৩১ লক্ষণাব্দ লিখিত রহিয়াছে।

মধুসূদন-সদ্যুক্তি-সমুৎসারিতকণ্টকাঃ
আলোক-বক্রমার্গেণ মণিং গৃহ্নন্তু ধীধনাঃ ॥

(২) আলোকের দ্বিতীয় টীকা "দর্পণ" নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রণেতা মিথিলাবাসী মহেশ ঠক্কুর। ইহাঁর পিতার নাম চন্দ্রপতি, মাতার নাম ধীরা দেবী বলিয়া অনুমিত হয়; দর্পণের যে হস্তলিখিত পুস্তক পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের নয়ন গোচর হইয়াছে, তাহা ১৬৬৩ সংবতের ৩রা শ্রাবণ সমাপ্ত হয়।

গৌর্য্যা গিরিশাদিব কার্ত্তিকেয়ো
যো ধীরয়া চন্দ্রপতেরলম্ভি।
আলোকমুদ্দীপয়িতুং নবীনং
স দর্পণং ব্যাতনুতে মহেশঃ ॥

(৩) আলোকের তৃতীয় টীকাকার হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। পুরীর

* নব্যভারত, পঞ্চম খণ্ড ১৪৪—৪৫ পৃষ্ঠা।

শঙ্কর মঠে হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত প্রত্যক্ষালোক, শব্দালোক, ও অনুমানালোকের যে তিন খানি হস্তলিখিত পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহা যথাক্রমে ১৫২৩, ১৫২২ ও ১৫২১ শকে কন্দর্প রায় নামক জনৈক লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হয়। প্রত্যক্ষমণ্যালোকের শেষে এই অস্পষ্ট শ্লোকটী দৃষ্ট হয়।

শাকে ত্রিযুগ্ম-বিশিখ-ক্ষণদাধিনাথে (১৫২৩)
মাসে + + স্বরধুনী-সরিধে চতুর্থ্যাং।
শ্রীসার্ব্বভৌম-প্রসি (?) প্রণয়েন লব্ধ
কন্দর্পরায়পদবীক ইদং লিলেখ॥

এই হরিদাসের কৃত উদয়নাচার্য্য প্রণীত কুসুমাঞ্জলি নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কুসুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যা নাম্নী একখানি টীকা আছে। ডাক্তার কাউয়েল (Cowell) হরিদাসী টীকাসহ সমগ্র কুসুমাঞ্জলি স্বরচিত ভূমিকা সহ পূজনীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সাহায্যে ইংরেজীতে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৪) আলোকের চতুর্থ টীকাকার নৈয়ায়িকাগ্রণী মথুরানাথ তর্কবাগীশ। ইনি গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির এবং রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি দীধিতিরও টীকা প্রণয়ন করেন*।

শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগীশ-ধীমতা।
বিশদীকৃত্য দর্শ্যন্তে প্রত্যক্ষালোকফক্কিকা॥

মথুরানাথের প্রণীত বহুতর গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। আমরা প্রস্তাবান্তরে ঐ সকল পুস্তকের নামাবলী উল্লেখ করিব। ইহাঁর পিতার নাম শ্রীরাম তর্কালঙ্কার। পিতা ও পুত্র উভয়েই নৈয়ায়িক শিরোমণি রঘুনাথের ছাত্র ছিলেন। পিতৃদেবের নিদেশানুসারে তিনি তত্ত্বচিন্তামণি, মণ্যালোক ও মণিদীধিতির টিপ্পনী রচনা করিয়া জগতে স্বকীয় বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত টীকার সাধারণ নাম রহস্য।

এই চারি জন ভিন্ন আরও অনেক পণ্ডিত আলোকের টীকা রচনা করেন। আমরা এস্থলে তাঁহাদের নাম ও রচিত গ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নির্দ্দেশ করিতেছি।

(৫) আলোকের পঞ্চম টীকা সারমঞ্জরী। ইহা ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত। ইনি রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির ও মণিদীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা নাম্নী এক খানি টীকা রচনা করেন। এই টীকা ভবানন্দী নামে প্রসিদ্ধ।

নমস্কৃত্য গুরূন্ সর্ব্বান্ নিগূঢ়-মণি-দীধিতৌ।
শ্রীভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকাশিতা॥

এই ভাবানন্দী টীকার ভাবানন্দী-প্রকাশ নামক টিপ্পনী মহাদেব পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত। মহাদেব পুণতামকর (?) রচিত এতদ্‌ভিন্ন আরও একখানি সর্ব্বোপকারিণী নাম্নী টীকা আছে বলিয়া ডাক্তর হল (Hall) নির্দ্দেশ করিয়াছেন*। এই উভয় মহাদেব এক ব্যক্তি কি না বলিতে পারি না। ভবানন্দ প্রণীত কারকাদির অর্থনির্ণয়, লটার্থবাদ, শব্দার্থসারমঞ্জরী, কারণতাবাদবিচার নামে কয়েকখানি বাদার্থ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ভবানন্দশর্ম্মা নামক জনৈক গ্রন্থকার গদ্যপদ্যে প্রায়-

* নব্যভারত, পঞ্চম খণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।

* Dr. A. F. Hall's Contribution towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems. Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss.

শ্চিত্ত-বারিধি নামক স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন।

(৬।৭) রঘুপতি ভট্টাচার্য্য এবং গোপীনাথ প্রণীত শব্দালোকের টীকার নাম শব্দালোক-রহস্য।

(৮।৯) গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ ও জয়রাম ন্যায়-পঞ্চানন শব্দালোক-বিবেক নামে জয়দেব মিশ্রের প্রণীত আলোকের শব্দখণ্ডের টীকা রচনা করেন। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন প্রণীত রঘুনাথ শিরোমণির দীধিতির টিপ্পনী (ব্যাখ্যা) বর্ত্তমান আছে। তৎপ্রণীত আখ্যাতবাদ টিপ্পনী (বা ব্যাখ্যাসুধা), হেত্বাভাস-দীধিতি-টিপ্পনী, সামান্য লক্ষণাদীধিতিটিপ্পনী, সমাস-বাদ নামে বাদার্থ, এবং ন্যায়সিদ্ধান্তমালা নামে গৌতম প্রণীত ন্যায়সূত্রের ভাষ্য পাওয়া গিয়াছে। ন্যায়সিদ্ধান্তমালা ১৭৫০ সংবতে বিরচিত হয়। আখ্যাতবাদ টিপ্পনীর প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন ;—

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ॥
আখ্যাতবাদব্যাখ্যানমাতনোতি মনোরমং।

তৎপ্রণীত উপদেশ-বিধেয় বোধস্থলীয় বিচার, অন্যথা-খ্যাতিতত্ত্ব, কারক-ব্যাখ্যা, নানার্থবাদ বিবৃতি বোধ হয় তাঁহার রচিত দীধিতি-ব্যাখ্যারই অন্তর্ভুক্ত। জয়রামের জনৈক কৃতবিদ্য ছাত্র গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্ত-বাগীশ ভট্টাচার্য্য প্রণীত শক্তিবাদ নামক সুবিখ্যাত বাদার্থগ্রন্থের টীকা রচনা করেন। গদাধর বহুতর ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। বাদার্থ বিষয়েই তিনি ৬৪ খানি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(১০) আলোকের দশম টীকা গাদাধরী। ইহা গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রণীত বলিয়া পণ্ডিত-বর হল (Dr. Hall) সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন*।

প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত স্বপ্রণীত জয়দেবচরিতে প্রসন্নরাঘব-নাটক-প্রণেতা জয়দেবকে পক্ষধর মিশ্র হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, নবদ্বীপের শেষ হিন্দুরাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেবের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামক স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বের শেষভাগে বঙ্গেশ্বরের প্রধান বিচার-পতি ও সভাসদ (আবসথিক মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ) বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়। পুতিতুণ্ড-বংশীয় আর্য্যাসপ্তশতী প্রণেতা প্রাগুক্ত গোবর্দ্ধনাচার্য্যের ন্যায় হলায়ুধ মুখ্য কুলীন ছিলেন*। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বগ্রন্থে কাত্যা-য়ন, বৌধায়ন, আশ্বলায়ন, পারস্কর ও গোভিল প্রণীত কল্পসূত্র ও গৃহ্যসূত্র, মনু-সংহিতা এবং প্রধান প্রধান পুরাণ হইতে স্বকীয় মত সংস্থাপনার্থ নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেদাধ্যয়ন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য, এই বিস্তীর্ণ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থে তাহাই সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি সর্ব্বস্ব নামে অনেকানেক গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে

* Dr. F. Hall's contribution towards an Index to the Bibliography of the Indian Philosophical Systems. Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss.

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত "সম্বন্ধ নির্ণয়" দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের "সেনরাজগণ" নামক পুস্তিকার লিখনানুসারে হলায়ুধকে আদিশূরানীত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বাৎসগোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ভট্টনারায়ণো দক্ষো বেদগর্ভোহথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
(ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং।)

কিন্তু পণ্ডিতবর ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির পরিচয় প্রদান কালে, হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার এই মত ভ্রমাত্মক কিনা, বলিতে পারি না। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ কবিরহস্য নামক ধাতুবিবেক প্রণেতা হলায়ুধ শাণ্ডিল্য-গোত্রজ ছিলেন। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি যজুর্ব্বেদাবলম্বী হিন্দুদিগের উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার বিষয়ে দশকর্ম্মদীপিকা নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত কুশণ্ডিকা ও বিবাহ-পদ্ধতি নামক স্মার্ত্ত গ্রন্থদ্বয়ও পুর্ব্বোক্ত দশকর্ম্মদীপিকার অন্তর্ভুক্ত। প্রবরাধ্যায় নামে স্বল্পায়তন একখান গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তাহা ও রত্নমালা নামক পদ্মরাগাদি রত্ন পরীক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ পশুপতি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। স্বরচিত দশকর্ম্মদীপিকার প্রারম্ভে পশুপতি রাজপণ্ডিত বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বিপ্রাণাং দশকর্ম্মপদ্ধতিমিমামুদ্ধৃত্য বেদাদর্সৌ।
চক্রে ভূপতি-পণ্ডিতঃ পশুপতি স্বর্গাপবর্গপ্রদাং॥

পশুপতি রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হলায়ুধ প্রণীত অনেক গুলি গ্রন্থের পশ্চাতেই "সর্ব্বস্ব" নামে সংযোজিত দেখিতে পাওয়া যায়। হলায়ুধ কর্ত্তৃক বিরোচিত স্মৃতিসর্ব্বস্ব বা হলায়ুধী*, মীমাংসা-সর্ব্বস্ব, বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব, শিব-সর্ব্বস্ব, মুনি-সর্ব্বস্ব, ন্যায়-সর্ব্বস্ব, পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব, মৎসসূক্ত তন্ত্র, অভিধান-রত্নমালা, কবিরহস্য নামক ধাতুবিবেক, এবং মৃতসঞ্জীবনী নামে পিঙ্গলাচার্য্য প্রণীত ছন্দঃসূত্রের টীকা,—পাওয়া গিয়াছে। শেষোক গ্রন্থের শেষে তিনি লিখিয়াছেন,—

পিঙ্গলাচার্য্যরচিতে ছন্দঃশাস্ত্রে হলায়ুধঃ।
মৃত সঞ্জীবনীং নাম, বৃত্তিং নির্ম্মিতবান্ ইমাং॥

* বিল্বপঞ্চ গ্রাম বাসী, কবি ভবেশের পুত্র, মিথিলার জনৈক অজ্ঞাতনামা রাজার ধর্ম্মাধিকরণিক মহামহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান সপ্ত পরিচ্ছেদে দণ্ডবিবেক নামক যে স্মৃতি গ্রন্থ ৫৫৫ লক্ষ্মণাব্দে (১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রণয়ন করেন, তাহাতে তিনি অন্যান্য স্মার্থ রচিত স্মৃতি গ্রন্থের সঙ্গে হলায়ুধের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দণ্ডবিবেকের যে হস্তলিখিত পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ৫৫৫ লক্ষ্মণাব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবিল্বপঞ্চান্বয়সম্ভবেন,
শ্রীসদ্ভবেশস্যতনূদ্ভবেন।
শ্রীবর্দ্ধমানেন বিদেহভর্ত্তুঃ,
কৃতে কৃতো দণ্ডবিধৌ বিবেকঃ॥

কল্পতরু কামধেনু হলায়ুধঞ্চ ধর্ম্মকোষঞ্চ।
স্মৃতিসার-কৃত্যসাগর-রত্নাকর-পারিজাতাংশ্চ।
টীকাসহিতে দ্বে সংহিতে চ মনুযাজ্ঞবল্ক্যোক্ত।
ব্যবহারে তিলকঞ্চ প্রদীপিকাঞ্চ প্রদীপঞ্চ॥
দৃষ্টা কৃতো নিবন্ধো নিবন্ধানির্ব্বন্ধাদেষ বর্দ্ধেণ
দণ্ডস্যাদৌ পরিকরস্ততঃ ষট তস্য হেতবঃ।
উক্তা দণ্ডবিবেকে যস্মিন্ পরিচ্ছেদেষু সপ্তসু।

হলায়ুধ মিশ্র নামক জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রন্থকার জ্যোতিঃসার নামে গ্রহনক্ষত্রাদি নিরূপক জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং দ্বিজনয়ন নামে সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যবস্থা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বোধ হয় তিনি মিথিলাবাসী ছিলেন।

আমরা তৃতীয় প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়াছি যে, শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে) ৪৪৬ জন কবির কাব্য গ্রন্থ হইতে সদুক্তিকর্ণামৃত নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলন করেন। ইহাতে ৮১৮৫ টী শ্লোক আছে। ইহাতে পাঁচটী প্রবাহ আছে। প্রতি প্রবাহ নানা বীচিতে বিভক্ত। এই গ্রন্থোল্লিখিত কবিদিগের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে সদুক্তিকর্ণামৃত একতম সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে*। মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস বঙ্গেশ্বর দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেবের বিশ্বস্ত বন্ধু ও সেনাপতি ছিলেন।

শৌর্য্যানীব তপাংসি বিভ্রতি ভবং যস্মিন্ন যস্যাবধি।
জ্ঞানে দান ইব, দ্বিষামিব জয়ো যেনেন্দ্রিয়াণাংকৃতঃ॥
সম্রাজামিব যোগিনামপি গুরুর্যশ্চ ক্ষমামণ্ডলে।
সশ্রীলক্ষ্মণসেন এব নৃপতি মুক্তশ্চ জীবন্নভূৎ॥
তস্যাসীৎ প্রতিরাজতদণ্ড-মহাসামন্তচূড়ামণি
নাম্না শ্রীবটুদাস ইত্যনুপমপ্রেমৈকপাত্রংসখা॥
শ্রীমান্ শ্রীধরদাস এত্যাধিগুণাধারঃ স তস্মাদভূদ্।
আকৌমারমপারপৌরুষপরাধীনস্য তস্যানিশং॥
অমরাঃ শৃঙ্গারচাটু অর্পদেশোশ্চাবচে ক্রমশঃ।
ইতি পঞ্চভিঃ প্রবাহৈঃ সদুক্তিকর্ণামৃতং ক্রিয়তে॥
শাকে সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেতদশশতে শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য রসৈকবংশে॥
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুণবিংশেষু পরার্থহেতাবকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥

সদুক্তিকর্ণামৃতে গোবর্দ্ধন, হলায়ুধ, জয়দেব, ভট্টনারায়ণ, কবিরাজ, কেশবসেন দেব, কৃষ্ণমিশ্র, লক্ষ্মণসেন, মাধব সেন, প্রবরসেন, পুর সেন, পুরুষোত্তমদেব, প্রভাকর দত্ত, ভগীরথ দত্ত, উমাপতি ধর, বল্লভ সেন, বসু সেন, বিদ্যাপতি, বিভাকর শর্ম্মা, যুবরাজ দিবাকর, ধ্রুব সেন প্রভৃতি বঙ্গদেশবাসী অনেকানেক গ্রন্থকারের নাম ও বিরচিত শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থোক্ত কবিগণের নাম এস্থলে বাহুল্য ভয়ে উল্লিখিত হইল না।

সৎপদ্যরত্নাকর নামক পদ্যসংগ্রহে ৩১৪৬ টী শ্লোক আছে। এই সংগ্রহ গ্রন্থ গোবিন্দদাস কর্ত্তৃক সংকলিত হয়। শান্তিপুরের রামযাদব চূড়ামণির নিকট যে হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তাহাতে ১৬৯৭ শকাব্দ গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রণম্য গোবিন্দপদারবিন্দং
গোবিন্দদাসো বিদুষাং নিয়োগাৎ।
নানা-কবীনামনবদ্যপদৈঃ
সৎপদ্যরত্নাকরমাতনোতি।

চন্দ্রশেখর কবি প্রৌঢ় বয়সে কাশীধামে অবস্থান কালে রাজা সূর্জ্জনের অনুরোধ-

* "Although the poetry collected is not of much value, it is of great use in identifying the poets whose names are of the highest importance as affording a limit on one side regarding their ages."
(Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. III. P. 134)

ক্রমে সূর্জ্জন-চরিত নামে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। রাজা সূর্জ্জনের জীবনী ইহাতে পদ্যে বিবৃত হইয়াছে। রাজা সূর্জ্জন কাশী বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানের বিদ্যাৎসাহী নরপতি ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। গ্রন্থকার বঙ্গদেশবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জিতামিত্র। চন্দ্রশেখর অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব বৈদ্য ছিলেন বলিয়া গ্রন্থ-সমাপ্তিবাক্যে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গৌড়ীয়ঃ কিল চন্দ্রশেখর কবির্যঃ প্রেম-
পাত্রং সতাং।
অম্বষ্ঠান্বয়মণ্ডলাৎ কৃতধিয়ো জাতো জিতা-
মিত্রতঃ॥
নির্ব্বর্ন্ধান্নৃপসূর্জ্জনস্য নিতরাং ধর্ম্মৈকতা-
নাত্মনো।
গ্রন্থোঽয়ং নিরমায়ি তেন বসতা বিশ্বেশিতুঃ
পত্তনে॥

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নবদ্বীপে বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ষড়্‌দর্শনবিৎ প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার পিতার বিদ্যাভূষণ উপাধি ছিল। তিনি পিতার নিকট অধ্যয়ন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে সবিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। চন্দ্রশেখর সংকল্প-দুর্গভঞ্জন, ধর্ম্মবিবেক, স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসারসংগ্রহ নামক চারি খান স্মৃতি-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থ-দ্বয়ে তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সদানন্দময়ীং স্মৃত্বা চন্দ্রশেখরশর্ম্মণা।
বরেন্দ্রান্বয়সম্ভূত—নবদ্বীপনিবাসিনা॥
...প্রীত্যয়ে গূঢ়শাস্ত্রার্থস্যাভিসন্ধিতঃ।
ক্রিয়তে দুর্গভঞ্জনঃ বুধরঞ্জনং॥
বিদ্যাভূষণ-বিখ্যাতঃ ষড়্‌দর্শনমতে সুধীঃ।
তৎসুতস্তাদৃশো ধীমাংস্ততোঽধীতি চ তৎ
সুতঃ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরো নাম্না খ্যাতো বাচস্পতিঃ
ক্ষিতৌ।
স্মৃতীনাঞ্চ প্রকাশার্থং তনোতীমাং
প্রদীপিকাং॥

গোপাল ন্যায়পঞ্চানন এক জন বঙ্গ-দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ও স্মৃতিসংগ্রহকার। তিনি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের পরে প্রাদুর্ভূত হন। হলায়ুধের "সর্ব্বস্ব" ও রঘু নন্দ-নের "তত্ত্বের" ন্যায় তিনি "নির্ণয়" নামে অনেক গুলি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের "তত্ত্বের" ন্যায় গোপাল ন্যায় পঞ্চাননের "নির্ণয়ের" দুই চারি খানি গ্রন্থ বঙ্গদেশীয় অনেক পণ্ডিতের গৃহই অলঙ্কৃত করিতেছে। গ্রন্থকার তৎ-প্রণীত কোন গ্রন্থেই নাম বা উপাধি ভিন্ন স্বকীয় অন্য কোন পরিচয়ই প্রদান করেন নাই। গোপাল ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত সম্বন্ধ-নির্ণয়, কাল-নির্ণয়, তিথি-নির্ণয়, প্রায়-শ্চিত্ত-নির্ণয়, দায়-নির্ণয়, বিবাদ-নির্ণয়, আচার-নির্ণয়, সংক্রান্তি-নির্ণয়, উদ্বাহ-নির্ণয়, অধিকারি-নির্ণয়, শুদ্ধি নির্ণয়, বিচার-নির্ণয়, ও দুর্গোৎসব-নির্ণয়, এই ত্রয়োদশ খানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

গোপাল শর্ম্মা নামে জনৈক বঙ্গীয় গ্রন্থ-কার "ধ্রুবানন্দমতবাখ্যা" নামক কুলজী গ্রন্থে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতানুযায়ী বঙ্গ-দেশীয় কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগাদি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাস-স্থান ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারস্থিত হরিনদী গ্রামে ছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণে প্রাচীন

গ্রন্থাদির সহিত কুলজীগ্রন্থের বিলোপের উপক্রম দর্শনে ব্যথিত হইয়া "নন্দচতুর্ভূপে" শাকে এই গ্রন্থ বিরচনে প্রবৃত্ত হন।

নত্বা রামপদদ্বন্দ্বং গুরুঞ্চ কুলদেবতাং ॥
ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা কৃতা গোপালশর্ম্মণা।
বর্গিকেন হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ ॥

* * * *

গ্রামে হরিনদীরম্যে গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বভাগতঃ।
শাকে নন্দচতুর্ভূপে শুভারম্ভঃ কৃতো মুদা ॥

আমরা চতুর্থ প্রস্তাবে শ্রীহরিভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণব সমাজে সুপ্রচলিত সংগ্রহ গ্রন্থ গোপাল ভট্ট প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তিনি ভগবদ্ভক্তিবিলাস গ্রন্থে একাদশী তিথিতে ব্রতোপবাস ও বিষ্ণুপূজাদির মাহাত্ম্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার স্বয়ংই তাহার টীকা যোজনা করিয়া দিয়াছেন। গণেশ সহস্রনামের হ্লাদদায়িনী নামে ব্যাখ্যা পুস্তকও বোধ হয় এই গোপাল ভট্ট প্রণীত।

গোপালকৃষ্ণ কবিরাজ রসেন্দ্রসারসংগ্রহ নামক ভৈষজ্যতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বঙ্গদেশীয় ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

তন্ত্রদীপিকা নামক সুবিস্তীর্ণ তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থে প্রায় ১১৭১৫টী শ্লোক আছে। ইহা কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যের তন্ত্রসারের ন্যায় তন্ত্রবিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ গোপাল ভট্ট প্রণীত। ইনি হরিনাথের পুত্র ও আগমবাগীশের পৌত্র বলিয়া সংকলিত গ্রন্থ মধ্যে স্বকীয় পরিচয় দিয়াছেন।

আগমবাগীশপৌত্রেণ হরিনামস্য সূনুনা।
শ্রীগোপালেন বিজ্ঞেন কৃতেয়ং তন্ত্রদীপিকা।*

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

সাগরের উক্তি।

১

যারে যা কুটিলা নদি,
কেন আর নিরবধি
মিছে কুল্ কুল্ স্বরে জ্বালাস্ আমায়?
ও কপট প্রেম গানে
পরাণে সাঁড়াশী টানে
কলিজা ধমনী শিরা ছিঁড়ে যায় যায়!
পারি না সহিতে আর
এ কপট ব্যবহার
বাড়ব অনলে বুক জ্বলিছে সদায়,

---

*অপর এক গোপাল ভট্ট ভানুদত্ত প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ রসমঞ্জরীর রসিকরঞ্জিনী নাম্নী টীকা রচনা করেন। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এই রসমঞ্জরী বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করেন। গোপাল ভট্ট দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম হরি ভট্ট। কালকৌমুদী নামে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানোচিত সময় বিষয়ে যে স্মৃতি গ্রন্থ আছে, তাহাও এই গোপাল ভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন দ্রাবিড়ক্ষ্মাসুপর্ব্বণা।
ক্রিয়তে রসমঞ্জর্য্যাঃ টীকা রসিকরঞ্জিনী ॥

শঙ্করাচার্য্য প্রণীত কঠোপনিষদ্ভাষ্যের কঠবল্লীভাষ্য বিবরণ নামে টীকা গোপাল যোগী নামা গ্রন্থকার প্রণীত। ভগীরথ মিশ্রের তনয় গোপালনন্দ বাণীবিলাস সারাবলী নাম্নী কালিদাসের কুমারসম্ভবের সুপ্রচলিত পূর্ব্বভাগের এক খানি টীকা রচনা করেন।

মিছে তোর ও সোহাগে
নিদারুণ মহারাগে
ঝটিকা তুফানে বুক ভেঙ্গে চুরে যায়
অবিরাম অবিশ্রাম আছাড়ি বেলায়!

২

জন্ম তোর উচ্চ কুলে
বৃথাই গিয়াছি ভুলে
তোর মত নীচগামী দেখি নাই আর,
শুধু তোর সঙ্গ দোষে
জগতে এ নিন্দা ঘোষে,
নীচতর—নীচতম নীচ পারাবার
ভাঙ্গিয়া পাষাণ-কারা
হয়েছিস্ গৃহ-ছাড়া,
কত দেশে বেড়াইলি সংখ্যা নাহি তার,
কোথাও পা'লিনা কূল,
খেয়েছিস্ তুই কুল,
তোরে কুল দিয়ে শেষে অকূল আমার!

৩

বড় আশা ছিল মনে
তোর সনে সম্মিলনে
নির্ম্মল জীবনে প্রাণ হইবে নির্ম্মল,
এনে দিবি স্বর্ণকণা,
কিন্তু একি বিড়ম্বনা,
ঢেলে দিলি হা পাষাণি কাদা মাখা জল!
বিধাতা হয়েছে বাম,
গেল রত্নাকর নাম,
কর্দ্দমে মর্দ্দিলি মণি মাণিক্য সকল,
আরো দেখ বুক ভরা
কত যে জন্মেছে চরা
অপার বালুকা রাশি ব্যাপি নীল জল!

৪

কত দুঃখ—কত ক্লেশ
ভীম ভয়ঙ্কর বেশ
মকর হাঙ্গর নক্র কত জলচর,
অতল জীবন মম
মথিতেছে অবিরাম
মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই—তিল অবসর!
যদি কেহ সেঁচে জল
দেখিত এ বক্ষস্থল
দেখিত সে কিযে কাণ্ড—কিযে ভয়ঙ্কর—
হৃদয়ে লুকান মোর
কি যে সে বিপ্লব ঘোর,
প্রলয়ের ধ্বংস মূর্ত্তি—ভীত চরাচর!

৫

এ হৃদয়ে এক দিন ছিল শশধর,
দেবেরে দিয়াছি যাহা
এ হৃদয়ে ছিল তাহা,
আমারি অমৃত দিয়া দেবতা অমর!
দিছি পারিজাত ফুল,
কৌস্তুভ মণি অতুল,
দিছি সর্ব্ব ফলপ্রদ কল্প তরুবর,
দিছি সর্ব্ব অবশেষে
ঐশ্বর্য্য—ঈশ্বরী বেশে
রাজশক্তি রাজলক্ষ্মীচাহিলে অমর!
কিন্তু আজি হায় হায়
কে বিশ্বাস করে তায়
সহস্র মন্দরে যদি মথে নিরন্তর,
সে সকল রত্ন আর
না উঠিবে পুনর্ব্বার
অতল কর্দ্দম রাশি—বালুকার স্তর
গ্রাসিয়াছে পারিজাত শশী সুধাকর!

৬

এখনো চাহিলে আহা শশধর পানে,
হৃদয় উছলে উঠে
বিশাল তরঙ্গ ছুটে,
কি যেন ভাবের উৎস খুলে যায় প্রাণে!

পারি না থাকিতে স্থির
ভাসাইয়া যায় তীর
সজোরে জোয়ারে তোরে ঠেলিয়া উজানে,
কিন্তু রে বেহায়া এত
তোর মত দেখিনে ত
আবার আসিস্ ফিরে কুল্ কুল্ গানে!
দিনে রেতে ঠেলে দেই যাস্ না উজানে!

৭

আহা!
এ বিষাক্ত চিন্তা প্রাণে সহেনা যে আর,
নিত্য অশ্রু জলে সিক্ত
জীবন হইল তিক্ত,
রটিল ক্ষীরোদ নামে কলঙ্ক আমার!
শরীর হইল কালা
প্রাণ করে ঝালা পালা,
আগুন লাগায় জলে নারী এ প্রকার!
কোথাহে অগস্ত্য আজ
কর বান্ধবের কাজ
বিশাল গণ্ডূষে আসি শোষ পারাবার!
নিবে যাক্ জীবনের যন্ত্রণা অপার!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মিথিলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মিথিলা প্রদেশ বঙ্গীয় পাঠকগণের নিতান্ত অপরিচিত নয়। জীবন্মুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী, রাজর্ষি জনকের রাজধানী, সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার ভগবান রামচন্দ্রের শ্বশুরালয়; মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপা, প্রাতঃস্মরণীয়া, সতী সাধ্বী সীতা দেবীর আবির্ভাব স্থল বলিয়া রামায়ণ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে এই পুণ্যভূমি মিথিলার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। বিশেষ, যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চার জন্য আজ নবদ্বীপ ভারতের অগ্রণী বলিয়া খ্যাত, সেই ন্যায়শাস্ত্র মিথিলা হইতেই বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়, ইহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পবিত্র স্থলের গৌরব দিন দিনই খর্ব্ব হইতেছে। রাজপুরুষদিগের অনুসরণ করিয়া আধুনিক ইতিহাস ভূগোল লেখকগণও এই প্রাচীন দেশের প্রকৃত নাম গোপন করিয়া ত্রিহুত নাম প্রচার করিতেছেন। সুতরাং কালক্রমে এই নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। নাম পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিথিলার আভ্যন্তরিক ভাবেরও যথেষ্ট বিপর্য্যয় ঘটিতেছে। এই প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে অবগত করাইবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

মিথিলার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। শীতোষ্ণ উভয়েরই আধিক্য। বর্ষাও যথেষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক ভিন্ন অপর কোন দিক হইতে বায়ু বহে না। শীতকালে পশ্চিমদিক হইতে এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পূর্ব্ব দিক হইতে বায়ু বহে। মলয় পবনের সঙ্গে এদেশের কোন সম্পর্কই নাই। মিথিলার প্রতি মা লক্ষ্মীর বিশেষ কৃপা। এখানে ধান্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয়; এতদ্ভিন্ন সকল প্রকার রবি শস্যই প্রচুর

পরিমাণে জন্মে। কৃষকগণের বিশেষ সুবিধা এই যে, এক ক্ষেত্রেই ক্রমে দুই অথবা এককালীন অনেক প্রকার শস্যের বীজ বপন করিতে পারে। ইক্ষুর চাষও বিলক্ষণ হয়। তামাক উৎপন্নের জন্য মিথিলা বিখ্যাত। কিন্তু নীলকর সাহেবেরা জমীদারের নিকট হইতে গ্রামকে গ্রাম দীর্ঘকালের জন্য ঠিকা লইয়া প্রজার নিকট হইতে ভাল ভাল জমী কাড়িয়া লন এবং তাহাতে নীল বপন করেন। ইহাতে প্রজাসকলের যে কতদূর অনিষ্ট সাধন হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, ঈদৃশী উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী বসুন্ধরার বক্ষে বাস করিয়াও মিথিলার প্রজাগণ পেটের জ্বালায় অস্থির! অনেকের দিনান্তেও উদরানল নির্ব্বাপণের উপায় হয় না। যাহা হউক, এবিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং রাজপুতদিগেরই প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রোত্রীয় (শোতী ভাষা) এবং সাধারণ ব্রাহ্মণ (বাহমন ভাষা)। শ্রোত্রীয়গণ সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। ইহাঁদের সংখ্যা পঞ্চশত অতিক্রম করিবে না। শ্রোত্রীয়দিগের মধ্যে কাহারও সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে; বরং অনেকের অবস্থাই উন্নত। অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ কাহারও নাই। স্বনামখ্যাত দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই শ্রেণীভুক্ত। মহারাজাই শ্রোত্রীয়গণের নেতা এবং তিনিই ইহাদিগের স্বচ্ছলতার কারণ। ইহাঁরাই মিথিলার আদিম ব্রাহ্মণ। অপর ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট অন্ন ইহাঁরা ভোজন করেন না। এই জন্যই শ্রোত্রীয়গণ ধনশালী হইলেও পাচক রাখিতে পান না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কোন শ্রোত্রীয়েরই অবস্থা নিকৃষ্ট নহে, সুতরাং পাচকত্ব স্বীকার করিতে সহসা ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। সংখ্যায় অল্প বলিয়া সকলেই পরস্পর সম্পর্কে আবদ্ধ; সম্পর্কীয়লোকের বেতনভোগী হইয়া কর্ম্ম করায় মানের লাঘব। তবে মহারাজা এবং তাঁহার জ্ঞাতীদিগের কথা স্বতন্ত্র। ইহাঁরা প্রচুর বেতন জায়গিরাদি দিয়া শ্রোত্রীয় পাচক সংগ্রহ করেন। মধ্যবিৎ শ্রোত্রীয়গণ মহারাজা কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতীদিগের বেতনভোগী হইতে বিশেষ অপমান বোধ করেন না, ইহাঁরা অপর ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করেন না বটে, কিন্তু ঘৃতপক্ক হইলে শূদ্রাদিতে (যাহাদের জল পানীয়.) পাক করিয়া দিলেও লুচি তরকারী ইত্যাদি ভোজন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন দিবা কিম্বা রাত্রে যতবার ইচ্ছা অন্ন ভোজন করিতে পারেন। আহারীয় বস্তুর মধ্যে অড়রেরডাল, আম্‌লি এবং দধিই ইহাঁদের পরমোপাদেয় ভোজ্য। কোনপ্রকার ডাল তরকারীই ইহাঁরা আম্‌লি না দিয়া রাঁধেন না। প্রবাদ আছে, কোন এক শোতীর ঘরে চোর আসিয়া অনেক দ্রব্য অপহরণ করিয়া লয় এবং সেই সঙ্গে এক কলসী অড়রেরডালও লইয়া যায় কিন্তু ভুল ক্রমে তৎপার্শ্ববর্ত্তী আম্‌লির হাড়ি ফেলিয়া যায়। প্রভাতে গৃহস্বামী চুরির সংবাদে বড়ই বিমর্ষ হইলেন। পরে যখন শুনিলেন, আম্‌লির হাড়ি অপহৃত হয় নাই, তখন আশ্চর্য্য হইয়া সংবাদ দাতাকে বলিলেন "চোর ধরিবার বিলক্ষণ উপায়

হইয়াছে; যেহেতু সে কেবল ডালই নিয়াছে, আম্‌লি নেয় নাই, বিনা আম্‌লিতে যখন ডাল খাওয়া যায় না, তখন অবশ্যই আম্‌লি নিতে কিম্বা ডাল ফিরাইয়া দিতে আসিবে। অতএব এই চোর ধরিবার বিশেষ সুযোগ।" সম্ভবত গৃহস্বামী ন্যায়-শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন!!!

শোতীরা মৎস্য মাংস ভোজনে বাঙ্গালী অপেক্ষা পটু। এলাচি এবং গুবাক ইহাঁদের অতি প্রিয়। ধূমপানের রীতি ইহাঁদের মধ্যে নাই, কিন্তু শাদা তামাক চূণ মিশ্রিত করিয়া গুড়া করিয়া খাইয়া থাকেন; ইহার নাম "খইনি"। প্রায় প্রত্যেক শোতীর সঙ্গেই একটী থলিয়ায় গুবাক, লবঙ্গ, এলাচি, শাদা তামাক, চূণ এবং একখানা সরতা থাকে।

ইহাঁদের বিবাহ প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে। অপর ব্রাহ্মণের সঙ্গে শোতীর আদান প্রদান নিষিদ্ধ। কিন্তু শোতীর মধ্যে কন্যার অভাব হইলে মহারাজ বাহাদুরের অনুমতি লইয়া শোতী, ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন; কিন্তু বিবাহের পর কন্যা আর পিতৃ গৃহে যাইতে পারিবেন না। এই নিয়মের লঙ্ঘণ করিলে শোতীর শোতীত্ব নষ্ট হয়। প্রত্যেক শোতীকে কন্যাদান কালে মহারাজার অনুমতি লইতে হয়। শোতী কোন ক্রমেই অপর ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে পারেন না। ইহাঁদের মধ্যে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। ঋতুমতী হওয়া পর্য্যন্ত কন্যা পিতৃ গৃহেই বাস করেন; পরে স্বামী গৃহে যান।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিম্বা দূরসম্পর্কীয় শ্বশুরের সঙ্গে জামাতার বাক্যালাপ কিম্বা দর্শন-লাভ নিষিদ্ধ। রাস্তাপথে হঠাৎ দৈব-ঘটনায় জামাতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই দূর হইতে পলায়ন করেন। জামাতাকে শ্বশুর বাড়ী গিয়া আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবরণে থাকিতে হয়। পরদার আড়ালে কিম্বা অপর গৃহে থাকিয়া জামাতা শ্বশুরমহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করেন, কোন তৃতীয় ব্যক্তি এই সংবাদ শ্বশুরের কর্ণগোচর করিলে তিনিও জামাতাকে উদ্দেশ করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। শ্বশুরের সঙ্গেই যখন এইরূপ ব্যবহার, তখন শাশুড়ীর সঙ্গের ব্যবহার আর বুদ্ধিমান পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না। জামাতা অতি বৃদ্ধ কালে শ্বশুরালয় গেলেও এই নিয়ম পালন করিতে হয়। সর্ব্বদাই অধোদৃষ্টিতে থাকিতে হয়, পাছে কোন শ্বশুর শাশুড়ী নয়নগোচর হয়। আমাদের পক্ষে "শ্বশুর বাড়ী মথুরাপুরী", ইহাদের পক্ষে যমের বাড়ী! ধন্য দেশাচার!

স্ত্রীলোকেরা অতি নোংড়া। সধবা স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই স্নান করেন না, মাসের মধ্যে যদি ২।১ দিন স্নান করেন ত সেই অধিক। বিধবারা প্রত্যহই স্নান করেন। বালকগণের যে পর্য্যন্ত উপনয়ন না হয়, সে পর্য্যন্ত কদাচিত স্নান করে; সুতরাং শরীরে অতি দুর্গন্ধ হয়। উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত বালকেরা শূদ্রাদির অন্ন ভোজন করে।

ইহাঁরা পিতাকে "দাদাজি", মাতাকে "দাই", পিতামহ ও মাতামহকে "বাবা" পিতামহী ও মাতামহীকে "মাঁইয়া", এবং প্রপিতামহী ও প্রমাতামহীকে "দা" বলিয়া সম্বোধন করেন। মাতুলানীর সঙ্গে এঁদের ঠাট্টা তামাসা চলে, বিশেষ ২ পর্ব্বোপলক্ষে

মাতুলানীর প্রতি অশ্লীল ভাষা পূর্ণ গালি বর্ষণও করিয়া থাকেন।

শোতীদিগের মধ্যে সকলেরই চাষ আছে, তদ্দারাই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, বরং কাহারও কাহারও উপস্বত্ব থাকে। শোতীরা যত দিন দ্বারভাঙ্গা সহরে থাকেন, তত দিন পান ভোজনের ব্যয় মহারাজাই বহন করেন। মর্য্যাদানুসারে এই ব্যয়ের তারতম্য আছে। ন্যূনকল্পে দৈনিক চারি আনার কম্ কাহাকেও দেওয়া হয় না। ছোট ছোট বালকগণও এই নিয়মে পাইয়া থাকেন। বৎসরাবধি যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের জন্যও এই নিয়ম লক্ষিত হয়। শোতীদিগের এই একটী বিশেষ সুবিধা; বিশেষ বালকগণের পক্ষে; কারণ, সর্ব্ব সাধারণের জন্য মহারাজার অবৈতনিক ইংরাজি স্কুল এবং সংস্কৃত পাঠশালা আছে; তাহাতে আবার শোতীদিগের ভোজনের এই প্রকার সুব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এত সুযোগ থাকা সত্বেও শ্রোত্রীয় বালকগণ বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী নয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক অতি কম। তবে আজকাল কেহ কেহ এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। শোতীদিগের মধ্যে কেহই নিরক্ষর নাই। সংস্কৃতের আলোচনাও কিছু আছে। যাঁহারা অধিক পড়াশুনা না করেন তাঁহারাও অন্ততঃ লঘুকৌমুদির কয়েক পাতা এবং অমর কোষের কয়েক পংক্তি কণ্ঠস্থ করিয়া এবং মুখে মুখে শাস্ত্রীয় ২।৪ কথা শিখিয়া, ললাটে চন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া, মস্তকে বড় বড় উষ্ণীষ চাপাইয়া রাজদরবার এবং অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এদের পাগড়ী দেখিতে কুতূহল জন্মে। পাগড়ীর কাপড়ের দৈর্ঘ্য ৩০।৭০ বা ৮০ হাত পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ভাল পাগড়ীর বারাণ্ডা এবং খিড়কিও থাকে। শোতীগণ বেশ বাকপটু, অর্থাৎ অনর্থক গল্প এবং পরনিন্দায় বিশেষ পটু! সম্মুখে হুজুর বলিয়া পশ্চাতে গালি বর্ষণ করেন। স্বভাবতঃই ইহারা কুটিল। লোকের নামে মিথ্যা অপযশ ঘোষণা করিতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন না।

সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর এবং আচার ভ্রষ্ট। যাহারা নিরক্ষর, তাহাদের কৃষিকর্ম্ম, গরু ও মহিষ চরাণই কাজ। এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন, যাহাদের উপবীত গুপ্ত থাকিলে চণ্ডাল কিম্বা তদপেক্ষা কোন নিকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া ভ্রম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

ইহাদের বিবাহ প্রণালীতেও একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। বাড়ীতে ঘটক গিয়া সম্বন্ধ নিরূপণ ইহাদের কদাচিৎ হয়। বৎসরের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিন একটী নির্দ্দিষ্ট আম বাগানে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ আসিয়া মিলিত হয়। সেখানে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার পরস্পর আলাপ পরিচয় হইলে কথা সুস্থির হয়। এই সমস্ত লোক ২।৩ দিন ঐ বাগানে অবস্থিতি করে। এই অসংখ্য লোকের আহারীয় সামগ্রী, দ্বারভাঙ্গার সুযোগ্য, পুণ্যশীল, বদান্য, উদারচেতা মহারাজার সরকার হইতে প্রদত্ত হয় এবং লোকের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, এজন্য রাজধানী হইতে একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী এই বাগানে প্রেরিত হন। তিনি সুনিপুণ

ব্যবস্থা করিয়া সকলের শান্তি বিধান করেন।

এইরূপে বাগানে বসিয়া কথার স্থিরতা হইলে বর কন্যা দেখিয়া বিবাহের দিন ধার্য্য করা হয় এবং যথারীতি বিবাহ সম্পন্ন হয়।

ব্রাহ্মণেরা দধি চিড়ার অতি প্রিয়। দধি চিড়া পাইলে আর অন্য কিছু চায় না। এমন কি ক্রমাগত মাসাবধিও ইহারা ভাত না খাইয়া দধিচিড়া খাইয়া থাকিতে পারে। কোথা হইতে নিমন্ত্রণ আসিলে প্রথমেই ইহারা অনুসন্ধান লয় যে নিমন্ত্রণে "দহি চুড়া" হইবে কি "চুড়া দহি" হইবে। এর তাৎপর্য্য এই যে "দহি চুড়ায়" দহির এবং "চুড়া দহিতে" চুড়ার আধিক্য।

কায়স্থদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই। ইহারা লেখনী সঞ্চালন এবং কৃষি কার্য্যই করিয়া থাকে। ভোজনে ইহারাও বিলক্ষণ পটু, কিন্তু ব্রাহ্মণের ন্যায় আকণ্ঠপূরণ করে না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় জাতিতেই কন্যার বাল্যকালে বিবাহ হয়। তবে ব্রাহ্মণ কন্যার যত অল্প বয়সে বিবাহ হয়, কায়স্থ কন্যার বিবাহ তদপেক্ষা কিছু অধিক বয়সে হয়। এই উভয় জাতিতেই পুরুষদিগের যুবাবস্থায় বিবাহ হইতেই সচরাচর দৃষ্ট হয়। এই উভয় জাতীয়া কন্যারাই ঋতুমতী না হইয়া স্বামী গৃহে যাইতে পান না। ঋতুমতী হইলেই স্বামী গৃহে যান। স্বামী গৃহে প্রথম যাত্রাকে ইহারা "দ্বিরাগমন" বলে।

এইবার নীচশ্রেণীর লোকের বিষয় লিখিতে হইতেছে। ইহাদের অবস্থা স্মরণ হইলে মনে বড় ব্যথা লাগে। শরীরের রক্ত দিয়া শস্য জন্মায়, কিন্তু শস্য তাহাদের উদর পূর্ত্তির সাহায্যে আসে না। জমীদার এবং মহাজনের পীড়নেই ইহারা ব্যতিব্যস্ত। তার উপর আবার ঠিকাদার নীলকর সাহেবেরা আছেন। গরিব প্রজা যায় কোথায়? পেট ভরিয়া ভাত খাওয়া দূরে থাকুক, মাড়ুয়ার রুটী দিয়া উদর পূরণ করিতে পারিলেও অনেকে কৃতার্থমন্য হয়। কি দুর্ভাগ্য! শ্রাবণ ভাদ্র মাসে অনেকের দিনান্তেও একবার হয় না। অনেক সময় যে সমস্ত লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। যাঁহারা মিথিলার পল্লীগ্রামে আসিয়া কৃষীজীবিদিগের অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন অপরের বুঝিয়া উঠা কঠিন। শস্য কাটিয়া আনিয়া ঘরে রাখা দূরে থাকুক, বিক্রয় করিয়া জমীদারের খাজানা, নজর, মহাজনের সুদ, গোমস্তা পাটোয়ারীর সেলামী এবং সিপাহীর আগমনী প্রভৃতি অবশ্য দেয়ও পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই পুনরায় ঋণ করিতে হয়।

মজুরি করিবারও সুবিধা নাই। ঘরের খাইয়া সমস্ত দিন পরিশ্রম করিলে দুই সের কি আড়াই সের ধান অথবা এক আনা দেড় আনা পয়সা বই মেলে না। আবার গোলাভাটী থাকিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছে। ২।৪ পয়সা যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনে, তদ্দারা আহারীয় সামগ্রী কিনিতে পারিলেও কথঞ্চিত উপকার হয়; কিন্তু সে পয়সা প্রায় ঘরে আসে না। পথে যথেষ্ট তাড়ীর দোকান আছে, সেই খানেই রাখিয়া আসিতে হয়। বাড়ীতে স্ত্রী হাঁড়ি ধুইয়া বসিয়া আছে, স্বামী সমস্ত দিনের উপর্জ্জিত পয়সা দ্বারা তাড়ী পান করিয়া

আনন্দে বিভোর হইয়া নৃত্য গীত করিতে করিতে আসিয়া হয়ত অনাহার-পীড়িতা স্ত্রীকে প্রহার করিয়া বসিলেন, সুতরাং এদিনের হরিবাসর পরিণাম। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য ভিন্ন অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাও বিলক্ষণ করে। এবিষয়ে তাহারা পুরুষাপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে বরং ফাজিল; কারণ পুরুষের উপর্জ্জিত পয়সা প্রায় তাড়ীতে ব্যয় হয়, স্ত্রীলোকের উপর্জ্জিত পয়সাই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয় হয়। এমনি তুরদৃষ্ট! স্ত্রীপুরুষে সমভাবে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও পেটের জ্বালা ঘুচাইতে পারে না। রাজা, জমীদার, এবং মহাজনের স্বার্থপরতা যদিও এই জীবনকষ্টের কারণ, তথাপি প্রজাদিগের অনবধানতাও এর অন্যতম কারণ। সাধারণতঃ এ দেশের লোকের বুদ্ধি কিছু স্থূল, কোন বিষয়েরই রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারে না।

এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রথা আছে। শিশু বিবাহই এদের মধ্যে প্রচলিত। বালকগণের ৫।৭ বৎসরের মধ্যে এবং বালিকাগণের ৩।৪ বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। যে সকল বালকের ৫।৭ বৎসরের মধ্যে বিবাহ না ঘটে, তাহারা আর কুমারী বিবাহ করিতে সমর্থ হয় না। বয়স অপেক্ষাকৃত বেশী হইলে, এমন কি দশ বৎসর অতিক্রম করিলে বিধবা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। বিধবার সহিত বিবাহকে ইহারা বিবাহ বলে না, "সম্বন্ধ" বলে। ইহাদের মধ্যেও কন্যা বয়স্থা না হইলে স্বামী গৃহে যায় না। ইহারা অতি অপরিষ্কার। বিশেষ স্ত্রীলোকেরা। তাহারা প্রায়ই স্নান করে না, কদাচিৎ স্নান করিলেও কাপড় ধোয় না। কেহ কেহ বা নূতন কাপড় পরিয়া, সেই কাপড় পুরাতন হইয়া পরিধানের নিতান্ত অনুপযুক্ত না হইলে আদৌ ত্যাগ করে না। সুতরাং ঐ সকল লোকের কাছে থাকা দায়। উহারা কাছে আসিলে নাকে কাপড় না দিয়া থাকা যায় না। দারিদ্র্যই যে ইহার মুখ্য কারণ, এমনও নয়। আলস্য এবং অভ্যাসই ইহার মূল।

এখন পাঠকগণকে এ দেশের একটু সাধারণ ভাব জ্ঞাত করিয়া প্রবন্ধের শেষ করিব। মৈথিলদিগের ভাষা স্বতন্ত্র কিন্তু বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের সঙ্গে বেশ ঐক্য আছে। অক্ষরে প্রায়ই বাঙ্গালা অক্ষরের ন্যায়, প্রভেদ অতি অল্প।

বঙ্গদেশে যেরূপ দেবার্চ্চনা, উৎসব পার্ব্বনাদি আছে, এদেশে সেরূপ দেখা যায় না। "চৌঠচাঁদ" এবং "ছট"ই এ দেশের প্রধান পর্ব্ব। এ পর্ব্ব, সর্ব্ব সাধারণের গৃহেই লক্ষিত হয়। এই উভয় দিনই স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীআচার নির্ব্বাহ করিয়া আহারের যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করে। 'চৌঠ চাঁদের' অর্থ নষ্ট চন্দ্র। আমাদের দেশে এ দিন চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ, এদেশে চন্দ্র দর্শন অবশ্য-কর্ত্তব্য। "ছটের" অর্থ ষষ্ঠী পূজা, এটা কার্ত্তিক মাসে হইয়া থাকে। শ্রীপঞ্চমীর দিন এ দেশে কোন উৎসব নাই, কিন্তু ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন দোয়াত পূজা হয়। ভাইফোঁটার প্রথাও আছে। দীপান্বিতার দিন রাত্রে দীপ যাত্রা হইয়া থাকে। দোলের সময় আবির এবং কাদার বিলক্ষণ ছড়াছড়ি হয়। সকলের আবির জোটে না বলিয়াই বোধ হয় কাদার

ব্যবস্থা। দোল যাত্রাকে ইহারা "ফাগুয়া" বলে। এদিন পূজার্চ্চনার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই, কেবল লোকের প্রতি অশ্লীল গালি বর্ষণ করা হয়। রামনবমীর দিন কোন কোন বাড়ীতে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান্ প্রভৃতির মূর্ত্তি পূজা হয়। হনুমানকে ইহারা দেবতা বলিয়া মানে। লোকে যত্ন করিয়া ছেলে পিলের নাম হনুমান রাখে। সচরাচর লোকে যে নাম রাখে, তাহার কোন অর্থই নাই এবং শুনিতেও কদর্য্য।

প্রকৃতপক্ষে এদেশে শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। এই অভাব অপনয়নের আশু চেষ্টা না হইলে স্থানীয় লোকের দুঃখ দূর এবং সুখবর্দ্ধনের অন্য উপায় নাই।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র বসু।

সীতারাম রায়।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে সাড়ে সাত-ঘর* কায়স্থ আছে। তন্মধ্যে কাশ্যপদাস নিকৃষ্ট। এই কাশ্যপদাসের বিশ্বাস খাস ধারায় সীতারামের জন্ম। হরেকৃষ্ণ রায় নামক কৃষ্ণবিগ্রহের মন্দিরোপরি ইষ্টকে লিখিত যে কবিতা দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সীতারামকে "বিশ্বাসখাসোদ্ভবকুল-কমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ" বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কুলজীতে বিশ্বাস খাস বংশের এইরূপ বর্ণনা আছে;—

"হালচসে তাল খায় গিধিনেতো বাস।
তাহাতে হইলেক নাম বিশ্বাসখাস"॥

এইরূপ হীনবংশে সীতারামের উৎপত্তি। সীতারামের পিতার নাম উদয় নারায়ণ দাস। পরিশিষ্টে যে নক্সা প্রদত্ত হইবে, তাহাতে উদয়গঞ্জের খাল ও উদয়গঞ্জের হাট নামে দুটী স্থান দৃষ্ট হইবে। তাহাই তাঁহার পিতার নামের প্রমাণ।

সীতারামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম লক্ষ্মী-নারায়ণ রায়। সীতারাম হইতে এই দাস বংশ "রায়" উপাধি দ্বারা খ্যাত। পর পৃষ্ঠের শিরোভাগে সীতারামের বংশাবলী দেওয়া যাইতেছে।

সীতারামের প্রপৌত্র রাধাকান্ত রায়ের দৌহিত্রবংশে উমাচরণ দাস বিদ্যমান আছেন। তিনি অতি দীনভাবে কাল যাপন করিতেছেন। তাঁহার নিকট হইতেই আমি বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছি। সীতা-রামের সহোদর লক্ষ্মী নারায়ণের উত্তর পুরুষ দেবনাথ রায় হরিহর নগরে বাস করিতেছেন।

সীতারামের প্রাদুর্ভাব কাল নিশ্চিত-রূপে জানা গিয়াছে। তৎকৃত দশভুজালয়, হরেকৃষ্ণ রায় এবং লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মন্দিরত্রয়ের শীর্ষ দেশে এক একটী কবিতা ইষ্টকে খোদিত ছিল। তন্মধ্যে হরেকৃষ্ণ রায়ের বাটীর কবিতা আমি পাঠ করিয়াছি।

---

* ঘোষ—১ মধুকুল্যদাস—১
সিংহ—১ কাশ্যপ দাস—১
মিত্র—১ শাণ্ডিল্য ঘোষ—১
দত্ত—১ কর—$\frac{১}{৪}$
ভরদ্বাজ—$\frac{১}{৪}$

৭ $\frac{১}{২}$

+ রাঢ়
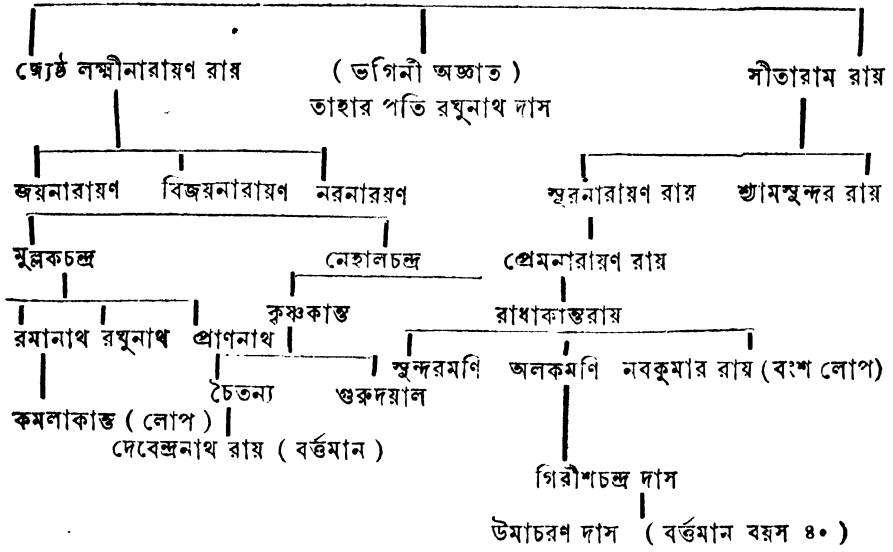
আর দুটী কবিতা, ইতিপূর্ব্বে ইষ্টক স্খলিত হওয়াতে অদৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু সে দুটী কবিতা যাঁহার মুখস্থ আছে, এমন লোকের নিকট হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। কবিতা তিনটী নিম্নে লিখিত হইল;--

(১) দশভূজালয় মন্দিরে।*

মহীভুজরস ক্ষৌণীশকে দশভূজালয়ং
অকারি শ্রীমতাসীতা রাম রায়েন মন্দিরং

অর্থ। ১৬২১ শকে (১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে) সীতারাম রায় কর্তৃক দশভূজালয় নামক মন্দির কৃত (নির্ম্মিত) হয়।

(২) হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরে।†

বাণদ্বক্ষাঙ্গ চন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষঃ
শ্রীমদ্বিশ্বাস খাসোদ্ভবকুলকমলে ভাসকোভানুতুল্যঃ।
ভ্রজস্নেহোপযুক্তং রুচির রুচিরহরেকৃষ্ণগেহং বিচিত্রং।
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমন্তঃ সসর্জ্জ।

অর্থ। ১৬২৫ শকে (১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে) কৃষ্ণের সন্তোষের জন্য রুচির রুচিহর শ্রীমদ্বিশ্বাস খাসোদ্ভবকুলকমলে রবি সদৃশ শ্রীসীতারাম রায় ভক্তিমন্ত হইয়া যদুপতিনগরে বিচিত্র কৃষ্ণ গেহ নির্ম্মাণ করিলেন।

(৩) লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে।

লক্ষ্মীনারায়ণ স্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশ
নির্ম্মিতং পিতৃ পুণ্যার্থে-সীতারামেণ মন্দিরং।

অর্থ। ১৬২৬ শকে (১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে) লক্ষ্মীনারায়ণ নামক শিলাচক্র সংস্থাপনের জন্য পিতৃ পুণ্যার্থে সীতারাম রায়ের কর্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

এই তিন কবিতা দ্বারা স্থির করা যায়,

---

* ইহার ভিতর সীতারামের সময়ের অষ্টধাতু নির্ম্মিত দশভূজা মূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হয়। তজ্জন্য সেই সময় হইতে যে ব্রহ্মোত্তর ছিল, অদ্যাপি তাহা আংশিকরূপে আছে।

† এইমন্দির যদুপতিনগর (বর্ত্তমান কানাই নগর) গ্রামে স্থিত। ইহাতে কৃষ্ণ বিগ্রহের ঐ প্রকার পূজা হয়।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীতারাম রায় বিদ্যমান ছিলেন।

মহাম্মদপুরের দুই ক্রোশ উত্তরে ধুলজুড়ী গ্রামে একটী ভগ্ন মন্দিরের ভিতরের দিকে নিম্ন লিখিত কবিতা ইষ্টকে খোদিত ছিল। কবিতাটী এই ;—

স্বর্ণচন্দ্র রসইন্দৌ কৃষ্ণচন্দ্রস্য মন্দিরং
ইদং কৃতি মুনীরামো রামভদ্রস্য নন্দনঃ। *

অর্থ। ১৬১০ শকে (১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) রাম ভদ্রের পুত্র মুনীরাম কৃষ্ণচন্দ্র নামক বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

মুনিরাম (রায়) ঢাকাতে, পরে মুর্সিদাবাদে সীতারামের উকীল ছিলেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থ। সম্ভবত সীতারামের কার্য্যোপলক্ষে তিনি এ অঞ্চলে আসেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য কবিতাকারে প্রচলিত আছে। কবিতাটী এই ;—

কোন্ সীতারাম রায়?
যেস্কা উকীল মুনীরাম রায়? †

স্থানান্তরে এই কবিতার অর্থ ও তদ্ঘটিত ঘটনা বিবৃত করিব। এস্থলে, বোধ হয়, ইহা বলা যাইতে পারে যে, মুনীরাম রায় কৃত উপরোক্ত কৃষ্ণ মন্দির নির্ম্মাণ কালে সীতারাম এমন বয়স্ক হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং উকীলাদি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ কালে যদি তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর ধরা যায়, তবে তাঁহার জন্ম সন ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে।

ক্রমশঃ।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ভুল।

১

একি হ'লো ভুল!
আমার একি হ'লো ভুল!
সকলি ঘুচিয়া গেল, দুখেতে আকুল।
আমার একি হ'লো ভুল!

২

কি জানি, কি ক্ষণে ভুলে,
চেয়েছিনু আঁখি তুলে,
নয়নে নয়নে মিল, প্রাণে প্রাণে ভুল!
হৃদয় নির্ম্মূল।

৩

না দেখে, না শুনে কিছু,
না ভাবিয়া আগু-পিছু,
বাসনা-নদীর মোর ভেসে যায় কূল।
আমার একি হ'লো ভুল!

৪

হায় হায়, যার আঁখি,
প্রেমে স্বপ্নে মাখামাখি,
তার আঁখি হ'লো একি যাতনার মূল!
আমার একি হ'লো ভুল!

শ্রীঅক্ষয় কুমার বড়াল।

---

* মুনিরাম রায়ের প্রপৌত্র শতবর্ষবয়স্ক প্রাণনাথ রায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ এই কবিতা গৃহীত।

† এই প্রবাদ বাক্য প্রাণনাথ রায় ও তাঁহার স্ত্রী সমর্থন করেন। উভয়েই অত্যন্ত বৃদ্ধ।

মহিমা ধর্ম্ম।+

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে ধর্ম্মের নামাঙ্কিত হইল, তাহা বিগত প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে উৎকল ও মধ্য ভারতবর্ষের বহুতর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মের প্রচারের ন্যায় এই ধর্ম্মের প্রচার বিশেষ আড়ম্বর ও আন্দোলনের সহিত সাধিত হয় নাই, যদিও এই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাম অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের নামের ন্যায় বহুবিস্তৃত লোক-প্রসিদ্ধি ও গৌরব-ভূষণে বিভূষিত হয় নাই, তথাচ দুই এক জন নয়, দুই এক শত নয় কিন্তু সহস্র সহস্র লোককে এই ধর্ম্মে নিবিষ্ট দেখা যায়। সুতরাং লোকসমাজে তাদৃশ খ্যাতি-প্রতিপত্তি না থাকিলেও মহিমা-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক যে এক জন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের প্রকৃত নাম কি, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কেহ বলেন, ধূলিয়াবাবাজী, কেহ বলেন অলখ্ বাবাজী, আবার কেহবা বলেন মহিমাবাবাজী! তিনি ধূলি অর্থাৎ মৃত্তিকাতে শয়ন করিতেন বলিয়া বোধ হয় ধূলিয়াবাবাজী নামে আখ্যাত হইয়া থাকিবেন, এবং শেষোক্ত নামদ্বয় বোধ হয় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নামানুসারে হইয়াছে। কেননা তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে কেহ অলখ্ ধর্ম্ম কেহ বা মহিমাধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, কেহ তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত নামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে "আমি নিজের কোন নাম রাখিব না, কিন্তু প্রভুর নামই রাখিব।" তাঁহার নাম সম্বন্ধে যেমন কেহই প্রকৃত সংবাদ অবগত নহে, সেইরূপ তাঁহার প্রকৃত জন্মস্থান কোথায় ছিল, তাহাও কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। সুতরাং এই ধর্ম্মসংস্থাপকের প্রকৃত নাম ও জন্মভূমির সংবাদ আমরা পাঠকগণের জ্ঞানগোচর করিতে পারিলাম না। তবে অলখ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকে অনুমান করিয়া বলেন যে, তাঁহার জন্মস্থান পশ্চিমাঞ্চলে গয়ার সন্নিকটে কোন স্থানে ছিল। যে স্থানে হউক আর যে সময়েই হউক, এরূপ বর্ণিত আছে যে, মহিমাবাবাজী বৈশাখী পূর্ণিমার দিন রবিবার প্রাতঃকালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের নির্গুণ মাহাত্ম্য নামক পরমপূজ্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি কপিলঋষির পুত্র।

কপিলঋষিঙ্কর সুত, নাম তাহাঙ্ক অবধূত।
দীক্ষহিঁ অবধূত বেশ, ত্যাগিলা সংসার
বিশেষ ॥
বাল্যকালেরু হইল যোগী, সন্ন্যাসভাবে
সর্ব্বত্যাগী।

যদিও এই সকল পদ উৎকল-দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছে, তথাচ বাঙ্গালার

+ এই ধর্ম্মাক্রান্ত এক জন অবধূতের নিকট হইতে আমরা এবিষয়ে যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই এই প্রস্তাবে লিপিবদ্ধ করিব। সুতরাং বর্ণনীয় বিষয় সকলের সত্যাসত্যের জন্য আমরা দায়ী নহি। তবে কেহ কোন স্থানে ভ্রমসঙ্কুল দেখিয়া তাহা সংশোধনের জন্য [illegible] বিষয় আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। লেখক।

সহিত এ সকলের এমন কিছু গুরুতর পার্থক্য নাই, যদ্দারা এ দেশীয় পাঠকবর্গের অর্থবোধে কষ্ট হইতে পারে, পাঠকগণ একটু চিন্তা করিলেই সহজে ঐ সকলের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যাহা হউক, মহিমাবাবাজী বাস্তবিক কপিলঋষির পুত্র ছিলেন কি না; সে বিষয় পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদের সে বিষয়ে বাদপ্রতিবাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তবে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা যে নিজ নিজ প্রবর্ত্তক পুরুষের জন্ম, মৃত্যু, আহার, বিহার ইত্যাদি নৈসর্গিক ও শারীরিক ব্যাপার সকলকে অলীক ও অতিবর্ণনায় বর্ণিত করেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং যে রীতি সর্ব্বগত এবং সর্ব্বকালপ্রচলিত, তখন মহিমাসম্প্রদায়ে কেন তাহা উপেক্ষিত হইবে ?

পূর্ব্বোক্ত পদাবলীর মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে, বাল্যকালেই তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। এমন কি শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি সাত বৎসর বয়সের সময়েই সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসাবলম্বনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে ;— তিনি একদিন কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, একজন নৃশংসস্বভাব ব্যাধ আসিয়া একটী কপোতশাবককে ধরিবার জন্য জাল বিস্তার করিল। অবিলম্বে সেই কপোতশিশু জালে পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতে করিতে ব্যাধের হস্তে আক্রান্ত হইল। কিছুক্ষণ পরে সেই কপোতমাতা আসিয়া সন্তানের দুর্দ্দশা দর্শন করিল এবং সেও পুত্রদুঃখে দুঃখিনী হইয়া সেই জালে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার মন চিন্তিত ও আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি বিলম্ব ব্যতিরেকে সংসারপাশ ভেদ করিয়া প্রব্রজ্যার অনুগামী হইলেন। কারণ তিনি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আমিও যদি আসক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সংসার মধ্যে অবস্থান করি, তবে আমাকেও এইরূপ মায়াজালে জড়িত হইতে হইবে।

বিশ্বচরাচর যে একখানি পরমসুন্দর অতি জ্ঞানগর্ভ অভ্রান্ত শাস্ত্র এবং ইহা নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিতে পারিলে মনুষ্য যে বহু পরিমাণে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা প্রায় সকল সাধু মহাত্মার জীবনেই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি ও প্রতিভাবলে সময়ে সময়ে জনসমাজের আমূল পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে, অথবা যাঁহাদিগের চরিত্রগত পরম পবিত্র পুণ্যদীপ্তিতে ধরণীর মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই পুস্তকগত জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া প্রকৃতিরূপ এই পরমশাস্ত্রের অধ্যয়নে গাঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সুনীল নভোমণ্ডলের একটি উজ্জ্বল তারকা, সমীরণের মন্দ মন্দ প্রবাহ, বিহঙ্গকণ্ঠের কলকলধ্বনি, পর্ব্বতের স্থির গম্ভীর শৃঙ্গমালা, অনন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের বিপুল গাম্ভীর্য্য, মস্তকোপরি অসীম কল্প আকাশমণ্ডলের উদাস ও প্রমুক্ত ভাব ইত্যাদি গ্রন্থসকল বিশুদ্ধচিত্তে ও নিবিষ্টভাবে অধ্যয়ন করিলে কাহার না চিত্তে অজস্রধারে জ্ঞানবারি বর্ষিত হইতে থাকে ? এ সকল ত দূরের কথা, আমাদিগের ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত অগ্নি জল মৃত্তিকা প্রভৃতি সামান্য সামান্য

বস্তুর তত্ত্ব আলোচনা করিলেও আমরা প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা পাইতে পারি। হয়ত কেহ জন্মাবচ্ছিন্নে পুস্তকের মুখ অবলোকন না করিয়াও এই সকল পদার্থ হইতে প্রভূত পরিমাণে পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন। আমাদিগের প্রস্তাবিত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকও সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া এইরূপে নানাপ্রকার নৈসর্গিক পদার্থ হইতে অনেক পরমসুন্দর হিতকর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। মহিমাবাবাজী সংসার পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য গুরুর নিকট গমন করেন নাই, কিন্তু তিনি আকাশ পৃথিবী বায়ু প্রভৃতি পদার্থকে গুরুপদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে শিক্ষারম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন, পৃথিবী নীরবে শীত বাত সকলই সহ্য করিতেছে, লোকে তাহার উপর কত কি করিতেছে, অথচ পৃথিবী অম্লানবদনে লোকদিগকে কেমন ফল শস্য দান করিতেছে; ইহা দেখিয়া তিনি শিক্ষা করিলেন যে আমিও এইরূপে লোকের নিন্দা তিরস্কার অত্যাচার প্রহার সকল সহ্য করিয়া মনুষ্যদিগকে অনাদির জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিব। তাহার পর দেখিলেন, জলমধ্যে কি ধনী কি দরিদ্র কি পাপী কি পুণ্যবান্ সকলেই আসে, জল সকলকেই শীতল করে। তদ্দর্শনে তিনি স্থির করিলেন যে, আমার নিকটেও সকলে আসিলে আমি তাহাদিগকে সেই অনাদি দেবতার নামে শীতল করিব। সূর্য্যকিরণ নির্ব্বিকারভাবে পৃথিবীর ভাল মন্দ সকল স্থানে পতিত হইয়া সকলের উপকার করে, ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, আমিও ঐরূপ নির্ব্বিকারভাবে সকলের কল্যাণসাধন করিব। তিনি মেঘের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে, মেঘসকল শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে এবং পৃথিবীর উপরে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া তাহাকে ফল শস্যে সুশোভিত করে। ইহা দেখিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, আমিও সেইরূপ অনন্তের আকাশ হইতে জ্ঞানমেঘ লাভ করিয়া পৃথিবীতে বিতরণ করিব, এবং তাহা বৃষ্টিধারার ন্যায় পতিত হইয়া লোকের হৃদয়ে ভক্তিশস্য উৎপাদন করিবে। নদীর নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করিলেন যে, নদী যেমন প্রবাহিত থাকিলেই তাহার জল নির্ম্মল থাকে এবং বদ্ধ হইলেই জল অপরিস্কার হইতে আরম্ভ হয়; সেইরূপে আমিও এক স্থানে বদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইব। একস্থানে বদ্ধ থাকিলে পাছে কলঙ্কিত হইতে হয়, এই কারণে তিনি ছয় মাসের অধিক কোন স্থানে বাস করিতেন না। সুমেরু পর্ব্বতের নিকট গিয়া দেখিলেন যে, সে সকল বৃক্ষগুলিকেই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, আমিও এইরূপ অনাদি ধর্ম্মেতে জগতের সকল লোককে ধারণ করিব,—আমার হৃদয়ে সকলকেই রাখিব। এইরূপে তিনি সমুদ্রের নিকট হইতে গভীরতা, সর্পের নিকট সঞ্চরণশীলতা, বায়ুর নিকট স্বাধীন ও প্রমুক্তভাব এবং আকাশের নিকট হইতে উদাস ভাব ইত্যাদি প্রাকৃতিক নানা পদার্থ হইতে নানাপ্রকার মনোরম ভাব শিক্ষা করিলেন। এইরূপে সেই অলখ্ ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসীপুরুষ বিশ্বশাস্ত্রের নিকট হইতে বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর

তিনি নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া জগতের সর্ব্বত্রেই অসত্যের প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া হিমালয়ে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সংসার করি পর্য্যটন, অসত্য দেখি ত্রিভুবন।
এবে উত্তর পথে যাও, হিমালয় গিরিরেতু রহ॥

এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি হিমালয়ে গমন করিয়া স্তম্ভের ন্যায় স্থির ও প্রশান্ত ভাবে বহুকাল তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তৎপরে ভগবান তাঁহার প্রগাঢ় তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দিতে আসেন। তখন তিনি অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া বলিলেন যে "আমাকে এই বর দেন—আমি যেন অন্তিমকালে অভয়-পুরে সেই অনাদিদেবের নিকট গমন করিতে পারি।" ভগবান তাঁহাকে প্রার্থিত বরপ্রদান করিয়া প্রস্থান করিলে পর তিনি জগতের নিকট অনাদিধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত হিমালয় হইতে অবতরণ করিলেন। তথা হইতে তিনি পুরুষোত্তমে আগমন করেন এবং এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। পুরুষোত্তমে অবস্থিতিকালে বৈষ্ণবদিগের সহিত তাঁহার অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। তৎপরে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি খণ্ডগিরি নামক সুরম্য পর্ব্বতে গমন করেন এবং সেই স্থানে দীর্ঘকাল যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময় গোবিন্দ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই ব্যক্তিকেই মহিমাবাবাজীর প্রথম শিষ্য বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দদাসের পর কানাইদাস, দীনবন্ধুদাস, নারায়ণদাস প্রভৃতি ব্যক্তিরা উত্তরোত্তর তাঁহার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সকল ব্যক্তিরা বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট মহিমাধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। এইরূপে খণ্ডগিরি পর্ব্বতে অবস্থানকালে, সাতজন লোক তাঁহার প্রচারিত এই নবধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে তৈলঙ্গদেশে যাত্রা করেন। তথায় যদুনাথ সিংহ নামক জনৈক রাজা তাঁহার নিকট অলখ্ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এইরূপে দিন দিন লোকদিগকে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া তিনি গোবিন্দ-দাসকে বলিলেন যে, হয় তুমি সমাধিতে প্রবৃত্ত হও, আমি প্রচারে যাই; নয় আমি সমাধিতে নিমগ্ন হই, তুমি প্রচারার্থ বহির্গত হও। এই কথা শ্রবণ করিয়া গোবিন্দদাস সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। মহিমাবাবাজী তখন অনাদি অলখ্-ধর্ম্মের জ্যোতি বিস্তার করিতে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শচীমাতার স্বপ্ন।

শ্রীবাসের বাড়ীতে নিত্যানন্দের বাসা, নিতাই বাল্যভাবে বিভোর; এখন আর নিজ হাতে ভাত খান না; মালিনীদেবী শিশুর মত ভাত খাওয়াইয়া দেন।

'আপনি তুলিয়া হস্তে ভাত নাহি খায়;
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়।'

প্রতিবাসী বালকদিগের সঙ্গে মিশিয়া নিতাইয়ের খেলা; নগরে নগরে ধূলা খেলা, গঙ্গাস্রোতে ডুব সাঁতার, চিৎসাঁতার প্রভৃতি নানাবিধ জলক্রীড়া এবং ভাত খাওয়ার সময় অর্দ্ধেক অন্ন সমস্ত অঙ্গে মাখিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলান প্রভৃতি ক্রীড়ায় তিনি খুব মজবুত হইয়া উঠিলেন। থাকিয়া থাকিয়া নিতাই এক দৌড়ে বিশ্বম্ভরের বাড়ী যান, শচীমাতাকে মা বলিয়া ডাকেন, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কত হাস্য পরিহাস করেন। আর শচীমাতাকে দেখিলেই তাঁহার চরণ-ধূলি লইতে যান। উদাসীন সন্ন্যাসীচরণ স্পর্শ করিলে অপরাধ জন্মিবে ভয়ে শচীদেবী নিতাইকে দেখিলেই পলাইয়া যান্;—

"বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ
ধরিবারে যান্; আই করে পলায়ন।"

তথাপি নিতাইয়ের বাল্যসরলতায় শচীর মন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া গেল; এবং নিতাইকে আপন প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানে ভালবাসিতে লাগিলেন। এক দিন শচী দেবী বিশ্বম্ভরকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ নিমাই! আমি গত রজনীতে বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, তুমি আর নিত্যানন্দ যেন আমার দেবালয়ে প্রবেশ করিলে ও পাঁচবছরের ছেলে হইয়া যেন সিংহাসনস্থিত কৃষ্ণ বলরাম শ্রীবিগ্রহ লইয়া বাহির হইয়া এলে; তোমার হাতে বলরাম ও নিতাইয়ের হাতে কৃষ্ণ। তাহার পর চারি জনে যেন মারামারি করিতে প্রবৃত্ত হইলে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাদের দুই জনকে তিরস্কার করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন;—

"কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই? বাহিরাও গিয়া।
এবাড়ী এঘর সব আমা দোঁহাকার;
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার।"

তাহাতে নিতাই যেন বলিয়া উঠিলেন;—

নিত্যানন্দ বলয়ে সে কাল গেল বয়ে;
যে কালে খাইলে দধি নবনী লুঠিয়ে।
ঘুচিল গোয়াল, হৈল বিপ্র অধিকার;
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার।
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ;
লুঠিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন?"

তাহাতে রামকৃষ্ণ যেন আরও তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন যেন, "কৃষ্ণের দোহাই! তোদের দুজনকে আজ্ মারিয়া তাড়াইয়া দিব।" নিতাই পুনর্ব্বার উত্তর করিলেন "তোর কৃষ্ণকে কে ভয় করে? বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র আমার প্রভু।" ইহার পর যেন তোমাদের চারি জনের মধ্যে মারামারি ও নৈবেদ্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল।

"কাহারও হাতের কেহ কাড়ি লই যায়;
কাহারও মুখের কেহ মুখ দিয়া খায়।"

আর নিত্যানন্দ যেন আমাকে বলিলেন "মা! বড় ক্ষুধা হয়েছে, আমাকে

অন্ন দাও।” এই বলিয়া সরলহৃদয়া শচী পুত্রকে বলিলেন,—“বৎস! এ স্বপ্নের অভিপ্রায় কি! আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই; তুমি আমাকে উহা বুঝাইয়া দাও।”

বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন “মা! আমার বোধ হইতেছে আপনি খুব সুস্বপ্ন দেখিয়াছেন; ইহা আর কাহাকেও বলিবেন না। আমাদের বাড়ীর মূর্ত্তি বড় প্রত্যক্ষ দেবতা; আমিও নৈবেদ্যাদি করিয়া রাখি ও পরক্ষণে আসিয়া দেখি তাহা আধাআধি হইয়া আছে; এত দিন মনে মনে ভাবিতাম, এ সব কি হয়। এই বলিয়া রসিক চূড়ামণি বিশ্বম্ভর মধুর হাসি হাসিয়া ও বধূর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, ‘মা! সত্য সত্য এত দিন আমার তোমার বধূর উপর সন্দেহ ছিল; আজ তাহা দূর হইল।’—

“মুই দেখি বারবার নৈবেদ্যসব যে;
আধাআধি না থাকে,না কহোঁ কারে লাজে
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল;
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল।”

বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু অন্তরে ছিলেন; স্বামীর ভালবাসা মাখান পরিহাস শুনিয়া সুখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। কোন্ স্ত্রীই বা না হয়?

“হাঁসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে;
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে।”

নিমাই! আমরা জানিতাম, তুমি গার্হস্থ্য প্রেম জান না, কেবল বিভুপ্রেমে ভোর। আজ্ আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। অথবা যাঁহার প্রাণে হরি প্রেম পরিপূর্ণ; তিনি দাম্পত্য প্রেম জানেন না? এতো হইতেই পারে না। হরি প্রেম তো আর একাঙ্গ নয়, উহা যে পূর্ণাঙ্গ। গার্হস্থ্য প্রেম বল, দাম্পত্য প্রেম বল সকলই সেই বিশ্বপ্রেমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা। যাহা হউক, বিশ্বম্ভর জননীকে বলিলেন,—‘মা! নিতাই স্বপ্নে আপনার নিকট অন্ন ভিক্ষা করিয়াছেন; আমার বিবেচনায় তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বপ্ন সফল করা উচিত। শচীমাতা পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া নিতাইকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পুত্রকে বলিয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর মহা হৃষ্ট চিত্তে শ্রীবাসের বাটীতে আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনে বসিয়া ভাত ছড়ান নিতাইয়ের রোগ; বিশ্বম্ভর তাহা জানিতেন। সুতরাং নিতাইকে সাবধান হইতে সতর্ক করিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ মহা বিজ্ঞের ন্যায় কর্ণে হস্ত দিয়া বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়া উত্তর করিলেন “আমি কি পাগল যে ভাত ছড়াইব, তুমি বুঝি আমাকে আপনার ন্যায় মনে কর।”

“আমার বাটীতে আজ্ গোঁসাইর ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবে, করাইল শিক্ষা॥
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ বিষ্ণু বিষ্ণু বলে,
চঞ্চলতা করে যত পাগল সকলে।
এ বুঝি যে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল;
আপনার মত তুমি দেখহ সকল।”

গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রভৃতি আত্মীয়গণ লইয়া নিজগৃহে ভোজন করিতে বসিয়াছেন; শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেছেন। গৌরের নিষেধ স্বত্তেও নিতাই থাকিয়া থাকিয়া নিজপাতের উচ্ছিষ্ট লইয়া বালকের ন্যায় চারি দিকে ছুঁড়িতেছেন। বন্ধুগণ মানা করিলে কত মত রঙ্গ ভঙ্গি করিতেছেন। শচী দেবী রন্ধনশালা হইতে একবার অন্ন দিতে আসিয়া হঠাৎ পংক্তির

দিকে তাকাইয়া দেখিয়া অন্নের থালি সহিত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হস্তস্থিত অন্ন চারিদিকে ছিটাইয়া গেল; ভোক্তাগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। বিশ্বম্ভর আস্তে ব্যস্তে উচ্ছিষ্ট হাত ধুইয়া জননীকে তুলিয়া ক্রোড়ে লইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও শচী দেবী কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন;—

"উঠ উঠ মাতা স্থির কর চিত;
কেন বা পড়িলে পৃথিবীতে আচম্বিত।"

শচীদেবী চেতনা লাভ করিয়া অনেক ক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না; গৃহ মধ্যে গিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে ও দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন.—"বাছা! আমি ভাত দিব মনে করিয়া ভোজন স্থানে আসিয়া দেখি যেন তুমি কৃষ্ণবর্ণ ও নিতাই শুক্লবর্ণ দুইটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক চতুর্ভুজ হইয়া ভোজন করিতেছ; উভয়েই দিগম্বর এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হল, মুষলধারী। আর আমার বউ যেন বাপ তোর হৃদয়ে শোভা পাইতেছেন। নিমাই! বল দেখি কেন আমি এরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম?"

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন 'মা! রাত্রের সেই স্বপ্নের ভাব মনে ছিল। তাই ঐরূপ বোধ হইয়াছে। ও কিছু নয়।'

নিশা-কীর্ত্তন।

এক দিন সম্মিলিত বৈষ্ণব সভায় গৌর-চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন;—

"প্রভু বলে ভাই সব! শুন মন্ত্রসার;
রাত্রি কেন মিথ্যা যায় আমরা সবার।
আজি হৈতে নির্ব্বন্ধিত করহ সকল;
নিশায়ে করিব সবে কীর্ত্তন মঙ্গল।
সংকীর্ত্তন করিয়া সকলগণ সনে;
ভক্তি স্বরূপিনী গঙ্গা করিব মজ্জনে।
জগৎ উদ্ধার হয় শুনি কৃষ্ণ নাম;
পরমার্থে তোমরা সবার ধন প্রাণ।"

এই কথা শুনিয়া ভক্ত দল মহা আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে নিশাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এতদিন কেবল শ্রীবাসের গৃহেই কীর্ত্তন হইত, এখন হইতে অন্য অন্য স্থানেও হইতে লাগিল। কোন কোন দিন চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে, কোন দিন বা বিশ্বম্ভরের বহির্বাটীতে হইত; কিন্তু শ্রীবাসমন্দিরই সর্ব্ব প্রধান স্থান রহিয়া গেল।—

"শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন;
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন।"

এখন হইতে কীর্ত্তনের প্রকৃতিও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইল। এতদিন সকলে মিলিয়া একত্রে কীর্ত্তন হইত। এক্ষণে পৃথক পৃথক্ সম্প্রদায় হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে অথবা একসময়ে এক বাড়ীতেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল; শ্রীবাস পণ্ডিতের এক দল, মুকুন্দ দত্তের দ্বিতীয়, গোবিন্দ দত্তের তৃতীয়, এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ দল গঠিত হইতে লাগিল। একাদশী রজনীর হরিবাসরে কিছু অধিক ধুম হইত;—

"শ্রীহরিবাসরে হরি কীর্ত্তন বিধান;
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ।
পুন্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ;
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ।
উষাকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর,
জুদা জুদা হৈল সব গায়ন সুন্দর।

শ্রীবাস পণ্ডিত হয় এক সম্প্রদায়,
মুকুন্দ লইয়া আর জনকত গায়।
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আরো কত জন;
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সবে করেন কীর্ত্তন।"

কীর্ত্তনের পদগুলিও এখন হইতে কিছু লম্বা লম্বা হইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ চল্লিশপদী কীর্ত্তনের উৎপত্তি এই সময়ে। আর নৃত্যের ভাষাটাও কিছু অধিক মাত্রায় চড়িয়া গেল। এই সময়ের সংকীর্ত্তনের প্রগাঢ়তা, গাম্ভীর্য্য, মত্ততা ও মাধুর্য্য এতই জমাট বাঁধিয়া যাইত যে, বাহিরের লোকেরও তাহাতে গভীর ভাবাবেশ না হইয়া পারিত না। বৃন্দাবন দাস মহাশয় এই বর্ণনা লিখিতে লিখিতে এতই আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি আক্ষেপ করিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, "পাপ জন্ম হইলত কেন সেই সময়ে হইল না। তাহা হইলে তো সংকীর্ত্তনানন্দে পাপ ধুইয়া যাইত।"

"হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম তখন না হৈল;
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল।"

এইরূপ নিশাকীর্ত্তন এক সম্বৎসর কাল হইতে লাগিল;—

"বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল;
চৈতন্য-আনন্দে সব কিছু না জানিল।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এখন হইতে নৃত্যের ভাগটা কিছু অধিক মাত্রায় হইতে লাগিল। গৌরকে নাচাইবার উদ্দেশে বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নিজেও এক জন কম নয়; কতকগুলি তৃণ দিয়া আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করত বিকট বেশে যখন কটী দোলাইয়া নাচিতেন. তাহা দেখিয়া ভক্ত-গণে হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেন না;—

"তৃণ করে তখনে অদ্বৈত উপনীত,
আপাদ মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া;
নিজ শিরে থুই নাচে ভ্রূকুটী করিয়া।
অদ্বৈতের রঙ্গ দেখি সবার তরাস;
নিত্যানন্দ গদাধর দুই জনে হাস।"

গৌরের নৃত্য, কীর্ত্তন, ভাব, আনন্দ সকলই অদ্ভুত। পাঠক মহাশয় জানেন যে, তাঁহার হৃদয় ভাবময়। যখন যে ভাব-জাগরুক হইত; তাহার অবধি না হইয়া যাইত না। নর্ত্তনাবেশে বিবিধ ভাব লহরী প্রকটিত হইতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে কখন কখন বন্ধুগণের স্কন্ধে উঠিয়া অঙ্গন মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন, কখন বা বালকের ন্যায় চঞ্চলতা প্রকাশ করেন; পা নাচাইতে নাচাইতে কখন খল খল করিয়া হাসিতে থাকেন, কখন বা ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া কতমত রঙ্গভঙ্গ করেন; আবার কখন বন্ধুদিগের চরণ ধরিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন। এমন আশ্চর্য্য ভাবাবেশ কেহ কখন দেখে নাই। আধ্যাত্মিক রাজ্যে কত নিগূঢ় রহস্য আছে, তাহা কে জানে? স্থূল জগতে বাস করিয়া স্থূলের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে আমরা সূক্ষ্ম জগতের ভাব কেমন করিয়া বুঝিব? সে রাজ্যে না গেলে কে তাহার সম্বাদ আনিতে পারে? এখানে মানবের দর্শনশাস্ত্র পরাস্ত; পদার্থবিদ্যা গণিতবিদ্যারও ক্ষমতায় কুলায় না। প্রেমবিজ্ঞান সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, প্রেমিক না হইলে প্রেমতত্ত্বের তত্ত্ব পাওয়া যায় না। কে জানে কি কারণে ক্ষণে ক্ষণে গৌরের দেহ তুলার

ন্যায় লঘু হইত, আবার কখন লৌহাপেক্ষাও গুরু। এমন শীত ও কম্পন হয় যে, যেন বিকারের কম্প। আবার কখন সমস্ত শরীর অগ্নির ন্যায় উত্তাপযুক্ত, চন্দন পঙ্ক লেপিলে তখনই শুকাইয়া যায়। কখন আবার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে থাকে, যেন মহাশ্বাস রোগ জন্মিয়াছে। কখন কখন এমন হিক্কা হইত, যে তাহাতে সর্ব্ব অঙ্গ যেন ভাঙ্গিয়া যাইত। কখন সুন্দর গৌরবর্ণ নানারূপ রঙ্গ ধারণ করিত এবং কখন কখন দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ করিয়া চারি দিকে ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন এবং বন্ধুদিগের প্রতি অযোগ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেন;—

"অলৌকিক হঞাপ্রভু বৈষ্ণব আবেশে;
যে বলিতে যোগ্য নয় তাহা প্রভু ভাষে।
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি প্রভু করি বলে;
এ বেটা আমার দাস ধরে তার চুলে।
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণে;
তার বক্ষে উঠি করে চরণ অর্পণে।"

ভাবুক না হইলে এসব ভাবতত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝা যায় না।

"ক্ষণে নিত্যানন্দ অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সবাকারে চাহি হাসে॥
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পায়;
আর বার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায়।
ক্ষণে যার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন;
ক্ষণেক তাহার কান্ধে করে আরোহণ।
চক্রাকৃতি হই কভু প্রহরেক ফিরে;
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে।
যখন যে ভাব হয় সেই অদ্ভুত;
নিজ প্রেমানন্দে নাচে জগন্নাথ সুত।"

বহির্মুখ লোকে ইহাকে পাগলামি ভিন্ন আর কি বলিবে; কিন্তু এমন পাগল হওয়া তো সহজ নয়।

এই সময়ে এক দিন এক শৈব ভিক্ষুক বিশ্বম্ভরের বাটীতে ভিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিল। ভিক্ষুকের সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি ভস্মমাখা, শিরে জটা জুট ও হাতে শিঙ্গা ডমরু; উহা বাজাইয়া সে শিব সঙ্গীত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। শঙ্কর গুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বিশ্বম্ভরের ভাবময় হৃদয় ভাবে উথলিয়া উঠিল; শঙ্কর ভাবাবেশে হুঙ্কার করিয়া 'আমি শিব' বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ এক লম্ফে আগন্তুকের স্কন্ধে উঠিলেন। সে ব্যক্তিও তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া অঙ্গনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভক্তগণ নাকি সেই সময়ে গৌরকে সত্য সত্য জটাজুটধারী শম্ভু মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন;—

"একদিন আসি এক শিবের গায়ন;
ডম্বুর বাজায় গায় শিবের কথন।
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে;
গাইয়া শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে।
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর;
হুঙ্কার করিয়া বলে মুঞি সে শঙ্কর।
কেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়;
বোল, বোল মহাপ্রভু বলয়ে সদায়।'

কিছু কাল পরে শচানন্দন বাহ্য জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার স্কন্ধ হইতে নামিলেন এবং নিজ হাতে ভিক্ষুককে যথেষ্ঠ ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিলেন;—

"বাহ্যপাই নামিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর;
আপনি দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর।"

পাষণ্ডীদিগের ব্যবহার।

নিশাকীর্ত্তনের প্রগাঢ়তা, প্রমত্ততা ও ভাবুকতায় নবদ্বীপ টলমল করিতে লাগিল, গভীর রজনী যোগে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া

শ্রীবাস পণ্ডিতের বহিঃপ্রকোষ্ঠে খুব মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইতেছে; বিশ্বাসী ভক্তগণের ব্যাকুলতা, প্রেমানুরাগ, ও উল্লাসময় কীর্ত্তনের ধ্বনিতে লোক সকল আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে পণ্ডিতের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইতেছে; কীর্ত্তনারম্ভের পূর্ব্বে যাহারা আসিয়াছে, তাহারা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে; কিন্তু কীর্ত্তনের একটু জমাট বাঁধিয়া গেলেই গৌরের আদেশে কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল, আর কেহ প্রবেশ করিতে পাইল না। লোকগুলি অগত্যা বাহিরে থাকিয়া কপাট ঠেলিতেছে; কলরব করিতেছে; কত নিন্দা কুৎসা করিতেছে ও কেহ কেহ নানা প্রকারে উৎপাত করিতেছে।

"পূর্ব্বে যেই সান্ধাইল বাড়ীর ভিতরে;
সেই মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে।
প্রভুর আজ্ঞাতে দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার,
প্রবেশিতে নারে অন্য জন নদীয়ার।
ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া;
প্রবেশিতে নারে রহে দ্বারে দাঁড়াইয়া।
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে;
কীর্ত্তন দেখিব ঝাঁট ঘুচাহ দুয়ারে।"

এই সকল লোকের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক আছে; কতক লোক বাস্তবিক সরল প্রাণে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার জন্য আসিয়াছে; কতকগুলি আপনাদের কৌতুহল-স্পৃহা চরিতার্থের জন্য, আর কতকগুলি সংকীর্ত্তনবিদ্বেষী লোক কেবল ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও উৎপাত করিবার উদ্দেশে আসিয়াছে, নমুনা স্বরূপ দুই চারিটী পয়ার উদ্ধার করা যাইতেছে;—

"কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া,
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।
কেহ বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল;
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল।
রাত্রিকরি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে;
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য নৈবেদ্য চন্দন;
খাই তা সবার সঙ্গে বিবিধ রমণ।
অন্য লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ;
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ।
চালি কলা মুদ্গ দধি একত্র করিয়া;
জাতি নাশ করিয়া খায় একত্র হইয়া।"

পাষণ্ডীদিগের উক্তিতে নিমায়ের উপর তত কোপ দেখা যায় না, যত তাঁহার সঙ্গীদিগের উপর দেখা যায়। তাহারা মনে করিত, নিমাই পণ্ডিত খুব ভাল লোক ছিল, কেবল কুসঙ্গে পড়িয়া মন্দ হইয়া গেল। একে একটু বায়ুরোগগ্রস্ত, তাহাতে আবার অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছে; সুতরাং পাঁচজন ঢঙ্গের দলে পড়িয়া মন্দ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? হায়! পাষণ্ডিগণ! তোমরা লোক চিনিতে পার নাই। যত নষ্টের ওস্তাদ ঐ নিমাই! সাবধান ও বড় সহজ পাগল নয়। ওইতো দলশুদ্ধ লোককে পাগল করিয়া তুলিল।

"কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত;
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত?
কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব্ব অসংস্কার;
কেহ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার।
নিমাইর বাপ নাই, তাতে আছে বাই;
এত দিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই।
কেহ বলে পাশরিল সব অধ্যয়ন;
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়া করণ।"

ক্রমে ক্রমে সিদ্ধান্ত হইল যে, নিমাই

পণ্ডিত বিদ্যেসাধ্বি ভুলে গিয়ে গণ্ড মূর্খের দলে পড়ে এখন একজন মহা গণ্ডমূর্খ হইয়াছে। আগন্তুকদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, সংকীর্ত্তন করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ; দেশমধ্যে যত অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ হইতেছে, সে সব উহারই জন্য।

"যেনা ছিল রাজ্যদেশে আনিয়া কীর্ত্তন
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন।
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিহ নিশ্চয়;
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়।
কেহ বলে কালি হউ যাইব দিয়ানে;
কাঁকালি বাঁধিয়া সব নিব জনে জনে।'

কোন কোন পাষণ্ডী সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এগুলা নাচিতেছে গাইতেছে, ইহাদের মুখদর্শনে পাপ হয়। শরীর মধ্যে পরমাত্মা রহিয়াছেন, আত্ম সাক্ষাৎকার লাভই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; তাহা না করিয়া বল দেখি চীৎকার করিলে কি হইবে? দ্বিতীয় পাষণ্ডী উত্তর করিল, তাইতো! নাচিলে গাইলে যদি ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে এই নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল রহিয়াছেন, তাঁহারা কি আর তাহা করিতেন না।

আর একজন বলিল, আরে ভাই! দেখিতেছো না, নিমাইকে লইয়া এগুলা পাগল হইয়াছে; পাগলের কথায় আমাদের কাজ কি?

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আরে! আমরা কি আর সংকীর্ত্তন শুনিতে আসি; পাগল গুলা কি করে; তাই দেখিতে ও ঠাট্টা করিতে আসি।

উহাদের মধ্যে দুই একজন সুবুদ্ধি ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "কেন ভাই! পরনিন্দা করিতেছ, যাঁহারা সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারা ভগবানের নাম করিতেছেন, তাঁহারা পরম সুকৃতী, তাঁহাদের নিন্দা করিলে পাপ হইবে। আমাদের কপালে নাই, তাই এমন মধুর কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিলাম না।

পাষণ্ডীদিগের মধ্যে যাহারা বড়ই উদ্ধত প্রকৃতির লোক ও কীর্ত্তন বিদ্বেষী ছিল, তাহারা শেষোক্তদিগের কথা শুনিয়া "ইহারাও তবে ঐ দলের লোক" এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

বিদ্বেষীদিগের বিদ্বেষের ও ক্রোধের প্রধান পাত্র শ্রীবাস পণ্ডিত। তাঁহাকে তাঁহারা থানিয়াতি অর্থাৎ আড্ডাধারী শ্রীবাসা, বামনা, ঢাঙ্গাইত প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ভাষায় সম্বোধন করিত। তাহাদিগের মতে উহা হইতেই নবদ্বীপের কুশল নষ্ট হইল ও সকল লোক খারাপ হইয়া গেল; সুতরাং স্বতঃ পরতঃ তাঁহার নিন্দা কুৎসা ও অনিষ্ট করিতে ছাড়িত না।

"থানিয়াতি শ্রীবাসা করেঁ কালি কার্য্য,
কালিবা কি করে তায় অদ্বৈত আচার্য্য।
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত;
শ্রীবাসার ঘরে থাকি করে এতরূপ।
দুর্দ্দার হইয়া আছে শ্রীবাসার বাড়ী;
দুর্গোৎসবে যেন সবে করে হুড়াহুড়ী।
হই, হই, হায়, হায়, এই মাত্র শুনি;
ইহা সবা হৈতে হৈল অপযশঃ বাণী।
শ্রীবাস বামনা এই নদীয়ার হৈতে;
ঘর ভাঙ্গি কালিনিয়া ফেলাই মু স্রোতে।
ও বামুন ঘুচাইলে গ্রামের কুশল;
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবেক খল।"

পাষণ্ডীদিগের উৎপাতের একটী আখ্যায়িকা আছে। গোপাল চক্রবর্ত্তী ওরফে চাপাল গোপাল নামে তখন একজন ষণ্ডা গোছের বামুন নবদ্বীপে বাস করিত। গভীর নিশায় ভক্তদল শ্রীবাসমন্দিরে আবিষ্টচিত্তে সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত আছেন; এমন সময়ে সে ব্যক্তি অন্য অন্য পাষণ্ডীদিগের পরামর্শানুসারে লুক্কায়িত ভাবে অঙ্গনে যাইয়া অঙ্গনের মধ্যস্থান লেপিয়া ভবানী পূজার দ্রব্য সামগ্রী রাখিয়া দিল। কদলী পত্রের উপর জবাফুল, সিন্দুর রক্তচন্দন ও মদ্যভাণ্ড সাজাইয়া রাখিল। উদ্দেশ্য এই, লোকে জানুক যে, সংকীর্ত্তনের ভাণ করিয়া ইহারা রাত্রি যোগে পঞ্চকন্যা আনিয়া মদ্যপান করিয়া কি কুৎসিত কাণ্ড করিয়া থাকে। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, ভক্তগণের উপর পাষণ্ডীগণ যে যে দোষারোপ করিতেছিল, তাহার মধ্যে [illegible] বেশ্যা নটী মদ্য পান করা একটী প্রধান কার্য্য। তাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই কুৎসিত কাণ্ডের অভিনয় করা হইল।

"একদিন বিপ্রনাথ গোপাল চাঁপাল
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল।
ভবানী পূজার সব সামগ্রী আনিল
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান নেপাইল।
কলারপাত উপরে থুইল ওড়ফুল;
হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন তণ্ডুল।
মদ্য ভাণ্ড পাশে রাখি নিজ ঘরে গেল।"

প্রাতঃকালে শ্রীবাস পণ্ডিত বহিঃপ্রাঙ্গণে ঐ সব বস্তু দেখিয়া গ্রামের বিজ্ঞ ও সুবোধ লোকদিগকে ডাকিয়া দেখাইলেন ও পরিহাস করিয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন যে, মহাশয়গণ! দেখুন্ রজনী যোগে আমি কি সাধনা করিয়া থাকি। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী শ্রীবাসকে উত্তমরূপে জানিতেন; সুতরাং পাষণ্ডীদিগের কার্য্য বুঝিতে তাঁহাদের বাকী থাকিল না। দুই চারি দিন মধ্যেই চাপাল গোপালকে ঐ কার্য্যের নায়ক বলিয়া সকলে জানিতে পারিলেন। কথিত আছে যে, অল্প দিন মধ্যে চাপাল গোপাল নিজ কার্য্যের সমুচিত দণ্ড স্বরূপ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইল।

এক সরল জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ আর এক রজনীতে কীর্ত্তন শুনিতে আসিয়া বহির্দ্বার বন্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া নিরাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। পর দিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে যাইয়া সে বিশ্বম্ভরের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ নিমাই! আমি কাল রাত্রিতে তোমাদের কীর্ত্তন শুনিতে গিয়া দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি; ইহাতে আমার বড়ই মনঃকষ্ট হইয়াছে।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল যে, "আমাকে যেমন তুমি মনঃপীড়া দিয়াছ, আমি শাপ দিতেছি, তুমিও তেমনি সংসারে সুখী হইতে পারিবে না।"

"শাপিব তোমারে আমি পেয়েছি মনোদুখ।
পৈতা ছিঁড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ।
সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ।"

শাপ শুনিয়া বিশ্বম্ভরের উল্লাসের সীমা নাই। মনে মনে করিতে লাগিলেন 'আমি ঐরূপ শাপই চাই।' ও বাহিরে একটু হাসিয়া ব্রাহ্মণকে শান্ত্বনা করত ভক্তদলের নিকট আসিয়া অভিশাপ বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

প্রতিজ্ঞার বল।

মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন হয়। দুই ঘণ্টা পূর্ব্বের মানুষ—আর দুই ঘণ্টা পরের মানুষ প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ নূতন। শরীরগত বা অবয়বগত পরিবর্ত্তন কিছু ধীরে ধীরে হয় সত্য, কিন্তু চিকিৎসা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের শোণিতমাংস-ঘটিত অবয়ব—সম্পূর্ণ নূতন হয়। চক্রের পর চক্র—ক্রমাগত পরিবর্ত্তনচক্র ঘুরিতেছে। ঘটনার পর ঘটনা, অবস্থার পর অবস্থা, সময়ের পর সময়। প্রতি নূতন ঘটনা, নূতন অবস্থা বা নূতন সময়—মানুষকে চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতনতর জগতের নূতন জীব করিয়া তুলিতেছে। মানুষের প্রকৃতি, আকৃতি—স্বভাব চরিত্র, ধর্ম্ম বা জ্ঞান—সব পরিবর্ত্তনের অধীন—সব পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু এ নিয়ম সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে। দুবৎসর বা দুমাস পূর্ব্বের সাধারণ মানুষকে যে আজও পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতে চায়, তাহার ন্যায় ভ্রান্তজীব আর নাই! ঘটনার দাস মানুষ প্রতি ঘটনায় নূতনত্ব লাভ করিয়া নূতন ঘটনার সংঘর্ষণে আসিতেছে। পরিবর্ত্তন-চক্র অবিরাম ঘুরিতেছে। সাধারণ মানুষ ক্রমাগত অবস্থার পর নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দী—ইতালী মহানগরে দুটী বালক সান্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে বাহির হইয়াছেন। দুটী বালক, দুই সহোদর। দুটীর প্রাণে প্রাণে মিল। বালকের খেলা, বালকের ভ্রমণ, বালকের হাসি, বালকের তামাসা চির-উপেক্ষিত! তাহাদের হাসিরও কেহ তত্ত্ব লয় না, ক্রন্দনেরও কেহ খোঁজ খবর লয় না। তাহাদের কথা-বার্ত্তা আমোদ উল্লাস—তারই বা তত্ত্ব কে লয়? দুটী বালক গল্প করিতে করিতে কত সুখে, কত ভাবে পথ হাটিতেছে। জ্যেষ্ঠের মনের আশার কথা, জীবনের উন্নতি-স্বপ্নের কথা কনিষ্ঠ কত আগ্রহ সহকারে শুনিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। উভয়ে একটু চমকিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ এই সময়ে কি কারণে যেন হঠাৎ স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। এখনি ফিরিয়া আসিব, বলিয়া কনিষ্ঠকে রাখিয়া গেলেন। ইটালীতে তখন বড়ই দস্যুর ভয়। সকল অধিবাসীই কোন না কোন দস্যুদলভুক্ত। মারামারী রক্তা-ক্তি—সর্ব্বদাই চলিত।* কি কুক্ষণে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে রাখিয়া গেলেন! কি কুক্ষণে দারুণ সন্ধ্যা চতুর্দ্দিক গ্রাস করিল! জ্যেষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠের সর্ব্বশরীর রক্তময়—দস্যুর অস্ত্রাঘাতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। কি ভীষণ দৃশ্য! এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে জীবিত ছিল, এখন সে আর এই পৃথিবীতে নাই! তার শরীরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া শোণিত-প্রবাহ মৃত্তিকাকে সিক্ত করিয়া কি ভীষণ শোকবার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে! জ্যেষ্ঠের প্রাণে দারুণ শোক-শেল বিঁধিল। আহা! সেই সান্ধ্য সমীরে হত ভ্রাতার মৃত শরীরের সহিত জ্যেষ্ঠের আলিঙ্গন, সেই মলিন মুখ-চুম্বন, সেই নিরাশরোদন, সেই "বিচার প্রার্থনা"—ভবিষ্যতের কি যেন এক উজ্জ্বল ইতি-হাস অঙ্কিত করিল। মৃত ভ্রাতার নিস্তেজ শরীর আলিঙ্গন করিয়া জ্যেষ্ঠ কি যেন এক

* Decline and Fall of the Roman Empire by E. Gibbon; Edited by F. A. Guizot. Vol. II. Chap. LXX.

স্বর্গীয় শক্তি লাভ করিল।* জ্যেষ্ঠও কনিষ্ঠের সহিত মৃত! সেই পূর্ব্বের জ্যেষ্ঠ আর নাই। তাহার কোমল শরীর, কোমল হৃদয়, সেই মধুর স্নেহ, সেই দুর্ব্বল মন সব যেন কনিষ্ঠের সহিত কোন অতীত জগতের কাহিনীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে! মৃত ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া যিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন, তিনি ইটালীর ভাবী উদ্ধারকর্ত্তা রিয়েঞ্জি! অসামান্যই হউক বা সামান্যই হউক, এই একটী ঘটনা হইতে ইটালীর উদ্ধার কর্ত্তার জন্ম হইল।† কি এক প্রতিজ্ঞা, কি এক স্বর্গীয় অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, আর এক নূতন জ্যেষ্ঠ যেন মাথা তুলিলেন। ইটালী কম্পিত হইল,—ন্যায়ের রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে, নিমিষের মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় এই বার্ত্তা আকাশময় ছাইল! কি এক গভীর অগ্নিময় প্রতিজ্ঞায় বালকের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল!

এই ঘটনার বহুশতাব্দী পূর্ব্বের ভারতের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। মায়ার ছলনে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যধন সর্ব্বস্ব হারিয়াছেন। অবশেষে পঞ্চ পাণ্ডবের একমাত্র স্ত্রী সতীশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীরূপিনী দ্রৌপদীকেও হারিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির মতিচ্ছন্ন, কৌরবগণের সর্ব্বনাশের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কি কুক্ষণে কে জানে, দ্রৌপদীর বস্ত্রাহরণ করিতে দুর্য্যোধন আদেশ করিলেন। সভা মধ্যে কুললক্ষ্মীর সেই অবমাননা, সেই নির্যাতন, সেই লজ্জাহীন ঘৃনিত ব্যাপার—যাহা লিখিতেও কষ্ট হয়, কি এক ভাবী মঙ্গলের বীজ রোপণ করিল। মহাপরাক্রান্ত মহাবীর ভীম সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "রণমধ্যে দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করিয়া রক্ত পান করিয়া ইহার প্রতিশোধ তুলিব।'* সভা কম্পিত হইল, কুরুকুলের শোণিত নিস্তেজ হইল, এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার বলে ভারত যেন শিহরিয়া উঠিল। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের দিকে সমস্ত রাজন্যবর্গ যেন আহূত হইলেন; কি যেন এক ভীষণবার্ত্তা নিমেষের মধ্যে ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠায় শোণিতাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইল।

আর একটী চিত্র দেখ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ যায় যায়। অষ্ট্রিয়ার দাসত্বে ইটালীর অতি শোচনীয় অবস্থা। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণের স্বেচ্ছা-শাসন-লীলার কেন্দ্রস্থল হইয়া ইটালীর মুখ মলিন,—পরিধেয় জীর্ণশীর্ণ। এই দুঃখ দুর্দ্দিনে এক আলো প্রজ্জ্বলিত হইল। ম্যাটসিনী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, মুখ মলিন, পরিধেয় বস্ত্র মলিন, কি যে এক সর্ব্বসংহারক দুঃখ-কালিমা সর্ব্ব শরীর ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই সময়ে তিনি কার্ব্বোনারি সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন, প্রতারণা, ছলনা, প্রাণিহত্যা—তাহাদের লক্ষ্য, তখন তাহার শরীরে যেন কি এক বৈদ্যুলিক আলো জ্বলিল। প্রতারকদিগের ছলনায় তিনি যখন নির্ব্বাসিত

* Gibbon's Fall of the Roman Empire, Edited by F. A. Guizot, Vol. II. P. 600.

† "Will they not give us justice: Time shall show." So saying he bent his head over the corpse, his lips muttered, as with some prayer or invocation, and then rising, his face was as pale as the dead beside him,—but it was no longer pale with grief.

From that bloody clay, and that inward prayer, cola di Rienzi rose a new being. With his young brother died his own youth. But for that event, the future liberator of Rome might have been but a dreamer, a scholar, a poet,—a man of thoughts, not deeds."

Lytton Bulwer.

* মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

হইলেন, তখন এই আগুন এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করিল। প্রাণ মন সব অগ্নিময় হইয়া উঠিল! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন ;—

—"To dedicate myself wholly and for ever to the endeavour to constitute Italy one, free, independent &c.—&c.—

"Now and for ever

"This do I swear, invoking upon my head the wrath of God, the abhorrence of man, and the infamy of the perjurer if I ever betray the whole or a part of this my oath."

ইটালীর উদ্ধারের জন্য ম্যাটসিনী এই গভীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জীবন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজের আর কিছু রহিল না, সর্ব্বস্ব দেশের হইল।* এই প্রতিজ্ঞার বলে ও তাঁহার স্বর্গীয় স্বার্থত্যাগের আদর্শে—ইটালীতে আবার একপ্রাণতার বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিল। ইটালী আচার স্বাধীনতার মুখ দেখিল।

ঘটনা মানুষের দাস, না মানুষ ঘটনার দাস? ইতিহাসে এ প্রশ্নের দুটী উত্তর পাওয়া যায়। ঘটনা হইতে কখনও মানুষের জন্ম, এবং মানুষ হইতে কখনও ঘটনার জন্ম। কখনও ঘটনা মানুষকে পরিবর্ত্তন করে, কখনও মানুষ ঘটনাকে রূপান্তরিত করিয়া পৃথিবীকে দারুণ ঝটিকাপূর্ণ দুর্দ্দিন হইতে উদ্ধার করে। উপরে যে কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লিখিত হইল, ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, ঘটনাই যেন মানুষকে জন্ম দিতেছে। কিন্তু জন্মের পর—দেখ ঐ রিয়োঞ্জি আর ঐ ভীম, আর ঐ ম্যাটসিনি কিরূপে হাতে ধরিয়া পৃথিবীর ঘটনাকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিতেছেন। সিংহের তনয় গভীর গর্জ্জনে যেন সমস্ত পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহাদের প্রতিজ্ঞার বলে এক তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিতেছে।*

আমরা দুটী সিদ্ধান্তে তবে উপনীত হইতেছি,—ঘটনা মানুষকে জন্ম দেয় ; আর জন্মের পর মানুষ ঘটনাকে বা কার্য্যকে সৃজন করে। রিয়োঞ্জি বা ম্যাটসিনি ঘটনার দাসত্ব স্বীকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইটালীর আমূল সংস্কার বা আমূল পরিবর্ত্তন ইহাদের অগ্নিময় প্রতিজ্ঞার বলে সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনাও মানুষকে চালায়, সময়ে মানুষও ঘটনাকে চালায়। অনন্ত পরিবর্ত্তন চক্র ঘুরিতেছে, মানুষ কখনও ঘটনাকে ঠেলিতেছে, কখনও বা ঘটনা মানুষকে ঠেলিতেছে। মূলে কি যেন এক অব্যক্ত অবিনাশী শক্তি তড়িত বেগে ক্রীড়া করিতেছে!

এই অবিনাশী শক্তি—প্রতিজ্ঞার বল। মানুষ কি কখনও মানুষ হইতে পারিত, এই প্রতিজ্ঞার বল ভিন্ন?—না, কখনই নয়। ধৈর্য্য বল, আর অধ্যবসায় বল, ধর্ম্ম বল বা চরিত্র বল, সুখ বল বা শান্তি বল—সব এই প্রতিজ্ঞার আয়ত্তাধীন। রিপুর

* Joseph Mazzini, A memoir by E. A. V. Chap. II.

* "Although Mazzini's love of his native land was like a fire in his bones, and her pressing needs largely absorbed his thoughts and energies, yet her political enfranchisement, based upon intelligence and virtue, was with him but the prelude to the deliverance of all Europe. In him there was not discoverable one spark of self-inflation, one atom of worldly ambition, one symptom of narrowness towards any people".

William Lloyd Garrison.

উত্তেজনার বিলাসিতার দুর্জ্জয় সংগ্রামে পরাজিত হইব?—ছি, না তা হইবে না, এই বলিয়া যখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন বিলাস সুখ এবং পাপ প্রলোভন ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিল। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে মারপিশূনকে পরাজয় করিবার জন্য নিরঞ্জনা তটে যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তুমি আমি কি তাহা পারি? গভীর প্রতিজ্ঞা—হয় জীবকে জরা মরণের অতীত করিব, নয় মরিব। এই প্রতিজ্ঞার বলে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কত কত মহাত্মা যে এইরূপ জীবনকে স্বীয় প্রতিজ্ঞার বলে তৃণের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার অন্ত নাই। প্রতিজ্ঞাই সঞ্জীবনী শক্তি। এই শক্তি বিহনে মানুষ মৃত, অসার, জড়ের ন্যায় নিস্পন্দ। প্রতিজ্ঞার অটলত্ব ভিন্ন মানুষ মানুষ হয় না; মানুষ অমরত্ব লাভে অধিকারী হয় না। প্রতিজ্ঞাই সঞ্জীবনী শক্তি।

একজন মহাত্মা বলিয়াছিলেন;—"পৃথিবীকে নিমেষের মধ্যে আপন অধীনে আনিতে পারি, যদি মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারি।" মনকে বাঁধিতে না পারিলে, ইচ্ছার অধীন করিতে না পারিলে কিছুতেই কিছু হয় না। যাহার মন আপন বশে নয়, সে একবার হাসে, একবার কাঁদে, একবার জাগে, একবার ঘুমায়;—সে একবার মাতে একবার মরে। আর যাহার মন বশে আছে—সে জিতেন্দ্রিয়, সে না পারে এমন কার্য্য নাই। ঘটনার আঘাতে সে মরিবে, ঘটনা তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিবে? ঘটনা তার নিকট তৃণের ন্যায়; তার ফুৎকারে ঘটনা তড়িত্‌বেগে উড়িয়া যায়। মন যার বসে, ঘটনা তার নিকট কিছুই পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না। যদি তাহা পারিত, পৃথিবীর কোন মহাত্মা পৃথিবীকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিতেন না। প্রকৃত মহাপুরুষ তাঁহারা, যাঁহারা ঘটনায় আত্মসমর্পণ করেন না, স্রোতের শৈবালের ন্যায় একবার পূর্ব্বে আবার পশ্চিমে নীয়মান হন না;—যাঁহারা অটল ভিত্তির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। সুখ ঐশ্বর্য্য,—তুচ্ছ কথা। বিপদ আন্দোলন—মৃত্যু কারাবাস—তাহাও তুচ্ছ কথা। ম্যাট্‌সিনির পিতা মনে করিয়াছিলেন, অনাহার ও কারাবাসের কষ্টে ম্যাট্‌সিনির মন পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং সময়ে ম্যাট্‌সিনি রাজার নিকট ক্ষমা চাহিবে। কিন্তু কি অসার আশার কুহক! মরণের ভয় দেখাইলে খ্রীষ্টের মতি ফিরিবে, ইহা মনে করিয়া ইহুদী জাতি কি মহাভুল করিয়াছিল! নির্ব্বাসনের কষ্টে ভীমের প্রতিজ্ঞার মূল ছিন্ন হইবে, মনে করিয়া কুরুবংশ কি মায়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিল! মৃত্যু, কারাবাস; নির্য্যাতন—দুঃখ, সুখ, বিলাস,—যশমান, প্রকৃত মনস্বী ব্যক্তির নিকট এ সকল কোন গণনার কথা নয়। শত বৎসরের শত ঘটনা আন—শত শত অত্যাচর রাশীকৃত কর,—মনোরাজ্যের রাজা কিছুতেই টলিবার নন। তাঁহাদের লক্ষ্য আর কিছুই নয়, কেবল প্রতিজ্ঞা, কেবল লক্ষ্য-সিদ্ধি। ভ্রাতার মৃত্যুর কথা আর সকলেই সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রিংেঞ্জি ভুলেন নাই। শত কষ্ট দুঃখে, শত নিরাশয়, শত বন্ধুর উপদেশেও ম্যাটসিনী আপন ব্রত পরি-

ত্যাগ করেন নাই। ঘটনা বালককে পরিবর্ত্তন করে, করিতে পারে। ঘটনা—অস্থিরমতির আসন টলাইতে পারে বটে। অত্যাচার আন্দোলন ছিন্নমতির পা কাঁপাইতে পারে বটে। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞাবলে আপন মনোরাজ্যে বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে—তার নিকট পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা--সমস্ত আন্দোলন—অতি তুচ্ছ কথা। সে ব্যক্তি যে অপরিবর্ত্তিত, সেই অপরিবর্ত্তিত চিরকাল—আবহমান কাল। প্রতিজ্ঞার বলে চতুর্দ্দিকে ঘন ঘন আগুন বর্ষণ হইতে থাকে। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কথাই বল, বা ইটালীর চতুর্দ্দশ শতাব্দী বা উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায়ের রাজ্য বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথাই বল, ও সকলই প্রতিজ্ঞারূপ মহাযজ্ঞের ফল!

মনোরাজ্যে যে রাজা নয়, সে মানুষই নয়। সে একরূপ পশুকুলের মধ্যে গণ্য। সে রিপুর অধীন, সে বিলাসের দাস, সে প্রলোভনের ক্রীড়াপুত্তলি, সে যশপ্রশংসার ক্ষণ-নর্ত্তক! প্রশংসার তুই তুড়ি দেও, সে অমনি হাসিয়া উঠিবে, একটু সম্মান প্রতিপত্তির আশা-বাঁশি বাজাও, সে তোমার যত বিরোধীই হউক না কেন, সে অমনি মাথা নোয়াইয়া তোমার পায়ে পড়িবে। তুটী সুন্দরী রমণী লইয়া তাহার সম্মুখে দাড়াও, সে অমনি আড় নয়নে চাহিয়া, আপনার চরিত্রের বিনিময়ে ক্ষণসুখ কিনিতে ব্যস্ত হইবে। আমাদেরও অবস্থা তাহাই। আমরা ঘটনার দাস। এত তুঃখ, এত দারিদ্র্য—এত অর্থাভাব—তবুও আমরা হাসিতে ছাড়ি না। এত ইংরাজের অত্যাচার—এত পীড়ন—নিমিষে একটু সম্মান দিলে অমনি ভুলিয়া ইংরাজের পায়ে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। তুই বাহু তুলিয়া নাচি। আমাদের না আছে চরিত্র, না আছে প্রতিজ্ঞার বল, না আছে ধর্ম্ম, না আছে জীবন। কি আছে? ঘটনার উপর ঘনার আঘাতে উঠিতে এবং বসিতে একদল হুজুগপ্রিয় লোক এই ভারতক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছে! অধ্যবসায়হীন, বলবুদ্ধিহীন, বিদ্যাসম্পদবিহীন, চরিত্র ধর্ম্মবিহীন একদল হুজগপ্রিয় ন-পশু-ন-মানুষ এখন সঘন মৃদু মৃদু বিচরণ করিতেছে! কেন ভারতের এই অবস্থা? এত হিতৈষী থাকিতেও কেন এত তুর্দ্দশা? এত লোক থাকিতেও কেন এত অস্থিরতা? এ কথার একমাত্র উত্তর, মানুষ আছে বটে, কিন্তু মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, এমন রাজা নাই। এমন লোক নাই, যে আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কঠোর সাধনার পর মহা প্রতিজ্ঞারূপ অটল ভিত্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত—যে লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য অনলে ঝাঁপ দিয়াও মরিতে পারে। প্রতিজ্ঞায় অটল যে নয়—সে ঘটনার দাস। ভারত প্রতিজ্ঞামন্ত্রহীন জড়-ভরত, তাই এত তুর্দ্দশা! কেবল আমোদ, কেবল হুজুগ—কেবল বিলাস, কেবল পোষাক পরিচ্ছদের বাহ্য চটক! একটু আগুনেরও পরিচয় পাওয়া যায় না! কি তুর্দ্দিন!

এত হাসি, এত আন্দোলন, এত আস্ফালন কিসের?—এত নৃত্য, এত বাদ্য, এত কোলাহল, এত বেশভূষা কিসের?—ভারতের আজ বড় মলিন বেশ, অথচ তোমরা এত হাসিতেছ কেন বলত?—যদি ম্যাটসিনি বা রিয়েঞ্জি, পার্কার বা গ্যারিবল্ডি প্রদেশে জন্মিত, তবে আজ তাহারা গভীর তুঃখের কালিমা পরিধান

করিয়া নির্জ্জনে কাঁদিতে বসিতেন। সেই ক্রন্দনের ভিতর হইতে তাঁহারা নবজন্ম লাভ করিয়া তবে জগতে সিংহের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন! আর আমরা? কেবল নাচি, কেবল হাসি! কেবল বক্তৃতা করি, কেবল বিলাস-পোষাক পরিয়া যশমান ও স্বার্থ অন্বেষণে দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে ঘুরিয়া বেড়াই! হা ধর্ম্ম, হা দেশ-হিতৈষিতা, হা কর্ত্তব্য-বোধ!!

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এত ঘটনা ঘটিল, কিন্তু একটাও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মহাবীর এই ভারতে জন্মিল না। ঘটনার দাসত্ব করিতেই ভারতবাসীর জীবন গেল, ঘটনা আর ভারতবাসীর দাসত্ব স্বীকার করিল না। তৃণের জীব তৃণ লইয়াই রহিল, স্বাধীনতর মুখ আর দেখিল না! যে আপন মনোরাজ্যে স্বাধীন নয়—সে কিরূপে স্বাধীনতা পাইবে? তাই কোটী ২ ঘটনা, কোটী ২ অবস্থা ভারতবাসীকে উলটি পালটি কত রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল, একবার দেখ। শিশু বালক হয়, বালক যুবক হয়, যুবক বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধ মরে। যেটী জন্মে, সেটীই মরে! কি দুঃখ, এদেশে একটীও অমর জীব জন্মিল না! একটীও অগ্নিময় নব উদ্যমপূর্ণ যুবক মস্তক তুলিল না। যেটী উঠিল, সেইটীই মরিল। যেটী মাতিল, সেইটীই ডুবিল। একটীও এমন অক্ষয় অমর জীব জন্মিল না, যাঁর প্রতিজ্ঞাবলে শত শত ঘটনা নিমেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়;—যাঁর প্রতিজ্ঞাবলে দেশের বায়ু আমূল পরিশুদ্ধ হয়। ভারতবাসি, একথাটী এই হুজুগপ্রিয়তার দিনে একবার ভাব।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৮ম)

আমরা কার্ত্তিক মাসের সংখ্যায় সামাজিক নিয়মাদি থাকা যে একান্ত উচিত, তাহা একরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি। পরস্পরের সহিত যে সকল কার্য্যে যোগাযোগ, অর্থাৎ যাহাতে পরস্পরের ইষ্টানিষ্ট ঘটে, সে সকল কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা একান্ত উচিত। ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য সামাজিক সময়োচিত নিয়মাবলী গঠন করা একান্ত প্রয়োজন।* নিয়মাবলী গঠনের সময় প্রাচীন এবং নূতন প্রথার দোষগুণ উভয়ই ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।+ বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ বিষয়ক সমস্ত নিয়মাদি ধার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষ ভাবে চিন্তা করা উচিত। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ প্রধানত এখন তিন ভাগে বিভক্ত। এক সমাজকে অন্য সমাজের দোষগুণের ফলভোগী হইতে হইতেছে যখন, এবং আদান প্রদান কার্য্য এই তিন সমাজের লোকের মধ্যেই চলিতেছে যখন, তখন এই তিন সমাজকেই বিবাহ বিষয়ক নিয়মাদি গঠনের জন্য একত্রিত হইতে হইবে। তিন সমা-

* Guizot's History of Civilization. Vol 1. Page 13 & 14.

+ The study of Sociology by Herbert Spencer. Page 399.

জের মধ্য হইতে প্রবীণ, চিন্তাশীল, ধর্ম্ম-পিপাসু ও চরিত্রবান ব্যক্তি সকলকে লইয়া একটী সামাজিক-নিয়ম-গঠন-কমিটী নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে যে সকল প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইবে, তাহা অবনত মস্তকে সকলকে পালন করিতে হইবে। আপন আপন দল বজায় রাখিয়া চলিতে চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অনিষ্ট হইবে। এই গুরুতর এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহের সময় তিন সমাজ যদি একত্রিত হইতে না পারেন, তবে ব্রাহ্মসমাজকে, আজ হউক, কাল হউক পাপের ভয়ানক ভ্রুকুটীর নিকট মস্তক অবনত করিতে হইবে,—পাষণ্ডীদিগের আধিপত্যে সমাজ ছারখার যাইবে।

এই সকল কথা না বুঝিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, "যাহারা দোষী, তাহাদিগের নাম প্রকাশ কর, তাহাদিগকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দিলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়!" এইরূপ কথা যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণী সরলপ্রাণ, তাঁহারা তত গোলমাল বুঝেন না, মনে করেন, নাম বলিয়া দিলেই সব গোল চুকে। আর এক শ্রেণী কিন্তু বিষম চক্রী। তাহারা দোষী ব্যক্তিদিগের নাম বাহির করিতে পারিলে লাইবেল আনিবার সুযোগ পান। এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি আমাদের অনুরোধ, তাঁহারা যেন মনে রাখেন যে, এই ব্যক্তিগত দোষের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা করা আইন-বিরুদ্ধ এবং আমাদের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। সকল সমাজেই অপরাধী ব্যক্তি আছে এবং থাকিবে। সমাজ হইতে পাপ একেবারে নির্ম্মূল হইবে, কখনও আশা করা যায় না। এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ পাপ-শূন্য বা পাপী-শূন্য হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজেও পাপ আছে, পাপী আছে। এটা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। এ স্বতঃসিদ্ধ কথা শুনিয়া খুব বিরক্ত হইলেই বা চলিবে কেন? প্রত্যেকের জীবন আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই—কোথায় ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ, আর কোথায় আমরা অধঃপতিত! ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক বা কালিমার কথা আমরা কীর্ত্তন করিতেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা কে না জানেন? তোমরা জান না, না যাঁহারা বাহিরের লোক, তাঁহারা জানেন না? মেকি টাকা পৃথিবীতে অধিক দিন চলে না। দু দশ দিন পরে তাহা ধরা পড়িবেই পড়িবে। ব্রাহ্মসমাজ এবং হিন্দুসমাজ, সকল সমাজেই পাপ আছে, এবং পাপী আছে। তাহা বাহির এবং ঘরের অনেক লোকেই জানে। না জানিলেও সময়ে জানিবে। ইহাতে ক্ষোভ বা দুঃখ কি? দুঃখ এই, এসম্বন্ধে সমাজ কথা বলেন না! সমাজ পাপকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দেন। হিন্দুসমাজ বেশী প্রশ্রয় দেন, কি ব্রাহ্মসমাজ বেশী প্রশ্রয় দেন, সে বিচার করিতে চাহি না। আমরা এই মাত্র জানি, হিন্দুসমাজও প্রশ্রয় দেন, ব্রাহ্মসমাজও দেন। হিন্দুসমাজ এখন বিশাল-বিস্তৃত, ইহা হইতে দোষ বা পাপ উন্মূলিত করা এখন সোজা কথা নয়। যখন প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের কথা, বেদ বেদান্তের আপ্তবাক্য পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হইতেছে, তখন কে এমন আছেন, যাঁহার কথায় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের আমূল সংশোধন হয়

সংস্কার হইবে? কোটী কোটী দলে বিভক্ত হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া, আচার প্রণালী ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা এই প্রাচীন সমাজের সংস্কার বা সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল যে কি হইবে, কিছুই নির্দ্দেশ করিবার শক্তি নাই। হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় অবস্থার দিনে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আশা ভরসা ছিল। হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মসমাজে সংযুক্ত হইয়া যাইবে, আমরা তাহা মনে করি না। তাহা কখনই সম্ভব নয়। সম্ভব—ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের জীবন্ত ভাব, জীবন্ত সত্য হিন্দুসমাজে যাইয়া সংযুক্ত হইবে। হিন্দুসমাজ যেখানে আছে, সেইখানে থাকিয়া অল্পে অল্পে পুনর্জীবন লাভ করিবে। আমরা ইহাই সম্ভব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যে আদর্শে প্রাচীন সমাজের সংস্কার হইতে পারে, সে আদর্শ পাইতেছি না, বরং স্থানে স্থানে দেখিতেছি, সাপ মারিতে গিয়া লাঠীই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। একটা পাপ নির্ম্মূল করিতে যাইয়া আর একটা পাপের অনুষ্ঠান হইতেছে। এমনই অবস্থা হইয়া উঠিতেছে যে, জীবন্তচিন্তা, জীবন্তভক্তি, জীবন্ত সাধনাবিহীন অসারত্বে যেন সমাজ পূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অন্য সমাজকে আদর্শ দেখাইয়া আকৃষ্ট করিবেন কি, নিজেরাই পরস্পরের পূতিগন্ধে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতেছেন।* মূর্খের বক্তৃতায় বা জীবনহীনের অসার কথায় লোক ভুলে না। ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই বক্তা, অনেকেই না পড়িয়া পণ্ডিত বা প্রচারক। সমাজে বক্তৃতা খুব জীবন্ত আছে, কিন্তু প্রকৃত নীতিবান ও চরিত্রবান লোক কই? যাঁর মুখের জ্যোতিতে লোক পবিত্র হয়, যাঁর চরিত্রের সুবাসে লোক ধার্ম্মিক হয়, সেরূপ লোক কই? মুখভার করিয়া গম্ভীর হইলে বা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নৈতিক ঘৃণা (moral indignation?) দেখাইলেই ধর্ম্ম বা চরিত্র লাভ হয় না। আজ কাল পরস্পর দ্বেষাদ্বেষী হিংসাহিংসী করিয়া পরস্পরের বুকের রক্ত পান করিয়া সকলে মরিতেছে। সমাজে আদর্শ মত এখন আর জীবিত নাই। একজন, দুজন, দশজন লোক দোষী হইলে কথা ছিল, কিন্তু দেখা যাইতেছে—অনেকেই কোন না কোন দোষে লিপ্ত। আমি, তুমি, সে, কাহার নাম করিব? নাম করিলেই বা বিচার করিবে কে? বিচার হইবেই বা কিসের? একটা আদর্শ মত থাকিত, তবে বুঝিতাম, তাহার অন্যথা যে করিয়াছে, তাহাকে শাসন করা যাইবে, সুতরাং তার নাম করি। আদর্শ মত নাই যখন, দোষীর দোষ কেমনে সাব্যস্ত হইবে? একজন বলিতেছেন, সম্বন্ধ-পাতনে ভাই ভগ্নীর সহিত বিবাহ হইতে পারে;—অন্য জন বলিতেছেন, বিবাহের পূর্ব্বে এক বাড়ীতে পাত্র পাত্রী অভিভাবকহীন অবস্থায় থাকিলেই বা দোষ কি! বলত একার্য্য অন্যায় কি না? তোমার মতে অন্যায় হইতে পারে, কিন্তু তার মতে ত নয়! সুতরাং তাহার দোষ বিচার করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিবে কিরূপে? আমরা দেখিতেছি, বিচারকমিটী কথা সত্ত্বেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পাপীর বিচার হইতেছে না। একজন

* Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, Page 19.

ফরিয়াদী হইয়া উপস্থিত না হইলে বিচার আরম্ভ হয় না! ফরিয়াদী হওয়া কি কষ্টকর, ইহাতে কিরূপ হিংসার তলে পড়িতে হয়, সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ফরিয়াদী হইতে বড় কেহ রাজি নয়। এইজন্য, সুবিচার হওয়াও সম্ভব নয়। বিশেষত, স্বেচ্ছাচারমূলক বিচারকে লোকে ভয় করে না। এই সকল কারণে আমরা বারবার অনুরোধ করি, অগ্রে আদর্শমত গঠন করা উচিত। এসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি, আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলি, এই আদর্শ মত গঠনের জন্য তিন সমাজকে একত্রিত হইয়া কার্য্য করা উচিত। আদর্শমত যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন অনায়াসে পাষণ্ডীদিগকে দমন করা যাইবে এবং ব্যক্তিগত জীবনকে আদর্শমতে দীক্ষিত করিয়া উন্নত করা যাইবে। এইরূপ করিতে করিতে যখন ব্রাহ্মসমাজ নীতি ও ধর্ম্মে সজীব হইবে, তখন অলক্ষিত ভাবে এই জীবন্ত ভাব দেশময় সংক্রামিত বা অনুপ্রাণিত হইবে। তার পূর্ব্বে নয়।

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি, প্রাচীন প্রথা-সংস্থানকারী এবং নূতন প্রথা প্রতিষ্ঠিতকারী উভয় সম্প্রদায়ের ভাল মত উভয় সম্প্রদায়ের গ্রহণ করা উচিত। ব্রাহ্মসমাজের সমবেত সামাজিক কমিটী গঠিত হইলে তাহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে, প্রাচীন প্রথার দোষ গুণ আলোচনা করা। এই কার্য্যের সহায়তার জন্য প্রাচীন ও নূতন প্রথার আমরা কিছু সমালোচনা করিতে চাই।

প্রথমে প্রশ্ন এই; বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল কি না? এসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই কঠিন। মনু যে আট প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, সমাজে তখনও যৌবন বিবাহ প্রচলিত ছিল। কারণ আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের তিনি যে লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকের ও পুরুষের যৌবন কালে বিবাহ হইত। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যাদানের কথা আছে।* কিন্তু প্রথমোক্ত চারিপ্রকারে বিবাহে কন্যাদানের কোন কথা নাই।+ একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, ও গান্ধর্ব্ব, এই ছয় প্রকার বিবাহকেই মনু প্রশংসা করিয়াছেন, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে খুব নিন্দা করিয়াছেন। তৎপর দেখা যায়, মনু বলিতেছেন, কন্যা অপ্রাপ্ত বয়সই হইলেও, উৎকৃষ্ট অভিরূপ ও সদৃশ বর পাইলে, তাহাকে সেই বরে যথাবিধি দান করিবে।* "অপ্রাপ্ত বয়স হইলেও "এই কথায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বয়স হইলেই বিবাহ হইত, তবে ভাল পাত্র পাইলে তার অন্যথা করিতে বলিতেছেন। তারপর আরো স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন,—

"কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।
মনুসংহিতা, ৯ম অ, ৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ ঋতুমতি কন্যাও আমরণ পিতৃগৃহে অবস্থান করিবে, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক গুণহীন বরকে কখন কন্যা দান করিবে না।

তার পর বলিতেছেন ;—

'ত্রিণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।

---

* মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায়—২৭,২৮,২৯ ও ৩০ শ্লোক দেখ।

+ মনুসংহিতা ঐ ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ শ্লোক।

* মনুসংহিতা—নবম অধ্যায় ৮৮ শ্লোক।

উৰ্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম।

মনুসংহিতা, ৯অ, ৯০ শ্লোক।

অর্থাৎ কুমারী ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবে, এই কালের পরে উৰ্দ্ধ বা সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।

তারপর বলিতেছেন,—'যদি অদীয়মানা কন্যা স্বয়ং ভর্ত্তাকে যথাকালে বরণ করে, তবে সেই কন্যার ও বরের কোনও দোষ গ্রহণ করিতে হয় না। '৯ম অ, ৯১ শ্লোক। তারপর বলিতেছেন—স্বয়ংবরা কন্যা পিতৃ মাতৃদত্ত অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না। ৯ম অ, ৯২ শ্লোক। ইত্যাদি।

এই সকল শ্লোকে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, মনু যৌবন বিবাহের পোষকতা করিয়াছেন; তবে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে,অপরিহার্য্য না হইলে এরূপ করা অবৈধ। পুরুষের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে মনু খুব স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন। গুরু-কুলে জীবনের অধিকাংশ কাল থাকিয়া বেদাধ্যয়ন ও ব্রতাচরণ সমাপ্ত না করিয়া বিবাহ করিবে না।* ২৪।২৫ বৎসরের পূর্ব্বে তাহা হইত না।+ পুরুষদিগকে গুরুকুলে থাকিতে তিনি আদেশ করিয়াছেন কন্যাদিগকে বাল্যকালে পিতারবশে,যৌবনে পতির বশে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।+ ইহাতে বুঝা যায়, মনু স্ত্রী স্বাধীনতার খুব বিরোধী ছিলেন। সে যাহা হউক, একটী শ্লোকে তিনি বিবাহের বয়সে একটু গোল করিয়াছেন। ৯ম অধ্যায়ের ৯৪ শ্লোকে দেখা যায়, ;—

''ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যা হৃদ্যাংদ্বাদশবার্ষিকীম"

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি, দ্বাদশবর্ষীয় কন্যাকে বিবাহ করিবে, ইত্যাদি।

উপরোক্ত শ্লোক সকলের পর এই শ্লোকটী থাকায় আমাদের মনে হয় যে, তিনি এতদ্বারা অনুপাত (Ratio) ঠিক করিতেছেন; কিন্তু ইহাতে ইহাও বুঝা যায় যে,সে সময়ে এইরূপ বিবাহ হইত। যাহা হউক, বিকৃত অর্থ করিলেও,এ শ্লোকে বালিকাদের পক্ষে বাল্য বিবাহের বিধি থাকিলেও,পুরুষদিগের পক্ষে নাই। হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান সময়ে পুরুষদিগের যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা দেশাচার মাত্র; তাহা শাস্ত্রের অনুমোদিত মোটেই নয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে বালিকাদের যে অধিক বয়সে বিবাহ হইত, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, গান্ধারী, দেবযানী, প্রভৃতির বিবাহেই তাহা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।+ বৈদিক, স্মার্ত্তিক পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কালে বালিকার পক্ষেও বাল্যবিবাহ যে প্রচলিত ছিল না, সুরভি ও পতাকায় শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর মিত্র তাহা সুন্দররূপ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* তবে তিনি বলিতেছেন যে, "কেবল দানসাধ্য বিবাহে (যাহা পরবর্ত্তী স্মার্ত্তিককালে কেবল ব্রাহ্মণগণেই আবদ্ধ ছিল) অনেক স্থলে বালিকার পরিণয় হইত, কিন্তু তাহা বালকের সহিত কদাচ সংঘটিত হইত না।" সুরভি ও পতাকা—৮ই পৌষ—১২৯৪।

* মনুসংহিতা—৪র্থ অ—১, ৩য় অ ২, ২য় অ ৩৬ ও ৩য় অ ৪ শ্লোক।

\+ হিন্দু বিবাহ সমালোচন—প্রথম খণ্ড ১৩।১৪ পৃষ্ঠা।

\+ মনু—৫ম অ, ১৪৭।৪ ১৪৮ শ্লোক।

\+ হিন্দুবিবাহ সমালোচন প্রথম খণ্ড ৯ম পৃষ্ঠা; and Hygene and Public Health by D. Basu, vol II. P 130.

* সুরভি ও পতাকা—বাল্যবিবাহ ১ম হইতে ৮ম প্রস্তাব, কার্ত্তিক হইতে ১৫ই পৌষ, ১২৯৪।

শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয়, ইতি-পূর্ব্বে হিন্দুবিবাহ সমালোচনায়ও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাল্যবিবাহ বিস্তৃতরূপে প্রচলিত ছিল না, তবে কোনং স্থানে একটু আধটু ব্যবস্থা দেখা যায় মাত্র। কথায় বলে, নানা মুনির নানা মত, সকলে যে একমত হইবেন, ইহা কখনও আশা করা যায় না।

এখন প্রশ্ন এই, হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক যোগ বা মুক্তি কি না! শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "হিন্দুপত্নী" ও "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে মীমাংসা করিয়াছিলেন যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক।* শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এই কথাটী খণ্ডন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক নয়। + রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ অন্যান্য বিষয়ে খুব সারগর্ভ হইলেও এবিষয়ে ভ্রমাত্মক বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল। মনু বলিয়াছেন, গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।* তার পর তিনি বলিতেছেন, "যিনি অক্ষয় স্বর্গ ও ঐহিক সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্ন সহকারে গৃহস্থাশ্রম সতত অবলম্বন করিবেন। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তি এ আশ্রম অবলম্বন করিতে সমর্থ নহে।"+ বিবাহ ভিন্ন গৃহস্থাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় না, সুতরাং স্বর্গ লাভের জন্য বা মুক্তির জন্য বিবাহ যে হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ, ইহাতে সন্দেহ কি? হর পার্ব্বতীর বিবাহ, রামসীতার বিবাহ প্রভৃতি যে সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-ভাবের দৃষ্টান্ত ঘোষণা করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। চন্দ্রনাথ বাবু রবীন্দ্র বাবুর উত্তরে অনেক যুক্তি সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক ভিন্ন আর কিছুই নয়।+ আধ্যা-ত্মিক উদ্দেশ্যই প্রধান, গৌণ উদ্দেশ্য পুত্র লাভ ইত্যাদি। চন্দ্র নাথ বাবু খুব যোগ্যতা সহকারে রবীন্দ্র বাবুর কথা সকল কাটিয়া দেখাইয়াছেন। সোজা কথাতে, আমরা ইহাই বুঝি, প্রাচীন আর্য্য সমাজের সকল বিধি, সকল অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই ধর্ম্ম বা মুক্তি। ধর্ম্ম ভিন্ন কোন কথা নাই। আর্য্য সমাজের বিবাহের উদ্দেশ্য আধ্যা-ত্মিক নয়, একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আরো কোন কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি চেষ্টা করিবেন শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে যে কি লাভ হইবে, বুঝি না। সে সকল না দেখিলে কিছুই বলা যায় না। হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য যে আধ্যাত্মিক ছিল, যৌবন বিবাহ প্রতিষ্ঠিত থাকাই তাহার প্রমাণ। পুরুষ ধর্ম্ম শিক্ষা শেষ না করিয়া বিবাহ করিবে না, ইহাই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য অধ্যাত্ম যোগ বা মুক্তি হইলে বালিকার চরিত্র বা ধর্ম্মজ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে যে বিবাহের ব্যবস্থা, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই প্রাচীনকালে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল না।* আমাদের বিবেচনায় এ বিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যও চাই। সুশ্রুত সংহিতার আদেশ এই জন্যই শিরোধার্য্য। দময়ন্তী ও সাবিত্রী যে দেশে এত পূজা পাইতেছেন, সে দেশে যৌবন বিবাহের প্রতি লোকের যে ঘৃণা ছিল না, তাহা বেশ বুঝা যায়।

* সাবিত্রী, ৫৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

+ ভারতী, ১১শ ভাগ পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ দেখ।

* মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায় ৭৭ ও ৭৮ শ্লোক।

+ মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায় ৭৯ শ্লোক।

+ নবজীবন ৪০ সংখ্যা, কার্ত্তিক, হিন্দুবিবাহ।

* সুরভি ও পতাকা, পৌষ ১২৩ পৃষ্ঠা।

সুতরাং নানাকারণেই সর্ব্বতোভাবে যৌবন-বিবাহের অনুমোদন করা যাইতে পারে। এখন যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা দেশাচর মাত্র। এই দেশাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? যেরূপ দেখা যাইতেছে, কন্যাভারগ্রস্ত হওয়া প্রযুক্তই হউক, বা পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণেই হউক, অনেক স্থলে খুব বয়স্থা বালিকা দেখা যায়। এই জন্যই রক্ষণশীল দলের অগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু বালিকার বয়স ১৩ বৎসর করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন।* বাল্য বিবাহ উঠিয়া যাইতেছে এবং যাইবে; কাহারও সাধ্য নাই তাহার গতি থামায়। তবে হিন্দুসমাজে বয়সের একটা বাঁধাবাধি নিয়ম থাকিবে কি না, সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজের মতে বালিকার ১৪ বৎসর বিবাহের ন্যূন বয়স, হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল দলের মতে ১৩ বৎসর উর্দ্ধ বয়স। আর এক বৎসর উঠিলে নিম্নে ও উর্দ্ধে অন্ততঃ মিলন হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায়, আদর্শ আরো উপরে তুলিয়া দেওয়া উচিত। এত অল্প বয়সে বালিকাদের ধর্ম্মজ্ঞান, চরিত্র, এসকল কিছুরই অঙ্কুর জন্মে না। যে হিসাবে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকা রাখা যাইতে পারে, সেই হিসাবে আরো কিছু কাল রাখিলে ক্ষতি নাই। তবে যেখানে সমাজের বা অভিভাবকের অবস্থায় কন্যা রাখা কষ্টকর, সেস্থলে স্বতন্ত্র কথা। যাহা হউক, বয়স সম্বন্ধে প্রাচীন প্রথা ও নব্য প্রথার মধ্যে অতি অল্পই পার্থক্য দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজ এ সম্বন্ধে দেশের প্রাচীন মতানুসারে যে কতক কার্য্য করিতে পারিয়াছেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে এই বিবাহ প্রথাকে সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে মহৎ কার্য্য করিয়াছেন,* এক সময়ে সে জন্য ব্রাহ্মসমাজ এদেশে পূজা পাইবেন। কিন্তু কথা এই, বয়স সম্বন্ধে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছেন, ধর্ম্ম, নীতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ সেরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে—ব্রাহ্মিকাদের মন দিন দিন বিলাসের দিকে ঝুকিতেছে। এই স্রোত হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করা খুব উচিত। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। বিলাসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, সুশিক্ষা ও সুনীতিতে ভূষিত করিয়া, উপযুক্ত কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে এখনও কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

অভিভাবকের উপর বা গুরুর উপর কন্যা এবং পাত্রের সম্পূর্ণশিক্ষার ভার দেওয়া হিন্দুশাস্ত্রের আদেশ। তাঁহারাই পাত্র পাত্রী মনোনীত করেন। প্রাচীন কালে দুই একস্থলে অন্যরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকিলেও—অধিকাংশ স্থলে পাত্র পাত্রী মনোনয়নের ভার অভিভাবকদিগের উপর থাকিত। যে চারিপ্রকার বিবাহে কন্যাদানের ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ত সম্পূর্ণ অভিভাবকদিগের কর্তৃত্ব। স্ত্রীস্বাধীনতার তত বিস্তার বা আদর ছিল না। ব্রাহ্মসমাজেও যে খুব বিস্তার হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। তবে কোন কোন স্থানে হিন্দুসমাজেও স্ত্রীস্বাধীনতা আছে,

* [illegible]

* Leonard's History of the Brahma Samaja.

কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মসমাজেও আছে। ব্রাহ্মসমাজে মনোনয়ন প্রথার একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, ইহাতে আমাদের খুব আপত্তি। কেশব বাবুরও খুব আপত্তি ছিল।* সে সকল কথা পূর্ব্বে যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। অভিভাবকের মতামতের উপর নির্ভর না করিলে বিবাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। চরিত্র, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, বংশপরম্পরা চরিত্র ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি, নানা বিষয়ের অনুসন্ধান প্রয়োজন। কেবল পাত্র পাত্রীর উপর ভার দিলে তাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই জন্য আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু রিত্যনুসারে বর কন্যার উপর মনোনয়নের ভার না রাখিয়া অভিভাবকের উপর অধিক দিতে বলি; ইহাতে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না। পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে চটাইয়া নিজের সুখের জন্য বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। নিজের সুখই মানুষের এক মাত্র লক্ষ্য নয়। আত্মসংযম ব্রত গ্রহণ করিয়া অন্যের সুখ, অন্যের সুবিধা দেখা খুব উচিত। ব্রাহ্মসমাজে অনেকে আত্মীয়ের মত বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছেন; আর কেহ কেহ এমনও আছেন যে, পিতা মাতার মত বিরুদ্ধ হয় বলিয়া যাঁহারা বিবাহই করিতেছেন না। তাঁহাদিগের কি মহত্ব! বাস্তবিকও এইরূপই হওয়া উচিত। নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা বা স্বার্থ—অন্যের জন্য পরিত্যাগ করাতেই মহত্ব। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি; আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে প্রাচীন মত গ্রহণ করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একান্ত উচিত। ক্রমশঃ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **অঞ্জলী**।—শ্রীইন্দু ভূষণ রায় প্রণীত—মূল্য ॥৵০। পদ্যময় গ্রন্থ। গ্রন্থকার এই নূতন সাহিত্য জগতে দেখা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার লেখায় তেজ আছে, কমনীয়তা আছে, পবিত্রতা আছে, মাধুর্য্য আছে। সকলগুলি নয়, দুই চারিটী কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। 'সে ভুলিবার নয়,' 'তুমি মধু,' 'পিয়াস না মিটিল,' প্রভৃতি কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। সকলের উপরে, গ্রন্থকারের রুচি অতি সুন্দর—প্রতি কবিতায় তাঁহার পবিত্রতার অস্ফুট ছায়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক এ গ্রন্থ পড়িয়া আমরা ইন্দু বাবুর পবিত্র জীবনের পরিত্র একটা আভাস পাইয়াছি। ভগবান্ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

৫। **বিভা**।—মাসিক পত্রিকা, বার্ষিক মূল্য ২৸০।—রয়াল ৬ ফর্ম্মা। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। আমরা ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ ইহাতে লিখিতেছেন। পূর্ণ বাবুর প্রবন্ধ বেশ হইতেছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ের জাতিভেদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটী খুব পাণ্ডিত্য পূর্ণ হইতেছে। মোটের উপর পত্রিকা খানি বেশ হইতেছে।

---

* Life and Teachings of Keshub Chunder, &c. Page 401.

সীতারাম রায়। (২য়)

যে স্বাস্থ্য-প্রদায়িনী মধুমতী নদী আজ মহম্মদপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, ২০০ বৎসর পূর্ব্বে সেই মধুমতী আদৌ ছিল না। তখন মহম্মদপুর, হরিহর-নগর এবং ভুষণা প্রভৃতি খ্যাত নগর কালী-গঙ্গা নদীর তটস্থ ছিল। থাকের নক্সায় কালীগঙ্গা অঙ্কিত আছে এবং স্থানে স্থানে কালীগঙ্গার কাল জল পথিকের নয়ন ক্লিষ্ট করিয়া থাকে এবং যদি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ ক্ষত উৎপাদন করে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কালীগঙ্গা কি প্রকার শ্রীশালিনী ছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু তত্তীরস্থ ভূষণা ও মহম্মদপুর নগর যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, সন্দেহ নাই। এই উভয় নগরই সীতারামের। কি প্রকারে একজন উত্তর রাঢ়ীয় হীন বংশোদ্ভব কায়স্থ এ অঞ্চলে একটী স্বাধীন রাজ্যের মূল পত্তন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় কিম্বদন্তী বিবিধ কল্পনা বিজৃম্ভিত করিয়াছে। (১) সীতারামের হরিহর নগরে তালুক ছিল। তদ্ভিন্ন শ্যামনগরে একটী জমা ছিল। একদা তিনি অশ্বারোহণে হরিহর নগর হইতে শ্যামনগর যাইতেছিলেন, পথে অশ্বের খুরে বাধিয়া একটী ত্রিশূল উঠিল। সেই ত্রিশূল দ্বারা ভূমি খনন করাতে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের মন্দিরের শীর্ষদেশ দেখা দিল। ক্রমে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের মন্দির, পরে সেই ঠাকুর (শিলাচক্র) প্রাপ্ত হওয়া গেল। সীতারাম দেবতার দাস বলিয়া আপনাকে ঘোষিত করিলেন; সহস্র লোক সঙ্গে জুটিল। তাহাদের সহায়তায় রাজ্য বিস্তৃত হইল, দুর্গ নির্ম্মিত হইল, তিনি রাজা হইলেন। (২) এ অঞ্চলে ১২ জন ভূস্বামী ছিলেন। তাঁহাদের রাজকর বাকী পড়িয়াছিল। দিল্লীর সম্রাট সীতারামকে সসৈন্যে পাঠান; তিনি ভূস্বামী-গণকে একে একে পরাজিত করিয়া স্বয়ং রাজা হন, কিন্তু শেষে নিজেও রাজকর দেন নাই। (৩) সীতারাম দিল্লীতে চোপদার ছিলেন। ভূস্বামীগণের রাজকর অনাদায় বশত সম্রাট তাঁহাকে সাজোয়ান করিয়া পাঠান। (৪) সীতারামের পিতা "ভূষণা জরকারক সুরনারায়ণ বিশ্বাস" জয়ান্তে দিল্লীতে গেলে মৃত্যুমুখে পতিত হন; তাঁহার পুত্র সীতারাম নানা দুর্দ্দশার পর স্বপ্নে দেখেন, পোড়া মাটী খাইতেছেন। পোড়ামাটী খাওয়ার ফল রাজ্য লাভ। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আসিলে রাজ্যলাভ হইতে পারে বিবেচনা করিয়া, আবাদী সনন্দ লইয়া আইসেন। *

---

* ১ম ও ২য় প্রবাদ ওয়েষ্টল্যাণ্ড (Westland) সাহেবের যশোহরের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত সাহেব প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে সীতারামের রাজধানী মহাম্মদপুর সন্দর্শন করেন। কিন্তু তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই, তিনি বলেন— There must be much in my report that would bear further enquiry (Vide his letter to Govt. dated the 25th Oct. 1870). তাঁহার সহিত কোন কোন বিষয়ে আমাদের অনৈক্য হইবে। সম্প্রতি অথযোল্লিখিত প্রবাদ আমরা জানি নাই।

এই সকল প্রবাদের প্রকৃতার্থ স্থির করা কঠিন। সীতারামের পিতা ও মাতা এ দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার কতক কারণ আছে। অনেকেই বলে, মহম্মদপুরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে যে খাল অদ্যাপি বহমান আছে, উহা সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ দাসের কাটা বলিয়া উদয়গঞ্জের খাল নামে পরিচিত। সে স্থলে উদয়গঞ্জের হাটও ছিল। কিন্তু উদয় নারায়ণ ভূষণা "জয় কারক" ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভূষণা "চাকলে ভূষণা বলিয়া" খ্যাত। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে "চাকলা" নামক বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; সে সময় অর্থাৎ ১৫৮২ হইতে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ ৩৩ সরকারে বিভক্ত ছিল। ভূষণা সীতারামের নিজের নির্ম্মিত এবং সীতারামের পরাজয়ের পর "চাকলাতে" পরিণত হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বিবেচনা করেন, সীতারাম ১৭১৪ কি ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে তনুত্যাগ করেন। একথার বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না। সীতারামের তিরোভাবের পর যাহা "চাকলা" হইল, সে চাকলা তাঁহার পিতা কি প্রকারে পূর্ব্বে জয় করিলেন? চাকলা সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যে জয় করার ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

আমার বিবেচনা হইতেছে, সীতারামের পিতার আগমনের সহিত "মথুরাপুরের সংগ্রাম সাহার" ইতিবৃত্তের সংশ্রব আছে। সুতরাং তদ্বিষয় যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধুমতী নদী সে সময়ে ছিল না। বাবুখালীর নিকট দিয়া সে সময়ে বারাসিয়া নদী প্রবাহিত হইত। বারাসিয়ার উত্তরাংশ পরিণামে মধুমতী হইয়াছে। বারাসিয়া ও কালীগঙ্গা ভিন্ন আর দুইটী নদী ছিল—ছত্রাবতী ও চন্দনা। ছত্রাবতী শুষ্ক-কলেবরা হইয়াছে; চন্দনা অদ্যাপি আছে, তাহাতে বৎসরে ৫। ৬ মাস নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

সংগ্রামসাহ সম্বন্ধে ডাক্তার হণ্টার নির্ব্বাক্; ঢাকার ইতিহাস লেখক ক্লে সাহেব নির্ব্বাক্; বরিশালের ইতিহাস লেখক বিবরিজ সাহেব নির্ব্বাক্; যশোহরের ইতিহাস লেখক ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব নির্ব্বাক। * কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বাক হই-

---

২য় ও ৩য় প্রবাদ মূলতঃ প্রায় একরূপ। ইহার ভিতর সত্য থাকা অসম্ভব নহে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও ২য় প্রবাদ অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করেন।

৪র্থ প্রবাদ মহাম্মদপুর নিবাসী রাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হস্তলিপি হইতে গৃহীত। উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন নহেন—তাঁহার হস্তলিপির মধ্যে বঙ্কিম বাবুর শ্রী, [illegible] এবং ভূঞা প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। যদিও তাঁহার হস্তলিপি আমার প্রধান অবলম্বন, তথাচ তাঁহার প্রত্যেক কথা আমার পরীক্ষা করিয়া লইতে হইতেছে। তিনি সীতারামের আগমন বিষয়ে যে প্রবাদ সংযোজিত করিয়াছেন, তাহা অন্য কেহ সমর্থন করে না এবং তাহা প্রায় সর্ব্বতঃ পরিত্যজ্য বলিয়া মনে করি। তাঁহার মতে সীতারামের পিতা সুরনারায়ণ বিশ্বাস; কিন্তু সীতারামের উভয় পুরুষ বলেন, সুরনারায়ণ সীতারামের পুত্র।

* তাঁহার পুস্তকে সিংহরাম সা নামে নবাবের প্রধান সেনাপতির নাম পাওয়া যায়। সিংহরাম সীতারামকে পরাজিত করেন। সিংহরাম আর সংগ্রাম এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না। সংগ্রাম এ দেশে বাস করিয়াছিলেন। মথুরাপুরের দেউল সীতারামের দশভুজালয়, হরেকৃষ্ণ মন্দির

লেও সংগ্রামসাহ নামে এক ব্যক্তি সীতারামের অব্যবহিত পূর্ব্বে চন্দনা নদীতীরে রাজত্ব করিতে ছিলেন, এবিষয়ে মথুরাপুরের দেউল সাক্ষ্য দিতেছে এবং তদ্বিষয়ক কিম্বদন্তী * বর্ত্তমান মধুমতীর উভয় পার্শ্বে প্রায় সকল গ্রামে জাগরিত আছে।

সংগ্রাম সাহকে এদেশে "হামবৈদ্দী" সংগ্রামসাহ বলিয়া থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধাংশে যখন বঙ্গদেশ (বর্ত্তমান পূর্ব্ব বাঙ্গালা) একদিকে মগ ও পর্ত্তুগিজ ও অপরদিকে আসামীদিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত ও মোগলসাম্রাজ্য আভ্যন্তরিক বিবাদে প্লাবমান, তখন সংগ্রামসাহ প্রাদুর্ভূত হইয়া নিরাপদে চন্দনা তীরে রাজত্ব করিতেছিলেন।

সংগ্রাম সাহকে পরাজিত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তৎসমভিব্যাহারে উদয়নারায়ণ বিশ্বাস (সীতারামের পিতা) সম্ভবত আসিয়া থাকিবেন, এবং কোন না কোন কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিজয়ী সেনার অধিনায়ককে সন্তুষ্ট করিলে তদনুরোধে তিনি এ অঞ্চলে কতক জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে উত্তর রাঢ়ীয় একঘর কায়স্থ কালীগঙ্গা নদীর তীরে উপনিবেশিত হয়। উদয়নারায়ণ বিশ্বাসের পুত্র সীতারাম।

সীতারামের অভ্যুদয় সম্বন্ধে যাকমন্ত্রপ্রাপ্তিই প্রধান কারণ বলিয়া এ অঞ্চলবাসী সর্ব্বসাধারণ লোকে নির্দ্দেশ করে। সকলেই বলে, তিনি ঐ মন্ত্র প্রভাবে যে স্থানে ধন লুক্কায়িত থাকিত, তাহা জানিতে পারিতেন। তাহারা ইহাও বলিয়া থাকে "সীতারামকে ধনে ডাকিত", অর্থাৎ সীতারাম চলিবার সময় যে স্থানে ধন নিহিত থাকিত,সে স্থান হইতে আহ্বান

প্রভৃতির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহার অনেকটা মাটীর নীচে বসিয়া গিয়াছে; হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের মন্দির প্রভৃতি তাহা হয় নাই। সুতরাং সিংহরাম নিশ্চয়ই সংগ্রাম নহেন।

* সংগ্রাম সাহের দরবারে শ্রীকান্ত বেদাচার্য্য নামে একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। আদিষ্ট হইলে, বেদাচার্য্য মহাশয় সংগ্রামের আয়ু গণনা করিয়া দেখেন, সংগ্রামের মৃত্যু তৎপর দিন দ্বিপ্রহর বেলার সময় হইবে। তজ্জন্য তাহার ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত করেন। সৈন্য আসিয়া তার পরদিন সংগ্রামকে মারিয়া ফেলে। এই কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, শ্রীকান্ত সংগ্রামের সমকালবর্ত্তী। শ্রীকান্তের বংশাবলী—এই প্রকার জানা যাইতেছে।

শ্রীকান্ত—বেদাচার্য্য
।
পুত্র—(অজ্ঞাত)
।
পৌত্র—(অজ্ঞাত)
।
প্রপৌত্র—দেবীপ্রসাদ ন্যায়লঙ্কার
।
নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য

১৪।১৫ বৎসর হইল প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে নন্দকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। নন্দকুমার জীবিত থাকিলে তাহার ৯০ বৎসর বয়স হইত। তাঁহার ৪ পুরুষ পূর্ব্বে শ্রীকান্ত। ৩০ বৎসর করিয়া পুরুষ ধরিলে (৩০ বৎসর করিয়া পুরুষ ধরার কারণ আছে) শ্রীকান্তের অবির্ভাব কাল বর্ত্তমান সময় হইতে ২১০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হই। সে সময় সীতারাম ১০ বৎসর বয়স্ক বালক এবং তাঁহার পিতা জীবিত।

২য় কিম্বদন্তী এই, সংগ্রামসাহ এদেশে আসিলে কেহ জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোন জাত?" সংগ্রাম প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসিলেন, "এদেশে কোন জাত প্রধান?" উত্তর "বৈদ্য প্রধান"। সংগ্রাম বলিলেন 'তবে হামবদ্দি"। এই জন্য তিনি হামবদ্দি নামে খ্যাত।

সূচক শব্দ নির্গত হইত এবং সীতারাম যাইয়া ধন উঠাইয়া লইতেন। এই প্রকারে যে স্থান হইতে প্রথম ধন উঠান হয়, তাহা হরিহর নগরের নিকটবর্ত্তী "ধনভাঙ্গা" গ্রামনিবাসিনী কোন বৃদ্ধার অলাবু তলা। সেই স্থান হইতে এত ধন উঠান হইয়াছিল যে, সে স্থানে এক "দোয়া" অর্থাৎ জলাশয় হইয়াছিল। অদ্যাপি ধনভাঙ্গার দোয়া বলিয়া উহা বিখ্যাত। এই প্রবাদের ভিতর কি আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা এত দেশময় ব্যাপ্ত যে, ইহার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ফল, সীতারামের জলকীর্ত্তি এত অধিক এবং তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর নির্ম্মাণ, হরিহরনগর, শ্যামগঞ্জ ও সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি নির্ম্মাণে এত টাকা ব্যয় হইয়াছিল যে, তাঁহাকে কোন সূত্রে প্রভূত অর্থবান বলিয়া গণনা না করিলে কিছুতেই ঘটনা পরম্পরার সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না। মোসলমান লেখকেরা * তাঁহাকে ডাকাইত বলিয়াছেন। ব্রহ্মদেশবাসীদিগকে যে প্রকার ডাকাইত বলা যাইতেছে, সীতারাম একজন সেইরূপ ডাকাইত নয়ত ? ফল, সীতারামের বিস্তর অর্থসম্পত্তি হইয়াছিল।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অবসাদ।

শিশির-প্রভাত-বায়ু অলসে বহিয়া যায় ;
অলসে নিহার-কণা পত্রে পত্রে লতিকায়,
খেলি মরণের খেলা, খসিয়া, পরশে ধূলা
নিশ্বাসে কোমল প্রাণ অনন্তে মিশিয়া যায় !
মেঘে মেঘে কোলাকুলি অনন্ত গগণ জুড়ি ;
রুদ্ধ প্রাণ শশীকর ক্লান্ত শ্রান্ত ফিরি ঘুরি,
যদি মেঘ অবকাশে, একাকী নিরুদ্ধ শ্বাসে
চাহে ধরণীর পানে স্বর্গের মমতা ছাড়ি.
অলস কম্পিত স্বরে, শিথিল সঙ্গীত ঝরে
নীরবে আঁধারে মিশে, ধরায় মুরছি পড়ি !
ফুল ফুটে ঝরে যায়, শিথিলতা পশে প্রাণে !
বিযুক্ত হৃদয়-গ্রন্থি চূর্ণ মর্ম্ম সঙ্গোপনে !
দূরাগত বীণাধ্বনি, করুণা-গলিত বাণী
ছোয় কিনা ছোয় তায়, তবু যে রে আনমনে
আপনারি সুখ লয়ে, আপনারি দুখ লয়ে,
প্রাণ যে মিশাতে চাহে ধূলি-কণিকার সনে !
কে আমারে বলে দেবে দূরাগত গীতরব
কেন প্রাণে পশে মোর—কেন এ ঘুমের ঘোর ?
সাধের বাসনাগুলি অভিমানে বিনীরব
কেন ? কেন বুঝিনা যে কি নেশায় আছি ভোর !

শ্রীকিশোরিলাল গুপ্ত।

সাধ

আঁধার রজনী কোলে,
তারকা মধুর হাসে,
বনলতা ধীরে দোলে,
শিশির নীরবে ভাসে।

আমার হৃদয় আজি,
তোমারে হেরিতে চায়,

* Vide Stewart's History of Bengal.

গাঁথিয়া কুসুমরাজি,
পরাতে তব গলায়।

তোমার প্রেমের হাসি,
শোভা দিবে এ জীবনে,
স্বর্গীয় কুসুমরাশি,
অমিয় ঢালিবে প্রাণে।

তোমার সুন্দর মুখ,
আঁকিয়া রেখেছি প্রাণে,
যখন পাইব দুঃখ,
চাহিব সে চিত্রপানে।

বনের বিহগ ডাকে
'বালিকা' বলিয়া মোরে,
পুষ্পহার দেয় মোকে,
ফুলবালা স্নেহভরে।

নদী বলে বালিকারে,
তোরে বড় ভালবাসি,
ইচ্ছা হয় প্রেমনীরে,
হৃদে লয়ে সুখে ভাসি।

আকাশ হাসিয়া বলে,
বালিকা আয় রে হেথা;
তোরে লয়ে দুলে দুলে,
বলিব মনের কথা।

সমীরণ মম সনে,
অতি ধীরে ধীরে বলে.
'বালিকা' একটী গানে
দেরে মন প্রাণ খুলে।

আমার 'বালিকা' নাম,
সকলেই স্নেহে বলে,
তুমি কেন নাহি মম
'বালিকা' নাম রাখিলে?

শ্রীমতী মোহিনী দেবী।

মাতৃ অন্বেষণ।

এত নহে সেই মলিন গগণ
প্রাণ কাঁদে মম হেরিলে যাহার,
এত নহে সেই চন্দ্রের কিরণ—
আনন্দবিহীন ছায়া ভাসে যায়!

এত নহে কভু সেই সমীরণ—
যে শুধু বহিত পরশিয়া কায়,
এত নহে সেই প্রাণী-কণ্ঠ-স্বর—
যাহাতে উদাসী হ'ত মম মন।
আর সে প্রকৃতি শূন্য নাহি আজ
প্রাণের সঞ্চার না ছিল যাহার,
নিরখি যে দিকে সেই দিক আজ
উথলি পড়িছে স্নেহে অনিবার।
নিরখি প্রবাসী তনয়ে আগত
যথা প্রেমময় অতুল বদনে,
দুঃখিনী জননী ডাকে অবিরত
স্নেহ পরিপূর্ণ মধুর বচনে।
পুত্র-পরিচিত সেই স্নেহে পূরি
আজি এ প্রকৃতি সম্ভাষে আমায়,
যেন ভূমণ্ডল-হৃদয় প্রসারি
ডাকিছে—"বাছনি আয় আয় আয়।"
এ অদ্ভুত স্নেহ ছিল যে কেবলি
মায়ের আমার হৃদয় ভাণ্ডারে;
পাইলে কোথায়? সেই মায়া তুমি,
বলগো প্রকৃতি, বলগো আমারে।
জাহ্নবীর তটে জীর্ণ গৃহ খানি,
বিদেশে নির্জ্জনে বসিয়া তাহায়,
খুলি বাতায়ন উদাসীর প্রায়
ভাবিতাম শুধু কোথায় জননী!
কে দিবে বলিয়া কোথায় জননী!
হেন সখা মম কে ছিল সংসারে,
কে করিবে স্নেহ জননীর মত

এ সুধা কার হৃদয় ভাণ্ডারে।
নিরাশহৃদয়ে সজল নয়নে
জগতের প্রতি করি নিরীক্ষণ,
জননী চিন্তায় বিরস বদনে
করিতাম শুধু অশ্রু বিসর্জ্জন।
আজি নভগুল মাতৃ-স্নেহ সম
ঘিরিয়ে আমায় আছে চারি ধারে,
এ চন্দ্রের আলো তাঁরি স্নেহ সম
আমার হৃদয়ে পড়িতেছে ঝ'রে।
অকস্মাৎ আজি কোথায় পাইলে,
প্রকৃতি, এ স্নেহ মায়ের আমার ?
আছেন কি মাতা তোমাতে মিশিয়ে ?
বলনা প্রকৃতি বল এক বার।
এ মৃদু পবন তালবৃন্ত যেন—
নড়িছে, মায়ের কোমল করেতে,
প্রাণী-কণ্ঠ-স্বর তাঁর সম্ভাষণ
শুনিলে পরাণ আকুলিত করে।
কেবল আমার মায়ের হৃদয়ে
ছিল স্নেহময় ভাব এ সকল,
তবে কি জননী তোমাতে মিশিয়ে
অয়ি সুপ্রকৃতে! রয়েছেন বল ?

শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভাঙ্গা বাঁশী।

সংসার-শ্মশানে আছিল দাঁড়ায়ে
আলেয়াসুন্দরী প্রায়,
প্রায়শঃ নিশীথে হাসিতে খেলিতে
দেখিতে পেতেম তায়।
দুরাশায় বাক্যে এক দিন আমি
ধরিতে তাহারে যাই,
সে দিন হইতে কোথায় লুকা'ল,
আর না দেখিতে পাই।
উদাস-পাগল সে দিন হইতে,
শ্মশান সমান ধরা,
ভূতের-কীর্ত্তন ভৈরব নর্ত্তন
ডাকিনী প্রেতিনী-ভরা।
সেদিন হইতে শশাঙ্ক 'বিধু',
যামিনী 'যমুনা' প্রায় ;
হাসির বালুকা স্তরের তলে
দুঃখের ফলগু ধায় ;
সে দিন হইতে লোকে দেখাইয়া
যখন তখন হাসি,
সে দিন হইতে লোকে না দেখায়ে
বিরলাশ্রুজলে ভাসি,
সে দিন হইতে একটী স্বপনে
হয়ে আছি নিমগন,
সে দিন হইতে অতীত সুখের
করিতেছি রোমন্থন ;
সে দিন হইতে প্রদোষে সায়াহ্নে
আকাশের পানে চাই,
সে দিন হইতে নিরজন পেলে
আপনা আপনি গাই।
হে পিতঃ বিধাতঃ! জগতের নাথ!
ব'লে দাও একবার,
এমনি করিয়া মুহূর্ত্ত গণিয়া
যাবে কত কাল আর!
সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গল-বিধান
তোমায় বলিছে সবে,
হাসির উচ্ছ্বাসে দুঃখের নিঃশ্বাসে
কি হেতু মিশাও তবে!
আমোদের পথে নেচে নেচে যেতে
কেন না তোমার সয়!
পাঠাইয়া দাও বিষাদের চর,—
পথ আগুলিয়া রয়!
সুখের চন্দ্রমা উদিলে আকাশে
না পূরিতে ষোলকলা,
দুঃখ কালিমায় ঢেকে ফেল তায়,
চোখে বিধে তব শলা।

আমাকে কাঁদায়ে সুখী হ'লে হ'লে,
এ মিনতি মোর ধর,
এমন যাতনা অপরে দিওনা,
নমস্তে জগদীশ্বর!
উদাস-পাগল।

গান।

বল বল বল সখা শুনি যে একি,
তোমাতে আমাতে আছে প্রভেদ না কি?
অনন্ত তোমার রাজ্য,
অনন্ত তোমার কার্য্য,
কেবলি তোমারে দেখি যে দিকে ফিরাই আঁখি!
তুমি ছাড়া আমি নই,
আমি ছাড়া তুমি কই?
তোমারি আমারি কার্য্য অবিভিন্ন—মাখা মাখি!
দিয়েছ ভুগিতে সুখ,
কেন হইব বিমুখ?
করিব প্রাণে যা চাহে, পাপই বা কি পুণ্য বা কি!
ধূলিতে মিশিব ধূলি,
প'ড়ে র'বে কথা গুলি,
তোমারে করিব সুখী আপনি হইলে সুখী!
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের

ধর্ম্মবিষয়ক মতামত।

মৎ-প্রণীত "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত" পুস্তকে অক্ষয় বাবুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি মত ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। মৃত্যু না হইলে, কাহারই ধর্ম্ম বিষয়ক মতামত প্রচার হয় না। তাঁহার জীবিতাবস্থায় আমার পুস্তক প্রকাশিত হয়, সুতরাং তাহাতে তদ্বিষয়ের নির্দ্দেশ নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ কেহ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন; এবং ভবিষ্যতেও ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা। যিনি যিনি দত্তজ মহাশয়ের ধর্ম্ম-মতের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের কেহই প্রকৃত তত্ত্ব নির্দ্ধারণে সমর্থ হন নাই। যেহেতু এবিষয়ে নানা লোকের নানা মত প্রকটিত হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে নাস্তিক, অপর কেহ কেহ সংশয়বাদী ইত্যাদি কত কথাই বলিতেছেন। এই নিমিত্ত আমি এইবিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১।—অক্ষয় বাবু ১২৪৬ সালের শীত কালে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। তাহারও বহু পূর্ব্বে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। ১২৬২ সালের আষাঢ় মাস হইতে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংশ্রব রহিত হয়। ইহার প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে "আত্মীয় সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। আত্মীয় সভাতে বাদানুবাদ চলিত। কাহারও কাহারও মতে আত্মীয় সভার অধিবেশনেই দত্ত মহাশয়ের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইবার সূত্রপাত হয়। তদ্বিবরণ পশ্চাৎ বিবৃত হইল। এবিষয়ের বিশেষ বিবরণ বাবু কানাইলাল পাইনের উক্তিতে ব্যক্ত আছে। কানাই বাবু এক জন প্রাচীন ও মাননীয় ব্রাহ্ম। বিশেষতঃ তিনি আত্মীয় সভার এক জন সদস্য ছিলেন। তাঁহার বাক্য এবিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। তিনি বলেন, "A society under the name of the আত্মীয় সভা

(society for intimate friends) was established towards the close of 1854. Babu Devendranath Thakur was its president and Babu Akshaykumar Datta the secretary. This association soon attracted the sympathy of almost all intelligent, well-educated and earnest members of the community, some of whom held very respectable position in society. But Babu Devendranath could not agree with them as to introducing the changes they proposed in the formulae of worship which consisted in doing away chiefly as much as possible, with the reading of extracts from Sanskrit scriptures and substituting certain expressions for others, indicating the attributes of God. This disagreement caused hot discussions, in which Babu Akshaykumar Datta took an active part, and Babu Devendranath was much troubled about the matter. Finally he raised an objection, that no changes in the formulae could be made without the consent of the trustees of the Adi Brahma Samaj. This objection was found too difficult to overcome and the originators of the Association thought it better not to trouble him further on the subject; they had, therefore, to give up their hope of revising the formulae of worship"

[*Indian Messenger, June 13, 1886.*]

পাঠক মহাশয়েরা উপরি উক্ত উদ্ধৃতাংশ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, অক্ষয় বাবু কি কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত হইয়াছে,—দেবেন্দ্র বাবু ঐ সভাতে প্রস্তাব করিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।" অক্ষয় বাবু বলিলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, বিচিত্র শক্তিমান।" সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন বাক্য তিনি বলেন নাই। আর দেবেন্দ্র বাবু "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পুস্তকে অথবা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে বলেন, 'হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ কি না।' দেবেন্দ্র বাবু ও তাঁহার ন্যায় রক্ষণশীল ব্যক্তিরাই মনে করিতেন, হস্ত উত্তোলন করিলেই তাঁহাদের পক্ষ প্রবল হইবে, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত হইত। যেরূপে ও যে যে কথায় ঐ অংশ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদেরই ত্রুটি বোধ হয়, বস্তুতঃ প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ঠিক্ নহে, প্রমাণিত হইল।

২।—কোন কোন ব্যক্তির মতে দত্তজ প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা অনাবশ্যক বলিতেন। কথা অযথার্থ। ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-সংক্রান্ত মত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ত্যাগের কিছু পূর্ব্বে সংঘটিত হয়। আর, লোকে যে ভাবে প্রার্থনা-বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকটন করিতেছেন, তাহাও ঠিক্ নহে। এ বিষয়ের সবিশেষ বিবরণ মদ্রচিত অক্ষয় বাবুর বৃহদাকার জীবনবৃত্তে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

"অক্ষয় বাবু ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা, করিবার বিষয়ে ইঁহার মত এই যে, জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; পরমেশ্বর তাহা অতিক্রম করিয়া কোন কার্য্য করেন না। প্রাকৃতিক নিয়ম ঈশ্বরেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। মনুষ্য তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিলে অভিপ্রেত ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম-বলে যাহা সংঘটিত হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করার প্রয়োজন নাই।

"একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে কোন সাধারণ বিষয়ের জন্য ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব হয়। ইনি তাহার প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়। কিছু দিন হইল, অক্ষয় বাবু কোন কারণ বশতঃ পাথুরিয়াঘাটার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিবার নিমিত্ত পত্র লেখেন। তাহার উত্তরে দেবেন্দ্র বাবু লিখিয়া পাঠান,——

"ইংরেজী ১৮৫৪।৫৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৭৬ ৭৭শকে) সিভেষ্টিপুল নগরের নিকটে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। তৎকালে ইংরেজদের জয় কামনায় জন্য ইংলণ্ডের অনেক গির্জ্জাতে প্রার্থনা করা হয়। ঐ উপলক্ষে ভারতবর্ষের গির্জ্জা সকলেও তদনুরূপ প্রার্থনা করিবার আদেশ আইসে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একটি অধিবেশনে হিন্দুপেট্রিয়ট্-সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ সমাজে ঐরূপ প্রার্থনা করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু আপনি ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করাতে তাহা রহিত হইয়া যায়।"

"যখন ইনি ব্রাহ্মসমাজে সুস্থ শরীরে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য-সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন, সেই সময়ে এই বিষয়ের বিস্তর বাদ-প্রতিবাদ হয়। অতঃপর, সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইবার পরেও একটি বৃত্তান্ত বর্ণন করা যাইতেছে।

"একবার এ বিষয় লইয়া একটি বড় কৌতুককর ঘটনা হইয়াছিল। কলিকাতার হিন্দুহষ্টেলে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কালেজের বিদ্যার্থিগণ, গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে অক্ষয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই বিষয় ইঁহার শ্রুতিগোচর হইলে ইনি ভাবিলেন, 'বহুসংখ্যক ছাত্রের আমার নিকটে আসা অপেক্ষা আমার সেখানে যাওয়াই সুবিধাজনক।' অনন্তর এক দিন ইনি ব্রজ বাবুকে সমভিব্যাহারে করিয়া তথায় গিয়া উপনীত হইলে, হষ্টেলের তাবৎ ছাত্র একত্র সমবেত হইয়া ইঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তাঁহারা ঈশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করার প্রয়োজন-বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তৎসম্বন্ধে ইঁহার মত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ইনি প্রার্থনা করিবার আবশ্যকতা বা স্বার্থকতা আদৌ নাই, এই অভিপ্রায় অতি প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করেন এবং দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলেন, "কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা দ্বারা কোন কৃষাণের কস্মিন্ কালেও শস্য-লাভ হয় নাই।" ইহাতে কেহ কেহ কহিলেন, "ভাল, কৃষক—পরিশ্রম ও প্রার্থনা উভয়ই করুক না কেন?" তৎপরে ইনি বলিলেন, "বল দেখি, কৃষক যদি প্রার্থনা না করিয়া যথানিয়মে কৃষি-কার্য্যে নিরত থাকে, তবে তাহার কি ফল-লাভ হইবে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "কেন, শস্যরাশি।" তদনন্তর দত্তজ মহাশয় পুনরায় কহিলেন, "যদি তাহারা প্রার্থনাও করে, কৃষিকার্য্যও করে, তাহা হইলে কি ফল-লাভ হয়?" তাঁহারা এই প্রকার জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "তাহাতেও শস্যরাশি।" তখন ইনি বলিলেন, "যাহা তোমরা বলিলে, বীজগণিতের সমীকরণ-প্রণালীতে তাহা স্থাপন করিয়া বল দেখি, প্রার্থনার শক্তি কত?"

"পরিশ্রম = শস্য,

পরিশ্রম ও প্রার্থনা } = শস্য,

"অতএব প্রার্থনার শক্তি কত ?

"এই প্রশ্নের পর সকলেই কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ও নীরব রহিলেন। পরে অপেক্ষাকৃত কোন বয়োজ্যেষ্ঠ যুবক বলিয়া উঠিলেন, "প্রার্থনার মূল্য ০ শূন্য, অর্থাৎ কিছুই নহে।" ইহা শুনিয়া তখন বড় কৌতুক ও কলরব উপস্থিত হইল।

"ইহার পরে যুবক ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ ও আন্দোলন চলিতে লাগিল। কলিকাতার প্রধান প্রধান স্কুল ও কালেজেও এই বিষয় উপলক্ষ করিয়া তুমুল আন্দোলন ও আলোচনা হয়। এই ঘটনার দুই দিবস পরে মেডিকেল কালেজের ডিমন্‌ষ্ট্রেটার্ বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের সহিত অক্ষয় বাবুর সাক্ষাৎকার হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি ভাল এক সমীকরণ দিয়ে সহরটা তোল্‌পাড়্ করে দিয়েছেন।" অক্ষয় বাবু উত্তর করিলেন, 'বিশুদ্ধ-বুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ লোকের পক্ষে যাহা অতি বোধ-সুলভ, তাহা এদেশীয় লোকদের নূতন বোধ হইল, এটি বড় দুঃখের বিষয়।'

"ব্রাহ্মদের অধিকাংশে অনেক পরিমাণে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সাংসারিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা নিষ্ফল ও অন্যায় বলিয়া অনেকেরই প্রত্যয় হইয়াছে।" [অক্ষয়কুমার বাবুর জীবনবৃত্তান্ত ৯১—৯৪ পৃষ্ঠা।]

এ সম্বন্ধে আরও জানা আবশ্যক, এজন্য নিম্নে কিছু উদ্ধৃত হইল।

"কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন যে, যখন বিপদ্ কি অন্য কোন সময়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে, সে প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে তিনি আপনার অখণ্ড্য নিয়ম সকল লঙ্ঘন করেন না, আর যখন কোন পৃথিবীস্থ রাজার ন্যায় স্তুতি বন্দনা তাঁহার তুষ্টিকর হয় না, তখন তাঁহার উপাসনার আবশ্যকতা কি ? এরূপ আপত্তিকারকেরা বিবেচনা করেন না যে, যদ্যপি ঈশ্বরোপাসনার প্রতি কোন সাংসারিক কামনার সাফল্য নির্ভর করে না বটে, তথাপি তাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যিনি মঙ্গল অভিপ্রায়ে প্রাকৃতিক নিয়ম সকল স্থাপন করিয়াছেন,—যিনি জল, বায়ু, আলোক প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু সকল এমত প্রচুররূপে দিয়াছেন যে, সে সকল মূল্য দিয়া আহরণ করিতে হয় না, যিনি মনের ক্ষুধা নিবারণ নিমিত্ত বিদ্যার নিয়োগ করিয়াছেন, যিনি ভাবি-বালকের পোষণ নিমিত্ত মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, যিনি কি পুণ্যবান্, কি পাপী, কি ব্রহ্মনিষ্ঠ, কি নাস্তিক, সকলেরই উপজীবিকা বিতরণ করিতেছেন,—আর পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেও, এবং প্রভুর কোপে জীবিকাচ্যুত হইলেও, যিনি বাস ও জীবিকা প্রদানে ক্ষান্ত হয়েন না, হা! তাঁহার প্রতি কি কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে ? তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করা কি উচিত বোধ হয় না ? যখন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইল, তখন পিতা, মাতা ও বন্ধু-স্বরূপে তাঁহার প্রতি আমাদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাও সাধন করিতে হইবে। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ" পরমেশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। হে অকৃতজ্ঞ পুত্রেরা! তোমাদিগের পিতাকে তোমরা স্মরণ না কর, তাঁহার প্রতি তোমরা শ্রদ্ধা না কর,

কিন্তু তিনি তোমাদিগের প্রতি যেরূপ করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা বর্ষণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। পরমেশ্বরের উপাসনা কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে, তাহা অত্যন্ত আনন্দজনক হইয়াছে। জগদীশ্বর যত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই এক নিয়ম যে, ব্রহ্মচিন্তাতে অত্যন্ত সুখোৎপত্তি হয়।* * * মনুষ্যের যে নিজোন্নতির বাসনা আছে, তাহা মোক্ষাবস্থা ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না।"—(১৭৭১ শকের ১১ই মাঘে অক্ষয় বাবুর বক্তৃতা)

উপরি উদ্ধৃতাংশে ঈশ্বরের আরাধনা করার আবশ্যকতা-বিষয়ে দত্ত মহাশয়ের মত স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। যিনি উপাসনায় অত দূর নিষ্ঠাবান্, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাতেও যে ঐরূপ হইবেন, অনায়াসেই বুঝা যায়। অনুমানের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ বক্তৃতার অন্য এক স্থলের কয়েক পঙ্‌ক্তি দেখুন,—

"হে পরমাত্মন্! প্রীতিপূর্ণ মনের সহিত তোমার আলোচনার সময়ে যে সুস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল মহানন্দ দ্বারা চিত্ত কখন কখন প্লাবিত হয়, তোমার নিকট এই প্রার্থনা যে, তুমি সেই আনন্দ চিরস্থায়ী কর; তাহা হইলে, আমি পরিত্রাত ও কৃতার্থ হইলাম।"

আমার লিপির উপর যাঁহারা নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহাদের তৃপ্তিবিধানার্থ ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার পত্রিকার প্রামাণিক উক্তি এ স্থলে প্রদত্ত হইল,—

"Our friend, the author of বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার was again opposed to the views entertained by Babu Devendranath Thakur on Prayer : the latter would pray for temporal or physical blessings to which the former strongly objected. He expressed his objection with much force on the occasion of a prayer meeting which was proposed to be held in Brahma Samaj in Bhawanipur in connection with a general calamity during which prayers were offered in the Christian churches. And he succeeded in upholding his views. The Brahmas now pray for their spiritual welfare and believe in the efficacy of such prayers.—[*Indian Messenger, 13th. June, 1886.*]

৩।—ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। কেন না, "১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে সন্ধ্যার পর এক দিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-কালে তথায় উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে অত্যধিক দুর্ব্বল হইয়া, একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।" * এই উপলক্ষে সমাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কোন সম্পর্ক রহিল না।

৪। পীড়িত হইবার পরেও যে ব্রাহ্মধর্ম্মে ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার প্রমাণ চারুপাঠের তৃতীয় ভাগ। উহা, অক্ষয় বাবুর সমাজ হইতে সম্বন্ধ ত্যাগের ৪ চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৬৬ সালের শ্রাবণ মাসে প্রচারিত হয়। উহাতে যে সমুদায় বিষয় বিবৃত আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই সৃষ্টিকর্ত্তার এত দূর অচিন্ত্য মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন স্ব-রচিত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" বিরক্ত হইয়া লেখেন,—"অক্ষয় বাবু সকলে পুস্তকেই 'পরম কারুণিক'

* মৎপ্রণীত 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত' ২২৭ পৃষ্ঠা।

'পরম পিতা' 'পরাৎপর পরমেশ্বর' 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা' প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভাল জিনিষ বটেন, তাঁহাকে মনে করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্যও বটে, কিন্তু তালটী পড়িলেই ঈশ্বর ঢুপ্ করিলেন, পাতাটী নড়িলেই—ঈশ্বর হাই তুলিলেন, পাখীটী পড়িলেই—ঈশ্বর ফুড়ুৎ করিলেন—ইত্যাদি রূপে সকল কার্য্যে ও সকল কথাতেই যদি লোককে ঈশ্বর উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের বোধে সে উপদেশ সফল হয় না। ঈশ্বর প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়—অমনতর খেলাবার বি[illegible] নহেন। আমরা জানি, ঘন ঘন ঈশ্বর 'অত্যাশ্চর্য্য' 'অনির্ব্বচনীয়াদি' শব্দের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে অনেক পাঠকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন—ঈশ্বরানুরাগ প্রকাশ করেন না।"—(বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠা।)

অনেকের মতে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের উক্ত লেখার জন্যই দত্ত মহাশয়, শেষাবস্থার রচিত প্রবন্ধাদিতে জগদীশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই। আমরা উল্লিখিত মতে সম্মতি দিতে পারি না। যিনি জ্ঞানালোচনায় সুদৃঢ়চিত্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত উক্তি, কোন মতে প্রযুক্ত হইবার উপযুক্ত নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি অসঙ্গত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যে যে স্থানে অক্ষয় বাবু জগৎপতির যশোঘোষণা পুরঃসর পুলকিত হইয়াছিলেন, তাহা অতিমাত্র মধুর ও চিত্তাকর্ষক।

৫।—১২৮৬ সালেও অক্ষয় বাবুর ঈশ্বর-বিশ্বাস বিষয়ের প্রমাণ আছে। প্রবীণ ব্রাহ্ম বাবু কানাইলাল পাইন্ দত্তজের লোকান্তর গমনের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুনের ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার্ পত্রিকায় 'পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত কার্য্য, ("The late Akshaykumar Datta and his work in the Adi Brahma Samaj") নামে যে প্রস্তাব মুদ্রিত করেন, তাহার শেষাংশে লেখা আছে,—"I should like to state as a matter of fact that whilst passing two days with him (Babu Akshaykumar Datta) at Bali in September 1879, one morning I and my younge-t son offered prayers and chanted hymns in his beautiful garden taking our seat under the shade of some lofty trees. Babu Akshaykumar Datta sat at a little distance from us. After the service was over, we met and I marked that his face glowed with the love of God and I [illegible] say—"[illegible] আমার গৃহ প্রতিষ্ঠা হ'ল" 'To day my house is consecrated.' In the evening, whilst driving to the Railway station he expressed a desire to hear hymns, and my youngest son forthwith sang some, to his great delight. Does not this speak of a heart susceptible of devotional feeling? It is true that his rationalistic tendencies were stronger than his devotional feelings; but the latter were active in him when he was enjoying the company of our revered friend Babu Devendranath Thakur.' —[*Indian Messenger, June 13,1836.*]

৬।—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ২য় ভাগ ১২৮৯ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত হয়। তাহাতে যে অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সাধারণের সুগোচরার্থ উদ্ধৃত হইল,—

"অতর্কনীয় বিষয়ে তর্ক উপস্থিত করিলেই বুদ্ধিবিপাক ঘটিয়া উঠে। যে বিষয় অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয়, তাহা জানিতে ও নির্ব্বাচন করিতে গিয়া, মানুষে

বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। লোকে পরমেশ্বরকে একটি অসামান্য মনুষ্যের মত মনে করিয়া এই বিপদ্ উপস্থিত করিয়াছে। রোমক-রাজ্য-বিনাশের অবিনশ্বর-ইতিহাস-রচয়িতা শ্রীমান্ গিবন্ মুসলমান্ ধর্ম্মের বিষয়ে যে নিম্নলিখিত কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন, নিরপেক্ষ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা প্রধান প্রধান অনেক বিষয়েই তাহা নিয়োজন করিতে পারেন।

"They struggle with the common difficulties, how to reconcile the presence of God with the freedom and responsibility of man; how to explain the permission of evil under the reign of infinite power and infinite goodness."
[*Gibbon*, 1820: vol. IX. chap. L. p. 263.

"পরামর্থ-পরায়ণ ভক্ত লোকের মধ্যেও কেহ লিখিয়াছেন,—

"To think that God is, as we can think him to be, is blasphemy"

"আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ মনে করিতে পারি, তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া বিবেচনা করিলে, তাঁহার নিন্দা করা হয়।

"A God understood would be no God at all."

"ঈশ্বর যদি বুদ্ধিগম্য হইলেন, তবে তিনি আর ঈশ্বর নন।

"উপনিষদ্-কর্ত্তারা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় এক এক বার স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন।*

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

—[তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ব্রহ্মবল্লী, ৯ শ্রুতি।]

"যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য ও মন নিবৃত্ত হয়।

"যিনি মনে করেন, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তলবকার ঋষি তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন,—

'যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং।'

—[তলবকরোপনিষদ্, ৯।]

"যদি মনে কর, আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপ জানিয়াছি, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মস্বরূপ অল্পই জানিয়াছ।

"ফলতঃ অবিজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্বকারণের অতলস্পর্শ স্বরূপ-সাগরের তলস্পর্শ করিতে পারি, এরূপ মনে করিতেও নাই। অন্য এক জন অনির্ব্বচনীয় বিশ্বকারণকে নির্ব্বাচন করিতে গিয়া তদর্থ অপরাধ-মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়াছেন।

'রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতম্
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরো! দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ-যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥'

"তোমার রূপ নাই, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপ বর্ণন করিয়াছি; বিশ্বগুরু! স্তুতি করিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় স্বরূপের খণ্ডন করিয়াছি; এবং তীর্থ-যাত্রাদি করিয়া তোমার সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব গুণের নিরাকরণ করিয়াছি। অতএব জগদীশ! আমার সেই বিকলতা নিবন্ধন তিনটি অপরাধ মার্জ্জনা কর।

"কিন্তু যদিও বিশ্বকারণ অজ্ঞেয়-স্বরূপ, তাহার সন্দেহ নাই, তথাচ সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়া একেবারে

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগের উপক্রমণিকা. ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।

নিরস্ত থাকা উচিত নয়। তাহাতে স্থির-নিশ্চয় হইবার উদ্দেশে যত দূর সাধ্য, জানিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। **জ্ঞানাচল আরোহণ করিতে করিতে যখন শিখরদেশ তিমিরময় কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন দেখিবে, তখন জানিবে, আর আরোহণ করিবার অধিকার নাই।**

"Man is not born to solve the mystery of Existence; but he must nevertheless attempt it, in order that he may learn how to keep within the limits of the Knowable."—[*Goethe.*]

"সাকারবাদীরাও সদসৎ পাঁচ কথা বলিতে বলিতে এক একটি অতি প্রধান কথা বলিয়া বসেন এবং কখন কখন বিশ্ব-কারণকে সুস্পষ্ট রূপে **অজ্ঞেয় ও অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ** বলিয়া উল্লেখ করেন।

'কে জানে কালী কেমন। ষড়্ দর্শনে না পায় দর্শন। * * * * প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন। আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধোর্বে শশী হোয়ে বামন।'—[রামপ্রসাদ।]

"ঈশ্বরের স্বরূপ বাক্য-মনের অগোচর, বিশুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে এটি অতীব সহজ কথা। তবে তাঁহার শারীরিক বা মানসিক রূপ কল্পনা করিয়া প্রাচীন বয়সেও ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া বাল্যামোদে আমোদিত থাকিলে আর উপায় কি?"*

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা. ৪৮—৫১ পৃষ্ঠা দেখ।

দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এক ব্যক্তি এই অক্ষয় বাবুকে বিনা প্রমাণে পৌত্তলিক বলিতে সাহস করিয়াছেন।

৭।—উল্লিখিত মতটীকে বিশেষরূপে আলোচনা করিলে, পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরের কোন কোন স্বরূপ-সম্বন্ধে অক্ষয় বাবু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার অস্তিত্বে কোনই সংশয় করেন নাই। অক্ষয় বাবুর জীবনচরিত প্রচারের পর অনেকে আমাকে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস কি, জিজ্ঞাসা করেন। আমিও অক্ষয় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি, "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ২য় ভাগের উপক্রমণিকার ১, ২ ও ৪৮ হইতে ৫১ পৃষ্ঠার মধ্যে যাহা লিখিত হইয়াছে, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহাই আমার মত।" *

৮।—এক দিন বালিতে তাঁহার শোভানোদ্যানে ভ্রমণ করিতে, করিতে আমি একটী হরিদ্বর্ণ তৃণের উপর একটী শ্বেত রেখা, তৎপরে হরিদ্বর্ণ, পুনরায় শুক্ল রেখা, আবার হরিদ্বর্ণ—একত্র এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য সমাবেশ দেখিয়া সমীপস্থ অক্ষয় বাবুকে বলিয়াছিলাম, "যেন এক জন মানুষে এক বার সাদা কালী দিয়ে রুল টেনেছে, আর এক বার সবুজ কালী দিয়ে রুল্ টেনেছে।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মানুষের সাধ্য কি ওরূপ কৌশল দেখায়।" তাঁহার ভাব ভঙ্গীতে তখন আমার মনে হইল, ঈশ্বরই উক্ত তৃণের সৌন্দর্য্যবিধানকর্ত্তা ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

৯।—অক্ষয় বাবুই ব্রাহ্মধর্ম্মে বৈজ্ঞানিক তত্বপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম করেন।

* উদ্ধৃতি চিহ্নের অন্তর্গত বাক্যগুলি অক্ষয় বাবুর মুখের কথা।

ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে হইলে, সেই বৃত্তান্ত আদ্যন্ত জানা উচিত, এই কারণে মদ্রচিত অক্ষয় বাবুর জীবনবৃত্তান্ত হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত হইতেছে,—

"ইহার পর ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত আর একটি মত প্রবর্ত্তিত করিবার মানস করিয়াছিলেন! বিজ্ঞানই প্রকৃত নিশ্চিত জ্ঞানের আকর, সুতরাং বিজ্ঞান-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যের কার্য্যের নিয়ামক হওয়া উচিত। তদনুযায়ী কার্য্য করা বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম পণ্ডিত-কুলের স্থির নিশ্চয় হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি কোন দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবম্ভূত উচ্চ মত সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মত শিক্ষিত-সমাজে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান-বলে পরাভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতেছে। বিজ্ঞান-প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বার বার কম্পমান হইয়াছে। কম্পমান কেন? বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম শিক্ষিত সমাজের অসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে বিজ্ঞানেরই অধীনত্ব অঙ্গীকার করিয়া এবং স্ত্রীলোক, অশিক্ষিত লোক ও অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি অন্য লোকের শরণাপন্ন হইয়া কোন রূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত ও অবনি-মণ্ডলের হিতগর্ভ মহোপকারক হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মেরা বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনার, আত্মপরিজনের, স্বদেশীয় জনসমাজের ও সমগ্র মানব-কুলের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বাংশে ভূলোকের হিত-সাধন করাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা ও আপনাদের প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাই ইহাঁর অভিপ্রেত। এই হেতু ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-গ্রন্থই প্রকৃত ধর্ম্ম-গ্রন্থ বলিয়া অক্ষয় বাবুই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন। ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন কথা ইনিই বিশেষ করিয়া ঘোষণা করিয়া দেন। অতএব যখন বিশ্ব-গ্রন্থই ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম-পুস্তক, তখন বিজ্ঞানই সেই পুস্তকের প্রকৃত জ্ঞান। বিজ্ঞান-গ্রন্থই তাহার ব্যাখ্যা-পুস্তক। বিজ্ঞান-সিদ্ধ, প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, এই বিষয়টি স্বতন্ত্র পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবেন, মনে করিয়াছিলেন। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনের শেষ-ভাগে তদ্বিষয়ে নিদর্শন রহিয়াছে,—

'ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক (বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার) অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও, তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর, তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক তৎসমুদয় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এ পর্য্যন্ত কত প্রকার নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে

যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল। অতএব এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অভিপ্রায় সকল অবলম্বন পূর্ব্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে ও অন্য লোকদিগকে তৎসমুদায়ের উপদেশ প্রদান করিতে যত্নবান্ থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত।'—[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন।]

"ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, 'ইঁহার মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম।'* ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মত ও সাধনাটি প্রকৃতরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলে ব্রাহ্মধর্ম্মের যার পর নাই গৌরব ও মহিমা বৃদ্ধি পাইত, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অক্ষয় বাবু বিদ্যালয়ে প্রবৃত্ত হইয়াই যে সামান্য ইংরেজী কাব্য অধ্যয়ন করেন, তাহাতে লিখিত আছে, মনুষ্যের উপকার করিলেই ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়।

"Let gratitude in deeds of goodness flow :
Our love to God, in love to man below."
(Poetical English Reader, No. I., P.3. 1884.)

"এই কথায় ইঁহার এমনই প্রতীতি ও প্রীতি জন্মিয়া গেল যে, তদবধি ইহা ইঁহার অন্তঃকরণে চিরদিনের মত অঙ্কিত হইয়া রহিল এবং উত্তরকালে একটি প্রকৃত মত হইয়া দাঁড়াইল। মহাত্মা রামমোহন রায় যে মহার্থকর পারসীক বচনটি সচরাচর আবৃত্তি করিতেন†, সেই বচনে এবং পশ্চাল্লিখিত মহাভারতীয় বচনে যে মহোচ্চ পরম ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, ইঁহার মতে তাহাই প্রধান ধর্ম্ম ও তাহাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা।

'ন হীদৃশং সংবননং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্॥'

"ত্রিভুবনে প্রাণিগণের প্রতি দয়া-প্রকাশ, বন্ধুভাব দর্শন, সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ এবং দানানুষ্ঠান এই সমুদায়ের সদৃশ ঈশ্বর-উপাসনা আর নাই।

"অক্ষয় বাবুর মত এই যে, যাহাতে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির যুগপৎ সমুন্নতি সাধন হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত, এবং সেই সমুদায়কে আপনাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মগণের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বা পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম-পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ও তৎসংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করা বিধেয় এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ে তদনুযায়ী-প্রণালী প্রচলন করা আবশ্যক। ভৌতিক-নিয়ম-লঙ্ঘনে ভৌতিক পাপ, শারীরিক-নিয়ম-লঙ্ঘনে শারীরিক পাপ, আর বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনে মানসিক পাপ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ ভৌতিক নিয়ম-পালনে ভৌতিক ধর্ম্ম, শারীরিক-নিয়ম-পালনে শারীরিক ধর্ম্ম এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক নিয়মপালনে মানসিক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনও কি এই অত্যুদার প্রধান ভাব গ্রহণ করিয়া সকল ধর্ম্মের শিরোরত্ন হইতে পারিবেন? বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার গ্রন্থের উপসংহারে এই বিজ্ঞান-সম্মত বিশুদ্ধ অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে,—

* * * "তিনি (জগদীশ্বর) যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থা-

---

* নববার্ষিকী, ১২০ পৃষ্ঠা।

† "মানব কুলের হিত সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা।" ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।

পন করিয়াছেন, সেই সমস্ত পরিপালন করা ব্যতিরেকে আমাদের দুঃখ-সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক সুখরূপ সুরম্য-দ্বীপ-সমাগমনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম-পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনই অধর্ম্ম; অতএব, তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবহারই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য। অতএব কোন প্রকার নিয়ম-পালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি সাধনে সমুদায় কাল ক্ষেপণের মানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্ত্তা, এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। অতএব তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

"যদিও বিশ্ব-নিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং সেই সমুদায়েরই উপরে আমাদের সুখ-সম্ভোগ অধিক নির্ভর করে। আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তেজস্বিনী হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থাকিবে, সংসারে দুঃখপ্রবাহ ততই মন্দীভূত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

* * * "ইহা যথার্থ বটে যে, এক্ষণে জন-সমাজে যেরূপ বিরুদ্ধ রীতি-নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থোক্ত যথার্থ তত্ত্বানুগত সমুদায় ব্যবহার সম্পাদন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নয় যে, কোন কালেই ভূমণ্ডলের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না। জ্ঞান-প্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্যবহার শুদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

"জন-সমাজস্থ প্রভুত্বশালী লোকদিগের যে প্রকার স্বভাব থাকে, তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ, সহমরণ ও বলিদান আরব্ধ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি-সংস্থাপকদিগের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি প্রবল ও উপচিকীর্ষা-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল ছিল। যে সকল জাতি যুদ্ধ-নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের সুখ-সচ্ছন্দতা-বর্দ্ধনার্থে অল্প ব্যয় করিতে কাতর হয় এবং অর্থোপার্জ্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি-সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগ-শূন্য থাকে, তাহাদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জ্জনস্পৃহা যে,—উপচিকীর্ষা, ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণকার অনেক জাতীয় লোকেরই ঐ প্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন করা, অবশেষে তদনুযায়িনী রীতি নীতি সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

* * * "এইরূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই সত্যস্বরূপ জ্যোতিঃ-প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচার-সংস্থাপনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ী ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা, ধর্ম্ম, সুখ ও সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল তেজস্বিনী হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব যে সকল নিয়ম পরমেশ্বরের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভদায়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত হইয়া পরিণামে সত্যের জয় হইবে। কোন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে অজ্ঞ লোকে

তাহা সহসা অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না ; কিন্তু তাহা কালক্রমে বিচক্ষণ লোক-দিগের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই,—"[বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচারের দ্বিতীয় ভাগের উপসংহার।]

* * * * "উদার মত ও বিজ্ঞান-সম্মত মতের বিবরণে যেরূপ প্রশস্ত ভাব ও মহৎ অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, অবনিমণ্ডলে পরমার্থ-বিষয়ে অর্থাৎ কোন দেশীয় লোকের ধর্ম্মশাস্ত্রে বা ধর্ম্ম প্রণালীতে সেই উভয় মিলিত করিয়া অত্যুদার, মহোন্নত, সমগ্র মত কেহ কুত্রাপি সন্নিবেশ বা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, এরূপ জানা নাই। ইনিই কেবল ভূমণ্ডলের যাবতীয় প্রচলিত ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ঐ সুপ্রশস্ত তত্ত্ব পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"*

১০।—একবার অক্ষয় বাবুকে আমি পরমেশ্বরের স্বরূপ-বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া, এই উত্তর পাইয়াছিলাম, কেবল"সৃষ্টি-প্রণালীর উপর নির্ভর করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় না। জগতে যেমন অনন্ত দয়ার কার্য্য বিদ্যমান আছে, তেমনই অনেক নিষ্ঠুরতারও দৃষ্টান্ত দেখা যায়।"

১১।—অক্ষয় বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পরম বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি দত্তজের শেষাবস্থার ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অভিপ্রায় কি জানেন? তিনি কহিলেন, "শেষাবস্থায় বহুদিন তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে নাই। নাস্তিকতা লইয়া তাঁহার সহিত আমার যখন বাদানুবাদ চলিত, তখন তিনি সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি অবজ্ঞা না করিয়া আমার তর্কবিতর্ক মনোযোগ সহকারে শুনিতেন।"

১২।—সর্ব্বশেষ প্রমাণ অক্ষয় বাবুর উইল্। উইল্ প্রস্তুত হইবার সময়ে কথা হইল, উইলের শিরোভাগে ঈশ্বরের নাম লিখিতে হইবে, কোন্ শব্দ প্রয়োগ করা যায়। দত্ত মহাশয় "বিশ্ব-বীজ" লিখিতে আদেশ করেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, "বিশ্ববীজ" শব্দের ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ কি? উহার অর্থ জগতের মূল — বিশ্বকারণ অর্থাৎ জগতের আদি কারণ। এ অংশের আর একটু আলোচনা বিধেয়। শিবের ধ্যানে শিবকে "বিশ্ববীজ" শব্দে শৈবেরা অভিহিত করেন। শিবভক্তের পক্ষে শিবই উপাস্য দেবতা—ঈশ্বর। অতএব "বিশ্ববীজ" শব্দে এখানে ঈশ্বরকে বুঝাইবার বাধা কি? অক্ষয় বাবুর মত উত্তরোত্তর কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনুশীলন করিলে তাহা অনুভূত হইতে থাকে। বিচক্ষণ দার্শনিক ও বিজ্ঞানবেত্তারা যে ভাবে ঈশ্বরের আলোচনা করিয়া থাকেন, অক্ষয় বাবুর প্রকৃতি তদ্রূপ, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ে নাস্তিক ও আস্তিক দুই শ্রেণী আছে। অক্ষয় বাবু আস্তিক দার্শনিক ছিলেন। ইহার নিদর্শন তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হইয়াছিল। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বেদবেদান্তাদির ভ্রম বুঝাইয়া দেওয়া সুতীক্ষ্ণ বিশুদ্ধবুদ্ধি বিজ্ঞানবিতের লক্ষণ।

১৩।—দত্ত মহোদয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসার কত দূর বিস্তারিত করিতে উদ্যত ছিলেন, ১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহা অবগত হওয়া যায়।

* মৎপ্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, ১০০ হইতে ১০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ব্রাহ্মসমাজে মত-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কেহই তদপেক্ষা মহান্ উদার মত প্রচার করিতে পারেন নাই, কখনও কেহ পারিবেন কি না, বলা যায় না। ধর্ম্ম-মতালোচনা-উপলক্ষে সেই বৃত্তান্ত পাঠ না করিলে, ধর্ম্ম-বিষয়ে অক্ষয় বাবু ক্রমশঃ কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, বুঝা যায় না, আমার অবলম্বিত প্রবন্ধও অসম্পূর্ণ থাকে; সুতরাং তাহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল।—

"ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নয়। ধর্ম্মবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তর কালে যাহা নির্ণীত হইবে, সে সমুদয়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্ম-তত্ত্ব উদ্‌ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না এবং ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ন্যায় কোন অভিনব বিদ্যার প্রচার দেখিয়াও কম্পিত হই না। আমরা অবনিমণ্ডল সচল শুনিয়াও শঙ্কিত হই না এবং তদর্থে ক্রুদ্ধ হইয়া পিসা নগরীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে নিগ্রহ করিতেও প্রবৃত্ত হই না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই, এবং অধুনা জর্জ্জ্ কুম্ব্ প্রণীত অদ্ভুত পুস্তক প্রচার বিষয়েও প্রতিকূল হই নাই। অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন্ ও লাপ্লাস্ যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্‌ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ, এবং বেকন্ ও কোম্ত্* যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মুসা ও মহম্মদ্ এবং যিশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে কেবলই বৃদ্ধি হইবে এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।"+

১৪।—ব্রাহ্মসমাজে আত্মপ্রত্যয় বা সহজ জ্ঞানের প্রচারও অক্ষয় বাবু কর্তৃক নিষ্পাদিত হয়। ইহাতেও তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি-চেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়। লিওনার্ড বলেন,—

"The theory of intuition was broached in an article headed "Dharma Tatwa Viveka "published in the *Patrika*. It emanated from the pen of Akshaykumar Dutta, who derived his first idea on the subject from the Mundak Upanishad which says: এক-মাত্মপ্রত্যয়সারম্।" —[*Leonard's, History of the Brahmo Somaj, p 93.*]

১৫।—দত্তজ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, তাহার সর্ব্বোত্তম প্রমাণ এই,—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। সাংখ্যপ্রবচন, ৯২ সূত্র।

"কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

*মূল প্রবন্ধে লাপ্‌লাস্ ও কোম্ত্ এই দুইটি নাম সন্নিবিষ্ট ছিল। ইহা যে সময়ে প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ দুইটি শব্দ নাস্তিকের নাম বলিয়া উঠাইয়া দেন ও তাহার পরিবর্ত্তে অন্য দুইটি নাম সন্নিবেশিত করেন, কিন্তু অক্ষয় বাবুর ঐ দুইটি নাম দিবার তাৎপর্য্য এই যে, আস্তিক দূরে থাকুক, নাস্তিকেও যদি বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া এরূপ কোন অভিনব তত্ত্ব উদ্‌ভাবন বা অবিদিতপূর্ব্ব সদভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, তদ্দ্বারা অনির্ব্বচনীয় বিশ্ব-কৌশলের জ্ঞান-লাভ ও মানুষের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন নূতন পথ বা কোন নূতন বিষয় জানিতে পারা যায়, তাহাও আমাদের আদরণীয়। ইঁহার এইরূপ অভিপ্রায় অত্যন্ত উন্নত মনের কার্য্য।"

+ ১৭৭৭ শক, বৈশাখের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অথবা মৎপ্রণীত অক্ষয়বাবুর জীবন বৃত্তান্ত ৯৪-হইতে ৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

"কপিল ঋষির এই নাস্তিকতা-বাদ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে সাংখ্য পণ্ডিতেরা নানারূপ তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন, শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও জগৎ সগুণ অর্থাৎ নানাপ্রকার-গুণ-বিশিষ্ট, অতএব নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ সংসারের উৎপত্তি হইল।

"সাংখ্যাচার্য্যা আহুঃ নির্গুণত্বাদীশ্বরস্য কথং সগুণতঃ প্রজা জায়েরন্।

—[৯২ সাংখ্য-প্রবচনের ভাষ্য।]

'সাঙ্খ্যাচার্য্যেরা বলিয়া গিয়াছেন, নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কিরূপে সগুণ প্রজা উৎপন্ন হইল?

"কোন কোন ব্যক্তি বলেন, জগতে কেহ বা সুখী ও কেহ বা দুঃখী হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে জীবের সুখ-দুঃখের এরূপ বৈষম্য দোষ ঘটিত না। অতএব ঈশ্বর নাই। কিন্তু ঘটিকা যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র, গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইত্যাদি বস্তুতে যেরূপ বুদ্ধি-কৌশল বিদ্যমান আছে, যাঁহারা এই বিশ্বযন্ত্রে তদপেক্ষা শত সহস্রগুণ কৌশল রাশি দর্শন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ বিশ্বকারণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, এবং সেই সমস্ত অদ্ভুত কৌশল অনির্ব্বচনীয় কৌশল-সম্পন্ন নৈসর্গিক আদিম নিয়মের কার্য্য জানিয়া বিশ্ব-নিয়ন্তার অচিন্ত্য মহিমার অতিমাত্র আধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্য পণ্ডিতদিগের উল্লিখিত আপত্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন, ঐ আপত্তি ঈশ্বরের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ বিষয়ে একদিন উত্থাপিত হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব নিরূপণ বিষয়ে কোন রূপেই নিয়োজিত হইতে পারে না।'—[ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ২য় ভাগের উপক্রমণিকা, ১ ও ২ পৃষ্ঠা।]

১৬।—১৮০৮ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়া "ব্রাহ্মসমাজ ও অক্ষয় কুমার দত্ত" নামে যে ক্ষুদ্র পুস্তক ঐ শকের মাঘ মাসে মুদ্রিত হয়, তাহাতে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সভাপতি প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয় বলেন,—

"অক্ষয় বাবু অনেক কাল যাবৎ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া অজ্ঞতাবাদী হইয়াছেন। তাঁহার হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন সপ্রমাণ করা যাইতে পারে।" *

এই উপলক্ষে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা রাজনারায়ণ বাবুর অবলম্বিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের অংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের মত সমর্থন করেন নাই। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দুই খানি আছে। ১২৮৯ সালের চৈত্র মাসে ২য় ভাগ প্রচারিত হয়। এই ভাগের কোনও অংশকে লক্ষ্য করিয়া রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। কারণ, তাহা হইলে "অনেক কাল" ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করা বলা অসঙ্গত হয়। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের ঈশ্বর সংক্রান্ত সমুদায় স্থল আমরা এই প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি। প্রথম ভাগে এবিষয়ে সবিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বলা বাহুল্য।

এক্ষণে এই প্রবন্ধে প্রমাণিত হইল, দত্তজ মহাশয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় করেন নাই; তিনি ঈশ্বরের

* "The Babu long abjured his belief in Brahmoism and turned an agnostic. This change in his opinion could be proved by passages in his work on Hindu sects"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০৮ শক, কার্ত্তিক মাস দেখ।

কোন স্বরূপে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে অজ্ঞতাবাদী বলিলে, তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সংশয় করেন, বলা হয়। রাজনারায়ণ বাবু এমন কথা কেন কহিলেন, জনসাধারণ তাহা বুঝিয়া দেখিবেন। ফলতঃ, অক্ষয় বাবু পূর্ব্বে যেরূপ ব্রাহ্ম ছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও প্রায় সেইরূপ ছিলেন।

দত্তজ মহাশয়ের ধর্ম্মমত কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিলেও, * ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাঁহার আন্তরিক নিগূঢ় প্রেম ছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম সমাজের শুভাশুভ সংবাদ তিনি সর্ব্বদাই লইতেন। যে কেহ তাঁহার সহিত বালিতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, তিনিই এ বিষয়ের সপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য ব্রাহ্মধর্ম্মসংস্থাপক রাজা রাম মোহন রায়ের প্রতি অচলা ভক্তি। রাম মোহন রায়ের প্রতি তিনি কি কারণে শ্রদ্ধা করিতেন? প্রশ্ন করিলে, আমরা দত্ত মহাশয়ের লিপি হইতেই বিনা আয়াসে এই সদুত্তর প্রদান করিব, "ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত রামমোহন রায়ের গুণ কীর্ত্তন করেন। সেই প্রশংসা-বাদ দত্ত মহাশয়ের শেষাবস্থায় লিখিত হয়। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। অক্ষয় বাবুর পরলোক গমনের পর মহানুভব রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক ১৩ নং মৃজাপুরষ্ট্রীটে সেই রচনা যখন পঠিত হইয়াছিল, তখন সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রাজার উপর দত্তজের কি অটল শ্রদ্ধা। দত্তজের জীবৎকালেও রাজার স্মরণার্থ সভায় উহা আরও একবার পঠিত হয়। রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলির প্রকাশক বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ও যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ বি, এল্ মহাশয়েরাও রামমোহন রায়ের প্রতি দত্ত মহাশয়ের এই ভক্তি ভাবের প্রসঙ্গ রাজার শেষ গ্রন্থমধ্যে নির্দ্দেশ করাতে, বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মে অক্ষয় বাবুর অশেষ অনুরাগ ছিল।†

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা (৭ম)

ধর্ম্ম।

মনুসংহিতা হিন্দুদিগের একখানি অতি প্রাচীনগ্রন্থ। ইহা যে সময় রচিত হয়, সে সময় বীর্য্যবন্ত আর্য্যকুল সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সকল স্থান অধিকার করিয়া তদুপরি আপনাদিগের অব্যাহত প্রভুত্ব বিস্তার পূর্ব্বক শান্তি ও নিরাপদে দিন দিন শ্রী ও সৌভাগ্য পদবীতে অধিরোহণ করিতেছিলেন বলিয়া বোধ হয়। মনুসংহিতাকে হিন্দুসভ্যতার প্রথম যুগের ব্যবস্থাপক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের

* অক্ষয় বাবুর কোন কোন বন্ধু কহেন, 'দীর্ঘকাল দুরন্ত রোগভোগ, ঐরূপ মতপরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ।' তাঁহার জ্ঞান পূর্ব্বাপর সমভাবেই ছিল। অতএব ঐ কথা ঠিক নহে।

† ৫১২ পৃষ্ঠার শেষার্দ্ধ ভাগের (2nd column) ২য় পংক্তিতে সর্ব্বশক্তিমান্ স্থলে সর্ব্বজ্ঞ হইবে।

উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সর্ব্বপ্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা ইহা উৎপাদন করেন, তৎপরে তিনি নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে ইহার শিক্ষা প্রদান করেন এবং তাহার পরে তিনি ভৃগু মরীচি প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে এই পরমশাস্ত্র শিক্ষা দেন এবং এইরূপে ইহা ক্রমে ক্রমে মানবমণ্ডলে প্রচারিত হয়। মনুসংহিতার আর একটী নাম মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র, ইহাতে বোধ হয় যে,এই সংহিতা-শাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিরূপণের জন্য মানবমণ্ডলে প্রথম প্রচারিত হইয়াছে। বাস্তবিক রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও আশ্রমনীতি প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাবশ্যকীয় হিতকর বিষয়ের ব্যবস্থাসঙ্কলন পক্ষে হিন্দুদিগের ইহা একখানি আদিগ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদিও বৈদিকবিভাগের মধ্যে শ্রৌতসূত্র গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে আশ্রম ধর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদির ক্রিয়া কলাপ সমূহের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং যদিও সে সকল মনুসংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতর; তথাপি ভারতীয় সভ্যতার প্রথম বিধি-প্রবর্ত্তক বলিয়া হিন্দুগণ ইহাকে প্রথম স্থানে সন্নিবিষ্ট করিতে সঙ্কুচিত হন না। কি বিষ্ণু, কি যাজ্ঞবল্ক্য, কি হারীত অন্যান্য সকল ধর্ম্ম প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের প্রণীত সংহিতা অপেক্ষা মনুসংহিতা প্রাচীনতর, অথবা ইহা সকল সংহিতার অগ্রজস্বরূপ। সেই জন্য হিন্দুগণ ইহাকে সর্ব্বোপরি সম্মান দান করেন এবং সর্ব্বোপরি ইহার প্রভুত্বকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখন আমরা দেখিব হিন্দুদিগের এই পরমপূজ্য পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র কোন্ সময় রচিত হইয়াছে। মনোযোগের সহিত এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে জানা যায় ইহার রচনাকালে আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্যের সীমায় পদার্পণ করেন নাই। কারণ মনুসংহিতাতে বিন্ধ্যাচলকেই আর্য্যদিগের আবাসভূমির দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণ রচনার সময় ভারতের অর্দ্ধাংশস্বরূপ এই বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহাদিগের নেত্রপথে পতিত হয়। এমন কি দক্ষিণাপথ-সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনাতেই রামায়ণের বহু স্থল পূর্ণ হইয়াছে। রামায়ণ রচনাকালে দক্ষিণাপথ নিবিড় অরণ্যমালায় পরিপূর্ণ ছিল এবং তন্মধ্যে অনার্য্যজাতিরা বাস করিত। যাহাহউক মহাভারত পুরাণাদি অপেক্ষা রামায়ণও যে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যখন মনুসংহিতার মধ্যে দক্ষিণাপথের উল্লেখ মাত্রও নাই, কিন্তু রামায়ণের মধ্যে তাহার উল্লেখ, তাহার ভূরি ভাগ পরিদর্শন এবং তৎসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তখন মনুসংহিতাকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর কালের রচিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়া বলেন যে খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে রামায়ণ রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে মনুসংহিতাকে খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর রচিত গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পৌত্তলিক-প্রণালী প্রচলনের পূর্ব্বেও এদেশে মূর্ত্তি পূজা প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দুধর্ম্মের ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে তিনটী দেবতাকে অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পরমপূজ্য আসনে সমাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। সে তিনটী দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব। মূলে এই দেবতাত্রয় যদিও পৃথক পৃথক দেবতা নহেন, কিন্তু সেই

দেবাদিদেব পূর্ণ পরমেশ্বরের বিভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, তথাপি কল্পনাসুলভ মানব বুদ্ধির দ্বারা তাঁহারা এক এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে আখ্যাত হইয়াছেন। কেন না শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে; যথা—

স্থিতিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দ্দনঃ॥
স্রষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণু পাল্যশ্চ পাতি চ।
উপসংহ্রিয়তে চান্তে সংহর্ত্তা চ স্বয়ং প্রভুঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ। ২ অধ্যায়।৬৩।৬৪।

অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই তিন কার্য্যের নিমিত্ত একমাত্র ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি স্রষ্টারূপে সৃষ্টি, পালকরূপে পালন এবং সংহর্ত্তা রূপে অন্তে সংহার করেন। সুতরাং স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহাঁরা ভগবানের সৃজনী, সংহারিণী এবং পালনী এই শক্তিত্রয়ের নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কল্পনাপটু আর্য্যগণ ইঁহাদিগকে এক এক মূর্ত্তিতে পরিণত না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। যে রূপেই হউক ব্রহ্মার দেবত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত বক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! মনুসংহিতাকার পূর্ব্বোক্ত ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মাকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মাকে স্থাবরজঙ্গমাদিসম্বলিত বিশ্বচরাচর এবং ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে মনুসংহিতা রচনাকালে ব্রহ্মার দেবত্ব এমন কি ঈশ্বরত্ব পদ বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন হয়ত অনেকের মনে প্রশ্ন উদিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মা কি তবে বিশ্ব-কারণ পরমেশ্বরের সৃজনী শক্তির মূর্ত্তিমান্ আকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে? ব্রহ্মার দেবত্ব পদের কি আর কোন অস্তিত্ব নাই।

হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা উৎপত্তি, কার্য্য, শক্তি এবং স্বরূপ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়া বেদবর্ণিত একটি অতি সুপ্রসিদ্ধ প্রধান দেবতার সহিত ব্রহ্মার একত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বেদ-বর্ণিত সেই প্রধান দেবতার নাম বিরাট পুরুষ। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত পুরুষ সূক্তে এই বিরাট পুরুষের অসীম মহিমা পক্ষে বহুতর স্তুতিকর রচনা-বলী প্রকটিত হইয়াছে। এই বেদবর্ণিত বিরাট পুরুষের সহিত ব্রহ্মার অভেদত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে যে অনেক যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাবলী নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। যাহাহউক ব্রহ্মা বেদকীর্ত্তিত বিরাট পুরুষের সহিত অভিন্ন পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হউন, আর তিনি বিশ্ব-পতি পরমেশ্বরের শক্তিবিশেষের মনঃকল্পিত মূর্ত্তিমন্ত দেবতাই হউন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র বাদানুবাদ না করিয়া আমরা তাঁহার দেবত্ব ও উপাসনার বিষয়ে দুই একটী কথা বলিতেছি। শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে, তখন বলা বাহুল্য যে বিষ্ণু ও শিবমূর্ত্তি পূজার বহুতর বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মার পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মনু-সংহিতা যখন খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে বলিয়া এইরূপ অনুমিত হয় এবং তন্মধ্যে যখন

ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব পক্ষে ভূয়সী মহিমাবাদ লিপি-বদ্ধ হইয়াছে, তখন তদ্রচনার পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই যে ব্রহ্মার পূজা প্রচলিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময় ব্রহ্মার পূজা যদিও তত বহুল পরিমাণে এমন কি কিছু পরিমাণেও দৃষ্টি গোচর হয় না, তথাপি পুরাকালে এদেশে যে ব্রহ্মার উপাসক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শঙ্করবিজয় নামক সংস্কৃত গ্রন্থে হিরণ্য-গর্ভোপাসক অর্থাৎ ব্রহ্মার উপাসকদিগের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাহারা চতুর্ম্মুখ কমণ্ডলু শ্মশ্রু প্রভৃতি চিহ্নধারী এইরূপ বর্ণনা আছে। তাহা হইলে শঙ্করাচার্য্যের সময় অর্থাৎ অনুমান অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে পূর্ব্বোক্ত উপাসক সম্প্রদায়ের বিদ্যমানতা সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন আমাদিগের দেশে গৃহে অগ্নিসংযোগ হইলে লোকে ব্রহ্মার পূজা করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা আমরা বঝিতে পারিতেছি যে মনুসংহিতা বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময় ব্রহ্মার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তৎপরে তাহার আরাধনা প্রচলিত হইয়া কিছুকাল প্রবল থাকে এবং ক্রমে তাহা বিলুপ্ত অবস্থায় পতিত হইয়া এখন হিন্দুদিগের দৃষ্টিপথে একেবারে অদৃশ্যপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাসে ব্রহ্মার পর শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কত কাল বা কোন্ বিশেষ সময় পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আরাধনা হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা কেহই নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন না। এবং বিষ্ণূপাসনা ও শিবোপাসনাই বা ঠিক কোন্ সময় হইতে আরব্ধ হইয়াছে তাহা বলাও একরূপ অসম্ভব। যাহা হউক শিবোপাসনা যে আমাদিগের প্রচলিত পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রণালী প্রচলনের বহুপূর্ব্বে প্রবলরূপে এদেশে বিদ্যমান ছিল তাহার পক্ষে বহুতর নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রামায়ণ একখানি অতি প্রাচীন গ্রন্থ ইহা প্রচলিত পুরাণ উপপুরাণ সকল অপেক্ষা যে বহু পুরাতন তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই বহু প্রাচীন রামায়ণের মধ্যে শিবপ্রসঙ্গ ও শিবমাহাত্ম্যের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের স্থানে স্থানেও শিবমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভুবনবিখ্যাত কবিকেশরী কালিদাস খৃষ্টীয় চতুর্থ ও ষষ্ট শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা পণ্ডিতদিগের নিরূপণানুসারে একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তলা মেঘদূত এবং কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থে শিবমাহাত্ম্য ও শিবার্চ্চনার কথা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অধিক কি শিব-পার্ব্বতীর গুণকীর্ত্তন ও মহিমাবর্ণন উদ্দেশেই কুমারসম্ভবের একরূপ সৃষ্টি হইয়াছে। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে চীন-দেশীয় সুপণ্ডিত হিউয়েন্‌সাঙ্ ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার সেই সুবিস্তৃত পরমাশ্চর্য্য জ্ঞানগর্ভ ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে তিনি বারাণসী পর্য্যটন কালে অনেকগুলি শিবমূর্ত্তি ও শৈব সম্প্রদায়ী লোক দর্শন করেন। এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালীর উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে ভারতক্ষেত্রের বহুল স্থানে শিবারাধনা প্রচলিত হইয়াছিল। যাহা হউক

বর্ত্তমান কালপ্রচলিত মূর্ত্তি-পূজা অপেক্ষা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই ত্রিমূর্ত্তির পূজা বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীনতর কালে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেবল শিবাদি ত্রিমূর্ত্তি কেন? দুর্গামূর্ত্তি-পূজা-প্রসঙ্গও বহুদিনের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। হিউয়েন্থসাঙ্গের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-বিবরণী মধ্যে এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অযোধ্যা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে এক স্থানে এক দল দুর্গাভক্ত নরঘাতক দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। ঐ সকল দস্যুরা এই বিদেশীয় সুপণ্ডিত তীর্থযাত্রীকে উপাস্য দেবীর নিকট বলিদান দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল! হিউয়েন্থসাঙ্গের ভারত-পরিভ্রমণকাল খ্রীষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে সম্ভাবিত হইলে ঐ সময়ে দুর্গারাধনা প্রচলিত থাকার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীশদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ এরিয়ান নামক গ্রন্থকার ভারতের অনেকানেক বিষয় বর্ণনোপলক্ষে একস্থলে কুমারিকাস্থিত কুমারী নাম্নী একটি শক্তিমূর্ত্তির প্রসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ দেবী মূর্ত্তির নাম হইতেই কন্যাকুমারী সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ দুর্গার অপর একটি নাম কুমারী বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা হইলে ঐ মূর্ত্তিকে দুর্গা-মূর্ত্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং এতদ্দ্বারা ঐ সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে দুর্গারাধনা প্রচলিত থাকার সম্ভাবনাও কথিত হইতেছে। দুর্গাদি মূর্ত্তি পূজাকে ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যবংশীয়দের ধর্ম্মান্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিলে উপরিউক্ত সময়ে প্রচলিত থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় এবং তাহা যুক্তিযুক্তও বটে। বিশেষতঃ হিউয়েন্থসাঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তোল্লিখিত দুর্গাভক্ত দস্যুদিগের প্রসঙ্গে দুর্গামূর্ত্তি পূজা যে অনার্য্যজাতীয় লোকদিগের ধর্ম্ম, তাহা আরও সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালীর অনেকাংশ আদিম অধিবাসী অসভ্যদিগের ধর্ম্মের উপাদানে গঠিত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, সেই বহু পুরাতন কালপ্রতিষ্ঠিত দুর্গাদি মূর্ত্তির আরাধনাও বর্ত্তমান পৌত্তলিক-পদ্ধতিরূপ বিস্তৃত মন্দিরে অধিকার লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি মূর্ত্তির আরাধনা বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের বেগবান্ প্রচণ্ড প্রবাহের নিকটে এ সকল তাদৃশ প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি স্থাপনে সমর্থ হয় নাই, অমনি জীবন্মৃতাবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের বিদ্রাবিত কাননে অবস্থিতি করিতেছিল বলিয়া বোধ হয়। তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবে যখন বিলুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম ভারতক্ষেত্রে সতেজে পুনরধিকার বিস্তার করিতে লাগিল, তখন সেই জীবন্মৃত শ্লথমূল বৃক্ষ সকল একে একে সতেজ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া হিন্দুদিগের ঝটিকা-বিলোড়িত শ্রীহীন ধর্ম্মোদ্যানকে পরিশোভিত করিতে লাগিল। অচিরে শিবাবতার স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের প্রতাপে শিবমাহাত্ম্য ও শিবারাধনা বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইতে লাগিল; নির্জ্জীবকল্প শৈবধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত হইয়া বিশাল ভিত্তির

উপরে আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিল। এইরূপে শৈবধর্ম্মের বহুল প্রচারের পর রামানুজ রামানন্দ প্রভৃতি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণু-মাহাত্ম্য ও বিষ্ণূপাসনা প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরধিকার দ্বারা, সকল প্রকার মূর্ত্তি পূজার আধার স্বরূপ শৈব বৈষ্ণবাদি সকল ধর্ম্মের আশ্রয়ীভূত বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত এই পৌত্তলিক পদ্ধতির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয়লাভরূপ প্রকাণ্ড প্রবাহকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালীর একরূপ মূলস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিলে আমাদিগকে কিছুমাত্র অযুক্তি বা অসঙ্গতদোষে দূষিত হইতে হয় না।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ-মহিলা।

(মথুরা।)

২৬এ ফেঃ প্রত্যুষেই আমরা সুন্দর আগ্রাপুরী পরিত্যাগ করিয়া মথুরাভিমুখে যাত্রা করি।

আগ্রার গাড়ী ত্যাগ করিয়া আমরা যখন হাট্রাসে মথুরার টেুনে চড়িলাম, তখন ঊষার সুখময়ী মূর্ত্তি, তরুণ তপনের মধুর হাস্য পূর্ব্ব গগণ অনুরঞ্জিত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে আশার তরঙ্গ তুলিয়া দিল। সেই শোভা আবার প্রভাতিক বিহঙ্গের কলকণ্ঠ স্বরে আরো দ্বিগুণতর ঘনীভূত হইয়া যেন অভিনব প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে দীপ্তি পাইতে লাগিল। এমন শান্তিময় সুখ-প্রভাত দর্শন মনুষ্যের ভাগ্যে অতীব দুর্ল্লভ। মথুরা যাইবার পথে বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্রে মৃগ শিশুগণ কোথায় বা নির্ভয়ে শুইয়া আছে, আবার কোথায় তাহারা চকিতে চাহিয়া, শব্দমাত্র শ্রবণে অদৃশ্য হইয়া যায়। এই আছে এই নাই, কেমন মনোমোহন দৃশ্য! ইহা দেখিয়া অতীত কালের পবিত্র তপোবনের চিত্র মানসক্ষেত্রে সমুদিত হয়। জীবনের এ সুখস্বপ্ন, বাস্তবিক স্বপ্ন নহে। যিনি এ দৃশ্য, এমন প্রভাত কখন নয়ন ভরিয়া দেখেন নাই, তাঁহাকে আর কি বলিব? আমি জীবনের অনেক প্রকৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির মধ্যে এ স্মৃতিও হৃদয়ে সযত্নে রক্ষা করিব।

হাট্রাসে মথুরা যাইবার জন্য যে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম, তাহাকে বাষ্পীয় শকট না বলিয়া গজেন্দ্রগামী বণিকপোত বলিলে ঠিক হয়। এই ট্রেণ কখন চলিবে, কখন থামিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। গাড়ী যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন পথিক-গণ ইচ্ছানুসারে তাহাতে উঠিতে লাগিল। কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না, করিলেও কথা গ্রাহ্য করিতে কেহ স্বীকৃত হয়

না। কোন নিয়মও নাই, যাহার যাইচ্ছা সে তাই করে। ধূমপানের ধূম ত সীমা নাই। তামাক খাইবার জন্য যেই গাড়ী থামান হইতে লাগিল। আরোহণ ইহাকে যেন স্বকীয় বাসভবন মনে করিয়া সেইরূপ ব্যবহার করিয়া নামা উঠা জল যোগ ইত্যাদি করিতে করিতে চলিল। গরিব আমরা কেবল অধৈর্য্য হইয়া পড়িলাম। ইহার পরিচালকগণ হিন্দুস্থানী। এ গাড়ীর সহিত ইংরাজ কি ফিরিঙ্গীর সহিত কিছুমাত্র সংশ্রব নাই, সুতরাং দৌরাত্ম্য কি অপমান কাহাকেও সহ্য করিতে হইল না, তবে সেই মৃদু-মন্দবাহী গজেন্দ্র-গমন আমাদের খুব প্রীতিকর বোধ হয় নাই।

আমাদিগের গাড়ীর পার্শস্থ কক্ষে কতকগুলি ইংরাজীনবিশ হিন্দুস্থানী উঠিয়াছিল। তাহাদিগের হাব, ভাব, কথাবার্ত্তা সমুদায়ই অদ্ভুত। এমন জন্তু বিশেষ মনুষ্য দর্শন আমার কপালে পূর্ব্বে বড় ঘটে নাই। আমি তাহাদিগকে কি বলিয়া ডাকিব, ঠিক করিতে পারি না। মনুষ্য যে এইরূপ ঘৃণার পাত্র হইতে পারে, ইহা দেখিয়া আমার মনে অনুকম্পারও উদয় হইল না। অন্য যাত্রীগণও প্রকাশ্য ভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কলহের চেষ্টায় ছিল। তাহারা একটু ইংরাজী জানে, বোধ হইল বাঙ্গালাও আধ আধভাবে একটু আধটু কহিতে পারে। কিন্তু "little learning is a dangerous thing" এই প্রসিদ্ধ বাক্য তাহারা সপ্রমাণ করিয়া আরোহীদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিল। আরোহীগণের সৌভাগ্যবশতঃ গাড়ী খানিক পথ যাইতে না যাইতেই এক জন বৃদ্ধ পরিব্রাজক পথিমধ্যে এই গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। তাঁহার পবিত্র সৌম্য মূর্ত্তি ও স্থির দৃষ্টিতে কেমন যেন অপার্থিব ভাব। সে স্নেহময়, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া প্রত্যেকেই ভক্তিভাবে তাঁহাকে অযাচিত অভিবাদন করিল। তিনিও হাস্যমুখে সংস্কৃত ভাষায় সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই বন্যব্যক্তিরা প্রথমে একটু পরিহাসের চেষ্টায় ছিল। কিন্তু তাহাদিগের সে চেষ্টা সুবিধামত হইল না। জীবন্ত পবিত্রতা পাপীর হৃদয়েও পুণ্যের শান্তিবারি ঢালিয়া দেয়। সে হাস্যের হিঃ হিঃ বিকটশব্দ, বক্রোক্তির চাতুরী, এবং পাণ্ডিত্য-প্রকাশক গর্ব্বিত ভাষা কোথায় যেন উড়িয়া গেল, অবিলম্বে সমস্ত নিস্তব্ধ শান্তিপ্রদ ভাব ধারণ করিল।

সচরাচর আমরা পথে ঘাটে যে সকল সন্ন্যাসী দেখিতে পাই, আমি যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি সে রূপ সন্ন্যাসী নহেন। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে প্রকৃত সন্ন্যাস বলে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়া পরমার্থ চিন্তায় নির্ব্বাণ ধর্ম্মে এবং জ্ঞান বিতরণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। "সদন্নে বা কিদন্নে" তাঁহার সমান প্রীতি, "লোষ্ট্র" ও "কাঞ্চন," তাঁহার নিকট একরূপ। শীত প্রধান দেশে শরীর রক্ষার্থে ও লজ্জা নিবারণ করিতে পরমহংসের পক্ষে যে প্রকার গৈরিক বসন সাজে, তাঁহারও তাই ছিল। একখানি কম্বল এবং তাল পত্রের একটা ছত্র তাঁহার জীবনের প্রয়োজনীয় স্বরূপ সঙ্গে আছে, দেখিলাম। তিনি দ্বারকা হইতে মথুরায় জনৈক সন্ন্যাসীর মঠে শাস্ত্রীয় বিচারের মীমাংসার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া শিষ্যসহ যাইতেছেন, শুনিলাম।

সোঁ, সা, করিতে করিতে কোন প্রকারে চলিয়া থামিয়া, অতি কষ্টে আমাদিগের গাড়ী বেলা ১০ ঘটিকার সময় মথুরা আসিয়া পৌঁছিল, অমরাও সুপ্রসন্ন মনে নামিয়া নিস্তার পাইলাম।

রৌদ্র তখনি চারিদিকে চনচন করিতেছে, আমরাও সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং পরিশ্রান্ত। অশ্বযান সহরে প্রবেশ করিল, আমরা বাসা খুঁজিয়া লইবার জন্য এদিক ওদিক একটু করিতে লাগিলাম, বেশিক্ষ কষ্ট পাইতে হইল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুসংখ্য পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগের গাড়ী ঘেরিয়া ধরিল এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ পূর্ব্বে কেহ কখন মথুরা গিয়াছিলেন কিনা, তাহাই জনে জনে খাতা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অতগুলি লোকের খাতার নামাবলী শ্রবণ করিবার ধৈর্য্যবল ও সৌভাগ্য না থাকায়, তাহারা আমাদিগকে ক্রমে মুক্তি দিয়া চলিয়া গেল। কেবল তিনজন মাত্র পাণ্ডা আমাদের গাড়ীর বাহিরে চড়িয়া একটী অতিসুন্দর প্রস্তরের বাড়ীর সম্মুখে আনিয়া সেই বাটীতে বাসা স্থির করিয়া দিল। আমরা যমুনার নিকটে একটী বৃহৎ প্রশস্ত দ্বিতল বাটীর একদিক ভাড়া লইলাম; তার অন্যদিকে মথুরার মুনসেফ বাবু সপরিবারে ছিলেন। পাণ্ডাঠাকুরেরা আমাদিগের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃত মিষ্টান্ন প্রভৃতি হিন্দুর আহারীয় সামগ্রী আনিয়া দিয়া, মাছ মাংস আমিতে নিষেধ করিয়া, তখনকার জন্য বিদায় হইলেন। তাহাদিগের মুখে গল্প শুনিলাম, কলিকাতা হইতে কয়েক জন ব্রাহ্ম নাকি মথুরায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন ও আমরা যে বাসায় ছিলাম, তাঁহারাও সেইখানে ছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামীর অমতে স্বাধীনতা প্রকাশার্থে গোপনে অনেক মাংস ও পলাণ্ডু খাইয়াছিলেন। সেই সব গৃহকোণে লুকাইয়া রাখাতে ধরা পড়িয়া শেষে অপমানিত হইয়া বাসা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আরো অনেক শোচনীয় দুঃখের কথা আমাদিগের কাণে আসিল। কিন্তু তাহা বিশ্বাস না করিলেও তাঁহাদিগের ব্যবহারের জন্য আমাদিগের একটু কষ্ট পাইতে হয়। আমরা যেন, রুষভীত ইংরাজ-রাজ্যে ছদ্মবেশী গুপ্তচরবৎ সন্দেহের ছায়ায় "নজরবন্দী" পাহারায় রহিলাম।

মথুরার পাণ্ডাগণের আত্ম-পরিচয়ের রহস্য সহসা ভেদ করা কঠিন। তাহারা যাত্রীগণের নিকট আসিয়া বলে "আমরা সাড়ে চারিভাই" কেহ বা "আড়াই" "দেড় ভাই"। ইহা না বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, আমরাত "সাধু সাধু সাড়ে পাঁচ ভাই" বুঝিতে পারি নাই। কাজেই ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয়। অবিবাহিত ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না, সুতরাং যে ভাইরা বিবাহিত তাহারা পূর্ণ ও তাহাদিগের মধ্যে যাহার বিবাহ হয় নাই, সে অর্দ্ধেক। আমাদিগের ভাগ্যে "সাড়ে পাঁচ ভাই" জুটিয়াছিল। এই অর্দ্ধাঙ্গটী বড় সুশীল, মিষ্টভাষী ও প্রিয়দর্শন। তাহাকে ধনীর গৃহের যত্ন-পালিত বালক বলিয়া বোধ হয়। সংসারের কোন চিন্তা নাই, লেখা পড়ারও ধার ধারে না, "লাড্ডু পুরী" মিষ্টান্ন পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়া স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া বেড়ায়। তবে বাঙ্গালী বালকের সহিত ইহার শারীরিক বিভিন্নতা অনেক,

তাহাদের মত, ইহারা রুগ্ন দুর্ব্বল ও ম্যালেরীয়া প্রপীড়িত নহে। ইহারা প্রত্যহ নিয়মমত দুইবেলা ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া থাকে। কুস্তীর "আড্ডা" আছে, সেখানে অধিক কাল অতিবাহিত করে এবং কুস্তীতে সুশিক্ষিত হইলে কখন কখন গোয়ালিয়ার হোলকার প্রভৃতি মহারাজ সদনে আত্মবলের পরিচয় দিয়া সম্মানের সহিত পুরস্কার লইয়া আইসে।

মথুরা দেখিতে বড় পরিপাটী। পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও কোন স্থানে ময়লা নাই। কংসরাজ-রাজধানী মথুরা, ঠিক রাজধানীরই মত সুন্দর। মথুরায় কেমন একটী শান্তিময় শোভা ও নির্জ্জনতা দেখিলাম, ইহা আমার মনের সঙ্গে ঐক্যতানে নীরবে মিলিয়া গিয়াছিল। আমি মথুরা গিয়া কেমন যেন এক স্মৃতি-স্বপ্নে ডুবিয়া গিয়াছিলাম, কেবল মুক্ত গবাক্ষে দাঁড়াইয়া চারিদিকের শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম, এবং যমুনার কল কলনাদে আমার স্মৃতিমগ্ন হৃদয় ঘুমাইয়া যাইত। কল্পনায়, স্মৃতিতে, ও আশার চিন্তাতে দিন কাটাইতাম, প্রবাসের শূন্যতা তত অনুভব করি নাই। মথুরাবাসী স্ত্রী পুরুষগণ প্রায়ই গৌরাঙ্গ ও সুস্থ। তাহাদিগের শিশু-সন্তানগুলি এমন সুশ্রী এবং সবল যে, দেখিলেই সাদরে কোলে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করে। পাণ্ডাদিগের সুন্দর সুন্দর বালকগণ পরিষ্কার পরিচ্ছদে দেবালয়ের পথে পথে দাঁড়াইয়া, আধ আধ ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষায় "দাদা দিদি" বলিয়া ডাকিয়া যখন সামান্য পয়সা ভিক্ষা চাহে, তাহাতে কেমন মায়া হয় ও কিছু না দিয়া থাকা যায় না। একটী স্বর্ণ মুদ্রায় লোকের যত আহ্লাদ না হয়, একটা পয়সা মাত্র পাইলে ইহারা ততোধিক আনন্দিত হইয়া থাকে। 'ব্রজবাসী' মধুর কণ্ঠে গাইয়া এবং যাত্রীগণের সম্মুখে করতালি দিয়া যে নৃত্য করে, তাহা দেখিতে আমোদ আছে।

ধনবান ব্যক্তি পুত্রহীন হইলে, সকল দেশেই পোষ্যপুত্র রাখিবার নিয়ম আছে, কিন্তু বাঙ্গালীগণ যেরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী, তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সংস্কার করা আবশ্যক। এই সকল ব্রাহ্মণ বালকগণকে নিঃসন্তান ধনী বাঙ্গালীরা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া সুশিক্ষিত করিলে, ও প্রাপ্তবয়সে বাঙ্গালী বালিকাদিগের সঙ্গে বিবাহ দিলে সময়ে বেশ বলবান ও স্বাস্থ্যপূর্ণ সন্তান জন্মিতে পারে, এবং তাহাতে খুব উপকার হইবার সম্ভাবনা। সমাজ-সংস্কারকগণ এই বিষয়ে চেষ্টা করিলেও সমাজের পক্ষে একটী স্থায়ী উপকার করিতে পারেন। বাল্যবিবাহ উঠাইলে, ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিলে যেমন সামাজিক মঙ্গল, তেমনি বঙ্গবাসীর স্বাস্থ্য সংস্কার এইরূপে করিতে পারিলেও উপকার আছে। আমাদিগের সমাজে অদ্যাপি রাঢ়ী বারেন্দ্রর মধ্যে পর্য্যন্ত বিবাহপ্রথা প্রচলিত না থাকাতে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের যে কত কষ্ট সহিতে হয়, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাতে আবার পাশকরা ছেলের উৎপাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। আমাদিগের দেশহিতৈষীগণ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি কেন মনোযোগ দেন না, তাহা দুঃখের সহিত বুঝিতে পারি না। কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে সামাজিক অশেষ দুর্গতি যাইবে না। আর সমাজ-সংস্কারক মহাশয়েরাও অসবর্ণ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য এত চিন্তা ও যত্ন না করিয়া অগ্রে সবর্ণে

সবর্ণে ঐপ্রকার বিবাহ দিবার চেষ্টা ও আন্দোলন করিলে সামাজিক কল্যাণ সাধন করা হয়।

মথুরায় অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে বাস করেন ও তাঁহাদের সহবাসে পাণ্ডাগণ বেশ "চলন সই" এক রকম বাঙ্গালা কথা কহিতে শিখিয়াছে। তাহাদিগের সে আধভাঙ্গা বাঙ্গালা আমার নিকট ভাল লাগিত। আহারাদি করিয়া আমরা সেই দিন বৈকালেই মথুরার বিগ্রহগণ দর্শন করিতে বাহির হইলাম। মথুরায় বেশ গাড়ী পাওয়া যায়, তবে তাহার ভাড়া কিছু অধিক। বাসা ছাড়িয়া প্রথমে আমরা "কংস-খেড়া" ও "রণভূম্" দেখিতে গেলাম। এক পাণ্ডা আমাদিগের সহিত থাকিয়া "গাইডের" কাজ করিতে লাগিল। প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে যখন মথুরাতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করা হয়, কিন্তু বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ, সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে কংস-রাজকে বিনাশ করিলেন এবং পরিশেষে স্বয়ং মথুরার রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহা-দিগের সেই সমরাঙ্গণের নাম "রণভূম্"। অতি ছোট একটু জমী, চারিদিকে ছোট ছোট গাছ, চারিজন লোক একত্র হইলে তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। কোন কালে সেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহা কেহ না বলিয়া দিলে কল্পনাতেও অনুমান করা যাইতে পারে না। "গলিভার ভ্রমণে" "লীলি-পুটীয়ানদিগের" যেরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ কাহিনী আছে, এও বোধ হয় সেইরূপ যুদ্ধ এবং রণভূমি। আবার এই যুদ্ধক্ষেত্রে এক ভগ্ন-মন্দিরে চোক মুখ বিশিষ্ট এক মহা-দেব মূর্ত্তি আছেন। অত্যাচারী কংসরাজা সমরে নিধন প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া রণ-ক্ষেত্রের মধ্য হইতে সহসা এক শিব আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে উঠিয়াছিলেন ও তাহাতেই তাঁহার নাম—"রঙ্গেশ্বর মহাদেও" শুনিলাম।

কংসরাজ রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ও গড়খাই দেখিলে, অদ্যাপি রাজকীয় সম্পদের চিহ্ন রহিয়াছে, দর্শকের মনে হয়। এই ভগ্নরাশির মধ্যে একটী ক্ষুদ্র মন্দির সজীবভাবে দণ্ডায়মান আছে; তাহা অতী-তের হিন্দু মহিলার পবিত্রতার নিদর্শন। প্রবাদ এই যে, এই "সতীমঠে' কংসের মহিষী বাস করিতেন এবং তিনি এই মন্দিরেই পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন ও স্বামীর চিতায় একত্র ভস্মীভূত হন। সেই জন্য তাহার সতীত্বের পবিত্র চিহ্নস্বরূপ এই মঠ, "সতীমঠ" নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে ও ধনকুবের জগৎ শেঠরা তাহা পুনর্ব্বার সংস্কার করাইয়া যান। তাহা-তেই আজিও "সতীমঠ" নূতন অবস্থায় রহিয়াছে যেন বোধ হয়। এই গল্প আমরা পাণ্ডাঠাকুরদিগের মুখে শুনিয়াছি, ও তাহা সত্য কিনা, সে বিষয় অনুসন্ধান করিবার কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। ভাল গল্প, ভাল লাগিল সুতরাং লিখিলাম। ভারতীয় রত্নভাণ্ডারে কত কীর্ত্তিময়ী মহিলার ঐরূপ পবিত্র জীবন-কাহিনী লুক্কায়িত আছে, তাহার খোঁজ কে করিবে? ইতিহাসহীন ভারতের পূর্ব্ব গৌরব এখন হয়ত বিদেশীর নিকট মূল্য শূন্য উপকথা, কিন্তু আমাদের কাছে তাহা নহে।

প্রভাত সায়াহ্নে "মথুরাবাসিনী মধুর হাসিনী শ্যামবিলাসিনী"রা নানা বর্ণের বিচিত্র বসন পরিয়া পুষ্পমালা হস্তে দেব-দর্শনে যায়। তাহাদিগের অবগুণ্ঠনাবৃত সৌন্দর্য্যরাশি মুগ্ধ ভাবে দর্শন করা যদিও প্রবাসীর ভাগ্যে সকল সময় ঘটিয়া উঠে না, তবুও যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে তাহারা যে সুন্দরী, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জন্মে নাই। সাধারণতঃ তাহারা গৌরাঙ্গিনী এবং তাহাদিগের মুখশ্রী বেশ জ্যোতির্ম্ময়। তবে পশ্চিমাঞ্চলের মহিলাগণ প্রায়ই সুকেশিনী নহে। বঙ্গনারীর সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ তাহাদিগের নিকট উপাদেয় এবং হিংসনীয় সামগ্রী। পাণ্ডাগণের প্রমুখাৎ শুনিলাম যে "মথুরাবাসিনীরা" নাকি গৃহকার্য্য করে না, এবং নব্য বঙ্গরমণীর ন্যায় "ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ পড়া" শিখিয়া অসার আমোদে ও তাসক্রীড়ায় এবং আলস্যে জীবন কাটায়। বঙ্গের নব্যগণ কোনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মও করে না, কিন্তু ইহারা দুই বেলা "মথুরানাথ" দর্শন না করিয়া জলগ্রহন করে না, এই প্রভেদ।

আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মথুরার চারি দিকে দেখিয়া আরতির একটু আগে "মথুরানাথ" দর্শনার্থে তাঁহার মন্দিরে গেলাম। কিন্তু তখনি সেই প্রকাণ্ড দেবালয় জন কোলাহলে এবং মনুষ্যমস্তকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটু দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। লোক ঠেলিয়া সেই গোলে মিশিয়া বিগ্রহ দর্শন করা তৎকালে ঘটিল না। কোনরূপে পাণ্ডা ঠাকুরদিগের সাহায্যে সংকীর্ত্তন প্রাঙ্গণে আমরা নিরাপদে একটু আশ্রয় পাইলাম।

দেখিতে দেখিতে দীপালোকে সমুদায় দিবাবৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। গায়কগণ মধুর হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অবিশ্রান্ত কোলাহল থামিয়া সকল নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সেই অসংখ্য প্রাণীবৃন্দ একেবারে নীরবে ভক্তিভাবে হরিপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া স্তব করিতে লাগিল। আর কোন শব্দ নাই, প্রতিধ্বনিও সেই সান্ধ্যসঙ্গীতে মিশিয়া কোথায় গেল, তাহা কে বলিবে। সহসা এই নিস্তব্ধতা ভেদ করিতে বায়ু পর্য্যন্ত সাহসী নহে, সেও আর সে দিকে বহিতে না পারিয়া, হরিগুণে মজিয়া মথুরার দ্বারে দ্বারে পবিত্র গান গাইয়া যেন বেড়াইতে লাগিল। এই অপরূপ দৃশ্যে, এই প্রাণপূর্ণ ভক্তিভাবে ও অলৌকিক সংকীর্ত্তন শ্রবণে আমরা স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এমন ভক্তিভাব, এমন মোহময় আত্মবিস্মৃতি!—প্রতিদিন মথুরানাথের মন্দিরে আসিয়া যাঁহারা ইহা দেখিয়া যান, তাঁহাদের নিকট ইহা কল্পনায় অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। এইরূপ পবিত্র মনোহর কীর্ত্তন আমি ত কখনও শুনি নাই। বৈষ্ণবদিগের তখনকার সেই আনন্দময় ভক্তিপূর্ণ উৎসাহ দেখিলে মনে শান্তির উদয় হয়। জগতে চৈতন্যের পবিত্র ধর্ম্ম, পতিতের আশ্রয় ও পাপীর মুক্তি। সময় ও অবস্থার পীড়নে তাহার সে পবিত্রতা নাই। তথাপি এই আরতির সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে ক্ষণকালের জন্যও পতিত জনের হৃদয়ে পরকালের কথা উদিত হয় এবং হরিনামের মোহে ইহ সংসার ভাসিয়া যায়। এমন ঈশ্বরগান শুনিলে, আমার বোধ হয়, অধম মনুষ্যজীবন তরিয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে

সজ্ঞানে জাহ্নবী সৈকতে শুইয়া যিনি ভক্তি-ভাবে এইরূপ হরিসংকীর্ত্তন শুনিয়া মরিতে পারেন, তাঁর আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

আমরা এখান হইতে আবার "বিশ্রাম ঘাটের" আরতি দেখিতে গিয়া আর এক ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যে ডুবিয়া গেলাম। এই "বিশ্রামঘাটে" শ্রীকৃষ্ণ স্নান করিয়া "বংশী" ও "মোহনচূড়া" রাখিয়া যান এবং সেই জন্য ইহাকে "বিশ্রামঘাট" বলে। এইখানে শত সহস্র ব্যক্তি যুক্ত করে মুদ্রিত নয়নে দাঁড়াইয়া "জয় জয়" শব্দে নিশীথ নীলাম্বর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। রাশি রাশি সুরভিময় কুসুমহার চারিদিক হইতে জলধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে, শাঁক ঘণ্টা এবং বাঁশির রবে যমুনার হৃদয়েও যেন কম্পিত তরঙ্গ উঠিয়াছে। আর কিছু দেখা যায় না, কেবল লোকারণ্য, তাহার মধ্যে শান্তিরক্ষকের গভীর মুখ। প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা নিয়মমত "বিশ্রামঘাটে" আসিয়া থাকে, নতুবা গোল থামাইয়া যাত্রীগণের ও দর্শকের জীবন রক্ষা করা সুকঠিন ব্যাপার।

"বিশ্রামঘাটের" আরতিতে একটু নূতনত্ব আছে। একজন অতি বলবান্ ব্রাহ্মণ উজ্জ্বালিত সহস্র দীপাধার প্রথমে হস্তে লইয়া তারপর বক্ষে তুলিয়া, এবং পরিশেষে মস্তকে করিয়া আরতি করেন। তাহার কৌশলময় আরতি সকলেই মুগ্ধবৎ নেত্রে দেখিয়া ধন্য ধন্য করে। সেই ব্যক্তি এতই লম্বা যে, তাঁর মস্তক এত লোকের মাঝেও প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যায়।

"বিশ্রামঘাটে" আরতির সময় পুষ্প বিক্রেতা রমণীরা ফুলমালা ও দীপ লইয়া সারি সারি বসিয়া থাকে। তাহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে তাহাদিগের মধ্যে রূপে কেহ বঙ্কিম বাবুর "রজনী" কিম্বা লর্ড লিটনের "নিতিয়া"র মত না থাকিলেও তাহারা যে প্রায় সকলেই দেখিতে ভাল তাহা আমি বলিব। কেমন পবিত্রমাখা কোমল মুখে তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত শোভাময় দীপালোকে বসিয়া সলজ্জভাবে যাত্রীগণকে ডাকিয়া মায়াফুল লইতে বলে। সেস্বরে মায়া আছে, ব্যবসার চাতুরী নাই। সে কণ্ঠ কোমলতায় পরিপূর্ণ, বিক্রেতার কপটতা তাহারা যেন জানে না। ফুলমালা স্ত্রী-পুরুষে সকলেই ক্রয় করে, কিন্তু প্রদীপ কেবল স্ত্রীলোকেরাই কিনিয়া প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় যমুনাবক্ষে ভাসাইয়া দেয়। যাহার শুভ উদ্দেশ্যে তাহা ভাসান হয়, দীপ ডুবিয়া গেলে তাহার সমূহ অমঙ্গল। আর তাহা ভাসিতে ভাসিতে দূরে গিয়া অদৃশ্য হইলে কোন অশুভ নাই। আমি কোন দীপ নিমগ্ন হইতে দেখি নাই। নীল যমুনার বক্ষে সেই অসংখ্য দীপমালা যখন ভাসিয়া যায় এবং মৃদুল বায়ুভরে একটু নিবু নিবু হইয়া আবার তখনি জ্বলিয়া উঠে, সে শোভা অপূর্ব্ব ও অপার্থিব। তাহা একবার মাত্র দেখিলে মনুষ্য ইহ জীবনে কখন আর ভুলিতে পারিবে না। আমি যখন অতি ছোট ছিলাম, সেই সময় একখানি সংবাদ পত্রে একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীর একখানি পত্র (বাঙ্গালা অনুবাদ) পড়িয়াছিলাম, তাহাতে যমুনার ঘাটের এই দীপ ভাসাইবার বর্ণনা ছিল এবং তাহা এমন সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছিল যে, আজ কত বৎসর অতীত লইয়া গিয়াছে, তবু আমার সেই শৈশবের স্মৃতি অদ্যাপি সজীবিত রহিয়াছে। আমি নিজে তাহা

স্বচক্ষে না দেখিলেও লিখিবার সময় কল্পনার সাহায্যে সে দৃশ্য এইরূপই অনুভব করিতে পারিতাম, বোধ হয়।

এদিকে আরতির শোভা, আবার অন্য দিকে যমুনার বক্ষে অযুতদীপালোকের উজ্জ্বলতা ও তটভূমে মনুষ্য হস্তে এই সকলের শোভা; এই সকল দৃশ্য একত্র অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে এবং আশা-নৈরাশ্যে কেমন যে হইয়া গেল, তাহা বলিতে পারি না। যমুনাতীর ছাড়িয়া রাত্রে বাসায় আসিলাম, কিন্তু তখন সকলই আঁধার হইয়া গেল, এখন আর কিছু স্মরণ নাই। মনুষ্যের প্রাণের উপর দিয়া যুগ যুগান্তর বহিয়া যায়, তথাপি স্মৃতি জাগরিত রহিয়া অতীতের সমুদায় স্বপ্নবৎ স্মরণ করাইয়া কখন কখন যেন শান্তনা করে। আমার জীবনের অন্য অনেক প্রিয় স্মৃতির মধ্যে এই ভ্রমণের স্মৃতি আর একটী প্রিয় সামগ্রী।

শ্রীমতী নীহারিকা দেবী।

বীর-কাহিনী।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষণজন্মা লুই কসুথের প্রাণ-গত যত্ন ও উত্তেজনায় হঙ্গেরির স্বাধীনতা-সমর বিঘোষিত হইলে তাঁহার এক প্রিয় অনুচরের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমে আত্মোৎসর্গ সন্দর্শনে সমগ্র ইয়ুরোপ বিস্মিত হইয়াছিল। যে মহাসমরে বল-দর্পী, পরাক্রমশালী, ও যথেচ্ছাচারী অষ্ট্রিয়া ভীত, কম্পিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছিল, সেই মহাযুদ্ধে এই মহাবীর কসুথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, ইঁহার নাম আজিও ইয়ুরোপীয় ইতিহাস গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যদি এইরূপ অসাধারণ হৃদয়বান ও অদ্ভুত বীর-গর্ব্ব-সম্পন্ন মহাত্মার গুণ গরীমায় অমর ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত না হইবে, তবে আর কোন্ বিষয় উহাতে স্থান পাইবে? স্বদেশের পবিত্র ললাট হইতে দুর্গন্ধময় কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষালন এবং স্বজাতির কল্যাণ-সাধন-কামনায় পবিত্র মন্ত্রগ্রহণ, মন্ত্রগোপন ও মন্ত্রসাধনার্থ আত্মপ্রাণ বলিস্বরূপ উৎসর্গ করিয়া হৃদয়ের মহান শৌর্য্য প্রদর্শনে তিনি বীর-জগতে অমরত্বলাভ করিয়াছেন। অতি অল্পদিন হইল, এই মহাত্মা বুডা পেস্ত (Buda Pesth) নগরের একটি অনাথ-আশ্রমে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে ইঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইঁহার মহান্ উদ্দেশ্যপূর্ণ ও প্রকৃত কার্য্যময় জীবনের যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই প্রিয় পাঠক-সমাজে সাদরে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই বীরপুরুষের নাম ফেরেঙ্স্ রেনিএ (Feroncz Renyi)। ইঁহার পিতা মাতার তাদৃশ উন্নতির অবস্থা ছিল না; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই সুশিক্ষিত ও ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। ইঁহাদের আদর্শে পুত্র বাল্যকাল হইতেই সুবোধ, সচ্চরিত্র, উৎসাহী, পরিশ্রমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং

অল্পবয়সেই সুশিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছিলেন। বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন ও চরিত্র সংগঠন পক্ষে তিনি তাঁহার উন্নতমনা স্নেহময়ী জননীর নিকট হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ মহৎ লোকেই আপন আপন জননীর উন্নত চরিত্রের সমুজ্জ্বল আদর্শে স্ব স্ব চরিত্র নিয়মিত করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইতে না হইতেই ফেরেঙ্সের পিতা পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যু হইলে তাঁহার জননী তাঁহাকে এবং তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনীকে লইয়া অতি কষ্টের অবস্থায় পতিত হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী ও পরিণামদর্শী মাতার পরিমিত ব্যয় ও কার্য্যদক্ষতা গুণে তাঁহাদের অর্থের অনাটন প্রবল হইতে পারে নাই। তাঁহাদের যে আয় ছিল, তাহাতেই কোনরূপে পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল, কিন্তু ফেরেঙ্সের উচ্চ শিক্ষা লাভের আর সুবিধা ঘটিয়া উঠিল না; সুতরাং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ হইল। অনন্তর অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্থানীয় একটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

তিনি যেমন বলিষ্ঠ ও সুশ্রী ছিলেন, তেমনই উদ্যম-শীল ও সদা-প্রফুল্ল ছিলেন। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে তাঁহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য নিহিত ছিল। বিদ্যালয়ের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি বহুল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের অবসর পাইয়াছিলেন। মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত ও ইতিহাস পাঠে তাঁহার অধিকাংশ সময় নিয়োজিত হইত। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমে পূর্ণমাত্রায় সুশোভিত হইয়াছিল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের চারুশোভা ও চরিত্রের মধুরতায় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, শিক্ষক এবং ছাত্রবর্গের প্রীতি, সম্মান, ও ভালবাসা অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার তেজোপূর্ণ প্রফুল্ল-মুখ-জ্যোতি অবলোকনে দর্শক মাত্রেরই মনে প্রবল উৎসাহ ও অনুরাগ জন্মিত। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার কার্য্য-নিপুণতা, সুশিক্ষা-দান-প্রণালী ও সদ্ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, এবং তাঁহার বন্ধু ও পরিচিত স্বদেশবাসীগণ তাঁহার সরলতা ও সৌজন্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সহিত সম্মান করিতেন। যখন তিনি তাঁহার ছাত্রগণের সম্মুখে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, যখন তিনি তাঁহার সমবয়স্ক এবং বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া কোন নির্দ্দোষ আমোদে রত হইতেন, যখন তিনি তাঁহার সাধের বীণাযন্ত্রে সুমধুর স্বর সংযোজনে ও সেই সুরে স্বীয় সুললিত কণ্ঠ-স্বর মিলাইয়া স্বদেশের গুণ গান করিতেন, এবং যখন তিনি তাঁহার স্বদেশানুরাগী ভ্রাতৃগণের সহিত কোন প্রকাশ্য সভাস্থলে মিলিত হইয়া তেজস্বিনী বক্তৃতায় স্বদেশের স্বাধীনতা ও স্বজাতীর গৌরব কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদয়ের অপ্রতিহত উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়িতেন, তখন শত শত হৃদয় মন্ত্র-মুগ্ধবৎ তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত— শত শত চক্ষু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের প্রতি নির্নিমেষ চাহিয়া থাকিত, এবং বক্তৃতা শেষ হইলে শত শত সুশিক্ষিত নরনারী অন্তরের সহিত তাঁহার দীর্ঘায়ু ও

সুযশ কামনা করিতে করিতে তাঁহার কর-স্পর্শ সুখ অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন।

ফেরেঙ্‌স্‌ তাঁহার সংসারের প্রধান অবলম্বন, স্নেহময়ী জননী ও সহোদরাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। একটি পরম রূপ-লাবণ্যবতী সুশোভনা রমণী তাঁহার সুকোমল হৃদয়ের গভীর অনুরাগ ও প্রণয় অধিকার করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য ও সরলতার প্রতিমা রূপিণী এই প্রেমময়ী ললনা তাঁহাকে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা জ্ঞানে সমুচিত ভক্তি ও সম্মানের সহিত ভাল বাসিতেন। তিনি এক দিন সুখ-শান্তির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তি-চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে পিতা, মাতা এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন-সম্পত্তি হারাইয়া একমাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আশ্রয়ে ও তত্ত্বাবধানে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঘটনা ক্রমে রেনিএর নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার ও তৎসঙ্গে তাঁহার উদার হৃদয় ও উন্নত মনের পরিচয় পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আত্ম-হারা হইয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে তাঁহাকে আপনার হৃদয়টি দান করিয়া ফেলিলেন। মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার যে অত্যাশ্চর্য্য বিধানে কালিদাসের মনোরমা শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিচয়ে ও মধুর আলাপে পরিতৃপ্ত হইয়া আত্ম-হারা হইয়াছিলেন, এবং যে বিধানের বশবর্ত্তী হইয়া সেক্ষপিয়রের আশ্চর্য্য সৃষ্টি মধুরভাময়ী মিরন্দা তুফান-সন্তাড়িত-তরণী-বক্ষে কম-কান্তি ফার্ডি-ন্যাণ্ডকে দেখিবামাত্রই তাঁহার কল্পনার জগতে একমাত্র ফার্ডিন্যাণ্ডের মধুময় সত্তা অনুভব করিয়াই বিবশা হইয়াছিলেন, সেই গভীর রহস্যময় বিধানের সম্মোহন প্রভাবে রেনিএর ভবিষ্য প্রণয়িণী তাঁহার পরিচয় লাভ মাত্রই আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন! বিমুগ্ধা রমণী প্রায় এক বৎসরকাল আপনার প্রাণের বাসনা লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন; ক্রমে যখন পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টতা বাড়িতে লাগিল এবং রেনিএর ভালবাসার গভীরতার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, তখন এক দিন তিনি ভয়ে ভয়ে, লজ্জাবনত মুখে, সঙ্কোচ-দুর্ব্বলতা জড়িত-কণ্ঠে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তিনি অনুগ্রহ পুরঃসর তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন, তাহা হইলে তিনি কৃতার্থ হইবেন! রেনিএ অনেক দিন হইতে তাঁহার প্রণয়িণীর মুখ হইতে এই প্রস্তাব শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; এখন এই প্রস্তাবে তিনি একান্ত পুলকিত হইয়া প্রগাঢ় অনুরাগ ভরে তাঁহার সুকোমল করচুম্বন করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে ভিন্ন অপর কোন রমণীর ভালবাসা হৃদয়ে স্থান দিবেন না। অনন্তর দিন দিন ইহাঁদের উভয়ের প্রতি উভয়ের বিশ্বাস, অনুরাগ ও ভালবাসা বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। রেনিএর জননী ও ভগিনী আন-ন্দের সহিত তাঁহাদের বিহারের অনুমোদন করিলেন।

১৮৪৮খৃঃ অব্দে যখন হঙ্গেরির স্বাধীনতা-প্রিয় বীর সন্তানগণ স্বদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে অষ্ট্রিয়ার কঠোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে আহ্বান করিলেন, তখন রেনি-এর বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর মাত্র। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার হৃদয়-বিহীন নিষ্ঠুর কর্ম্মচারীগণের কলঙ্কিত হস্তে স্বদেশের শত শত প্রিয় সন্তা-

নের অশেষ দুর্গতি এবং ক্ষীণ-প্রাণা ললনাগণের লাঞ্ছনা দৃষ্টে কতবার তাঁহার কোমল হৃদয় নিদারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছিল,—কতবার নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া করযোড়ে সকাতরে বলিয়াছিলেন,—"ভগবান, তোমার মঙ্গলময় রাজ্যে প্রবলের পদতলে বিদলিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার জন্যই কি দুর্ব্বলের সৃষ্টি হইয়াছে? মানব জীবনের এই ঘৃণিত বৈষম্য-ভাব কখনই তোমার অনুমোদিত হইতে পারে না। আর কত দিন স্বদেশের এরূপ অবনতি ও স্বজাতির এমন দুর্গতি চক্ষে দেখিব? কত দিনে এ হৃদয়-ভেদী দুর্দ্দিন অস্তমিত হইবে? কতদিনে স্বদেশের প্রিয় সন্তানগণ স্বাধীনতা অথবা স্বর্গসুখের অমৃতাস্বাদে জাতীয় ইতিহাসে অমরতা লাভ করিবে?" আজি হঙ্গেরির স্বাধীনতা ঘোষণ ও স্বাধীনতা-সমরবার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার হৃদয় আনন্দের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল ও উদাস হইয়া উঠিল। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন স্বদেশের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। স্বদেশপ্রেমিক বীর ভ্রাতৃগণকে স্বদেশ-উদ্ধারব্রতে বদ্ধপরিকর ও যুদ্ধ-সাজে সজ্জিত দেখিয়া তাঁহার অন্তর অস্থির হইয়া উঠিল। অনতিবিলম্বে তিনিও স্বীয় ভবিষ্য জীবনের লক্ষ্য স্থির করিলেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া বীরবেশে সজ্জিত হইলেন—পবিত্র ঈশ্বরের নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির পদতলে জীবনের সুখ-শান্তি উৎসর্গ করিলেন। দিন দিন তাঁহার দল বাড়িতে লাগিল—দিন দিন তাঁহার যশ চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল।

একদিন তিনি তাঁহার অধীনস্থ ভলণ্টিয়র সৈন্যগণের নেতা হইয়া একটি যুদ্ধে প্রভূত পরাক্রম ও অদ্ভুত রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন, এমন সময় কতিপয় স্বদেশদ্রোহী নর-পিশাচের বিশ্বাস ঘাতকতায় তিনি ও তাঁহার কতিপয় বিশ্বাসী অনুচর-বন্দী হইলেন। তিনি ও তাঁহার অনুচর বর্গ শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া অষ্ট্রিয় সেনাপতি এনোর (Haynau) সমক্ষে নীত হইলে, বিজয়োৎফুল্ল সেনাপতি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"স্বদেশানুরাগী বীর, আমি এই যুদ্ধে তোমার সাহস, পরাক্রম ও বীরত্ব দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি যদি তোমার দলকে পরিত্যাগ কর, তোমার অবশিষ্ট অনুচরবর্গ কোথায় কিভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের নাম কি, তাহা প্রকাশ কর, এবং যদি তুমি শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা কর যে, আর কখনও তাহাদের কোন কার্য্যে উৎসাহ দান করিবে না, তাহা হইলে আমি তোমার এই গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার অনুরোধে এই দণ্ডেই তুমি রাজদরবারে উচ্চপদ ও রাজসম্মান লাভ করিবে—সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তোমাকে সাদরে স্নেহালিঙ্গন দান করিবেন।" রেনিএর হৃদয় নীচ নহে; অথবা শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহ কোন্ কালে আপনার হৃদয়ের তেজ হারাইয়া থাকে? তিনি ঘৃণার হাসি হাসিয়া সেনাপতির প্রস্তাবে অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। সকলে তাঁহার অদৃষ্টের পরিণাম দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া উঠিল।

অষ্ট্রিয় সেনাপতি অনুসন্ধানে জানিতে পাইলেন যে, নিকটবর্ত্তী পল্লীতে রেনিএর বাসভূমি; তথায় তাঁহার মাতা ও ভগ্নী

বাস করেন। তখন তিনি উক্ত তুইটী নিরপরাধা রমণীকে বন্দিনী বেশে তাঁহার সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। তদ্দণ্ডেই রাজাজ্ঞার ন্যায় সেনাপতির কঠোর আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল—দেখিতে দেখিতে শত শত লোক-পরিবৃত হইয়া রেনিএর মাতা ও ভগিনী বন্দিনীরূপে কারাগৃহের সম্মুখে আনীত হইলেন। আজি রেনিএর স্বদেশ-দ্রোহাদলের বড় আনন্দের দিন! দেশের প্রধান কণ্টক রেনিএ শৃঙ্খল-বদ্ধ ও কারাবরুদ্ধ এবং তাঁহার স্নেহের জননী ও ভাগনী কারাগৃহের সম্মুখে বন্দিনী! অষ্ট্রিয় সেনা-নিবেশে মহা আনন্দের কোলাহল উথলিয়া উঠিতেছে। অন্য দিকে চাহিয়া দেখ;—রেনিএর সম-দশা-গ্রস্ত স্বদেশীয় বন্দী বীর-ভ্রাতৃগণ লজ্জায়, ক্রোধে, অভিমানে জ্বলিয়া অবনত শিরে এই ঘৃণার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কি এক মহা সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতাপ্রিয় হঙ্গেরির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গভীর বিষাদের ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই ঘন বিষাদে প্রকৃতির মুখ মলিন হইয়াছে। ঐ দেখ, সমীরণ হেথা হোথা ছুটিয়া ছুটিয়া মহা স্বননে ঘোরতর শোক-কাহিনী প্রচার করিতেছে। পশু, পাখী, তরু, লতা, পত্র পুষ্প সকলেই নিস্তব্ধে গভীরভাবে প্রতি-শোধ-গান গাইয়া হঙ্গেরির স্বাধীনতা-প্রিয় অযুত নরনারীর হৃদয়ে সঞ্জীবনী-সুধা বর্ষণ করিতেছে। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি প্রাণ ভরিয়া এই মহা দৃশ্য হইতে জাতীয় জীবনের পবিত্র ভাব উপলব্ধি করুন—শোকাকুলা প্রকৃতি জননী তাঁহার অবসন্ন হৃদয়ে বল দান করিবেন।

অষ্ট্রীয় সেনানায়ক এনো কর্কশ কণ্ঠে গম্ভীরভাবে বলিলেন—"যদি এই তুইটী স্ত্রীলোকের জীবনে সাধ থাকে—যদি ইহা-দিগকে জীবিত থাকিতে দেখিলে সুখী হও, তবে এখনও বলিতেছি, আমার আদেশ পালন কর—তোমার অনুচরবর্গ কে কে, কোন্ কোন্ স্থানে লুকাইয়া আছে, প্রকাশ কর। তোমার কোন ভয় নাই; আমি তোমার সমস্ত অপরাধ মাপ করিব; এবং তুমি যদি তোমার কৃতকার্য্যের জন্য অনু-তাপ কর, তাহা হইলে তোমাকে উচ্চ পদে ও উচ্চ গৌরবে সম্মানিত করিব। স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া উত্তর দান কর—তোমার কথার উপরে আমার বর্ত্ত-মান কার্য্য নির্ভর করিতেছে।" এনোর বাক্যে রেনিএ কম্পিত হইলেন; একবার ক্ষণকালের জন্য হতভাগিনী জননী ও ভগিনীর বিষণ্ণ মুখ পানে দৃষ্টিপাত করি-লেন, আর একবার তাঁহার পার্শ্বস্থ স্বদে-শীয় কারাবাসীগণের মলিন মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার তুই চক্ষু জল পূর্ণ হইয়া আসিল—তিনি নীরবে তুই বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সেই পাপ দৃশ্য আর যেন না দেখিতে হয়, এই ভাবিয়াই বুঝি চক্ষু মুদিয়া রহি-লেন। তখন তাঁহার প্রাণ কি ভীষণ যাত-নায় অধীর হইয়াছিল, কে তাহা সম্যক রূপে বুঝিতে পারিবে? মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মনে কত প্রবল ভাবনার তুফান বহিতে লাগিল। সম্মুখে পরমারাধ্যা জননীর তুর্দ্দশা এবং স্নেহময়ী ভগিনীর লাঞ্ছনা এবং সকলের অদৃষ্টের পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে তিনি অবনত মুখে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে অশ্রু

অবলা রমণীর কাতর হৃদয়ের অশ্রু নহে—উহা বীর-হৃদয়ের অত্যুষ্ণ শোণিতধারা! উহা বর্ষিত হইতে দেখিয়া এনোর হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়াছিল।

এনো আবার বলিলেন,—"আর বৃথা চিন্তার সময় নাই, এখনই আমার আজ্ঞা পালন কর, অন্যথা এই দণ্ডেই এই দুইটি স্ত্রীলোকের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে।" এই বাক্যে রেনিএ চমকিয়া উঠিলেন—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—তাঁহার মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি শোভা পাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাঁহার যে চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল, এখন তাহা হইতে যেন দ্রবময় অনল-প্রবাহ উদ্গীরিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে কঠোর প্রতিজ্ঞা বিভাসিত হইল! এই সময় তিনি আর একবার তাঁহার ভগিনী ও জননীর মুখ পানে তাকাইলেন। তখন উপযুক্ত বীরের উপযুক্ত জননী স্বর্গীয়তেজে উত্তেজিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—"Do not speak, my son, do not speak—do your duty calmly, and never think of me, for my hairs have become grey—at least I have only a few days to live—think of God, and he will give you strength to bear.—"বলোনা, বাছা, বলোনা—তুমি তোমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ধীরভাবে সম্পাদন কর—আমার জন্য কিছুমাত্র ভেবোনা—আমার মাথার চুল পাকিয়াছে--আমি আর অল্প দিন মাত্র বাঁচিব—এখন কেবল পরমেশ্বরকে ভাব—তিনি তোমার হৃদয়ে বল দান করিবেন।" বীর-জননীর কথা শেষ হইতে না হইতেই বীর-ভগিনী জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত মধুমাখা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন;—"Do not speak dear brother, do not speak—if you betray your country our name will be covered with shame—our fair fame will be soiled for ever—and what is life without honor? Do not speak Ferencz—be calm, have courage, and only think of God—I shall know how to die.—"

"প্রিয় ভ্রাত, কখনো বলোনা, বলোনা—যদি তুমি তোমার স্বদেশের বিশ্বাস-হন্তা হও, তাহা হইলে আমাদের নাম লজ্জায় ডুবিবে—আমাদের সুযশ চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইবে—মান গেলে জীবনে কায কি ভাই? ফেরেঙ্স্, তুমি কোন কথা বলোনা—স্থির হও, সাহস অবলম্বন কর, এবং কেবল ঈশ্বরকে ভাব;—কেমন করিয়া মরিতে হয় তাহা আমি জানি।" বীর-জননী ও বীর-ভগিনীর জ্বলন্ত উৎসাহ বাক্যে চারিদিক স্তম্ভিত হইয়া উঠিল—রেনিএর হৃদয় অভ্রভেদী পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও অটল হইল—মহা সঙ্কল্পে তাঁহার প্রাণ অনুপ্রাণিত হইল—তিনি স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন,—"এ জীবন, ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি—তাঁহার ইচ্ছায় ইহা প্রিয় জন্মভূমির পদতলে বলি দিব—তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হউক" এই বলিয়া করযোড়ে নীরবে প্রার্থনা করিলেন—আবার তাঁহার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বিগলিত হইল। অনতিবিলম্বে তাঁহার সম্মুখে ঘাতক হস্তে শাণিত তরবারি ঝলসিয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে জননী ও ভগিনীর মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। রেনিএ এই পাশব দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিলেন। রেনিএর হৃদয়ের প্রধানতম পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই;—তাঁহার জীবন-নাটকের একটি ঘোর বিষাদময় অঙ্ক শেষ হইল, এক্ষণে আর একটি মহা আতঙ্কজনক অঙ্কের অভিনয় জন্য যবনিকা উন্মুক্ত

হইয়াছে। সেই ভীষণ মর্ম্ম-ভেদী দৃশ্যে কাহার হৃদয় অরুন্তুদ বেদনায় অবসন্ন না হইয়া থাকিতে পারে? রেনিএর স্বদেশ-প্রেমের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার উন্নতমনা জননী ও ভগিনী, এনোর কঠোর আদেশে, তাঁহার সম্মুখে নিষ্ঠুর ঘাতক-হস্তে নিহত হইলেন, তাহাতেও এনোর হৃদয়ের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল না, আর একটি প্রফুল্ল কুসুমোপমা নিরপরাধা রমণীকে বলি দিবার জন্য অয়োজন হইল! এই অল্পবয়স্কা সুশোভনা ললনা কে? ইনিই মহাবীর রেনিএর প্রেম-মুগ্ধা প্রণয়িণী। তিনি যখন শৃঙ্খলা-বদ্ধা হইয়া উন্মাদিনী বেশে তাঁহার হৃদয়-দেবতার পার্শ্বে আনীত হইলেন,তখন অষ্ট্রীয় সেনাগণের শত শত পাপ-চক্ষু ক্ষণকালের জন্য স্বতঃই মুদিয়া আসিল—তাঁহার অদৃষ্টের শোচনীয় পরিবর্ত্তন ও অনিবার্য্য পরিণাম কল্পনা করিয়া অনেকের কঠিন হৃদয় গভীর আতঙ্কে ও বিষম ক্ষোভে শিহরিয়া উঠিল। কাহার সাধ্য নিয়তির অপ্রতিহত গতি রোধ করে? তাঁহার হৃদয় রেনিএর জননী ও ভগিনীর হৃদয়ের ন্যায় উন্নত নহে—উহা অতি দুর্ব্বল, অতি কোমল—অতি সামান্য মাত্র দুঃখের তাপে উহা বিগলিত হইয়া পড়ে। তিনি সেনা নিবেশে উপস্থিত হইয়াই সম্মুখে দুইটী পরিচিতা রমণীর মস্তক শূন্য মৃতদেহ এবং পার্শ্বে তাঁহার জীবনের ধ্রুব নক্ষত্রের মর্ম্মভেদী দুর্দ্দশা অবলোকনে দুর্ব্বিসহ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া বাতাহত তরুর ন্যায় রেনিএর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন অষ্ট্রীয় সেনাপতি পুনরায় গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন "এখনো যদি দুর্ম্মতি দূর করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত করিতে সাধ থাকে, এই শোক-বিহ্বলা যুবতীর জীবনকে যদি প্রিয় জ্ঞান কর, এবং ইহার সহবাস-সুখে পূর্ব্ব-শোক ভুলিতে চাও, তবে এখনই আমার আদেশ পালন কর—এখনো বল, তাহারা কোথায় কি ভাবে লুকাইয়া আছে।" ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই শোকাকুলা রমণীর মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি সহসা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভূমি হইতে উঠিয়া রেনিএর গলা জড়াইয়া ধরিলেন,এবং হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"Speak, speak, dear, my life, my heart's treasure, my all, pray speak out. See, I am young, I love you with all my heart,—do not let me be killed—do not kill yourself. You will save yourself and me if you speak out. When you are free, we will go far away and be happy. Speak my dearest Ferencz, and save your future wife—not a single desire of my heart is yet fulfilled!"—"বল, বল, প্রিয়, আমার জীবন, আমার হৃদয়ের ধন, আমার সর্ব্বস্ব, মিনতি করিতেছি, বলিয়া ফেল। দেখ, আমার বয়স অল্প, আমি তোমাকে সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ভালবাসি—আমাকে মরিতে দিও না, এবং তুমিও আপনাকে আপনি নিপাত করিও না। তুমি বলিলে তোমার এবং আমার জীবন রক্ষা হইবে। যখন তুমি কারা-মুক্ত হইবে, তখন আমরা অতি দূরদেশে যাইয়া সুখে থাকিব। প্রিয়তমে ফেরঙ্স্, তুমি বলিয়া তোমার ভবিষ্য প্রণয়িনীর প্রাণ রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের একটি বাসনাও এখনও পূর্ণ হয় নাই!"

অনন্তর তিনি একান্ত প্রেমভরে রেনিএর দুইহস্ত ধারণ করিলেন—কতবার উহাতে

চুম্বন বর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"জীবনের সর্ব্বস্ব ধন, এখন আর চুপ করিয়া থাকিবার সময় নাই—যথার্থ কথা প্রকাশ কর—তোমার কথার উপরেই আমাদের উভয়ের জীবন নির্ভর করিতেছে।" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার হাত দুই খানি ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িলেন। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন শেষ একমাত্র ভাসমান অবলম্বনকে জড়াইয়া ধরিয়া একবার ভাসিয়া উঠে এবং পরক্ষণেই ডুবিয়া যায়, আবার ভাসিয়া উঠে, আবার ডুবিয়া যায়, তিনিও সেইরূপ তাঁহার প্রণয়ীর প্রিয় হাত ধরিয়া কাতর ভাবে একভাবে উঠিতে লাগিলেন, পুনরায় অবসন্ন হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিলেন। মহা সাধনায় অনুপ্রাণিত মহাবীর রেনিএ আর কতক্ষণ এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য নীরবে স্থিরভাবে সহ্য করিবেন? এইবার পাষাণ গলিল। তিনিও কাতর ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন—দুই হাতে ধরিয়া প্রণয়িণীকে ভূমি হইতে তুলিলেন—তাঁহার মৃণাল-ধবল-সুকোমল করে দুইটী চুম্বন দান করিলেন—দুঃখ ও শোকের গভীর উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল—প্রাণের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারিয়া মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিলেন! সহসা দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল! সহসা তাঁহার মুখ-ভাব পরিবর্ত্তিত হইল! কে যেন তাঁহাকে গোপনে বলিল—"সাবধান, রেনিএ, সাবধান!—রমণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিও না—এই পৃথিবী কয় দিনের জন্য? ইহার সুখ-শান্তি ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—এখানে প্রাণের বাসনা পূর্ণ হয় না—অন্তরের পিপাসা মিটে না। নির্ভয়ে, অবিচলিত হৃদয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন কর—পর জগতে অনন্ত সুখ ও অনন্ত শান্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হও। এই মৃত্যুর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিলাভে অমর হইবে। ইতিহাসের পবিত্র পৃষ্ঠায় তোমার নাম সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে এবং উহা স্বদেশ প্রেমিক নরনারীর রসনায় নিত্য ক্রীড়া করিবে। ঐ দেখ, পরলোকগত বীরেন্দ্র-সমাজ প্রীতির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি লইয়া সবিস্ময়ে, স্তম্ভিতভাবে, অনিমেষ নয়নে তোমার হৃদয়ের অদ্ভুত বীরত্ব নিরীক্ষণ করিতেছেন। এই কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই তাঁহারা স্বর্গ হইতে মঙ্গলগান ও তোমার প্রতি অজস্রধারে পুষ্প বৃষ্টি করিবেন—চারিদিকে তোমার বীরত্ব-বিজয় বিঘোষিত হইবে—তোমার পরজীবন স্বর্গের প্রাতঃস্মরণীয় স্বদেশানুরাগী বীরেন্দ্র-সমাজে পরম রমণীয় সুখে অতিবাহিত হইবে। মায়া-মোহ ত্যাগ কর—ঐ দেখ তোমার পরলোকগতা জননী ও ভগিনী তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহ দান করিতেছেন।" এই কথায় যেন তাঁহার মোহ-নিদ্রা দূর হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার প্রণয়িনীর বক্ষোমাঝে মুখ লুকাইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; এখন তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি সহসা মুখ তুলিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিল, এবং চক্ষু হইতে যেন অনল-কণা নির্গত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই তিনি স্থির গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন—তাঁহার চক্ষুদ্বয় মস্তকোপরি নীল নভোমণ্ডলের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল,—বিমল

আকাশ-পটে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে যেন এক উদ্দীপনা মন্ত্র লিখিত রহিয়াছে, তিনি তাহা এক মনে পাঠ করিলেন। অমনি তৎক্ষণাৎ দুই হাত যোড় করিয়া সুস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "জগদীশ, তোমারই প্রিয় কার্য্যে এ জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তোমারই আদেশে ইহা হাসিতে হাসিতে বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু দেব, এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে যে, এত সহ্য করিয়াও প্রিয় জন্মভূমির সুদিন চক্ষে দেখিয়া মরিতে পারিলাম না। আর কিছুই সাধ নাই, এখন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই বলিয়া তিনি সদ্য-বিকসিত শিশির-স্নাত সরোজিনীর ন্যায় তাঁহার প্রণয়িণীর অশ্রু-অভিষিক্ত মুখ-কমল আর একবার প্রশান্ত ভাবে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে জন্মের মত শেষ বিদায় লইবার জন্য তাঁহাকে হৃদয় ভরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন দান করিলেন। অনন্তর সম্পূর্ণরূপে আত্ম সংযম করিয়া বলিলেন,— "Farewell! Prepare yourself dearest, for that bright and happy land where mother and sister have gone—there we shall meet again, and part no more! Farewell!" "বিদায়, প্রিয়তমে—মাতা ও ভগিনী যে জ্যোতির্ম্ময় এবং সুখকর দেশে গমন করিয়াছেন, তুমিও তথায় যাইতে প্রস্তুত হও—সেখানে আমরা পুনরায় মিলিত হইব—আর কখনও আমাদের বিচ্ছেদ হইবে না! তবে এখন বিদায় দাও।" এই বলিয়াই তাঁহাকে সরাইয়া দিলেন এবং আপনি কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী গগণভেদী ক্রন্দনে আবার তাঁহাকে মিনতি করিয়া কত কথা বলিলেন, কিন্তু আর তিনি তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন না। তৎক্ষণাৎ নিষ্ঠুর অষ্ট্রীয় সেনাগণ বেগে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বলি দিবার জন্য ধরিল। তিনি বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন,—"Be cursed, be cursed, you who let me die; you who kill me; who are my assasin." রেনিএ নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিমেষ মধ্যে অষ্ট্রীয় সেনার গুলির আঘাতে হতভাগিনী রমণীর প্রাণ-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল;—নরাধম সেনাপতি এনোর নিষ্ঠুর আদেশে একটী প্রস্ফুটিত সজীব কুসুম অকালে বৃন্ত-চ্যুত হইয়া পৃথিবীর ধূলায় পরিণত হইল। হারেরে! হৃদয়হীন নিষ্ঠুর এনো, কি করিলি, কি করিলি! অস্ত্রবলে—পশুবলে—বীরের দুর্ভেদ্য হৃদয় জয় করিতে গিয়া তিনটী নিরপরাধিনী স্ত্রীলোকের প্রাণনাশে তোর কি ফললাভ হইল? এখনও কি তোর শোণিত-পিপাসা মিটে নাই?

আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া বন্দুকের গুলি নির্গত হইবামাত্র উহা রমণীর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল;—এক আঘাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল! রেনিএ পূর্ব্বের ন্যায় দুই চক্ষু আবৃত করিয়া মর্ম্মভেদী স্বরে গভীর উচ্ছ্বাসে ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া জ্বলন্ত দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,— "ওঃ .... হো .. ও ....!!" বন্দুকের শব্দ থামিবামাত্রই রমণীর প্রাণ-শূন্য কায়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল, কিন্তু রেনিএর গভীর আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি শীঘ্র থামিল না—উহা চারিদিকে ছুটিয়া ছুটিয়া ভীষণ গভীর স্বরে গাইতে লাগিল,—"ওঃ হো ও!"

সেই ভীষণ দৃশ্যে ও ভীষণতর স্বরে সমবেত অষ্ট্রীয় সেনাদলে ক্ষণকালের জন্য বিষাদের ছায়া পরিব্যাপ্ত হইল। সেনাপতি আর সে দৃশ্য সহিতে না পারিয়া বিবেকের মর্ম্মান্তিক দংশনে স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন—সে তীব্র দংশন-যাতনা সহজে নিবিল না!

অনেকক্ষণ পরে রেনিএ অতি কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সেই কলঙ্কিত সংহার-ক্ষেত্র হইতে মৃত দেহ গুলি অপসারিত হইয়াছে, এবং অষ্ট্রীয় সেনাদল একে একে কে কোথায় চলিয়া যাইতেছে! এমন সময় দুইজন সেনা ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনি ভাবিলেন, এইবার তাঁহার দুর্ব্বহ জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হইবে। তিনি বিকট হাসি হাসিয়া তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার করিলেন। তাহারা বুঝিতে পারিল, তিনি ঘৃণার সহিত মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন। তাহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিল, "ভয় নাই, আমরা তোমার জীবন লইতে আসি নাই, তোমাকে প্রাঙ্গণ হইতে গৃহাভ্যন্তরে নিরাপদ স্থানে রাখিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া তাহারা তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিয়া তাঁহাকে কারা-গৃহ মধ্যে রাখিয়া প্রস্থান করিল। রেনিএ এখন একাকী কারাগৃহে উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতেছেন? এক একবার বিকট হাস্যে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া স্তম্ভিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন, আবার উপবিষ্ট হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া পড়িতেছেন। স্নেহময়ী জননী, প্রীতিময়ী ভগিনী ও প্রেমময়ী প্রণয়িণীর একে একে কলঙ্কিত অপমৃত্যু স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার বিরাট হৃদয় একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মন ক্রমশঃ বিকৃত ভাব ধারণ করিল। তিনি কখনও হৃদয়ে করাঘাত করিয়া জলন্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, কখনও হাসিতেছেন, কখনও স্বদেশের স্বাধীনতা গান করিতেছেন, কখনও প্রণয়িণীর নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সাদরে প্রণয়-গীতি শুনাইতেছেন, এবং কখনও বা একদৃষ্টে শূন্য পানে তাকাইয়া কি-যেন-কি সুন্দর ছবি দেখিয়া তাহাকে হাসিতে হাসিতে হৃদয়ে ধরিতে যাইতেছেন। দুই দিন কাটিয়া গেল, তৃতীয় দিবসে তিনি ঘোরতর উন্মত্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি একবারেই বিলুপ্ত হইল, সুতরাং আর তাঁহাকে কোন যাতনা অনুভব করিতে হইল না। তাঁহার চিত্ত-বিকার ও উন্মত্ত ভাব দৃষ্টে অষ্ট্রীয় রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দান করিলেন। তাঁহার কতিপয় পরিচিত ও স্বদেশবাসী ভক্ত তাঁহাকে লইয়া গিয়া আপনাদের আশ্রয়ে রাখিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই হঙ্গেরিতে যে সকল লোমহর্ষণ অভিনয় হইল, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন, এস্থলে তাহার অবতারণা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সংক্ষেপতঃ ইহা উল্লেখ করিলে যথেষ্ট হইবে যে, তিনটি নির্দ্দোষী স্ত্রীলোকের প্রাণ বধ এবং মহাবীর রেনিএর তীব্র লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্যই যেন হঙ্গেরির বীরগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অষ্ট্রীয়াকে নানারূপে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত করিলেন। এই যুদ্ধের অবসানে তথায় শান্তি স্থাপিত হইলে পর রেনিএ একটি অনাথ আশ্রমে রক্ষিত হইলেন। তাঁহার

কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীগণ তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মানসিক বিকার ও উন্মাদাবস্থা দূর করিতে পারেন নাই। প্রতি দিন হঙ্গেরির শত শত কৃতজ্ঞ-হৃদয় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব ও জলন্ত আত্মোৎসর্গের স্তুতি-গান করিতেন। প্রতিদিন তাঁহার জন্য নূতন নূতন [illegible] নানা সামগ্রী প্রেরিত হইত—জ্ঞানহীন উন্মত্ত রেনিএ কিছুই জানিতে পারিতেন না! কিছুই বুঝিতে পারিতেন না! প্রায় ৩৬ বৎসর কাল অনাথ আশ্রমে উন্মত্তাবস্থায় বাস করিয়া মহাত্মা রেনিএ অল্পদিন হইল এই দুঃখময় পৃথিবী পরিত্যাগ পুরঃসর দিব্যধামে বীরেন্দ্র-সমাজে বাস করিতে গিয়াছেন! সেখানে কোনরূপ বেদনা, শোক, দুঃখ, জ্বালা, যন্ত্রণা, বিরহ, নৈরাশ্য, অশান্তি ও অত্যাচার, কিছুই নাই; সেখানে কেহ কাহারও হৃদয় লইয়া খেলা করে না;—সেখানে চির প্রণয়, চিরসুখ, চিরশান্তি, চিরআনন্দ, চির আরাম, পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত! সে রাজ্যের মহান্ অধিপতি প্রেমময় ঈশ্বর মহাবীর রেনিএকে শান্তিময় ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের সমুচিত পুরস্কার দান করিয়াছেন; অন্যান্য দেবতাগণ আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়া তাঁহার, উন্নত মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সুর-সিমন্তিনীগণ বিপুল হর্ষে অধীর হইয়া করতালি দিয়া মঙ্গল গান করিয়াছেন!

ভাই স্বদেশবাসি! এস, আমরা সসম্ভ্রমে এই পরলোকগত মহাবীরের উদ্দেশে শতবার প্রণাম করি। এস ভাই, আমরা এক্ষণে একবার ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মহান্ চরিত্র পর্য্যালোচনা করি। আজি আমাদের দেশ মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে! শত শত বৎসরের কঠোর পরাধীনতায় এদেশের বীরত্ব-বহ্নি চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছে! হল্‌দিঘাটের মহা যুদ্ধের পর পুণ্যভূমি ভারতে আর প্রকৃত হৃদয়ের বীরত্ব প্রদর্শিত হয় নাই। এখন এদেশের যেদিকে দেখি, সেই দিকেই অন্ধকার, সেই দিকেই কঠোর পরাধীনতা বিকট বদনব্যাদান করিয়া চরাচর গ্রাস করিতে যাইতেছে। এদেশের কোটি কোটি লোক যেন অধীনতার তীব্র কশাঘাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া গভীর অবনতির গহ্বরে, কলঙ্কিত মৃত্যুর পুরে ছুটিয়া চলিয়াছে। হায়! হায়! কে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া উন্নতির পথে, গৌরবের রাজ্যে পুনরানয়ন করিবে! অনৈক্য, ঈর্ষা, দলাদলি ও কুসংস্কারে দেশের অস্থি-মজ্জা পর্য্যন্ত জর জর হইয়াছে। হায়! হায়! কে তথায় অমৃতকুণ্ডের জল সিঞ্চন করিয়া তাহাকে পুনরায় সজীব ও সতেজ করিয়া তুলিবে? জাতিভেদ, বর্ণ-ভেদ, ধর্ম্ম-ভেদ ও জ্ঞান-ভেদে দেশের সকল কার্য্য বিফল হইতেছে। সমগ্র দেশ মধ্যে দিন দিন ঘৃণিত ছদ্মবেশের প্রাদুর্ভাব হইতেছে—বাহ্যিক চাক্‌চিক্যশালী প্রাণ-জুড়ান অন্তঃসার-শূন্য সভ্যতার দিন দিন আদর বাড়িতেছে;—এখানে সাধনা, ভণ্ডামীতে পরিণত হইতেছে—যোগ-শিক্ষা, চপলতায় পরিণত হইতেছে—স্বদেশানুরাগ, বৃথা বাগাড়ম্বরে পরিণত হইতেছে—স্বজাতি প্রেম, বিদ্বেষভাবে অথবা ঘোর ঔদাসীন্যে পরি-

নত হইতেছে—আত্মোৎসর্গ; সুখ-সেব্য বিলাসিতায় পরিণত হইতেছে। এই ঘোর দুর্দ্দিনে—এই ঘোর অধঃপতনের দিনে আমরা রেনিএ ও তাহার তুল্য ক্ষণজন্মা মহাত্মাদিগের স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি প্রেম ও জলন্ত আত্মোৎসর্গ হইতে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারি। এস ভাই, হতাশ হইও না; দয়াময় ঈশ্বরের পবিত্র নাম লইয়া পবিত্র জন্মভূমির পদে জীবনের সমস্ত আশা ও সুখশান্তি উৎসর্গ করি। একদিন আমাদের প্রাণের বাসনা পূর্ণ হইলেও হইতে পারে।

শ্রীবিজয়লাল দত্ত।
আলিপুর প্রাণি-বাটিকা।

ইংরাজ শাসনে বঙ্গসাহিত্য।*

১ম প্রস্তাব।

অন্নদামঙ্গল বিরচিত হইবার পাঁচ বৎসর পরে, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাসীর আম্র-কাননে ভারতের ভাগ্য-দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। স্বর্ণ-বিহঙ্গ পিঞ্জর হইতে পিঞ্জরান্তরে প্রবেশ করিল। ইস্‌লামধর্ম্মের উপাসকবর্গ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হিন্দুস্থান যীশু-ভক্তগণের কর-কবলিত হইল। একদিকে মুসলমান রাজত্বের বিসর্জ্জন, অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা;—প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া, এই উভয় প্রবল প্রতিকূল স্রোতের মধ্যে পড়িয়া, দেশ হাবু-ডুবু খাইতে লাগিল। অবসর বুঝিয়া; অরাজকতা স্বীয় অনুরূপ দল বল লইয়া চারিদিকে তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিল। দুঃসময় দেখিয়া শান্তি-দেবী ম্লানমুখে ধীরে ধীরে অন্তর্হিতা হইলেন। ইহার উপর আবার ঘোরতর দৈব বিড়ম্বনা—দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সোণার বঙ্গদেশ ছারখার হইয়া গেল। এই সময়ের একখানি চিত্র পাঠকগণের সমক্ষে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি।

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই। সুতরাং ১১৭৫ সালে চাউল কিছু মহার্ঘ্য হইল। লোকের কিছু ক্লেশ হইল; কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে আবার রাখাল মাঠে গান গাহিল: কৃষক পত্নী আবার রূপার পৈঁছার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র

* এই প্রবন্ধটী মেদিনীপুরের অন্তর্গত মহিষাদলস্থ আলোচনা সভায়, ১২৯৪ সালের ১০ই বৈশাখ শুক্রবার পঠিত হয়। প্রস্তাবটী যে বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক, সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।—যেরূপ আকারে পঠিত হইয়াছিল, অবিকল তাহাই মুদ্রিত করা গেল। পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বুঝিলেও, নানা কারণে তাহা হইতে বিরত রহিলাম। লেখক।

বৃষ্টি পড়িল না। মাঠে ধান্য সকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পায় না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল; তারপর, এক সন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর, দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজার্খাঁ রাজস্ব আদায়েব কর্ত্তা, মনে করিলেন, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া গেল। লোক প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়?—উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল। ঘর বাড়ী বেচিল, জোত জমা বেচিল, তারপর, মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল; তারপর, ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল, তারপর, স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী—কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়: খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর ও বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। আর যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রোগ সময় পাইল। জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়? কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহার চিকিৎসা করে না। কেহ কাহাকে দেখে না। মরিলে ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়। * * * কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে—কত কোটী তা কে জানে,—যমপুরে প্রেরণ করাইয়া, সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল; পৃথিবী শস্যশালিনী হইলেন। যাহারা বাঁচিয়া ছিল; তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়াছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকেই তাহাতে মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী কিন্তু জন শূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া গবাদির বিশ্রাম ভূমি ও প্রেত ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বরা ভূমি-খণ্ড অকর্ষিত হইয়া জঙ্গলে পুরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলময় হইল। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই। বিক্রেয় জন্মে, কিনিবার লোক নাই। চাষায় চাষ করে, টাকা পায় না। জমীদারে খাজনা দিতে পারে না। রাজা জমীদারি কাড়িয়া লওয়ায় জমীদার সম্প্রদায় দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী সুপ্রসবিনী হইলেন, তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায়, কাড়িয়া খায়। চোর, ডাকাতেরা

মাথা তুলিল। সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।" (আনন্দমঠ)।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকে আমার উপর বিরক্ত হইতেছেন। বোধ হয়, অনেকে মনে করিতেছেন, ধান ভানিতে. শিবের গীত কেন? বঙ্গ-সাহিত্যের কথা ফাঁদিয়া; দুর্ভিক্ষের দৌরাত্ম্য, দেশের দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করা কেন? স্বীকার করি, ইহাতে আমার দোষ হইয়াছে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, যখন দেশের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়, লোক অখাদ্য খাইয়া, বা না খাইয়া যখন দলে দলে দুর্ভিক্ষানলে আপনাদিগকে আহুতি প্রদান করিতেছে; বলবান যখন দুর্ব্বলকে আক্রমণ করিতেছে; দুর্ব্বল সেই অত্যাচারের প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া যখন ব্যথিত প্রাণে, ঊর্দ্ধপানে তাকাইয়া নীরবে নেত্র-নীর মোচন করিতেছে; যখন "দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি, বউ রাখিয়া শোয়াস্তি নাই, ঝি, বউয়ের পেটে ছেলে রাখিয়া শোয়াস্তি নাই;" যখন রাজা রাজ-ধর্ম্ম অতল-জলে ডুবাইয়া, দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; যখন নবাগত বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বৃটেনবাসীর বলবতী অর্থ-পিপাসা, অস্তগামী মুসলমান পৌরুষের সাহায্যে,—পবন-সহায় সর্ব্বভুক্ হুতাশন-শিখার ন্যায়, এই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা, স্বর্গাদপি-গরীয়সী জননী জন্ম-ভূমিকে কেবল শ্মশান—শ্মশানময় করিয়া তুলিতেছে,—সে সময় সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে বসিবে কে? লোক যখন পেটের দায়ে, মানের দায়ে, প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া, উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সাহিত্য সেবা অসম্ভব। সাহিত্য, শান্তি-সরোবরের শোভন শতদল। দর্পণ-হৃদয়া সরসী-বক্ষে কমলদল সুন্দর মলয়-মারুত-হিল্লোলে ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া চারিদিকে সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করে; কিন্তু যখন বায়ু দিগ্বিদিক্-জ্ঞান হারাইয়া প্রচণ্ড বেগে বহিতে থাকে, তখন সরোবরের সুনীল আরসা খান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, এবং প্রফুল্ল পদ্মদল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। যে সমাজ যে পরিমাণ শান্তি-সুখ উপভোগ করে, তথায় সাহিত্য-সাধনা সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সমাজ বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে সাহিত্যালোচনার পথ তৎসঙ্গে সঙ্গেই অবরুদ্ধ হইয়া যায়। বঙ্গদেশে এই সময়ে তাহাই ঘটিয়াছিল। এই ঘোরতর অশান্তির সময়ে দেশের কথা যদি কেহ ভাবিতেন, তবে সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ। তাঁহারা লোভী, স্বার্থপর, ক্ষমতা-প্রত্যাশী, তোষামোদ-পটু ছিলেন না। তাঁহারা প্রকৃতই সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, মাণিক-তর্কভূষণ প্রভৃতি নিষ্ঠাবান, স্বাধীনচেতা ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল। তৎকালের দুরাচার, নীচাশয়, অর্থগৃধ্নু ইংরাজগণ পর্য্যন্ত ইঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদর করিতেন। ইঁহারা বিচারক, ব্যবস্থাপক অথবা অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। "কিন্তু ইঁহারা বিদ্যা-ব্যবসায়ী ছিলেন মাত্র; সাহিত্য-সমালোচনা করিবার ইঁহাদের অবসর ছিল না।"

১৭৬০ খ্রীঃ গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ইহ-

লোক পরিত্যাগ করেন। তিনি যে কি রূপ অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তির অধিকারী হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার—

'খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কবাট।'
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ;'
'নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে ;'
"বড়র পীরিরি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি,
ক্ষণেকে চাঁদ,"
'মিছা কথা, সেঁচা জল কতক্ষণ রয় ?'
'জলে শিলা ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়'
'নির্ম্মল চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা, শীতল
মন্দ পবন ;'
'হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়,
হাদে লক্ষ্মী হ'ল লক্ষ্মী ছাড়া।'

প্রভৃতি পঙ্ক্তি নিচয় আজিও অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, ভারতচন্দ্র কৃত গ্রন্থাবলী আমাদের সমালোচ্য নহে।

অন্নদামঙ্গলের পর, "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনীর" নাম উল্লেখ যোগ্য। উলাগ্রাম-নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কাব্যের রচয়িতা। সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ, কপিল-শাপ-ভস্মীভূত স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের উদ্ধার সাধনার্থ, কঠোর তপস্যায় গঙ্গাদেবীকে প্রসন্ন করিয়া, ধরাতলে তাঁহাকে আনয়ন করেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী উচ্চদরের কাব্য না হইলেও প্রশংসার যোগ্য বটে। স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায় ইহার বিলক্ষণ পক্ষপাতী। আজিও কোন স্থলে, চণ্ডী, রামায়ণ প্রভৃতির ন্যায় মন্দিরা-চামর-সংযোগে ইহা গীত হইতে দেখা যায়। কাব্যখানি ভক্তিরস-প্রধান। "গঙ্গার ষষ্ঠী পূজায় বিধাতার আগমন" স্থল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

'আদি, অন্ত তোমার মা! জানে কোন্ জন ?
কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড মা! করেছ সৃজন।
তোমার চরণ-গুণে কহিতে কি পারি ?
তব নামে মাগো! যেন হই অধিকারী।
প্রসবিনী আপনি মা জান সে যেমন,
জঠোর-যাতনা মাতা জানিলে এখন।
যাতায়াত বারে বারে সবে কত আর ?
জানিলা জননি! দাসে কর গো নিস্তার।
বিধি বটি, বিজ্ঞ নই, বালক তোমার,
লিখিয়া পড়িয়া মরি আছে এই ভার।
অবকাশ নাহি কিছু—মাহিনাতে শূন্য,
কে জন্মিল কোথায়, কি লিখি পাপ পুণ্য।
পরের কপালে আমি লিখি ভোগাভোগ,
নাহি জানি আপন ললাটে কর্ম্মযোগ।
কপালিনি! কপাল রূপিণী তুমি সার,
আমি কি লিখিব মাগো কপালে তোমার।
ব্রহ্মাণ্ড সমান যদি মস্যাধার হয়,
কারণ সলিল যদি হয় কালিময়,
আকাশের তুল্য পত্রে যিনি চিরজীব ;
আশা-রূপ লেখনীতে লিখে সদাশিব ;
তথাপি মহিমা তব লেখা নাহি যায়,
আমি কি লিখিব মাগো না দেখি উপায়,
কোন বর্ণ ললাটে মা, লিখিব তোমার।
বর্ণময়ী তুমি মাগো, আপনি বর্ণাকার।"

গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনীর পর অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন ভাল গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। এই সময়ে এক দল "স্বভাব-কবি" জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষার বিলক্ষণ পুষ্টি সাধন করেন। তাঁহারা যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তখন প্রতিভা-শক্তি সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারে না। তখনকার জমীদারগণ ও

"হঠাৎ-অবতার-বাবু"দিগের চিত্ত-রঞ্জনের জন্য তাঁহারা নানাবিধ গান বাঁধিতেন। আদিরস-ঘটিত সঙ্গীত রচনায় তাঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আপনারা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমি টপ্পা-ওয়ালা নিধুবাবু এবং কবিওয়ালা রামবসু ও হরুঠাকুরের নামোল্লেখ করিতেছি। এতদ্ভিন্ন, রাসুনৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী, চিন্তাময়রা, নীলুপাটুনি, ভোলাময়রা, আণ্টুনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি কবিওয়ালা, সমাজে সমাদৃত ও গৌরবান্বিত ছিলেন। কিন্তু হরুঠাকুর ও রাম বসুর ন্যায় আর কেহই তাদৃশ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না।

নিধিরাম গুপ্ত, ওরফে নিধুবাবুর প্রকৃত বাসস্থান পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত চাঁপ্তা গ্রাম। ১৭৩৭ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। নিধুবাবু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। সেই জন্য কলিকাতায় কুমারটুলীতে বাস করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ ৯৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিম্নে নিধুবাবুর ৪টী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।

ভৈরবী—মধ্যমান। (১)

বিচ্ছাদান্তে মিলনে কত সুখোদয়।
হিমান্তে বসন্ত যেমন, মেঘান্তে শশীর উদয়।
যে হ'ল অন্তরবাসী, সে হ'ল অন্তর বাসী,
সে পুনঃ অন্তরে আসি, সে যেন সে জন নয়।

(২)

নয়ন-নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী ম'রে, অন্য বারি নাহি হ্যারে,
ধারাজল বিনা তার সকলি বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি! হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে স্নিগ্ধ জানি অনল-প্রবল॥

(৩)

সিন্ধু-খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ যাতনা জানাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুঃখ, সে পাছে বেদনা পায়।
তার দোষ গুণ যত, সকলি মম বিদিত,
দোষ ত্যজে অবিরত, রত প্রশংসায়॥
নীর ত্যজে ক্ষীর যেমন, হংসে করে গ্রহণ,
তেমতি আমার মন তার পানে ধায়॥
ভাবিয়া দেখিলাম ভাল, সকলিরে কর্ম্মফল,
তাহে এ দুঃখ ঘটিল, কি দোষ তাহায়॥

(৪)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে।
গগণে শরত শশী উদয় কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে গৌরবে, কে তোমার তুলনা হবে,
তোমাতে সকলি সম্ভবে, যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে॥

হরুঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী) ১৭৩৯ খ্রীঃ কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইঁহার একটী সখের কবির দল ছিল। শোভাবাজার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজা নবকৃষ্ণের উৎসাহে ও অনুরোধে তিনি শেষাবস্থায় পেশাদারি কবির দল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিম্নে তাঁহার একটীমাত্র সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।

সখী সংবাদ।

মহড়া।

ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি,
ব্রজ-কুলনারী, বধিলে।
বমুনা কি বাদ সাধিলে॥

নবীনো পিরীতো, না হইতে নাথো,
অঙ্কুরে আঘাতো করিলে ॥

চিতেন।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো,
কে আনিল রথো, গোকুলে।
অক্রূরো সহিতে, তুমি কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে, চলিলে ॥
শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুন হে মাধবো
তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী ॥
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি
তথা আসি গোপী সকলে।
দিয়ে বিসর্জ্জন কুল-শীলে ॥
এতেই হ'লাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি,
এই দোষে কিহে ত্যজিলে ?
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি, যথা সুখ পাও।
একবার, সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে,
ব্রজ-গোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত, শ্রীচরণ দুটী,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি !
আর হেরিব আশা না করি ॥
হৃদয়ের ধন, তুমি গোপীকার,
হৃদে বজ্র হানি চলিলে।
রাধারে চরণে, ত্যজিলে, রাধানাথ !
কি দোষ তাহার পাইলে ?

আহা ! কেমন সরল ! কেমন সকরুণ ! কেমন প্রাণস্পর্শী ! প্রেমময়ী সরলার প্রাণের মধুর সৌন্দর্য্য ইহার মধ্যে কেমন ফুটিয়া পড়িতেছে।

রাম বসু, কলিকাতার অপর পারস্থ শালিখা নামক স্থানে, ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার "বিরহ" দেশ-বিখ্যাত। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। নিম্নে তাঁহার দুইটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।

(১)

মহড়া।

মনে রৈল সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি
বলা হল না।
শরমে মরম কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নিলর্জ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি, ধিক্ থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না।

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এল।
এ সময় প্রাণনাথ বিদেশে গেল।
যখন হাসি হাসি, সে "আসি" বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনি !
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি !
একি সখি, হল বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান,
মদন দহিছে এখন, এ অবলার প্রাণ,
যদি সে হ'ল নিদয়, লইল বিদায়,
তবে যেন সখি ! প্রাণও রহে না।

(২)

দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ !
বদন ঢেকে যেও না।

তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখ্‌ব না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি ত ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।
দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ!
হ'ল এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা,
তোল ও বিধুবদন।
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি?
এমন ত প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি,
অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হ'ল বিমুখ,
আমি সাগর সেঁচে কিছু মাণিক পাব না।

সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"রাম বসুর গানের ভাব ও শব্দ-বিন্যাস-কৌশল, উভয়েরই আমরা প্রশংসা করি। মোটামুটি এরূপ প্রশংসা করা যায়, কিন্তু আঁটাআঁটি করিয়া ধরিয়া সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইঁহার ভাব-পারিপাট্য অপেক্ষা রচনা-চাতুর্য্য অধিকতর জাজ্বল্যমান,—ভাবুকতা অপেক্ষা মুনসিগিরি অধিক—কথার বাঁধুনি, কথার গাঁথনি যেমন, ভাবের মনোহারিতা, ভাবের চমৎকারিতা তদ্রূপ নহে। সুতরাং ইহার বিরহিনীদিগের বিরহ-সঙ্গীত শুনিয়া "বহবা" দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু "আহা" কথাটা মুখে আসে না।"

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

অন্ধকার।

(সমুদ্রতীরে)

১

গোধূলির দীপ্তি ওই মিশাল অম্বরে,
ছাইয়ে আসিছে সুধু ঘন অন্ধকারে
নীল বারিধির কায়া,
অতি নীল,—শেষে ছায়া;
মহাসিন্ধু, মহাশূন্য পড়ি একস্তরে;
সাগর, সাগর-পাতে হ'ল একাকার।

২

আকাশের শ্রান্ত পাখা, দূর সিন্ধুকোলে,
অসীমে না পেয়ে দিশে,
এলায়ে গিয়াছে মিশে;
স্বর্গ মর্ত্ত্য সবি আজি অন্ধ শূন্যে দোলে।

৩

হেরগো, হেরগো সিন্ধু, আকাশ সমান
চির-অন্ধকার মাখা,
চির-ধূম্র মেঘে ঢাকা,
অনন্তে ছুটিয়া শ্রান্ত, আমার পরাণ!
তাই সে আজিরে হায়,
আঁধার সাগর চায়,
অমনি মিশিতে সাধ, বুকেতে তাহার;
তুমি কি লইবে কোলে, ওহে পারাবার?

৪

অথবা
দেখগো তোমারি মত,
হৃদয়ে তরঙ্গ শত

গর্জ্জিয়া উঠিয়া পুন পড়ে নিজ গায় ;
জানেনা কাহার তরে.
অজ্ঞেয় আকাঙ্ক্ষা ধরে,
আঁধার গর্জ্জন তাই আঁধারে মিলায় !
এ পরাণ নহে বিন্দু,
তোমারি মতন সিন্ধু
অনন্ত প্রবাহ তার, অসীম প্রসার ;
সাগরে সাগর তাই,
আজি মিশাইতে চাই ;
এসো এসো আলিঙ্গন করি পারাবার !

(৫)

বুঝিতে পারিনি যাহা,
তুমি কিগো জান তাহা ?
জান কি অতীত কি,সে ? কোথা সে লুকায় ?
কার্থেজ্ হইল ভস্ম ;
বাবিলন হ'ল ধ্বংস ;
লুপ্তকুরু পাণ্ডু বংশ, ব্রহ্মে হায় হায় !
কোথা চন্দ্রগুপ্ত রাজা ?
অশোক, পুণ্যের ধ্বজা ?
কোথা সে মগধ পুরী নব পাটনায় ?
আজি বৃন্দাবন ধামে,
আর কিশোরীর নামে,
প্রেমের বাঁশরী ধ্বনী কই শোনা যায় ?
ওইনা আসিব বোলে,
মথুরায় গেল চোলে,
কাঁদিছে গোপের বালা, কোথা শ্যামরায় ?
সহচরী সহচর,
হাসি, ক্রীড়া নিরন্তর,
প্রণয়, বিচ্ছেদ মিষ্ট; লুকাল কোথায় ?
সেই অভিমান রাশি,
প্রেম চেয়ে ভালবাসি ;
মিছে রাগ, মিছে কান্না মিছে যাতনায় ?

৬

আমার সে বৃন্দাবন, ?
সেই চারু চন্দ্রানন ?
প্রেমের সে জলকেলি প্রিয় যমুনায় ?
জল বুদ্বুদের মত,
কোথা গেল জানিনে ত ?
নরভাগ্য দগ্ধ এত কেন, কে বুঝায় ?

৭

কোথা বা সম্ভোগ সুখ, বল বর্ত্তমানে ?
দুরন্ত অতীত স্মৃতি,
তিক্ত করে নব প্রীতি,
উপজে কত না ভীতি, দুর্ব্বল পরাণে।
এই যাহা আছে মম.
কে জানে তাহার ক্রম ?
এই চারু বিম্বাধর. এই অনুরাগ,
জানিনা কদিন পরে,
ফাঁকি দিয়ে যাবে মোরে,
পরাণে রহিবে সুধু চিতা-ভস্ম-দাগ ! !
ধরিতে নবীনে তাই.
আশার সে আশা নাই ;
তাইতো লুকাতে চাই, ও অতল তলে ,
আছে কি নির্ব্বাণ-সুখ ; সিন্ধু, তোর জলে ?

৮

জানিনা কি ভবিষ্যৎ, অন্ধকার পারে ;
আছে কি জ্যোছনা তথা ?
মৃত যত প্রিয়-লতা
অঙ্কুরিত বল কি, তা পাব দেখিবারে ?
অজ্ঞেয় অজ্ঞাত যাহা
বুঝিতে কি পাব তাহা ?
মরণে জীবন নব, সত্য কি তা শুনি ?
পাবে বারি দগ্ধ মরু ?
জনমিবে সুগতরু
সেই দুঃখ বীজ হতে, রেখেছি যা বনি ?

ক্ষণেক গর্জ্জন ভুলি,
শোন সিন্ধু কথাগুলি।

চারিদিকে অন্ধকার সুধুই ছাইল;
"তুচ্ছ মানবের দুঃখ" সাগর গর্জ্জিল!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

মহিমাধর্ম্ম।

(২)

অতঃপর তিনি পশ্চিমাঞ্চলের বহুতর স্থান পরিভ্রমণ ও তৎসঙ্গে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী উদাসীন ও পণ্ডিতগণের সহিত বিচার পুরঃসর মহিমাধর্ম্মের তত্ত্ব সকলকে প্রচারিত করিয়া উৎকল-ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। তখনও পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ দাস সমাধি-সিন্ধুর সুগভীরতলে নিবিষ্ট ছিলেন। তিনি গোবিন্দ দাসকে সমাধি হইতে সচেতন করিয়া এই নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মালোক বিস্তারের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ দাস এদিকে ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত রহিলেন, তিনি ওদিকে ঢেঙ্কানল নামক প্রসিদ্ধ ও সভ্যতর রাজ্যের সমীপবর্ত্তী কপিলাস পর্ব্বতে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কপিলাস উৎকলদেশের মধ্যে একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড পর্ব্বত, একদিকে ইহার জল বায়ু যেমন মনুষ্য শরীরের পক্ষে বিলক্ষণ হিতকর ও স্বাস্থ্য-সাধক, অপরদিকে ইহার প্রকৃতি ও সৌন্দর্য্যও সেইরূপ নয়নমনের সুখকর ও আনন্দ সম্পাদক। সেই জন্য এদেশীয় লোকেরা উপমা-স্থানে বঙ্গদেশের দার্জ্জিলিংএর ন্যায় কপিলাস গিরিকে উৎকলের দার্জ্জিলিং বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।* যাহা হউক পুরাকালে এই নয়নানন্দকর প্রশান্ত পর্ব্বত-পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা এই সমুন্নত গিরির শিখর-দেশে আরোহণ করিলেই জানিতে পারা যায়। কারণ ঐ স্থানে পর্ব্বত-পৃষ্ঠ-খোদিত অনেক সুরম্য গুম্ফা অর্থাৎ গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু এই পর্ব্বতারোহণের মধ্যবর্ত্তী পথের পার্শ্বদেশে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যাহাকে এদেশীয় লোকেরা কপিলঋষির গুহা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সুবিশাল অরণ্যমালাপূর্ণ; হস্তীভল্লুকব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদ-সমাকীর্ণ গিরিরাজি যে তপস্যার স্থান বলিয়া পুরাকাল হইতে উৎকলে প্রসিদ্ধ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এখন এই নবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বাবাজী কপিলাসাচলে গমন করিয়া কঠোর সমাধি-ব্রতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার অবস্থা সময় সময় এরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত যে, তিনি একেবারে হত-চেতন ও অসাড় হইয়া পড়িতেন। তখন শিষ্যগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহার সচেতনতা সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইত। এইরূপে সমাধি ও সাধনার সহিত কয়েক বৎসর কাল কপিলাসে ক্ষেপণ করিয়া, তথা হইতে

* শ্রীযুক্ত দামোদর পট্টনায়ক প্রণীত 'কপিলাস-ক্ষেত্র' নামক উৎকলভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে এই পর্ব্বতের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।

অবতরণ পূর্ব্বক পুনরায় প্রচার-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময় তাঁহার শিষ্য সকল এত বিস্তৃত সংখ্যায় পরিণত হইয়াছিল যে, স্বভাবতঃ তাহারা অপরাপর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে স্থানে গমন করিতেন, সেই স্থানেই শত শত লোক তাঁহার অনুগমন করিত, শত শত লোক একত্রে সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত। কপিলাস পর্ব্বত হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি অরণ্যস্থিত কুম্ভীবৃক্ষের পট অর্থাৎ বল্কল পরিধান করেন, সেই জন্য সেই সময় হইতে এই ধর্ম্মসম্প্রদায় কুম্ভপাতিয়া নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কুম্ভপাতিয়ার ন্যায় এই সম্প্রদায় অলখ্‌সম্প্রদায় ও মহিমা সম্প্রদায় নামে সাধারণের নিকট বিদিত। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত নামদ্বয় এই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তৎপরে ধর্ম্ম সংস্থাপনোদ্দেশে মহিমা বাবাজী উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। পার্ব্বত্য প্রদেশীয় পান, শবর, পাতিয়া প্রভৃতি অসভ্য-জাতির মধ্য হইতে সহস্র সহস্র লোক বিনা বিচারে তাঁহার নিকট এই ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যেরা মহানদীর তীরস্থিত মালবেহারপুর নামক গ্রামে একটি ধুনীঘর নির্ম্মাণ করে। তিনি তথায় যাইয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এইরূপে নিজমত-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-প্রচার ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় অতিবাহিত করিয়া কপিলাস পর্ব্বতের অন্যূন দুই ক্রোশ পশ্চিমে জোরেন্দা নামক গ্রামে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মৃত্যুকালে এক সহস্র গৃহত্যাগী উদাসীন এবং প্রায় লক্ষ গৃহীলোক তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল।

এখন আমরা দেখিব তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের তাৎপর্য্য কি? লোকে সচরাচর এই ধর্ম্মকে মহিমাধর্ম্ম ও অলখ্‌ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মহিমার্ণব পরমেশ্বরের মহিমাসংস্থাপনোদ্দেশে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, বোধ হয় সেই জন্যই ইহার নাম মহিমাধর্ম্ম হইবে। এবং অলেখ্‌ অর্থাৎ অলেখ্য-শক্তি ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিয়া ইহার নাম অলেখ্‌ বা অলখ্‌ধর্ম্ম হইয়া থাকিবে। অলখস্বামী ব্রহ্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে দ্বাত্রিংশৎ আজ্ঞা প্রচার করিয়া এই ধর্ম্মের মতামত সকল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা সেই সকল আদেশ অনুবাদের সহিত পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিলাম।

১। অলেখ অনাকার পরমেশ্বরের উপাসনা সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সার হয়।

২। সদ্‌গুরুর সেবা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন কর।

৩। অনুভবের দ্বারা অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

৪। অণিমাদি অষ্টযোগ সাধন দ্বারা আত্মাকে মুক্ত কর;

৫। নিজ শক্তি দ্বারা তপস্যা করিয়া সাত্বিক ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

৬। পবিত্র আত্মাতে সহস্রদলান্তর্গত জ্যোতিব্রহ্মকে ধ্যান কর।

৭। ভক্তি পূর্ব্বক পরমাত্মার সেবা কর।

৮। তিন সন্ধ্যা নাম মন্ত্র জপ করিয়া শরীর, মন, আত্মাকে পবিত্র কর।

৯। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ধারণা প্রভৃতি সাধন কর।

১০। পরম,শাস্ত্রের প্রচার এবং অভ্যাসের দ্বারা আত্মাকে তৃপ্ত কর।

১১। লোকদিগের নিকট ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন কর।

১২। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না এবং সাক্ষাৎ সত্য কহিবে।

১৩। ধৈর্য্য দ্বারা শান্তশীল হইবে।

১৪। সাধ্যানুসারে জীবের প্রতি দয়া কর।

১৫। দোষী ব্যক্তির দোষ ক্ষমা করিবে।

১৬। নিষ্কপট হৃদয়ে নিষ্কাম ও অহিংসা ব্রত পালন করিবে।

১৭। নিজমত রক্ষা পূর্ব্বক লোকদিগের উপকার কর।

১৮। ভাব ও প্রীতির দ্বারা সকলকে সমান দেখিয়া সমদর্শী হও।

১৯। লোভে পড়িয়া পরদ্রব্য চুরি করিও না।

২০। উপকার না দেখিলে কুসঙ্গ ও মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিবে।

২১। জাতি, গোত্র, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে।

২২। পঙ্কিল ভাবে লোকদিগের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া নির্লিপ্ত ও উদাসভাবে অবস্থান কর।

২৩। নরনারীকে পিতা মাতা জ্ঞান করিয়া মায়া-পাশ ছেদন কর।

২৪। একেশ্বরবাদী সাধু অতিথিদিগকে যথাশক্তি সেবা করিয়া উপদেশ দান কর।

২৫। নিজের প্রশংসা ও সুজনদিগের প্রতি নিন্দা ও উপহাস করিবে না।

২৬। পুণ্যপথ আশ্রয় করিয়া পাপকে ঘৃণা ও ত্যাগ করিবে।

২৭। নির্ব্বিকার দ্বারা বিকার পরিত্যাগ কর।

২৮। পঞ্চকোষ শরীর ও সমস্ত জড়প্রতিমার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড-কর্ত্তা পরমেশ্বরকে আশ্রয় কর।

২৯। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি করিয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সমস্ত সাধু ও শাস্ত্র বাক্যের সারাংশ গ্রহণ কর।

৩০। ধর্ম্মাত্মাকে সাক্ষী মানিয়া আত্মদ্রোহ করিও না।

৩১। সর্ব্বদা আলস্য ত্যাগ করিয়া এই সম্প্রদায় বৃদ্ধি কর।

৩২। শ্রদ্ধার সহিত এই বত্রিশ আজ্ঞা পালন কর এবং লোকের হিতের নিমিত্ত ইহা প্রচার কর।

উল্লিখিত আদেশ সকল পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যাইতেছে যে, এই সম্প্রদায়স্থ লোকেরা জড়মূর্ত্তির পূজা করে না, ইহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের উপরে। ইহারা পুত্তলিকার চরণে কোনরূপেই মস্তক অবনত করিতে চাহে না, এমন কি এই সম্প্রদায়স্থ অনেক লোকে একবার দলবদ্ধ হইয়া জগন্নাথ মূর্ত্তিকে চূর্ণ করিবার জন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। মহিমাধর্ম্ম একদিকে যেমন পৌত্তলিকতার প্রবল প্রতিরোধী, অন্যদিকে ইহা সেইরূপ জাতিভেদ স্বীকার করে না। রাজা, বেশ্যা ও রজক এই তিন শ্রেণীর লোক ভিন্ন ইহারা সকল জাতির হস্তের অন্ন সচ্ছন্দে ভোজন করিয়া থাকে। তৎপরে সদ্গুরুর আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার সেবাদ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যায়, ইহা মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রবল

বিশ্বাস ; কারণ পূর্ব্বোল্লিখিত বত্রিশ আজ্ঞার মধ্যে দ্বিতীয় আজ্ঞাতেই ইহা পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে। সেই কারণে ইহাদিগের মধ্যে গুরুপদের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকে। ঐ সকল আদেশ পাঠ করিয়া আরও জানিতে পারা যায় যে ইহাদিগের সাধন প্রণালী, নামজপ, অণিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি সাধকযোগ প্রণালী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিতেছে। এই সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, এক শ্রেণী গৃহী, অপর শ্রেণী উদাসীন। গৃহীরা আবার নামাশ্রিত প্রভৃতি তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উদাসীনদিগের মধ্যেও আচারী প্রভৃতি তিন সম্প্রদায় আছে, আচারী সম্প্রদায়স্থ লোকেরা নিজে রন্ধন করিয়া খায় এবং দিবাভাগের মধ্যে তিনবার স্নান করিয়া থাকে। গৃহীরা প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া রক্তবর্ণ সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অলখ্ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করে এবং দিবাবসান সময়েও সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অলখ্ নাম উচ্চারণ পুরঃসর প্রণাম করিয়া থাকে। প্রথমে নামজপ সাধনে সিদ্ধ হইলে, তৎপরে অন্যান্য সাধনপথ অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাদিগের যোগপ্রণালী আট অঙ্গে বিভক্ত; —(১) নাম সাধন (২) যন্ত্রসাধন (৩) ছায়া সাধন (৪) অবাড় সাধন (৫) পবন সাধন (৬) ধ্যান (৭) অনাহতের শব্দ শ্রবণ (৮) আসন সাধন। ইহাদিগের যোগের অঙ্গ যেমন আট প্রকার, সেইরূপ ইহাদিগের যোগও ধনঞ্জয়-যোগ, মৃত্যুঞ্জয় যোগ, সমাধিযোগ, প্রভৃতি আট শ্রেণীতে বিভক্ত। মহিমাধর্ম্ম প্রচারক অবধূতেরা দীক্ষার সময় দীক্ষার্থীকে প্রথমে প্রণামসাধন শিক্ষা দেয় অর্থাৎ গুরুর প্রতি প্রণাম, ঈশ্বরের প্রতি প্রণাম প্রভৃতি প্রণাম কিরূপে করিতে হয় তাহার উপদেশ দিয়া থাকে। তৎপরে জাতিভেদ ও দেবোদ্দিষ্ট বস্তু ভক্ষণ নিষেধ বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার পর নামসাধন এইরূপে উত্তরোত্তর উচ্চতর অঙ্গের সাধন সকলে শিক্ষা দিতে থাকে।

উপরিউক্ত দ্বাত্রিংশৎ আদেশের মধ্যে যদিও অন্যান্য আদেশ সকলে ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ উপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু বিংশতি আদেশের মধ্যে যে মত পরিব্যক্ত হইয়াছে আমরা তাহার সহিত কোনরূপেই একমত হইতে পারি নাই। অর্থাৎ ঐ আদেশের মধ্যে লিখিত হইয়াছে, যে, "বিনা উপকারে কুসঙ্গ ও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিবে না," তাহা হইলে এতদ্দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রকাশ পাইতেছে যে, উপকারের সম্ভাবনা দেখিলে কুসংসর্গ ও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিবে। এরূপ অনর্থকর সুনীতি বিরুদ্ধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে আদেশ প্রদান করা যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মনিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাহউক এপ্রস্তাব সম্বন্ধে আর কয়েকটি আবশ্যকীয় কথা বলিয়া আমরা ইহার উপসংহার করিতেছি। মহিমাধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাধনার নিমিত্ত প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক একটী টুঙ্গী অর্থাৎ সামান্য কুটীরের ন্যায় ঘর আছে। ইহারা সন্ধ্যাকালে তাহার মধ্যে সমবেত হইয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, সাধন, ভজন এবং পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীত করিয়া থাকে। ইহাদিগের সঙ্গীত সকলে অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের

স্বরূপ ও গুণ-প্রসঙ্গ এবং মধ্যে মধ্যে জড়োপাসনার বিরোধ-ব্যঞ্জক বাক্য সকলও নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এই পৌত্তলিকতাবিরোধী একেশ্বরোপাসক সম্প্রদায়ের কোন তীর্থ নাই এবং ইহারা তীর্থের মাহাত্ম্যও স্বীকার করে না। তবে ইহারা জোরেন্দা গ্রামের সমাধিকে পরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করে, কারণ সেই স্থানে অলখ্ স্বামীর সমাধি হইয়াছে। কিছুদিন হইল এই সম্প্রদায়কে দিন দিন বহু বিস্তৃত হইতে দেখিয়া রাজবিদ্রোহী বিবেচনায় গভর্ণমেণ্ট নরসিংহ দাস নামক একজন অবধূতকে কটকে আনিয়া তিন মাস কাল কারারুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দেন। বাস্তবিক ইহারা রাজবিদ্রোহীও নহে, অথবা সমাজদ্রোহীও নহে। ইহারা শান্তচিত্তে সরল ভাবে নানাস্থানে আপনাদের মত পরিব্যক্ত করিয়া থাকে। মহিমাবাবাজীর মৃত্যুর পর হইতে অদ্যাবধি প্রায় একাদশ বৎসরের মধ্যে চৌষটি জন লোক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অবধূত বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। যদিও এই সকল প্রচারকদিগের বুদ্ধি তত মার্জ্জিত নহে; মস্তিষ্ক তত প্রসারিত নহে; ধারণাশক্তি তত উজ্জ্বল নহে, গবেষণা তত বিস্তৃত নহে এবং বিচারপদ্ধতি তত তীক্ষ্ণ নহে এবং এমন কি ইহাদিগের মধ্যেও যদিও অনেকে নিরক্ষর, তথাপি ইহাদিগের অমার্জ্জিতবুদ্ধিপ্রসূত অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন-হৃদয় নিঃসৃত উৎসাহশিখাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারি না।

ভারতবর্ষে বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ বিস্তারের নিমিত্ত অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল হইল বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজ নামে একেশ্বরবাদীদিগের একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যে সুশিক্ষিত মার্জ্জিতমনা অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে অনেক মর্য্যাদাবান্, ধনবান্ এবং সম্ভ্রমবলে বলীয়ান্ ব্যক্তি আছেন, ইহাঁদিগের মধ্যে অনেক হৃদয়োদ্দীপনকারিণীবাগ্মিতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, তথাচ অজ্ঞানান্ধ অসভ্য লোকসমাকীর্ণ এই মহিমাসম্প্রদায়ে এত অল্পকালের মধ্যে যে অধ্যবসায় ও উৎসাহাদির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এই পণ্ডিত ও সজ্জনপরিপূর্ণ বিশুদ্ধ ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসে এই দীর্ঘকালের মধ্যেও তাহার শতাংশের একাংশও পরিলক্ষিত হইতেছে না। যে পরিশুদ্ধপুণ্যালোক-স্রাবিনী তেজোনিঃসারিণী সুস্নিগ্ধ স্বর্গীয় আলোকশিখায় জগতের সকল অন্ধকার তিরোহিত হইবে, অধর্ম্ম বংশের বিলোপ হইবে, অজ্ঞানবিভাবরীর অবসান হইবে, কেন সেই আলোক দিন দিন ম্লানভাব ধারণ করিতেছে, কেন সেই আলোকশিখা মেঘান্তরালবর্ত্তিনী তরুণ সূর্য্যশিখাবৎ উত্তরোত্তর অস্পষ্টীকৃত ও মন্দীভূত হইয়া বিনাশদশায় নীয়মান হইতেছে? যে সূর্য্য জগতের অন্ধকার তিরোধানের জন্য, বঙ্গদেশে অভ্যুদিত হইয়াছিল; কেন সেই সূর্য্যালোক মধ্যাহ্নদশায় পদার্পণের পূর্ব্বে এই সঙ্কীর্ণ বঙ্গসীমার মধ্যেই নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়া পড়িতেছে? ভারতের অদৃষ্টে কি তবে পরিত্রাণ-মুকুট নাই? এই অধঃপতিত জাতির কি তবে আর সদ্গতির আশা নাই? নিশ্চয় আছে, চাই উৎসাহ এবং জীবন অধ্যবসায় এবং একপ্রাণতা।

মহিমাধর্ম্মাবলম্বীবা জাতিভেদের শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছে, জড়োপাসনা ও পৌত্তলি-

কতার প্রতিকূলে সতেজে দণ্ডায়মান হইয়াছে। বলিতে গেলে তাহারা ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মমতের অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে তাহাদিগের মধ্যে দিন দিন নানা প্রকার কুসংস্কার প্রশ্রয় পাইতেছে; ব্যভিচারাদি ধর্ম্মবিগর্হিত নানাপ্রকার কুনীতি সকলও তাহাদিগের সমাজ মধ্যে অল্পে অল্পে প্রাদুর্ভূত হইতেছে এবং জ্ঞানাভাব নিবন্ধন ত্রুটি সকলও এই সম্প্রদায়ে দিন দিন সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছে। একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের প্রচারকগণ এবং বন্ধুগণ! আমি আপনাদিগকে ধর্ম্মপ্রচারের নামে এবং জগতের হিত ব্রতের নামে আহ্বান করিতেছি এবং জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনাদের দৃষ্টি কি এই পতনোন্মুখ একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের দিকে পতিত হয় না? ইহাদিগের সংস্কার এবং উন্নতির জন্য কি আপনাদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় জাগ্রত হয় না? সুদূরবর্ত্তী ইংলণ্ড এবং আমেরিকার জন্য আপনাদের চিন্তা সঞ্চলিত হইয়া উঠে, কিন্তু যাহারা আপনাদিগের বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথের এত দূরে অগ্রসর হইয়াছে এবং যাঁহারা আপনাদিগের প্রতিবাসীস্বরূপ, তাহাদিগকে আহ্বানের জন্য যদি আপনাদিগের হস্ত প্রসারিত না হইল, তবে কি জানি, আপনাদের প্রচার পদ্ধতির কিরূপ অর্থ!

সমাপ্ত।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় ভাষার আবশ্যকতা।

মানুষ কথা কয়, মানুষ শুনে। মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করে, মানুষ কাণ পাতিয়া শুনিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করে। মানুষের মনের ভাব যদ্দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাকেই শব্দ বলে। কতকগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ শব্দের নাম পদ। সুশৃঙ্খলাবদ্ধ পদ সমষ্টির নাম ভাষা। সুতরাং যদ্দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত হয়, তাহাই ভাষা। ভাষা ভিন্ন মানুষ মানুষকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে না। একতার প্রথম জিনিস, পরস্পরকে জানা, বুঝা। যাহাকে জানা যায় নাই,—সে ব্যক্তি কল্পনার আঁধার-মাখা ছায়া-জগতে জীবিত, তার সহিত আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাওয়া মহাভ্রান্তি। যাহাকে জানিয়াছি, দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি,—স্থূলত তাহাকেই ভালবাসি। পরিচিত বা জানিত লোককে ভালবাসাই মানুষের স্বভাব। অর্থাৎ প্রেমের মূলে জ্ঞান। ভাষা জ্ঞান-সোপান। অতএব বুঝা যাইতেছে, ভাষাই মানুষকে আত্মীয়তার জগতে বা মিলনের জগতে টানিতেছে। যে জগতে ভাষা নাই, সে জগতে মিলন নাই, একতা নাই,—প্রেম নাই, কিছুই নাই।

এই জগত ভাষাময়। জড়ই বল আর চেতনই বল,—সকলই যেন কি একটা ভাবে বিভোর। কেহ কথা কয়, কেহ কয় না—কিন্তু সকলই ভাবে বিভোর। ফুল হাসে,

পাখী গায়, সূর্য্য জ্যোতি ঢালে, নক্ষত্র মধুর চাহনি চায়, নদী চলে, সময় বয়—এসকলই কি জানি একটা মহা ভাবে বিভোর। কেহ কেহ বলেন, চেতন ভিন্ন আর কোন কিছু মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারে না। মিথ্যা কথা। সকলই ভাবে বিভোর—সকলই আপন আপন বিশেষত্ব জগতে ঢালিতেছে। সকলই কি যেন এক অলক্ষিত গুপ্ত শক্তির মহিমা-গীতি গাইতেছে। তাই বলি, এই জগত ভাষাময়, কাব্যময়। ভাষাময়ই বল বা সঙ্গীতময়ই বল। যা খুসি। কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে,—চেতন এবং অচেতন,সমস্তই আমাদিগকে নূতন নূতন রাজ্যে লইয়া যাইতেছে। ফুলটী বাগানে ফুটিয়া, পাতাটী মৃদু দোলনে দুলিয়া—কি অমৃত ঢালিল, কি করিয়া যেন প্রাণ কাড়িয়া লইল। তোমরা বলিতে পার, ওত সব জড়, প্রাণ কাড়িবার ওদের কোনই শক্তি নাই। কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সকলেরই প্রাণ কাড়িবার শক্তি আছে। সকলই কোন না কোন ভাবে, কোন না কোন রূপে প্রাণ কাড়িতেছে। প্রাণ কাড়িয়া আপন প্রাণে বাঁধিতেছে। ফুলটীকে কেন বল ত মানুষ অত দেখে,—কেন বল ত দেব-সেবায় দেয়,—কেন বল ত হৃদয়ে পরে? ফুলটী কি যেন এক মধুর কথায়, মধুর আকর্ষণে মানুষকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। তাই তাকে মানুষ এত ভালবাসে। মানুষ কণ্টকের ভয় করে না—মানুষ ফুল তুলিয়া গলে পরে। যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে ফুল দেয়। সুসভ্য এবং অসভ্য —সকল লোক এই ফুলের নিকট আত্ম-বিক্রীত। এইরূপে দেখা যায়, জগতের সকল অণু পরমাণু, জীব জন্তু আপন ভাষায় অপরকে পরিচয় দিয়া, আপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া সকলকে প্রাণের পানে টানিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জীব, জন্তু, জড়, অজড়, সকলই আপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া এক মহাপ্রাণতায় সকলকে বাঁধিতেছে। কেহবা নীরবে, কেহবা সরবে, আপন তত্ত্ব জগতে ঘোষণা করিতেছে! কার ইঙ্গিতে কে জানে, সকলই হাসে, গায়, কথা কয়, ভাব ঢালে।

তবে বুঝা যাইতেছে,—ভাষা সরব, এবং নীরব। জীবের ভাষা, সরব; জড়ের ভাষা,—ফুলের ভাষা, চন্দ্র সূর্য্যের ভাষা—নীরব। ভাষার কাজ প্রাণের পরিচয় দেওয়া, প্রাণ কাড়া, প্রাণে প্রাণ বাঁধা। সে কাজ কিন্তু এই নীরব এবং সরব, উভয় ভাষার দ্বারাই সাধিত হয়। বহুদিন পর প্রণয়ী যুগলের মিলন হইয়াছে, নয়নে মাত্র দুই বিন্দু জল, মুখে কথাটী নাই;—তবু উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিয়া লইতেছে; উভয়ে উভয়ের প্রাণে ডুবিতেছে। পরস্পরকে বুঝিয়া লওয়া যদি কথা,তবে উভয়ের দেখা সাক্ষাতেই বুঝা শুনা হইতেছে। এখানেও নীরব ভাষার নীরব কার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু অনেক সময় মানুষ কথা না বলিয়া প্রাণের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। পারিলেও তাহা মানুষ সব সময় বুঝে না। এই জন্যই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষার সৃষ্টিতে মানুষের মিলনের যে একটা অতি আশ্চর্য্য জগৎ খুলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। নীরব ভাষার শক্তি কেবল বর্ত্তমান লইয়া,সরব ভাষার শক্তি অতীত এবং ভবিষ্যতের পরপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নীরব

ভাষা দেখা সাক্ষাতে মাত্র কার্য্যকরী; কিন্তু সরব ভাষা লিপিবদ্ধ হইয়া অনন্ত কাল মানবজগতে শক্তি বিকীর্ণ করিতেছে। একটা ক্ষণস্থায়ী,—এই আছে, এই নাই;—মাদকতা,—উন্মত্ততা,—বা কেবল ভাবময়। আর একটা অনন্তকাল স্থায়ী,—ভাবের অতীত, চিন্তাময়,—জীবনময়।

ইংরাজ জাতি আজ জগতের সকলের প্রিয়। কেন বল ত?—বাহুবলে, ধন বলে, ঐশ্বর্য্য বলে? মিথ্যা কথা। ইংরাজজাতি প্রধানত ভাষার মোহিনী সঞ্জীবনী মন্ত্রে জগৎকে এক প্রাণে বাঁধিতেছে। কোথায় কোন্ যুগে সেক্ষপীয়র বা মিল্টন জন্মিয়াছিলেন, আজও তাঁহারা যেন জীবিত। তাঁহারা জীবিতের ন্যায় কত কথাই বলিতেছেন, কত ভাবই ঢালিতেছেন, কত মিলনের সংবাদই আনিতেছেন। অতীত জগত—বর্ত্তমান জগতে বাঁধা। বর্ত্তমান—ভবিষ্যতের করে বাঁধা। অনন্তকাল ব্যাপিয়া ঐ মধুর সঙ্গীতরব উঠিতেছে—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎকে বাঁধিতেছে। ভাষা কালের অতীত। কেবল কি তাহাই? ভাষা দেশেরও অতীত। ভাষা যাকে পায়, তাকেই মাতায়, তাকেই বাঁধে, তাকেই কাঁদায়। ইংলণ্ড আজ পৃথিবীর প্রাণের জিনিস। ইংলণ্ড আজ পৃথিবীতে একভূত। ইংরাজি ভাষা আজ দেশে দেশে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মিলনের মূল মন্ত্র। ইংরাজি ভাষার গৌরব আজ সকলের মুখে কীর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবীকে এইরূপ একপ্রাণতার স্বর্গীয় মন্ত্রে দীক্ষা দিতেছে যে ইংরাজি ভাষা, ইহা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল? মাত্র দুটী দশটী লোকের মুখের অস্পষ্ট শব্দে নিবদ্ধ ছিল। আর আজ দেখ, পৃথিবীর আর সকল ভাষা যেন নিবিয়া যাইতেছে, ইংরাজি ভাষা নবজীবন পাইতেছে। অথবা আর সমস্ত ভাষা যেন আপন অস্তিত্ব ইহাতে মিশাইয়া কলেবর ত্যাগ করিতেছে। আজ লাটিন, গ্রীক, এবং দেবভাষা সংস্কৃতের এত অনাদর, আর দেখ আসুরিক ভাষা ইংরাজির কত আদর!

ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশক। যখন যে দেশে মানুষের অভ্যুদয় হইয়াছে, তখনই সেই দেশে একটা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। জড় অবস্থায় নীরব ভাষা। অসভ্য অবস্থা জড় অবস্থার একটু উপরে। সেখানেও ভাষা আছে, কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ নয়। বিবর্ত্তনবাদের মূলে যতদূর যাইতে চাও, যাও, দেখিবে, সর্ব্বত্রই ভাষা আছে, কিন্তু কোথাও সরব, কোথাও নীরব, এই মাত্র প্রভেদ। কোথাও মৃত, কোথাও ক্ষণস্থায়ী,—কোথাও জীবন্ত, কোথাও অনন্ত কালস্থায়ী। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিতেছেন যে, জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি হইতেছে। অথবা জড় ও চেতনের মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম স্থান আছে, যাহা নির্ণয় করিতে মানুষের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়। চেতন আবার নানারূপ অবস্থা ও রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া সুসভ্য মানবদেহ ধারণ করিতেছ। সৃষ্টিতত্ত্বের এ গূঢ় রহস্যে লোকের সন্দেহ থাকে, থাকুক, কিন্তু একথায় কাহারও সন্দেহ থাকিবার উপায় নাই যে, মানুষ যতই সভ্য হয়, ততই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। অর্থাৎ ততই লোকের মনোভাব প্রকাশের সহজ উপায় আবিষ্কার হয়। কিম্বা যতদিন মানুষ জীবিত, ততদিনই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন, তৎপরই ভাষার হীনাবস্থা। প্রাচীন লাটিন, গ্রীক এবং সংস্কৃত ভাষার স্থানে যে

ইংরাজি ভাষা বৈজয়ন্তী উড়াইতেছে, ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয় যে, প্রাচীন রোমক, গ্রীক বা হিন্দুজাতি মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বস্তুত কথাও তাই। যে সময় হইতে পবিত্র সংস্কৃত ভাষা, লাটিন এবং গ্রীক ভাষার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে পৃথিবীর প্রাচীন গৌরব ঐ উন্নত জাতি সকলের মহাপতন হইয়াছে। সেই সময় হইতে রোম জাতির অবনতি, গ্রীক জাতির হীনাবস্থা, এবং আর্য্য-জাতির মহাপতন হইয়াছে। আর্য্য-জাতি নাই—তাই আর্য্যভাষা নাই; তাই ভারতভূমে ইংরাজির এত আদর! কোন জীবিত জাতি যে পরমুখে কথা কহিতে পারে না, এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া আর উপায় নাই।

মানুষ জীবিত না মৃত? একথার প্রমাণ কিসে পাওয়া যায়? মানুষ কথা কয় কি না কয়;—ইহাতে। নিঃশ্বাস বহে কি না বহে, এও জীবন মরণের একটা পরীক্ষার ব্যাপার বটে, কিন্তু যে জীবন মরণ শরীর সম্বন্ধীয়। মানুষ শরীর ধারণ করিয়াও মরণের কোলে পড়িয়া থাকিতে পারে। মানুষ বাঁচিয়াও মৃতের ন্যায় থাকিতে পারে। যে বীজে মানুষের উৎপত্তি হয়, সে বীজে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবিত অনেক পরমাণু থাকে; কিন্তু কথাও বলে না, নিঃশ্বাসও ফেলে না। এই জন্য তাহাদিগকে কেহ জীবিত বলে না, বুঝিলাম। শিশু যখন জরায়ু গর্ভে অঙ্গে অঙ্গে সর্ব্বাবয়ব পাইয়াছে, তখনও সে কথা বলে না, কিম্বা নিঃশ্বাস ফেলে না। বলত সে জীবিত কিনা? সকলেই বলে, জরায়ুগর্ভে শিশু জীবিত, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্যতার ইতিহাসে তার নামে একটা মরণের কালির দাগ অঙ্কিত রহিয়াছে,—সে সভ্যতার জগতে আজিও জীবিত মানুষ বলিয়া পরিচিত হয় নাই। তারপর পৃথিবীতে কত কোটি কোটি অসভ্য মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাসে তাহারা মৃতের ন্যায় ব্যবহৃত। পৃথিবীতে এইরূপ কত মানুষ জীবন ধারণ করিয়াও সভ্যতার জগতে বা মনুষ্যত্বের বাজারে যে মরিয়া রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? অনেক মানুষ বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু জীবন ধারণের কোন স্মৃতি রাখিয়া যায় না, তাহারা মৃত অপেক্ষাও মৃত। তাহারা জীবন্মৃত। আর যাহারা মানুষ, তাহারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, কার্য্য করে। জীবন্ত মানুষের সমষ্টিতে জীবন্ত জাতির অভ্যুদয়। জীবন্ত জাতির অস্তিত্ব যেখানে, সেই খানেই জীবন্ত ভাষা। অথবা জীবন্ত ভাষাই জীবন্ত জাতির অস্তিত্ব ঘোষণা করে। জীবন্ত জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছে, অথচ ভাষা জীবন্ত নাই, অথবা সেই জাতিকে একপ্রাণতায় বাঁধিবার জন্য ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কোথাও নাই। সকল জীবন্ত জাতির সভ্যতার ইতিহাস খুলিয়া পাঠ কর,—জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, জাতীয় অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার সৃষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। জাতীয় ভাষার উন্নতিতে জাতির উন্নতি, আবার জাতির উন্নতিতে ভাষার উন্নতি। দুই মেশামেশি, ঘেসাঘেসি। একের অবনতি যেখানে, সেখানে অপরের উন্নতি অসম্ভব। ভাষা নাই, জাতির অভ্যুত্থান

হইয়াছে,—একতা আসিয়াছে, ইহা কোথাওও পাঠ করা যায় নাই। অথবা জাতি আছে, জীবন্ত মানুষ আছে, অথচ জাতীয় ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, ইহাও দেখা যায় নাই। জাতির উন্নতিতে ভাষার উন্নতি, ভাষার উন্নতিতে জাতির উন্নতি। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যাহা পৃথিবীতে আর কোথাও হয় নাই, তাহা ভারতে কেমনে সম্ভব হইবে? তাহা হওয়া অসম্ভব। ভারতে এক ভাষা যত দিন না হইবে, ততদিন ভারতে একপ্রাণতার মধুর মিলন বা জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব।

গত বৎসর জাতীয়-মহা-সমিতিতে একজন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ সংস্কার মানুষের লক্ষ্য। তারপর যদি আর কিছু বাকী থাকে, তবে তাহা রাজনীতি-সংস্কার। আমরা বলি, সর্ব্বাগ্রে ভাষা-সংস্কার মানুষের লক্ষ্য, তারপর আর সকল সংস্কার। আগে মানুষ কথা কহিতে এবং কথা শুনিতে শিখে, তারপর অন্যান্য প্রকার উন্নতি করে। কথা বলা বা শুনার সুবিধা যার নাই, সে কেমনে উন্নতি করিবে? সব মানুষ কিছু মাটীতে পড়িয়া বড় হয় না। মানুষকে মানুষ করিতে হইলে—মানুষের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে, মানুষের কথা শুনাইতে হইবে। মানুষকে মানুষ করিতে হইলে প্রাণময় জীবন্ত মানুষের প্রাণের কথা বলিতে হইবে;—কীর্ত্তিময় মানুষের মহা-কাহিনী শুনাইতে হইবে। ভাষার সাহায্য ভিন্ন ইহা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ভাষার উন্নতি ভিন্ন মানুষের উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তিগত উন্নতি ভিন্ন জাতির উন্নতি অসম্ভব। যেখানে ভাষা নাই, সেখানে উন্নতিও নাই। ভাষা শূন্য জাতি পৃথিবীতে মরণের কোলে মহাকাল নিদ্রায় চির-নিদ্রিত!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পর মুখে কথা বলিয়া কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। ইংরাজ জাতির অভ্যুত্থান একথা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছে যে, যদি জাতিত্ব গঠনে চেষ্টা করিতে হয়, তবে জাতীয় ভাষার গঠনে সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে। এক দিন দুদিনের কথা নহে। এক শত দুশত বৎসরেরও কথা নহে। কোন জাতির উন্নতি একশত বা দুশত বৎসরে হয় নাই। সহস্র বৎসরের চেষ্টার পর সুফল ফলে। ভারতবর্ষে নানা জাতির নানা ভাষা। এই সমস্ত ভাষা মিলাইয়া এক করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাত বটেই। সোজা হইলে সকলেইত একটা মিলন ঘটাইতে পারিত। কঠিন বলিয়াই তাহা সহজে হইতেছে না। কঠিন বলিয়াই হুজুগে বা বাল-চাপল্যের ক্রীড়ায় ও বাহ্য আন্দোলনে তাহা হইতেছে না। প্রকৃত উপায় অবলম্বন না করিলে তাহা হইবেও না। পৃথিবীতে যে ইংরাজি ভাষা এত পরিব্যাপ্ত হইবে, কেহ কি দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল? কিন্তু আজ তাহা জগতে সংসাধিত হইয়াছে। ভারতের এক ভাষা হইবে, ইহা কল্পনা করিতেও এখন অনেকে ভীত হন। বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহারাই কিন্তু ভারতকে স্বাধীন করিবার আশার কুহকে মাতোয়ারা। যেটা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সেটাকে সহজ মনে করেন, কিন্তু যেটা অপেক্ষাকৃত সহজ, অথচ জাতিত্ব গঠনের মূলভিত্তি, সেটাকে কল্পনার ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন।

ভাষার উত্তেজনা ভিন্ন কোন দেশের কোন পরিবর্ত্তন,—কোন প্রকার আমূল সংস্কার-কার্য্য সংসাধিত হয় নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচারের কথাই বল বা ফরাশি বিপ্লবের কাহিনীই বল,এসকলই ভাষারূপ মহাশক্তির উদ্গীরণের ফল। ভল্টেয়ার, রুসো, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি অতি সামান্য সামান্য ব্যক্তির লেখনী এই ভাষার সাহায্যে পৃথিবীকে কিরূপ আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, দেখ। যেদেশে ভাষার সৃষ্টি হয় নাই, সে দেশের উন্নতি হইয়াছে, শুনিয়াছ কখনও? আমরা কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে দৃষ্টান্ত পাইতেছি না।

ভারতকে একপ্রাণে বাঁধিতে ইচ্ছা থাকিলে, জাতীয় প্রাণের ভাষা সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। প্রাণের ভাষা, এ কিরূপ কথা? কথাটা এই। পৃথিবীতে দেখা যায়, দেশ কালের বিভিন্নতাতে, অবস্থাগত পার্থক্যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন স্বর, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন লোকের আকৃতি এবং প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সবই পৃথক্ পৃথক্। যে দেশের যেমন প্রাণ, সেই দেশের তেমন প্রাণের কথা। যার প্রাণে দুঃখ, সে দুঃখের কথাই বলে; যার প্রাণে সুখ, সে সুখের কথাই কয়। যার প্রাণে বীরত্ব—সে বীরত্বই প্রকাশ করে, যার প্রাণে প্রেমের কোমলতা, সে তাহাই জগতের লোককে জানায়। ভাষা প্রাণের ছায়া, তা নীরবই হউক, আর সরবই হউক। নীরব ভাষাও প্রাণের ছায়া, সরব ভাষাও প্রাণের ছায়া। যার প্রাণ যেমন,তার প্রাণের ছায়াও তেমনি। এই জন্যই দেখা যায়, পৃথিবীর নানা লোকের নানা ভাষা। আমার ভাষা তুমি বুঝ না, তোমার ভাষা আমি বুঝি না। তোমাকে আমি চিনি না, তুমিও আমাকে বুঝ না। আমি যা বলি তুমি তা অন্যরূপ বুঝ। আমি বলি, তোমাকে ভালবাসার কথা, তুমি বুঝ, আমি শত্রুতার ফন্দি বিস্তার করিতেছি! প্রাণের কথা একেবারে অন্যেকে খুলিয়া বুঝাইতে পারে, পৃথিবীতে আজও ভাষার তেমন শক্তি জন্মে নাই। সেই জন্যই ভাষাকে অনেক সময়েই অসম্পূর্ণ বলি, তবে যত টুকু মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারা সম্ভব, তাহা কিন্তু এই ভাষাই পারে। প্রাণের সব কথা ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না বটে, কিন্তু কতক ত পারে। এই এই জন্যই ভাষার মহিমা কীর্ত্তন করি। ভাষা নানা জাতির নানারূপ। নানা জাতি, নানা রূপ। একরূপ ভাষা জগতের বিধান নয়—প্রকৃতি বা আকৃতিও জগতের সমস্ত জাতির একরূপ নয়। ধর্ম্ম সকলের এক নয়, ভাষাও এক নয়। তবে মোটামুটি ধরিতে গেলে, এক এক দেশের এক একটা মিলনের ঠাঁই পাওয়া যায়,—এক ধর্ম্ম বা এক ভাষার অর্থ ইহাই। সকলই পৃথক্ বটে, কিন্তু মিলনেরও ত ঠাঁই আছে। আছে বলিয়াই বলি, ইংরাজ জাতির যেমন ইংরাজি ভাষা, ভারতবর্ষের আর্য্যজাতির তেমনই সংস্কৃত ভাষা ছিল। যে সংস্কৃত ভাষা এক সময়ে এক-প্রাণতায় আর্য্যাবর্ত্তের সকল নর-নারীকে বাঁধিয়াছিল, সেই দেশে নাকি ভাষার একতা আজ অসম্ভব! রামায়ণ, মহা-ভারতের কাহিনীতে ভারতের কাহার প্রাণ মোহিত নয়? কালীদাস, ভবভূতির লেখায় কার প্রাণ সরস হয় না? বেদ বেদান্তের স্বর্গীয় তত্ত্ব পাঠেই বা কাহার হৃদয় আনন্দিত হয় না? অধিকাংশ লোকে

রই হয়। কারণ এই, অধিকাংশ লোকেরই প্রাণের কথার একটা মিলনের মন্ত্র যেন ঐ সকলে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—অবস্থাগত, সমাজগত, দেশগত বা ধর্ম্মগত একতাতে ভারতভূমির নর-নারীর মিলনের একটা জমাট ঠাঁই আছে। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে গান্ধার ও আরব সাগর, পূর্ব্বে বঙ্গ উপসাগর ও মগমুল্লুক,—ইহার মধ্য-ভাগের অবস্থা অনেকটা একরূপ। এক আর্য্যজাতির শোণিতযোগে ভারতের অধিকাংশ মিশ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা এই দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম। এক হিন্দু সমাজের বক্ষে এক আচার প্রাণালীতে সকলে লালিত, পালিত ও দীক্ষিত। এক সংস্কৃত ভাষা, সকলের মূল ভাষা। এক ইতিহাস, এক কাব্য, এক শাস্ত্র, এক তন্ত্র সকলের উপদেষ্টা। এইত অধিকাংশ লোকের কথা বলা হইল। মুসলমান সম্প্রদায়কে বাদ দিয়াই এ কথা বলিলাম। রাজনীতির ধুয়া ছাড়িয়া দিলেও, ভারতবর্ষে হিন্দুর প্রাণ হিন্দুর প্রাণে মিলাইবার এই সকল উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এসকল সত্ত্বেও মিলন হইবে না কেন, আমরা কিছুই বুঝি না। মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত কি সূত্রে মিলিবে, সে কথাও সংক্ষেপে বলি।

বিদেশ হইতে আসিয়াও এখন মুসলমান সম্প্রদায় ভারতের জলবায়ুতে জীবিত থাকিয়া থাকিয়া আর্য্যজাতির কতকটা ধাতু প্রাপ্ত হইয়াছে। নানা রূপে আর্য্যজাতির অনুপ্রাণনে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যে জাতি যখন প্রবল হয়, সেই জাতির সংঘর্ষণে দুর্ব্বল জাতির পৃথক অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যায়। (Survival of the Fittest) মতের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, অনেক দুর্ব্বল জাতি প্রবলতর জাতির সংঘর্ষণে পড়িয়া কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। আর্য্যজাতি আবার যদি মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হয়, আর্য্যজাতির সংঘর্ষণে মুসলমান জাতির পৃথক্ অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। এখনই এ কথার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্রমেই হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব জন্মিতেছে। হিন্দুর ভাষা, হিন্দুর আচার-প্রণালী অনেক মুসলমানকে দীক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্ব্বে মুসলমান রাজা ছিল বলিয়া এই একীকরণ একটু মন্দীভূত ছিল। এখন হিন্দু মুসলমান এক অবস্থায় উপনীত। হিন্দুর ভাষা হইতে মুসলমানের ভাষা বা ধর্ম্ম আর সহস্র বৎসর পৃথক থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমান ও হিন্দু এক ভাষায় কথা বলিয়া একসময়ে এক প্রাণে যে আবদ্ধ হইবে, এখনই তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইতেছে।

এই জাতীয় ভাষা কিরূপ হইবে, ইহাতে লোকের সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক কথা, এদেশের উপযোগী হওয়া চাই। ইংরাজী ভাষা বীরত্বব্যঞ্জক, সংস্কৃত ভাষা প্রেমব্যঞ্জক,—সঙ্গীতময়, ধর্ম্মময়, মধুময়। ভারতে যে ভাষা কালে প্রাণের ভাষা হইবে, অর্থাৎ প্রাণ-বিনিময়ের মূলমন্ত্র হইবে, সে ভাষাকেও সঙ্গীতাত্মক মধুর হইতে হইবে। সংস্কৃত ভাষা হইতে খুব পৃথক হইলে কখনই তাহা ভারতের ভাষা হইবে না। বাঙ্গলা ভাষা যেরূপে গঠিত হইতেছে, নানা কারণে এই ভাষাকেই ভারতের একপ্রাণতার ভাষা বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে। এই ভাষা সংস্কৃতের ন্যায় মধুর; এই ভাষা সর্ব্বতোভাবে ভারতের উপযোগী। কেন

উপযোগী, সেকথা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে বলা সম্ভব নয়। পূর্ব্বে আমরা এই বিষয়ের কতক আলোচনা করিয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথক প্রবন্ধে আবার করিব। বাঙ্গালা ভাষা এখন সজীব ভাষা। বাঙ্গালা ভাষা যে কালে ভারতের ভাষা হইবে, "Survival of the fittest" মতের দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত যে দেশের প্রাচীন ভাষা সেই দেশে বাঙ্গালা ভাষা যে কালে একপ্রাণতার মূল সোপান হইবে, একথায় আমাদের মনে সন্দেহ নাই। হিন্দি, উড়িয়া বা আসামী ভাষা এ সকলই একরূপ বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ। বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণের অধিকাংশ মিল আছে। সামান্য সামান্য অমিলে কিছু আসিয়া যায় না। হিন্দি ভাষা যে কালে ভারতের ভাষা হইবে না, তাহার কারণ, এই ভাষার উৎকর্ষ বা উন্নতি নাই। বাঙ্গালা ভাষাই এখন ভারতের জীবিত ভাষা—এই ভাষারই উন্নতি হইতেছে। এই ভাষা ভারতের নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কালে ভারতকে সার্ব্বভৌম রশ্মিজালে ঘিরিবে, আশা আছে। কিন্তু সে কথা এখন থাকুক।

আমাদের নিকট কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, ভারতের প্রকৃত মহাপুরুষ কাহারা? আমরা বলিব, যাঁহারা ভারতে ভাষার সংস্কার এবং উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কেহ যদি বলেন, কাহাদের নাম জগতে স্থায়ী হইবে? আমরা এক কথায় বলিব—যে সকল দীন দরিদ্র গ্রন্থকার অনাহারের ক্লেশ ও নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা মস্তকে বহন করিয়াও এই প্রাণের ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারাই এদেশের প্রকৃত মহাপুরুষ; তাঁহাদের নামই জগতে থাকিবে। সমাজ-সংস্কার বা রাজনীতির সংস্কারের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন—তাঁহাদের নাম আজ আছে, আর পাঁচ বৎসর পর থাকিবে না। কিন্তু যাঁহারা জাতীয় গঠনের মূলভিত্তিতে চূণ সুরখি ঢালিতেছেন, অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইতেছে। আজ তাঁহারা অজানিত, লুক্কায়িত অন্ধকারে বসিয়া যাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন, তাহাই এদেশের ভাবী ভাষার মূল বীজ। আজ তাঁহারা অপদস্ত, কিন্তু সময়ে তাহাদের গৌরবে এদেশ গৌরবান্বিত হইবে।

আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য, ভারতে ভাষার সংস্কার করা। ইহাই একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি। যাহার যে শক্তি থাকে, এই মহাব্যাপারে ঢালিয়া দেও। এই মহাযজ্ঞে ভারতকে আহ্বান কর—নচেৎ উন্নতি, মিলন,—অসম্ভব.—স্বপ্নের কাহিনী।

প্রাণের কথা ব্যক্ত করিতে না পারিলে মিলন অসম্ভব। প্রাণের ভাষা ভিন্ন প্রাণের কথার প্রকাশ হয় না। কোথায় সেই ভাষা পাই, যাহার সাহায্যে প্রাণকে খুলিয়া দেখাইতে পারি? এখনও বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ। আমরা এক কথা বলি, লোকে অন্য কথা বুঝে। ইংরাজি পরের ভাষা—তাতে প্রাণের কোন গূঢ় ভাবই বলা যায় না, বলা সম্ভব নয়। উহাকে স্বদেশের করিয়া লইতে পারিলে হয় কিনা, জানিনা; কিন্তু তাহা অসম্ভব। প্রাণের কথা কোন্ ভাষায় তবে ব্যক্ত করি? কোন্ কথা লোকে বুঝে? কোন্ ভাবে লোক মজে?—কিছুই ঠিক নাই। তবে কে যেন একটা স্বপ্নের স্বরে বলিতেছে, এই বাঙ্গালা ভাষাই প্রাণের সুখসংবাদ—মধুর হইতেও মধুর, হৃদয়ে হৃদয়ে যেন কি,

মধুর স্বর ঢালিতেছে। এই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এখনও লোকের আদর নাই, তাহা জানি। এখনও ভারতের অসংখ্য জাতি ইহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাহাও জানি। জানি, পরমুখাপেক্ষী, ইংরাজির নকল-নবিস অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইহার প্রতি অনাস্থাবান। কিন্তু যখন কতিপয় উৎসাহী গ্রন্থকার এবং এইরূপ উৎসাহদাতা সভাসমিতির একান্ত একাগ্রতা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের প্রতি তাকাই, তখন হৃদয় আশায় মাতোয়ারা হয়। বাঙ্গালী জাতি বুদ্ধি বিদ্যায় ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি। এই জাতির প্রতিভা-প্রসূত কীর্ত্তিকলাপ যে ভারতের সমগ্র জাতির উপর যশ-পতাকা উড়াইতে সমর্থ হইবে, ইহাতে নিরাশার কথা নাই। বাহু বলে নহে, ঐশ্বর্য্য বলে নহে, কিন্তু প্রতিভা বলে এই জাতি সকলের শ্রেষ্ঠ। এই সময় হইতে সকলে যদি স্বদেশের হিতব্রত গ্রহণ করিয়া ভাষা সংস্কাররূপ মহাযজ্ঞে জীবন উৎসর্গ করেন, কালে দেশের একতার মূল দৃঢ়ীভূত হইবে। মহামতি স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হই। বিধাতার কৃপায় কালে মহৎ সুফল ফলিবে। জাতীয় ভাষার উন্নতিকল্পে, বঙ্গবাসি, প্রাণ, মন, উৎসর্গ কর। জাতীয় ভাষার উন্নতি না হইলে জাতীয় মিলন বা একতা অসম্ভব। জাতিয় মিলন ভিন্ন জাতির উন্নতি অসম্ভব।*

চৈতন্য চরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (১৭শ)

(মহাপ্রকাশ।)

পরমাত্মা অপরিসীম চিচ্ছরূপ; জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্রাংশ চিৎকণ; অপরিমিত বৃহৎ চিৎবস্তুর সহিত জীবরূপী ক্ষুদ্র চিৎকণ নিত্যযোগে যুক্ত; কিছুতেই উভয়ের সম্বন্ধ বিযুক্ত করিতে পারা যায় না। একটী অনন্ত, মহান্ অপরিবর্ত্তনীয়, গভীর চিদ্ঘন; অপরটী ক্ষুদ্র, বদ্ধ, যৎসামান্য চিদংশ। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রকৃতিগত যথার্থ স্বত্ব এক হইলেও জীবের ঔপাধিক ব্যবহার ক্রিয়ার এত বৈলক্ষণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাকে আর পরমাত্মার সহিত এক প্রকৃতি বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। আবার জীবাত্মার প্রকৃতি পরমাত্মার প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য ভেদভাব রহিয়াছে, যাহা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। বৈষ্ণবাচার্য্য পূজ্যপাদ জীবগোস্বামী মহাশয় ইহা "অচিন্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞান" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক এই অচিন্তনীয় ভেদাভেদ জ্ঞানেই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মূল নিহিত রহিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। ভ্রমর বা মৌমাছি মধুপানের জন্য ব্যাকুল হইয়া পুষ্পান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ সুন্দর একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প দেখিতে পাইয়া তাহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করত তদুপরি উপবিষ্ট হইল এবং এদিক ওদিক বেড়াইয়া

* এই প্রবন্ধটি সিকদার বাগান বান্ধবপুস্তকালয়ের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনকালে পঠিত হইয়াছিল।

তাহার পাঁপড়িগুলি ভেদ করিয়া ভিতরের মধুভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হইয়া মধুপানে বিভোর হইয়া পড়িল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রমরটী স্থির ভাবে মধুপান করিতে পারে নাই; ততক্ষণ সে আপনাকে গোলাপ-স্থিত মধু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করিতেছিল। কিন্তু যখন মধুকোষের মধ্যে যাইয়া তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নীরবে মধুপান করিতে লাগিল, তখন তাঁহার নিকট কি বাহ্য জগৎ অথবা কি সেই মধুভাণ্ডার, ইহার কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-জ্ঞান থাকে না। সে তখন সকলই মধুময় বলিয়া জানিতে থাকে; অথচ আত্ম-বোধের ও মধুবোধের এক অচিন্তনীয় ভেদজ্ঞান ও বুঝিতে পারে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। জীব স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিলে এইরূপ দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সাধকের প্রাণের মধ্যে যখন সেই রসস্বরূপের অমৃতরস পানের জন্য সুপ্রবল তৃষ্ণার সঞ্চার হয়; তখন সে ব্যাকুল ভাবে সেই নিত্যসুন্দর পরম কুসুমের অনুসন্ধান করিতে থাকে, এবং যখন সৌভাগ্যক্রমে তাহা লব্ধ হয়; তখন আর জগতে দ্বৈত জ্ঞান বা স্থূল ভেদ জ্ঞান থাকে না; সকলই তন্ময় হইয়া যায়, এবং সাধক সেই নিরুপম সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া কেবল 'ত্বংহি' ত্বংহি' দেখিতে থাকে; এমন কি আপনি পর্য্যন্তও তখন 'ত্বংহি' হইয়া যায়। হইবারইতো কথা। জীব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা কর, ইহাই জানিতে পারিবে। জীবের মূলে কোন্ শক্তি? কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাহা কি? ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছা। পৃথিবীর কুটিল পথের বিভিন্ন দিকে দুইটী নরনারীর আত্মা ছুটিতেছিল; ইচ্ছারূপিনীর ইচ্ছায় তাহা-দের পরস্পরে সাক্ষাৎকার হইল। সেই ইচ্ছা—আবার উভয়ের হৃদয়ে অনুরাগ রূপে পরিণত হইল। সেই পবিত্র ইচ্ছাই আবার পিতৃতেজে, মাতৃ শোণিতে কার্য্য করিয়া ভ্রূণরূপে পরিণত হইল। তাহাই অবলম্বন করিয়া 'আমির' উৎপত্তি হইল। এই "আমি" তেই আবার কতকগুলি শক্তি সমা-বেশ হইল। কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয় "আমির" সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইল। আমি যদি আমার স্বরূপজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছাকে কার্য্য করিতে দিতে পারি-তাম, অর্থাৎ আমার শক্তি পরিচালনের ক্ষমতা পাইবার পূর্ব্বে সেই মহতী ইচ্ছা যেরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, সেইরূপে করিতে দিতে পারিতাম, আমার কর্তৃত্বভার বা অহঙ্কার দ্বারা বাধা না জন্মাইতাম, তাহা হইলে আমার স্বরূপ বোধের অভাব হইয়া বিড়ম্বনা হইত না; এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব দেখা আমার পক্ষে কঠিন হইত না। কিন্তু আমি কি করি-য়াছি? আমার কতকগুলি পার্থিব সুবিধার জন্য নিজের অহঙ্কারকে পরিচালনা করিয়া একটী কল্পিত মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি; নিজের সুখদুঃখ লইয়া অজ্ঞান ভাবে সেই জগতে বাস করিতেছি। কাজেই আমার স্বরূপ জ্ঞান বুঝিবার উপায় নাই। 'আমি' তো আর সেই আমার মূলাধারা কুলকুণ্ড-লিনীর জগতে বাস করি না; আমার কল্পিত জগৎই আমার সর্ব্বস্ব। শাস্ত্র-কারেরা এই কল্পিত মিথ্যা জগৎকেই, মায়া, অবিদ্যা বা 'সংসার' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কথাটী সুস্পষ্ট করিয়া বলি-বার জন্য আর একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্।

গুটীপোকা আপন মুখ-বিনির্গত লালা দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে আপনিই জড়বৎ আবদ্ধ হইয়া পড়ে; দৈবশক্তিতে আবার তাহা কাটিয়া সুন্দর প্রজাপতির আকার ধারণ পূর্ব্বক প্রমুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। জীবও সেইরূপ বাসনা পরিচালিত হইয়া স্বকল্পিত সংসার-পিঞ্জরে আবদ্ধ হওত আপন স্বরূপ-ভাব বিস্মৃত হইয়া যায়; কিন্তু যখন ভগবৎ কৃপায় সৎসঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ঘটনা হয়, তখনই সে ঐ পিঞ্জর কাটিয়া আপন স্বরূপা-বস্থা লাভ করত প্রমুক্ত চিদাকাশে উড়িয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। এই স্বরূপাবস্থা লাভ হইলে সকলই ব্রহ্মময় দর্শন হয় এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত বা অভিন্নতা উপ-লব্ধি হয়। সাধকের সাধনার গভীরতা ও ঘনীভূততার পরিমাণ অনুসারে এই ভাব অল্পকাল, বহুকাল বা চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, শুক নারদাদির এই ভাব জীবনব্যাপী ছিল; ঈশা, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণে তটস্থ ভাবে থাকিত, অন্যান্য সাধকে অল্পকাল মাত্র থাকিয়া অন্তর্হিত হয় এবং অস্মদাদিতে ইহার উদ্রেকই হয় না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের 'মামেব শরণং ব্রজ' প্রভৃতি উক্তি; বাইবেলে 'I and my father are one' এবং চরিতামৃতে 'আমিসেই' 'আমি সেই' প্রভৃতি কথা এই একই ভাব সম্ভূত।

গৌরের মহাপ্রকাশ বুঝিবার উদ্দেশে আমরা এত কথা বলিলাম। এই তত্ত্ব না বুঝা-তেই ধর্ম্মজগতে অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তিতা, মহাপুরুষবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধীভাব সকল প্রশ্রয় পাইয়াছে এবং পাইতেছে। গৌরের মহাপ্রকাশ হইতেই তদীয় ভক্ত-গণ তাঁহার পূর্ণত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং তাহারই বিষময় ফল স্বরূপ আমরা এই পরমপবিত্র ভগবদ্ভক্তকে আজ ভগবানের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তিনি মর্ত্ত্যজীবনে থাকিলে ইহা কখনই হইতে দিতেন না।

'মহাপ্রকাশ' অর্থে যেদিন গৌরচন্দ্র মহাভাবে বিভোর হইয়া জীবাত্মার স্বরূ-পাবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাকে 'সাতপ্রহরিয়া' ভাবও বলে; অর্থাৎ ঐ দিন তিনি বেলা এক প্রহরের সময় হইতে সমস্ত দিন ও সমস্ত রজনী ভগবদ্ভাবে নিমগ্ন ছিলেন এবং ঐ অবস্থায় আপনাকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন ভাবিয়া নানা অব-তার ভাব প্রদর্শন করত ভক্তমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

"এবে শুন চৈতন্যের মহাপরকাশ;
যাঁহি সর্ব্ব বৈষ্ণবের সিদ্ধি অভিলাষ।
সাতপ্রহরিয়া ভাব লোকে খ্যাতি যার;
যাঁহি প্রভু হইলেন সর্ব্ব অবতার।"

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

গ্রাম্য সন্ধ্যা।

দিগন্তে ডুবিল রবি
বসুধা কনক ছবি
বিষাদেতে ছায়াময়ী, মিলায় মিলায়।
পূরবে গগণ কোণে,
করুণা ব্যথিত মনে,
নীরবেতে সন্ধ্যা-তারা মুখ পানে চায়।

আঁধারে ছাইল ধরা,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ পারা,
দূরে শুধু শোনা যায় ঝিল্লির স্বনন।
হলটী লইয়া কাঁধে
অতি শ্রান্ত মৃদু পদে
ধীরে ধীরে গৃহে ফিরে কৃষক সুজন।

প্রশান্ত নিস্তব্ধ সব,
শুধু শুধু টুন্ টুন্ রব,
মেঘ-গলঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় দূরে ;
কুটীরে-কৃষক দারা
দীপ হাতে নমে তারা,
তুলসী তলায় আসি সন্ধ্যা দেয় ধীরে।
নিস্তব্ধ বনানী কায়া
আঁধারেরে সঁপি দিয়া
জলধি জলেতে যদি ডুবিল তপন :
ব্যথিত কম্পিত শাখী,
গৃহে ফিরে যায় পাখী,
বিলাপ কাকলী পূর্ণ করিয়া গগণ।
ক্রমে ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে,
আলোকে নিষিক্ত করে,
মেঘের আড়াল হ'তে চাঁদ উঠে হেসে!
একে একে, ফোটে তারা,
প্রেম নিমন্ত্রিতা তারা—
চাঁদেরে ঘেরিয়া সুখে সভা ক'রে বসে।

শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী।

আমি ও আমার।

মনুষ্য জীবন পাঠ করিয়া আমরা যত দূর উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি, বোধ হয় আর কোন বিষয় পাঠে ততদূর উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই। জীবনচরিত প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমটী মহাত্মাগণের জীবনচরিত, দ্বিতীয়টী দুরাত্মাগণের জীবনচরিত। শিখিবার বিষয় উভয় শ্রেণীতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে স্থূল দৃষ্টিতে অনেক সময়ে পাপের জয়, পাপের সুখ, ও পাপের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তরলমতি যুবকগণ দুরাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া কখন কখন পাপাসক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠ করিলে প্রীতি, ভক্তি, সাহস, উৎসাহ, অধ্যবসায়, লোকহিতৈষণা ও দেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ রাশির শিক্ষা হইয়া থাকে। আমি তাই একদা মনুষ্যজীবনী পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। একে একে অনেকের চরিত খুলিলাম, কিন্তু কিছুতে তৃপ্তি হইল না, দুই চারি পৃষ্ঠার অধিক পড়িতে পারিলাম না। এইরূপে বিরক্ত হইয়া অবশেষে নিজের জীবন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। কেননা আত্মানুরাগ মনুষ্যের ভিতর অতিশয় প্রবল, কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। যে কারণে মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠে বিরক্ত হইলাম,এখানেও সেই কারণ বর্ত্তমান। এ বিরক্তির কারণ আর কিছুই নহে, কেবল পুনরুক্তি দোষ। একটী শব্দের বারম্বার ব্যবহার সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক প্রত্যেকের জীবনে আদি, মধ্য এবং ইহাই শেষ, ইহাই সকল মূল মন্ত্র; বলিতে কি, ইহাই মনুষ্যকে জীবিত রাখিয়াছে। যেখানে যাও, সেই খানে এই শব্দ শুনিতে পাইবে। যুবা, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সকলেই দিবা নিশি এই শব্দের কোলাহল করিতেছে। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, আমরা কেহই অপরের মুখে এই শব্দ শুনিতে ভালবাসি না। অথচ শয়নে স্বপনে, জীবনে, মরণে সতত এই শব্দ জপ করিতেছি। ইহারই জন্য ধন, মান, এমন কি, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছি এবং

ইহার দ্বারা নিজ নিজ ইতিহাস পূর্ণ করিতেছি। এই শব্দ আমাদের উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক এবং আমাদের সর্ব্বনাশের মূল। এই শব্দটীর নাম **আমি বা আমার।**

এই আমি বা আমার জ্ঞান হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় এবং অহঙ্কারই বিনাশের মূল। তবে কি ইহাকে হৃদয়ে পোষণ করা আমাদের কর্ত্তব্য? না তাহা কখনই নহে। কিন্তু ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? ইহা যে আমাদের অস্থি, মজ্জা, পেশী ও শোনিতের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবিত থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে করুণাময় পরমেশ্বর, জননীর জঠরস্থ ভ্রূণের অবস্থা হইতে আমাদিগের উপর তাঁহার অপার করুণা বর্ষণ করিয়া আসিতেছেন, তিনি কি আমাদের বিনাশের জন্য অথবা উন্নতির অবরোধের জন্য এই আমি বা আমার জ্ঞান আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন? বিশ্বাসী প্রাণান্তেও একথা বলিতে পারিবে না। অবিশ্বাসীরা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন।

এ শব্দের যথার্থরূপ ব্যবহার আছে, সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে না পারিয়াই আমরা অনেক সময় বিপদে পড়িয়া থাকি। যে সকল বস্তু আমার সে গুলিকে আমার বলিবার ক্ষতি কি? এক্ষণে দেখা যাউক, কোনগুলি আমার। তাহাই যথার্থ আমার, যাহা পূর্ব্বে আমার ছিল, এক্ষণে আমার আছে এবং পরেও আমার থাকিবে—যাহা ইহজীবনে আমার থাকিবে এবং পর জীবনে আমার সঙ্গের সঙ্গি হইবে। কিন্তু এরূপ সামগ্রী কোথায়? পিতা মাতা বল, স্ত্রী পুত্র বল, ভ্রাতা ভগ্নী বল, আত্মীয় স্বজন বল, সুখ সম্পদ বল, আর জ্ঞান মান বল, কাহাকেইত এইরূপে আমার বলিতে পারি না। যদি পৃথিবীতে কিছুই আমার না থাকে, তবে ০ এ শব্দের জ্ঞান কেন? এ বিড়ম্বনা কেন? মঙ্গলময় ঈশ্বর এ অনিষ্টের বীজ আমার ভিতর রোপণ করিলেন কেন?

আমার এক বস্তু আছে, যখনই আমি তাহা চিনিতে পারিব, তখনই মনুষ্যভাব ঘুচিয়া আমার দেবভাব প্রাপ্তি হইবে। তখন আমার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইবে এবং আমি দিব্যজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইব। তখন আমার স্বর্গ ও নবজীবন লাভ হইবে: পাপ অসম্ভব হইবে; ভয় ভাবনা একেবারে তিরোহিত হইবে। সেই পরম পদার্থ ঈশ্বর, তিনিই যথার্থ **আমার।** ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যত, তিন কালের ইতিনি **আমার।** যখন সেই দেবদেব পরমদেব জগতের ঈশ্বরকে আমার ঈশ্বর বলিতে পারিব, তখনই আমি ধন্য হইব। যিনি তাঁহাকে **আমার** বলিয়া চিনিবেন, তিনিই ধন্য হইবেন। বিশ্বাসী যখন সকল ছাড়িয়া সেই এক ঈশ্বরকে আমার ঈশ্বর বলিতে পারিবেন, কেবল মুখের কথা নহে, কিন্তু যখন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে "আমার" "আমার" ধ্বনি উচ্চারিত হইবে, তখন সেই কৃপাময় তাঁহাকে অনন্ত ধনে ধনী করিবেন। তখন তিনি বলিবেন, বৎস, তুমি আমার জন্য সকল ছাড়িয়াছ, তুমি এখন যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে। এই লও আমার যাহা কিছু সকলই তুমি লও; তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। বিশ্বাসী তখন দেখিবেন, পৃথিবী ও স্বর্গে

সকলই তাঁহার হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারীকা সকলই তাঁহার, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলই তাঁহার, বৃক্ষ, লতা, পত্র পল্লব, ফুল, পুষ্প, সকলই তাঁহার; মনুষ্য-মণ্ডলী সকলই তাঁহার। বুদ্ধদেব, চৈতন্য, মহম্মদ, নানক, ঈষাও মুষা, যোগী ও ঋষি সকলই তাঁহার। সাধু অসাধু, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, সকলই তাঁহার। তখন তাঁহার ক্ষুদ্র আমিত্ব উর্দ্ধে ও নিম্নে, দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ-হিল্লোল সততই খেলা করিয়া বেড়াইবে।

এইরূপে ক্ষুদ্র মনুষ্যের ভিতর যখন সমস্ত জগত প্রবেশ করিবে, তখনই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে। হৃদয়ের ভিতর সর্ব্বদা যদি সেই প্রেমময় পবিত্রস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকেন, তাহা হইলে পাপাচরণ আর কখনই সম্ভব হইবে না. আমার জীবন-ইতিহাসে যদি কেবল "আমার ঈশ্বর" এই দুইটী শব্দ লিখিত থাকে, এই দুই কথা ভিন্ন যদি আর কোন কথা লিখিত না থাকে, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র ক্ষতি বিবেচনা করিব না। মহাত্মা যিশু যে বলিয়াছিলেন "আমি ও আমার ঈশ্বর এক"—যে কথার উপর নির্ভর করিয়া খ্রীষ্ট সম্প্রদায় তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার প্রমাণ করিতে অগ্রসর হন, সে কথা অহঙ্কারের কথা নহে, নম্রতারই কথা। যিশুখ্রীষ্ট যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার "আমিত্ব" হারাইয়াছিলেন। তখন তিনি ঈশ্বর ভিন্ন নিজের অস্তিত্ব দেখিতে পান নাই। এই সময়ে তাঁহার ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (৮ম)

আমরা দ্বিতীয় ও পঞ্চম প্রস্তাবে নবদ্বীপবাসী নৈয়ায়িক-শিরোমণি সুপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছি। জগদীশ রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি-দীধিতির চিন্তামণিদীধিতি-প্রকাশিকা প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত টীকা জাগদীশী টীকা (জাঃ টীঃ) নামে সুপ্রসিদ্ধ। অনুমান-দীধিতিটিপ্পনী, তর্ক, টিপ্পনী সামান্যাভাব-টিপ্পনী, ব্যাপ্ত্যনুগমটিপ্পনী, সিংহব্যাঘ্রটিপ্পনী, পক্ষতাটিপ্পনী, উপাধিবাদ টিপ্পনী প্রাগুক্ত চিন্তামণি-দীধিতি-প্রকাশিকারই অন্তর্গত। ব্যাপ্ত্যনুমানদীধিতি টিপ্পনীতে অনুমিতি, ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিংহব্যাঘ্রী, পূর্ব্বপক্ষ, ব্যাধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, সিদ্ধান্তলক্ষণ, অবচ্ছেদক নিরুক্তি, বিশেষ নিরুক্তি বা ব্যাপ্তি, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, অতএব চতুষ্টয়ী, তর্ক, ব্যাপ্ত্যনুগম, সামান্যলক্ষণা, সামান্যাভাব, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী, অন্বয়ব্যতিরেকী, বাধ, অসিদ্ধি, সৎপ্রতিপক্ষ, অনুপসংহারী, সাধারণ, অবয়ব, হেত্বাভাস, সব্যভিচারী প্রভৃতি বহু পরিচ্ছেদ আছে। জগদীশের টীকা নৈয়ায়িক সমাজে

অতি প্রসিদ্ধ। জগদীশ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। জগদীশ অনুমান-দীধিতিটিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে, প্রাচ্য (পূর্ব্বদেশীয়) পণ্ডিতগণের অনুচিত ব্যাখ্যা দ্বারা চিন্তামণি-দীধিতি কলুষীকৃত দর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি দীধিতির টিপ্পনী রচনায় প্রবৃত্ত হন।

প্রাচ্যৈরনুচিতবিবিধক্ষোদৈঃ কলুষীকৃতোঽপি অধুনা।
দীধিতি যুত মণিরেষ শ্রীজগদীশ প্রকাশিতঃ স্ফুরতু॥

১৭২১ শকের লিখিত একখানি অনুমান দীধিতিটিপ্পনী পাওয়া গিয়াছে।

শকে চন্দ্রমেন্তাগবিধূমিত আদিত্যতনয়ে১৭২১
নভস্যীয়ে সপ্তাহনি চ স্মরনাথং হৃদিবহন্।
দশম্যাং শুক্লায়াং কুস্মর-কমলানাথ ইমকং
প্রযত্নেনালেখীন্নিজপরিপাঠনায়েতি পুস্তং॥

এতদ্ভিন্ন জগদীশ লীলাবতীদীধিতি-টিপ্পনী, তর্কামৃত ও সর্ব্বশক্তিপ্রকাশিকা রচনা করেন। মিথিলাদেশীয় বল্লভন্যায়াচার্য্য ন্যায়লীলাবতী ও গুণকিরণাবলী নামে দুই খানি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ন্যায় লীলাবতীতে দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের গুণাদি ও ঈশ্বরের স্বরূপাদি নিরূপিত হইয়াছে। এই বৈশেষিক দর্শন বিষয়ক ন্যায়লীলাবতীর* রঘুনাথ শিরোমণি প্রণীত দীধিতির টীকাই লীলাবতীদীধিতিটিপ্পনী নামে জগদীশ রচনা করেন। এই গ্রন্থে জগদীশ লিখিয়াছেন—

কণভক্ষমুনেঃ পক্ষরক্ষাবিন্যস্তবাসনা।
বচাংসি জগদীশস্য চিন্তয়ন্তু বিচক্ষণাঃ॥

জগদীশের প্রিয় ছাত্র নবদ্বীপের রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা-প্রবোধিনী নাম্নী জগদীশের সুপ্রসিদ্ধ বাদার্থ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

গুরুমিব গুরুমিহ নত্বা অকৃতশক্তিপ্রকাশেষু।
শ্রীরামভদ্রকৃতী কুরুতে টীকাংমুদে সুধিয়ঃ॥

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও ভুবনচন্দ্র বশাক কর্ত্তৃক কলিকাতায় প্রকাশিত হইয়াছে। জগদীশের তর্কামৃত বৈশেষিক দর্শন বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। ইহার দুই খানি টীকা আছে। (১) তর্কামৃতচষক গঙ্গারামজাড়ি কৃত, (২) তর্কামৃততরঙ্গিনী মুকুন্দ ভট্ট বিরচিত। গঙ্গারাম নীলকণ্ঠের শিষ্য ও নারায়ণের পুত্র। গঙ্গারাম তর্কামৃতচষক তাৎপর্য্যটীকা নামে স্বরচিত চষকের টীকার টীকা রচনা করেন বলিয়া সংস্কৃতবিৎ হল সাহেব† নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

চষকস্বুবর্ণস্পর্শং দিনকরকর-কৃতপরামর্শং!
জগদীশমঘনকল্পং পিবতু তর্কামৃতং তদাকল্পং।

তর্কামৃতের দ্বিতীয় টীকাকার মুকুন্দ ভট্টের পিতার নাম অনন্ত ভট্ট।

---

* ন্যায়লীলাবতীর অনেক খানি টীকা আছে। (১) মিথিলাবাসী তত্ত্বচিন্তামণি প্রণেতা গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রণীত 'ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ' (২) রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়লীলাবতী প্রকাশদীধিতি নামক প্রাগুক্ত টীকার টীকা, (৩) বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশদীধিতি-বিবেক দ্বিতীয় গ্রন্থের টীকা (৪) ভগীরথ কৃত 'ন্যায়লীলাবতী ভাবপ্রকাশ' (৫) শঙ্কর কৃত ন্যায়লীলাবতী কণ্ঠাভরণ, (৬) 'ন্যায়লীলাবতীবিভূতি,' এবং (৭) মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রণীত লীলাবতী-রহস্য, লীলাবতীপ্রকাশ-রহস্য, ও লীলাবতী দীধিতি-রহস্য। মথুরানাথ বল্লভন্যায়াচার্য্যের গুণকিরণাবলীর ও 'রহস্য' রচনা করেন। তিনি বল্লভ, বর্দ্ধমান ও রঘুনাথ, এই তিন জনের কৃত গ্রন্থেরই টীকা রচনা করেন। তৎপ্রণীত টীকার সাধারণ নাম রহস্য।

(নব্যভারত, পঞ্চমখণ্ড, ১৫৭ পৃষ্ঠা।)

† Dr. F. E. Hall's Index to Indian Philosophy, p. 76.

নবদ্বীপের পণ্ডিত হরমোহন চূড়ামণি ১৭৮৫ শকে "সামান্যলক্ষণা-ব্যাখ্যা" নামে জগদীশ প্রণীত চিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশিকার অনুমানখণ্ডের অন্তর্গত সামান্যলক্ষণাধ্যায়ের টীকা রচনা করেন। হরমোহন শ্রীরাম-শিরোমণির পুত্র বলিয়া গ্রন্থারম্ভে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরামমিব মত্তাতং শ্রীরামং পুরুষোত্তমং।
শিরোমণিতয়াখ্যাতং বন্দেঽহমতিযত্নতঃ॥
সামান্যলক্ষণাব্যাখ্যা জগদীশেন যা কৃতা।
তাংটিপ্পনীং শ্রিয়া যুক্তস্তনুতে হরমোহনঃ॥

*　　*　　*　　*

রম্যং শ্রীহরমোহনদ্বিজ ইহচ্ছাত্রেচ্ছয়োবেত্যহং
শাকে বাণ-বসুদধীন্দুবিমিতেঽহদঃ পুস্তকং নির্ম্মমে॥

জগদীশকৃত তর্কামৃত অনেকবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষার্থীগণের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহার প্রথমে 'আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্রব্যপ্রমাণ, দ্বিবিধ দ্রব্যনাশ, চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গুণ, গুণ ও কর্ম্মের উৎপত্তি প্রক্রিয়া কথন, ভ্রমাত্মক জ্ঞান, অনুমান, হেত্বাভাস ও উপমান নিরূপণ, শব্দপ্রমাণ, শাব্দবোধপ্রক্রিয়া, কারক ও বিভক্তি প্রভৃতির অর্থ, আখ্যাত ও কৃৎ-প্রত্যয়ের অর্থ, এব প্রভৃতির অর্থ যথাক্রমে বর্ণিত ও নিরূপিত হইয়াছে।

অপর এক জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি শূলপানির রচিত শ্রাদ্ধবিবেকের শ্রাদ্ধবিবেকভাবার্থদীপ নামে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন।

শ্রীমতা জগদীশেন স্মৃতিতত্ত্বং বিজানতা।
শূলহস্ত-কৃতগ্রন্থে ক্রিয়তে কৌশলং কিয়ৎ॥

সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট* প্রণীত কাব্যপ্রকাশের টীকা বঙ্গদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত হয়, তন্মধ্যে জগদীশ তর্কপঞ্চানন বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশরহস্য-প্রকাশ' নবদ্বীপের পণ্ডিত হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নিকট বিদ্যমান আছে। এই পুস্তক ১৫৭৯ শকের মাঘ মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে রবিবারে তর্কপঞ্চাননের শিষ্য ন্যায়লঙ্কার অধ্যাপনার্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া পরিসমাপ্ত করেন।

শাকে রন্ধ্রাদ্রিবাণ-ক্ষিতি-পরিগণিতে মাঘ-মাসে নবম্যাং
পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতি দিবসে জীবযুগ্-যুগ্মলগ্নে।
ন্যায়ালঙ্কার-ধীরো নিজগুরুরচিতং পুস্তমেতৎ সমস্তং
স্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনস্থো ব্যলিখদনলসোঽধ্যাপনার্থং সুখেন॥

জগদীশ তর্কপঞ্চানন মহাদেবকে নমস্কার পুরঃসর এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।—

সম্প্রতি স্বমতিপ্রীত্যৈ শ্রীজগদীশো দ্বিজো ধীমান্।
কাব্যপ্রকাশসূক্তৌ সরস-রহস্যং প্রকাশয়তি॥

জগদীশ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি আর একখানি কাব্যপ্রকাশ-রহস্যপ্রকাশ রচনা করেন। কাব্যপ্রকাশের আরো কতকগুলি টীকা আছে—কাব্যপ্রকাশ নিদর্শন, কাব্যামৃত তরঙ্গিনী, মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার কৃত কাব্যপ্রকাশাদর্শ বা ভাবার্থচিন্তামণি, রামকৃষ্ণের কাব্যপ্রকাশ-ভাবার্থ,

* কাশ্মীরদেশে খ্রাষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মম্মট ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কথিত আছে, নৈষধচরিত প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক শ্রীহর্ষ তাঁহার ভাগিনেয় ছিলেন।

শ্রীবৎস শর্ম্মার সারবোধিনী, ভাস্কর ও গদাধর চক্রবর্ত্তীর রচিত কাব্যপ্রকাশ টীকা, পরমানন্দ চক্রবর্ত্তীর কাব্যপ্রকাশনিস্তারিকা, নাগেশ ভট্টের কাব্যপ্রদীপ, বৈদ্যনাথের কাব্যপ্রকাশপ্রভা, ও জয়রামের কাব্যপ্রকাশ তিলক। নরহরি ভট্ট প্রণীত একখানি কাব্যপ্রকাশটীকা আছে। গ্রন্থারম্ভেই তদীয় আত্মপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ত্রিভুবনগিরিতে বাৎসগোত্রজ রামেশ্বর ভট্ট নামে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাস করিতেন। নরসিংহ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। নরসিংহের পুত্রের নাম মল্লিনাথ। এই মল্লিনাথই* কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি মহাকবি প্রণীত কাব্যসমূহের টীকা রচক কি না, বলিতে পারি না।

তস্মাদচিন্ত্যমহিমা মহনীয়কীর্ত্তিঃ
শ্রীমল্লিনাথ ইতি মান্যগুণো বভূব যঃ।
সোমযাগবিধিনা কলিখণ্ডনাভি
রদ্বৈতসিদ্ধমিব সত্যযুগং চকার॥

নারায়ণ ও নরহরি নামে মল্লিনাথের দুই পুত্র জন্মে। কনিষ্ঠ নরহরি সরস্বতীতীর্থ নাম ধারণ পুরঃসর সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। সন্ন্যাসী নরহরির কাশীতে অবস্থান কালে কাব্যপ্রকাশের প্রাগুক্ত টীকা প্রণয়ন করেন।

কাশ্যাং সরস্বতীতীর্থযতিনা তেন রচ্যতে।
টীকা কাব্যপ্রকাশস্য বালচিত্তানুরঞ্জিনী॥

*ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথমভাগে ৺রামদাস সেন, অধ্যাপক উইলসনের মতানুসারে লিখিয়াছেন যে, প্রায় ৫০০ বৎসর অতীত হইল মল্লিনাথ সুর দক্ষিণাবর্ত্ত নাথের অতি দুষ্প্রাপ্য টীকা অবলম্বনে কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ অফ্রেট সাহেব অনুমান করেন যে, মল্লিনাথ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

এই কাব্যপ্রকাশের টীকা রচয়িতা নরহরি, 'শ্রবণভূষণ' নামে বিদগ্ধমুখমণ্ডল কাব্যের টীকাকার বল্লাল-নন্দন নরহরি ভট্ট হইতে পৃথক ব্যক্তি সন্দেহ নাই।

যঃসাহিত্যসুধেন্দুনরহরিবল্লালনন্দন কুরুতে।
স শ্রবণভূষণাখ্যং বিদগ্ধমুখমণ্ডন ব্যাখ্যাং॥

দারন্ধাগ্রামনিবাসী রামরামের পৌত্র ও সিদ্ধেশ্বরের পুত্র গোপালদাস সেন কবিরাজ ১৬৯৭ শকে চিকিৎসা বিষয়ে যোগামৃত নামে সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে দশসহস্রাধিক শ্লোক আছে। ১৭২৩ শকে অন্যান্য টীকাকারগণের দুরূহ টীকা দর্শনে সুবোধিনী নামে ইহার একখানি সহজ টীকা রচনা করেন।

তাতঃ সিদ্ধেশ্বরো যস্য রামরামঃ পিতামহঃ।
তেনেয়ং লিখিতাটীকা গোপালেন সুবোধিনী॥
শাকে রামাঙ্কতর্ক ক্ষিতি পরিগণিতে মাসি শুক্রেঽবলক্ষে
পক্ষে, নত্বা মুরারে পদযুগকমলং সর্ব্বকামৈকসিদ্ধিঃ।

* * * * *

গ্রন্থং যোগামৃতাখ্যং ব্যরচয়দধুনা বৈদ্য গোপালদাসঃ।
সেনভূমিসমাজস্ত-দ্বারন্ধাগ্রামবাসিনঃ।
গোপালস্য প্রযত্নেন গ্রন্থোঽয়মজনি কৃতং॥

শ্রাদ্ধ বিষয়ক পিতৃপদ্ধতি ও যজ্ঞ প্রায়শ্চিত্ত বিবরণ গোপালাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত।

ধ্যাত্বা নন্দীশ্বরং দেবং নত্বা পিতৃপদদ্বয়ং।
গোপালো বালতোষায় বিলিখেৎ পিতৃপদ্ধতিঃ॥

বোধ হয় প্রক্রিয়া-কৌমুদী প্রণেতা পরমহংস গোপালাচার্য্য, এই গোপালাচার্য্য হইতে পৃথক ব্যক্তি। এই প্রক্রিয়া-কৌমুদী

ব্যাকরণে কৃৎপ্রত্যয়াদি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বৈয়াকরণ গোপালাচার্য্য রামচন্দ্র আচার্য্যের শিষ্য। ১৬২৩ সংবতের লিখিত একখানি প্রক্রিয়া-কৌমুদী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে সংরক্ষিত হইতেছে।*

নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির কৃতিমান্ পুত্র রামভদ্র সার্ব্বভৌম পদার্থখণ্ডন টিপ্পনী রচনা করেন। ইহা রঘুনাথের পদার্থখণ্ডন নামে বৈশষিকদর্শনের ব্যাখ্যা পুস্তক। রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত পদার্থখণ্ডনের আর একখানি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। এই রঘুদেব বিরচিত কলাদসূত্রব্যাখ্যান, শিরোমণির অখ্যাতবাদের টিপ্পনী, অনুমিতি-পরামর্শবিচার, সামগ্রী বাদ বিচার, প্রতিযোগী-জ্ঞান হেতুত্বখণ্ডন, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদক প্রত্যয়াসত্তি নিরূপণ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-বোধবিচার, নিরুক্তিপ্রকাশ, ঈশ্বরবাদ, গূঢ়ার্থতত্ত্বদীপিকা বা রঘুদেবী নামে গঙ্গেশের তত্ত্বচিন্তামণির ভাষ্য বর্ত্তমান আছে। রামভদ্র সার্ব্বভৌম পদার্থখণ্ডনের টিপ্পনীতে এইরূপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।—

তাতস্য তর্ক-সরসীরুহ-কাননেষু
চূড়ামণে র্দিনমণে শ্চরণে প্রণম্য।
শ্রীরামভদ্রকৃতী কৃতিনাং হিতায়
লীলাবশাৎ কিমপি কৌতুকমাতনোতি॥

রামভদ্র পূর্ব্বোক্ত পদার্থখণ্ডনটিপ্পনী ভিন্ন সমাসবাদ নামে বাদার্থ গ্রন্থ ও উদয়নাচার্য্যকৃত কিরণাবলীর গুণরহস্য নামক ভাষ্য এবং কুসুমাঞ্জলিকারিকার ব্যাখ্যা* প্রণয়ন করেন। জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন+ প্রণীত আরও একখানি সমাসবাদ আছে। রামভদ্রের ভ্রাতা রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রঘুনাথ শিরোমণির গুণপ্রকাশবিবৃতির টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

---

* সুবিখ্যাত রামানুজপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত শ্রীনিবাস দাস প্রক্রীয়াভূষণ নামে একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি বেঙ্কটাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন।

* রামভদ্র সার্ব্বভৌমের টীকা ভিন্ন কুসুমাঞ্জলির আরও নয়খানি টীকা আছে। (১) বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ের কুসুমাঞ্জলিকারিকা-প্রকাশ, (২) রুচিদত্ত মিশ্রকৃত কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ-মকরন্দ, (৩) হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার প্রণীত কুসুমাঞ্জলি-কারিকা ব্যাখ্যা, (৪) বৈদ্যনাথ মিশ্রের কুসুমাঞ্জলি-টীকা, (৫) নারায়ণতীর্থ যতীর কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, (৬) গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ রচিত গুণানন্দী, (৭) ত্রিলোচন ন্যায়পঞ্চাননকৃত কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, (৮) রুদ্র ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যা, (৯) অজ্ঞাতনামা লেখক প্রণীত কুসুমাঞ্জলি বৃত্তি।

+ ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। জয়রাম এতদ্ভিন্ন পক্ষধর মিশ্রের চিন্তামণি-আলোক ও রঘুনাথ শিরোমণির চিন্তামণি দীধিতির টীকা করেন। তিনি শিরোমণির আখ্যাতবাদদীধিতির ব্যাখ্যা সুধা নামক টিপ্পনীতে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন।

ন্যায়পঞ্চাননঃ শ্রীমান্ জয়রামঃ সমাসতঃ।
আখ্যাতবাদব্যাখ্যানং আতনোতি মনোরমং॥

তৎপ্রণীত হেত্বাভাস দীধিতি টিপ্পনী, সামান্য লক্ষণাদীধিতি টিপ্পনী দীধিতি ব্যাখ্যা শব্দালোকবিবেক, উপদেশ বিধেয় বোধস্থলীয় বিচার, অন্যথা খ্যাতিতত্ত্ব, ন্যায়মালা নামে মহর্ষি গৌতমের চতুর্ব্বিধ প্রমাণের বিচার, নানার্থবাদটিপ্পনী, গুণপ্রকাশ দীধিতি টিপ্পনী ও পদার্থমণিমালা নামক বৈশেষিক-দর্শন গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

আশীর্ব্বাদ।

দুটী লগ্ন হৃদয়ের সন্ধি বিদারিয়া,
অলস মিলন পথে যুগ্ম আলিঙ্গনে,
যে প্রাণের জ্যোতি-কণা বাহির হইয়া,
গেছিল অদৃষ্ট পথে—এসেছে ভুবনে।
নিরখিয়া শশী যথা নাচে পারাবার,
প্রেমের প্রয়াগতীরে, নিরখি কুমারে
উল্লাসে রোমাঞ্চ তনু গঙ্গা যমুনার!
চারিচোকে বহে স্নেহ অবিরাম ধারে,
মরতায় অমরতা, সুখের সন্ধান,
রমতির কি-যেন-কি দেখায় বদনে,
হাঁসি দেখে প্রাণ শেখে হইতে মহান্,
সৌন্দর্য্যে লুটায় চিত্ত বিভুর চরণে,
জননী করিলি শিশু! সখীরে আমার,
স্নেহপানে উর্ব্বরতা লভিবে সংসার।

শিশু সুন্দর।

শিশু কবিতার কবি তুই দয়াময়!
গাথায় পীযূষ এত নাহিক কোথায়,
করুণার পূর্ণ বর্ষা এ সুখ আলয়,
তরলিত হাসে ভাসে, জগৎ ভাসায়,
শিশুরে বুকেতে ধরি জননীর মনে
যে স্নেহের ঊর্ম্মিমালা হয় উছলিত,
স্পর্শে তার ফোটে ফুল, নন্দন কাননে
স্পর্শে তার মন্দাকিনী সদা পুলকিত।
শিশু কি সংসার মাঝে কুসুম নির্ম্মল
স্পর্শিতে যা পড়ে স্বর্গ জগতে নতিয়া।
শিশু হ(ও)য়া দেবের কি তপস্যার ফল
পূততায় রাখিবারে হৃদয়ে ধরিয়া?
হৃদয় মরুর মাঝে শিশুময় প্রাণ
বিকৃতই যদি হয় কেন তবে দান!!

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

হলায়ুধ।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌষ মাসের নব্যভারতে, বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের "সেনরাজগণ" নামক পুস্তিকার লিখনানুসারে হলায়ুধকে আদিশূরের আনীত পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম বাৎগোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতির পরিচয় প্রদান কালে, হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়াছেন। তাঁহার এই মত ভ্রমাত্মক কি না, বলিতে পারি না।"

ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের বাক্য যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ত্রৈলোক্য বাবু স্বীকার করিতেছেন না। স্বীকার করিলে তিনি কখনই মিত্র মহাশয়ের মত ভ্রমাত্মক "কি না" এই কথা লিখিতেন না। এ জন্যই হলায়ুধ সম্বন্ধে আমাদিগকে পুনর্ব্বার কিছু লিখিতে হইতেছে।

---

* ১৭ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, কোন বন্ধুর নবকুমার জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত।

আমরা "সেন রাজগণ" পুস্তিকায় লিখিয়াছি যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণের মন্ত্রী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, বাৎস গোত্রে (অর্থাৎ ছান্দড়ের বংশে) ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গোমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উজ্জ্বলা নাম্নী রমণী তাঁহার গৃহিনী ছিলেন। সেই গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের ঈশাণ, হলায়ুধ ও পশুপতি নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশাণ ব্রাহ্মণদিগের "আহ্নিক পদ্ধতি" হলায়ুধ,—'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' ও পশুপতি 'পশুপতি পদ্ধতি' নামক শ্রাদ্ধাদি কৃত্য প্রস্তুত করেন। শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেননৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।"

হলায়ুধের এইরূপ পরিচয় যে আমরা ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছি, তাহা সেনরাজগন পুস্তিকায় প্রকাশ করা গিয়াছে; তথাপি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থের সেই অংশ এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

বংশো বাৎস্য মুনের্মনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভূঃ।
ধর্ম্মাধ্যক্ষধনঞ্জয়ঃ সমজনি জ্যায়ান পরজ্যোতি যঃ॥
যস্মিন্ জুহ্বতি জাতবেদসি হবি র্ব্যোমাঙ্গণ ব্যাপিভিঃ।
ধুমৈর্দ্ধূপিতমম্বুসিদ্ধসরিতো বৃন্দারকৈঃ পীয়তে॥ ৫॥
বাঞ্ছাতিক্রম সম্ভবেঽপি জ্যোতি র্জটালান্ মণীন্
হিত্বা যস্ত জগত্রয়স্ত মহসো জাগর্ত্তি কোষঃকৃশঃ।
আপ্যেতস্য বিলজ্ব্য শৈলসদৃশঃ প্রাগ্দ্বার দ্বিপান
দুরোদ্দণ্ডিত যজ্ঞযূপ বৃষভোৎকর্ষণ হর্ষোঽভবৎ॥ ৬॥
অন্তঃ প্রমোদশবলীকৃত পক্ষ্ম সূচিস্যূতাশ্রুমৌক্তিকভরালসলোচনাভিঃ।
গীতাং পুরঃ স্যুরবধুভির মুষ্যকীর্ত্তিম্
আস্থানসীমনি সুরাধিপতিঃ শৃণোতি॥ ৭॥
গোষ্ঠীবুদৈবতমমলমতি ধৈর্য্যসম্পদাংবসতিঃ।
প্রকৃতিরিব পরমপুংস স্তস্যাভূদুজ্জ্বলা গৃহিণী॥ ৮॥
বভূব তস্যাঃ প্রকৃতের্ম্মহানিব
শ্রেয়ো বিলাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎকীর্ত্তিরস্তো নিধিবীচিদণ্ড-
দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তে॥ ৯॥
লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াদ্গুণবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতেরাবৃত্তাসদৃশী
নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহামাত্যতা।
শব্দব্রহ্ম করোদরামলকবন্তো গোত্তরাক্রিয়ে
ত্যস্তি প্রার্থয়িতব্যমস্ত কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসারিকম্॥ ১০॥
যেনাসদ্রীজিতং ন সিন্ধু লহরীধৌতাঞ্চলায়াং ক্ষিতৌ
যস্যাজ্জাতমভূন্ন সপ্তভুবনে নানাবিধং বাঙ্ময়ম।
দেবঃ স ত্রিজগন্নমস্য মহিমা শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতিস্তেনে
যস্য মনীষিতাধিক পুরস্কারোত্তরাং সম্পদম্॥ ১১॥
বাল্যে খ্যাপিতরাজ পণ্ডিত পদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছাত্রোৎসক্তি মহামহত্তমপদং দত্তা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবন শেষ যোগ্য মখিলক্ষ্মাপাল নারায়ণঃ—

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ।। ১২ ।।

*   *   *   *

*   *   *   *

ভ্রাতা পদ্ধতিমগ্রতঃ পশুপতিঃ শ্রাদ্ধাদি-
কৃত্যেব্যধা
দীশানঃ কৃতবান্ দ্বিজাহ্নিকবিধৌ
জ্যেষ্ঠোঽপরঃ পদ্ধতিম্।
তেনাস্মিন্নমুনা ফলস্তুতিপরাঃ প্রস্তূত্য
নানা স্মৃতীঃ—
সন্ধ্যাদিদ্বিজকর্ম্মমন্ত্রবচসাং ব্যাখ্যা পরং
খ্যাপিতা ।। ২৪ ।।

অর্থাৎ "সদাচারের বিশ্রামভূমি বাৎসমুনির বংশে ধর্ম্মাধ্যক্ষ—ধনঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ বিজ্ঞশীল ছিলেন। আশাতিরিক্ত ধন থাকা স্বত্বেও ইনি জ্যোতির্জাল জড়িত মণি সমূহ ত্যাগ করিয়া কুশকেই কোষ করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহার পূর্ব্বাভিমুখস্থ দ্বারে নিবদ্ধ গজ সমূহ ত্যাগ করিয়া যজ্ঞযূপনিবদ্ধ বৃষ সমূহের গর্ব্বিতাচরণে হর্ষোৎফুল্ল হইতেন। সুরবধূগণ তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দেবরাজের সভায় গান করিত। পরম পুরুষের প্রকৃতির ন্যায় তাঁহার গৃহিণী উজ্জ্বলা ছিলেন। জনসমাজে ইনিও দেবতার ন্যায় নির্ম্মল বুদ্ধি, ধৈর্য্য, সম্পদের আশ্রয় স্থান স্বরূপ ছিলেন। প্রকৃতি হইতে যেমন মহান, সেইরূপ তাঁহার গৃহিণী হইতে ধনঞ্জয়ের পুত্র হলায়ুধ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা লক্ষ্মণের যৌবনে তিনি মহামাত্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুল, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যা, ধনসম্পদ হলায়ুধের সংসারে প্রার্থনা করিবার কিছু ছিল না। পৃথিবীতে যাঁহার অজ্ঞেয় কিছু ছিল না, সপ্তভুবনের নানাবিধ পদার্থ যাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, সেই রাজা লক্ষ্মণ, হলায়ুধকে প্রার্থনাধিক বস্ত্রালঙ্কারাদি পুরস্কার ও প্রচুর ধন সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যকালে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে চন্দ্রবিম্ববৎ উজ্জ্বলছত্র (ধবল ছত্র) দ্বারা বর্দ্ধিত মহাতেজঃ পুঞ্জ মন্ত্রীর পদ এবং বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।

*   *   *   *

তাঁহার (হলায়ুধের) কনিষ্ঠ ভ্রাতা পশুপতি শ্রাদ্ধাধিকৃত্য প্রস্তুত করেন। (ইহা অদ্যাপি "পশুপতি পদ্ধতি" নামে খ্যাত) তাঁহার অগ্রজ ঈশান ব্রাহ্মণদিগের আহ্নিক পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। ইনি কেবল সন্ধ্যাদি মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, হলায়ুধ স্বয়ং এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়াও কি কেহ পণ্ডিতপ্রবর মিত্র মহোদয়ের লেখা ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করিবেন না। বাৎসগোত্রজ ধনঞ্জয়ের পুত্র হলায়ুধ যে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশজ হইতে পারে না, বোধ হয় একটী পাঁচ বৎসরের হিন্দু বালকও ইহা জানেন।

বোধ হয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আমরা ভারতী নামক বিখ্যাত সাময়িক পত্রে পুরাতন তত্ত্বালোচনা ও কোন কোন প্রাচীন কিম্বা ঐতিহাসিক গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছি—১২৯০ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের ভারতী একত্র হইয়া প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় আমরা হলায়ুধ শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সেই প্রবন্ধে দেখান গিয়াছিল যে, ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত

গ্রন্থে এই হলায়ুধকে নিপুর পুত্র ও ভট্টনারায়নের পৌত্র বলা হইয়াছে। আবার মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় সুবিখ্যাত ঠাকুর বংশের যে বংশ বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতেও হলায়ুধকে রামরূপের পুত্র ও সুরেন্দ্রের পৌত্র লিখা হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বোধ হয় এই সকল ভ্রম মূলক সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বাৎসগোত্রজ হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণের বংশধর লিখিয়াছেন। আমাদিগের সেই প্রবন্ধটীকে লক্ষ্য করিয়া ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দের ২৪ নবেম্বর তারিখ সুবিখ্যাত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় Reis and Rayyet পত্রিকায় নিম্ন লিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী প্রকাশ করেন :—

A LEARNED BLUNDER.

A very good periodical is the *Bharati* Edited by Babu Dwijendra Nath Tagore. There is always a freshness and originality in the views that find expression in its pages. In the region of prose literature, it has chalked out an independent path of criticism, doing real service to Bengali literature by discrediting many an idol of blind popular worship Du ring about the seven years of its existence, in antiquities alone it has given to the world a mass of information of both interest and value. In the department of modern history it has cerrected many a superstition of English origin and vindicated with reason and justice many a character weighted down with unthinking calumny. The last double number is replete with matters of interest. The short article on *Halyandha* corrects the popular error which owing its origin in the untutored vanity of a reputable Calcutta family labouring from of old under an unfortuate social ban, and since endorsed by no less a scholar than Dr. Rajendra Lall Mittra—of making the Lord Chancellor of Bengali's last Hindu King a descendent of Bhattanarayan. The bard of Veni Sauhar has always been known as the founder of the Banerjea clan in Bengal. About thirty years ago, when the late Babu Prosonno Kumar Tagore intrigued with the leaders of Brahamonocracy to re-enter the pale of caste, he proclaimed the descent of the Tagores from the same Bhattanarayan. So far so good. But one step leads to another until the retired Sudder Vakeel put forth a whole geneological tree of high family from the first settlement of the present Rarhi Brahmans in Bengal. Not content with Bhattanarayan for progenitor he would have a Succession of great names in his ancestry. Perhaps a poetical origin was not quite after his professional heart. He longed to connect his race with triumphs in jurisprudence. Jimut Vahan is rather too obscure a character in Indian Literature, but Raghunandana was a genuine Bengalee. We do not know whether the Baboo everlooked into the family history of the author of the 28 *Tatwas* to find out any relation between him and the Tagores. He certainly claimed the great legist Halayauda for one of his early ancestors, and this great name has found its way into all the numerous publications of and in behalf of the Tagore family. It has been cited accordingly by writers here and abroad intending to glorify them. That is in the usual way of friends and hirelings. In an evil hour Dr. Rajendra Lall Mittra too lent himself to the business. He had no idea of the danger, the unregenerate, however learned, rise meet with in dabbling with the minutioe of twice-born existence. Perhaps he thought he was as good as a Brahmana when the great Bhatta Muller had invested with the sacred cord the German

Sanskritist having blunderd into the belief that the Kayastha Doctor was a hereditary Brahman Pundit. The very passage in which the Doctor speaks of Halayauda as a descendent of Bhattanarayan contains matters for at once refuting the assumption, if he could but see it. Here is what the Doctor says—"His (Laksmana Sen's) prime minister and Lord Chancellor was Halayauda, son of Dhananjaya, of the Vatsya race, a Brahmin of great learning and a descendent of Bhattanarayna, the author of Veni Sanhar." A Brahmin child of five years, knows that a descendent of Bhattanarayan can not be of any other than *Shandilya* race. A Brahman of the Vatsya race cannot, in the nature of things, claim descent from Bhattanarayana. A Brahmin writer could never have been guilty of such a blunder. All this happens simply because Dr. Rajendra Lall Mitra for all his learning and reputation or learning, has not passed through the regenerating ordeal. As one of the once-born, the question of gotra (*race* as he wrongly translates it) becomes a stumbling block to him. Foreigners would scarcely understand the ludicrousness of the blunder. The assertion of Halayauda of the Vatsya race being a descendant of Bhattanarayana would be tantamount to saying—"Nava Krishna Das is a Kulin Brahmin who performed for the peace of his Soul a journey to Mecca."

৫ বৎসরের হিন্দু বালক পর্য্যন্ত যাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে, সংস্কৃতে এম, এ, উপাধিধারী একজন ব্রাহ্মণ যুবক তাহা "ভ্রমাত্মক কি না, ইহা বলিতে পারিলেন না।" ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে। ত্রৈলোক্য বাবু আমাদের একজন বন্ধু, তাই এত কথা বলিলাম।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

পুঃ। ত্রৈলোক্য বাবু বলিয়াছেন যে আমরা "হলায়ুধকে আদিশূরানীত পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম ছান্দড়ের বংশসম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

কিন্তু "সেন রাজগণ" পুস্তিকায় আমরা ভ্রম ক্রমেও ছান্দড়কে আদিশূরানীত পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করি নাই। আমাদের মতে ছান্দড়ের পিতা সুধানিধি আদিশূরের সময় বাঙ্গালায় আগমন করেন। এই সুধানিধির দুই পুত্র— ছান্দড় ও ধরাধর। ছান্দড় হইতে বাৎস-গোত্রজ সমস্ত রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও ধরাধর হইতে বাৎস গোত্রজ সমস্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। হলায়ুধ রাঢ়ীয় বলিয়াই আমরা তাঁহাকে ছান্দড়ের সন্তান বলিয়াছি।

শ্রীঃ—সিংহ।

বিরহ সঙ্গীত।

১

কেদারা,—কাওয়ালি।

মিছে কেন কাঁদি আর হলাহল তুলিয়ে।
সুখ গেছে, সাধ গেছে, থাক দুখ চলিয়ে।
প্রেমে আশা নাহি আর,
যাতনা ব্যবসা তার।
মিছে ভেবে ভালবাসা, মরি শুধু ভুলিয়ে।

২

জয়জয়ন্তি,—আড়া।

দূরে যা, দূরে যা তোরা, কিছু নাহি বুঝিবার।
কার মুখ-পানে চাব, চাহিতে পারিনে আর।
যে ছিল প্রাণের আশা,
সেই হ'লো প্রাণ-নাশা।
মিছে পর-ভালবাসা, কেবল পিপাসা সার!

৩

খাম্বাজ,—মধ্যমান।

এই কি ঘটিল শেষে, কপাল-ফলে?
অমিয়া দাঁড়াল বিষে, পিরীতি-ছলে!
সে কথা কি মন-রাখা?
সে হাসি কি মন-ঢাকা?
অভিমানে কত চাপি নয়ন-জলে!

৪

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ,—কাওয়ালি।

কারে কই, কি যাতনা সই, মরমে।
ফেটে যেন যায় বুক, কোথায় লুকাই মুখ!
গুমরি গুমরি মরি সরমে।
ভাবি, হেন কোন যাদু, নাহি কি ধরায়,
জীবনের এ পাতাটা উবে যাতে যায়!
ভুলে হোক্ যাতে হোক, আমারে বুঝায়,
ভেবেছিনু পর-কথা, নিজ কথা ভরমে!

৫

খট্,—একতালা।

যতন যাতনা হবে, আগে কে জানিত বল?
কথা শেষে ব্যথা হবে, হাসি হবে আঁখিজল।
সুখ হবে দূর স্মৃতি,
দুখ হবে প্রাণ-গীতি,
আশা হবে মৃগ তৃষা, মরণ হবে মঙ্গল,
আগে কে জানিত বল?

৬

বাঁরোয়া,—কাওয়ালি।

প্রেম যদি হয়েছে ভুলে, বুঝেও কেন যায় না ভোলা?
পরের পানে চেয়ে চেয়ে, চোখ গেছে হইয়ে খোলা!
পরের গান গেয়ে, গেয়ে
প্রাণ গেছে আঁধারে ছেয়ে,
বুঝেসুঝেও তবু কেন পরের বাঁধন যায় না খোলা?

৭

আলাইয়া,—আড়া।

কি ঔষধে মন বাঁধে, বলরে শফথ তোর।
মুছে যায় স্মৃতি ক্ষত, ঘুচে যায় আশা ঘোর!
অপমান, অবহেলা,
যন্ত্রণা, কল্পনা-খেলা,
অশ্রুজল, দীর্ঘশ্বাস, কি কুহকে হয় ভোর?

৮

ঝিঁঝিঁট,—কাওয়ালি।

তবু, তারে—দেখিতে পরাণ কাঁদে!
এমন যে ক'রে গেছে, হা-হুতাশে, অপবাদে।
চোখে চোখে সদা রেখে,
চোখে চোখে সদা থেকে,
মনেতে পড়ে না ভাল, তবু তার মুখ-চাঁদে
দেখিতে পরাণ কাঁদে!

৯

ভৈরবী,—আড়া।

ভেবেছি, কেঁদেছি কত, ভুলিতে পেরেছি কই?
এখনো যে ক্ষত দাগে, জাগে সে গরল-মই।
এখনো বাসনা করে,
সমুখে সে এসে পড়ে!
চরণে ধরিয়া বলি, ত্যজ না ত্যজ না, সই!

১০

ঝিঁঝিঁট,—যৎ।

বাঁচিতে পারি না আর, হয়ে তার আশা-হীন!
যুগসম বোধ হয়, সে বিনে, এ প্রতিদিন!
পলে পলে হৃদি বাঁধি,
মরণের পায়ে কাঁদি।
আশার এ শূন্য বাসা, হবে নাকি শূন্য লীন?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।
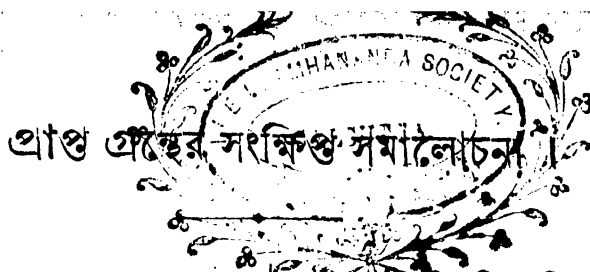
১। রশিনারা।—ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস; ৺ কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ১২৭৬ সালে প্রথম এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়,—অনেক দিন হইল তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। কালীকৃষ্ণ বাবুর পরলোক গমনের পর এ পুস্তক আর কেহ প্রকাশ করে নাই। সম্প্রতি তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্তবাবু কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল মহাশয় এই পুস্তকখানি পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক দিনের পুস্তক হইলেও, ইহার ভাষা অতি সুন্দর। গ্রন্থকারের উপন্যাস লিখিবার বেশ শক্তি ছিল;—তিনি জীবিত থাকিলে আরো কত ভাল পুস্তক হয়ত আমরা পাইতাম; কিন্তু দুরন্ত কালের তাহা সহিল না। এ পুস্তকখানি একটী লুপ্ত জীবনের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ সকলের ঘরে রাখিলে মৃত গ্রন্থকারের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অর্থ সামান্য জিনিস, কিন্তু কৃতজ্ঞতা এক স্বর্গীয় পদার্থ। এই সামান্য জিনিসের বিনিময়ে একটা মহত্ত্ব উপার্জ্জন, অতি সুন্দর কথা। আশা করি, এ পুস্তকখানি সকলেই আদর করিয়া পাঠ করিবেন।

২। মোহম্মদের জীবন চরিত।—তিন ভাগ, বিধান যন্ত্র হইতে প্রকাশিত—মূল্য ৩৷০। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। না থাকিলেও তাঁহাকে আমরা জানি। মোহম্মদ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালীর মধ্যে আর কাহারও আছে কি না, আমরা জানি না। গ্রন্থকার এই মহাত্মার কীর্ত্তিকলাপের আলোচনাতে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। মূল ভাষায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। মোহম্মদের এই জীবনচরিতখানি যেরূপ বিস্তৃত, পরিশুদ্ধ, আড়ম্বরশূন্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত, আশা করি, সকল সমাজে এই পুস্তকখানি বিশেষ আদর পাইবে। গ্রন্থকার মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

৩। বিজ্ঞানকুসুম।—শ্রীসূর্য্যকুমার অধিকারী, বি, এ, প্রণীত। মূল্য ১৲। এই পুস্তকে পঞ্চভূত, আকাশ, বিপুল ব্রহ্মাণ্ড, ধূমকেতু ও উল্কাপাত, মৃণ্ময়ী, সূর্য্য, সূর্য্য ও সময়, আহার ও সৌরভ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। সূর্য্য বাবু একজন কৃতবিদ্য, বিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি যখন যাহা লেখেন, গভীর গবেষণার পর লেখেন। এই জন্যই তাঁহার লেখার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বড়ই অপ্রতিভ হন। সূর্য্য নামক প্রবন্ধ যখন নব্যভারতে প্রকাশিত হয়, তখন সময় নামক পত্রিকায় তাহার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সূর্য্য ও সময়' নামক প্রতিবাদ প্রবন্ধে সূর্য্য বাবু তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার পর 'সময়' নীরব হন, আর কথাটী বলেন না। এই বিজ্ঞান-কুসুমে সূর্য্য বাবু যে কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, এ সকলটীতেই তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। বিজ্ঞান-কুসুমের ন্যায় সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। ডিটেক্‌টিভ্‌ পুলিশ।—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০ মাত্র। এই পুস্তকখানি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। যে ডাক্তার বাবুটীর জীবনের কাহিনী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আমরা জানি। মানুষের হৃদয় কতদূর নীচগামী হইতে পারে, এই পুস্তকে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত চিত্রিত হইয়াছে। ভাষা অতি সরল, অতি পরিপাটী। মানুষের জীবনের অন্ধকারময় অংশ পাঠেও মানুষের যথেষ্ট শিক্ষালাভ হইতে পারে, এই জন্য আমরা এই পুস্তক খানি সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৫। চিন্তা।—গীতিকাব্য, শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য ১৲। ঈশান বাবু সাহিত্য জগতে অপরিচিত নন্। ইঁহার কল্পনা-প্রসূত অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা ইতিপূর্ব্বে উচ্চদরের সাময়িক পত্রিকা সকলে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল তাহা নয়, ইনি চিন্তা ভিন্ন আরো কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ঈশান বাবুর গীতি কবিতা আমরা খুব আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তাঁহাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমরা এখনও কোন মতামত দিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু একথা বলিতেই হইবে, চিন্তার গভীরতা এবং ভাবার উচ্ছ্বাসে ঈশান বাবু কোন বঙ্গকবি অপেক্ষা নীচে নহেন। ঈশান বাবুর কবিতার এখনও তত আদর হয় নাই, ইহার একমাত্র কারণ, মিষ্টত্বের অভাব। যেমন চিন্তা, যেমন উচ্ছ্বাস, তেমন যদি মিষ্টত্ব থাকিত, তাহা হইলে ঈশান বাবুর কবিতা খুব আদর পাইত। কিন্তু বর্ত্তমান আদর অনাদরে কিছু আসিয়া যায় না। কালে ঈশানবাবুকে লোকে বুঝিতে পারিবে, কালে তাঁহার কবিতার খুব আদর হইবে।

৬। কল্যাণমঞ্জুষা বা ন্যায়প্রকাশ।—শ্রীস্বামি ইন্দ্রচন্দ্রেন নিষ্পন্নঃ। স্বামী ইন্দ্রচন্দ্রের জীবন প্রহেলিকা-ময়, অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ। যে ঘটনায় ইহার পূর্ব্ব জীবনগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, তাহাতে জগতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মের বিশ্ব-বিমোহিনী শক্তির নিকট ইনি পরাস্ত হইয়াছেন, ইহার পূর্ব্ব জীবন স্বপ্নের কাহিনী হইয়া গিয়াছে; এখন ইনি একজন স্বদেশ-বৎসল, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি। কল্যাণমঞ্জুষা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার উপযুক্ত পরিচয়। যে বিষয়টী লইয়া স্বামী প্রথম উপস্থিত হইয়াছেন, এ বিষয়টী অতি কঠিন। কিন্তু দৃষ্টান্ত প্রভৃতি দ্বারা এই কঠিন বিষয়টীকেও সহজ করিয়া তিনি উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থাপন্ন লোকের নিকট আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহাতেই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলাম্। আশা আছে, কালে তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার আরো উপকার হইবে। বিধাতা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন। তাঁহার কৃপা পাইলে দুর্ব্বল সবল হয়, অজ্ঞান জ্ঞান পায়, মূক কথা কয়। কল্যাণমঞ্জুষা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

৭। গোবর্দ্ধন লীলা।—শ্রীগদাধর শর্ম্মা প্রণীত। আমরা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তিনি যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাঁহার লিপি-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ইহার উল্লেখ না করিয়া আমরা বিরত হইতে পারিলাম না। পুস্তক খানির ভাষা উপন্যাসের ন্যায় মধুর ও ভাবপূর্ণ।

৮। শান্তিমঠ।—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কোন্ গ্রন্থ কোন্ স্থলে শেষ করা উচিত,তাহা গ্রন্থকারই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল রূপে বিবেচনা করিতে পারেন। বঙ্কিম বাবু যে স্থানে তাঁহার কপালকুণ্ডলা শেষ করা উচিত বোধ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই তিনি তাহার শেষ দাঁড়ি অঙ্কিত করিয়াছেন। আর শিবনাথ বাবুও উপযুক্ত স্থানেই মেজবউর উপসংহার করিয়াছেন। কিন্তু নূতন লেখকগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এজন্যই কপালকুণ্ডলার উপসংহারের ন্যায় মেজবউর উপসংহার স্বরূপ শান্তিমঠ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় দামোদর বাবুর ন্যায় দেবেন্দ্র বাবুও অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। উভয়ই সম-অপরাধী, তবে ইতর বিশেষ এই যে, নবকুমারের নির্ম্মল চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া ও কপালকুণ্ডলার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া দামোদর বাবু নিরস্ত হইলেন, কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু তাহা করেন নাই। তিনি মানে মানে শান্তিমঠ সমাপন করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, কিন্তু দুই একটী স্থানে তিনি সাম্প্রদায়িক গোড়ামির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের প্রীতিকর বোধ হইল না। সাম্য ও উদারতা যাঁহাদের মূল মন্ত্র, এইরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও গোড়ামি সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

৯। অক্ষয়চরিত।—শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। বঙ্গ সাহিত্যের পিতৃস্বরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাত্মা অক্ষয় কুমারের জীবনচরিত দেখিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত পুস্তক্ খানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু পাঠান্তে অন্তঃকরণে যুগপৎ দুঃখ ও ক্ষোভের সঞ্চার হইল। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীবনচরিত লেখা উচিত, গ্রন্থকার সেই প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, বরং তাহার বিপরীত রীতি অবলম্বন করিয়া পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই, প্রত্যুত সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে। তৎপরে গ্রন্থের মধ্যে এতগুলি ত্রুটি আছে যে,তাহারবিস্তারিত সমালোচনা বিশেষ স্থানসাপেক্ষ। কিন্তু আমরা তাহার সকলগুলির উল্লেখ না করিয়া কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ের কথা বলিতেছি। প্রথম অপ্রাসঙ্গিক দোষ;—অক্ষয় বাবুর জন্মের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার তিন পুরুষের বংশবৃত্তান্ত বর্ণন করা, তিনি গৌর মোহন আঢ্যের স্কুলে পড়িতেন বলিয়া গৌর মোহন আঢ্যের পুত্রাদি ক্রমে বংশাবলী কীর্ত্তন করা, অক্ষয় বাবু আমিষ ভক্ষণের বিরুদ্ধে লিখেন এবং পুনরায় আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া তদুপলক্ষে প্রভাকরে মুদ্রিত কবিতাকে উদ্ধৃত করিয়া ৬৮ পৃষ্ঠা পুস্তকের দুই পৃষ্ঠারও অধিক পূর্ণ করা ইত্যাদি বিষয় অপ্রাসঙ্গিক দোষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তৎপরে অক্ষয় বাবুকে পড়িতে সাহায্য করেন বলিয়া তাঁহার ভ্রাতা হরমোহন দত্তের এক খানি প্রতিকৃতি এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। এ বিষয়টী যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক, তাহা নয়, কিন্তু যার পর নাই অনাবশ্যক। এই ভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর,

আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রভৃতি লোকদিগেরও এক এক খানি ছবি এই পুস্তকে দেওয়া উচিত ছিল; কারণ ইঁহারা প্রত্যেকে অক্ষয় বাবুকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপরে পুস্তকের মধ্যে ভাষাগত ও রচনাগত দোষ যৎপরোনাস্তি দৃষ্ট হয়। "প্রবন্ধ নির্ব্বাচিনী" "সুলোলিত" 'দত্তজর' প্রভৃতি শব্দ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ দ্বারা ভাষাকে বিকলাঙ্গ করা হইয়াছে। অথচ গ্রন্থকার পুস্তকের প্রথমে একখানি শুদ্ধি পত্রও দিয়াছেন, কিন্তু এ সকল প্রকাণ্ড ভুল তাঁহার সম্মুখে পড়ে নাই। পুস্তকের ৯, ১১, ৪৪, প্রভৃতি পৃষ্ঠায় কতকগুলি রচনাগত ভুল দৃষ্ট হয়। পুস্তকের আবরণ পৃষ্ঠা পড়িয়া দেখা যায়, গ্রন্থকার ইতিপূর্ব্বে আরও ২।৩ খানি পুস্তক লিখিয়াছেন, এত গুলি পুস্তক লিখিয়াও আজ পর্য্যন্ত গ্রন্থকারের ভাষা যদি এত বড় বড় ভুলের হস্ত হইতে রক্ষা না পায়, তবে ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে কি আশা করা যাইতে পারে? অক্ষয় কুমারের অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যবলে তত্ত্ববোধিনীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাঁহার যুক্তি ও তর্ক দ্বারা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বেদের অভ্রান্ততাবিষয়ক ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ মত তিরোহিত হয়, এ সকল বিষয় সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ ও চির-বিদিত। কিন্তু গ্রন্থকারের লেখায় বোধ হয় যে, যেন 'পেপার কমিটি' নামক সমিতি দ্বারাই 'তত্ত্ববোধিনীর' শ্রীবৃদ্ধি, তারপর দেবেন্দ্র বাবু বেদের অভ্রান্ততা মানিতেন না, ইহা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী উপাচার্য্য রাম-চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মানিতেন, অক্ষয় বাবু প্রথমাবধিই প্রার্থনায় অবিশ্বাস করিতেন, তিনি রোগ আরামের জন্য পুত্তলিকার চরণে প্রণাম করিতেন, এ সকল কথা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসবিরুদ্ধ ও একান্ত সত্যবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। গ্রন্থে আরো বহুল দোষ লক্ষিত হয়, কিন্তু সে সকল বলিবার আর সময় নাই। এই গ্রন্থ প্রচারে অক্ষয় বাবুর জীবনকে গৌরবান্বিত করা হয় নাই, কিন্তু আপদস্থ করা হইয়াছে। বাবু মহেন্দ্র নাথ রায়ের লিখিত পুস্তকখানি ইহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন। তাহা পাঠ করিলে মহাত্মা অক্ষয় কুমারের মহত্ত্ব ও প্রতিভার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় এরূপ একজন মহৎ লোকের জীবনীকে এরূপ ছবিতে অঙ্কিত করা গ্রন্থকারের উচিত হয় নাই এবং বঙ্গসমাজ সে চিত্র দেখিতেও ইচ্ছা করে না। মহৎ লোকের জীবনকে মহিমান্বিত করাই যদি জীবনচরিত প্রচারের উদ্দেশ্য হয়, তবে আশা করি, গ্রন্থকার এ পুস্তকের প্রচার একেবারেই বন্ধ করিবেন।

১১। —মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা লর্ড মেটকাফের সংক্ষিপ্ত-জীবনী। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত. মূল্য দুই টাকা। আমরা এই পুস্তক খানা নিতান্ত আগ্রহের সহিত আদ্যপান্ত পাঠ করিয়াছি, পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। মেডকাফ প্রকৃত পক্ষে মহাত্মা ছিলেন। চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে, "ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত লর্ড রিপণ এবং জষ্টিস ফিয়ার ভিন্ন অন্য কেহ মেটকাফের ন্যায় দেশের সমগ্র লোকের প্রদত্ত অভিনন্দন লাভ করেন নাই।" ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা। নীচাশয়, মন্দমতি ও স্বার্থপর শাসনকর্ত্তাগণ

তাহাদের ন্যায় নরাধমদিগের নিকট হইতে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু দেব প্রকৃতি সম্পন্ন উদারমতি শাসন কর্ত্তাদিগের প্রতি সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়-উৎস হইতে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সুবিমল ধারা নিঃশ্রিত হইয়া প্রধাবিত হইতে থাকে। ওয়ারণ হেষ্টিংশের ন্যায় শাসনকর্ত্তাকে বোধ হয় দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। আর ইডেন সাহেবকে একজন বাঙ্গালী পুষ্প চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছিল। কিন্তু রিপণের জন্য সমস্ত ভারতবাসী অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে বিরত হয় নাই কেন? রিপণ দেব প্রকৃতি সম্পন্ন; তিনি সেই প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাই আজও ভারতবাসী তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে। আমরা মেটকাফকে দর্শন করি নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিয়া বোধ হয়, যে উপকরণে রিপণ নির্ম্মিত, বিধাতা সেই উপকরণে মেটকাফকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই জীবনচরিত পাঠ করিলে মেটকাফের দেবোপম প্রকৃতি আমাদের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে।

আমরা এইরূপ আর একজন মেটকাফকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করিয়াছি। শুনিয়াছি যে, ইনি মহাত্মা মেটকাফের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ত্রিপুরায় মেজিষ্ট্রেট ও জজের কার্য্য করিয়া প্রায় ২৫ পঁচিশ বৎসর হইল বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আজও ত্রিপুরাবাসী তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ে উচ্চ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। পাঠক, বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব প্রান্তে যে একটী দেশী স্বাধীন রাজ্য দেখিতে পাইতেছ, ইহা কেবল মেটকাফের কৃপা। নচেৎ দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্য ব্রিটানিয়ার লোহিত রেখায় রঞ্জিত হইত। উপযুক্ত পিতৃব্যের উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র। মেটকাফ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সহিত কাগজে, কলমে লড়াই করিয়া ত্রিপুরারাজ্যটী রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

নিজাম পরিবার লর্ড মেটকাফের নিকট যেরূপ ঋণী, ত্রিপুরার রাজ পরিবার ভ্রাতুষ্পুত্র মেটকাফের নিকট সেই রূপ ঋণী। যদি ইঁহারা কখন মেটকাফের নাম ভুলিয়া যান, তাহা হইলে ইহাঁদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ লোক জগতে আর কেহ নাই। মহাত্মা মেটকাফের সমস্ত গুণ গরিমা লিপিবদ্ধ করিবার আমাদের অবকাশ নাই। ভরসা করি, পাঠকগণ তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন। আমাদের অভিলাষ যে, প্রত্যেক বঙ্গবাসী মেটকাফের জীবনচরিত একবার পাঠ করেন। ইহার মূল্য দুই টাকা মাত্র। আমরা জানি যে, অনেক বাঙ্গালী একখানা পুস্তকের মূল্য দুই টাকা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইবেন। কিন্তু যাঁহারা তিন টাকা ব্যয় করিয়া একখান বাঙ্গলা উপন্যাস খরিদ করিতে পারেন, কিম্বা তদপেক্ষা অধিক মূল্য দ্বারা এক বোতল মদিরা ক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা এক দিনের জন্য দুই টাকা জলে পড়িয়া গেল, ইহা বিবেচনা করিয়াও লর্ড মেটকাফের একখান জীবনচরিত ক্রয় করিতে পারেন। যাঁহার কৃপায় আজ দেশময় পুস্তক পত্রিকার ছড়াছড়ি হইয়াছে, কোন্ ব্যক্তি একবার সেই মহত্মার জীবনচরিত পাঠ না করিয়া থাকিতে পারেন?

১১। জাগো মা আমার।—শ্রীবিজয়

লাল দত্ত প্রণীত মূল্য ।৵০। জাতীয় সমিতি উপলক্ষে বিরচিত। একজন কবি বলিয়াছেন—

"লতা পাতা ফুল জল হাসিলে কি হয় ?
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব না হাসিলে সব ব্যর্থ।"

আমরাও বলি, জাতীয় মহাযজ্ঞে আর সকল লোক যোগ দিলে কি হয়, যদি লেখক-শ্রেণী তাহাতে যোগ না দেয় তবে সব ব্যর্থ। লেখকগণ ভিন্ন কোন কীর্ত্তিকে স্থায়ী করিতে কেহ সমর্থ নয়। এই জন্যই সদনুষ্ঠানে গ্রন্থকারগণের, সম্পাদকগণের সাহায্য পাইবার জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সর্ব্বাগ্রে লোকেরা যত্ন করে। আমাদের দেশে গ্রন্থকার বা সম্পাদকগণের এখনও তত আদর হয় নাই বটে, কিন্তু তবুও মনে হয়, গ্রন্থকারগণের যাহাতে সহানুভূতি নাই, সে কাজ ব্যর্থ। জাতীয় মহাসমিতি—জাতির একটা গৌরবের জিনিস সেই দিন হইবে, সে দিন সমস্ত গ্রন্থকার ইহার উন্নতির জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিবেন। সম্পাদকগণের অনেকে ইহার প্রতি সুপ্রসন্ন, কিন্তু গ্রন্থকারগণের তত নাম শুনা যায় না। তাঁহাদের সহানুভূতি পাইবার জন্য কেহ বড় একটা চেষ্টাও করে না। আমাদের বিবেচনায় এ কাজটা সঙ্গত নয়। যাহা হউক, দুই একজন গ্রন্থকার জাতীয় সমাসমিতি উপলক্ষে লেখনী ধরিতেছেন, দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। "জাগো মা আমার" পুস্তকের গ্রন্থকার ইহার মধ্যে একজন। ইঁহার চেষ্টা, উদ্যম এবং সৎইচ্ছার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কেবল তাহাই নয়। গ্রন্থকার এক-স্থানে লিখিয়াছেন,—

"জননীর পূজা" এ যজ্ঞে সার,
"আত্ম বলিদান" দক্ষিণা ইহার
এ যজ্ঞের নেতা ভারতের প্রজা।"

কি সুন্দর কথা, কি সুন্দর ভাব। কিন্তু এ সুন্দর কথার সঙ্গে সত্যের যেন একটু বিবাদ আছে। আত্ম বলিদান, এ যজ্ঞের দক্ষিণা হইলে নিশ্চয় এ মহাসমিতি ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিবে। এ পর্য্যন্ত কিন্তু আত্ম বলিদানের পরিবর্ত্তে আত্ম-প্রতিষ্ঠার পরিচয়ই অধিক পাওয়া যাইতেছে। যাহাদিগকে ভারতের প্রজা বলা যায়, তাহারা আজও মহানিদ্রায় নিদ্রিত। গ্রন্থকার বুঝিয়াছেন, তাহাদিগকে না জাগাইলে, তাহাদিগকে আত্ম বলিদান মন্ত্র না শিখাইলে, মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তাই তাঁহার লেখনী ধারণ। বিজয় বাবুর গভীর স্বদেশ-ভক্তির পরিচয় পাইলাম। কিন্তু সত্যের সহিত যে একটু বিবাদ, তাহা থাকিয়াই যাইল।

কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অনুরোধ উপরোধে যে ভাল কবিতা লেখা যায় না, এটা কিছু নূতন কথা নয়। কিন্তু বিজয় বাবুর এই পুস্তকে অতি সুন্দর কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। একটী নমুনা দি ;—

"রবি অস্তাচলে গেল,
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা এল,
মনোহর বেশে কিবা ধরাসতী সাজিল ;
বহিছে সাঁঝের বায়
বিহগ মধুর গায়
শান্তির সমুদ্র মাঝে কোলাহল ডুবিল।"

শেষ পদে অতি উচ্চদরের কবিত্ব ফুটিয়াছে। বিজয় বাবু স্বদেশবৎসল ভাবুক ব্যক্তি, তাই তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে স্বদেশ ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিধাতা বিজয় বাবুকে দীর্ঘজীবী করুন।

১২। **গীতরত্নাবলী**।—দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্তৃক রচিত এবং সঙ্কলিত ;

মূল্য ॥০। শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা এক জন পরিচিত ব্যক্তি। ইঁহার রচিত "ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা,' 'কেশব-চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ এদেশে খুব আদৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাঁর প্রতিভা সঙ্গীতে যেরূপ বিকশিত হইয়াছে, এমন আর কিছুতে নয়। ইনি একজন ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি,—উপাসনার সময় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গান রচনা করিয়া গাইতে পারেন। এই জন্যই ইনি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ পরিচিত। গীত-রত্নাবলীতে ইহার অনেকগুলি মিষ্ট গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

১৩। ভুল।— অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত; মূল্য ॥০ আনা। অক্ষয় বাবু এখন একজন পরিচিত কবি। অনেক সম্পাদকই ইহার লেখার প্রশংসা করিয়াছেন; আমরাও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। নূতন কথা বলিবার বড় একটা কিছুই নাই। এই "ভুলে" যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, নব্যভারতে তাহার কয়েকটী প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা রীতি-বিরুদ্ধ মনে করি। অক্ষয় বাবু সেজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অন্যান্য যে সমস্ত কবিতা আছে, সেগুলিতে মোটের উপর অক্ষয়বাবুর পূর্ব্বসম্মান অপ্রতিহত প্রভাবে বজায় রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, অক্ষয় বাবু দিন দিন কিছু অস্পষ্ট-ভাব-যোজনার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। অল্প কথায় গভীর ভাব লিপিবদ্ধ করা লেখকের একটা মহৎ শক্তি, সন্দেহ নাই; কিন্তু মনের ভাব যদি বুঝাই না গেল, তবে আর কি হইল! অক্ষয় বাবুর পুস্তকের নাম নির্ব্বাচনে এই অস্পষ্টতার প্রথম পরিচয়। পুস্তকের নাম "ভুল" হইল কেন, আমরা বুঝিতে পারি নাই। এসম্বন্ধে উৎসর্গে দুই একটী কথা আছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়। এই অস্পষ্টতার পরিচয় অনেক কবিতায়ও পাওয়া যায়,—দুইটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"ফুলে"—"আঁখি তার—প্রভাত নলিন;
বসোরার গোলাপ, কপোল,
দেহ তার—শিরীষ-কুসুম;
নব পুষ্প তার সে নিচোল।
মন তার? ব'লো না আমারে,
ঢাক চিতা ঢাক ফুল-ভারে।"

"আর"—"একটী ক'য়ো না কথা আর,
একটী চুম্বন সুধু দাও।
কথা ভাল বুঝিতে পারি না,
নীরবে চলিয়া তুমি যাও।

প্রণয়ের আশ্বাস বচন,
সে কেবল মেয়েদের খেলা!
ঘোলা আঁখি, রবে কে চাহিয়া
শূন্যপানে আর সন্ধ্যাবেলা?

আমাদের পক্ষে কবির মনের ভাব টানিয়া বাহির করিতে কষ্ট হইয়াছে।

মন্দ বলিলাম বলিয়া প্রশংসার যে কিছু নাই, তাহা নয়। কোন কোন প্রাচীন সম্পাদক অক্ষয় বাবুকে অনুকরণ দোষে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন। অনুকরণ থাকিবে না, কোন কবিতায় অন্য কবিদের ছায়া থাকিবে না, এরূপ আশা করাই অন্যায়। অক্ষয় বাবুতে অনুকরণ-প্রিয়তা যে নাই, তাহা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আসল জিনিস যাহা আছে, তাহার অনাদর হওয়া উচিত নয়। দুটী চারিটি নমুনা না দিলে অবিচার হয়;—

১। "সৌন্দর্য্য।"

যাওরে সৌন্দর্য্য, যাওরে ডুবিয়া
প্রেমের সাগর পরে!

জগতের লোকে তোমা ল'য়ে যেন
ছেলে-খেলা নাকি করে।
উন্মাদ যুবক, তোমারে না করে,
গানের বিষয় তার ;
গর্ব্বিতা বালিকা, তোমার নামেতে
না যেন বিকোয় আর !

২। "এই পথ দিয়ে গেছে" — কবিতার শেষাংশ—

এই পথ দিয়ে গেছে, ব'সে গেছে নদীকূলে,
গেঁথেগেছে ফুলমালা,প'রে যেতেগেছেভুলে !
এই পথ দিয়ে গেছে,কেঁদে গেছে তরু-ছায় ;
এখনো যে বিন্দু-অশ্রু,শিশিরে মিশেনি হায় !
কোথায়যেতেছে চ'লে,কেমোরে বলিয়াদেয়?
এঅশ্রুকে মুছে যাবে,এ মালাকে তুলেনেয় ?
কি তার মনের কথা, আমিত বুঝিনে কিছু !
কেদেখেছে তার মুখ? আমিযে র'য়েছি পিছু

৩। "আয় ঘুম আয়।"

বাঁধ মোরে বাহুডোরে, এ জগত যাক্ স'রে
ভ্রান্ত আমি, জগত-রেখায়।
বড় শ্রান্ত চেয়ে চেয়ে, বড় শ্রান্ত গেয়ে গেয়ে
সুখে, দুখে, প্রেমে কল্পনায়।
বুকে মাথা রাখ্ ভুলে, অকূলে দেখারে কূলে !
ঢাক্ স্নেহ-ছায়, আয় ঘুম, আয় !

এ সকল কবিতায় কবির যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন আরো অনেক সুন্দর কবিতা আছে।

কবি যেন প্রাণে কি নিরাশার স্বপ্ন অনুভব করিয়াছেন। তাই উৎসর্গে তিনি লিখিয়াছেন—

—"অচেনা জগত-বুকে, অবরুদ্ধ সুখে দুখে
কত ভুল করিয়াছি, কত ভুলে ভুলিয়া !
না ল'য়ে কিছুরি তত্ত্ব, আপনার ভাবে মত্ত,
ফেলেছি ঝটিকামত, না জানি কি তুলিয়া !
রবি,এও কি হ'য়েছে ভুল,এত ভুলেভুলিয়া !

পুস্তকের শেষে লিখিয়াছেন—

'এতদিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে !
অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে !
যেখানে অনন্ত স্তব্ধ, খুঁজিয়াছি সেথা শব্দ,
যেখানে অনন্ত স্বপ্ন,খুঁজিতেছি সেথা কাজ !
নাহি সুখ,নাহি শ্রান্তি,খুঁজিতেছিসেথাভ্রান্তি।
চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা, অনন্ত খেলার মাঝ !
—এত দিনে বুঝিলাম,কি হবে বুঝিয়া আজ ?

লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে মনুষ্যের যে অবস্থা হয়, অক্ষয় বাবুর সে অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। তিনি পথ অন্বেষণ করিতেছেন মাত্র, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নাই। আমাদের আশা আছে, লক্ষ্য ঠিক করিতে পারিলে তিনি কাব্যজগতে অমর হইতে পারিবেন।

কবি এখন প্রেমের অন্বেষণ করিতেছেন, বলেন—

কোথা তুমি,ভালবাসা,যে তুমি-সে তুমি দূরে !
গান ত হইল শেষ, কোথা তুমি সুর-রেস ?
সুখ দুখ হ'লো শেষ,হ'লো শেষ কালে ঘুরে।

এই প্রেমের আস্বাদন যদি একবার পান, তবে এই লেখা আরো মধুর হইবে, আরো সরস হইবে।

একথা গুলি বলিবার আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। কবির কনকাঞ্জলীতে যেরূপ উচ্চদরের কবিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলাম, ইহাতে তেমন পাই নাই। হয় কবি পরিবর্ত্তিত,নয় আমরা পরিবর্ত্তিত। কে পরিবর্ত্তিত, তাহার বিচার আমরা করিতে সাহসী নই।

আর একটা কথা। কবির ছায়া কবিতাটী লইয়া শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত বিবাদ চলিতেছে। এরূপ বিবাদ বড়ই নিন্দার কথা। আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। কে অপরাধী, আমরা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। আমরা উভয় কবিরই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করি, উভয়কেই শ্রদ্ধা করি, উভয়কেই শক্তিশালী বলিয়া মনে করি। সামান্য একটী বিষয় লইয়া ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা উভয়কেই বিনীতভাবে অনুরোধ করি, উভয়ই নিরস্ত হউন।

"ভুল" সম্বন্ধে যাহা বলিবার আমরা বলিয়াছি। অক্ষয় বাবুকে বিধাতা যথেষ্ট শক্তি দিয়াছেন, এই শক্তির অপব্যবহার না হইলে তিনি এদেশে এক বিভাগের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন। বিধাতা অক্ষয় বাবুর সহায় হউন।

ইংরাজ-শাসনে বঙ্গসাহিত্য।

(২য় প্রস্তাব।)

উপরোক্ত কবিওয়ালাদিগের সমকালে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে ভারত-প্রবাসী কতিপয় ইংরাজ মহাপুরুষের অনুগ্রহে বঙ্গভাষার বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ জাতি ভারত-রাজ্য শাসনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে, এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তৎকালে হাল্‌হেড্‌ সাহেব এদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ;—বিশেষ যত্ন ও শ্রম সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গভাষায় এক ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলার ছাপার অক্ষর সৃষ্ট হয় নাই। তৎকালে চার্লস্ উইল্‌কিন্স সাহেব এদেশে অবস্থান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত প্রভৃতি এদেশের নানা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইনিই স্বহস্তে এক শাট বাঙ্গালা অক্ষর ক্ষোদিত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হাল্‌হেড্‌ সাহেবের সেই ব্যাকরণ খানি হুগলীতে মুদ্রিত হয়। এক্ষণে যে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র দেশের এক জাগ্রত মহাশক্তি, উক্ত প্রাতঃস্মরণীয় চার্লস উইলকিন্স সাহেব তাহার মূল। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, ঐ সময় হাল্‌হেড্‌ ও উইল্‌কিন্স ভিন্ন ফরষ্টার, কেরি, মার্শমান, কোল্‌ব্রুক, জোন্স, প্রভৃতি কয়েক জন ইংরাজ মহোদয় বিশেষ যত্ন সহকারে সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার আলোচনা করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে, যে সমস্ত বিধি ইংরাজীতে সংগৃহীত হয়, ফরষ্টার সাহেব সেইগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইনিই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরি, মার্শমান, উয়ার্ড, প্রভৃতি মিশনরীগণ এদেশে আসিয়া শ্রীরামপুরে অবস্থান করেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করা যদিও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তদুপলক্ষে তাঁহাদের দ্বারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন হয়। তাঁহারা এই সময়ে কয়েকটী বঙ্গ-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া, ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ, পরে কাশীদাসী মহাভারত মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যে প্রচারিত করেন। তৎকালে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বিলাতী সিবিল কর্ম্মচারীগণকে দেশীয় ভাষায় শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮০০ অব্দে "ফোর্টউইলিয়ম" নামক বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এই উপলক্ষে কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিত হয়। কেরি সাহেব এই সময় একখানি ব্যাকরণ ও একখানি অভিধান প্রস্তুত করেন। রামরাম বসু ১৮০১ অব্দে "প্রতাপাদিত্য চরিত"

ও পর বৎসর "লিপিমালার" রচনা করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজীবলোচনের "কৃষ্ণচন্দ্রচরিত," এবং ১৮১৩ অব্দে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধ চন্দ্রিকা" ও "রাজাবলী" মুদ্রিত হয়। উল্লিখিত পুস্তকগুলি গদ্যে রচিত। ইহাদের মধ্যে ভাষার লালিত্য ও গুণ গৌরবে "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থপ্রণেতা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্মস্থান উৎকল দেশ। তিনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও "কৃষ্ণচন্দ্রচরিত" যেরূপ জঘন্য বাঙ্গালায় লিখিত, "প্রবোধচন্দ্রিকার" ভাষা সর্ব্বত্র সেরূপ নহে, সত্য বটে, কিন্তু ইহার কোন কোন স্থলের রচনা এরূপ উৎকট ও অপকৃষ্ট যে, অনায়াসে তাহার অর্থগ্রহ হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়," "উৎকট সাধু ভাষার" উদাহরণ স্বরূপ, "প্রবোধচন্দ্রিকা" হইতে যে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমিও সেই অংশটী [illegible] করিতে সাহসী হইলাম। "কে[illegible] বাচাল যে মলয়াচলানিল, সে [illegible] নিৰ্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া [illegible]তেছে।" ইহার অপেক্ষা হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষা আমার নিকট সুখ-পাঠ্য ও সহজ-বোধ্য। বাস্তবিক গ্রন্থের অনেক স্থান এইরূপ সুদীর্ঘ সমাস-সম্বন্ধ ও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ, আবার কোন কোন স্থলের রচনা তদ্রূপ নাই শিথিল ও গ্রাম্যতাদোষে কলঙ্কিত। ইহার জন্য আমরা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে দোষ দিতে পারি না। কারণ, তিনি যে সময়ের লোক ও যে প্রণালীতে শিক্ষিত তাহাতে তাঁহার নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত সরল বাঙ্গালা আশা করা এক প্রকার দুরাশামাত্র। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় স্ব-প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের" এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, "আজিও সংস্কৃত পরম প্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগকে একপাত বাঙ্গালা লিখিতে দিলে তাঁহারা প্রায় ঐরূপ বাঙ্গালাই লিখিয়া বসিবেন। অদ্যাপি তাঁহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কঠিন জটিল ও দুর্কোধ রচনাতেই পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়। আমাদের শুনা আছে যে, এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—একি হয়েছে!—এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়!!!"

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদ রায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রগণের ব্যবহারার্থ বিদ্যাপতি প্রণীত সংস্কৃত "পুরুষ-পরীক্ষার" যে বাঙ্গালা অনুবাদ করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও শ্রুতি-সুখকর হইয়াছে। একটু নমুনা দেখুন ——

"জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া, নীতিজ্ঞ ও বহু পুত্র যুক্ত হইয়া সুখেতে কালযাপন করেন এক রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন করিতে ছেন, এমন সময়ে কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া, ঐ শব্দানুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে

নগরপ্রান্তে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, নবযুবতী, নানা-ভরণ-ভূষিতা আর উত্তম বস্ত্র পরিধানা, এমন কোন এক স্ত্রীকে দেখিলেন।" ইত্যাদি।

এইরূপে গদ্য রচনা প্রণালী বঙ্গ-ভাষায় প্রবর্ত্তিত হইল। উড়ে এবং সাহেব মিলিয়া বর্ত্তমান সাহিত্যের সৃষ্টি করিল। ইহাতে আমাদের গৌরব করিবার কিছুই নাই। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু পাইয়াছি, সে সমস্তই বিদেশীয়ের অনুগ্রহে। আমাদের প্রথম গদ্য-লেখক বিদেশী; প্রথম ব্যাকরণ ও অভিধান লেখক বিদেশী; বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টিকর্ত্তা বিদেশী; এবং বঙ্গ-ভাষার সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র "সমাচার দর্পণ" শ্রীরামপুরের খৃষ্টীয় মিসনরীগণ কর্ত্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে হইতে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। আজি যে বঙ্গ সাহিত্যের অক্ষয় গৌরব-স্তম্ভ বঙ্কিমচন্দ্র, এবং যে ভাষায় সম্পাদিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের গ্রাহক সংখ্যা নূন্যাধিক বিংশতি সহস্র, সেই সাহিত্যের জন্মদাতা বিদেশী। বঙ্গভাষার উন্নতি-দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই ইঁহাদের নিকট অপরিশোধনীয় ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন।

এদিকে দেশ মধ্যে ইংরাজ প্রভাব দিন দিন যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, লোকের মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ততই বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। শান্তিদেবী সুসময় দেখিয়া পুনরায় এই পরিত্যক্ত লীলাভূমে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন। লোক জ্ঞানালোচনার অবসর পাইল। এই পরিবর্ত্তন সময়ে কয়েকজন বিশেষ ক্ষমতাশালী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। এই মহাপুরুষের সবিশেষ পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে ইঁহাকে কে না জানেন? ইঁনি "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।" তাঁহার প্রণীত ও অনুবাদিত অনেক পুস্তক ও পুস্তিকা আছে। সে গুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিচারপূর্ণ। তন্মধ্যে "পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী" "বেদান্তের অনুবাদ," "কঠোপনিষদ," "বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ," "মাণ্ডুক্যোপনিষদ, "পথ্যপ্রদান" প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। তিনি "কৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।" তিনি সহমরণ প্রথার প্রতিকূলে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া "চন্দ্রিকা" নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এখানি আজিও জীবিত আছে; কিন্তু বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন চলৎশক্তি রহিত ও অন্ধ-প্রায় হইয়া এক্ষণে বালক "দৈনিকের" শরণাপন্ন হইয়াছে। এইরূপে রামমোহন রায় ও তাঁহার প্রতিপক্ষ পৌত্তলিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের দ্বারা বিশুদ্ধভাবে গদ্য রচনা-প্রণালী বঙ্গভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। নিম্নে রামমোহন রায়ের গদ্য রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্থানাভাব ও সময়াভাব প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত রহিলাম। এই মহাপুরুষের যে আর একটী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার বিষয় কিছুই উল্লেখ করি নাই। তিনি অতি-উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার গীতাবলী সর্ব্বজন-সমাদৃত ও সর্ব্বত্র-গীত হয়। বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের অনন্ত, অনির্ব্বচনীয়, নিরাকার স্বরূপ

অতি উজ্জ্বলরূপে এই সমস্ত গীতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিলে পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়; কঠোর নাস্তিকেরও অন্তঃকরণ ঈশ্বরাভিমুখে ধাবিত হয়; এবং নিতান্ত বিষয়াসক্ত,সংসার-সেবকগণের চিত্তও উদাসীন ভাব ধারণ করে। ঐ সকল সঙ্গীতে প্রগাঢ়ভাব, গাম্ভীর্য্য ও অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার যে অসার, জীবন যে অনিত্য, মায়া ও মমতা যে বৃথা এবং ভগবানের প্রতি প্রীতিই যে মানবের নির্ম্মল ও নিত্য সুখের কারণ, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত সকল হইতে এই সমস্ত উপদেশ লাভ করা যায়। যত দিন বঙ্গ ভাষা থাকিবে, যতদিন ধর্ম্মসঙ্গীতের সমাদর থাকিবে, মহামতি রামমোহন ততদিন বঙ্গবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। ইংরাজ মহাকবি শেলি লিখিয়াছেন,—

"Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.',

এ কথা সত্য হইলে, রামমোহন রায়ের গীতাবলি বঙ্গসাহিত্যে আজিও তুলনা রহিত। নিম্নে তাহার ৪টী সঙ্গীত উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না--

(১)

সাহানা—ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে, না থাকে অন্যের ভয়;
যাঁহারে করিলে প্রীতি, জগতের প্রিয় হয়।
জড়মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়;
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এত ভাল নয়॥

(২)

ভৈরবী---আড়া ঠেকা।

মনে স্থির করিয়াছ,চিরদিন কি সুখে যাবে?
জীবন, যৌবন, ধন, মান রবে সমভাবে॥
এই আশা-তরুতলে, বসি আছ কুতূহলে,
বিষয় করিয়া কোলে,জাননা ত্যজিতে হবে॥
ওরে মন শুন সার, দিবা অন্তে অন্ধকার,
সুখান্তে দুঃখের ভার, বহিতে হবে----
অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ,
ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে॥

(৩)

বেহাগ—আড়া।

মন একি ভ্রান্তি তোমার!
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার?
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কেবা, আন কাকে,—একি চমৎকার॥
অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান ক'রে,
ইহতিষ্ঠ বল তাঁরে, একি অবিচার—
একি দোষ অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব,
তাঁরে দিয়া কর স্তব —এ বিশ্ব যাঁহার॥

(৪)

রামকেলি—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর!
অন্যে বাক্যকবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥
যার প্রতি যত মায়া,কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর॥
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন—নাড়ী ক্ষীণ—হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ, অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর॥

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"ডাক্তার-ব্যবসায়ী কলিকাতার একজন দুর্দ্ধর্ষ নাস্তিক আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তিনি এই গান শুনিলেন, তখন তাঁহার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত একেবারে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।" ধন্য রামমোহন! ধন্য তোমার সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা।

রঘুনন্দন গোস্বামী এই সময়ের লোক। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। তিনি "রামরসায়ণ" কাব্যের রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বাল্মীকি-বর্ণিত "রামায়ণের" সপ্তকাণ্ড সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই কাব্য খানির কলেবর অতি প্রকাণ্ড—প্রায় দুই খানি কীর্ত্তিবাসী রামায়ণের সমান। প্রতি সর্গের শিরোভাগে গোস্বামী মহাশয়ের স্বকৃত একটী করিয়া সুন্দর সংস্কৃত কবিতা আছে। এই মহাকাব্যে কবি চরিত্র-বর্ণনা, রচনা-নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আদিরস গণনায় গোস্বামী মহাশয় অতি সাবধান ছিলেন। নিম্নে "বর্ষা বর্ণনা" হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"অবিরল ধাইতেছে প্রবল পবন।
বিষয়েতে যেন অতি বিষয়ীর মন।।
নব জলধর দলে ঢাকিল অম্বর।
তমোগুণে যেন পাপীজনের অন্তর।।
তড়িৎ প্রকাশ পায় নব জলধরে।
শ্মশান-বৈরাগ্য যেন বিষয়ী-অন্তরে।।
গুণ নাহি, তবু ইন্দ্র-ধনু বক্র হয়।
স্বভাবতঃ বক্র দেখ খলের হৃদয়।।
অবিরত মেঘ করে সলিল বর্ষণ।
ভক্তিরস দান করে যথা ভক্তজন।।
তার মাঝে কভু জল শিলা বৃষ্টি করে।
জ্ঞান উপদেশ যেন ভক্তি কথান্তরে।।
বৃষ্টি ধারে ব্যথা নাহি পায় গিরিগণ।
দুর্জ্জন-বচনে যেন সুজনের মন।।
পত্রভরে-বৃক্ষ সব লোটায় ভূতলে।
সাধু যেন অবিরত প্রণত সকলে।।
গড়ায়ে পড়িছে জল সদা পত্র-আগে।
সাধু-নেত্রে যেন নারায়ণ-অনুরাগে।।
কুটজ, কেতকী, জাতি হইল প্রকাশ।
ভাবাবেশে যেন ভক্ত-বদনেতে হাস।।
তৃণেতে ঢাকিল ভূমি, পথ হৈল গুপ্ত।
কলিকালে যেন হয় বেদ-মন্ত্র লুপ্ত।।
নাহি দেখি উচ্চ নীচ—ঢাকিল জীবনে।
নিজ হিতাহিত যেন মোহ-আবরণে।।
বহুমুখে ধায় সব তটিনী সাগরে।
নানাবিধ শ্রুতি যেন পরম ঈশ্বরে।।"

ইত্যাদি।

বাস্তবিক কবি যেরূপ সুকৌশল-সম্পন্ন, সেইরূপ ভক্তিমান।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী বংশবাটী গ্রামে শ্রীধর কবিরত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কথকতা-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু সংখ্যক সঙ্গীত আছে। সে গুলি যারপর নাই সরল, সুমধুর ও স্বভাব-সঙ্গত। পাঠ বা শ্রবণ মাত্র মন মোহিত হয়। নিম্নে কয়েকটী সঙ্গীত উদ্ধৃত হইল।—

(১)

ভৈরবী—মধ্যমান।

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।।
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে।।

(২)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরমে মরম-যাতনা ভালবাসার অযতনে।
একা যে একাজে মজে বাজের অধিক বাজে প্রাণে।।
যেজন পীরিতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ সদা যারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে।।

(৩)

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

যাবত জীবন রবে কা'রে ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হ'ল, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
আমি ভালবাসি যারে, সে কভু ভাবে না মোরে,
তবে কেন তারি তরে, নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভালবাসেনা

(৪)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মন-যন্ত্রণা কভু শুনাওনা তায়।
শুনিলে আমার দুখে সে পাছে বেদনা পায়॥
না বাসে না বাসে ভাল,
সুখে থাকে সেই ভাল,
তাহারি মঙ্গলে মঙ্গল শুনিলে প্রান যুড়ায়॥

নবদ্বীপাধিপতি গিরীশচন্দ্র রায়ের সভায় কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী বাস করিতেন। তিনি অতিশয় সুরসিক ও উপস্থিত বক্তা ছিলেন। সেই জন্য মহারাজ তাঁহাকে "রস সাগর" উপাধি প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃত, হিন্দী, পারসী, ও বঙ্গালা ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ দ্রুত-রচনা শক্তি ছিল। প্রশ্ন করিয়া প্রশ্নকারীকে উত্তরের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতে হইত না। তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। যাহা জানিতেন, কার্য্যকালে তাহা আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিতেন। কিন্তু এই স্থলে ইহাও না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না যে, রসসাগর নানা ভাষা ও বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেও তাদৃশ কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। এইরূপ দ্রুত-রচনায় যে দোষ ঘটে, তাঁহার রচনায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পায় নাই। ফরমাইসে কবিত্ব-সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক বিনষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটী সমস্যা-পূরণ উদ্ধৃত হইল—

১ম

প্রশ্ন—রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল।
পূরণ—লক্ষ্মী নারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে,
তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে॥
তৃণ কাষ্ঠ পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল।
রমণীর গর্ভে পতি ভয়ে লুকাইল। *

২য়

প্রশ্ন—গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।
পূরণ—মহারাজ রাজধানী নগর বাহির,
বারোয়ারী মা ফেটে হলেন চৌচির।
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির,
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।

৩য়

প্রশ্ন—নিশিতে প্রকাশ পদ্ম, কুমুদিনী দিনে।
পূরণ—জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পালো মনে।
চক্রান্ত করিল চক্রী চন্দ্র আচ্ছাদনে॥
আকাশেতে কাল নিশি উভয়ে না জানে
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম, কুমুদিনী দিনে।

কথকতা, পাঁচালী, কীর্ত্তন, যাত্রাদি দ্বারা যে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টি-সাধন ও মধুরতা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এস্থলে তাঁহাদের স্বতন্ত্র পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। তবে এই সম্প্রদায়ের একজনের বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহার নাম দাশরথি রায়। দাশুরায়ের পাঁচালী দেশ-বিখ্যাত। কি ভদ্র, কি ইতর—কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—কি পুরুষ, কি রমণী—সর্ব্বসাধারণেই দাশ-

* লক্ষ্মী—তণ্ডুল, নারায়ণ—জল।

রথি রায়ের নাম ও তাঁহার প্রণীত দুই একটী গানও অবগত আছেন। তিনি পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করিয়া অনেক "পালা" রচনা করিয়া গিয়াছেন। আবার, বহুসংখ্যক "পালা" তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত। এই সকল কবিতার স্থানে স্থানে অতি উচ্চদরের কবিত্ব শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার রচনার অনেক স্থল এতদূর জঘন্য ও অশ্লীল যে, সেগুলি বয়স্যবর্গের সমক্ষে পাঠ করা দূরে থাকুক, নিভৃতে আপনা আপনি পড়িতে লজ্জা বোধ হয়। তাঁহার সঙ্গীত সকল যেরূপ সরল ও সুললিত, সেইরূপ মনোহর ও স্বভাব-সঙ্গত। এগুলিতে বিবিধ রসের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী গীত উদ্ধৃত হইল।

(১)

সুরট—ঝাঁপতাল।

হৃদি-বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি!
ওহে ভক্তিপ্রিয়!
আমার ভক্তি হবে রাধা সতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দা-গোপ-নারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী
আমার ধর ধর জনার্দ্দন, পাপ-ভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস-চরে ধ্বংস কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরি, মন-ধেনুকে বশ করি,
তুষ্ট হৃদি-গোষ্ঠে পূরাও ইষ্ট এই মিনতি॥
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে,
আশা-বংশীবট-মূলে,
স্ব-দাস ভেবে সদয় ভাবে সতত কর বসতি।
যদি বল রাখাল-প্রেমে, বন্দী থাকি ব্রজ-ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার
দাস হবে হে দাশরথি॥

ধনী! আমি কেবল নিদানে।
বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষ
গুণ সে জানে॥
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, এককেতে
চর্ণকরি সমুদয়,
ঈশ্বর চূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মমগুণে।
ওহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক, আমারি
সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি হরিবারে দুখে, ভ্রমণ করি
এ ভুবনে।

(৩)

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময়, নাহি রসময়, বাজাতে মোহন
বাঁশি।
তোমারি জন্যেতে, অরণ্যে আসিতে, সতত
অভিলাষী॥
সতত গুরুজনার নিকটেতে রই,
বাঁশি শুনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই;
এ কথা ফুটিয়ে কাহারে বা কই, প্রতিবাদী
প্রতিবাসী॥
কে বলে সরল বাঁশী তোমারি,
তবে কেন লয় মন প্রাণ হরি,
ছাড়না ছলনা কপট শ্রীহরি, শ্রীমতী তোমার
দাসী॥

এই সময়ে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যে কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। একদল ইংরাজী সাহিত্য ও অপরদল সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনুবাদ ও ভাব সঙ্কলন করিয়া যে কত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। এই স্থলে উভয়দলের দুই চারিজন প্রধান প্রধান লেখকের বিষয়

সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে। ইংরাজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আর কি পরিচয় দিব? ইহাঁদের সঙ্কলিত, বিরচিত ও অনুবাদিত প্রবন্ধ সকল একত্র করিলে একটী ছোট রকমের পুস্তকালয় হইয়া দাঁড়ায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত "বিদ্যাকল্পদ্রুম" এবং মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বঙ্গভাষার মহামূল্য সম্পত্তি;—বঙ্গভাষার দুইখানি Encyclopedia. সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, শিল্প, বস্তু ও প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহুল শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল এই উভয় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত। বিশেষতঃ "বিবিধার্থ-সংগ্রহে" মধ্যে মধ্যে সুন্দর প্রতিকৃতি থাকিত। প্রস্তাব সকলের ভাষা অতিশয় জটিল ও দুর্বোধ হইলেও, সেগুলিতে সম্পাদকদ্বয়ের অগাধ বিদ্যা, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর গবেষণার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন; আর মিত্র মহাশয় জীবিত থাকিয়াও এক্ষণে মাতৃভাষার উপর বীতরাগ হইয়া উঠিয়াছেন।

এই স্থলে বাবু নীলমনি বসাকের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। তিনি এই সময়েরই লোক। তাঁহার "পারস্যোপন্যাস ও "নবনারী' নামক পুস্তকদ্বয় যারপর নাই সরল গদ্যে লিখিত হইয়াছে। এই দুই খানি গ্রন্থ আজিও অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। যখন গদ্য রচনায় লোকে সুদীর্ঘ সমাস সমন্বিত শব্দাড়ম্বরের পক্ষপাতী ছিলেন, সে সময় তিনি সরল অথচ সাধু ভাষায় মনের সকল ভাব অবাধে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। "পারোস্যোপন্যাসের" স্থানে স্থানে সুললিত ও সুমধুর কবিতা আছে। তাঁহার "নবনারীতে" এদেশীয়, প্রাচীন ও আধুনিক সময়ের নয় জন প্রাতঃস্মরণীয় মহিলার জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা এক খানি সুন্দর স্ত্রী পাঠ্য পুস্তক।

সংস্কৃত কলেজের ভূষণ স্বরূপ মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় দুই খানি মাত্র কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে "রস-তরঙ্গিণী" ও একবিংশ বৎসর বয়সে "বাসবদত্তার" রচনা করেন। "রস-তরঙ্গিণী" কতকগুলি আদিরস ঘটিত সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার পদ্যানুবাদ মাত্র। এই ক্ষুদ্র কাব্য খানির রচনা "বাসবদত্তার" রচনা অপেক্ষা সরল ও সুমধুর। অনুবাদ যার পর নাই মনোহর হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই কাব্যের অধিকাংশ স্থল এতদূর অশ্লীল, যে কোন ক্রমেই পাঠ করা যায় না। তর্কালঙ্কার মহাশয় যে কিরূপ উৎকৃষ্ট অনুবাদক ছিলেন, নিম্নে একটী মূল কবিতা ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইতেছি।

মূল—ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ।

অনুবাদ—
নয়ন কেবল; নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিয়া গড়িল।
কুন্দে দন্ত পাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল॥
শরীর সকল, চম্পকের দল,
দিয়া অবিকল; বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে,
পাষাণে তোমার মন গঠিল॥

উজ্জয়িনীর অধিপতি ভুবন-বিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন বর-রুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু সংস্কৃত ভাষায় বাসবদত্তা নামে যে মনোহর গদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, মদনমোহন তাহারই উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া স্বীয় কাব্যের রচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাতে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত গজগতি, দ্রুতগতি, দিগক্ষরা, অনুষ্টুপ প্রভৃতি ছন্দে অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ভারতচন্দ্র প্রণীত অন্নদা মঙ্গলের পূর্ব্বে বাসবদত্তা প্রকাশিত হইলে, ইহার সৌরভ চারিদিক আমোদিত করিত, সন্দেহ নাই। ইহার কোন কোন স্থল যার পর নাই অশ্লীল। এই কাব্যে কবি অসাধারণ কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বালক বালিকাগণের প্রথম পাঠ্য পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব দেখিয়া, মদনমোহন তিন ভাগ "শিশুশিক্ষা" রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে প্রথম শিক্ষার্থীগণের পাঠোপযোগী এরূপ মনোহর পুস্তক আর লিখিত হয় নাই। বাস্তবিক এগুলি অতি উপাদেয় হইয়াছে। "পাখী সব করে রব" প্রভৃতি প্রভাত-বর্ণনা বিষয়ক যে একটী কবিতা আছে, তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই কণ্ঠস্থ। ইহা প্রসাদগুণের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহার কোন কোন স্থানের বর্ণনায় প্রকৃত কবিত্বের অঙ্গ-হানি হইয়াছে। তিনি "সর্ব্ব-শুভকরী" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত করেন। উহাতে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ তিনি গদ্যে রচনা করেন। "সেরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালা রচনা তৎপূর্ব্বে আর কখনই প্রকাশিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি ঐ প্রস্তাব কখনই ওরূপ লিখিতে পারিতাম না।"

তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় কাদম্বরী ও রাসেলাস নামক পুস্তকদ্বয়ের অনুবাদক। বাণভট্ট বিরচিত সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য-কাব্য "কাদম্বরী" হইতে প্রথম খানি এবং ইংরাজ লেখক-কুল-ভূষণ জন্‌সন প্রণীত "রাসেলাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে দ্বিতীয় পুস্তক এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, বঙ্গভাষায় লিখিত অধিকাংশ মৌলিক গ্রন্থ গুণ-গৌরবে ইহাদের সমকক্ষ নহে। বিশেষতঃ "কাদম্বরীর বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুর্য্য ও অর্থের গাম্ভীর্য্যে প্রগাঢ়"। গ্রন্থের যে কোন স্থল একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, আর সহজে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। গ্রন্থখানি সংস্কৃত কাদম্বরীর অবিকল অনুবাদ নহে।

এক্ষণে আমরা সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি পুরাতন ও নূতন সাহিত্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন বলিয়া, এই স্থানে তাঁহার বিষয় আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছি। তিনি প্রবোধ-প্রভাকর, হিত-প্রভাকর, বোধেন্দু-বিকাশ এবং ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের জীবনী রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। তিনি "প্রভাকর" নামে মাসিক পত্র এবং "সংবাদ-প্রভাকর" "সাধুরঞ্জন" ও "পাষণ্ড-পীড়ন" নামক আর তিন খানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন। মাসিক প্রভাকরের অধিকাংশ বিবিধ পদ্য রচনায় পরিপূর্ণ থাকিত। মনোমোহন বসু,

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বাঙ্গালার বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য-শিষ্য। তাঁহারা এই প্রভাকরেই প্রথমে লেখনী চালনা করেন। সংবাদপ্রভাকর আজিও প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছে। সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক। শেষোক্ত দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রের পরিচয় তাহাদের নিজ নিজ নামেই ব্যক্ত রহিয়াছে। গুপ্ত কবির এই পাষণ্ড-পীড়নের সহিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদিত "রসরাজ" পত্রের কিছু দিন ধরিয়া "কবিতা-যুদ্ধ" চলিয়াছিল। এই উপলক্ষে উভয় পত্রে এরূপ অশ্লীল কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ সকল বাহির হইত যে, সহজ অবস্থায় কোন মনুষ্যই সে গুলি পাঠ করিতে পারে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ভাস্কর" নামক আর একখানি পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার গদ্য-রচনার ক্ষমতা বিলক্ষণ ছিল। খর্ব্ব-কায় বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট "গুড় গুড়ে" ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত।

অল্প দিন হইল, বঙ্কিমবাবু গুপ্ত-কবির কবিত্ব সমালোচনা করিয়া কবিবরের কবিতাবলীর প্রথম ভাগ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার ন্যায় সংক্ষিপ্ত অথচ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সমালোচন বঙ্গভাষায় আর আছে কি না, আমি জানি না। আমরা সেই সমালোচনার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিরূপ কবি।

"প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহু কষ্টে পিসিমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে এ "কেলা কা ফুল।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলই মোচা ভুলিয়া "কেলা কা ফুল" বলিতে শিখিয়াছি।

এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথি লক্ষ বীচি-বিক্ষেপশালিনী——মৃদুপবন-হিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্র-করমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদী-বক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্র-রশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজী কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজীর সঙ্গে এ ভাগীরথির ত কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময় গঙ্গা-বক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে॥

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা

বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক্‌সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়,খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি।

* * * * *

মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ. ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এসব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা। * * * যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি? ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসের রসিক—সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষ পার্ব্বণে পিটা-পুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্য-রস টুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদা ফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বরগুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রু বিন্দু শ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দেও—তিনি চালের দরটী কসিয়া দেখিয়া, তাহার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে,
ভাঙ্গা মন আর গড়েনা কো॥

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন-গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্য-রস বাহির করেন।

"বধূর মধুর খনি মুখ শতদল,
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল॥"

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাজীর ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্য রস পান, তপুসে মাছে মৎস্য ভাব ছাড়া তপস্বী

ভাব দেখেন। পাঁটায় বোকা-গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী ;—প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। * * তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময়, যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়তঃ সেই নীহার-শীতল স্বচ্ছ সলিল-ধৌত কষিত-কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিবেন, "দেখ দেখি, কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়া বাড়ি কর কেন!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামী পুত্র-সেবা-ব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য।" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাঁধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শ্বাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্ব-ভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বরগুপ্ত Satirist. ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষ-প্রসূত। * * ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গে কিছু মাত্র বিদ্বেষ নাই—কেবল আনন্দ। যে যেখানে সম্মুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন——কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনান্ট গভর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বরগণ হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা, কেহ ছাড়া নাই। * * যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

"বিড়ালাক্ষী, বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে"

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী গুল্কী॥

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitator দের কাণ ধরিয়া টানা টানি—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনে শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালী ঘাস।
যেন, রাঙ্গা আম্‌লা, তুলে মাম্‌লা,
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌ব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—

যখন আস্‌বে শমন, করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি, হুট্ ব'লে বুট্ পায়ে দিয়ে,
চুরুট্ ফুঁকে স্বর্গে যাবে॥

এক কথায় সাহেবদের নৃত্য গীত—

গুড়্ গুড়্ গুম্ গুম্ লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

* * ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালি

গালাজ করিতেন। মেকির উপর তাঁহার যথার্থ রাগ ছিল। * * অনেক সময়ে ঈশ্বর-গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধ-সম্ভূত। * * * *

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বর-প্রিয়তা তেমনই আর এক প্রধান দোষ। শব্দ-চ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়।"*

এই অবসরে আমি একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই। অতঃপর যাঁহারা সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তকাবলীর অনুবাদ করিয়াছেন, বালকগণের শিক্ষার্থ বিবিধ বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় কিছুই বলিতে পারিব না। তাঁহাদের সংখ্যা বহু। স্বতন্ত্র রূপে প্রত্যেকের বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে, সভার সময়ে কুলাইয়া উঠিবে না, এবং বিলক্ষণ আশঙ্কা হয়, পাছে, প্রবন্ধ কলেবর অযথা স্ফীত হইয়া, সভাসীন মহোদয়গণের ধৈর্য্য-চ্যুতি ও বিরক্তি উৎপাদন করে। ইঁহাদের দ্বারা বঙ্গভাষার যে কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইঁহারা সকলেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাজন।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম হইতে, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যতদূর সম্ভব, একটী ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত প্রবন্ধ হস্তে, আপনাদের সমক্ষে অগ্রসর হইতে সাহস করিয়াছি। ভরসা করি, আমার অভিপ্রায় বুঝিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (২০শ)

(মহাপ্রকাশ।)

মহাপ্রকাশের কথা বলিবার পূর্ব্বে আরও একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে এই একটী চমৎকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদিও সময়ে সময়ে মহাভাবে বিভোর হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন বোধ করিয়া ভগবহুক্তিতে কত ভগবত্তত্ত্ব বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু পাছে তদীয় শিষ্যগণের বা অপরের তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মে, সেজন্য বহু সময়ে তাঁহারা বাক্যে, উপদেশে, ব্যবহারে ও জীবনে আপনাদের মানবভাব দেখাইতে ক্রুটী করেন নাই। অন্য মহাপুরুষদিগের কথা এখানে বলিব না; গৌরের সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ করিবার উপায় নাই। একথা কেহ বলিতে পারিবে না যে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই; বা এমন সকল কথা বলিয়াছেন, যাহা দ্ব্যর্থ বা অস্পষ্টার্থ। আপনার মানবত্ব বিষয়ে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে ভূরি ভূরি উপদেশ

---

* প্রবন্ধ পাঠকালে উদ্ধৃতাংশের কোন কোন স্থল পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

দিয়া গিয়াছেন। এই প্রবন্ধের স্থানান্তরে সে সকল উক্তির অনেক কথা উদ্ধৃত করা গিয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে একটী কথা বলিব। তাঁহার মহা ভাবের অবস্থায় তিনি যে কখন কখন আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিয়া কথা বলিতেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই ঐ আশ্চর্য্য অবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা সময়ান্তরে করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সাধনের এক অবস্থায় উহা যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা দিবার সময় তিনি সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌরচন্দ্র বলিতেছেন ;—

> অধিরূঢ় মহাভাব দুইত প্রকার ;
> সম্ভোগে মাদন,বিরহে মোহন নাম তার।
> মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ,
> উদঘূর্ণা ; চিত্রজল্প, বিরহে দুই ভেদ।
> চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম ;
> ভ্রমর গীতা দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ।
> উদঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদি নাম ;
> বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান।"
>
> চৈঃ চঃ অন্তঃ ২৩ পৃঃ।

বিরহাবস্থায় মোহন নামে মহাভাবের দশা হয় ; তাহারই প্রকাশ বিশেষের নাম উদঘূর্ণা। উদঘূর্ণা অবস্থায় আবার দিব্যোন্মাদি মহাভাব জন্মে, তখন বিরহের ভিতরেও ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের বোধ হইতে থাকে। পাঠক মহাশয়! ইহার পরেও কি আর গৌরচরিতে কলঙ্কারোপ করিবেন? আর আপনারা, যাঁহারা তাঁহার পূর্ণত্বে বিশ্বাস করেন, আপনারা কি বলিবেন? লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনার ঈশ্বরস্বরূপ গোপন করিতেন, এ কথা কি আর বলিবার পথ আছে?

প্রাতঃকালে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবাসের আলয়ে উপবিষ্ট, ভক্তমণ্ডলী অল্পে অল্পে আসিয়া উপনীত হইল ; গৌরের ইঙ্গিতে উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। অন্য দিনের ন্যায় গৌরচন্দ্র দাস্যভাবে নাচিতে আরম্ভ করিলেন ; ক্রমে ভাবপ্রকাশ আরম্ভ হইয়া ক্রমে পূর্ণ মাত্রায় ঐশ্বর্য্যময় মহাভাবে পরিণত হইল। অন্য দিন নাচিতে নাচিতে ঈশ্বরভাবে বিভোর হইয়া তিনি বিষ্ণুখট্টায় উঠিয়া বসিতেন এবং ক্ষণকাল পরে ভাব অপগত হইলে যেন না জানিয়া বসিয়াছিলেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া অপ্রতিভ হইতেন। আজ আর ক্ষণকালের কথা নহে, সাতটী প্রহরের জন্য গৌরহরি নরহরি ভাবে মগ্ন হইয়া বিষ্ণুখট্টা অধিকার করিয়া বসিলেন। পাঠক মহাশয়, আকাশের চাঁদে গ্রহণ লাগা দেখিয়াছেন ; প্রথম রাহু স্পর্শ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত গ্রহণের স্থিতি এক প্রহর দশ দণ্ডের অধিক প্রায়ই দেখা যায় না ; কিন্তু আজ হৃদয়াকাশে গৌরচন্দ্রে যে গ্রহণ লাগিল, তাহার স্থিতি সাত প্রহর। আকাশের চাঁদের গ্রহণে রাহুশক্তি চন্দ্র স্পর্শ করে; এখানে হরিশক্তি গৌরচন্দ্রকে গ্রাস করিল। খাটের উপরে বসিয়া গৌরের আদেশ হইল 'আমার অভিষেক গীত গাও!' ভক্তগণ অমনি অভিষেক সঙ্গীত গায়িতে লাগিলেন,আর বিশ্বম্ভর মাথা ঢুলাইতে লাগিলেন। ভক্তমণ্ডলী মনে করিলেন যে, গৌরের জলাভিষিক্ত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে। তখন একশত আট কলস গঙ্গাজল আনাইয়া তাহাতে চন্দন, কর্পূর ও চতুঃসোম সংপৃক্ত করতঃ বৈদিক স্নানের পুরুষসূক্ত উচ্চারণ করিতে করিতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তদীয় মস্তকোপরি

ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের যে সকল দাস দাসীগণ গঙ্গার ঘাট হইতে জল বহিয়া আনিতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুঃখী নামে একটী স্ত্রীলোক ছিল; সুরসিক গৌরচন্দ্র তাহার ভক্তিভাবে জল আনা দেখিয়া তাহার নাম বদ্‌লাইয়া "সুখী" নাম রাখিলেন;—

'জল আ'নে এক ভাগ্যবতী দুঃখী নাম;
আপনি ঠাকুর দেখি বলে আন! আন!
আপনি ঠাকুর তার ভক্তি যোগ দেখি;
দুঃখী নাম ঘুচাইয়া থুইলেন সুখী।"

চৈঃ ভাঃ।

স্নানান্তে ভক্তদল অঙ্গ সংস্কার ও গৌর-দেহে চন্দন মাল্য পরাইয়া ও পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া বিষ্ণুখট্টা সজ্জিত করতঃ তদুপরি উপবেশন করাইলেন; নিত্যানন্দ তাঁহার শিরোপরি ছত্র ধরিলেন, কেহ চামর ঢুলাইতে লাগিল, এবং আর সকলে ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল গৌরের চরণতলে রাশীকৃত পুষ্প মাল্য, ধূপ, দীপ, চন্দন, কুঙ্কুম, আবির প্রভৃতি স্তূপাকারে সজ্জীকৃত হইয়াছে, চারিদিকে স্তবপাঠ হইতেছে ও শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্যধ্বনিতে অঙ্গন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। একে মনসা, তাতে ধুনার গন্ধ; আর কি রক্ষা আছে; একে ভক্তিমুগ্ধ ভক্তদল, তাতে আবার সে দিন গৌরের পক্ষ হইতে বাধা পড়িতেছে না। পড়িবেই বা কেমন করে? যে বাধা দিবে, সেতো আর তাহাতে নাই। কিন্তু ভক্তদল! তোমরা ইহার দ্বারা কি করিলে কিছু বুঝিতে পারিলে না; অবশ্য তোমাদের যাহা বিশ্বাস মনের আবেগে তাহা করিয়াছ, ইহাতে বাহিরের লোকের কথা কহিবার পথ নাই। কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ লোক তো আর ভিতরের কথা বুঝিবে না।

ভক্তগণ এইরূপ মহাধূমধামের সহিত গৌরাঙ্গ পূজা করিতেছেন; ষোড়শোপচারে, কেহ পঞ্চোপচারে, কেহ কেহ নানা উপচারে পূজার আয়োজন করিতেছেন; ইহার মধ্যে বিভোর গৌরচন্দ্র দক্ষিণ হস্ত পাতিয়া বলিলেন 'কিছু দাও' খাই।' অমনি যাহার যাহা ইচ্ছা হইল, তিনি তাহা হাতে দিতে লাগিলেন। কেহ নারিকেল, রম্ভা প্রভৃতি ফল, কেহ দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ও নবনীত, কেহ সন্দেস, মিঠাই, ও পক্কান্ন প্রভৃতি যাহা যাহা অভিলাষ, তাহা খাওয়াইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, গৌরাঙ্গ সে দিনে না কি দুই শত লোকের আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন:—

"দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়;
আর কি আছয়ে আন বোলয়ে সদায়।
বিবিধ সামগ্রী খায় শর্করা মিশ্রিত;
মুদ্গ নারিকেল খায় শস্যের সহিত।
কদলক চিপীটক ভর্জ্জিত তণ্ডুল;
আর বার আন বলে খাইয়া বহুল।
ব্যবহারে দুই শত জনের আহার;
নিমেষে খাইয়া বলে কি আছয়ে আর?"

চৈঃ ভাঃ।

ভোজনলীলা সাঙ্গ হইলে আর এক অদ্ভুত লীলা আরম্ভ হইল। সমবেত ভক্তমণ্ডলীর এক এক জনকে ডাকিয়া আবিষ্ট গৌরচন্দ্র তাঁহার অতীত জীবনের বৃত্তান্ত ও মনের গোপনীয় কথা বলিতে লাগিলেন। প্রথমেই তিনি শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিলেন "কেমন হে পণ্ডিত! তোমার কি মনে পড়ে? যেদিন দেবানন্দের টোলে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলে; প্রেম-রসময়

ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া তুমি বিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে পড়িয়াছিলে, দেবানন্দের অজ্ঞ পড়ুয়াগণ বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করত ধরাধরি করিয়া তোমাকে বাহির দুয়ারে টানিয়া ফেলিয়া দিলে, দেবানন্দ দেখিয়া শুনিয়াও কিছু বলিল না। তুমি মনে বড় দুঃখ পাইয়া নিজালয়ে আসিয়া ভাগবতের পাঠ চাহিতে লাগিলে ; তখন আমি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হয়তঃ ভাগবতের নিগূঢ় অর্থ বুঝাইয়া তোমাকে কাঁদাইয়াছিলাম কি না ?" শ্রীবাস এই কথা হৃদয়ে অনুভব করত কাঁদিয়া বিহ্বল হইয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গঙ্গাদাসকে ডাকিয়া বলিলেন " কি গঙ্গাদাস! সে রাত্রির কথা কি মনে নাই ? রাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া তুমি সপরিবারে গঙ্গা পার হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলে, কিন্তু ঘাটে নৌকা না দেখিয়া যবনে পরিবার স্পর্শ করিবে ভয়ে তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাইতেছিলে ; তখন খেয়ারীরূপে নৌকা আনিয়া তোমাকে কে পার করিয়াছিল,তা জান ?"

অদ্বৈতাদি সম্বন্ধেও অনেক কথা হইল। এইরূপে গৌরের ভাব বিভোরে, ভক্তগণের আনন্দ উৎসাহে, নৃত্য কীর্ত্তনে ও সেবায় ব্যস্ততায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা আগতে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া ও ধূপ দীপ জালিয়া ঘোর ঘটায় গৌরের আরতি হইল।

"এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈলা ;
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিলা।
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ,
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ততক্ষণ।
শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ।
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র,
কিছু নাহি বলে, যত করে ভক্তবৃন্দ।
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া,
'ত্রাহি প্রভু' বলি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
কেহ কাকু করে কেহ করে জয়ধ্বনি,
চারিদিকে আনন্দ ক্রন্দন মাত্র শুনি।
কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে,
যে আইসে সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে।
প্রভুর হইল মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ,
যোড় হাতে সম্মুখে রহিল সর্ব্বদাস।
ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি,
লীলায় আছেন গৌরসিংহ কুতূহলী।"

শ্রীধরের ভক্তি লাভ।

খোলা-বেচা শ্রীধরের পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইনি এক জন দীন দরিদ্র, তরকারি বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিতেন। নবদ্বীপের প্রান্তভাগে ইঁহার ভগ্ন কুটীর। ইনি একজন মহাশয় ব্যক্তি ;—

"মহা সত্যবাদী তিঁহ যেন যুধিষ্ঠির ;
যার যেহ মূল্য তাহা না বোলে বাহির।
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণ নামে।
সর্ব্ব রাত্রি হরি বলে সুদীর্ঘ আহ্বানে।
যতেক পাষণ্ডী বলে শ্রীধরের ডাকে ;
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই দুই কর্ণ ফাটে।
মহাচাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি মরে।
চৈঃ ভাঃ।

পরমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র আদেশ করিলেন, " ভক্তগণ! শীঘ্র যাও, শ্রীধরকে ডাকিয়া আন। সে আসিয়া আমার আজ্‌কার প্রকাশ দেখুক।

আদেশ শ্রবণমাত্র দুই চারি জন ভক্ত ছুটিয়া শ্রীধরের পর্ণকুটীরে যাইয়া উপনীত হইল এবং তাঁহাকে গৌরের মহা প্রকাশের কথা বলিয়া অবিলম্বে তৎ সমভিব্যাহারে গৌর সন্নিধানে পৌঁছিল। শ্রীধরকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বজীবনে শ্রীধরের সঙ্গে যে কৌতুকাদি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন "শ্রীধর! বল তো আজ্ অষ্টসিদ্ধিকে তোমার দাস করিয়া দি।" শ্রীধর এই কথা শুনিয়া গৌরবের সহিত মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। কথিত আছে যে, বিশ্বম্ভর কোমল শ্যামল বংশীমোহন মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন; সম্মুখে লক্ষ্মী যেন তাম্বুল দিতেছে এবং পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ প্রভৃতি দেবতাগণ স্তুতি করিতেছে, অনন্ত মস্তকে ছত্র ধরিয়াছে, সনক, নারদ, শুক প্রভৃতি গুণকীর্ত্তন করিতেছে। গৌরচন্দ্র শ্রীধরের গাত্রে হস্ত দিয়া মূর্চ্ছাপনয়ন করিয়া কহিলেন "শ্রীধর, তুমি আমার স্তব পাঠ কর।" শ্রীধর কাঁদিতে কাঁদিতে বিহ্বল চিত্তে বলিলেন "প্রভো! আমি মূর্খ, নীচ কুলোদ্ভব, আমি কি স্তব করিব?" এই বলিয়া শ্রীধর ভক্তিপূর্ণ চিত্তে কত কথা বলিয়া ফেলিলেন; তাহাতেই এক অপূর্ব্ব স্তবমালা রচিত হইয়া গেল। মূর্খের মুখে এই সব অলৌকিক কথা শুনিয়া ভক্তগন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন।

"বিশ্বম্ভর কহিলেন "শ্রীধর! বর লও; আজ তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দিতেছি।"

শ্রীধর উত্তর করিলেন "আর আমাকে বৃথা ভাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছো কেন? এত দিন ভাঁড়াইয়াছ বটে; কিন্তু আর পারিবে না।"

বিশ্বম্ভর অপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট; বাহ্যজ্ঞান নাই। শ্রীধরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, "শ্রীধর! তোমাকে অবশ্যই বর লইতে হইবে।"

শ্রীধর উত্তর করিল 'যদি নিতান্তই বর লইতে হয়, তো এই বর দাও।'

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত,
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্ম জন্ম নাথ।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল,
মোর প্রভু হউ তার চরণ যুগল।"

বলিতে বলিতে সরলমতি শ্রীধরের হৃদয় প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; তিনি দুই বাহু তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিয়া বলিলেন "শ্রীধর বলতো এক মহারাজ্যে তোমাকে অধিপতি করিয়া দি।"

শ্রীধর প্রেমাবেগে বলিয়া উঠিলেন, "যাও আমি তোমার ওসব কথা কিছুই শুনিতে চাই না। আমার এই ইচ্ছা যে চিরজীবন তব গুণ গাইয়া বেড়াই।"

তখন গৌরচন্দ্র স্থির গম্ভীর স্বরে সর্ব্ব সমক্ষে বলিলেন; "শ্রীধর! ধন্য তোমার দৃঢ় বিশ্বাস; কিছুতেই তোমার হৃদয় টলিল না। তুমিই ভক্তির উপযুক্ত অধিকারী; আজ তোমাকে আমি বেদের গোপ্য ভক্তি যোগদান করিলাম।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী জয় জয় রবে গগন পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

শ্রীধরের ভক্তিলাভ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস মহাশয় এইরূপে উপসংহার করিয়াছেনঃ—

"ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য,
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য।

কি করিবে বিদ্যাধন রূপে যশে কুলে,
অহঙ্কার বাড়ি সব করয়ে নির্ম্মূলে।
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা,
কোটিকল্পে কোটিশ্বরে না পাইবে তাহা।

মুরারি গুপ্তের প্রতি কৃপা।

বিশ্বম্ভর মহা বিভোর অবস্থায় মাথা ঢুলাইতেছেন আর গদাধর পণ্ডিতের প্রদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন। সম্মুখে অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া 'নাড়া' 'নাড়া' বলিয়া ডাকিয়া বলিলেন "কিছু বর চাই?" আচার্য্য বলিলেন "না; যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা পাইয়াছি।" অদ্বৈতের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে নাটকাভিনয়ের পট পরিবর্ত্তনের ন্যায় গৌরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রামচন্দ্রাবেশে মুরারি গুপ্তকে বলিলেন "গুপ্ত; একবার চাহিয়া দেখ দেখি?" মুরারি গৌরের দিকে তাকাইয়া দুর্ব্বাদল শ্যাম রামরূপ বামদিকে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ও চারিদিকে বানরেন্দ্রগণ যেন স্তুতি করিতেছে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিশ্বম্ভর দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতে লাগিলেনঃ—

"উঠ! উঠ! মুরারি আমার তুমি প্রাণ,
আমি সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি হনুমান।"

মুরারি গুপ্ত চেতনা প্রাপ্ত হইলে গৌরচন্দ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর সম্মুখে তাঁহার নাম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "গুপ্তেতে উঁহার হৃদয়ে মুরারি বাস করেন; এই জন্য উঁহার নাম মুরারি গুপ্ত।" আর গুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৈদ্য! বর লও।"

মুরারি বলিল 'প্রভু! এই বর দাও যেন চিরদিন তোমার পার্ষদ হইয়া থাকিতে পাই।

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তথাস্তু।

হরিদাসের দর্শন।

এইবার হরিদাসের পালা। হরিদাস সকলের পশ্চাৎভাগে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, বিশ্বম্ভর তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিদাস! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা বড়, তোমার যে জাতি আমারও সেই জাতি। যখন পাষণ্ড যবনগণ তোমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছিল; আমার প্রাণে তাহা শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল; আমি চক্র হস্তে বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে ও তাহাদিগকে দণ্ড দিতে কৃতসংকল্প হইলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম তাহারা তোমাকে মারিতেছে; অথচ তুমি তাহাদিগের কুশলকামনা করিয়া ভালবাসিতেছো, তখন আর তাহাদিগকে মারিতে পারিলাম না; কিন্তু তোমার পৃষ্ঠে যে প্রহার হইতেছিল, নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া লইলাম। আমার প্রকাশের কিছু বিলম্ব থাকিলেও তোমার এই ব্যাপারে তাহা শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া গেল। ভক্ত-নির্যাতন সহ্য না করিলে আমার প্রকাশ হয় না, সুতরাং পাষণ্ডী নিস্তারের উপায়ও উদ্ভাবিত হয় না। হরিদাস! আমার নাড়াই তোমাকে যথার্থ চিনিয়াছে।

বিশ্বম্ভরের ঈদৃশ করুণ বচন শ্রবণ করিয়া হরিদাস প্রেমে বিহ্বল হওতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে খেদ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হরিদাস কাঁদিতে

কাঁদিতে বলিলেন "বাপ বিশ্বম্ভর! তুমি জগতের নাথ; আমি নীচ কুলোদ্ভব অতি নীচ ও মহাপাতকী; আমাকে উদ্ধার করার ভার তোমার উপরেই আছে। তুমি বিপদ কালের বন্ধু! তোমার স্মরণে কি না হয়? পাপাসক্ত দুর্য্যোধন সভা মধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে চাহিলে, তখন বিপন্না কুল-কামিনী ব্যাকুল চিত্তে তোমাকে স্মরণ করিলেন, আর অনন্তরূপে, তুমি বস্ত্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলে। দুরন্ত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করিলেও ভক্ত তোমার একমাত্র স্মরণ প্রভাবে হাসিতে২ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। স্মরণ প্রভাবে অজামিল কিনা পাইয়াছিল? আমি এমন দুর্লভ স্মরণ বিমুখ। তোমার প্রকাশ দেখার আমার অধিকার নাই।

বিশ্বম্ভর।—তোমার যাহাতে অধিকার নাই; তাহাতে আর কাহারও অধিকার হইতে পারে না। হরিদাস! মনে যে অভিলাষ থাকে, প্রার্থনা কর, পূর্ণ হইবে।

হরিদাস।—আমি পাপাসক্ত; আমার আর কোন বাঞ্ছা নাই, কেবল এই কর, যেন আমি ভক্তের উচ্ছিষ্ট খাইয়া ও দাসানুদাস হইয়া থাকিতে পারি।

"প্রভুরে! নাথরে! মোর বাপ বিশ্বম্ভর!
মৃত মুই, মোর অপরাধ ক্ষমা কর।
শচীর নন্দন বাপ! কৃপা কর মোরে,
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে।"

বিশ্বম্ভর।—হরিদাস! বিনয় ছাড়; তোমার সঙ্গে যে মুহূর্ত্ত কাল বাস করিবে; সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমার শরীরে আমার নিত্য স্থিতি; এবং তোমার মত ভক্ত লইয়াই আমার ঠাকুরালি। আমি আজ এই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, বৈকুণ্ঠের ভক্তি ভাণ্ডার তোমারই হইল।

অদ্বৈতের প্রতি।

বিশ্বম্ভর অদ্বৈতের প্রতি পুনর্ব্বার কটাক্ষ করিয়া তাঁহার মনের কথা বলিতে লাগিলেন "আচার্য্য গোঁসাই! পূর্ব্বের কথা কি কিছু মনে হইতেছে, জগতে ভক্তি শাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য যখন তুমি গীতা ও ভাগবত অধ্যয়ন করিতে; কোন শ্লোকের ভক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া যখন ব্যাকুলচিত্তে চিন্তায় নিযুক্ত হইতে ও যতক্ষণ সদর্থ ও সৎপাঠ আবিষ্কৃত না হইত, ততক্ষণ অনাহারে উপবাসী থাকিতে; তখন কে তোমার প্রাণে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে সত্য পাঠ ও ভক্তির অর্থ বুঝাইয়া দিত; তুমি তখন মনে করিতে বুঝি স্বপ্নে সিদ্ধিলাভ লাভ হইল।" এই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ যত শ্লোকে পূর্ব্বে আচার্য্যের দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল, সেগুলি নাকি আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন ও পুনরায় বলিলেন "আচার্য্য! সকল পাঠই পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি; কিন্তু একটী বলি নাই; আজ তাহা বলিব; গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকের যথার্থ পাঠ এইঃ—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং। [সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি]।"

ইহার অনুবাদ

"তাঁহার (ব্রহ্মের) হস্ত ও চরণ সর্ব্বত্র; তাঁহার চক্ষু ও মুখ সর্ব্বত্র; এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

অদ্বৈতের চিরদিনের সন্দেহ স্থল মীমাংসা হইল; মনের মধ্যে এক স্বর্গের আলোক জ্বলিয়া উঠিল; তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেনঃ—

"অদ্বৈত বলয়ে-আর কি বলিব মুঞি,
এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুঞি।"

ইহার পর বিশ্বম্ভর ভক্তদলকে সাধারণ ভাবে বলিলেন যে "যাহার অভিলাষ থাকে বর যাচ্ঞা কর; আমি পূর্ণ করিব।" তখন যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহা বলিতে লাগিলেন ও বিশ্বম্ভর ও হাসিতে২ তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেনঃ—

"কেহ বলে মোর বাপ না দেয় আসিবারে;
তাঁর চিত্ত ভাল হউক এই দাও বরে।
কেহ বলে শিষ্য প্রতি; কেহ পুত্র প্রতি;
কেহ ভার্য্যা প্রতি ভৃত্য যাঁর যেই মতি।
কেহ বলে আমার গুরুর হউক ভক্তি;
এই মত বর মাগে যার যেই শক্তি।"

মুকুন্দ দত্তের দণ্ড।

যে ঘরে এই সব রঙ্গ অভিনীত হইতেছিল, তাহার প্রকোষ্ঠান্তরে সুগায়ক মুকুন্দ দত্ত অধোবদনে আসীন। যাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে ভক্ত দল মুগ্ধ হইতেন; যিনি কীর্ত্তন করিলে গৌরচন্দ্রের পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি মহাভাবের তরঙ্গ সকল উঠিয়া পড়িত; আজ মহা প্রকাশের মহানন্দের দিনে সেই প্রিয় মুকুন্দ কেন নির্ব্বাসিতের ন্যায় বিষণ্ণচিত্তে উপবিষ্ট? এ কথার রহস্য গৌরচন্দ্র ভিন্ন কেহ জানে না; মুকুন্দ জানিতেন; কিন্তু বিনানুমতিতে তাঁহার প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই। বিশ্বম্ভর একে একে সকলকেই ডাকিলেন, অথচ মুকুন্দের নাম পর্য্যন্ত করিলেন না দেখিয়া শ্রীবাস পণ্ডিত সাহসে ভর করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

"শ্রীবাস বলয়ে শুন জগতের নাথ,
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমার?
মুকুন্দ তোমার প্রিয়; আমা সবার প্রাণ;
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান।
ভক্তি নারায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান;
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান।
যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর;
আপন দাসেরে কেন দূরে পরিহর।
তুমি না ডাকিলে নারে সমুখ হইতে,
দেখুক তোমারে প্রভু বল ভাল মতে।"

বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন;—

"প্রভু বলে হেন বাক্য কভু না বলিবা;
ও বেটার লাগি কেহ কিছু না কহিবা।
খড় লয়, জাঠি লয়, পূর্ব্বে যে শুনিলা,
এই বেটা সেই হয় কেহ না চিনিলা।
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে,
ও খড় জাঠিয়া লেঠা না দেখাবে মোরে।"

শ্রীবাস পুনর্ব্বার কহিলেন "তোমার প্রহেলিকা কথা বুঝিতে পারিলাম না, আমরা তো মুকুন্দের কোন দোষ দেখিতেছি না।"

বিশ্বম্ভর। "তোমরা কি বুঝিবে? ও বেটা যখন যে মজলিসে যায়; তখন সেই মত কথা বলিয়া গোড়ে গোড় দেয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে থাকিয়া যখন সে যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করে, তখন ভক্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া দন্তে তৃণ করিয়া ভক্তিভাবে নাচিতে থাকে; আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভায় অন্য পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া আমার হৃদয়ে জাঠি মারে। ও বেটা ভক্তিস্থানে ঘোর অপরাধী; সেজন্য তাহার দর্শন সঙ্গ বাদ পড়িয়াছে।"

মুকুন্দ বাহির হইতে এই নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া চিরকালের জন্য গৌর দর্শন হইতে বঞ্চিত হইতে হইল ভাবিয়া অঝর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন; এবং শ্রীবাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "পণ্ডিত! সত্য সত্যই আমি গুরুর অনুরোধে বা শীঘ্র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ভক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াছি; ইহাতে সত্য সত্যই আমার ভক্তি স্থানে মহা অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপ-রাধী প্রাণ রাখা যুক্তিযুক্ত নহে; অবশ্যই আমি এ শরীর ছাড়িব।" মুকুন্দের রোদনে ভক্ত মণ্ডলী কাঁদিতে লাগিল দেখিয়া গৌর-চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "আর কোটি জন্ম পরে মুকুন্দ আমার দর্শন পাইবে।"

"প্রভু বলে আর যদি কোটি জন্ম হয়; তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়।" এইকথা শুনিবামাত্র বিশ্বাসী মুকুন্দ 'পাইব' 'পাইব' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দের বিশ্বাস ভাব দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। তথাচ মুকুন্দের গৌর সম্মুখে আসিবার সাহস লইল না। ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া আনিলে মুকুন্দ নির্ব্বেদ সহকারে বিশ্বম্ভর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। গৌরাঙ্গ কহিলেন "মুকুন্দ! আর কাজ নাই, উঠ। তোহার দৃঢ় বিশ্বাস তিলার্দ্ধ মধ্যে আমার সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ করিয়াছে; আমার পরাজয়, তোমরই জয়। সঙ্গদোষে তোমার যে পাপ হইয়াছিল, আজ তোমার সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাহা দূরীভূত হইল। তুমি আমার পরিহাস পাত্র, পরিহাসচ্ছলে যাহা বলিলাম, তাহাতে দুঃখ করিও না। আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, তোমার কণ্ঠস্বরে ও রসনায় আমি নিরন্তর বাস করিতেছি।

গৌরের এই সব প্রেমের কথা শুনিয়া মুকুন্দের নির্ব্বেদ দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিল; তখন তিনি ভক্তির মাহাত্ম্য ও আপনার দোষ কীর্ত্তন করিয়া বিলাপ করিতে লাগি-লেন। বিশ্বম্ভর কিছু লজ্জাবনত মুখে নানা প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

নারায়ণীর প্রসাদ ভোজন।

শ্রীবাসের বাটিতে প্রেমের হাট বসি-য়াছে; এই আনন্দবাজারে যে যাইতেছে, সে আর রিক্ত হস্তে ফিরিতেছে না। প্রেমান্নে, আনন্দান্নে তাহার আত্মার উদর পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। শ্রীবাসের দাস দাসী যত ছিল, সকলেই এ আনন্দের অংশীদার হইল। কেবল শুষ্ক জ্ঞানাভিমানী ভট্টাচার্য্যগণ ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না; না পারিবারই তো কথা; অহঙ্কার ও পণ্ডিতা-ভিমানের নিকট ভক্তিদেবী অপ্রকট থাকেন। যাহা হউক, রজনী প্রভাতে গৌরের ভাব-তরঙ্গ থামিয়া আসিল; পূর্ণিমার জোয়ারে ভাটা আরম্ভ হইল; মহা ভাবের আবেগ কমিয়া স্থায়ীভাবে পরিণত হইল। তখন আপনার গলদেশস্থিত পুষ্পমালা লইয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগণকে একে একে বাঁটিয়া দিলেন এবং আহারীয় পাত্রের অবশেষ শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা নারায়ণীকে খাইতে দিলেন:—

"ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল;
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান;
তাহাকে ভোজন শেষ প্রভু করে দান।

"পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ।
ধন্য ধন্য এই যে সেবিলে নারায়ণ;
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন।
খাইলে, প্রভুর আজ্ঞা হয় 'নারায়ণী!
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি তুমি?'
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব,
কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকা স্বভাব।
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে গায় ধ্বনি;
চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই নারায়ণী চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের গর্ভ-ধারিণী। এইরূপে সে দিনকার মহা লীলা শেষ হইল।

পাঠক মহাশয়, এই প্রস্তাবে অনেক অলৌকিক বৃত্তান্ত, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি এবং ভাবুকতার পরিচয় পাইলেন। স্থানে স্থানে যে অলৌকিক কথা বলা হইল, ইহাতে সাধারণের বিশ্বাস জন্মিবে না, এ কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; এবং তদ্রূপ অবিশ্বাস নিরাকরণ জন্য এই প্রস্তাবের বহুল স্থানে অবিশ্বাসীদিগকে বিধিমত প্রকারে ভৎর্সনা করিয়াছেন ও নরকের ভয় দেখাইয়াছেন।

"এসব কথায় যার নাহিক প্রতীত:
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত"

সুচতুর পাঠক সাবধানে এই অলৌকিক দৃশ্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ টুকু বুঝিয়া লইবেন। মধুকরের ন্যায় এই ভাব-কুসুমের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করুন; রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের মন্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি; তাহা ছাড়া আর কোন তত্ত্বে কেহ যদি উপনীত হইতে পারেন, তবে বড় সুখের বিষয়। ভাবপ্রবণ দেশে মানুষী লীলায় অমানুষী ভাব প্রক্ষেপ অস্বাভাবিক নয় এবং গ্রন্থকারের চাক্ষুষ বৃত্তান্ত লেখা নয়; এই দুইটা কথা স্মরণ রাখিলে মীমাংসা অনেক সহজ হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ-মহিলা।

(বৃন্দাবন পথে।)

দ্বিতীয় নিশা প্রভাতে মথুরাপুরী পরিছার মানসে আমরা সমস্ত দিন বাসায় বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে বৃন্দাবন দর্শনার্থে অশ্বযানে বাহির হইলাম। বৃন্দাবনের এই পথের চারিধার ঘন কৃষ্ণ ছায়াময় সুদীর্ঘ বৃক্ষাবলী পরিশোভিত কাননরাজি নব দুর্ব্বাদলে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মধুর নিস্তব্ধতা, এই পথ দিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে যেন আর এক অভিনব প্রকৃতিরাজ্যে লইয়া চলিল। প্রকৃতি সুন্দরী প্রাণ খুলিয়া পবিত্র নবীভূত সৌন্দর্য্যরাশি অকাতরে পথিকের জন্য এদিক সেদিক ছড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহার এ জগতে রোগ শোক জ্বালা যন্ত্রণা নাই। সকলি শোভা, সকলি মাধুরী। ভাবুকজন এখানে আসিলে নয়ন ভরিয়া

কল্পনার শোভা বাস্তবিক রাজ্যে দেখিতে পান। আর শোকাভিভূত মনুষ্য-হৃদয় ইহাতে জুড়াইয়া যায়। আর্য্যগণই যথার্থ কবি, তাঁহারা জীবন্ত কবিতা অধ্যয়ন করিতে এই সকল পুণ্য তীর্থ পরিদর্শন প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

"অহিংসা পরমধর্ম্ম" এই মহদ্বাক্যের সার্থকতা এই সব স্থানেই হইয়াছে। মনুষ্যের সহিত ময়ূর ময়ূরী এবং মৃগশিশুগণ একত্র পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তাহা দেখিলে পুণ্যময় অতীতকালের তপোবন স্মৃতি আমাদিগের মানস পটে আবার জাগরূক হয়। ঋষিকুমার কুমারী যে হরিণ-শিশুর সহিত ক্রীড়া করিতেন, তাহা আর্য্য কবির কল্পনা নহে, প্রকৃত চিত্র।

আমরা সন্ধ্যাসমাগমে চিরবসন্তময় রাজ্য বৃন্দাবনে আসিয়া নামিলাম। এক জন বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমাদিগকে তাহার বাটীতে বাসা দিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল। বৃন্দাবনের বাড়ী "কুঞ্জ" নামে অভিহিত। যাত্রী দেখিলে বৈষ্ণবগণ আপন আপন "কুঞ্জে" বাসা দিতে যত্ন করে, তবে আমাদিগকে প্রকৃত তীর্থ যাত্রী বোধ না হওয়াতে তাহারা বড় সাধিয়া বাসা দিতে অগ্রসর হইল না। এখানেও পাণ্ডাঠাকুর মূর্ত্তিমান্, তাঁহারাই সকল সুবিধা করিয়া দিলেন।

বৃন্দাবন।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন কয়েক ক্রোশ পথ মাত্র ব্যবধান এবং চতুর্দ্দিকে নীল শোভাময়ী যমুনা, মধ্যে স্বর্ণ কাননবৎ বৃন্দাবন দ্বীপ সম বিরাজিত, ইহাকে "আলোদ্বীপ আঁধার সাগরে" বলা যায়। এ পুণ্যদ্বীপের মাধুরী জীবলোক মুগ্ধ-কর ও পত্র পুষ্প বিশিষ্ট। নব পল্লবিত শ্যামল তরুকুলের চির প্রফুল্ল সৌন্দর্য্য রাশি এ দ্বীপ অঙ্গে নিরীক্ষণ করিলে ইন্দ্রালয়ের নন্দন কানন কল্পনা-নেত্রে যেন ফুটিয়া উঠে।

শান্তিময়ী যমুনার ঘাটশ্রেণী পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। এই সকল ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতেন, সেই নিমিত্ত ইহার স্মৃতি ভক্ত বৈষ্ণব বৃন্দের নিকট অতীব আদরণীয়। তাঁহারা যে ভাবে এ সকল ঘাট দর্শন করেন, আমরা সে ভাবে তাহা না দেখিয়াও প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি।

মাননীয় বঙ্কিম বাবুর শ্রীকৃষ্ণ নহেন, গোস্বামী মহাশয়ের কিম্বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণঠাকুর সে ঘাটের কদম্ব তরু-শাখায় গোপবালার অপহৃত বস্ত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের পল্লব একটু নূতনতর। গোপীনাথের "করপুটের চিহ্ন" নাকি ঐ সমুদায় পত্রাবলীতে প্রকাশিত হইতেছে। ভক্তজনের চক্ষে দেবতার লীলা খেলা অবশ্যই মালিন্যকণাহীন কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব কবিগণ ভক্তির স্রোতে, কবিত্ব-হিল্লোলে ভাসিয়া গিয়া তাহাদিগের "মহাপ্রভুকে" কিছু বেশি মাত্রায় বিলাসী করিয়া ফেলিয়াছেন। মহাজন পদাবলী ও অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িলে ভক্তি বিষাদে পরিণত হয়। তবে আজি কালিকার অনেক বিজ্ঞ সমালোচক কৃষ্ণচরিত্রে নানা প্রকার অলৌকিকতা দেখাইতেছেন।

আরতির মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন বাসার রহিয়া শুনিতে শুনিতে সুনিদ্রায় বিভাবরী পোহাইলে "রূপসী উষার অরুণ ভূষার

তরুণ'' শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমরাও "পথিক মন"কে জাগ্রত করাইয়া পরদিন প্রভাতেই দেব দর্শনে গমন করিলাম।

বৃন্দাবনে গাড়ী প্রভৃতি পাওয়া যায় না, সুতরাং পদব্রজে গমন করাই নিয়ম। জুতা, ছাতা ও ছড়ি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ থাকায়, তাহা দ্বারবানের নিকট গেটে রাখিয়া যাইতে হয়। "এখানে আসিলে সকলি সমান," লক্ষপতি হইতে অতি গরিব পর্য্যন্ত এ স্থানে "একই মূল্য বহন করে, এ বাজারে সব এক দর" "রাজা মহারাজা, "মহামহোপাধ্যায়" "নক্ষত্র" অনক্ষত্র "রায় বাহাদুর" হইতে সামান্য কৃষক এখানে আসিয়া পাদুকা-বিহীন হন। ইংরাজের কিম্বা বিধাতার উপাধির এ স্থানে সমান গৌরব।

প্রথমেই আমরা "গোবিন্দজী ও রাধা-রাণী" দেখিতে গেলাম। তখন কেবল মাত্র ললিত প্রভাত-রশ্মি উচ্চ মন্দির চূড়ায় কনক কিরণ প্রতিভাত হইয়াছে ও কাল পিক-কূজনে বৃন্দাবন জাগিয়া উটি-য়াছে, সেই সময়ই মন্দিরের চারিধার লোকারণ্যে পরিপূর্ণ এবং যাত্রীগণ যুক্ত-করে বসিয়া যেখানে হরিনাম জপ করি-তেছিল, আমরাও সেখানে গিয়া দাঁড়াই-লাম। গোবিন্দজী ও রাধারাণীই বৃন্দা-বনের প্রধান বিগ্রহ।

গৃহত্যাগী ভিখারীর স্থান বৃন্দাবন, বৈষ্ণব কিম্বা গোস্বামী ভিন্ন অন্য লোক তত দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ পুরুষ কৌপীন ও নামাবলীধারী, আর স্ত্রীলোকেরাও এখানে অতি সঙ্কীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। পূর্ব্ব রঙ্গের বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এখানকার অধিবাসীর মধ্যে বেশি হইলেও নবদ্বীপ শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়দের খুব দর্শন পাওয়া যায়।

বাজারে মৎস্য মাংসের সম্পর্কও নাই, খাদ্য ভিখারীর উপযোগী, কিন্তু দুগ্ধ ঘৃত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। গোচারণও নবনীত অপহরণ ক্ষেত্রে দুগ্ধ ঘৃত পাওয়া যাইবারও কথা। এখনও বৃন্দাবন গোপিনীর দেশ নয়। প্রতি বৎসর অনেক নূতন নূতন "আইন কানুন" প্রচার করিয়া "কানাই বলাই" একত্র "কাউন্সিলের" শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

এখানকার মনোহারীর দোকানে কেবল তুলসির মালা, তিলক "রজ" (বৃন্দাবনের ধূলা) ও নামাবলীই পাওয়া যায় এবং তাহাই লোকে ভক্তি ভরে ক্রয় করে। বৃন্দাবন নাথের রাজ্যে সৌখীন বিলা-সের উপকরণ কিছু দেখিতে পাই-লাম না।

এই সকল পবিত্র তীর্থ স্থানে অসংখ্য পতিত পাতকী আসিয়া বাস করিতেছে। তীর্থের পবিত্রতা তাহাদিগের সহবাসে যেন কমিয়া যায়। অধঃপতিত জাতিকে পরিত্রাণ করিতে মহাত্মা চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু সময়ে তাহাতে অশেষ অমঙ্গল আনিয়াছে। পুণ্যস্থানে মুক্তি লাভের ছলনায় কত প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে যে তাহারা জীবন কলঙ্কিত ও কলুষিত করিতেছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় ব্যথিত হইয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর এই সকল তীর্থস্থানে আবার সহসা বুদ্ধ বা চৈতন্যের আবির্ভাব না হইলে, আর এ পাপ-স্রোত নিবারিত হইবার আশা নাই। সাধু জন সংস্কার-বহ্নি জ্বালাইয়া যদি ইহার অণু-পরমাণু একেবারে ভস্মীভূত করিয়া আবার

নূতন উপকরণে ইহা প্রস্তুত করেন, তবেই নিস্তার, নতুবা আর এ জীবের মুক্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর জানেন, এই সকল জীবনের পরিণাম কি ?

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে লালাবাবুর ব্রহ্মচারী (একজন ধনবান উচ্চবংশজাত ব্রাহ্মণ, উপাধি ব্রহ্মচারী) এবং টিকারীর মহারাণীর সুন্দর দেবমন্দির দর্শন করিয়া আমরা শেষে শেঠের মন্দিরে গেলাম। লালাবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি বৃন্দাবনের চারিদিকে শোভা করিয়া আছে। তাঁহার "সদাব্রতে" প্রত্যহ দুই বেলা অসংখ্য দীন দরিদ্র অন্ন পানে প্রতিপালিত হইতেছে। সামান্য এক মুষ্টি ভিক্ষা দিয়া কর্কশবাক্যে কেহ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারে না। এখানে অনেক ভদ্রলোক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী উচ্চ বেতনে নিযুক্ত আছেন, এবং তাঁহারা সুনিয়মে "সদাব্রতের" কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বিবাহ কিম্বা উপনয়নের সময় ধনীর গৃহে যেরূপ ভোজের আয়োজন হয়, তেমনি প্রতিদিন পুণ্যাত্মা লালাবাবুর সদাব্রতে আহার প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে যাহা খাইতে অভিলাষ করে, তাহাকে তাই পরিতোষ পূর্ব্বক দেওয়া নিয়ম। তাঁহার ঠাকুর বাড়ীর সমুদয় স্থান বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সদাব্রত, অসংখ্য ভিখারীর বাসেও কিছুমাত্র মলিন নহে।

যে লালাবাবুর এই অতুল বৈভবময় পুণ্যকীর্ত্তি বৃন্দাবন জীবিত রাখিয়াছে,—লোক মুখে শুনিলাম, সেই পুণ্যাত্মা প্রত্যহ বৃন্দাবনের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মরক্ষার্থ রুটি ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন নাকি। এখানকার প্রায় সমুদায় দেবমন্দিরই দেখিতে অতীব মনোরম্য। আর ধনীগণ তাঁহাদিগের ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে যেন যত্নসঞ্চিত সুবর্ণ দ্বারা আপনাদিগের দেবমন্দির-চূড়া নির্ম্মাণ করাইয়া ধার্ম্মিকজীবনের সুখানুভব করিয়াছেন। স্বর্ণ যেমন পবিত্র ও সুনির্ম্মল, তাহার স্থান দেবতার গৃহ চূড়াই যোগ্য। নরদেহ তাহার উপযুক্ত স্থান নহে। ফুল সম্বন্ধে ধার্ম্মিককবি বলিয়াছেন,

"এমন পবিত্র, এমন নির্ম্মল
দেবপদ ভিন্ন কোথা শোভে বল ?"

সুবর্ণ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে,--

"এমন নির্ম্মল" এমন উজ্জ্বল,
দেবচূড়া ভিন্ন কোথা শোভে বল ?

টিকারীর মহারাণীর মন্দির-চূড়া কনক গঠিত হইলেও শেঠের মন্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রায় অর্দ্ধেক স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং উজ্জ্বল প্রভাকর কিরণ যখন তাহার উপর পূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়, তখন সে হাস্যময় উচ্চ দীপ্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় না। সে সৌন্দর্য্য আপনার গৌরবে আপনি মুগ্ধ। পৃথিবীর মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

শৈশবে যখন পিসীমার মুখে "রামায়ণ মহাভারতের" পুণ্যময় অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিবার জন্য সন্ধ্যা হইতে কত রাত্রি চেষ্টা করিয়া জাগিয়া থাকিতাম, তখন বৃন্দাবনের এই "সোণার তালগাছের" কথা কতবার শুনিয়াছি। তাঁহার অমৃতপূর্ণ স্নেহের সহিত মিশ্রিত হইয়া তখন সে "সোণার তালগাছ" শ্রবণে যেমন মধুর লাগিয়াছিল, আজ তাহা শেঠের দেবালয় প্রাঙ্গণে চক্ষের সম্মুখে শরীরী রূপে বিদ্যমান দেখিয়াও আর তেমন মোহিত হইলাম না। স্মৃতি সুখকর রাজ্যের সে সুধাকাহিনী এখন কেবল অস্ফুট স্বপ্নসম বোধ হয়।

শেঠের প্রকাণ্ড ঠাকুর বাটীর পশ্চাতে একটী সুদীর্ঘ সুন্দর দীর্ঘিকা আছে। তাহার ঘন কৃষ্ণ বারিরাশি নিদাঘের মেঘমালা সদৃশ শোভাময়। সেই সলিল-হৃদয় মথিত করিয়া কত রাজহংস হংসী ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে; যেন মানস-সরোবরে বিকশিত শ্বেত শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহা একবার দেখিয়া সাধ পূর্ণ হয় না, যতবারই দেখিবে, ততবারই অতৃপ্ত নয়ন ফিরাইতে পারিবে না। কেমন সে মাধুরী, এখনও আমার মানসনেত্রে দীপ্তি পাইতেছে।

দর্শক কিম্বা যাত্রীগণের আমোদার্থে এক খানি ক্ষুদ্র বোটও সেখানে যত্নপূর্ব্বক রাখা হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সায়াহ্নে তাহাতে আরোহণ করিয়া "জলখেলা" করা যায়। কর্ণধারহীন সে "সাধের তরণী তরঙ্গে" পড়িবার ভয় নাই। বসন্তের শরৎহিল্লোলে সে তরী আপনি ভাসিয়া যায়, "কূল ত্যজিয়া" গেলেও "আতঙ্কে মরিতে" হয় না।

"মোচার খোলার মত ছোট নৌকা খানি, চলে যেন নাচিয়া নাচিয়া।" "গগনের ঘন গরজনে" কিম্বা "খর সমীরণে" অদ্যাপি কোন বিপদ সে দীর্ঘিকা সাগরে ঘটে নাই।

শেঠজীর দেবনিকেতনের ভিতরও প্রত্যহ সকাল বিকালে কাছারী হয়। এখানেও অনেক ভৃত্য এবং পরিচারক ব্রাহ্মণ আছে। শুনিলাম, এখানকার নায়েবও একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং অতিথি অভ্যাগতের সমুচিত আদর ও যত্ন করেন।

বৃন্দাবনের কোন বিগ্রহ দর্শনেই কিছু দিতে হয় না। বিগ্রহস্বামীগণ এই সকল দেব দেবীর জন্য অকাতরে প্রচুর অর্থদান করিয়া এবং জমীদারী লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। দাতাদিগের বংশধরগণ ইচ্ছা করিলেও সেই সব "দেবোত্তর" এবং "ব্রহ্মোত্তর" কাড়িয়া লইতে পারেন না। নিয়ম বড় কড়াক্কড় নাকি।

অন্যান্য মন্দিরের বিষয় বলিতে বলিতে "সাহাজীর" চিত্রময় সুন্দর মন্দিরের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই মন্দিরের বাহিরে এবং ভিতরে নব নব প্রকার খোদিত ও চিত্রিত মূর্ত্তি আছে। তাহা সুনিপুণ ভাস্কর কিম্বা দক্ষ চিত্রকর হস্তজাত না হইলেও দেখিতে প্রীতিকর। কেমন একটু নবীভূত কল্পনা তাহাতে রহিয়াছে, দর্শক নয়ন রঞ্জন প্রতিমূর্ত্তি গুলিতে ভারতীয় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একটী চিত্র আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল; তাহা এইঃ—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহ রথারোহণে শূন্যমার্গে উঠিতেছেন, বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর, সুশীলা সুভদ্রা সখীগণ সহকারে সরোবর হইতে স্নাত বসনে গৃহে আসিতেছেন, সদ্য স্নানে বদন মণ্ডল লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়াছে, এমন সময় পথে অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, কিন্তু কথা বার্ত্তা হইতে সুবিধা হইল না, স্বয়ং ভগবান রথোপরি আরূঢ়। দেখিতে দেখিতে রথ বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল, অর্জ্জুন মুখ ফিরাইয়া নিম্নদৃষ্টে রহিলেন, রথ অদৃশ্য হইয়া গেল। লজ্জাশীলা সুভদ্রা দৃষ্টির সীমায় প্রিয়তমকে আর দেখিতে না পাইয়া পদতলে আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া রাজপথেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চতুরা সহচরীগণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পরস্পরে ডাকাডাকি ও হাসাহাসি

করিতে লাগিল। দেবী সুভদ্রা তাহাদিগের পরিহাসে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিতে করিতে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

"সাহাজী" পরমভক্ত। প্রতিদিন শত ব্রাহ্মণের পদধূলি তাঁহার মস্তকে পড়িলে তিনি পরলোকে পরিত্রাণ ও মুক্তিলাভ করিবেন আশায় নিজের এবং পত্নীর কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি দেবালয়ের বারাণ্ডায় খোদিত করাইয়াছিলেন। সোপান হইতে বারাণ্ডায় উঠিতেই সেই যুগল মূর্ত্তিশিরে পদস্পর্শ হয়। তাঁহাদিগের মস্তক অতিক্রম করিয়া কোন প্রকারেই যাওয়া যায় না, এমনি ভাবে তাহা খোদিত।

হায়! অদ্য এই পূজা পাইবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ কে? ভারতের অতীত যুগের গৌরবময় কীর্ত্তির সহিত সেই অরাধ্য ব্রাহ্মণবংশ লোপ পাইয়াছে। এখন কেবল ভাগীরথীর দুই কূলে জীবিত শব মাত্র বিদ্যমান। জীবনের চিহ্নহীন উচ্চমন ব্রাহ্মণবংশের হীনতা দর্শন করিয়াই ব্রাহ্মণ কবি হেমচন্দ্র বিষাদে গাইয়াছিলেন,—

"কি হবে রোদন করিলে এখন!
স্বাধীনতা ধন গিয়াছে যথন,
চোরে শিরোমণি করেছে হরণ
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে"

আমিও কবির বিলাপের সঙ্গে একতানে বলি;—

"নাহি কি সলিল হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক রাশি
তরঙ্গে, তরঙ্গে, অঙ্গ, বঙ্গ নাশি
এ ব্রাহ্মণ বংশ ডুবাও জলে।"

আগ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্র শ্রীরামভক্ত মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ বানর কুলের দর্শন পাওয়া যায়। ইহারা পালে পালে গৃহদ্বারে—সুবিধা হইলে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কতরূপে আপ্যায়িত করে। কখন ছাতা, কখন জুতো, কখন বা ঘটী বাটী আত্মসাৎ করিয়া গৃহস্থের সহিত বন্ধুতা করিতে চায়। এই অযাচিত বন্ধুগণ গৃহস্থদিগের জোর জবরদস্তিতে বশীভূত হইবার পাত্র নহে। এই "হাউস ট্রেস পাসে" ভারতীয় পিনালকোডের ৪৪৮ ধারা প্রয়োগ করিয়া কোন "সেণ্ট্রাল জেলে" ইহাদিগকে রাখিয়া দিলে ইহারা সংশোধিত হয় কি না বলা যায় না। মথুরা বৃন্দাবনে ডার্বিনের (Mr. Darwin) শুভাগমন হইলে মনুষ্য যে বানর বংশ সম্ভূত, একথা তিনি অনায়াসেই সঙ্গাইন ভাবে প্রমাণ করিয়া যাইতে পারিতেন। শুনিয়াছি, পণ্ডিতবরের আদি পিতামহের সহিত আকৃতিগত নিকটতর সাদৃশ্য ছিল। বৃন্দাবন মথুরার বানরগণের দৈনিক কার্য্য কলাপের বিষয় কোন পশুপ্রিয় দার্শনিক যদি এক খানি ইতিহাস লেখেন, তাহা হইলে এই "পুরুষ প্রধান" দিগের রহস্যময় চতুর বিজ্ঞতার বিবরণ সাধারণে কতক জানিতে পারে, নতুবা পশুত্ব ভাবুকতাহীন লেখকদিগের দ্বারা এ জাতির বুদ্ধির উদ্ধার সম্ভবে না।

বিগ্রহ দর্শন করিতে যাইবার পথে অসংখ্য ভিখারী দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়, এবং তাহাদিগকে কিছু না দিয়া এক পদ অগ্রসর হইবার সাধ্য নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা আবার নাচিয়া নাচিয়া ভিক্ষার্থে এই সকল গান করে;—

"ধুলা নয়, ধুলা নয়, গোপীর পদরেণু,
এই ধুলা মেখেছিল নন্দের বেটা কানু।"

"মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন,
শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।"

এ গীত শিশুকণ্ঠে সুললিত-শ্রুতিসুখকর বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পয়সায় না কুলাইলে গীতের পরিবর্ত্তে "লালাবাবুর সদাব্রতে" গিয়া দিনপাত কর। এবম্বিধ প্রিয় আশীর্ব্বাদে (?) পরিতৃপ্ত হইতে হয়, তীর্থ স্থানের এই সকল "জাত ভিখারী" অতিশয় বিরক্তিজনক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিয়া রাজপথের সম্মুখে দেবালয়ে যাইবার বিঘ্নস্বরূপ দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদিগকে দেখিয়া দয়া অনুকম্পায় পরিণত হয়। সরকার বাহাদুর অহিতকর কুলিআইন ইত্যাদি লইয়া চাকরদিগের সন্তোষার্থে মস্তিষ্ক বেশি মাত্রায় ব্যয় না করিয়া যদি এই সকল অকর্ম্মণ্য জাতির নিমিত্ত কোন কার্য্যালয় বা কারখানা,—বিলাতের গরিবের জন্য যেরূপ আছে, খুলিয়া দেন এবং আইন দ্বারা রাজপথে ভিক্ষা নিষেধিত হইয়া যায়, তাহাতে কত স্থায়ী উপকার হয়।

বেলা যখন দুই প্রহর, তখন দেবভোগের শাঁক ঘণ্টা কাঁসর নাদে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ও আবাল বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ভিখারীদল, কলরবে লালাবাবুর "সদাব্রতে" ও অন্যত্র ধাবিত হইল। আমরা সেই জনস্রোতভেদ করিয়া শূন্য বাসায় আসিলাম।

দিবা নিদ্রার ক্লান্তি দূর করিয়া সায়াহ্নে আবার আমরা বৃন্দাবন ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পথেই "বংশী বট" নামক জীর্ণ শীর্ণ একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ। গোপীনাথ ইহাতে নাকি বাঁশী রাখিতেন, তাহা "গোপেশ্বর" শিব। প্রবাদ এই, বৃন্দাবন গোপিনীগণ সহ নটবর মাধব একদা নৃত্য গীতে মত্ত, এমন সময় মহাদেব সেই নৃত্য গীতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ হইতে নারী রূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হন এবং সেই বিলাস বলে (Ball) যোগ দেন। কাশীশ্বর নৃত্য গীতে সুনিপুণ, তাঁহার সেই অপার্থিব নাচনে সব সখীগণ চমৎকৃত হইয়া মুখ চাহিতে লাগিল, তখন ভাবে ভোলা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছদ্মবেশে রমণীগণের সহিত যে নৃত্য করিয়াছিলেন, সে জন্য লজ্জানুভব করেন, কিন্তু উদারহৃদয় গোপিনীমোহন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া পার্ব্বতী নায়ককে গোপেশ্বর নাম দিয়া বৃন্দাবন-ধামে বাস করিতে অনুমতি দেন। এখানে সবই রাধাকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রহিয়াছে, কেবল এই "গোপেশ্বর মহাদেও" সেই একচেটিয়া রাজত্বে অত্যেকত্ব দূর করিয়াছেন। "ব্রহ্মকুণ্ড ও কালিয়াদহ" প্রভৃতি দর্শন করিয়া পরিশেষে আগ্রহ সহকারে "নিধুবন" নিকুঞ্জ বনাভিমুখে চলিলাম। "বসন্তের নিত্যবাস, সঙ্গীতের চিরোচ্ছ্বাস" সুখের পূর্ণ নিকেতন এই বন, বনভূমি নহে। নন্দন পারিজাত পরিমলময় কুসুমকুল প্রস্ফুটিত, লতা পত্রে পরিশোভিত এই কুঞ্জবন অমর বাঞ্ছিত দিব্যধাম। কত ফলপ্রদ বৃক্ষাবলী সাদরে সলজ্জ লতিকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মুগ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সকল তরুর শ্যামলপত্র মাঝে কলকণ্ঠ পিককুল কূজনে অদৃশ্যে সঙ্গীত-তরঙ্গ বিস্তার করিয়া মোহে আচ্ছন্ন করিতেছে। তাহারা এ সংসারের জীব নহে। শাপচ্যুত দেবশিশু মনুষ্য মনের সন্তাপ অপহরণ করিতে যেন ঐ নব পল্লবিত তরুশিরে ভর করিয়াছে। শোক জ্বালায় দুঃখী মানব যখন সেখানে যাইবে, তখন এই সুরশিশুগণ

স্বর্গের পবিত্র সমাচার সঙ্গীতে শুনাইয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে। উভয় কুঞ্জ ভিতরেই প্রস্তর গ্রথিত সিংহাসন রহিয়াছে। প্রতি নিশায় পুষ্পমালায় ও দীপাধারে ভক্ত-বৃন্দ তাহা সজ্জিত করিয়া রাধাকৃষ্ণের অদ্যাপি নিশীথ সমাগমের পরিচয় দেয়। "নিধুবন" ও নিকুঞ্জবন উভয়ের মধ্যেই কুণ্ড আছে। বনবিহারে একদা মাধব বিনোদিনী ক্লান্তভাবে প্রিয়তমের নিকট শীতল পানীয় চাহিয়াছিলেন। সেই অসময়ে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কোন উপায় না দেখিয়া মদনমোহন ললিতা ও বিশাখার করস্থিত বংশী দ্বারা কুণ্ড খনন করিয়া প্রণয়িনীর পিপাসা দূর করিয়াছিলেন। তাই এই বিহারভূমে "ললিতা" ও "নিধুবনে" বিশাখা কুণ্ড বিদ্যমান। দুই কুণ্ডই পাষাণ সোপান যুক্ত ও নীল সলিলে শোভা পূর্ণ।

কুঞ্জবনের প্রবেশ দ্বারে কপিকুল প্রহরী স্বরূপ বসিয়া থাকে, আহারীয় মিষ্টান্ন দক্ষিণা না দিলে তাহারা কখনও দ্বার ছাড়িয়া দেয় না। খাদ্য দ্রব্য দিবামাত্র কেমন আদরে কৃতজ্ঞতা জানাইতে দূরে দূরে সরিয়া যায়, কাহাকেও কিছু বলে না। দুইবনের দুই দল ও দলপতি আছে। কোন্‌টা কনজার্ভেটিব (Conservative) কোন্‌টা লিবারেল (Liberal) তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মাঝে মাঝে লোকে পরিহাসচ্ছলে তাহাদিগের "লড়াই" বাধাইয়া দেয় এবং যে দল জয়লাভ করে, তাহার বানরদিগকে দলপতিসহ ভোজন করায়।

আরতি না দেখিয়াই সন্ধ্যার ললিত মধুর সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে "সন্ন্যাসীর আখড়া" হইয়া আমরা সে দিনকার মত, কেন, যেন চিরদিনের তরে পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবনের নিকট বিষাদে সজল নেত্রে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীর" বাহিত, চির হাস্যময়ী প্রকৃতি রাজ্ঞীর নিবাস ছাড়িয়া আবার সংসারে আসিতে হৃদয়ের পরতে পরতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। বসন্তেই বর্ষা আসিল—এখন ভিক্ষা কেবল প্রভু তোমার পদতলে চিরনিদ্রা——

গৃহহীন পান্থ শালে
কাটে দিন গোলমালে
বিভবের শূন্য গরিমায়,
অশ্রুভরা হাসি মুখে
যন্ত্রণা অনল বুকে
ক্লান্ত নিতি মুক্তি ভাবনায়।

শ্রীমতী নীহারিকা দেবী।

সুখ।

যখন জানিতাম না আমি সুখী কি দুঃখী, তখন আমি সুখী ছিলাম। যখন জানিলাম আমি সুখী, তখনই বুঝিলাম আমি দুঃখী। সুখ অজ্ঞ, দুঃখ জ্ঞানী। জ্ঞানের উৎপত্তি দুঃখে, দর্শন বা বিজ্ঞান বিষাদের ইতিবৃত্ত।

যখন সুস্থ ছিলাম, তখন জানিতাম না

স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য কাহাকে বলে। তখন হাত পা শরীর ছিল কি না, জানিতাম না। ইচ্ছা হইত, লাফাইতাম, ছুটিতাম, হাতের সঙ্গে পায়ের সঙ্গে তখন পরামর্শের আবশ্যক হয় নাই।

সত্যযুগে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন উপনিষদ ছিল না। কারণ তাহারা তখন সুখী। তাহারা শরীর চিরিয়া হাড় গণিবার আবশ্যকতা বুঝে নাই। যে যত দুঃখী, সে তত জ্ঞানী। পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত শরীরের ভূগোল রচনা করেন, পূর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনের ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের দুঃখের পরাকাষ্ঠা। পশ্চিমেরা এখনও আমাদের অপেক্ষা সুখী, তাই আমাদের মত জ্ঞানী নহেন।

জ্ঞানে সুখ না অজ্ঞানে সুখ? যে সুখী সে কি জ্ঞানী? সে কি জানে যে সে সুখী?

এক দিন ছিল যখন দুজনে কত গল্প করিতাম, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গল্প করিতাম। যখন দুজনে কত খেলিতাম, কত বেড়াইতাম, চাঁদের আলোকে দুজনে দুজনাকে দেখিয়া হাসিতাম, চুলের রাশি ধরিয়া টানিতাম। তখন জানিতাম না যে, তোমাকে ভালবাসিতাম। কিন্তু তখনই তোমাকে প্রকৃত ভালবাসিতাম, তখনই কেবল মরিতে বলিলে মরিতে পারিতাম। কারণ তখন জানিতাম না যে, তোমাকে ভাল বাসিতাম। যে দিন জানিলাম, যে তোমাকে ভালবাসি, সে দিন অর্দ্ধেক ভালবাসা ফুরাইয়াছে। তাহার পর যে দিন তোমার কাছে সে কথা ফুটিলাম, সে দিন বার আনা শেষ হইয়াছে। তাই মুখে লালিমা, আধ আধ কথা, মাথা হেঁট, এই সকল পরের ঘরে ধার করিয়া সে বার আনা পুরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও কিছু ছিল, যে দিন সাত গাঁয়ের লোক এক করিয়া সবার সাক্ষাতে বলিয়াছিলাম "তোমা বই আর জানি না" সে দিন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, তখন ষোল কড়াই কাণা হইয়া গিয়াছিল। কেবল খাতিরে পড়িয়া সংসারের বন্ধুর ক্ষেত্রে গড়াগড়ি দিবার জন্য দুজনে ছড়া বাঁধিয়াছিলাম। কথাটা বড় কটু কিন্তু বড় সত্য। তবে ফুটিতে গেলেই কিছু পরিমাণে মিছা হইয়া যায়।

জ্ঞান অক্ষরে ফুটে, ভাব অক্ষরে ফুটে না। অক্ষরে যাহা ফুটে, সেটা পোষাক, শরীর নহে। ভাব ফুটে কিছু কিছু সুরে, সেও গোপনে। রবির ছায়ার চেয়ে কায়াটা অনেক ভাল। কবির বাক্য যাহা পড় সেটাত উদ্গার, যেটা পড়িতে পার না সেইটাই আসল কবিতা। সেটা কবির হৃদয়। গাছপালা বড় সুন্দর। লতা পাতা বড় সুন্দর, ফুল ফল বড় সুন্দর। নীলাকাশে শরৎশশী, নীল পত্রে শ্বেত কমল, নীলমণ্ডলে তারার মালা, বড় সুন্দর, বড় সুন্দর। কিন্তু তারাও কি কবির হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারে? তিনি যাহা পারিলেন না, তুমি তাহা পারিবে?

এই জন্যই ত ভাবুকেরা পাগল হয়। মনের ব্যথা বলিতে পারিলে কম কষ্ট হয়, মনটা খালি হয়। কিন্তু যার ব্যথা, সে কি ফুটতে পারে? সোণারবেণে ব্যথার আধলাটা বাজারে ফেলে দিয়া বিনিময়ে প্রাণটা পূরা করিতে পারে। কিন্তু যার ব্যথা—ব্যথার মত ব্যথা, সে কি তা ফুটতে পারে? তার ব্যথাও পবিত্র

দেবতা, আঁধারের আধারে সে তা লুকিয়া রাখে। শেষে পাগল হয়। তা না হলে কি গৌরাঙ্গ সাগরজলে ঝাঁপ দিতেন। তা না হলে কি রাধিকার কোকিল-কূজনে মুরলী ভ্রম হইত? ব্যথিত যাহা ফুটে তাহা প্রলাপ, তাহা ঠিক হয় না। কাকে মারতে কাকে মেরে বসে।

দুঃখের ব্যথা যখন ফোটা যায় না, তখন সুখের কথা কি ফোটা যায়? হরি হরি! সুখের যে কথাই নাই। সুখের অনুভাবকতা নাই। সাদা আলো কি দেখা যায়? যখন রঙ্গিন চস্‌মা দিয়া দেখ, তখনই সে সাদার ভিতর কি আছে তা বুঝিতে পার। দুঃখের ভিতর সুখের অনুভূতি। সুখে সুখের অনুভূতি নাই। দুঃখের ভিতর যখন সুখের অনুভূতি হয়, তখন সুখ অতীত হইয়াছে। পরের মুখে শোনা কথার সাক্ষ্য, গজভুক্ত কপিত্থবৎ।

সুখের সময় সুখের প্রতীতি করিলে মানবজীবনের বিচিত্রতা থাকিত না। গোলাপ সুন্দর হইলেও তোড়ায় দুটা পাতার বেড় দিতে হয়। সুখের সময় সুখের প্রতীতি থাকিলে মানুষের ঝগড়া ঘুচিত না। স্তনের মধুরতা তখন বুঝিলে কি মায়ের স্তন ছাড়িয়া চুষী ধরিতাম? সে অভয়কোল ছাড়িয়া কে ধীরে ধীরে পায় পায় উঠানে নামিত?

আর তুমি? সে সময় যদি জানিতাম তোমাকে ভালবাসি, তাহলে কি আজ এ অন্তর্জ্বালায় দিবানিশি, নিশি দিবা জ্বলিতে হইত? তাহলে কি যে কিছু গান গাই, তাহাতেই সেই এক সুর দেখা যাইত?

আসল যার মেলে না, তার ঝুটা বড় সস্তা। টাকায় এক সের হীরা ও এক হাজার মুক্তা বালাখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ভাবের ভণ্ডামী ষোল আনা। ভাবুক কয়টা মিলে? ভাব ফুটে না, কিন্তু ফুটন্তভাব—নামের ছাপ ও প্রিয়তম, বাঁকা দৃষ্টি ও নখ গোটা. ক্লণ ও পরচুল দোকান ভরা। রাধিকা একটী। যাকে দেখিলে শত পদ্ম ফুটে, তার মত দুর্ভাগ্য কে? আর তার মত দুঃখী কে যে আপনাকে সুখী বলিয়া পরিচয় দেয়? সুখ বোঝা যায় না, দুঃখই বোঝা যায়, যে আপনাকে সুখী বলিয়া বুঝে সে বুঝিল কি? অথচ কাঁদে লক্ষে একটী; হাসে লক্ষ জন। হাসি না কি ঝুটা, তাই এত সস্তা। এক দিন একটী বালকের দুইটী চিত্র দেখিয়াছিলাম, একটী হাসিতেছে আর একটী কাঁদিতেছে! তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন্‌টী সুন্দর? তুমি বলিয়াছিলে, যেটী কাঁদিতেছে।

সে হা করিয়া কান্না নহে, চীৎকার করিয়া কান্না নহে। যে রোদনে অঙ্গভঙ্গী গলাবাজী আছে, সে ঝুটা রোদন। তাতে গভীরতা নাই, পবিত্রতা নাই, মোহিনী শক্তি নাই। তা বুকে পুরিয়া রাখিবার জিনিস নহে, রাস্তায় ফেলিয়া দেখিবার জিনিস। আর এক দিন আর একটী শিশুর দুটী চিত্র দেখিয়াছিলাম। একটী জাগ্রত আর একটী সুষুপ্ত। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন্‌টী সুন্দর? তুমি বলিয়াছিলে, সুষুপ্তটী সুষুপ্তি বিষাদের পরিণতি, হাসি জাগ্রত বৃক্ষের ফুল। গভীরতা পবিত্রতা সম্মোহকতার ছবি সুষুপ্তি। হাসি ও জাগরণ বিকার বিল্পব ও প্রলাপ। প্রাণের আকুঞ্চন, জীবনের তুফান, সংসারের ঝটিকা। জ্ঞানী জাগ্রত, সুখী সুষুপ্ত। জ্ঞানীর শয্যা কণ্টকিত

তাই সে জাগ্রত। যখন বুকের উপর মাথাটী দিয়া পড়িয়া থাকিতাম, তখন চক্ষু চাহিত না, কে যেন নিমীলিত করিয়া দিত। সে নিদ্রায় স্বপ্ন ছিল না, জানিতাম না জাগিয়া থাকিতাম কি ঘুমাইতাম। নতুবা বলিতে পারিতাম, কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছিল!

এখন বয়স হইয়াছে, প্রবীণ হইয়াছি, তাই নিদ্রা পলায়ন করিয়াছে। দিবসে ও রাত্রিতে কত মুহূর্ত্ত, সব গণিয়া বলিতে পারি। এখন জ্যোতিষী হইবার সুবিধা হইয়াছে। দুঃখী ব্যক্তি এত জাগিয়া থাকে বলিয়া তাহার বিজ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা হয়। ছিলাম কবি, হইতেছি বৈজ্ঞানিক। যখন কবি ছিলাম তখন জানিতাম না, এখন জানিয়াছি। এখন বৈজ্ঞানিক হইতেছি, তাহা এখনই বুঝিতে পারি। সুখে সুখের প্রতীতি হয় না, কিন্তু দুঃখে দুঃখের প্রতীতি হয়।

নতুবা দুঃখমোচনে লোকের উদ্যম জন্মিবে কেন? রোগের সময় রোগী যদি রোগ না বুঝিত, তবে রোগের প্রতিকার হইত না, রোগের প্রাণান্ত ঘটিত। ভাবুকের উন্মত্ততা ও রোগীর রোগ প্রতিকার চেষ্টা উভয়েই সজীবতা আছে, কিন্তু একটীতে জ্ঞান নাই, আর একটীতে জ্ঞান আছে। একটী সুখ, অন্যটী দুঃখ! একটীতে উপভোগ, অন্যটীতে প্রতিকার। যে কারণে সুখের সময় সুখের প্রতীতি জন্মে না, ঠিক্ সেই কারণেই দুঃখের সময় দুঃখের প্রতীতি জন্মে।

বিজ্ঞান ও দর্শন চিকিৎসা শাস্ত্র, মানব জীবনের ব্যাধি পরিহারের সন্ধান। কোনটী পূর্ণ নহে, কোনটীতে আশা পূর্ণ হয় না। জ্ঞানের সূত্র দুঃখে; জন্ম,বৃদ্ধি, পরিণতি দুঃখে। সুখের বিজ্ঞান নাই। যাহার প্রতীতি নাই, তার পরীক্ষা, পরিদর্শন, ব্যবচ্ছেদ ও ব্যবস্থা নাই, তার আবার বিজ্ঞান কি করিয়া হইবে?

সুখের যখন প্রতীতি নাই, বিজ্ঞান নাই, পরের মুখে সুখের শোনা কথার যখন সাক্ষ্য লইতে হয়, তখন সুখ আছে; বা ছিল, বা হইবে, তাহার প্রমাণ কি?

প্রমাণ কিছুই নাই। আজীবন যে অন্ধকারে সূর্য্যের আলোক আছে, তার প্রমাণ কি? যখন সকলেই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, তখন সুস্থ লোক আছে, তাহার প্রমাণ কি? যখন সকলেই অন্ধ, তখন চক্ষুষ্মান লোক আছে, তাহার প্রমাণ কি? বস্তুতঃ কোনই প্রমাণ নাই। যা কিছু আছে, তোমার এই প্রতারণা পূর্ণ হাস্যে, তোমার এই গভীর নিরাশার কঠোরতম প্রশ্নে। সুখ পাইয়াছি এক দিন ইহা জানি, আর প্রমাণ নাই, সুখী হইব আর এক দিন ইহা বিশ্বাস করি, আর কোন প্রমাণ নাই। "We may be happy yet" প্রাণের উপর এ কথাটা লেখা আছে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

পরিণয়োপহার।

(কোন বন্ধুর বিবাহে প্রদত্ত।)

১

যে পবিত্র প্রেম পুষ্প পরিণয়-হার,
আজি পরিয়াছ গলে, দুই জনে কুতূহলে,
মানব জন্মের ইহা পুণ্য পুরস্কার!
জগতে ইহার কাছে, আর কি অমৃত আছে?
এ সুধা পায়নি দেব মথি পারাবার,
ওঠেনি সাগর জলে, এ কৌস্তুভ কোন কালে,
হেন পরিমলময় পারিজাত হার,
পরিলে অমর আজি যে মণি-মন্দার!

২

অমৃত ঔষধ হেন জীবনের আর,
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবনে, নাহি কিছু কোন স্থানে,
বিশল্যকরণী হেন জ্বালা যন্ত্রণার!
রোগ শোক দুঃখ ভরা,এত যে বিষাক্ত ধরা
ইহার (ই) পরশে বাঁচে সৃষ্টি বিধাতার!
যে প্রাণে এ পুণ্য স্রোত,হয় নাই প্রবাহিত
পবিত্র করেনি প্রাণ প্রণয়ে যাহার,
সে ত সাহারার মত, হা হা করে অবিরত,
এ জীবনে সে পিপাসা নহে পূরিবার,
ঢাল যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য পরাণে তাহার!

৩

সে জীবন শূন্যময়—শূন্য সে হৃদয়,
উদ্যম উৎসাহ হীন, আশাশূন্য চিরদিন
অন্তরে অনল জ্বলে সকল সময়,
তার নয়নের কাছে, সংসার পুড়িয়া আছে,
ছাই হ'য়ে—ভস্ম হ'য়ে গেছে সমুদয়!
সে জানেনা সুখ শান্তি,সে বোঝে সকলি ভ্রান্তি,
সে জানেনা দয়া মায়া স্নেহ কারে কয়!
জগতের নারীনর, সে ভাবে সকলি পর,
তাহার কেহই নয় সেও কারো নয়!
সে যেন আকাশ ছাড়া, জ্বলন্ত একটী তারা,
পরের অশুভ করে, নিজে ভস্ম হয়!

৪

অপ্রেম এমনি সখা মহা অকল্যাণ,
প্রেম মঙ্গলের মূল, উন্নতি—উত্থান!
প্রেম করে পরিপূর্ণ অপূর্ণ জীবন,
জগতের নরনারী, যমুনা জাহ্নবী বারি,
মিলাইয়া করে এক মহা প্রস্রবণ!
উদ্যম উৎসাহ আশা, দয়া মায়া ভালবাসা
বহে শত মুখে, গঙ্গা সাগরে যেমন!
হাসে তার তীরদেশে, সংসার সুন্দর বেশে
বিনোদ বসন্তে যথা বন উপবন!

৫

প্রেম নহে ভোগ বাঞ্ছা—বাসনা বিলাস,
প্রেমের প্রতিমা নারী, শত স্বর্গ পায় তারি,
পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্ম—সদা করে বাস!
সংসার করিয়া শূন্য, তারি কাছে যত পুণ্য
প্রীতির পবিত্র তীর্থ পাপ করে নাশ!
কোমল পবিত্র দৃষ্টি, প্রাণে করে সুধা বৃষ্টি
জাগায় হৃদয়ে সত্য আশা অভিলাষ,
প্রেম নহে ভোগ বাঞ্ছা বাসনা বিলাস!

৬

ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্যার প্রাণ,
সিদ্ধির সাধনা নারী, যাগ যজ্ঞ সব তারি,
তাহার সাহায্য বিনা মিলেনা নির্ব্বাণ!
হইয়ে সংসার ত্যাগী,তাই সে সতীর লাগি,—
তাই সে নারীর প্রেমে উন্মাদ ঈশান!
ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্যার প্রাণ!

৭

জননী ভগিনী নারী, নারী সমুদয়,
বিপদে বন্ধুর মত, উপদেশ দেয় কত,
শীতল ছায়াটী যেন বুক ঢেকে রয়!
যেন সে পরের তরে, জন্মিয়াছে এ সংসারে,
আপনার প্রাণ তার আপনার নয়,
জননী ভগিনী নারী, নারী সমুদয়!

৮

আজ সে মহিমাময়ী রমণীর সনে,
মিলিত হইলে সখা পবিত্র বন্ধনে!
শিখিও তাহার রীতি, সেই প্রেম সেই প্রীতি,
সেই দৃঢ় ধর্ম্মভাব শিখিও জীবনে,
শিখিও সে সরলতা, শ্রদ্ধা ভক্তি পবিত্রতা,
শিখিও সে স্নেহ দয়া দীন হীন জনে!
শিখিও শিবের মত, পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত,
পবিত্র সতীর সেই পূত আচরণে!
এমন রমণী লয়ে, ভোগ অভিলাষী হ'য়ে,
ভু'লনা পরম ধর্ম্ম সদা রে'খ মনে,
ভু'লনা ভু'লনা দোহে, সংসারের মায়ামোহে,
থাকে যেন স্থিরমন বিভুর চরণে।
রাখুন মঙ্গলময় সুখে দুই জনে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

খোকার মার প্রতি।

১

অধরের প্রান্তে হাসির আভাস,
নয়নের কোণে মধুর জ্যোতি,
হৃদয়ের মাঝে কুসুম-বিকাশ,
বদন-মণ্ডলে প্রীতির ভাতি,—

২

কি সাগর সেঁচি,—লভি কি রতন,
বল, ভাগ্যবতি, হরষ এত?
বিধি মিলাইলা কি অমূল্য ধন,
সফল করিয়া কঠোর ব্রত?

৩

বুঝেছি, বুঝেছি, পতি-সোহাগিনি,
আনন্দ-লহরী যাহার তরে;—
সাগরের প্রায় রত্ন-প্রসবিনী
হয়েছ করুণ দেবের বরে!

৪

সাগরের প্রায়?—অযথা তুলনা!
অতুলে তুলনা কভু কি সাজে?
সেঁচিলে জলধি মিলে কি বলনা,
যে ধন তোমার ক্রোড়ের মাঝে?

৫

চাঁদের কিরণে কুসুম-সুষমা
জড়িত হইয়া মাধুরী ধরি,
বিকাশি রূপের মোহন গরিমা
ঘুমায় তোমার কোলেতে মরি!

৬

কি দেখিছ, অয়ি মুগধ-মানসে,
আঁখির ভিতরে ঢালিয়া প্রাণ?
সুতমুখ পানে চাহিয়া অবশে,
লভিছ হরষ হারায়ে জ্ঞান!

৭

ক্ষরিছে গলিত মমতা উরসে,
ঝরিছে নয়নে আনন্দ-ব্যথা,
নাচিছে হিল্লোল হৃদয়ে, সরসে
বসন্ত-পবন-পরশে যথা।

৮

অধীরে কভু বা অস্ফুট আদরে
মমতা-উচ্ছ্বাসে চুমিছ কত
ললাটে, কপোলে, চিবুকে, অধরে,
চাপিয়া বক্ষেতে প্রাণের সুত।

৯

পুলক-নিশ্চল-লোচনে আবার
কি দেখিছ, সতি, শিশুর পানে ?
নিরখি সুন্দর বদন উহার
পতিমুখচ্ছবি পড়িল মনে ?

১০

সেই বিস্তারিত নয়ন-যুগল,
সেই সুকুঞ্চিত চিকুর-ভার,
তেমতি উন্নত ললাট উজ্জ্বল,
তেমতি অধর পীযুষ-সার,

১১

তেমতি ভুরুর সুবঙ্কিম টান,
সেই অবয়ব, গঠন-প্রথা,—
শিশু পিতা হতে লভিয়াছে প্রাণ,
প্রদীপ হইতে প্রদীপ যথা *।

১২

তনয়ের পানে চাহিয়া, যুবতি,
দেখিছ স্বপনে পতির মুখ,
জাগায়ে মানসে সুখ-পূর্ব্বস্মৃতি,
মৃদুল স্পন্দনে কাঁপায়ে বুক !

১৩

স্মরিছ আবেশে সে দিনের কথা
যবে শুধাইলে আদরে ধরি
পতিকণ্ঠ ভুজে, অংসোপরি মাথা
রাখিয়া, নয়নে অমিয় ঝরি,—

১৪

"বল দেখি, নাথ, কি হবে আমার
তনয় অথবা তনয়া, শুনি ?"
"তনয়া, প্রেয়সি !" পতির উত্তর ;
"তনয়, নিশ্চয়, বলিনু শুনি !"

১৫

হয়েছিল পণ সুস্থির সে দিন,
গণনায় শেষে হারিবে যেই,
বিজয়ীর পাশে স্বীকারিবে ঋণ,—
যাহা যত ইচ্ছা চাহিবে সেই।

১৬

পুত্র কোলে করি তাই, গরবিণি,
ভাবিতেছ বুঝি গভীর মনে,
পতি পরাজিত, তব কাছে ঋণী,—
আদায় করিবে পণ কেমনে।

১৭

দেখনা চাহিয়া তুলিয়ে বদন
খাতক দাঁড়ায়ে পালঙ্ক-ধারে,—
দেখিতেছিলে না জাগ্রতে স্বপন
যে আনন এবে তোমা নেহারে ?

১৮

চকিতে মিশিল নয়নে নয়ন,
চকিতে টুটিল মোহন হাসি,
চকিতে ফুটিল মধুর বচন,—
"উষাদেবী কোলে কিরণ-রাশি।"

১৯

"কথাতে কি, নাথ, শোধা যায় পণ ?
সেই দিবসের ভুলেছ কথা ?"
"কি দিব, প্রেয়সি, কি আছে আপন,
ভিখারীরে ছলি দিওনা ব্যথা !

২০

"কি রেখেছ, প্রিয়ে, কি দিব তোমায়,
দিয়াছি পরাণ, দিয়াছি মন,
দিয়াছি দেয় যা ছিল সমুদায়,
দিয়াছি অমূল্য প্রণয় ধন !"

২১

"কারাগার তবে !" বলিয়া রমণী
পতি বামেতর বান্ধিল করে,
(বিদ্যুৎ-চমকে নাচিল ধমনী,)
চুমিল আদরে অধর-পরে।

২২

"দেখ, নাথ, দেখ, সুন্দর কেমন
খোকাটি আমার কোলেতে শুয়ে !"—
নিশ্বাসে নিশ্বাসে মিশায়ে দুজন
চুমিল উভয়ে শিশুরে নুয়ে।

শ্রীবরদা চরণ মিত্র।

---

* "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"—ইতি রঘুবংশম্।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা।

(নবম প্রস্তাব।)

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার—একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইঁহার পিতা শ্রীনাথ আচার্য্য-চূড়ামণি দায়ভাগের একখানি টীকা রচনা করেন বলিয়া ন্যায়ালঙ্কার স্বপ্রণীত দায়-ভাগটীকায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার জীমূতবাহন প্রণীত বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র-প্রচলিত সুপ্রসিদ্ধ দায়ভাগের দায়-ভাগটীকা ও দায়ভাগ-সিদ্ধান্তকুমুদচন্দ্রিকা নামে দুই খানি টীকা রচনা করেন।

আলোচ্য তাতনির্ম্মিতনিবন্ধমারাধ্যবিশ্বেশ্বরং।
আচার্য্যাচার্য্যসূনুতে বিবৃতিমিমাং দায়ভাগস্য।

রাজসাহী জেলার বরিয়া গ্রামবাসী মধুসূদন শিরোমণির নিকট যে দায়ভাগ-কুমুদচন্দ্রিকা আছে, তাহা ১৬২৮ শকে লিখিত হয়। মহাকবি কালিদাসের রঘু-বংশের বিদ্বন্মোদিনী নাম্নী টীকা এবং অভি-জ্ঞান শকুন্তলা নাটকের শকুন্তলাবিবৃতিও বোধ হয় এই রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার বির-চিত।*

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর তান্ত্রিক দীক্ষাহোমাদি বিষয়ে তন্ত্র-প্রমোদন ও তাঁহার ষষ্ঠপুত্র রঘুমণি আগম-সার নামে তন্ত্রসংগ্রহ রচনা করেন।

---

* রঘুবংশের আরও পাঁচখানি টীকা আছে। (১) গোপীনাথ আচার্য্য কবিরাজকৃত কবি-কান্তা; (২) ভগীরথ পণ্ডিত আবসথ্যির জগচ্চন্দ্র-চন্দ্রিকা, (৩) বৃহস্পতি মিশ্র রচিত রঘুবংশবিবেক, (৪) ভবদেব মিশ্র প্রণীত সুবোধিনী; (৫) কৃষ্ণপতির অন্বয়ালাপিকা। গোপীনাথ বোধ হয় বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করেন।

কবিরাজ গোপীনাথ * * * রঘুবংশকাব্যস্য।
রঞ্জিতরসভাশেষং কবিকান্তা রচ্যতে টীকা॥

শান্তিপুরের পণ্ডিত কালিদাস বিদ্যাবাগী-শের নিকট ১৫৯৯ শকের ৩রা শ্রাবণ সোম-বার কৃষ্ণশর্ম্মা কর্ত্তৃক লিখিত একখানি হস্ত-লিখিত পুস্তক আছে।

নব-নব-শর-চন্দ্রে টিপ্পনী বৈ রঘোস্ত
সমলিখদিতি শাকে সম্মিতে সৌম্যবারে।
শশধর পরিপূর্ণে শ্রাবণস্য তৃতীয়ে
মিহির——————কৃষ্ণশর্ম্মা॥

দ্বিতীয় টীকাকার ভগীরথের পিতার নাম শ্রীহর্ষদেব। ইনি বলভদ্র পণ্ডিতের বংশধর ও কূর্ম্মাচলের রাজা জগচ্চন্দ্রের কুলপুরোহিত ছিলেন। তদনুসারে টীকার জগচ্চন্দ্রিকা নাম-করণ হয়। এই কূর্ম্মদেশ কি উড়িষ্যা না তৈলঙ্গ দেশ, বলিতে পারি না।

অপর তিন টীকাকার মিথিলাবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বৃহস্পতি মিশ্র গোবিন্দ মিশ্রের ঔরসে ও মথায়ী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রন্থকারের পত্নীর নাম নিবৃত্তি। তিনি গৌড়াধিপের সভাসদ ছিলেন।

বিদ্বৎসভাসু বিনয়ী প্রণয়ী গণেষু
গৌড়াধিপাদুচিত প্রচুর প্রতিষ্ঠঃ॥

চতুর্থ টীকাকার ভবদেব মিশ্র গ্রন্থশেষে লিখি-য়াছেন——

সর্ব্বাগম পরার্থজ্ঞঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
ভবদেব ব্যধাৎ রম্যাং রঘুবংশ সুবোধিনীং॥

পঞ্চম টীকাকার কৃষ্ণপতি মিথিলার সরু-য়াঢ়ী বংশোদ্ভব ছিলেন।

সন্তীহ যদ্যপি বিশিষ্ট জনপ্রণীত-
টিকা রঘুপ্রভবকাব্যভবাস্তথাপি।
স্বস্বান্তমোদনকরান্বয়লাপিকেয়ং
সম্পাতি কৃষ্ণপতিনা কৃতিনা প্রচক্রে॥

রত্নগর্ভ সার্ব্বভৌম পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান স্বর্ণগ্রামে (সোণার গাঁয়) ছিল। তিনি শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকা ও ক্রমচন্দ্রিকা নামে তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

গৌড়শ্রীরত্নগর্ভাখ্যসার্ব্বভৌম-বিপশ্চিতা।
বংশ্যানাং হিতমুদ্দিশ্য কৃতা শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা।

বেদবেদান্ত, আগম ও তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ পূর্ণানন্দ পরমহংস এক জন সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। প্রথিত আছে, তিনি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ও অনুষ্ঠান বলে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তৎপ্রণীত ষট্‌চক্রভেদ, ককারাদিশক্ক্রমে কালীকাদিসহস্রনামস্তুতিরত্ন, সপ্তাধ্যায়াত্মক শাক্তক্রমতন্ত্র, রামকেশ্বর তন্ত্র, শ্যামারহস্য, তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিনী, মুক্তিবিষয়ক তত্ত্বচিন্তামণি নামক বৈদান্তিক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দের শিষ্য ছিলেন। ১৪৯৯ শকে তত্ত্বচিন্তামণি রচিত হয়।

পূর্ণানন্দেন গিরিণা কৃতং শ্রীপতিবাসরে।
ইষে কালাঙ্কবেদেন্দু-শাকে মঙ্গলবাসরে ॥

চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বংসপুর গ্রাম নিবাসী রামবল্লভ শর্ম্মা পূর্ণানন্দ গিরি প্রণীত ষট্‌চক্রভেদের পূর্ণানন্দচক্রনিরূপণ, রামনাথ সিদ্ধান্ত ষট্‌চক্রদীপিকা, বঙ্গদেশীয় শঙ্করাচার্য্য নামা জনৈক তন্ত্রবিৎ পণ্ডিত ষট্‌চক্রভেদ টিপ্পনী, এবং বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ষট্‌চক্রবিবৃতি রচনা করেন। শঙ্কর রামদেবের পুত্র এবং নারায়ণের পৌত্র ছিলেন। তিনি সিদ্ধবিদ্যাদীপিকা ও তারারহস্যবৃত্তিকা নাম্নী আরও দুই খানি তন্ত্রগ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। ষট্‌চক্রভেদের দ্বিতীয় টীকাকার রামনাথ এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

শ্রীরামনাথসিদ্ধান্তরচিতা তত্ত্বদর্শিনী।
সতাং সন্তোষমাধত্তাং টীকা ষট্‌চক্রদীপিকা ॥

শ্যামাকল্পলতা নামে তন্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থ একাদশ স্তবকে রামচরণ নামা জনৈক তান্ত্রিক পণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। ভবানী প্রসাদ সারচিন্তামণি নামে তন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। নাম দৃষ্টে উভয়কেই বঙ্গদেশবাসী বলিয়া বোধ হয়। ১৭৫৪ শকের লিখিত সারচিন্তামণি নামক পুস্তক কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্বর্গীয় পিতা হরকুমার ঠাকুর

পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় স্বরচিত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের ৩২৮ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ ভিন্ন দিনকর, চরিত্রবর্দ্ধন, বিস্তরকর, কৃষ্ণভট্ট ও মল্লিকনাথকে রঘুবংশের টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিনকরের টীকা ১৪৪১ সংবতে (১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয়। তাঁহার মাতার নাম কমলা।

বর্ষেঽস্মিন্ বিক্রমার্কে শশিযুগধৃতি শ্চিহ্নিতে সূক্তিমুক্তাং
টীকামেতাং সুবোধাং ব্যতনুত কমলা কুক্ষিজন্মা দিনেশঃ ॥

চরিত্রবর্দ্ধন দিনকরের পূর্ব্বতন লোক। বোম্বে নগরীর সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত বলেন যে, দিনকর অনেক স্থলে চরিত্র বর্দ্ধনের গ্রন্থের অনুকরণ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, চরিত্রবর্দ্ধন অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন।

রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারের বিবৃতি ভিন্ন অভিজ্ঞান শকুন্তলের রাঘবভট্টরচিত এক খানি টীকা এবং নীলকণ্ঠ দীক্ষিতের অর্থদ্যোতনিকা বিদ্যমান আছে।

মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতের সবিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দক্ষিণাকালিকার সংক্ষেপ পূজা প্রয়োগ প্রণয়ন করেন। *

তন্ত্রবিষয়ক জ্ঞানানন্দতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ তন্ত্রশিরোমণি প্রণীত। হরগোবিন্দ তন্ত্রবাগীশ দক্ষিণাকল্প নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহিম্নস্তব নামে সুপ্রসিদ্ধ শিবস্তোত্রের বৈষ্ণবী নামক বিষ্ণুবিষয়িণী ব্যাখ্যাও এই হরগোবিন্দ বিরচিত।

বর্ণভৈরব নামে একখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি ও অকারাদি বর্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার রচয়িতা রামগোপাল পঞ্চানন। তাঁহার পিতার নাম রামনাথ, পিতামহের নাম নারায়ন। বিদ্যাপতি, যোগীশ, কবিরাজ মিশ্র নারায়ণের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ।

বিখ্যাতকবিরাজমিশ্রধরণীগীর্ব্বাণ-বাচস্পতি
র্যোগীশ স্তনুজস্তদীয়গুণযুক্ ষট্তর্কবিদ্যাপতিঃ।
আচার্য্যো জনিস্তৎস্তুতঃ শ্রুতিগুরুলক্ষণ্যাদি নারায়ণ
স্তদ্ধীরাত্মজরামনাথতনয়স্যৈষা কৃতিঃরাজতে।।

শ্রীপতির পুত্র রামকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি নামে ভগবতীর এক খানি স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করেন। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য আগমচন্দ্রিকা নামক তন্ত্রসংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করেন। আগমচন্দ্রিকার প্রারম্ভে রামকৃষ্ণ লিখিয়াছেন—

প্রণম্য গুরুপাদাব্জং মুনিবেদনৃপে শকে।
শ্রীরামকৃষ্ণ সংক্ষিপ্য তশেত্যাগমচন্দ্রিকা।।

তিনি প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। তৎপ্রণীত বহুতর গ্রন্থ পণ্ডিতকুলতিলক শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের গবেষণায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি 'কৌমুদী' নামে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে মন্ত্রকৌমুদী, অধিকরণকৌমুদী, আগমকৌমুদী, ভাগবত কৌমুদী, সঙ্কল্প কৌমুদী, ব্রতোদ্যাপন কৌমুদী, প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী ও স্মৃতিকৌমুদী পাওয়া গিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তকৌমুদী গৌড়ীয় স্মার্ত্তচূড়ামণি শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টিপ্পনী রূপে লিখিত। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তসংগ্রহকার হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির অন্তর্গত ব্রতখণ্ড অবলম্বন পুরঃসর ব্রতোদ্যাপনকৌমুদী বিরচিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ভিন্ন তিনি ব্যবহারদর্পণ, বিরোধভঞ্জনী নামক মহাভারতার্থ প্রকাশিনী টীকা, আখ্যাতবাদ টিপ্পনী ও শাব্দবোধ প্রক্রিয়া নামে দুই খানি বাদার্থ গ্রন্থ, মম্মটভট্ট কৃত কাব্যপ্রকাশ নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থের কাব্যপ্রকাশ ভাবার্থ নাম্নী টীকা, ভারতীতীর্থ রচিত পঞ্চভূতবিবেক নামক বৈদান্তিক গ্রন্থের দীপিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন বলিয়া অনুমিত হয়। ১৫৭৮ শকাব্দে লিখিত মহাভারতার্থ প্রকাশিনী, এবং ১৬৪৮ শকে লিখিত ব্যবহারদর্পণ পাওয়া গিয়াছে।

যাদবেন্দ্র বিদ্যালঙ্কার শ্যামারত্ন নামে তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে দশমহাবিদ্যার যথাবিহিত পূজাদি নিরূপিত হইয়াছে।

* স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত রাজোপাধিভূষিত পুত্রের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতানুরাগী ছিলেন। তিনিই বোধ হয় মূলাযোড়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত টোল সংস্থাপন করেন। প্রতি বৎসর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে M. A. সংস্কৃতে পরীক্ষা প্রদানার্থীগণের জন্য বিশ টাকার একটী মাসিক বৃত্তি 'হরকুমারবৃত্তি' নামে রাজা যতীন্দ্রমোহন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত মেঘদূতের টীকা প্রণয়নে অনেকানেক পণ্ডিত স্ব স্ব পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। হরগোবিন্দ বাচস্পতি, রমানাথ তর্কালঙ্কার, ভরত সেন মল্লিক, সনাতন গোস্বামী, শাশ্বত ভগীরথ মিশ্র, বিশ্বনাথ মিশ্র, কল্যাণ মল্ল * ও মল্লিনাথ—ইঁহারা প্রত্যেকেই মেঘদূতের এক এক খানি টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধান্তপঞ্চানন উপাধিধারী বিক্রমপুরের জনৈক পণ্ডিত বাক্যতত্ত্ব নামে এক খানি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের রচিত স্মার্ত্তাচার্য্য শূলপাণি প্রণীত শ্রাদ্ধবিবেকের বিবৃতি নাম্নী টীকা, কৃত্যপল্লব দীপিকা (শান্তিকল্পপ্রদীপ) ও তন্ত্ররত্ন নামে দুইখানি তন্ত্রশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ বিরচিত হয়। ১৫২১ সংবতের আষাঢ় মাসে লিখিত একখানি কৃত্যপল্লবদীপিকা বিদ্যমান আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যেন ধীমতা।
ক্রিয়তে বিদুষাং প্রীত্যৈ কৃত্যপল্লবদীপিকা॥

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের দায়াধিকার সম্বন্ধীয় দায়ক্রমসংগ্রহ নামক সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থ জীমূতবাহনের দায়ভাগ অবলম্বনে বিরচিত। প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বঙ্গদেশে ইহা দায়ভাগের নিম্নতর আসন অধিকার করিয়া আছে। সাহিত্যবিচার নামক নৈয়ায়িক গ্রন্থ এই শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের প্রণীত বলিয়া অনুমিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম নবদ্বীপবাসী ছিলেন। নবদ্বীপের রাজা রামজীবনের মনোরঞ্জনার্থ তিনি ১৬৩৩ শকে কৃষ্ণপদামৃত ও ১৬৪১ শকে পদাঙ্কদূত রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থেই কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের নিকট এই উভয় গ্রন্থই সমাদরের যোগ্য।

শাকে নায়কবেদষোড়শ-মিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মা স্মরণ্।
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতবচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুত রামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী নামক জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত রাশিলগ্নাদি বিষয়ে জ্যোতিঃসূত্র প্রণয়ন করেন। ইঁহার গুরুর নাম মার্ত্তণ্ড বলিয়া বোধ হয়।

নত্বা শ্রীগুরুমার্ত্তণ্ডং দুর্ব্বোধধ্বান্তনাশনং।
ক্রিয়তে জ্যোতিষাং সূত্রং শ্রীকৃষ্ণচক্রবর্ত্তিনা॥

শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মঞ্জুভাষিণী নামে শঙ্করাচার্য্যের রচিত আনন্দলহরী নামক শিবস্তোত্রের টীকা* প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম বল্লভাচার্য্য।

---

* ভগীরথ মিশ্রের টীকার নাম তত্ত্বদীপিকা, শাশ্বতের টীকার নাম ললিতা, কল্যাণমল্লের টীকার নাম মালতী, বিশ্বনাথ মিশ্রের টীকার নাম মেঘদূতার্থমুক্তাবলী। পণ্ডিত কুলতিলক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মেঘদূতের পাঠবিবেকে এই সকল টীকাকার হইতে নানা স্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

* আনন্দলহরীর আরো পাঁচ খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে (১) নরসিংহ কৃত টীকা, (২) গঙ্গাহরির দীপিকা, (৩) কৈবল্যাশ্রম যতীর সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী, (৪) গোপীরমণ ন্যায়পঞ্চানন প্রণীত টীকা, এবং (৫) গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম রচিত টীকা। গৌরীকান্ত সুকবি ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আরো বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সুধীরিমাং।
আনন্দলহরীটীকাং তনোতি বিদুষাং মুদে॥
এই গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম প্রণীত প্রসিদ্ধ

শ্রীবল্লভাচার্য্য পুত্রেণ শ্রীলশ্রীকৃষ্ণশর্ম্মণা।
আনন্দলহরীব্যাখ্যা যথাশক্তি বিতন্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়বাগীশ গোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র। তিনি জানকীনাথ তর্কচূড়ামণি বিরচিত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক নৈয়ায়িক গ্রন্থের ভাবদীপিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন।*

প্রণম্য শিবয়োঃ পাদৌ ধীমতা কৃষ্ণশর্ম্মণা।
সিদ্ধান্তমঞ্জরীব্যাখ্যা ক্রিয়তে ভাবদীপিকা ॥

কৃষ্ণভট্ট আড়ে প্রণীত কাশিকা বা গাদাধরী বিবৃতি, নির্ণয়সিন্ধুর ভাষ্য, মঞ্জুষা বা জগদীশতোষিণী, শক্তিবাদবিবরণ, আখ্যাতবাদ টিপ্পনী, পদার্থচন্দ্রিকাবিলাস বিদ্যমান আছে বলিয়া সংস্কৃতবিৎ ডাক্তার হল্ সাহেব নির্দ্দেশ করেন। রঘুনাথ শিরোমণির আখ্যাতবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার টিপ্পনী রচিত হয়। শিরোমণির তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি অবলম্বনে জগদীশ তর্কালঙ্কার যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহার টীকারূপে কৃষ্ণভট্ট মঞ্জুষা লিপিবদ্ধ করেন। গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশের দীধিতি-ভাষ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কাশিকা, গদাধরের শক্তিবাদ বা শক্তিবিচারের টীকারূপে শক্তিবাদ-বিবরণ (শক্তিবাদার্থদীপিকা) বিরচিত হয়। শিবাদিত্য মিশ্রের সপ্তপদার্থনিরূপণ নামক বৈশেষিকদর্শন অবলম্বনে শারঙ্গধর পদার্থচন্দ্রিকা নামে তাহার ভাষ্য রচনা করেন। কৃষ্ণভট্টের পদার্থচন্দ্রিকাবিলাস সেই পদার্থচন্দ্রিকার ভাষ্যরূপে লিখিত।

কৃষ্ণদাস নামে নৈয়ায়িক নানার্থবাদটিপ্পনী রঘুনাথ শিরোমণির নানার্থবাদদীধিতি অবলম্বনে রচনা করেন। গদাধর ন্যায়সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ও জনৈক অজ্ঞাতনামা নৈয়ায়িক বিরচিত নানার্থবাদটিপ্পনী বিদ্যমান আছে।†

কৃষ্ণ ধূর্জ্জটী দীক্ষিত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় রচনা করেন। ইহা বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার ও কাত্যায়নপ্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যাতা অন্নভট্টের তর্কসংগ্রহের ভাষ্য।‡

ইতিপূর্ব্বে পঞ্চম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক অদ্বিতীয় তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি তন্ত্রসার ও শ্রীতত্ত্ববোধিনী নামে দুই খানি তন্ত্র গ্রন্থ

মৈথিল ন্যায়াচার্য্য কেশব মিশ্রের তর্কপরিভাষার ভাবার্থদীপিকা নামে টীকা ডাক্তর হল্ সাহেব প্রাপ্ত হন।

* ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর (১) ন্যায়দীপিকা নাম্নী টীকা শ্রীকণ্ঠ দীক্ষিত ন্যায়বাগীশ রচিত। একতির যাদব ব্যাসের (২) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার, এবং (৩) লৌগাক্ষি ভাস্করের ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীপ্রকাশ বিদ্যমান আছে।

† জগন্নাথ পণ্ডিতের নানার্থবাদবিবেক, জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের নানার্থবাদবিবৃতি নামে নানার্থবাদের আরও দুইখানি টীকা আছে।

‡ তর্কসংগ্রহ কলিকাতায় পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ও বারাণসীতে ডাক্তর বেলেণ্টাইন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সুপ্রসিদ্ধ বৈশেষিক দর্শনগ্রন্থের বহুতর টীকা বিদ্যমান আছে। (১) অন্নভট্ট প্রণীত তর্কদীপিকা ও শ্রীনিবাস ভট্টরচিত তর্কদীপিকার সুরতকল্পতরু নামক টীকা, (২) নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর দীপিকাপ্রকাশ ও রামভদ্র ভট্টরচিত তট্টীকা, (৩) মুকুন্দভট্ট কৃত তর্কসংগ্রহচন্দ্রিকা, (৪) চন্দ্ররাজ সিংহের পদকৃত্য, (৫) বৃন্দাবনবাসী গোবর্দ্ধনাচার্য্য বিরচিত ন্যায়ার্থলঘুবোধিনী, (৬) পট্টাভিরাম শাস্ত্রী প্রণীত নিরুক্তি, (৭) মেরুশাস্ত্রীর তর্কসংগ্রহোপন্যাস, (৮) গোবর্দ্ধন মিশ্রকৃত ন্যায়বোধিনী, এবং (৯) তর্কসংগ্রহতত্ত্বপ্রকাশ ডাক্তার হল সাহেব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রচনা করেন। তন্ত্রসার শাক্ত বৈষ্ণবাদি নানা দেব দেবীর উপাসকগণের পরম পূজনীয় ও বহুমানিত গ্রন্থ। কৃষ্ণানন্দ বহুবিধ তন্ত্র হইতে এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। ইহাতে তিনটী বিস্তীর্ণ পরিচ্ছেদ আছে। গুরুতা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তন্ত্রসার অনুসারে স্ব স্ব শিষ্যবর্গকে নানা দেবতার মন্ত্রপূজাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট তন্ত্রসারই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন হইয়াও গুরুতাব্যবসায়ীগণ বর্ত্তমান সময়েও শিষ্যবর্গের নিকট দেবতার ন্যায় সম্মানিত ও পরিপূজিত হইয়া থাকেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী ও অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন পূর্ব্বপুরুষগণের বংশধর বলিয়াই শিষ্যবর্গের নিকট তাঁহাদের এত আদর ও সম্মান। বর্ত্তমান সময়ে গুরুগণ* শিষ্যবর্গকে উপদেশ ও ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের পরিবর্ত্তে তাহাদের নিকট হইতে রাশি রাশি অর্থ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব অর্থগৃধ্নুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মূল তন্ত্রগুলির অধ্যয়ন ও আলোচনা বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারই মূলতন্ত্রসমূহের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই তন্ত্রসারই বা কয়জন গুরুতাব্যবসায়ী সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেন? মাণিকগঞ্জের বাবু রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ও কলিকাতার বটতলার সুপ্রসিদ্ধ বেনীমাধব দে কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অক্ষরে তন্ত্রসার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বাবু রসিকমোহন তন্ত্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক তন্ত্র, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল ও পুরাণাদি প্রকাশ করিয়া মৃতপ্রায় সংস্কৃতসাহিত্যের পুনরুজ্জীবন সাধন করিতেছেন।

কৃষ্ণানন্দ বেদবিদ্যালঙ্কার বৈষ্ণবদিগের অনুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ ও দেবার্চ্চনাদি সম্বন্ধে বৈদিকসর্ব্বস্ব নামে স্বল্পাবয়ব একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

হয়শীর্ষাদিকং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণানন্দশর্ম্মণা।
সর্ব্বস্বং বৈদিকানান্তু ক্রিয়তে ধীরসম্মতং ॥

কৃষ্ণকান্ত ন্যায়রত্ন—ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর ন্যায়রত্নাবলীর 'ন্যায়রত্নপ্রকাশিকা' নামে টীকা রচনা করেন। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তমতের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক 'দশশ্লোকী' সংক্ষেপে প্রণয়ন করেন। ব্রহ্মানন্দের গ্রন্থ দশশ্লোকেরই ভাষ্যরূপে লিখিত।

ন্যায়রত্নাবলীং টীকাং তন্নুং নত্বা চ নীলিকাং।
তনোতি শ্রীকৃষ্ণকান্তো ন্যায়রত্নপ্রকাশিকাং ॥

কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ—"ন্যায় রত্নাবলী" নামক পুস্তকে ন্যায়শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করেন।

নব্যপ্রাচীনতার্কিক সর্ব্বার্থাধীয়ান-ধীমতা।
তন্যতে কৃষ্ণকান্তেন ন্যায়রত্নাবলী মতা ॥

কৃষ্ণদত্ত—গদ্যপদ্যে শাস্ত্রসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থে বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে শাস্ত্রবিষয়ক প্রামাণিক বচনাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

* কিরূপ লোক গুরু হওয়ার অধিকারী তাহা বিশ্বসারতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে নির্দ্দিষ্ট আছে।

সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ সাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥

যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরু অনুসন্ধান করিলে কয়জন মিলে, জানি না। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর সংখ্যাই অধিক হইবে।

আধায় হৃদি বিশ্বেশং বিশ্বেষাং হিতসাধনং।
ক্রিয়তে কৃষ্ণদত্তেন সর্ব্বশাস্ত্রস্য সংগ্রহঃ ॥

ভরতসেন মল্লিক—প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইল হুগলী জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বৈদ্যকুলে ভরত-মল্লিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ সেন। হরিহর নামে এক জন প্রসিদ্ধ বৈদ্য তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন। তিনি একজন অতি প্রসিদ্ধ টীকাকার ও গ্রন্থকার। ভরতমল্লিক সুখ-লেখন ও কারকোল্লাস নামে ব্যাকরণ সম্পর্কীয় পুস্তক, দ্বিরূপকোষ নামে অভিধান, লিঙ্গাদিসংগ্রহ নামক সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষের টীকা *, বৈদ্য-কুলতত্ব নামে বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণের বংশাবলীর ইতিহাস, দেশ-

কৌমুদী নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাণিনি ব্যাকরণ প্রণেতা ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র এবং রামাশ্রমের শিষ্য। তিনি রায় মুকুটমণির পরবর্ত্তী টীকাকার। স্থানে স্থানে রায় মুকুটের ভ্রম ভাজুদী কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।

বল্লবীবল্লভং নত্বা গিরং ভট্টোজিদীক্ষিতং।
সুধাখ্যামমরটীকাং মুনিত্রয়মতানুগাং ॥

রায় মুকুটমণি ১৩৫২ শকে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ষোড়শ জন কোষকার ও অমরের টীকা-কারের গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বরচিত উৎকৃষ্ট অমরকোষের টীকা প্রণয়ন করেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অনেকানেক বৈয়াকরণ ও কোষকারের মত তাঁহার পদচন্দ্রিকা নাম্নী টীকার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। তিনি ক্ষীরস্বামী, কোঙ্কট, ভোজ-রাজ, দ্রাবিড়, সুভূতি, হড্ডচন্দ্র, কলিঙ্গ, সর্ব্বধর, রাজদেব, গোবর্দ্ধন, ব্যাখ্যামৃত, টীকাসর্ব্বস্ব, মাধবী, মধুমাধবী, সর্ব্বানন্দ ও অভিনন্দের অমরকোষের তৎপূর্ব্বতন টীকা-কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রায়-মুকুট মেদিনী ও বিশ্বপ্রকাশ প্রভৃতি অভি-ধানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কৃত শব্দব্যুৎপত্তি স্থানে স্থানে ভ্রমাত্মক বলিয়া অধ্যাপক উইলসন (Professor H. H. Wilson.) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রায়মুকুট মহতাপীয় কবি চক্রবর্ত্তী রাজপণ্ডিত বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

স্বয়ংপ্রকাশতীর্থের শিষ্য মহাদেবের প্রণীত টীকার নাম বুধমনোহরা। ১৮০২ সংবতের লিখিত একখানি পুস্তক কলিকাতা এসিয়া-টিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে।

১৯১২ অনুষ্টুভ শ্লোকে পদ্মনাভ দত্ত ভূরিপ্রয়োগ নামে অমরকোষের ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট রচনা করেন। অভিধানতন্ত্র নামে অমরকোষের পরিশিষ্ট ২০৭২ শ্লোকে ও তিন কাণ্ডে জটাধর আচার্য্য কর্ত্তৃক বির-চিত। জটাধরের পিতার নাম রঘুপতি ও

* সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের যত্নে ও ব্যয়ে ১৭৭৩ শকে বহুবিধ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সুবিস্তীর্ণ শব্দকল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধানে অমরকোষের নিম্নলিখিত টীকাকারগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সুভূতি, হড্ডচন্দ্র, কলিঙ্গ, কোঙ্কট, দ্রাবিড়, সর্ব্বধর, ক্ষীরস্বামী, রাজদেব, গোবর্দ্ধন, মাধবী, সর্ব্বানন্দ, অভিনন্দ, অরুণ, মল্লিনাথ, নীলকণ্ঠ, রায় মুকুটমণি, ভগীরথ, জয়াদিত্য, কোলাহলাচার্য্য, শবর, স্বামী, নয়নানন্দ, বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরাম তর্কবাগীশ, রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী, ভানুজী দীক্ষিতের ব্যাখ্যা সুধা, অচ্যুত উপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা প্রদীপ, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার কৃত সারসুন্দরী, নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পদার্থ-কৌমুদী, রমানাথ বিদ্যাবাচস্পতির ত্রিকাণ্ড-বিবেক, ভরত মল্লিকের মুগ্ধবোধ সম্মতা টীকা, ব্যাখ্যামৃত, সন্দেহভঞ্জিকা, টীকা সর্ব্বস্ব।

ভানুজী দীক্ষিতের টীকার নাম সুধা। বঘেলবংশোদ্ভবা রাজা কীর্ত্তিসিংহ দেবের আদেশে ভানুজী পাণিনিসম্মত এই সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ভানুজী সিদ্ধান্ত

মাতার নাম মন্দোদরী। তিনি দিতীয় বিপ্রকুলজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

ভাগীরথীং জলময়ীং জগতামধীশাং
মন্দোদরীরঘুপতী পিতরৌ চ নত্বা।
দিতীয় বিপ্রকুলজঃ স জটাধরোঽসৌ
আচার্য্য এতদকরোদভিধানতন্ত্রং॥

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার সারসুন্দরী নামক অমরকোষের টীকা ভিন্ন নানার্থশব্দ ও শব্দরত্নাবলী নামে দুইখানি অভিধান রচনা করেন। অধ্যাপক উইলসন বলেন যে, মথুরেশ মূর্চ্ছা খাঁর (মুসা খাঁ) আশ্রয়ে থাকিয়া ১৫৮৮ শকে শব্দরত্নাবলী প্রণয়ন করেন। রাজা মূর্চ্ছা খাঁনের পিতার নাম শিতমান খান। মূর্চ্ছা খানের পুত্র রাম-আদেশে শব্দরত্নাবলী রচিত হয়। নানার্থ শব্দে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

নত্বা জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম মূর্চ্ছা খান-নৃপজ্ঞয়া।
নানার্থশব্দা লিখ্যন্তে মথুরেশেন যত্নতঃ॥

মথুরেশের পিতার নাম শিবরাম চক্রবর্ত্তী এবং মাতার নাম পার্ব্বতী। তিনি বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী বন্দাঘটীয় কুলীন ছিলেন। চন্দ্র, কাশীনাথ, মাধব, ও সর্ব্বানন্দ শিবরামের উত্তরোত্তর পূর্ব্ব পুরুষ। ১৬০২ শকে সুপদ্ম ব্যাকরণের মতানুযায়ী সারসুন্দরী মথুরেশ কর্ত্তৃক বিরচিত হয়।

মথুরেশের পিতা শিবরাম চক্রবর্ত্তী ১৭৫৯ শকে গ্রহনক্ষাদির শুভাশুভ বিচার বিষয়ে শিশুবোধিনী নামে জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

যঃ সর্ব্বানন্দবন্দ্য ক্ষিতিতলবিদিতঃ
সৎকুলোমেলবীজীস্নুস্তস্যাম জজ্ঞে
কৃতবিবিধকুলো মাধবো মাধবাভঃ।
কাশীনাথোঽপি তস্মাৎসমজনি, কুলধাম্-
শ্চন্দ্রবন্দ্য স্ততো বৈ
তস্মাৎ সুখ্যাতনামা সমজনি শিবরামোঽর্থা-
বিচ্চক্রবর্ত্তী॥
রায়মুকুটটীকাদেঃ কলাপাদিক্রিয়া যতঃ।
সুপদ্মপ্রক্রিয়া তস্মাৎমথুরেশেন তন্যতে॥
গজাষ্টতিথিযুক্‌শাকে বিদ্যালঙ্কারধীমতা।
লিঙ্গাদিসংগ্রহে টীকা নির্ম্মমে সারসুন্দরীং॥

শিবরাম চক্রবর্ত্তী জনকঃ পার্ব্বতী প্রসূঃ।
তস্য শ্রীমথুরেশোঽসৌ চকার সারসুন্দরীং॥

পঞ্চধারাত্মক জ্যোতিঃসাগর-সার নামে জ্যোতিষগ্রন্থ এই মথুরেশ রচিত কি না, জানি না।

সামন্তসার গ্রামনিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি নামে অমরকোষের সুবিস্তৃত উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ১৭৪২ শকাব্দে লিখিত এক খানি পুস্তক মুরসিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নসীপুরের বাবু জগন্নাথ প্রসাদ গুপ্তের নিকট বিদ্যমান আছে।

মতং গুরূণাং প্রতিচার্য্য যত্নাদ
আলোক্য তন্ত্রানিচ কোবিদানাং।
সতাং মুদে শ্রীরঘুনাথশর্ম্মা
ত্রিকাণ্ডচিন্তামণিমাতনোন।

এই টীকা মহামতি কৃষ্ণবল্লভের অনুরোধে বিরচিত হয়। এই কৃষ্ণবল্লভ কে, বলিতে পারি না।

মুকুন্দশর্ম্মা লিঙ্গানুশাসনটীকা বোপদেবের মুগ্ধবোধ অনুসারে রচনা করেন। ১৬১৭ শকে লিখিত এক খানি গ্রন্থ শান্তিপুরের রাধিকানাথ গোস্বামীর নিকট বিদ্যমান আছে।

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং বোপদেবকবৈমতং।
জ্ঞাত্বা টীকা বিরচিতা ক্রিয়া মুকুন্দশর্ম্মাণ।

রাঘবেন্দ্র (রঘুনন্দন) ভট্ট অমরকোষভাষ্য কাতন্ত্রব্যাকরণ সম্মত করিয়া রচনা করেন। টীকাকারের পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণভট্ট।

কাত্যায়নব্যাড়ি-শ্রীমাধবাদীন্
কাতন্ত্রতন্ত্রাণি বিচার্য্য যত্নাদ্।
শ্রীরাঘবেন্দ্রোঽমরসিংহকোষে
তনোতি ভাষ্যং সুধিয়াং হিতায়॥
শ্রীশ্রীকৃষ্ণভট্টস্য তনুজেন দ্বিজন্মনা।
নিরমায়ি সতাং প্রীত্যৈ ভাষ্যং মানুষবর্গকং॥

রাজসাহী জিলার অন্তঃপাতী লালগোলার বাবু তারানাথ রায়চৌধুরীর নিকট এক খানি কলাপসূত্রানুমোদিত অমরকোষমালা বিদ্যমান আছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই।

সম্ভবের * পূর্ব্বভাগের টীকা রচনা করেন। এই সুবোধার প্রারম্ভে গ্রন্থকার কেন কেবল মাত্র প্রথম সাত সর্গের টীকা করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, তাহার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কুমারসম্ভবংশর্ম কালিদাসমহাকবিঃ।
যশ্চকার মহাকাব্যং সর্গৈ র্ষোড়শভিঃ শ্রুতং।
তস্য শেষাষ্টসর্গস্য সঞ্চারোঽভূন্ন দৈবতঃ।
পাঠোঽষ্টমস্য সর্গস্য দেবীশাপান্ন বিদ্যতে॥
টীকা তৎ সপ্তসর্গস্য সুবোধাখ্যা যথামতি।
গৌরাঙ্গসেনপুত্রেণ ভরতেন বিতন্যতে॥

শ্রীরাম লিঙ্গানুশাসনটিপ্পনী নামে অমর-কোষের টীকা রচনা করেন।

লিঙ্গসংগ্রহবর্গস্য টিপ্পনীবহুসম্মতা।
শ্রীরামশর্ম্মণাকারি সুমতিপ্রতিপত্তয়ে॥

শ্রীকর আচার্য্য ব্যাখ্যামৃত নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

পদার্থকৌমুদী নামে টীকা নারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ১৬২৭ শকে লিখিত এক খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্মমধুলিন্নারায়ণঃ শ্রীনিধিঃ।
যত্নেনামরপঞ্জিকাং বিতনুতে সংক্ষেপতঃ সৎকবিঃ॥

*কুমারসম্ভবের আরও চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (১) গোবিন্দ রাম শর্ম্মার ধীররঞ্জিকা।

সানন্দং চরণাভিবন্দনভবৎপ্রোদ্‌গাঢ়হর্ষা-শ্রুভিঃ।
সংসিক্তানন-ভূরিগদ্‌গদবচা দেবেন্দ্রবৃন্দার্চ্চিতং।
পাদাব্জং পরিবন্দ্য শঙ্করবিভো গোবিন্দরামো দ্বিজঃ
ব্যাখ্যানং বিতনোতি পণ্ডিতমুদে যত্নাৎ কুমারীয়কং॥

(২) মিথিলাবাসী রঘুপতি কৃত কুমার ব্যাখ্যাসুধা। এই টীকায় অষ্টমসর্গেরও ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবুধৈঃ কৃতাত্র, টীকা প্রসিদ্ধার্থনিরুক্তি-দক্ষা।
ইয়ন্তু গূঢ়ার্থবিবেচনায়
বিতন্যতে শ্রীরঘুণা প্রযত্নাৎ॥

ভরত সেন রচিত ভট্টিকাব্য (রাবণবধ), শিশুপালবধ, ও নৈষধচরিতের মুগ্ধবোধক সম্মত টীকা বর্ত্তমান আছে।* সুখলেখন গ্রন্থে ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন।—

কুলবিতরণবিদ্যা বৈভবশ্রেষ্ঠগোষ্ঠী
বরহরিহর সেন খ্যাত বংশপ্রসূতঃ॥

---

(৩) রঘুবংশের টীকাকার কৃষ্ণপতি শর্ম্মার অন্বয়লাপিকা। টীকাকার মিথিলার সঙ্করাঢ়ী কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জগদ্ধর ও দিবাকরের বিস্তীর্ণ টীকা হইতে বিশেষ সাহায্য পান।

সঙ্করাঢ়ীকুলোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণপতিশর্ম্মণা।
টীকা কুমারকাব্যস্য ক্রিয়তেঽন্বয়লাপিকা॥
শ্রীমজ্জগদ্ধর-দিবাকরপণ্ডিতাদেঃ
অত্যন্তবিস্তরতরা হি কুমারটীকা।
লব্ধাববোধবিষয়া রচিতা ময়াপি
ধীরেণ কৃষ্ণপতিনান্বয়লাপিকেয়ং॥

এই জগদ্ধর মালতী মাধব ও বেণীসংহার নাটকের এবং বাসবদত্তা নামক গদ্যকাব্যের টীকা রচনা করেন।

(৪) গোপালানন্দ বাণীবিলাস প্রণীত সারাবলী নাম্নী টীকা। ইহার পিতার নাম ভগীরথ মিশ্র।

শ্রীভগীরথ মিশ্রস্য সূনু—তয়া সুধীঃ।
বাণীবিলাসঃ কুরুতে টীকাং সারাবলীমিমাং।

* ভট্টিকাব্যের প্রকৃত নাম রাবণবধ বলিয়া ১৩২৩ শকে পুরুষোত্তম দেবশর্ম্মা কর্ত্তৃক বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত পুস্তকে উল্লিখিত আছে। ইহা প্রবরসেনের রাবণবধ হইতে পৃথক গ্রন্থ। শ্রীধর স্বামীর পুত্র ভট্টিস্বামী নামা ব্রাহ্মণ কবি গুজরাটের অন্তর্গত বল্লভীপুরের রাজার সভাসদ্ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাকরণের দুরূহ দুর্ব্বোধ ব্যাকরণশাস্ত্রের উদাহরণাদি প্রদর্শনার্থ দ্বাবিংশতি সর্গে এই মহাকাব্য রচনা করেন।

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বল্লভ্যাং
শ্রীধরসেন-নরেন্দ্র পালিতায়াং।

বিদিতচরিতধীরঃ শ্রীলগৌরাঙ্গসূনু
ব্যধিত ভরতসেনো বালবোধার্থমেতৎ ॥

কীর্ত্তিরতো ভবাতাম্রপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্ ॥
(ভট্টি, ২২।৩৫)

ভরতমল্লিকের ভট্টিটীকা বয়সে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ। ভট্টিকাব্যের ছয়খানি টীকা উত্তরোত্তরকালে যথাক্রমে রচিত হইয়াছে। (১) জয়মঙ্গল, (২) হরিহর, (৩) পুণ্ডরীকাক্ষ, (৪) কন্দর্প চক্রবর্ত্তী, (৫) বিদ্যাবিনোদ, ও (৬) ভরতমল্লিক।

নরনারায়ণ বিদ্যাবিনোদ আচার্য্যের পিতার নাম বাণেশ্বর ও পিতৃব্যের নাম জটাধর ছিল। ইহাঁর বাসস্থল পূর্ব্বগ্রাম। ইনি ক্রমদীশ্বর রচিত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্রানুযায়ী উদাহরণ স্বরচিত ভট্টিবোধিনীতে প্রদর্শন করেন।

পূর্ব্বগ্রামিকুলে কলানিধিনিভ শ্ছত্রী সুমেরুস্থিতো
ভ্রাতা যস্য জটাধরো, দ্বিজবরো বাণেশ্বর, স্তৎসুতঃ।
তৎ পুত্রঃ প্রথিতোঽভবৎ কবিবরো নারায়ণো নামতঃ
সোঽভূদভ্যসনেন শাস্ত্রনিচয়াবিদ্যাবিনোঃ দার্থতঃ ॥

সন্তি যদ্যপি ভূয়াংসঃ শব্দলক্ষণচক্ষুষঃ।
তথাপি জৌমরাভ্যাস বিশেষাযৈর শিষ্যতে ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ ভটিকাব্যের যে টীকা রচনা করেন, তাহা কলাপ (কাতন্ত্র) ব্যাকরণ সম্মত বলিয়া তাহার নাম কলাপদীপিকা। টীকাকারের পিতার নাম শ্রীকান্ত পণ্ডিত।

নত্বা শঙ্করচরণং জ্ঞাত্বা সকলং কলাপতত্ত্বঞ্চঃ
দৃষ্টা পাণিনিতন্ত্রং বদতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সোণাপুর গ্রামের সাহা বাবুর নিকট ১৬৫০ শকের লিখিত একখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। এই সাহা বাবুর নিকট ১৬৪৫ শকে লিখিত পুরুষোত্তম প্রণীত ভাষাবৃত্তি নামক ভট্টি টীকাও বিদ্যমান আছে।

মাঘের রচিত শিশুপালবধ * মহাকাব্যের সর্ব্ব প্রধান প্রামাণিক টীকাকার মল্লিনাথ সূরি। ভরত মল্লিকের টীকা ভিন্ন (১ বল্লভ দেবের শিশুপালবধ টীকা, (২) ভগীরথের অনীয়সী, ও (৩) মিথিলাবাসী ভবদত্তের তত্ত্বকৌমুদী পাওয়া গিয়াছে। ১৫৯৪ শকে বঙ্গাক্ষরে লিখিত বল্লভ দেবের টীকা কলিকাতা এসিয়াটীক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয় টীকা-

---

ভাষাবৃত্তিতে পুরুষোত্তম এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথা ত্রিমুনিলক্ষণং।
পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তি বিধীয়তে ॥

রামচন্দ্র বাচস্পতি প্রণীত সুবোধিনী নামে ভট্টিকাব্যের টীকা বিদ্যমান আছে।

*মহাকবি মাঘের পিতার নাম শ্রীদত্ত। ১৪৩৬ শকে বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত এক খানি শিশুপালবধ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বিদ্যমান আছে।

দত্তাত্মজঃ সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ।
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানং ॥

মাঘ ভারবির কিরাতার্জ্জুনীয়কে আদর্শস্বরূপ করিয়া শিশুপালবধ রচনা করেন। মাঘের কবিত্ব ও বর্ণনা শক্তি অতি অদ্ভুত ছিল। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ওজস্বী, গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের বহু বিস্তৃত বর্ণনা ও সহৃদয়তার অভাব মাঘের প্রধানতম দোষ! মাঘের মধুর ও মনোহর বর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতবর্গ শিশুপালবধকে অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উপমা কালিদাসস্য, ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং,মাঘে সন্তিত্রয়োগুণাঃ ॥
পুষ্পেষু জাতী, নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণুঃ।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘ, কবি কালিদাসঃ ॥

কার ভগীরথ বোধ হয় মেঘদূতের টীকাকার ভগীরথ মিশ্র হইতে অভিন্ন ব্যক্তি।

বোধার্থমল্পবুদ্ধীনাং টীকামেতা মনীষসীং।
বিদধাতি দ্বিজঃ শ্রীমান্——ভগীরথঃ ॥

তৃতীয় টীকাকার ভবদত্ত মিথিলাবাসী ছিলেন। ১৫৫২ শকাব্দে (৫১২ লক্ষ্মণাব্দে) লিখিত পুস্তক চম্পানগরের জয়পতি ঝার নিকটে বিদ্যমান আছে।

মাঘে শ্রীভবদত্তেন টীকা যা ক্রিয়তে শুভা।
সর্গঃ সম্ভোগনামাসৌ তত্রাণাদ্দশমোঽসমঃ ॥

ভরত মল্লিকের টীকা ভিন্ন মহাকবি শ্রীহর্ষের রচিত নৈষধচরিতের অনেকানেক টীকা বিদ্যমান আছে। (১) নারায়ণ বেদকর প্রণীত নৈষধীয়-প্রকাশ। টীকাকার নরসিংহ পণ্ডিতের ঔরসে মদালসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় সংস্কৃত সুপণ্ডিত ছিলেন।

নত্বা শ্রীনরসিংহপণ্ডিতপিতুঃ পাদারবিন্দদ্বয়ং।
মাতুশ্চাপি মদালসেত্যভিধয়া বিখ্যাতকীর্ত্তেঃ ক্ষিতৌ।
শ্রীরামেশ্বরসীতয়োঃ সুমনসো গুর্ব্বোবগর্ব্বো। যথা—
বুদ্ধি শ্রীনিষধেন্দ্রকাবঃবিবৃতিং নির্ম্মাতি নারায়ণঃ ॥

এই নারায়ণের টীকা উত্তরনৈষধ (১২—২২ সর্গ) ডাক্তার রোয়ার সাহেব কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রযত্নে প্রকাশ করেন। পূর্ব্বনৈষধের প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ * কৃত টীকা বর্ত্তমান আছে।

(২) ভবদত্ত প্রণীত নলচরিত টীকা। এই ভবদত্ত প্রাগুক্ত তত্ত্বকৌমুদী নামক মাঘ কাব্যের টীকা রচনা করেন। নৈষধচরিতের এই টীকায় তিনি স্বীয় বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। আদিদেব, কর্ণ, বাচস্পতি মিশ্র, ধর্ম্মাদিত্য, জগদ্ধর, দিবাকর, নয়শর্ম্মশর্ম্মা, দেবদত্ত, ও ভবদত্ত। টীকাকারের পিতার নাম দেবদত্ত।

(৩) গোপীনাথ আচার্য্যের হর্ষহৃদয়া। ইনি বোধ হয় বঙ্গদেশবাসী ছিলেন।

(৪) নৈষধচরিতের চতুর্থ টীকা দীপিকা নরহরি বিরচিত। (৫) বংশীবদনশর্ম্মা প্রণীত নৈষধটীকা।

শ্রীরামচরণৌ নত্বা বংশীবদনশর্ম্মণা।
নৈষধীয়প্রবন্ধেঽস্মিন্নতিসংক্ষিপ্য লিখ্যতে ॥

মল্লিনাথ সূরি বিরচিত ভারবির রচিত কিরাতার্জ্জুনীয় মহাকাব্যের চারি খানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। (১) বঙ্কিমদাসের বৈষম্যোদ্ধরণী। বীরভূম জিলার অন্তর্গত ভীমগড় গ্রামবাসী গোপালচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট গদাধর শর্ম্মা কর্ত্তৃক ১৫৭৪ শকের লিখিত এক খানি হস্তলিখিত পুস্তক আছে।

অথ বঙ্কিমদাসেন প্রণম্য পরমেশ্বরীং।
বৈষম্যোদ্ধরণী কাব্যে ভারবীয়ে বিধীয়তে ॥
ব্রহ্মাস্যগ্রহচন্দ্রশেখরমুখক্ষৌণীমিতে ভূপতেঃ

---

* কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সুযোগ্য অধ্যাপক ও সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক স্বর্গীয় প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় নৈষধচরিতের পূর্ব্বার্দ্ধের টীকা ভিন্ন, ভবভূতিঃ উত্তররামচরিত নাটকের, দণ্ডীর কাব্যদর্শন নামক অলঙ্কারগ্রন্থের এবং রাঘবপাণ্ডবীয় মহাকাব্যের টীকা রচনা করেন। রাঘবপাণ্ডবীয় নামক দ্ব্যর্থ কাব্য জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভাসদ কবিরাজ পণ্ডিত কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিরচিত হয়। কাব্যদার্শের আরো দুই খানি টীকা আছে। প্রথম টীকা চন্দ্রিকা ত্রিসেন কৃত, দ্বিতীয় টীকা ত্রিশরণ ভট্ট তীম প্রণীত।

শাকে কার্ত্তিকসংজ্ঞকে শনিদিনে মাসে সিতায়াংতিথৌ।
অষ্টম্যাং লিখিতা সুবোধবিষমা টীকা মুদা ভারবেঃ।
শ্রীদামোদরশর্ম্মণা সুরবরং নত্বা হরিং কামদং॥

(২) গদসিংহের তত্ত্বচন্দ্রিকা। গদ সিংহ স্বীয় ভ্রাতা শ্রীসিংহের নিকট অধ্যয়ন করেন। তিনি এক জন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। ইনি প্রকাশবর্ষের কৃত ভারবির টীকার গ্রন্থারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন।

সন্তি প্রকাশবর্ষাদি টীকা অপি সুবিস্তরাঃ।
তথাপি লঘুবোধার্থং গদসিংহোঽকরোদিমাং॥

(৩) তৃতীয় টীকা মনোহর শর্ম্মার সুভাষিণী। এই টিকা রাজা মাণিক্যমল্লের তুষ্টিবিধানার্থে বিরচিত হয়।

নত্বা ভবানীচরণারবিন্দং
মনোহরেণ ক্রিয়তে বিচার্য্য।
মাণিক্য মল্লক্ষিতিপালতুষ্ট্যৈ
সুভাষিণী ভারবিকাব্যটীকা॥

(৪) ভারবির চতুর্থ টীকা প্রদীপিকা জৈনাচার্য্য দেববিজয়গণির শিষ্য ধর্ম্মবিজয়গণি রচিত। ১৭৬৬ শকের লিখিত এক খানি পুস্তক মুরসিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জাফরগঞ্জবাসী গোপাল দাস মোহন্তের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

বেচারাম ন্যায়ালঙ্কার কর্ত্তৃক আনন্দরঙ্গিনী কাব্য বিরচিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার চন্দননগরবাসী ছিলেন। এই কাব্যে চন্দননগর হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত জলপথে যাইতে পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী গ্রাম নগরাদির বর্ণনা সহ কাশীধামের মাহাত্ম্য ও তত্রত্য তীর্থাদির পৌরাণিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই কাব্য আট সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার স্বয়ং সিদ্ধান্ততরী নামে ইহার টীকা রচনা করেন। গ্রন্থকার তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে কাশীধামে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থশেষে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যলীলা বিষয়ে সৎকাব্যরত্নাকর, ভৈষজ্যরত্নাকর নামে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ, সিদ্ধান্তমণিমঞ্জরী নামে জ্যোতিষ ও সিদ্ধান্তমনোরমা নাম্নী তাহার টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজারাম সিদ্ধান্ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যশ্চৈতন্যরহস্যমদ্ভুতরসং সৎকাব্যংরত্নাকরং
বৈদ্যানাং সুখহেতবেঽতিবহুলং ভৈষজ্য রত্নাকরং।
তস্মাৎ শ্রীমণিমঞ্জরীং সুরুচিরাং নেপালভূপাজ্ঞয়া
শ্রীসিদ্ধান্তমনোরমাং সমকরোৎ টীকাং তথা জ্যোতিষি॥

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

পালরাজগণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে আমরা পাল রাজন্যবর্গের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত আলোচনা করিব।

বুদ্ধদেবের এক নাম সুগত। তদনুসারে বৌদ্ধগণ "সৌগত" নামেও পরিচিত হইয়াছেন। তাম্র শাসন ও প্রস্তর লিপিতে পাল রাজন্যবর্গকে সৌগত বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মুঙ্গেরের তাম্র শাসনে মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেবকে

"পরম সৌগত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই শাসন পত্রের অনুবাদক উইলকিন্স সাহেব ইহা ভাল রূপে অনুধাবন না করিয়া, দেবপাল দেবকেই সুগত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর স্থাপনকর্ত্তা সার উইলিয়ম জোন্স উইলকিন্স সাহেবের উক্ত ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাগলপুরের তাম্র শাসনে মহারাজাধিরাজ নারায়ণপাল দেবকেও "পরম সৌগত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পাল রাজারা যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহার প্রমাণ এত অধিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, সে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম। সত্য বটে পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মিথ্যাবাদী কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের যে চিত্র সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। এই মিথ্যাবাদী কুলাচার্য্যদিগের কৃপায় সাধারন বঙ্গবাসীগণ অবগত আছেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের অত্যাচারে বাঙ্গালা দেশে হিন্দুধর্ম্ম ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ লোপ পাইয়াছিল, ইহারা ব্রাহ্মণদিগের উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিতেন ও এবম্বিধ বহু প্রকার অত্যাচার করিতেন। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যদি জগতের মিথ্যাবাদিগণের শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়, তাহা হইলে এই সকল কথা যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

বোদাল স্তম্ভ লিপির বিবরণ প্রবন্ধের প্রারম্ভে প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পুরুষানুক্রমে পাল রাজন্যবর্গের মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং এই সকল মহাত্মাদিগকে তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান ও পূজা করিতেন। বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া পালরাজগণ যখন আপনাদিগের মস্তক সেই সকল ব্রাহ্মণের পাদপদ্মে স্থাপন করিতেন, তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ ও হিন্দু বিদ্বেষ্টা কিরূপে বলিব? বোদাল স্তম্ভ লিপিতে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদিগের যেরূপ গুণানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, পাল রাজগণ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগের হিতৈষী কি শত্রু ছিলেন।

১। খ্যাতঃ শাণ্ডিল্যবংশোকাবীরদেবস্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত।

২। শক্রঃ পুরোদিশিপতি ন্ দিগন্তরেষু
তত্রাত্রি দৈত্যপতিভি র্জিতনন্দনঃ সঃ।
... ... ধর্ম্মপরায়ণঃ স্ম
তৎস্বামুপৈতি নিজহাস বৃহস্পতিং যঃ॥

৩। পত্নীচ্ছানাম তস্যাসীদিচ্ছারান্তবিবর্ত্তিনী।
নিসর্গবিমল স্নিগ্ধাসাধ্বী প্রেমময়ী শুভা॥

৪। বিদ্যাসু যূপমুখ ... ...
... ... পরতস্ত্রিলোকঃ।
সূনুস্তয়োঃ কমলযোনিবির দ্বিজেশঃ
শ্রীদর্ভপাণিরিতিনামনি সুপ্রসিদ্ধঃ॥

৫। আরেবাজনকাম্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহতরাগৌরী পিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যতসিতিম্নোগিরে।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করংদাশ্রীদেবপালনৃপঃ॥

৬। মাদ্যন্নানাগজেন্দ্রস্রবদনবরতোচ্ছ্বাসিদনি-
প্রবাহৈঃ
ক্লিন্নক্ষ্মোদ্ভূত ভঙ্গপ্রবণঘনরজঃ সন্মৃতাশা
বিকাশং।
দিক্‌চক্রায়াত ভূমৃৎপরিকর বিসরদ্বাহিনী
দুর্বিলোকং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালোনৃপতির বসতাপে-
ক্ষয়া দ্বাবি যস্য॥

৭। দত্ত্বাপ্যনন্নমুডুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাদ পাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ॥

৮। তস্যশ্রীশর্করাদেব্যা মত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ।
অভূত্ সোমেশ্বর শ্রীমানপরমেশ্বরবল্লভঃ॥

৯। নভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারূহ্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতিগিরো নোদ্গর্ব্ব-
মাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তং মধুরং বচঃপ্রণয়িনঃ সন্তর্ত্রিনা-
স্বশ্রিয়া
যেনৈবং স্বগুণৈর্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রেসতাং
বিস্ময়ঃ॥

১০। শিব ইব করং শিবায়া হরিরিব লক্ষ্ম্যা
গৃহাশ্রম প্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধিকৃৎ তরলাদেব্যাঃপাণিং
জগ্রাহ॥

১১।..................
দুর্বোধোঽভ্যস্তশক্তিঃ স্বনয় পরিগতা
শেষবিদ্যাপ্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্মপ্রপেদে ত্রিদশ জনমনো
নন্দনঃসূক্তিয়াভিঃ
শ্রীমান কেদারমিশ্রো গুহ ইব বিলস-
দ্গীত রূপপ্রভাবঃ॥

১২। ভাস্বদ্দর্শনসম্পীত চতুর্বিদ্যা পয়োনিধীন্।
জহাসাগস্ত্যসম্পত্তি মুদ্গিরন্নস্থিবাস্ত যঃ॥

১৩। উৎকোলিতোৎকলকুলং হৃতহূনগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃত দ্রবিড় গুর্জ্জর রাজদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরসনাভরণং বুভোজ-
গৌড়েশ্বরশ্চিবমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং॥

১৪। স্বয়মপহৃত বিত্তানর্থিনো যোবমেনে
দ্বিষদি সুহৃদিবাসীন্নির্ব্বিবে কো যদাত্মা।
ভবজলধি নিপাতে যস্য ভীর্ধুতপাপা-
পরিমৃদিত কংশং যৌ যঃ পরে ধাম্নিরসে।

১৫। যস্যাগ্রেষু বৃহস্পতিপ্রকৃতেঃশ্রীসুরপালো
নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব প্রজাপ্রিয়বলোগত্বব ভূয়ঃ
স্বয়ং॥
নানাম্ভো নিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণ
গঙ্গাচিরং
গঙ্গাম্ভঃ প্লুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ
পূতঃপয়॥

১৬। দেবগ্রামভবা তস্য পত্নীবন্ধা........
... . ॥

১৭। সা দেবকীব তস্মাদ্য শোদয়া স্বীকৃত-
মিবকৃষ্ণং
গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমংতনয়ং॥

১৮। জমদগ্নি-কুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাস্যো রামসেন ইবাপরঃ॥

১৯। কুশলোগুণান্ বিবেক্তুং বিজিতেষু যঃ
নৃপঃ প্রসাদং স্তনমতি।
শ্রীনারায়ণ পালঃ প্রশস্তিরপরা কিয়ত্য-
সৌব॥

২০। নানাকাব্য রসাগমেষু ধিগমো নীতৌ
পরতিষ্ঠতা।
বেদোক্তানুগমাদসৌ প্রিয়তমো বঙ্গস্য
সম্বন্ধিনাং।
আসক্তির্গুণকীর্ত্তনেষু মহতাং বিখ্যাত
বিজ্জ্যোতিষো॥

যস্যানল্পমতেরমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারোনদঃ।।
২১। যস্যাশিসঃ শাসতি বাগধীশ বিহায়
বৈরাণিনিসর্গজানি।
উভেস্থিত সর্ব্বামিবাভিগস্ত্র্যাবেকত্র লক্ষ্মীশ্চ
স্বরস্বতীশ্চ।।
২২। শাস্ত্রানুশীলনগভীর ফর্ব্বৌবিবাদে
বিদ্বত সভাস্বপরবাদি মদানুলেপঃ।
উচ্চাসিতঃ সপরিতো রিপুবিদ্বিষাঞ্চ।
নস্তোকবিক্রমবরেণ হতাভিমানঃ।।
২৪। সহসৈব বলং ন যস্য যত্বাধগত্যাপি
ন কর্ব্বয়ুযন্নকিঞ্চিৎ।
কলিদানমপি যস্য ন জাতু শান্তঃ——,,
২৫। অতিলোল পলিত কলিযুগ বাল্মীকি
যমপিশুরশ্বর বর্ম্মেতি——
২৬। বাণীপ্রসন্ন গম্ভীরা বিরোতিবপুনাতিব।
পিতরং স্বয়মাস্থায় পুত্রন্নপগমৎস্বয়ং।
ব্রহ্মতি পুরুষাৎ যস্য——যংচপ্রপেদীর।
গোদা————
২৭। স্বকীয় বপুযো লোকে ক্ষণ গ্রাহিণি
স্বাদি————
২৮।————ফলিনাং বৃক্ষঃ প্রিয়সথজাজ্ঞো-
পমরোপিন।

হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ ও যাগ যজ্ঞ সম্পাদনার্থ বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল দানপত্র অবলম্বন করিয়াই আমরা প্রধানতঃ তাঁহাদের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রাচীন কালে কোন দানপত্র দ্বারা যে ভূমি দান করা হইত, তাহার চতুঃসীমা উল্লেখ করিয়া এরূপ বলা হইত যে, এই চতুঃসীমার মধ্যগত কোন ভূমি যদি ইতি-পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কিম্বা দেবতাতে অর্পিত হইয়া থাকে, তবে তদ্‌বাদে অপর সমস্ত ভূমি অদ্য দান করিলাম। মুদ্গগিরি নগরে বিজয়ী স্কন্ধাভার সংস্থাপন পূর্ব্বক যখন মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভট্ট বৃক্ষরথ মিশ্রকে (শ্রীনগর বা আধুনিক পাটনার), অন্তর্গত ক্রমিলা বিষয়ীর (পরগণা) অন্তঃপাতী মিসিক গ্রাম দেব উদ্দেশে দৈব কার্য্য সম্পাদনার্থ দান করিয়াছিলেন, তখনও তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। এমত অবস্থায় জানিনা কোন্ মূর্খ তাঁহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ্টা বলিতে পারেন।

সেন রাজগণের দান পত্রের মর্ম্মালোচনা দ্বারা বোধ হয় তাঁহারা বিষ্ণুর উদ্দেশে ভূমি দান করিতেন। কারণ লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে আমরা "নারায়ণ ভট্টারক মুদ্দিশ্য" শব্দ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পাল রাজগণ দেবাদিদেব ভগবান্ শশাঙ্ক শেখরের উদ্দেশ্যে ভূমিদান করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে ঐস্থানে (সেন রাজগণের শাসন পত্রে যে স্থানে "নারায়ণ ভট্টারক মুদ্দিশ্য" শব্দ লিখিত হইয়াছে সেই স্থানে) "ভগবন্ত শিবভট্টারক মুদ্দিশ্য" লিখিত রহিয়াছে। এই শাসন পত্র পাঠে অনুমিত হয় যে, তীরভুক্ত (ত্রিহুত) প্রদেশস্থিত কক্ষবিষয়ীর (পরগণা) অধীন কলস পোতগ্রামে সহস্র দেব মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ ভগবান মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি তাহাতে সংস্থাপন করিয়া সেই দেবতার পূজা, বলি, চরু, সত্র প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন ও রোগিদিগের আশ্রয়, ঔষধ ও সেবা শুশ্রূষা নির্ব্বাহ জন্য মুকুতিকা নামক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের পরিচয়? আমরা যতই এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে থাকি, ততই মিথ্যাবাদী কুলাচার্য্যদিগের প্রতি ঘৃণা শত

গুণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনেকে বলেন যে, ইহারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের পারিবারিক ইতিহাস রক্ষা করিয়া দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহারা পুরুষানুক্রমে মিথ্যার প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিয়া আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ইহারা অর্থলোভে অদ্যাপি যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা কি আমরা চক্ষে দেখিতে পাইতেছি না? এরূপ মিথ্যা পরিপূর্ণ পারিবারিক ইতিহাস থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল।

বোদালস্তম্ভলিপি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বলুন, পালরাজগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের প্রতি, কিরূপ ব্যবহার করিতেন।

পাল রাজন্যবর্গের রাজ্যশাসন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা আমরা আপাততঃ আলোচনা করিতে বিরত রহিলাম। সময়ান্তরে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবেক। কিন্তু আপাততঃ তাহাদের শাসন সংক্রান্ত রাজকর্ম্মচারিদিগের পদের তালিকা মুঙ্গের, ভাগলপুর ও আমগাছির তাম্র শাসন হইতে এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। ইহা দ্বারা পাঠকগণ তাঁহাদের শাসনপ্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করিতে পারি।

রাজরাণক। অধীনস্থ রাজন্যবর্গ।
রাজামাত্য। মন্ত্রী।
মহাসান্ধিবিগ্রহিক। সন্ধি বিগ্রহের কর্ত্তা।* (Minister of peace and war.)
মহাক্ষপটলিক। প্রধান বিচারপতি। (Chief justice.)
মহাসামন্ত। প্রধান সামন্ত।
মহাসেনাপতি। প্রধান সেনাপতি।
মহাপ্রতীহার। রাজপুররক্ষক সেনাদলের নায়ক।
মহাকর্ত্তাকৃতিক। তদন্তকারীদিগের নায়ক।
মহা দোঃ সাধ সাধনিক। দুরূহ কার্য্যসম্পাদনার্থ যাহারা নিযুক্ত ছিলেন তাহাদের নায়ক।
মহাদণ্ডনায়ক। ফৌজদারি বিভাগের প্রধান বিচারপতি।
মহাকুমারামাত্য। যুবরাজের মন্ত্রী।
রাজস্থানীয়োপরিক। রাজপ্রতিনিধি। (Viceroy and governor.)
দাশাপরাধিক। (Investigators of the crimes.)
চৌরদ্ধরণিক। গোয়েন্দা পুলিশের অধ্যক্ষ।
দাণ্ডিক। মেজেষ্ট্রেট বা ফৌজদার।
দাণ্ডপাশিক। অস্ত্র ও শস্ত্রের অধ্যক্ষ।
শৌল্কিক। Custom's collector.
গৌল্মিক। এক দল সৈন্যের নায়ক। Collonel.
ক্ষেত্রপ কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ।
প্রান্তপাল। সীমান্ত রক্ষক।
কোষপাল। ধনরক্ষক। (খাজাঞ্চী।)
খণ্ডরক্ষ। Superintendents of wards.
তদাযুক্তক। Inspectors of wards

* মন্ত্রিত্ব পদে অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণ। তদ্ব্যতীত ক্ষত্রিয় কিম্বা কায়স্থ নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু মহাসান্ধি বিগ্রহকের পদটী কায়স্থদিগের প্রায় একচেটীয়া ছিল। বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ বোধ হয় সকলেই নারায়ণ দত্তের নাম শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনদে বর শাসন কালে মহাসান্ধি বিগ্রহকর পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

বিনিযুক্তক। নিযুক্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। Hd. of the appointment Department.

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌবলব্যাপৃতক। হস্তি, অশ্ব, উষ্ট্র ও নৌ সমূহের অধ্যক্ষ।

কিশোরবড়বা গোমহিষ্যজাধিকাধ্যক্ষ। এই সকল পশু সমূহের অধ্যক্ষ।

দ্রুতপেষনিক। দ্রুত সংবাদ বহনকারীগণের অধ্যক্ষ।

গমাগমিক। ডাক বিভাগের অধ্যক্ষ।

অভিত্বমান। ....

বিষয়পতি। পরগণার শাসনকর্ত্তা।*

গ্রামপতি। গ্রামের শাসনকর্ত্তা।

তরিক। নৌ বিভাগের অধ্যক্ষ।†

দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া অঞ্চলে অদ্যাপি পালরাজগণের কীর্ত্তিকলাপের চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সেই প্রদেশবাসী মানবগণ সেই সকল স্মৃতি চিহ্নের সহিত স্বকোপল-কল্পিত গল্প রচনা করিয়া তাহার অযথা পরিচয় দিয়া থাকেন। হায়! দিগ্বিজয়ী বঙ্গকুলতিলক পালরাজগণ, অদ্য তোমরা কোথায়, কৃতঘ্ন বঙ্গবাসীগণ তোমাদের সেই সকল কৃত কার্য্যের সহিত বাণ, বিরাট প্রভৃতি কল্পিত ব্যক্তিবৃন্দের নাম সংযোগ করিয়া তোমাদের কীর্ত্তি লোপের চেষ্টা করিতেছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে সেন রাজগণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছিলাম, অদ্য পালরাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমাপ্ত করিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কেবল শাসনপত্র ও খোদিত লিপি অবলম্বন করিয়া এক একটী রাজবংশের ইতিহাস সংগ্রহ করা কতদূর দুরূহ কার্য্য, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকগণ অবশ্যই অনুভব করিতে পারেন। মনুষ্য ভ্রম প্রমাদের দাস, আমাদের লেখা যে আদ্যোপান্তই ভ্রমশূন্য হইবে, আমরা এরূপ আশা করিতে পারি না। তবে পাল ও সেন রাজগণের সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে সকল ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ মত প্রচলিত আছে, তৎসমস্ত সংশোধন জন্য আমরা যথাসাধ্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। "কলিকাতা রিবিউ" নামক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক "সেন রাজগণ" পুস্তকের

---

*ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, ডাক্তর শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের ন্যায় এক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত "বিষয়পতি" শব্দের ইংরেজি অর্থ (Commissioners of the districts) লিখিয়াছেন। অদ্যাপিও কোন কোন প্রদেশে পরগণাকে বিষয় বলে, ইহা কি তিনি অবগত নহেন?

†নৌবিভাগের অধ্যক্ষের কথা দুইবার উল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং বোধ হয় প্রথমবার সমরতরীর অধ্যক্ষকে নির্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলে হয়ত পাঠক হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। বাঙ্গালীর আবার যুদ্ধ জাহাজ! কিন্তু পুরাতত্ত্বালোচনা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে, প্রাচীনকালে অর্ণব নির্ম্মাণ ও জল যুদ্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উজ্জয়িনী নগর নিবাসী মহাকবি কালিদাস ইহা অবগত হইয়াছিলেন। ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বেও তুরুস্কের সুলতানের সমস্ত অর্ণবযান বঙ্গদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া যাইত। খ্রীষ্টাব্দের চতুর্দ্দশশতাব্দীতে বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্ক পোলো আমাদের অর্ণবযান সমূহের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্পাঠে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার মতে এরূপ বৃহৎ সুন্দর ও সুদৃঢ় অর্ণবতরী তদানিন্তন জগতে অন্য কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না।

সমালোচনে বলিয়াছেন, "স্কুলের পাঠ্য ইতিহাস লেখকগণ এই পুস্তক দর্শন করিয়া অনেক ভ্রম সংশোধন করিতে পারিবেন।" আমরা কিন্তু সে আশা করি না, কারণ ইহা আমাদের জাতীয় স্বভাবের বিপরীত। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর কথায় ভ্রম সংশোধন করিতে নিতান্ত লজ্জা ও অপমান বোধ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত নহি।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

কি ছিল, কি আছে, কি চাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, পরিবর্ত্তন স্বভাবের চিরন্তন প্রচলিত নিয়ম, এই নিমিত্ত মানুষের মধ্যে পরিবর্ত্তনের বাসনা আমরা এত সমধিকরূপে দেখিতে পাই। ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের কার্য্য মূলে এই বাসনা, সমাজের কার্য্য মূলেও এই বাসনা। এই নানাবর্ণ, নানাস্বভাব অসংখ্য মানবসমাজ এই একই বাসনা দ্বারা পরিচালিত। যে জাতির অথবা যে ব্যক্তির বর্ত্তমান অবস্থা যত অসন্তোষজনক, সে জাতির অথবা সে ব্যক্তির মধ্যে এই পরিবর্ত্তন-বাসনা তত বেশী। অবস্থা এবং কার্য্যানুসারে এই বাসনা হইতে কখনও বা সুফল, কখনও বা কুফল প্রসূত হয়। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রিফম বিল,এবং নর-শোণিত-স্নাতক ফরাসী-বিপ্লব একই জননী গর্ভ সম্ভূত।

আমাদের ভারতবর্ষীয় সমাজ সমূহেও এক্ষণে পরিবর্ত্তন-বাসনা একান্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আর বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছি না। ধর্ম্মনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক কার্য্য মধ্যে,—মোট কথা আমাদের সমাজের সমুদয় কার্য্য বিভাগেই—আমরা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। তন্মধ্যে সমাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক বিষয়ে মতভেদ অত্যন্ত অধিক; এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক স্বতন্ত্র-ভাবে এই দুই বিভাগে কার্য্য করিতেছেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিভাগে সকলে একত্র চেষ্টা করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা পাছে এদি-কেও অন্য দুই দিকের ন্যায় বহু সম্প্রদায়ের উদয় হইয়া পড়ে। এখন পর্য্যন্ত আমরা রাজ-নৈতিক বিশেষ কোন অধিকার প্রাপ্ত হই নাই, শীঘ্র প্রাপ্ত হইতে পারিব কি না, সে বিষয়েরও গুরুতর সন্দেহ আছে। কাযেই সে বিষয়ের মতভেদ এখন পর্য্যন্ত তত প্রকাশ্যরূপে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন মতের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে,তাহা অনে-কেই অবগত আছেন। একশ্রেণী গত সময়ের প্রতি মাত্র দৃষ্টি করিতে চাহেন না, বা দৃষ্টি করা আবশ্যক বোধ করেন না; অপর শ্রেণী যাহা ছিল তাহাই পাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র। আমরা এ উভয় শ্রেণীকেই তুল্যরূপে ভ্রম-পতিত বলিয়া মনে করি। যাহা হউক, এ বিষয়ে সকলের অন্তঃকরণেই একটী পরিষ্কার মত গঠিত হওয়া প্রয়োজন, এই নিমিত্ত, আমরা হিন্দু, মুসলমান এবং

ইংরেজ সময়ের কয়েকটী বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

রাজশক্তি—আর্য্য শাসন সময়ে রাজা যেরূপে নিজের শক্তি পরিচালন করিতেন, এবং প্রজারা রাজার প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করিত, সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করেন; কেহবা মধ্য সময়ের অবস্থা স্মরণ করিয়া মলিন হন, এবং বর্ত্তমান অবস্থার অনেক দোষ ও অনেক অভাব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এখন এই সময় ত্রয়ের অবস্থা একবার একে একে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো
বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য লোকস্য রাজানামসৃৎপ্রভুঃ॥"
(মনু ৭ম, অঃ ৩ শ্লোক।)

হিন্দুর রাজা ভগবানের সৃষ্ট, সামাজিক শক্তি হইতে এ রাজশক্তি জন্মে নাই; যে ঈশ্বর চতুর্ব্বর্ণের সৃজনকর্ত্তা, তিনিই এই সামাজিক শক্তির এক প্রধান বর্ণের সৃজন করিলেন। এই রাজা যেরূপ উপকরণে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মানব ধর্ম্মসংহিতা-কর্ত্তা বলিতেছেন:—

"ইন্দ্রানিল যমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যোনির্ম্মিতো-
নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা।
(মনু অঃ ৭ম, শ্লোক ৪।৫)

ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, তপন, মৃত্যু এবং কুবেরের সার ভাগ গ্রহণ করিয়া ভগবান রাজাকে সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার তেজে সমুদয় ভূতই অভিভূত হয়। আজি কালি, আমরা পৌরাণিক লেখকদিগের অনেক কথার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দেই যে, লেখক নিজে সেরূপ ব্যাখ্যা কোন দিন স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। হয়ত কেহ উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন যে, রাজপ্রভাবের স্বভাব বুঝাইবার নিমিত্ত এইরূপ অলঙ্কারময় ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে রাজাকে তাঁহারা মানবীয় উপাদানে সৃষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন। ৮ম শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি করিলে আর এরূপ মীমাংসায় সায় দেওয়া যায় না।:—

"বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি। ৮।
(মনু সপ্তম অঃ।)

রাজা মানুষ, এ কথা মনে করিলেই রাজাকে অবমাননা করা হয়। রাজা নিতান্ত বালক হইলেও তাহাকে মানুষ মনে করিয়া অবমাননা যেন না করা হয়। এইরূপ উপদেশান্তে সংহিতা-কর্ত্তা বলিতেছেন, রাজা মহতী দেবতা, নররূপে এই পৃথিবীতে অবস্থিত। এই ত গেল রাজশক্তি সম্বন্ধে সেই সময়ের ধারণা। এক্ষণে রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে কি উপদেশ আছে, তাহা আমাদের একবার দেখা আবশ্যক।

"তস্মাদ্ধর্ম্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্য নিষ্টেষু তং ধর্ম্মং ন বিচা-
লয়েৎ॥ ১৩

রাজা যে নিয়ম প্রচলিত করিবেন, তাহার দ্বারা ইষ্টই হউক আর অনিষ্টই হউক, কখনও সে নিয়মের অতিক্রম করিবে না।

ইয়ুরোপের রাজাও এক দিন ঈশ্বর কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইতেন (god's annointed.) য়িহুদীরা ঈশ্বরের বিশেষানুগৃহীত ব্যক্তিকে

রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের রাজাকে চিরদিনই মানবীয় উপাদানে গঠিত মনে করিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে রাজশক্তি সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; রাজার শক্তি এক্ষণে প্রজাপ্রদত্ত শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। তিনি প্রজার নিকট নিকাশের জন্য পর্য্যন্ত দায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। হিসাব কিতাবে কাযে কর্ম্মে রীতিবিরুদ্ধ কিছু দেখিলে, তাঁহার কৈফিয়ত তলব করা যাইতে পারে। সুতরাং সেই আর্য্য সময়ের অমানুষীয় উপকরণে গঠিত নররূপী দেব ক্রমে পরিবর্ত্তনের স্রোতের মধ্য দিয়া আসিয়া সমাজের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া পড়িয়াছেন। এখন আবার এই কর্ম্মচারীরূপী রাজশক্তিকে দেবরূপী প্রস্তুত করিয়া তোলা তত সহজ নয়। অতীত কালের অদৃষ্ট অবস্থাকে কল্পনা অনেক সময়ই উজ্জ্বল রঙ্গে চিত্রিত করিয়া থাকে, গত অবস্থা স্মরণ করাইয়া স্মৃতি অনেক সময়ই অনর্থক আমাদিগকে কাঁদায়, কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখুন, আমরা সে অবস্থায়ও এইরূপ কষ্টভোগ করিয়াছি কি না। পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতি সম্মান দেখায় না, এরূপ জাতি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা এই সংসার-সৈকতে নিজদিগের চরণচিহ্ন সহ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করি, কাজেই তাঁহাদের সময়ের অবস্থাকেও আমরা ভাল বলিয়া কল্পনা করিয়া লই। সময়ের পরিবর্ত্তনে, রুচির পরিবর্ত্তনে, সামাজিক অবস্থার যে বিষম পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং পূর্ব্বের রীতিনীতি যে আজ আর সমাজ পরিচালনে সক্ষম নয়; একথা অতি অল্প লোকেই মুখে স্বীকার করিয়া থাকেন। হিন্দুপ্রচারক হিন্দুর রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতির ব্যাখ্যা করিয়া গর্ব্বিত বচনে আবার সমাজকে সেই সমুদয় নীতি অনুসরণ করিতে বলেন। তাঁহাদের অন্তরে পূর্ব্বগামী আর্য্য মহর্ষিগণের প্রতি যে গাঢ় ভক্তিরাশি বিরাজ করিতেছে, তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেই; কিন্তু আমরা একথা না বলিয়া আর থাকিতে পারি না যে, এক্ষণে এ গাড়ীর চাকা আর পশ্চাতে নেওয়া যায় না। মুখে যিনিই যাহা বলুন না কেন; আজ দেব-শক্তিধারী, অজ্ঞাতাভিপ্রায় রাজার শাসন অবিতর্কিত রূপে শিরোধার্য্য করিতে কেহই স্বীকৃত হইবেন না।

এক্ষণে সমাজ উন্নতই হউক, আর অবনতই হউক, পৌরাণিক সময়ে যাহা ছিল, তাহা আর নাই; ভিন্ন ভিন্ন রূপ সমাজ-সংসর্গে, আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং বিবেচনা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নূতন অবস্থায়, নূতনপ্রকারের ব্যবস্থার প্রয়োজন। তবে সেই ব্যবস্থা কোন্ দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইবেক,—হিন্দু সমাজ যাহাতে যাইয়া পৌরাণিক আর্য্য সমাজে শীঘ্র পরিণত হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিতে হইবেক, না ক্রমে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন বলে, যখন সেরূপ অবস্থা পরিগ্রহ করা উচিত, সেই রূপ অবস্থানুযায়ী কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারে, এই রূপ শক্তির উপযোগীতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবেক? আমারা বলিব, পূর্ব্বকীর্ত্তি জাতীয় গৌরবের পতাকা, ইহাকে উচ্চে প্রথিত করিতে চাও, কর; অবগুণ্ঠন এবং

ম্রিয়মান সৈনিক যখন সেই পতাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, যখন অন্য জাতির পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তির সহিত তাহার পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তি কলাপ তুলনা করিবে, তখন তাহার অবসন্ন দেহে বল সঞ্চারিত হইবে,—সে উত্তেজিত হইয়া জীবনের যুদ্ধে অগ্রসর হইবেক। আমি এ পবিত্র স্মৃতি-ধ্বজা উড়াইয়া ফেলিতে বলি না, কিন্তু আবার লক্ষ্য বিমুক্ত করিতেও চাহি না।

হিন্দুরাজগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনানুরোধে যে নীতি অবলম্বন করিয়া শাসন করিতেন, সে নীতি মুসলমান শাসন নীতি অপেক্ষা সঙ্কীর্ণ ছিল। ইংরেজাধিকারের বর্ত্তমান শাসন নীতির সহিত যে তাহার তুলনাই চলে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে শাসন প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে যে কোন প্রকার কলঙ্ক নাই এবং তাহাই আদর্শ শাসন প্রণালী, একথা আমরা বলি না। ইহার মধ্যে যে অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন, তাহা আমরা বিশেষ-রূপ জানি। কিন্তু সমাজকে পূর্ব্বাবস্থায় নেওয়া সেইরূপ পরিবর্ত্তনের লক্ষ্য হইতে পারে না। আমরা যে অবস্থায় আছি, সে অবস্থা আমাদের পূর্ব্বাবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ; শ্রেষ্ঠ অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া নিকৃষ্ট-তর অবস্থায় কেহ যাইতে চাহে না, উৎকৃষ্ট-তর অবস্থার আকাঙ্ক্ষা করাই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমরা সামাজিক উন্নতির বীজ দেখিতে পাই। একথায় স্বদেশ-প্রিয় অনেকের নিকটই তিরস্কৃত হইব বোধ হয়, কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে লিখিতে হইতেছে, স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মুসলমানের অভ্যুদয় ক্ষণকালের নিমিত্ত দেশে জ্ঞানের স্বাধীনতা প্রতিরোধ করিয়া সমাজকে উৎক্লেশিত করিয়াছে সত্য; কিন্তু আবার পক্ষান্তরে সেই বিষম ভেদময় আর্য্য সমাজে সাম্য বিস্তারের সূত্রপাতও আবার মুসলমানের সময়ই আরম্ভ হইয়াছে। ইংরেজ শাসন সময়ে সেই সাম্যের ভাব এত বহুল বিস্তৃত হইয়াছে যে, জেতা এবং জিতের মধ্যে সামান্য প্রভেদ সহ্য করিতেও কেহ আর প্রস্তুত নয়। তপোবনের নিভৃত কুটীর পূর্ব্বে জ্ঞানের বসতিভূমি ছিল, এক্ষণে তাহাকে সামান্য গৃহস্থের কুটীরেও দেখিতে পাই এবং ক্রমে যে নিম্ন হইতে নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ দেখিব, এ আশা-কেও আমরা দুরশা বলিয়া মনে করি না।

হিন্দুর রাজত্ব সময়ে হিন্দুর রাজনীতি অত্যন্ত অসাম্যময় ছিল, এ কথা আমরা বলি-য়াছি, এক্ষণে তাহা আমাদের পক্ষে প্রমাণ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে আর্য্য সময়ে আমরা চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ প্রধানতঃ দেখিতে পাই; এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্যবসা-য়ের সমতা ছিল না, এ কথা সকলেই জানেন। অসমতা যে বর্ণগত লোকদিগের ইচ্ছানুসারে রক্ষিত হইত, তাহা নহে, শাস্ত্রের আদেশে আইনের শাসনে রক্ষিত হইত, যথা—

"দশস্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥
ত্রিষুবর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণোব্রজেৎ॥

মনু অষ্টম অঃ, ১২৪ শ্লোকঃ।

স্বায়ম্ভুব মনু শারীরিক দণ্ডের দশ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই শারীরিক দণ্ডসংহিতা-কর্ত্তা কেবল ক্ষত্রিয়াদি ভিন্ন বর্ণের প্রতি ব্যবস্থা করিলেন, ব্রাহ্মণ তুল্যাপরাধে অথবা একই অপরাধে অপরাধী

হইলেও তাঁহাকে অক্ষত শরীরে যাইতে দিতে হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহাতে অসাম্যের কোন কথাই নাই; মুর্খের প্রতি যে দণ্ড প্রয়োগে কেবল সামান্য মাত্র ক্লেশ প্রদান করা হয়, এক জন জ্ঞানী এবং সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতি সেরূপ দণ্ড প্রয়োগ করিলে মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এবং গুরুতর দণ্ড প্রয়োগ করা হয়, সুতরাং বাহ্যিক ফল দৃষ্টে দণ্ডের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচার করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দুই জন অপরাধীর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ডে তুল্যরূপ ফল এবং অপরাধীরও তুল্য মানসিক কষ্ট জন্মিতে পারে; অতএব উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে অসাম্য প্রমাণ হয় না, বর সাম্যনীতিই সমধিক রূপে রক্ষিত হইয়াছে। আমরা এরূপ তর্কের ভুল সহজেই দেখাইতে পারি, কিন্তু যখন ভূরি ভূরি অসমতার প্রমাণ স্পষ্টত পড়িয়া আছে, তখন বাকবিতণ্ডায় অনর্থক সময় ক্ষয়ে ফল নাই। আমরা পাঠকবর্গের বিচারার্থ ৪র্থ অধ্যায়ের অশীতিতম শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

ন শূদ্রায় মতিংদদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিস্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥

এই শ্লোকে শূদ্রকে জ্ঞানদান, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান এবং ব্রতাচরণ করার আদেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। একথার মধ্যে ত আমরা কোন ক্রমেই উচ্চনীতির কোন চিহ্ন দেখিতে পাই না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, পৌরাণিক ভারতে জ্ঞান ব্রাহ্মণে, বলবীর্য্য ক্ষত্রিয়ে, ব্যবসায় বুদ্ধি বৈশ্যে এবং সেবাধিকার শূদ্রে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। শক্তির যথেচ্ছা বিকাশের স্বাধীনতা কখনও প্রদত্ত হইত না। তখন কোন কারণে কেহ যদি এই সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুরুতর রাজ-শাসন ভোগ করিতে হইত। রামচন্দ্রের ন্যায় রাজা পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শূদ্রতপস্বীর শিরশ্ছেদ করিতে বাধ্য হইলেন। সে শূদ্র হইয়া তপস্যাচরণের উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিল, এই তাহার প্রাণদণ্ডের উপযোগী অপরাধ! ইহাপেক্ষা একদেশদর্শী নীতি আর কি হইতে পারে? প্রধানবর্ণের প্রাধান্য চিরদিনের তরে স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদয়ই আর্য্যনীতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীগত প্রাধান্যই পৌরাণিক ভারতের উন্নতির প্রধান কারণ এবং এই শ্রেণীগত প্রাধান্যই আবার মধ্য ভারতের অধঃপতনের কারণ। অসাম্য হইতে জাতির অভ্যুদয় হইতে পারে না। শ্রেণী বিশেষের প্রাধান্য অল্প কালের নিমিত্ত স্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী হওয়া বড় অসম্ভব। আর্য্যগণ যত দিন পর্যন্ত নিজদিগের চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে পরস্পরের প্রাধান্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তত দিন তাঁহাদের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু যখন নিয়মিত যোদ্ধাজাতি অপেক্ষা অধিক তেজশালী এবং অধিক সংখ্যক শত্রু আসিয়া দেশবৈরী রূপে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন একমাত্র গৃহ-বিচ্ছেদ-বিভিন্ন, আত্মকলহ-ক্ষীণ-সমষ্টি ক্ষত্রিয়দের বাহুবলের উপর ভারতের অদৃষ্ট লিপি নির্ভর করিল। সেই বিষম বিকল্প সময়ে অপর তিন বর্ণ সময়ের উপযোগী কোন সাহায্য করিতেই সক্ষম হইল না। পরে যাহা ঘটিল, তাহা

সকল ইতিহাস পাঠকই বিশেষরূপে অবগত আছেন। যে ভেদময়ী অসাম্য পূর্ণ নীতি হইতে এরূপ ফল প্রসূত হইয়াছে, আমরা কখনই সে নীতিকে আদর্শ করিয়া অনুসরণ করিতে পারি না।

আর্য্যদিগের শাসন সময়ে অনেক গুলি উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে দেশ শাসিত হইত, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আর্য্য সময়ের গ্রাম্য-সমিতি এখনও সভ্য জগতে কতক পরিমাণে আদর্শ স্থান অধিকার করে। আর আর্য্য শাসনকর্ত্তৃগণ বিচার বিক্রয় করাকে পরম অধর্ম্ম মনে করিতেন। এ কালের ন্যায় সে কালে ৫ টাকার দাবির নিমিত্ত ২০ টাকা ব্যয় করিয়া ১৫ টাকা ডিক্রী পাইতে হইত না। যাহা হউক, সে সমুদায় আমরা যথা স্থানে আলোচনা করিব। আমরা পাঠকগণকে এই পর্য্যন্ত বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আর্য্য সময়ের রাজনীতি ভেদময়ী ও অসাম্য-পূর্ণ—সুতরাং সে নীতি কখনও আদর্শ নীতি নহে। আমরা পরের প্রবন্ধে মুসলমান নীতি, এবং ইংরেজ নীতি আলোচনা করিব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত॥

পুরাতন।

নূতনের চমক অধিক। পুরাতন ধীর, স্থির, গম্ভীর, সৌন্দর্য্যময়। সৃষ্টির দুইটী রহস্য, নূতন ও পুরাতন। নূতন উদ্ভাসিত, পুরাতন নিগূঢ়। নূতন লইয়া সকলে ব্যস্ত, পুরাতনের পক্ষপাতী অল্প লোক। ভাসা ভাসা যাহা, তাহা সহজ-লভ্য—সকলে পায়। নিগূঢ় যাহা—গভীর আঁধারে ঢাকা যাহা—শত শত প্রস্তর স্তর উদ্ভেদ করিয়া যাহা পাইতে হয়, তাহাতে আমোদী লোকের সংখ্যা জগতে কম। এই জন্য পুরাতনের কথা তুলিতে মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়।

কিন্তু নূতন লইয়াই পুরাতন গড়া। বিন্দু বিন্দু নূতন পুঞ্জীকৃত হইয়া পুরাতন সৃষ্ট হইয়াছে। পলে পলে তিলে তিলে নূতন পুরাতনে সমাহিত হইতেছে। নূতন ক্ষণবিধ্বংসী, সান্ত, বর্ত্তমান-জীবী। পুরাতন চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত, বিশ্বাদ্য, বিশ্ব-বীজ।

ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে বোধ হয়, নূতন আছে বলিয়া পুরাতন হইয়াছে। একি সত্য কথা? সর্ব্বদা নূতন পুরাতনে গড়াইয়া পড়িতেছে। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে নূতনেরই আধিপত্য অধিক। আবার আজ যাহা পুরাতন, কাল তাহা নূতন ছিল। আবার নূতন গুলিই পলে পলে তিলে তিলে পুরাতন হইয়া যাইতেছে। নূতন দিয়া পুরাতনের সর্ব্ব-শরীর গঠিত। ইহা দেখিয়া আপাততঃ এই ভ্রম হইতে পারে যে, নূতনই পুরাতনের ভিত্তি। কিন্তু একথা বলাও যাহা, এই বিচিত্র বিশাল সুন্দর সৃষ্টি নির্জ্জীব, মৃত-শূন্য হইতে সৃষ্ট, ইহা বলাও তাহাই। চক্ষের প্রতিনিমিষের উপরে যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, তাহাই নূতনত্ব। যে মুহূর্ত্তে কোন ঘটনার প্রকাশ, তাহার নূতনত্ব সেই মুহূর্ত্তের আরম্ভ ভাগ টুকু পর্য্যন্ত

ব্যাপিয়া থাকে, শেষভাগে মহাপ্রলয়ে বিলীন হইয়া যায়। নূতনের আদি আছে, অন্ত আছে। পুরাতনের "অন্ত নাই" একথাটী যত সহজ-বোধা, "আদি নাই" একথাটী তত সহজ নয়।

কাল যত যাইতেছে, পুরাতন আরও পুরাতন হইতেছে। অনন্ত কালের তুলনায় পুরাতনের প্রাচীনত্ব অনন্ত গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। কিন্তু পুরাতন যে প্রথমেই বা সর্ব্বাদিতেই পুরাতন ছিল, একথা কে সহজে বিশ্বাস করিবে? পুরাতন ও নূতনের মধ্যে কে জনক, কে সন্তান, ঠিক করা সহজ নহে। আমরা বলি, সৃষ্টি একথার অর্থই নূতনত্ব—নূতনই সৃষ্ট। সৃষ্টির অভিপ্রায় নূতনত্বেরই ক্রমোবিকাশ। নূতনত্বের পূর্ণাভাব অথচ সৃষ্টি সমাধা হইল, এ ত বাতুলের কথা। কিন্তু সৃষ্টির বীজ পুরাতন—বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ পুরাতন। যে মহাবীজ হইতে এই বিশ্ব প্রকাশিত, তিনি অনাদি, অসৃষ্ট, পুরাতন পুরুষ; ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। যিনি জড়বাদী, তিনিও অনাদি অসৃষ্ট জড় পরমাণু বা অন্ধ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। যিনি দ্বৈতবাদী, তিনিও নির্ম্মাতা এবং উপাদান কারণের অসৃষ্টত্ব এবং আদিমত্ব স্বীকার করেন। যিনি একেশ্বর পরায়ণ তিনি বলেন, আদি এবং অন্তের অতীত, পুরাতনের পুরাতন, পিতামহের পিতামহ, বিশ্বাদ্য বিশ্ববীজ হইতে এই আনন্দঘন বিচিত্র সৃষ্টিচক্র ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত। আজ পর্য্যন্ত কেহই বলেন নাই—বলিতে পারেন নাই, এই সুবিশাল বিশ্ব মৃত আকাশ হইতে সমদ্ভূত। বলিলেও, আকাশেরই আদিমত্ব ও অসৃষ্টত্ব স্বীকার করিতে হয়। বিকারে সৃষ্টি বা নূতনত্ব। বিকারের জন্য নির্ব্বিকারের প্রয়োজন অলঙ্ঘনীয়! সৃষ্টির বীজ চাই, নূতনত্বের পুরাতন চাই—ভিত্তি চাই। আগে পুরাতন, পরে নূতন। একটী বীজ, অপর বৃক্ষ বা ফল।

বিকার সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার ভাল নয়। ভাল নয় এই জন্য যে, আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের নিগূঢ় অর্থ বুঝি না। সতের বিকারও যে সৎ, এ ধারণা আমাদের নাই। আমরা আশৈশব বার্দ্ধক্য মায়াবাদীর নিকট মায়ার কথা—ছায়ার কাহিনী—মিথ্যার সংবাদ—অসারের ইতিহাস শুনিয়া থাকি। কিন্তু মায়াবাদীরা প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতবাদী। কারণ তাঁহাদের বিদ্যা এবং অবিদ্যা আছে—মায়া এবং ব্রহ্ম আছেন—অসৎ এবং সৎ আছেন এবং পরমাণুবাদী নৈয়ায়িকেরও সৎ ও অসতের জ্ঞান আছে। জড়বাদীর চক্ষে সৎ অতি হীনাবস্থ—অন্ধ, কিন্তু অসৎই জাগ্রত এবং পরাক্রান্ত। অদ্বৈতবাদী আদিতে সৎ ছাড়া আর কিছুই মানেন না—জানেনও না। সুতরাং অন্তেও তিনি সৎ ছাড়া কিছুই মানিতে পারেন না। কারণ সতের বিকারেও সৎই উৎপন্ন হইবে। সৎ মৌলিক। মূল ধাতুকে অমিশ্র ও মৌলিকাবস্থায় রাখিয়া, গঠনাদি প্রণালী দ্বারা, যত পার বিভিন্নাবস্থ কর, উৎপন্ন সকল সমমৌলিক ও সুন্দর হইবে। তদ্রূপ যিনি আদৌ সৎছাড়া অসৎ মানেন না, জানেন না, তাঁহার মতে অমিশ্র সতের বিকারে অসতের উৎপত্তি অসম্ভবপর। মূল সদ্বস্তুকে যতই বিভিন্নাবস্থ করনা, উৎপন্ন, সদ্ভিন্ন আর কি হইবে?

শক্তিরূপে ব্রহ্ম নিগুর্ণ। আনন্দ ঘনরূপে তিনি ক্রিয়াবান ও অবস্থান্তরিত। দৃষ্টান্ত

স্থলে বলা যাইতে পারে, শক্তি-বীজ ইচ্ছা আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা নিদ্রিত আছে। নিদ্রিতাবস্থায় তাহার কোনই গুণ অনুভব করি না। কিন্তু ভাবযোগে তাহা জাগ্রত হইলে আমরা ক্রিয়াবান ও অবস্থান্তরিত হই। সেই আদিম পুরাতন শক্তি স্বরূপ পরব্রহ্মই আনন্দ-ঘন রূপে লীলাময় হইয়া বিশ্ববীজরূপ ধারণ করিয়াছেন। সেই পুরাতন পুরুষ হইতেই সমস্ত সৃষ্টি বা নূতনত্বের উদ্ভব। পুরাতনই সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ। পুরাতনই সকল আনন্দ ও আরামের আকর। আমরা পুরাতনেরই পূজক। . .

ঐ শোন, পূর্ব্বস্মৃতির মধ্যে পুরাতন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শোক——জীবনের আলো, আঁধার সকলই সমভাবে কেমন মনোহর প্রলোভনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমৃতময় সঙ্গীত গাইতেছে। ঐ গানের স্রোত কেমন অনন্তকাল স্থায়ী, কেমন অসীম শান্তি সুখ-প্রদ! এই যে প্রভাতে আকাশের নীলিমায় মিশিয়া পাপিয়া গাইতেছিল, গাইতে গাইতে সে যেন কোথায় গেল, তাহার গান যেন আকাশবাণীর ন্যায় আকাশে ডুবিয়া গেল, কিন্তু এই দেখ, এখনও সেই পাখী, সেই গান, সেই নীলিমা-ভরা অনন্ত আকাশ লইয়া প্রাণ জাগিয়া আছে! এই যে জাগিয়াছে, আর কি ঘুমাইবে? এইত পরকাল— এইত ইহকালের পরপার! ঐ দেখ, সেই মৃত বন্ধু, মৃত আত্মীয় এ দেশে অনন্ত জীবন লাভ করিয়া কেমন অখণ্ড আনন্দ বৰ্দ্ধন করিতেছেন! এই দেখ, তোমার বাহিরের নিদ্রিত, মৃত শৈশব, যৌবন—জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তগুলি এখানে কেমন আনন্দে জাগিয়া আনন্দে নাচিতে ও গাইতেছে! প্রভাতের আলো, বসন্তের ফুল, বর্ষার মেঘ, যাহা কিছু তোমার চক্ষুর উপর দিয়া এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, দেখ, তাহা আবার এ রাজ্যে জাগরিত। দেখ, পুরাতনে কেমন অনন্ত-কালস্থায়ী নবজীবন, নব আনন্দরাশি উৎসারিত! তাই বলি, এই যে পুরাতন বৎসরটী যাইতেছে——আমাদের জীবনের কত পাপ, তাপ, শোক, দুঃখ, আনন্দ, সুখ, শান্তি, আরাম, আশা, ভরসা, নিরাশা, আঁধার, আলোক ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে, এস আমরা সকলে মিলিয়া এই শেষ সময়ে তাহাকে অভিবাদন করি। কেহ মনে করিও না, পুরাতন বৎসর চলিয়া যায়। বস্তুত যত দিন যায়, বৎসর যায়, ততই উহা নিকটবর্ত্তী হয়। এই বর্ত্তমানে যদি উন্নতি চাও, আশা চাও, ভরসা চাও, ঐ ভবিষ্যৎ যদি আলোকিত করিতে চাও, তবে এই পুরাতন বৎসরটীকে ভুলিও না। যাঁহারা গত জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত লইয়া মাণিকহার গাঁথিয়া গলায় পরিতে পারেন, তাঁহারাই পৃথিবীর ভূষণ এবং সৃষ্টির আলোক হন। কোথায় পতন, কোথায় উত্থান, তৎসমস্তই এই গত জীবনের ইতিহাস-মধ্যে অঙ্কিত। আলোক নিবাইয়া ভীষণ আঁধার-কন্টক-বনে ভ্রমণ করাও অসাধ্য নয়, কিন্তু গত জীবন ভুলিয়া আগামী জীবনে উন্নতির সোপান অতিক্রম করা নিতান্তই অসাধ্য সাধন। আত্মচিন্তা, আত্মদৃষ্টি যাহা বলি না, সকলই গতজীবনের ইতিহাস সমালোচনায় নিহিত।

আমাদের মধ্যে যিনি গত বৎসর ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান বৎসরে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। যিনি বর্ত্তমান বৎসর ভুলিবেন, তিনিই আগামী বৎসরে প্রবঞ্চিত হইবেন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রেমান্তে।

(সঙ্গীত।)

১

বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সে আমার—আছে গো কেমন ?
এখনো তার ঠোঁটে হাসি ফোটে কি তেমন ?
এখনো কি আঁখি তুলে
চারি-দিকে চায় ভুলে ?
সমুখে কি ভাসে তার সুখের স্বপন ?
—সুখে থাক্, তাই চাই,
আমি মরি ক্ষতি নাই,
হ'য়ে গেছে যা হবার—কপাল লিখন !

২

ঝিঁঝিট,—কাওয়ালী।

দেখাবার হ'তো যদি প্রাণ,
পিরীতি হ'তো না আজি কবির স্বপন গান !
দেখাতাম বুক চিরে,
দেখিতাম, রমণি রে !
কুহেলিকা, মরীচিকা পিরীতে পেতোনা স্থান !

৩

মিশ্র পিলু,—কাওয়ালি।

যা কিছু আসিত প্রাণে—সুখ, দুখ, গান—
তারে না জানাতে পেলে (হ'তো) আকুল
পরাণ।

যাতনায় প্রাণ যায়,
নীরবে বাইতে চায়—
এখন জানাতে তায়, আসে অভিমান।

৪

মিশ্র বেলোয়ার,—যৎ।

দেখিলে আসিত ছুটে, এখন পলায়ে যায় ।
না দেখিয়া গরবিনী প্রেম কি ভুলিতে চায় !
প্রেম কি আঁখির মেলা ?
চকিত বিজলী-খেলা ?
সে যে প্রলয়ের নিশি ঘেরে আছে সমুদায় !

৫

সিন্ধু-কাফি,—কাওয়ালী।

দেখা হ'লো তার সনে, দেখা হ'লো কেনরে !
হৃদয়ের জানাজানি আর নাহি যেন রে !
মুখে নাহি কোন কথা,
সেই ব্যথা, ব্যাকুলতা,
সুধু, গরবেতে ঢাকাঢাকি চোখে চোখে
যেন রে !

৬

বেহাগ,—কাওয়ালি।

এই কি প্রেমের শেষ—যে প্রেম গত ?—
চোখে চোখে দেখা হলে অমনি নয়ন নত !
শরমে মরমে মরা, পলাই পলাই !
কত কাজে ব্যস্ত যেন, অবসর নাই !
গরবে বুঝাতে চাই,
সে সব ঘুচেছে ছাই,
আর ছেলে খেলা নাই, হ'য়েছি মানুষ মত !

৭

ললিত,—যৎ।

শুনিলে আমার নাম রোষে জ্বলে যায়—
এখনো কি আছে ক্ষত, তাই ব্যথা পায়?
এখনো কি জুড়ে হিয়ে
রোষের প্রলেপ দিয়ে?
শুনিবে উদাস হ'য়ে কবে তবে, হায়!

৮

সিন্ধু-কাফি,—কাওয়ালি।

কি দোষ ক'রেছি, হায়,
ভালবাসিয়ে তাহায়!
সকলে চাহিয়া যায়,
আমিই চাহিলে তায়—
কেন হয় মুখ রাঙা, গুণ্ঠনে লুকায়?
সবারে যে চোখে দেখে,
যেন—সেন দূরে থেকে,
আমারে কেন সে-চোখে দেখিতে না চায়!

৯

যোগিয়া-বিভাষ,—আড়া।

সে দিন যেত কেমনে?
ভাল আর পড়ে না মনে!
গেছে যেন কত মাস,
পড়িয়াছি উপন্যাস,
এর এটি ওর সেটি, আসে না স্মরণে!
ছাড়া-ছাড়া স্বপ্ন মত,
আছে কথা গোটা কত;
এ ল'য়ে যে দিন যেত,—বিস্মিত আপনে!

১০

খট,—যৎ।

যে প্রেম গিয়াছে দূরে, কাজ নাই তুলে আর
সে যে শুষ্ক ফুল-মালা, অকাল-মরণ-হার!
ইন্দ্রধনু নহে তাহা,
সে যে মারাত্মক হাহা!
প্রেম নয়—স্মৃতি-জ্বালা, নিন্দা, ঘৃণা, অত্যাচার!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

জীবনবৃত্ত লেখকদিগের দৌরাত্ম্য।

মাঘ মাসের "নব্যভারতে" শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ৺অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্ম বিষয়ক মত সম্বন্ধে এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে এক স্থানে আমার উপর বিশেষ কটাক্ষ করিয়াছেন। "তাঁহাকে (অক্ষয় বাবুকে) অজ্ঞতাবাদী বলিলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় করেন, বলা হয়। রাজ নারায়ণ বাবু এমন কথা কেন বলিলেন, জনসাধারণ তাহা বুঝিয়া দেখিবেন।" বিদ্যানিধি মহাশয় "অজ্ঞতাবাদ" অথবা বিশুদ্ধ রূপে বলিতে গেলে "অজ্ঞেয়তাবাদ" (Agnosticism) শব্দে কি বুঝায় তাহা জানেন না। অজ্ঞেয়তাবাদী তাঁহাকে বলা যায়, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন কিন্তু তাঁহার শক্তি, করুণা প্রভৃতি কোন গুণ আছে এরূপ বিশ্বাস করেন না। যথা হিউম, হার্বট স্পেন্সর প্রভৃতি। অক্ষয় বাবুকে এগনষ্টিক্ আমি এই অর্থে বলিয়াছি। অক্ষয় বাবু যে এই রূপ সংশয়বাদী ছিলেন, তাঁহার

প্রণীত উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ হইতে বিদ্যানিধি নিজেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন, আমার এ বিষয়ে আর অধিক আয়াস পাইতে হইবে না। তিনি বলেন যে, উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগে তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। উল্লিখিত প্রথম ভাগেও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

"বিশ্বকারণ যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বরূপ, এই অসংশয়িত ও অখণ্ডনীয় তত্ত্বটি উল্লিখিত রূপ বহুতর উপনিষদ্ বচনে একরূপ সূচিত ও নির্দ্দেশিত রহিয়াছে।" উপক্রমণিকা, ১০১ পৃষ্ঠা। "উপনিষৎ-প্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত রূপ অনেকানেক বচনে পরমার্থ চিন্তনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে বুঝি কেবল এই অনুক্ত দুইটী কথা সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। (১) যাঁহারা এই অদ্ভুত জগতের অদ্ভুত কারণের অদ্ভুত স্বরূপ * নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাতে কল্পিত গুণ ও কল্পিত স্বরূপ আরোপ করেন; তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানান্ধ। (২)—যাঁহারা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্বকারণকে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত রূপ অপ্রকৃত বাদী। বস্তুত. বিশ্বকারণের জ্ঞানানুসন্ধান বিষয়ে যিনি যত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করুন না কেন, তদীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে ততই দূরস্থ হইতে থাকে।" ঐ ঐ

এখানে বলা কর্ত্তব্য অক্ষয় বাবু উপনিষদের যেরূপ "অদ্ভুত" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার অন্যতর ব্যাখ্যা আছে।

অক্ষয় বাবু ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিবার পর একেবারে নাস্তিক হইয়াছিলেন. এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, অজ্ঞেয়তাবাদ নাস্তিকতার কাছাকাছি। এক ডিগ্রী কম মাত্র। নাস্তিকতা যদি উনপঞ্চাশ হয়, তাহা হইলে অজ্ঞেয়তাবাদ আটচল্লিশ। আমাদিগের সকল জ্ঞান বস্তুর গুণের জ্ঞান। বস্তুর স্বরূপ আমরা কিছুই জানিতে পারি না। ঈশ্বরের কোন গুণ আছে উহা যদি না বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে মোটে ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যেমন প্রত্যেক পদার্থ কতক পরিমাণে জানা যায়, আর কতক পরিমাণে জানা যায় না, ঈশ্বরও সেইরূপ; তবে তিনি অন্য পদার্থ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অজ্ঞেয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ ও অতি প্রিয় বন্ধুবর মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের সহস্রগুণ ছিল। তিনি সে বিষয়ে অনুকরণস্থল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটী দোষ ছিল। তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী হইয়াও, ব্রাহ্মসমাজ হইতে পীড়া নিবন্ধন অবসৃত হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি জন্য উক্ত সমাজে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সকল অনুষ্ঠানের সম্যক গৌরব তিনি একচেটিয়া করিতে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন। একজন অজ্ঞেয়তাবাদী ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধনের গৌরব লইবার জন্য কেন এত লোলুপ ছিলেন, বুঝিতে পারি না। অক্ষয় বাবু ধর্ম্ম বিষয়ে লিখিবার সময় যেমন 'অদ্ভুত শব্দ' প্রয়োগ করিতে

* যিনি এরূপ লিখিতে পারেন, তিনি, অন্যান্য বিষয় না হউক, ধর্ম্ম বিষয়ে যে নিজে একটী অদ্ভুত জীব হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা ইহা লিখিবার সময়ে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

ভালবাসিতেন, আমিও সেইরূপ এ ঘটনা সম্বন্ধে অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। অক্ষয় বাবুর উল্লিখিত আগ্রহাতিশয় দোষ থাকুক, কিন্তু ঈশ্বরের এক জন পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য তাঁহার আকিঞ্চন ছিল না। বিদ্যানিধি তাঁহাকে এক জন পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। অক্ষয় বাবু জীবিত থাকিলে তিনি তাঁহার জীবনীলেখকের এরূপ চেষ্টা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন, সন্দেহ নাই।

বিদ্যানিধি, অক্ষয়বাবুকে ঈশ্বরভক্ত প্রমাণ করিবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে যখন তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী ছিলেন না, তখনকার ভুরি ভুরি বাক্য তাঁহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি, আমার যে বক্তৃতার প্রথমে "কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন" এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা অক্ষয় বাবুর রচিত বলিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে এক জন পরম ভক্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা অতি কৌতুকজনক ব্যাপার। এই বক্তৃতা যে আমার রচিত, তাহা সকল লোকেই জানে। তাহা আমার বক্তৃতার প্রত্যেক সংস্করণে আছে। যে সময়ের বৃত্তান্ত বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, সে সময়ের লোকের বিষয় যিনি এত অল্প জানেন, তাঁহার সকল কথার যথার্থতা বিষয়ে পাঠক কিরূপে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন?

ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পরও অক্ষয় বাবুর যে ঈশ্বর ভক্তি ছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য, বিদ্যানিধি মহাশয়, কোন ব্যক্তির সহিত কথোপকথন-সময়ের তাঁহার যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি উপাসক সম্প্রদায়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য হইতে পারে। অক্ষয়বাবুর সংশয়-ভাব-সময়ে চারুপাঠের অনেক সংস্করণ বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে সকল প্রস্তাব আছে, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে থাকিবার কালে রচিত হইয়া তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। আর এক কথা বিবেচনা করিতে হইবে। সংশয়বাদী ও অজ্ঞেয়তাবাদিদিগের মানবজাতির প্রতি এতটুকু করুণা আছে যে, ছেলেদের জন্য যে সকল পুস্তক তাঁহারা রচনা করেন, তাহাতে ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাব থাকিতে দেন। অক্ষয় বাবু যে বহু কাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি বলিয়াছি, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বকাল সম্বন্ধে খাটে না। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে তাঁহার সংশয়ভাব ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পর এবং প্রথম ভাগ উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা লিখিবার (১৭৯১ শকের) পূর্ব্বে তাঁহার মনে উদিত হয়, কিন্তু উহার বীজ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। অক্ষয়বাবু কোনকালে বিশেষ ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন না। ইদানীন্তন এক অন্ধকেরে বিশ্ববীজ মাত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আর কিছুই ছিল না। অতএব আমি যে বলিয়াছি, তিনি মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক কথা।

বিদ্যানিধি, রামমোহন রায়ের প্রতি অক্ষয় বাবুর ভক্তি তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বিশ্বাসের এক প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বিখ্যাত মিলসাহেবের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল।

আমার প্রতি বিদ্যানিধি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা আমি ধরি না। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ, এমন কি, সমস্ত হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তিনি যেরূপ অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। তিনি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের একজন লেখকের কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে সিমলা গমনের অগ্রে যে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরস্বরূপ বিষয়ে সভ্যদিগের মতামত লইবার জন্য যে হাত তুলিবার প্রথা ছিল, সে বিষয়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিদ্যানিধি প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াছেন, ইহা অল্প ধৃষ্টতার কার্য্য নহে। যিনি এরূপ আচরণ করিতে সক্ষম, তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে কিরূপে তর্ক চলিতে পারে? প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কোন শিষ্য অক্ষয়বাবুর সহিত বালীতে সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি তখন অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই অবস্থাতে তাঁহার সহিত এক ঘণ্টাকাল কথা কহিলেন, বাগান দেখাইলেন, প্রস্তর শম্বুকাদি দেখাইলেন, কত প্রীতি ভালবাসা দেখাইয়া বলিলেন যে, "আমি আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারি না, কিন্তু তুমি নাকি অতি উচ্চ স্থান হইতে আসিয়াছ, মহর্ষির নিকট হইতে আসিয়াছ, তাই তোমার সহিত এত কথা কহিতে পারিতেছি, এত বেড়াইতে পারিতেছি। তোমাকে দেখিয়া আমার কত আনন্দ হইতেছে! যে পর্ব্বতে আমরা সকলে এক দিন ছিলাম, তুমি সেই উচ্চ ভূমি হইতে নামিয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ।" গুরু, মহর্ষির প্রতি এত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি একজন চেলার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

অক্ষয়বাবুর উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে তিনি যে সকল উপাসক সম্প্রদায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আর একটী নূতন সম্প্রদায় সংযুক্ত হইল। সে সম্প্রদায়ের নাম অক্ষয়োপাসক সম্প্রদায়। ইহা দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

সকলে অবগত আছেন যে, অক্ষয়বাবু আমার কিরূপ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার কোন দোষের বিষয় বলা আমার পক্ষে অতীব কষ্টকর, কিন্তু অন্ধ-উপাসক জীবনবৃত্ত-লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম, ইহাতে আমি অতিশয় পরিতাপিত আছি। (জীবনবৃত্তলেখক বলিয়া যে অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়া সেই জীবনবৃত্তের নায়ককে মনুষ্যের পূর্ণ আদর্শরূপে খাড়া করিতেই হইবে, এ কোন্ কথা?)

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(উপসংহার)

বিবাহ সম্বন্ধে মোটামুটী যে সকল কথা বলা প্রয়োজন, আমরা এক প্রকার তাহা বলিয়াছি। কিন্তু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং আমাদিগের দেশের শুশ্রুত-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র একরূপ স্থিররূপে নির্ণয় করিয়াছেন যে, রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। এদিকে মনু-সংহিতা নির্দ্ধারণ করিতেছেন যে, পুরুষের পাঠ সমাপ্ত না হইলে বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। মনুসংহিতা বালিকার সহিত যুবকের বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা যখন বিজ্ঞান-সম্মত নয়, তখন তাহা প্রতিপাল্য হইতে পারে না। এই জন্যই রক্ষণশীল দলের অন্যতর চিন্তাশীল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বালিকার বিবাহের বয়স ১০ হইতে ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।* যে কারণেই হউক, তাঁহার পূর্ব্বের মত কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "বিজ্ঞান যে সর্ব্বত্র ঠিক নয়, ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাইতেছি; তবে কেমন করিয়া বিজ্ঞানের কথা মানিব?" অথচ তিনি বালিকার বিবাহের বয়স, হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়ম উপেক্ষা করিয়া, দশ বৎসরের উপর তুলিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হয় যে, বিজ্ঞান সর্ব্বত্র ঠিক না হইলেও, একেবারে যে অঠিক, তাহা তিনিও মনে করেন না। সে যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় বয়স সম্বন্ধে সর্ব্বত্র একটা স্থির নির্দ্দিষ্ট নিয়মরাখা সম্ভব নয়। ধর্ম্মজ্ঞানউন্মেষ, চরিত্র-গঠন এবং স্বাস্থ্যোন্নতি—এ সকলের উপরই বিবাহ সম্বন্ধে অধিক পরিমাণে নির্ভর করা উচিত। দেশ, কাল, অবস্থা, এসকলকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে কোন ক্রমেই পাত্রপাত্রীর বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নয়। সেটা বালিকার পুতুল, পুতুল-বিয়ে-খেলার ন্যায়। ধর্ম্ম জ্ঞান উন্মেষের জন্য সমাজকে বিশেষ রূপ প্রস্তুত হইতে হইবে। না হইলে, পদে পদে অমঙ্গল ঘটিবে। এ সকল কথা আমরা বিস্তৃত রূপে আলোচনা করিয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞান কাহার কোন সময়ে হইবে, কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারে না। তবে দর্শন বিজ্ঞান ও মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যত দূর আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তাহাতে ইহা স্থিররূপে বলা যাইতে পারে, পুরুষের ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সাধারণত ধর্ম্ম-জ্ঞান জন্মে না। বালিকাদিগের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। তবে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে স্থানে স্থানে নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হয়। সকল অভিভাবকের বয়স্থা বালিকাকে গৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিবার তত সুবিধা নাই বলিয়া, স্থান বিশেষে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটা অপরিহার্য্য। একেবারে যে সুবিধা নাই, সে কথাও কিন্তু বলা যায় না। আমাদের দেশে কুলীন ব্রাহ্মণ-ঘরে অনেক অধিক বয়স্কা যুবতী বালিকা থাকে। কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। ধর্ম্ম জ্ঞান ও চরিত্র লাভ অতি আবশ্যকীয়। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে

---

* নবজীবন—কার্ত্তিক, ১২৯৪।

যে কার্য্য দ্বারা চরিত্রে দুর্নীতি ও অধর্ম্ম স্থান পাইবার সম্ভাবনা, তাহাতে কাজেই নিয়মের অন্যথা করিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে বালিকার বিবাহ দেওয়াও বাঞ্ছনীয়, যদি ধর্ম্ম ও চরিত্র রক্ষার আর উপায় না থাকে। বয়স বাড়িলেই যে সর্ব্বত্র ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে, তাহা নয়। বয়সের সঙ্গে সে রূপ শিক্ষা না দিলে সুফল ফলে না। যেখানে যে অবস্থায় সে রূপ শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব, সেখানে বয়স বাড়াইয়া বৃথা দুর্নীতি এবং অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এ সকল বিষয় বিশেষ সতর্কভাবে বিবেচনা করিয়া অভিভাবকগণ পাত্রপাত্রীর বয়স নির্দ্ধারণ করিবেন। ১৬ বৎসর বা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে, এরূপ নিয়ম করিলেই যে সমাজ ধর্ম্মনীতিতে ভূষিত হইবে, তাহা নয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহা দেখা যায় নাই।

তারপর কথা হইতেছে, অসম বয়স্ক পাত্রপাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়া উচিত কি না? আমাদের বিবেচনায়, তাহা একেবারেই উচিত নয়। কেবল জড়বিজ্ঞান, ও নীতিবিজ্ঞানের অনুরোধে নয়, অসম বিবাহে সমাজের ও পরিবারের নানাপ্রকার দুর্গতি ঘটে। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় নানা শাস্ত্র দ্বারা "প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অসম বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়। ১০ বৎসরের বালিকার সহিত ৩৫ বৎসরের যুবকের বিবাহে যেরূপ দাম্পত্য-প্রেমের ব্যাঘাত ঘটে, ২০ বৎসর বয়স্ক যুবতীর সহিত ৫০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের বিবাহেও তদ্রূপ ব্যাঘাত হয়।† অথচ দেখা যায়, সমাজে অবাধে এই অসম বিবাহ প্রথা চলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজেও বিপত্নীক বিবাহে স্থানেং এই বয়সের ঘোরতর বৈষম্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিরূপে ৩০ বৎসর অধিক বয়স্ক স্বামীর সহিত অপরিপক্কমন বালিকা স্ত্রীর গভীর প্রণয় জন্মিবে, তাহা আমরা কোন ক্রমেই কল্পনা করিতে পারি না। এই অসম বিবাহের দরুণই আমাদের দেশে অনেক বিধবা দুশ্চরিত্র হয়। সমাজের দুশ্চরিত্রতা নিবারণ করিতে হইলে, এই অসম বিবাহ সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করিতে হইবে।

অসম বিবাহে সমাজে যে পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে, একথা বুঝাইতে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে যে আমাদের দেশে স্বৈরিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। * তদ্ভিন্ন আর একটী কুফল ফলিতেছে। আমাদের দেশে কন্যার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। + সাধারণত স্বামীর বয়স স্ত্রী অপেক্ষা ২৫ বৎসর অধিক হইলে পুত্রের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইতে থাকে, এবং স্ত্রী পূর্ণাবস্থা (২৫বৎসর) প্রাপ্ত হইলে এবং স্বামী ৭৫ বৎসরের হইলে পুত্র অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে।"‡ আমাদের দেশে অসম বিবাহের দরুণ সাধারণত কন্যার সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, পাত্র মেলা ভার। অন্য দিকে এই অসম বিবাহের দরুণ বিধবার সংখ্যাও খুব বাড়িতেছে। রিপুর উত্তেজনাকে দমন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, সুতরাং দুর্নীতি যথেষ্ট প্রশ্রয় পাই-

† হিন্দুবিবাহ সমালোচন—প্রথম খণ্ড—৬৯ পৃষ্ঠা।

* Census Report, 1881. Vol. I.

+ Census Report Vol. I. P. 42.

‡ Hygiene & Public Health in Bengal By Dr. D. Bose. Vol. II. p. 145.

তেছে। এই দুর্নীতি নিবারণ করিতে হইলে অসম বিবাহকে একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে। আত্মসংযম জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য,ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ। ইহা যদি আমাদের দেশের বৃদ্ধ বিপত্নীকগণ জীবনে প্রতিপালন করিয়া আদর্শ দেখাইতে না পারেন, তবে কখনই আশা করা যাইতে পারে না যে, অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞানী বিধবারা তাহা পারিবে। এইজন্যও বিপত্নীক বিবাহের স্রোত থামাইতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। কেবল এজন্যও নয়। প্রকৃত বিবাহ মানুষের একবার ভিন্ন হওয়া উচিত কি না, ঈশ্বরের সে বিধান কি না, পরকাল-বিশ্বাসীর পক্ষে যে বিষয়ে গভীর সন্দেহ বিদ্যমান। ১৮৭২ সালের ৩ আইনে স্ত্রী জীবিত থাকিতে পুরুষের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু পরকালে স্ত্রী যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন আর রাজার আইন খাটে না, সুতরাং তখন অবাধে বিবাহ চলে। এটা অত্যন্ত অন্যায়। স্ত্রী ইহকালেই থাকুন, পরকালেই থাকুন, একাধিকবার বিবাহ করিলেই বহুবিবাহ হয়। বহুবিবাহের প্রতিরোধ করা একান্ত উচিত। অন্য দিকে অসমবিবাহের স্রোত প্রতিহত করিবার জন্যও এ কার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য। বিপত্নীকগণ অধিক বয়সের কন্যা পাইতে আশা করিতে পারেন না, সুতরাং বাধ্য হইয়া বালিকাদিগকে বিবাহ করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইতেছে বটে,কিন্তু বয়স্থা বিধবার পুনর্বিবাহ যে দুষিত, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজেও ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিপত্নীক যদি পুনঃ বিবাহ করেন, তবে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্ততঃ ২০ বৎসর ছোট যুবতীকে বিবাহ করিতে হইবে। ইহাতেও অসম বিবাহের নানা কুফল ফলিতে থাকিবে। বৃদ্ধ বিপত্নীক বা বৃদ্ধ বিধবার পক্ষে নানা কারণে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই শ্রেয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, স্ত্রীর চিতার আগুণ নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে কি ব্রাহ্মসমাজ,কি হিন্দুসমাজ, সর্ব্বত্রই অধিকাংশ বিপত্নীকগণ পুনর্বিবাহের জন্য পাত্রী অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ হওয়াতে, মানুষকে নিতান্ত রিপু-পরবশ বলিয়া মনে হয়। উপযুক্ত পুত্র কন্যা বর্ত্তমানেও পুত্র কন্যা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক পাত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া এদেশের লোকেরা কত অসারত্বের পরিচয় দিতেছে। ব্রহ্মচর্য্য, আত্মসংযম, এ সকল আমাদের দেশে এখন কথার কথা হইয়া উঠিয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থায়, আত্ম-সংযম ব্রত শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের দেশের সমাজের পক্ষে খুব চেষ্টা করা উচিত। আত্মসংযম ব্রত-শিক্ষা না দিলে, এবং বিপত্নীক ও বিধবাবিবাহের স্রোতের গতিরোধ না করিলে, নানা দুর্নীতি যে প্রশ্রয় পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ জন্য, আত্মসংযম-ব্রত এদেশের মনুষ্যকে অতি শৈশব হইতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আমরা বলিয়াছি, আদর্শ বিবাহ সমাজে প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বালবিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী। অর্থাৎ উপযুক্ত বয়সে ধর্ম্মজ্ঞান লাভের পর পছন্দ-সই বিবাহ হইলে এবং বিবাহের পর স্বামী সহবাস হইলে আর বিধবা-বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। সতীত্বের মর্য্যাদা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য, এবং পাশ্চাত্য সমাজের কুফল নিবারণের জন্য ইহা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। তবে স্থান

বিশেষে, মানুষের ব্যভিচার নিবারণের জন্য বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সে বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হইবে, আদর্শ মনে করিতে হইবে না। না হইলে বিবাহ কার্য্যটা কালে একটা ব্যবসার ন্যায় হইয়া উঠিবে। এই রূপ চুক্তি-বিবাহ যে সমাজে চলিয়াছে, সেই সমাজেরই দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এই জন্য হিন্দু সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজেও যাহাতে সতীত্বের আদর বৃদ্ধি পায় এবং বিবাহটা কোনক্রমে একটা চুক্তিতে বা ব্যবসাতে পরিণত না হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। সৌভাগ্যের বিষয়, এ বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি আছে। বিধবা এবং বিপত্নীক, এই উভয়ের মধ্যে যাহাতে ব্রহ্মচর্য্যা-শিক্ষা বিস্তৃত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টার এখনও আবশ্যক। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অনেক বিপত্নীক মহাত্মা এই কঠোর ব্রহ্মচর্য্যা গ্রহণ করিয়া উচ্চ জীবনের আদর্শ দেখাইতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্থানে স্থানে ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। আমাদের একান্ত অনুরোধ এই, ১৮৭২ সালের আইনানুসারে যে সকল যুবক যুবতীর বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ বিধবা বা বিপত্নীক হইলে আর বিবাহের চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। যদি কেহ বিবাহ করে, তবে সে বিবাহকে আদর্শ মনে করা উচিত নয়। কিম্বা পূর্ব্ব-বিবাহিত যে সকলবিধবা বা বিপত্নীকের সন্তান জন্মিয়াছে, তাহাদের পুনর্বিবাহ প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভারতের অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে বিবাহ চিরকাল নিন্দিত ও ঘৃণিত। ভূমিষ্টসন্তান লইয়া কোন বিধবা ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করিয়াছেন, আমরা শুনি নাই। কিন্তু উপযুক্ত সন্তান বর্ত্তমান থাকিতে বিপত্নীক বিবাহ করিয়াছেন, ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ সাম্যবাদানুসারে না চলিয়া বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকারের লিখিত অনুপাতবাদানুসারে চলিতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বয়স্থা বিধবা এবং অধিক বয়স্ক বিপত্নীকদিগের জন্য এক রূপ ব্যবস্থা হওয়াই উচিত। কেহ রিপু-দমন করিবে, কেহ রিপু চরিতার্থ করিতে থাকিবে, এ কলঙ্কের প্রথা ব্রাহ্মসমাজের সাম্যবাদের মধ্যে স্থান পাইতেছে বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম যাঁহাদের লক্ষ্য, আত্ম-সংযম যাঁহাদের মূল মন্ত্র, তাঁহারা কার্য্যকালে আত্ম-সংযম করিতে পারিবে না, ধর্ম্মগত জীবন লাভ করিতে পারিবে না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা।

বিবাহ আধ্যাত্মিকতা সাধনের অবলম্বন। বিবাহ কেবল সংসারের ইষ্টানিষ্ট সাধনের জন্য নয়, ধর্ম্মসাধনের সহায়তার জন্য। কিন্তু সেই বিবাহ ক্রমাগত অসংখ্য বার হইতে দিলে প্রেমের পরিবর্ত্তে রিপু পরিচর্য্যারই অধিক প্রশ্রয় দেওয়া হয়। পরকালে এক পা দিয়া, পক্ককেশ ও গলিতচর্ম্ম, জীর্ণ শীর্ণ দেহধারী যে সকল বিপত্নীক দ্বিতীয় তৃতীয় বার বিবাহের জন্য লালায়িত হন, তাহাদিগের রিপুর উত্তেজনা নাই, "কেবল দুধ গরম করিয়া দিবার জন্য বা সন্তান পালনের জন্য, বা আধ্যাত্মিকতা উপার্জ্জনের জন্য তাঁহারা বার বার স্ত্রী গ্রহণ করিতেছেন,"

এ কথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। ম্যাল্‌থাসের মত রক্ষার জন্য নয়, আমাদের বিবেচনায়, আধ্যাত্মিকতা সাধনের জন্যও একাধিক বার বিবাহ হইতে পারে না। বহুবিবাহ আমাদের দেশের শাস্ত্র বিরুদ্ধ।* স্ত্রী সংসারে থাকিলে বিবাহ দূষিত, আর পরকালে থাকিলে বিবাহ দূষিত নয়, পরকালবিশ্বাসী ধর্ম্ম-পিপাসু লোকের পক্ষে এ কথা বলা সঙ্গত নয়। তবে বালক বালিকাদের বিবাহের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের বিবাহকে আমরা বিবাহ বলিয়াই স্বীকার করি না। বাল বিধবার বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নানা শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাল বিধবার বিবাহ শাস্ত্র সম্মত।† বহুবিবাহের অযৌক্তিকতা ও বালবিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এস্থানে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। কারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্যব্যক্তি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন।

আমরা বিগত কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় দেখাইয়াছি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিয়মের বাধ্যবাধকতা, এ উভয়েরই প্রয়োজন আছে, এবং একের সহিত অপরের মিলনের স্থান আছে। উভয়ের মধ্যে সীমা-রেখা নির্দ্ধারণ করা কিছু কঠিন বলিয়া আমরা অনেক বিজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তৎপর দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মসমাজে এই রূপ সামাজিক নিয়মের আবশ্যকতা, ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য নেতা মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন উত্তমরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নবসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; এবং এই নবসংহিতা অনুসারে যাহাতে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য দরবার (Apostolic Durbar) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দরবার ব্রাহ্ম-সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ধর্ম্মাপিপাসু ব্যক্তিগণের দ্বারা সংগঠিত। সুতরাং ইঁহাদিগের সমবেত-বিবেক-শাসন দ্বারা চালিত হইলে, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবে, এ আশা করিয়া তিনি বড় ভুল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই কার্য্য কতদূর সুফল-প্রসূ হইবে, ভবিষ্যতের ইতিহাস সে কথার উত্তর দিবে।

এই নবসংহিতায় বিবাহ সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। আমরা এ পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে সে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা অতি সুন্দর রূপে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অত্যল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, হঠাৎ-বিবাহ মঙ্গলপ্রসূ নয়, নির্ব্বাচনের সময় রিপুর অধীন হইয়া রূপজমোহের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নয়, ধর্ম্ম ও নীতিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত উচিত, বিবাহে অভিভাবকের সম্মতি ও পাত্র পাত্রীর সম্মতি উভয়ই গ্রহণ করা উচিত, সম্বন্ধের পর পাত্র পাত্রীর আলাপাদি অভিভাবক-দিগের অজ্ঞাতে বা অসাক্ষাতে হওয়া উচিত নয়, একাধিক বার বিবাহ দেওয়া

---

* বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, চতুর্থ সংস্করণ দেখ।

† বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব শ্রীঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, ষষ্ঠ সংস্করণ দেখ।

উচিত নয়, বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা কোন স্থলেই বাঞ্ছনীয় নয়, বয়স্থ বিপত্নীক বা বিধবার বিবাহ ভাল নয়, কোন প্রকার নৈতিক বা রক্তমাংস সম্পর্কে আবদ্ধ পাত্র পাত্রীর বিবাহ সঙ্গত নয়, ইত্যাদি যে সকল কথার আমরা আলোচনা করিয়াছি,সে সমুদায় অতি বিস্তৃতার সহিত ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, আজ হউক কাল হউক, এই নবসংহিতার ন্যায় কোন সংহিতা অনুসারে ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ প্রথাকে নিয়মিত করিতে হইবেই হইবে। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সূক্ষ্মদৃষ্টি ভাবী সমাজভিত্তির এক প্রধান অবলম্বন হইবে।

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে একটা নিয়ম প্রণালী আছে। আমরা বারম্বার একথা অস্বীকার করিয়াছি। সমাজের একটা কিছু স্থির সিদ্ধান্ত না থাকায় নানা রূপ দোষ-মিশ্রিত গোলযোগ দেখা যাইতেছে। সেই সকল গোলযোগের কথা আমরা বাধ্য হইয়া স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল দোষ সংশোধিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা করিতে হইলে সমাজে আদর্শমত প্রতিষ্ঠিত করা চাই। এই আদর্শমত সমবেত বিবেকশক্তি সংস্থাপন করিবে। সেই মত অনুসারে সমাজের সকল লোক ধর্ম্মত ও ন্যায়ত চলিতে বাধ্য। কারণ, সমাজের আবশ্যকতা মানিতে গেলে এ বাধ্যবাধকতা চাই। এই সকল কথাই আমাদের বলিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আমরা যথাসাধ্য তাহা বলিয়াছি। ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার করা আমাদের লক্ষ্য ছিল না। অনেক ব্যক্তি আমাদিগকে দোষী ব্যক্তি সকলের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং ঘটনার স্থান ও নামোল্লেখ করিতে খেদ করিয়াছেন। আমাদের প্রতিবাদকারী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও তন্মধ্যে একজন। ব্যক্তিগত দোষের সহিত আমাদের কোন সংশ্রব নাই। সকল সমাজের সকল লোকই কিছু স্বর্গের দেবতা হইবে না। কোন সমাজই একেবারে নিষ্পাপ হয় নাই। সকল সমাজেই দুষ্টপ্রকৃতির লোকের সমাগম আছে। ব্রাহ্মসমাজে যে খারাপ লোক একেবারে থাকিবে না, তাহা নয়। খারাপ লোক আছে, এবং তাহা থাকিবে। পাপ সমাজে আছে, এবং তাহা থাকিবে। খারাপ লোকদিগের অন্যায় কার্য্য সমাজের দ্বারা প্রশ্রয় পাইতেছে, ইহাই আমাদিগের প্রধান দুঃখ। পাপকার্য্য পুণ্যকার্য্যের নামে প্রশ্রয় পায়, ইহাই খেদ। খারাপ লোক যাহারা আছে,তাহাদের আচার ব্যবহার,কার্য্যপ্রণালী সমাজের দ্বারা নিয়মিত হওয়া একান্ত উচিত। নচেৎ সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। ব্রাহ্ম-সমাজ এক বিষম অগ্নি পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। একদিকে যৌবন-বিবাহ, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা, অপর দিকে জাতিভেদ-নাশ এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে, সতর্ক না হইলে, পদে পদে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে কিছু দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে, ইহার ফলভোগ যে কত কাল ভুগিতে হইবে, তা বিধাতাই জানেন। কঠোর আত্মসংযমের ব্যবস্থা না হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। একদিকে পবিত্রতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, অন্যদিকে বৈরাগ্য ও রিপুনিগ্রহ;— একদিকে সুখস্বচ্ছন্দতা বা বিলাসিতা বিসর্জ্জন, অন্যদিকে নিষ্কাম পরোপকার ব্রত গ্রহণ ভিন্ন সমাজের

মঙ্গলের পথ নাই। কার্য্যকর্ম্মহীন জীবনেই রিপুর আধিপত্য অধিক স্ফূর্ত্তি পায়। কার্য্য-শিথিলতার সহিত ব্রাহ্ম-জীবনে রিপু-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। যাহাতে প্রত্যেকে উপরোক্ত সকল সৎগুণে ভূষিত হইতে পারে; তজ্জন্য এখনই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। আদি বংশের দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সংসাধিত না হইলে, পরবংশ যে আরো অধঃপতিত হইবে, তৎপক্ষে একটুও সন্দেহ নাই। সুতরাং এখন ব্রাহ্মসাধারণের খুব সতর্ক হওরা উচিত। মন্দ লোক যাহারা আছে, তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ দেশের পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, বিধাতা এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। পাপ যাহাতে এই নব সমাজে আর প্রশ্রয় না পায়, ভগবান তাহা করুন।

এক বৎসরের অধিককাল ব্যাপিয়া আমরা এই বিষয়টী লইয়া আন্দোলন করিতেছি। আমাদের সকল বক্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তবুও আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে বাধ্য হইলাম। তাহার কারণ, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া একটা বিষয় লইয়া আন্দোলন করায় অনেকে বিরক্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয়ত, সকল কথা বিস্তৃত রূপ লিখিতে গেলে আরো অন্ততঃ ৬ মাসের প্রয়োজন। এই ৬ মাস ব্যাপী প্রবন্ধে নব্যভারতের যে স্থান লাগিবে, তাহাতে আরো অনেক অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখিতে হইবে। তৃতীয়ত,যে উদ্দেশ্যে নব্যভারতেপ্রবন্ধটীর সূত্রপাত হইয়াছিল,তাহা একপ্রকার সুসিদ্ধ হইয়াছে। দেশের অনেক লোকের মন এই গুরুতর বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। চতুর্থত,--ব্রাহ্মসমাজে যদিও এখন পর্য্যন্ত ইহার সুফল ফলে নাই বটে, কিন্তু আন্দোলন যথেষ্ট হইয়াছে। আমাদিগকে অপদস্থ করিবার জন্যই হউক, বা যে কারণেই হউক, বিষয়টী ব্রাহ্মসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যখন মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে, তখন সময়ে যে ইহাতে একটা সুফল ফলিবে, তাহা নিশ্চয়। আর না ফলিলেও আমরা কি করিব? আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য আমরা যথাসাধ্য করিয়াছি। সুতরাং আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য একরূপ সাধিত হইয়াছে। এখন বৃথা আর আন্দোলন করিয়া প্রয়োজন কি? এই সকল নানা কারণে আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। প্রবন্ধটীতে ভুল ভ্রান্তি যথেষ্ট হইয়াছে, তাহা জানি। দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সে সমুদায় সংশোধন করিয়া এদেশীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সহ তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল। সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, বিধাতাই জানেন।

কেহ কেহ বলেন, এই প্রবন্ধের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করা হইয়াছে। আমরা খুব ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু একথার মূল কি, বুঝিতে পারি নাই। ধর্ম্মের নিকট যে সমাজ খাটী, সে সমাজের কে অনিষ্ট করিতে পারে? আর যে সমাজ তাহা নয়, তাহাকেই বা কে পতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে?. ধর্ম্ম ও নীতির মিলন স্থান—সমাজের এই বিবাহপ্রণালী। যে সমাজে এই বিবাহ-প্রণালী আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ, সে সমাজের পতন নাই। ব্রাহ্মসমাজ এই

বিবাহ-প্রণালীকে ধর্ম্ম ও নীতির উজ্জ্বল ভূষণে যদি একাল যাবৎ সজ্জিত করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে এ সমাজের নিশ্চয় পতন হইয়াছে, আমরা কিম্বা শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু না বলিলেও পতন হইয়াছে। আর যদি ধর্ম্ম ও নীতিকে অপ্রতিহত ভাবে বজায় রাখিতে পারিয়া থাকেন, শতকণ্ঠে শতজন ব্রাহ্মসমাজের দোষ ঘোষণা করিলেও ইহার পতন নাই। সুতরাং আমাদের দ্বারা ইহার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তাহা হয়ও নাই। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়া ব্রাহ্মসমাজ আপনি যে পতনের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, আমরা তাহার কেবল পুনরুক্তি করিয়াছি মাত্র। সমাজ অধিক দোষী কি আমরা দোষী? একথার বিচার ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা করিবে। আর যাঁহারা ধর্ম্মভীত ব্যক্তি, তাঁহারা করিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দোষ আছে বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ গুণশূন্য নয়। গুণশূন্য হইলে ব্রাহ্মসমাজ এতদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু সে কথা ব্রাহ্মসমাজের লোকের পক্ষে অধিক না বলাই ভাল। আত্ম-প্রশংসা সর্ব্বনাশের মূল।

যৌবন-বিবাহই জীবনের এক মাত্র মঙ্গলের পথ। তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, এই কথা গুলির বিশেষ আন্দোলন করাই আমাদের অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। যে কারণেই হউক,— এদেশে যৌবনবিবাহের সূত্রপাত হইয়াছে,—ইহার গতি আর ফিরিবে না,—ফিরিবার নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের পতিত সমাজের উপর দিয়া এক প্রবল পরিবর্ত্তনের স্রোত চলিয়াছে, ইহার স্রোত থামাইতে পারেন, এমন ব্যক্তি দেখি না। এই স্রোত আমাদের সমাজকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছে। অনেক বিষয়ে ভালও করিতেছে, অনেক বিষয়ে মন্দও করিতেছে। আমরা দেখিতেছি, বিবাহ বিষয়েও অলক্ষিত ভাবে সমাজে একটা বিষম পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে বালিকা ঋতুমতী হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ হইত, এখন অনেক স্থলে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। কোন মহারথীর আর এ স্রোত ফিরাইবার শক্তি নাই। আমাদের বিবেচনায় পরিবর্ত্তনের এই কার্য্যটী ভাল হই তেছে। কিন্তু ভয় হয়, পাছে পাশ্চাত্য সমাজের নানা দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। আমাদের দেশে সতীত্বের যেরূপ সম্মান, অন্য কোন দেশে এরূপ সম্মান নাই। ঐই জন উভয় দেশের আইনেই বা কত পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশে পত্যন্তর-গ্রহণ কত ঘৃণিত, পাশ্চাত্যসমাজে কতবার পত্য... গ্রহণ হইতেছে, অথচ কোনই সম্মানের হানি নাই! আমাদের দেশে পতিতা রমণীর সমাজে স্থান নাই; পাশ্চাত্য সমাজে সে... নয়। ভয় হয়, পাছে যৌবন-বিবাহ-প্রাবল্যের সহিত আমাদের দেশে স্বেচ্ছাচারিতা, লজ্জাহীনতা বা সতীত্ব-বোধ-হীনতা প্রচারিত হ... পাছে বিবাহ-ভঙ্গ প্রথা স্থান পায়, পাছে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায়। এই জন্য আমরা এ... গুরুতর বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান সময়ে এই সকল গুরুতর সংস্কারকার্য্যে অগ্রণী বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ কথা বলিয়াছি। সংস্কারের পথে যে অগ্রসর হয়, তাহাকে অনেক সহিতে হয়; ইহা আমাদের ধারণা। ব্রাহ্ম সমাজকে এই

সহিতে হইয়াছে, আরও হইবে। আমরাও কতক সেই লাঞ্ছনা দিলাম। এই জন্য অনেক সহৃদয় ব্যক্তি হৃদয়ে আঘাত পাইয়াছেন, জানি। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে, দেশ এবং সমাজের মঙ্গলের মমতায়, কঠোর হইতে কঠোর হইয়া আমাদিগকে এই কার্য্য পালন করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এক দিন আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আশা করি। আর সমগ্র দেশ,যাহার মঙ্গলের সহিত আমাদের রক্ত মাংসের জড়িত-যোগ, আশা করি, এই বিষম পরিবর্ত্তনের সময়ে ধীরতা এবং ধৈর্য্যতা সহকারে, নীতি ও ধর্ম্ম যাহাতে অপ্রতিহত ভাবে বজায় থাকে, তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন। আমাদের স্থির বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও নীতি লক্ষ্য পথে না থাকিলে, এবং তাহা ব্যবহারিক জীবনে প্রতিপালিত না হইলে, দেশের কোন প্রকার মঙ্গল নাই। ধর্ম্ম মানবের সঞ্জীবনী শক্তি। ধর্ম্মই মানবের এক মাত্র চরিত্রের ভিত্তি। যে সমাজে ধর্ম্ম নাহি, সে সমাজে কিছুই নাই। হিন্দু সমাজে অপ্রতিহত প্রভাবে যাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, সকলে প্রাণপণে সেই চেষ্টা করুন। এক মাত্র ধর্ম্মহীনতাই বর্ত্তমান সময়ের, দারিদ্র্যই বল বা দৌর্ব্বল্যই বল, যাহা বল, সকলের মূল। অতএব যাহাতে ধর্ম্ম আবার দেশে জাগে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মশূন্য যৌবন-বিবাহ সর্ব্বনাশের মূল। পাশ্চাত্য সমাজ সমূহ ইহার শোচনীয় ফলভোগে পর্য্যুদস্ত হইতেছে, সাবধান সাবধান,—নব হিন্দুসমাজ এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া যেন সেই ধর্ম্মশূন্য-যৌবন-বিবাহ বা সর্ব্ব- [illegible] প্রাণ, ধন মান অপেক্ষা অধিক পূজ্য পবিত্র চরিত্র ও ধর্ম্ম ধনে বঞ্চিত না হয়। ভারত যেন মহা অমূল্য সতীত্ব রত্নে বঞ্চিত না হয়! ভারত-রমণীর এই চিরপূজ্য, চিরোজ্জ্বল সতীত্ব-রত্নের নিকট কোটী কোটী কহিনুর তুচ্ছ কথা। সাবধান, ভারত যেন এই রত্নহীন না হয়।*

* আপাততঃ এই প্রবন্ধ শেষ হইল। আবশ্যক হইলে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আবারও ইহার আলোচনা হইতে পারিবে। কিন্তু আমরা এখন আর সে ইচ্ছা রাখি না। প্রবন্ধ শেষ হইলে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদের উত্তর দিব, প্রতিশ্রুত ছিলাম। আমাদের মূল প্রবন্ধের মধ্যে তাঁহার প্রায় সকল প্রধান কথাগুলির উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বাকী অংশের অনেকগুলির উত্তর প্রকাশ বাবু দিয়াছেন। অবশিষ্ট গুলি অবান্তরিক কথা। সে গুলিও খণ্ডন করিয়া দেখাইতে একান্ত ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সামান্য সামান্য প্রতিবাদে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিরক্ত হইয়া আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে আর আমাদের ইচ্ছা নাই। তিনি এত বিরক্ত হইবেন, পূর্ব্বে জানিলে আমরা তাঁহার প্রতিবাদ-প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতাম না। যাহা হউক, তাঁহারপ্রতি ব্যক্তিগত ভাবেআমাদের কোন বিরক্তির কারণ নাই। তিনি আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন,ভগবান তাঁহাকে সেজন্য ক্ষমা করুন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন অসহিষ্ণু সভ্য আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন,তাহারজন্যও ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। দুর্নীতিপ্রশ্রয় পাইতেছে দেখিয়া যখন এই সমাজের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছি,তখন আর এই সমাজের সভ্যদিগের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং দ্বারিক বাবুর প্রবন্ধের অন্যান্য কথা কিম্বা তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় বার প্রবীণ লোকের ন্যায় যে যুক্তিতর্কহীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও আর সমালোচনা করিব না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। গোধন-রক্ষা।— তাহিরপুর কৃষি-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ভারতবর্ষে গোজাতির দিন দিনই অবনতি হইতেছে, পীড়া, অযত্ন এবং গোমাংসাহার-প্রিয়তাই ভারতবর্ষের গো জাতির অবনতির কারণ; গোমাংস ভারতবর্ষের উপযোগী আহার নয়, প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়া লোকের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। তিনি গোজাতির রক্ষার উপায় সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, কেবল গোহত্যা-নিবারণের নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের স [illegible]য্য আবশ্যক, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। লেখকের শেষোক্ত মত সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলিতে চাহি না, তবে তাঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিনি যে অভিপ্রায়ে এই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য-সাধন সম্বন্ধে গ্রন্থখানি মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

২। **Helps to the Bengalee Course, for the Entrance Examination of 1888. by Sarat Chandra Mitra.**— আমরা অর্থ বহি পড়ানের তত পক্ষপাতী নহি, সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহ প্রদান করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। তিনি অনেক স্থলে শব্দের অর্থগুলি বেশ পরিষ্কাররূপে লিখিয়াছেন, কিন্তু আবার কোন কোন স্থলে তাঁহার লিখিত অর্থ মূল শব্দ হইতেও কঠিন হইয়াছে। আমরা একটী উদাহরণ দিতেছি, "উল্কা"—এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ মধ্যে মধ্যে আকাশ-মার্গে জ্বলিত হইয়া থাকে।"

৩। ভৈষজ্য-বিজ্ঞানম্।— শ্রীমতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়বিশারদেন সঙ্কলিতম্। প্রথমো ভাগঃ। এ গ্রন্থে কেবল পরিমাণ নির্ণয় এবং পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক সঙ্কলিত হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, এ গ্রন্থের অবয়ব আরো বর্দ্ধিত হইবে। এরূপ গ্রন্থ যত প্রচার হয়, ততই ভাল। আমরা এ অসম্পূর্ণ অবস্থায়, গ্রন্থের কোন দোষ গুণ আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি না।

৪। বালা।—এ খানি পদ্যময় গ্রন্থ, মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অনুকরণে লিখিত। গ্রন্থকর্ত্তা তাঁহার বালাকে বাবু যোগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের কর-কমলে সাদরে অর্পণ করিয়াছেন। সে ভালই

আর কোন অসহিষ্ণু ব্যক্তি যদি আমাদিগের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও আর নব্যভারতে স্থান পাইবে না। কারণ, প্রতিবাদের সমালোচনা যাঁহারা সহ্য করিতেপারিবেন না, তাঁহাদিগের এ পথে অগ্রসর হওয়া মহা ভুল। দ্বারিকবাবু আমাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, নানা কারণে তাহা উল্লেখ করিলাম না। তাঁহার প্রবন্ধের বাকী আবন্তরিক কথাগুলির উত্তর দিলাম না বলিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। তাঁহার কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং কুৎসা-প্রিয় ব্যক্তি মনে করিবেন। আর আমাদের কথা যাঁহাদের নিকট সত্য বলিয়া বোধ হইবে, তাঁহারা তাঁহাকে সেইরূপ মনে করিবেন। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত, সুতরাং সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ মনে করিবেন। যাঁহার যাহা মনে করিতে হয়, করুন, আমাদের বক্তব্য আমরা এখানেই আপাততঃ শেষ করিলাম।

করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ গুণহীনা, লাবণ্য-হীনা বালাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাটা তত ভাল হয় নাই।

৫। **অবসর-বিকাশ**।—জনৈক হিন্দু মহিলা প্রণীত। যাহারা এই গ্রন্থখানি ছাপাইতে গ্রন্থকর্ত্রীকে পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বন্ধুর মত কার্য্য করেন নাই। এই গ্রন্থে আমরা প্রশংসা করিবার কিছুই পাইলাম না।

৬। **অবসর-চিন্তা**।—শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানিও পদ্যময় গ্রন্থ, দেশের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য ও দেশের কুপ্রথা সমুদয় দূর করিবার জন্য কবি দেশের লোকদিগকে কবিতায় অনুরোধ করিয়াছেন। কবিতায় যে যে গুণ থাকিলে, মানুষ মুগ্ধ হইয়া, বৈরাগী হইয়া, আত্মহারা হইয়া, অথবা মৃত্যুকে স্বর্গের সোপান মনে করিয়া কবির নির্দ্দেশানুযায়ী কায করে, অবসরচিন্তায় সেরূপ উচ্চ কোন গুণের বিকাশ নাই। তবে গ্রন্থকর্ত্তা একটী বিষয় বেশ জানেন, কি ভাবে ছবি দাঁড় করাইলে দেখিতে সুন্দর হয়, তাহা তিনি জানেন। গ্রন্থকর্ত্তার আঁকিবার শক্তি একটু ভাল থাকিলে গ্রন্থখানি সুন্দর হইত।

৭। **অভিমন্যুবধ কাব্য**।—শ্রীউমাচরণ দাস প্রণীত। এখানিও কবিতা-শূন্য কাব্য, না লিখিলেই ভাল হইত।

৮। **সাহিত্য-কুসুম**।—শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার প্রণীত। গ্রন্থখানিকে বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে, বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে ব্যবহার-বিরুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য কিছু হ্রাস করিয়াছেন।

৯। **একাক্ষর-কোষঃ**।—শ্রীকালিপ্রসন্ন বিট সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানিতে একাক্ষর-শব্দগুলির অর্থ সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে। এ ক্ষুদ্র কোষখানির ভাষার একখানি পুরাতন গ্রন্থ। ভাষা-জ্ঞানার্থীদিগের একবার পড়া উচিত।

১০। **চিরপঞ্জিকা**।—"অতীত ও ভবিষ্যৎ, চির দিনের নিমিত্ত বার এবং দণ্ড পলাদির পরিমাণের সহিত তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি পঞ্জিকা সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণ ও গ্রহ সঞ্চার গণনা করিবার সহজ উপায়" এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। লেখক যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং গ্রন্থ খানিকে সাধারণের পাঠোপযোগী করিতেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গণনার সঙ্কেতগুলি যদি শুভঙ্করের প্রণালী মত লেখা হইত, তবে স্মরণ রাখার পক্ষে সুবিধা হইত।

১১। **শব্দতত্ত্ব-কৌমুদী**—শ্রীজয়গোপাল গোস্বামি-প্রণীত। এখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ। বাঙ্গালা-ভাষা-শিক্ষার্থী উচ্চ শ্রেণীর পাঠকগণের পাঠ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

১২। **শিশু ব্যাকরণ**।—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস গুপ্ত প্রণীত। এ ব্যাকরণখানিও নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্যের উপযোগী হইয়াছে।

১৩। **The Speaker or English odioms &c. By Manmatha Nath Mastafi B. A.** ইংরাজী ভাষার ইডিয়ম, ফ্রেজ প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া উপযুক্তরূপে ব্যবহার করা ছাত্রদিগের পক্ষে বড় কষ্টকর। মন্মথ বাবুর এই পুস্তকখানি হইলে তাহারা বিশেষ সাহায্য পাইবে।

১৪। প্রবন্ধ-মুক্তাবলী।— অর্থাৎ সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধ; ১ম সংখ্যা। এই সংখ্যায় "মঙ্গলাচরণ," "ইয়ুরোপীয় সভ্যতাই কি প্রকৃত সভ্যতা" এবং "শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার অধিকারী মহাশয় প্রণীত প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রকৃত বিজ্ঞান না বিকৃত বিজ্ঞান," এই কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রবন্ধটীতে লেখকের তর্ক শক্তির এবং লিখিবার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটীতে সেরূপ ক্ষমতার পরিচয় পাই-লাম না। তৃতীয় প্রবন্ধে সূর্য্য বাবুকে লক্ষ্য করিয়া যে সমুদয় কথা বলা হইয়াছে, তাহার অনেক কথা আমাদের নিকট স্বরুচি-বিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বোধ হইল। গ্রন্থকর্ত্তা মতের দোষ, লেখার দোষ দেখাইতে অবশ্য অধিকারী, কিন্তু লেখককে উপহাস ও বিদ্রূপ করিবার প্রয়োজন কি? স্থায়ী সাহিত্যে এই রূপ ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা উচিত।

১৫। সমালোচক কাব্য।— দ্বিতীয় ভাগ, লেখক যে উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে জানেন;তাহার পরিচয় এ ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ কাব্য খানির অধিকস্থলেই আছে। আজি কালি-কার গ্রন্থলেখা-রোগ দূর করিবার জন্য তিনি কিছু তীব্র ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। "যেমন রোগ তেমন ঔষধ," এজন্য আমরা তাঁহাকে নিন্দা করি না।

১৬। কাননে কামিনী কাব্য।— শ্রীঅঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সমর্থ-কোষ প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য।০ আনা। এখানি পদ্যময় গ্রন্থ। আমরা শুনিয়াছি,লেখক অন্ধ, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনু-রাগ। এ গ্রন্থখানি সেই অনুরাগের সুফল। তাঁহার বহুযত্নপ্রসূত এই সুন্দর গ্রন্থ খানিকে. আমরা তীব্র সমালোচনার আগুণে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতে ততপ্রস্তুত নহি। পদ্যগুলির ভাষা অনেকস্থলে সরল এবং সুমিষ্ট হইয়াছে।

১৭। ভৈষজ্য নাড়ী বিজ্ঞান-চন্দ্রিকা। শ্রীগিরীশ চন্দ্র দাস কবিরাজ কর্তৃক সঙ্কলিত; ও শশীভূষণ দাস ডাক্তার কর্তৃক প্রকাশিত। আমরা প্রথমত মনে করিয়াছিলাম, গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় নাড়ী পরীক্ষা সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন মত এবং নাড়ীর গতি পরিবর্ত্তনের কারণ ইত্যাদি বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া-ছেন, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সেরূপ কিছুই করা হয় নাই। তিনি নাড়ীর গতি ও পরীক্ষা সম্বন্ধীয় যে সমুদয় শ্লোক সঙ্কলন করা উচিত মনে করিয়াছেন, তন্ত্রাদি হইতে কেবল তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন। এরূপ সংগ্রহ পূর্ব্বেও দুচারি খানি বাহির হইয়াছে। কিন্তু এগ্রন্থ খানির ছাপা, কাগজ প্রভৃতি পূর্ব্ব-প্রকাশিত এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক ভাল।

১৮। ছিন্ন-হৃদয়।—উপন্যাস। বালকের সহিত বালকের বিমল প্রেম, সেই প্রেমে বিরহ, বিদ্বেষ প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা চিত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা বোধ হয় নূতন লেখক; চিত্রের সৌন্দর্য্য, ভাবের বিকাশ বা ভাষার পারিপাট্য কিছুই তাঁহার গ্রন্থে নাই। তারপর আবার ঘটনা-সন্নিবেশেও তিনি নিতান্ত অপটু।

১৯। ভারত কামিনী।—স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ. শ্রীদুর্গাচরণ দাস গুপ্ত কবিরাজ প্রণীত।

২০। ললনা সুহৃদ—শ্রীসতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

এই দুই খানি গ্রন্থেই স্ত্রীদিগের শিক্ষার উপযোগী অনেক বিষয় সন্নি-

বেশিত হইয়াছে। কিন্তু দুই খানি গ্রন্থের আরম্ভে উভয় গ্রন্থকর্ত্তাই স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য এবং বিষয় সম্বন্ধে একরূপ অদ্ভুত-পূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাব পুরুষের স্বভাবের মত নয়, সুতরাং পুরুষের যে বিষয় জানা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা জানিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,বিভিন্ন প্রকৃতির পুরুষের সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিবে কি? মতের অংশ বাদ দিলে, গ্রন্থ দুখানিতে মেয়েদের শিখিবার অনেক কথা আছে।

২১। রমণীর কর্ত্তব্য।—গিরিবালা মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। যিনিই প্রকাশ করিয়া থাকুন না কেন, গ্রন্থখানিতে গৃহস্থের মেয়ের শিখিবার অনেক কথা আছে। কিন্তু জেলী, পাওয়ারুটী প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালীর বর্ণনা করিয়া যে সময় ও কাগজ নষ্ট করা হইয়াছে, দেশীয় অন্যান্য একান্ত-প্রয়োজনীয় খাদ্য (সে সমুদয় সম্বন্ধে গ্রন্থে কোন কথার উল্লেখ নাই) সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিয়া ঐ কাগজটুকু এবং সময়টা ব্যয় করিলে কি ভাল হইত না?

২২। শান্তিজল।—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত। কবি প্রকৃত পদার্থকে কাল্পনিক পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া, লোকের সম্মুখে, পরিচিত অথচ পূর্ব্বে-না-দেখা একরূপ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আনিয়া উপস্থিত করেন। দর্শক সে রূপ দেখিতে দেখিতে মোহিত হয়, আবার সেই মোহের মধ্যেই প্রকৃত পদার্থকে চিনিতে পারে। নূতনত্ব-প্রিয় মনুষ্যের মন পুরাতন জিনিষের দিকে আকর্ষণ করার এটী যেরূপ অমোঘ উপায়,সেরূপ উপায় আরএকটীও নাই। যে কবির কবিতায় এইরূপ সাজ-সজ্জা যত,তাহার কবিতা মানুষের কাছে তত আকর্ষণ-কারিণী, তত মনোমোহিনী ও তত আদরের জিনিষ। গোবিন্দ বাবু তাঁহার কবিতাগুলিকে এ শ্রেণীর কল্পনায় সজ্জিত করেন নাই। তিনি মানব-মনের অসজ্জিত ভাবগুলির চিত্র আঁকিয়াছেন। কোন স্থানে অধিক রং দেন নাই। এই নিমিত্ত শান্তিজল সাধারণ পাঠকের নিকট বোধ হয় তত আদর পাইবে না। কিন্তু যে শ্রেণীর পাঠক নিজের হৃদয়-ভাবের ছায়া অন্য স্থানে দেখিলে সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা শান্তিজল পড়িয়া সন্তুষ্ট হইবেন। শান্তিজলের লেখক সকল প্রকার মনোবিকারের ব্যাখ্যা করিয়াই রোগী সম্বন্ধে শান্তিজল ব্যবস্থা করিয়াছেন। শান্তিজল উচ্চ কল্পনাময়ী কবিতা নয়, কিন্তু এখানি যে প্রকৃতির বার্ণিস-ছাড়া একখানি হৃদয়গ্রাহী চিত্রফলক, সে বিষয় বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

২৩। মা ও ছেলে।—শ্রীচণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি নূতন ধরণের পুস্তক। সন্তানকে মানুষ করিতে হইলে পিতা মাতাকে কিরূপ প্রস্তুত হওয়া উচিত, এবং কি কি উপায়ে সে রূপ প্রস্তুত হওয়া যায়, এই সমুদায় বিষয় গল্পচ্ছলে গ্রন্থকার লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। উদ্দেশ্য অতি সৎ, অতি মহৎ। আমাদের দেশের ছেলেরা মানুষ না হইলে এদেশের মঙ্গল নাই। এ কথাটী গ্রন্থকার বিশেষ রূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াই একার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি স্পেন্সরপ্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেক কথা এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কাল্পনিক অংশ অতি সুন্দর হইয়াছে. সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যবহারিক অংশ

সেরূপ হয় নাই। পুস্তক খানি মেয়েদের জন্য লিখিত, কিন্তু ভাষা বিশুদ্ধ এবং সরল হয় নাই। যাহা হউক, গ্রন্থকার যে মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইলে আমরা সুখী হইব। একটী জীবনও যদি ইহার দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়,তবেই যথেষ্ট হইল। বিধাতা গ্রন্থকারের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

২৪। প্রসূতি।—শ্রীরামমোহন দাস গুপ্ত প্রণীত। গর্ভচিহ্ন,গর্ভিণীর শুশ্রূষা, শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি বিষয় অতি সংক্ষেপে এবং সরল ভাষায় এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে থাকা উচিত। পুস্তক খানির মূল্য।০ চারি আনা,এটীও একটী বিশেষ গুণ। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা স্থানে স্থানে অনেক গুরুতর বিষয়ে আবশ্যকীয় অনেক কথা বলেন নাই। যদি তিনি পুস্তকের আকার ক্ষুদ্র করিবার জন্য এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন, তথাপি এটীকে আমরা গুরুতর দোষ না বলিয়া থাকিতে পারি না।

২৫। দীক্ষা দর্পণম্।—শ্রীবেচারাম সার্ব্বভৌমেন প্রণীতম্। হিন্দুমাত্রেরই দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন,তিনি শাস্ত্রীয় বচন অবলম্বন করিয়া এই কথা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রমাণ যে অকাট্য, তাহা নহে। যুক্তি এবং শাস্ত্র উভয় দ্বারাই তাহার মত খণ্ডন করা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের এ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা-স্তম্ভে তত স্থান নাই। মোটের উপর তাঁহার কথাগুলি তিনি শাস্ত্র দ্বারা একরূপ রক্ষা করিয়াছেন, তিনি কোন বিশেষ যুক্তি অবলম্বন করেন নাই। সে ভালই করিয়াছেন।

২৬। চিন্তা-প্রবাহিণী—১ম ভাগ; শ্রীপ্রিয়নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। মনোবিজ্ঞানের কঠোর প্রশ্ন সমূহ তিনি এরূপ সরল ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকে সকলেরই প্রশংসা করিতে হইবে। লেখক কথোপকথনচ্ছলে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় এ প্রণালীর গ্রন্থ এই নূতন। গ্রন্থকর্ত্তা যে ঘটত্ব পটত্বের ছড়াছড়ি না করিয়া ছোট ছোট কথায় বড় বড় বিষয় লিখিতে জানেন,তাহা গ্রন্থের যে কোন স্থান পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকর্ত্তার সঙ্গে দশজনের মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তাহা আর গ্রন্থকর্ত্তা দূর করিবেন কিরূপে?

২৭। অবলাবালা।—শ্রীসত্যচরণ মিত্র প্রণীত। গ্রন্থকর্ত্তা প্রায় সমুদয় স্থানেই তাঁহার উপন্যাস-লেখার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানই ভাল। কয়েকটী স্থানে মাত্র কয়েকটী দোষ লক্ষিত হয়। পিতৃশোকাতুরা বারবৎসর বয়সের মেয়ের পুতুল লইয়া খেলা করা, মাতৃশবের সম্মুখে বসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐরূপ মেয়ের ক্ষুধা বোধ,ডাক্তারের সহিত হরিদাস বাবুর প্রথম আলাপ, দাঁতকাটাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত দিগম্বরীর সঙ্কল্প, পরে দাঁতকাটার মায়ের কাছে ১২ বৎসর বয়সের মেয়ে দিগম্বরীর সেই কথা বলা, যোগেন্দ্র নাথের আকস্মিক স্বপ্ন-মূলক মনোবিকার,এই কয়েকটী স্থানই অত্যল্পাধিক পরিমাণে অস্বাভাবিক বা অসাধারণ হইয়াছে। অবলাবালা স্ত্রীলোকের একখানি সুন্দর ভাবপূর্ণ পাঠ্য পুস্তক।

২৮। ভারত-ভ্রমণ,—প্রথম খণ্ড, শ্রীবরদা কান্ত সেন গুপ্ত বিরচিত। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পড়িবার নিমিত্ত লোকের মনে নানা কারণে কৌতুহল জন্মে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক শোভা, ভূতকালের বীবন্দের, আত্মোৎসর্গের,পবিত্র প্রেমের, ধর্ম্ম জীবনের, ও কঠোর অন্যান্য কর্ত্তব্য সাধনের অথবা মানসিক নিকৃষ্ট বৃত্তি নিচয়ের তুষ্টি সাধনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহার বিবরণ, সামাজিক অবস্থা, জ্ঞানাদির চর্চ্চা প্রভৃতি বিষয় পরিব্রাজকের প্রমুখাৎ জানিতে পারিবে বলিয়াই লোকে পরিব্রাজকের কাছে, যাইয়া বসে। বরদা বাবুর গ্রন্থে তাঁহার পাঠকের এ সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। তিনি সামাজিক রীতি নীতি, জ্ঞানালোচনা প্রভৃতির প্রসঙ্গ করেন নাই, কেবল বড় বড় জায়গার বড় বড় ঘর বাড়ী, ঘাট বাট প্রভৃতি এবং তৎসম্বন্ধীয় জনশ্রুতি-মূলক অথবা ঐতিহাসিক যাহা কিছু জানেন, তাহাই তাঁহার পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। ভারত-ভ্রমণ-কারীর ভ্রমণবৃত্তান্তে যাহা থাকা উচিত, তাহা তাঁহার গ্রন্থে নাই। তবে যাহা তাঁহার গ্রন্থে আছে, তাহা অতি সুন্দর রূপই লেখা হইয়াছে। লেখকের ভাষার উপর অধিকার আছে, তিনি অনায়াসে সরল ভাষায় অনেক কথা প্রকাশ করিতে পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল এবং সুখশ্রাব্য।

২৯। ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত— অর্থাৎ "বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রত্যেক জেলার সংক্ষেপ বিবরণ।" শ্রীরসিক কৃষ্ণবন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, রচিত, ও প্রকাশিত, প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড। টাইটেল পেজের এ অংশ [illegible]ধ হ ছাপাইবার পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্তা [illegible] নাই সে যাহা হউক, এ গ্রন্থ খানির [illegible] স্থানে সামাজিক রীতি নীতি [illegible] কথা লিখিয়াছেন। ইঁহার [illegible] বরদা বাবুর গ্রন্থের ন্যায় অ[illegible] কিন্তু এই গ্রন্থ খানির ভাষা স্থানে [illegible] কি পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত ছিল।

৩০। কৃষ্ণামিহির।—[illegible] প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। [illegible] এই গ্রন্থখানি বিশ বৎসর পূর্ব্বে [illegible] বোধ হয় আদরের জি[illegible] কিন্তু আজি কালি এত অপ্রা[illegible] দীর্ঘ-শব্দ-বাহুল্য, অস্বাভাবিক বর্ণনা, এবং অতিশয়োক্তি-অলঙ্কারের [illegible] আবার সেই নব জলধর[illegible] গোছের বাঙ্গালা লোকে আর ভাল[illegible] না। লেখকের কল্পনা শ[illegible] আছে, কিন্তু ধনী লোক, তাঁহার ঘরে [illegible] অভাব নাই, কিন্তু কোথায় কি ভাবে তাহা রাখিতে হইবে,তাহা তিনি জানেন না। জ্ঞানদার চরিত্রটী মন্দ আঁকা হয় নাই।

রূপসনাতন।—শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘো[illegible] প্রণীত। গিরীশ বাবু বঙ্গদেশের নাট্য[illegible] জের রুচির বিশেষ পরিবর্ত্তন [illegible]তে [illegible] হইয়াছেন, এজন্য তিনি ধন্য[illegible]। [illegible] রূপসনাতন গ্রন্থখানিতে প্রে[illegible] বৈষ্ণবদিগের ও ভাবে বিভোর[illegible] ছবি তিনি দক্ষতার সহিত চি[illegible] আর রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের [illegible] যে সমুদয় বিষয় এই না[illegible] সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সম্ব[illegible] বলিতে চাহি না। বৈষ্ণবদি[illegible] যেরূপ বিশ্বাস, গ্রন্থকর্ত্তা তা[illegible] ছেন। গ্রন্থখানি নাট্যাংশে [illegible] নাই, তাহার কারণ, বোধ [illegible] বাধ্য হইয়া অনেক সময় অ[illegible] ঘটনা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবে[illegible] হইয়াছে।

এ বৎসরের অবশিষ্ট পুস্তকের সমালোচনা আগামী মাসে যাইবে।